অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

উপদেষ্টা

দেবীপদ ভট্টাচার্য

সম্পাদক-মণ্ডলী

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (সভাপতি)

শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ

শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

অমূল্যচরণ
বিদ্যাভূষণ
রচনাবলী

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
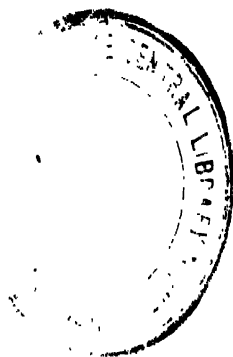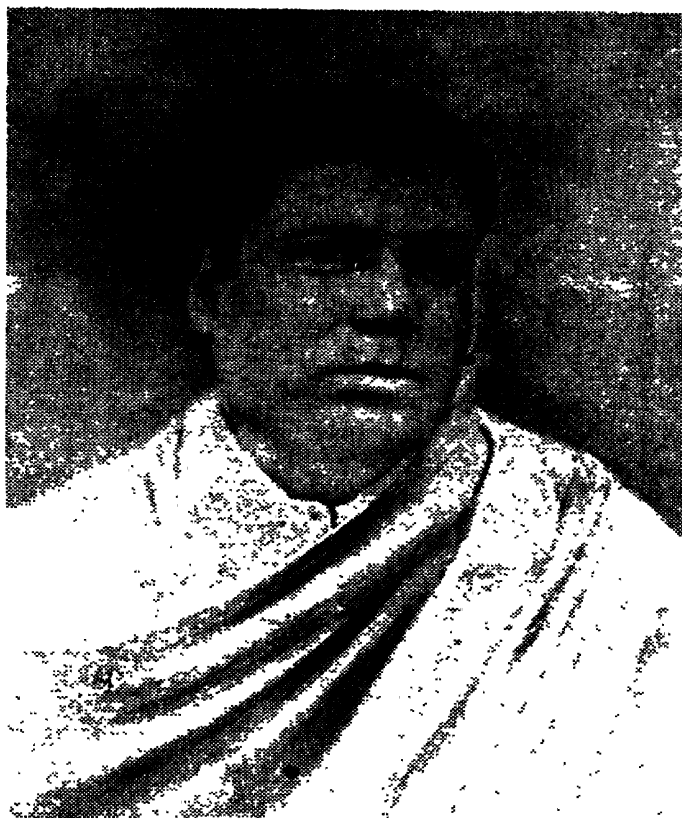
যৌবনে অমূল্যচরণ
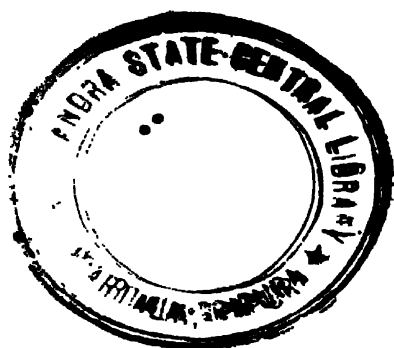
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

উপদেষ্টা

দেবীপদ ভট্টাচার্য

সম্পাদক-মণ্ডলী

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (সভাপতি)

শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ　　শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা

AMULYACHARAN VIDYABHUSHAN RACHANAVALI:

PRATHAMA KHANDA

Collected works of

Amulyacharan Vidyabhushan (1879-1940) : Volume I

Size 21.5 Cm × 13.5 Cm ; 9 illustrations. October 1982

প্রকাশ : ১৬ অক্টোবর ১৯৬০

মুদ্রক :

কালীচরণ পাল

নবজীবন প্রেস

৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী :

বিমল দাস

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, Arya Mansion, 6A Raja Subodh Mallick Square, Calcutta-700 013, under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level, of the Government of India, in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

ভাষা

ভাষা কাহাকে বলে তাহা বুঝাইবার জন্য কোন সংজ্ঞা বা definition দিয়া বিষয়টিকে তেমন পরিস্ফুট করা যায় না। দেশে দেশে যতগুলি ভাষা আছে সেই সমস্ত ভাষারও ততগুলি সংজ্ঞা হইতে পারে; আবার মানুষের যতগুলি ইন্দ্রিয় (organs) আছে, ভাষাগুলিরও ততগুলি রূপ (forms) আছে। বক্তার দিক দিয়া যেমন ভাষার সংজ্ঞা দিতে পারা যায়, তেমনই আবার শ্রোতার দিক দিয়াও ভাষা সংজ্ঞিত হইতে পারে। নিজের ভাব, চিন্তা ও ধারণাকে অপরের নিকট উপস্থিত করিতে হইলে ভাষা যে প্রধান সেতুস্বরূপ উপায় ও অবলম্বন, তাহাতে সন্দেহ নাই। একের নিকট হইতে অপরের নিকট, ভিতর হইতে বাহিরে সঞ্চার করিয়া দেওয়াই যেন ভাষার স্বভাব। বাক্য বা উচ্চারিত শব্দ দ্বারা ভাবের বা চিন্তার স্ফুরণই যদি ভাষা হইত, তাহা হইলে স্মৃতিশক্তিকে দাবাইবার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন ছিল না — আর পয়সা খরচ করিয়া অভিধানেরও দরকার ছিল না।

ভাষার উৎপত্তি

ভাষার উৎপত্তি স্থির করা সহজ ব্যাপার নয়। বিজ্ঞানসম্মত-প্রণালীর সাহায্যে যেমন আমরা বহুত্বের মধ্যে একত্বের সন্ধান পাই, তেমনই সকল ভাষার মধ্যে সেই একত্বের সন্ধান আছে।

অমুল্যচরণের বাংলা হস্তাক্ষর

নিবেদন

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মত বহুভাষাবিদ ও বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তি বিরল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম হতে তাঁর শেষ জীবন (১৯৪০) পর্যন্ত তিনি বহুশ্রেণীর গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির নিকট তথ্যের ভাণ্ডারী বলে স্বীকৃত। সে যুগের বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাগুলি শিক্ষামূলক তথ্যে, তত্ত্বে ও মনীষায় সমুজ্জ্বল।

প্রবন্ধ-সাহিত্যে অমূল্যচরণের মনীষা বিদ্বজ্জন-সমাজে সমাদৃত। বৈচিত্র্যে প্রবন্ধগুলি সংস্কৃতি, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, নৃতত্ত্ব, জাতি-বিজ্ঞান, জাতি-তত্ত্ব, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, দেশতত্ত্ব ও মূর্তিতত্ত্ব এবং আরও বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় সমৃদ্ধ। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে এই সমস্ত বিষয়ের পঠন-পাঠনও হয়। ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও শিক্ষকদের পঠন-পাঠনে প্রবন্ধগুলির যথেষ্ট উপযোগিতা থাকলেও, যে সমস্ত পত্র-পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি আজ সহজলভ্য নয়। তাঁদের পক্ষে সেগুলি সংগ্রহ করা আয়াসসাধ্য অনুভব করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ এই উদ্যোগের সম্পাদকমণ্ডলীর সহযোগিতায় প্রবন্ধগুলি অন্বেষণ ও সংকলন করে বিষয় অনুযায়ী সাজিয়ে প্রয়োজনীয় টীকা ও আনুষঙ্গিক তথ্যসহ গ্রন্থাকারে ছয়-সাত খণ্ডে প্রকাশ করার ভার গ্রহণ করেছেন। 'অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। বিষয়—'ভারত-সংস্কৃতি'। দেশের বিদ্যানুরাগী সন্ধিৎসু মাত্রেই এই রচনাবলী সাদরে গ্রহণ করবেন আশা করি।

শ্রীযুক্ত দেবীপদ ভট্টাচার্য মহাশয় উপদেষ্টারূপে এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ও বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তত্ত্বাবধান করায় তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

দিব্যেন্দু হোতা
মুখ্য-প্রশাসন আধিকারিক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

ভারত-সংস্কৃতি

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

সংকেত

অ.	অথর্ববেদ
অর্থশা.	কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র
অভি.	অভিধান-চিন্তামণি (হেমচন্দ্র-কৃত)
অম.	অমরকোষ
আপ-শ্রৌ.	আপস্তম্ভ-শ্রৌতসূত্র
আশ্ব-শ্রৌ.	আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র
ই.	ইত্যাদি
ইতি.	ইতিহাস
উ.	উপনিষৎ
ঋ.	ঋগ্বেদ
ঐ-আ.	ঐতরেয়-আরণ্যক
ঐ-ব্রা.	ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ
কা-শ্রৌ	কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র
কৃষ্ণয.	কৃষ্ণ-যজুর্বেদ
কৌ-উ.	কৌষীতকী-উপনিষৎ
কৌ-ব্রা.	কৌষীতকী-ব্রাহ্মণ
খ.	খণ্ড
খ্রী.	খ্রীস্টাব্দ
খ্রী-পূ.	খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ
গী	শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা
গৃ.	গৃহ্যসূত্র
গো-ব্রা.	গোপথব্রাহ্মণ
ছা-উ.	ছান্দোগ্যোপনিষৎ
জী-কো.	জীবনী-কোষ (শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার-সংকলিত, ১৩৪৩)

জৈ-উ.	জৈমিনী-উপনিষৎ
ড.	ডক্টর
তা-ব্রা.	তাণ্ড্যব্রাহ্মণ
তৈ-উ.	তৈত্তিরীয়-উপনিষৎ
তৈ-ব্রা.	তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ
তৈ-স.	তৈত্তিরীয়-সংহিতা
ত্রিকাণ্ড.	ত্রিকাণ্ডশেষ
দ্র.	দ্রষ্টব্য
পা.	পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী
পু.	পুরাণ
ব-ম.	বঙ্গীয় মহাকোষ
বাজ-স.	বাজসনেয়ী-সংহিতা
বিশ্বকো.	বিশ্বকোষ
বৃহদ্দে.	বৃহদ্দেবতা
বৃহ-উ.	বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
বো-রো.	Bohtlingk and Roth : Samskrit Worterbuch
বৌদ্ধকো.	বৌদ্ধকোষ (বেণীমাধব বড়ুয়া-সম্পাদিত)
বোধা-শ্রৌ.	বৌধায়ন-শ্রৌতসূত্র
ভা.	শ্রীমদ্ভাগবতম্
ভা-পু.	ভাগবতপুরাণ
মনু.	মনুসংহিতা
মহা.	মহাভারত
মহাম.	মহামহোপাধ্যায়
মাণ্ডু-উ.	মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
মুণ্ড-উ.	মুণ্ডকোপনিষৎ
মে.	মেদিনীকোষ
মৈ-স	মৈত্রায়ণী-সংহিতা

য.	যজুর্বেদ
যা.	যাস্কের নিরুক্ত
যাজ্ঞ-স.	যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা
রা.	রামায়ণ
রোমিলা থাপার	ভারতবর্ষের ইতিহাস (ওরিয়েণ্ট লংম্যান প্রকাশিত অনুবাদ)
লাট্যা.	লাট্যায়ন
শ-ব্রা.	শতপথ-ব্রাহ্মণ
শ্বেতা-উ.	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
সনৎসু.	সনৎসুজাতীয় টীকা পরিশিষ্টম্, ২য় খণ্ড (গুরুপদ শর্মা হালদার)
সা-প-প.	সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা
সা-সে-ম.	বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক-মঞ্জুষা (শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ-সংকলিত, বাঙালী লেখকের পরিচিতি-অভিধান) মাসিক বসুমতী ১৯৫৭, ফাল্গুন—১৩৬২ মাঘ।
সাম.	সামবেদ
হরি.	হরিবংশ

ASR	Archaeological Survey of India Reports
BASSI	Burgess : Archaeological Survey of South India
BCI	Burgess, J : The Chronology of Modern India (1913)
BDIB	Buckland, C.E : Dictionary of Indian Biography (Lond. 1906)

DCI	Duff, C.M. : The Chronology of India (1899)
EI	Epigraphia Indica
En. Brit	Encyclopaedia Britanica. (14. ed. 1932)
ERE	Hastings, I. C. : Encyclopaedia of Religion and Ethics (1908)
ESIP	Burnell, A.C. : Elements of South-Indian Paleography from the 4th to 17th C. (Lond. 1878)
HCUB	Hammerton, J.A. : Concise Universal Biography (Lond. 1939)
IA	Indian Antiquary
JA	Journal Asiatique
JAOS	Journal, American Oriental Society
JASB	Journal of the Asiatic Society of Bengal
JRAS	Journal of the Royal Asiatic Society
LYB	Literary Year Book and Bookman's Directory for the year 1914 (Lond.)
MDPP	Malalasekera, G.P. : Dictionary of Pali Proper Names (Lond. 1937)
MEML	Mackenzie, D.A : Egyptian Myth & Legend (Lond.)
MHEAI	Mazumder, N.N. : A History of Education in Ancient India
MMBA	Mackenzie, D. A : Myths of Babylonia and Assyria (Lond.)

SBE	Sacred Books of the East (Oxf 1891)
VSEHI	Vincent Smith : The Early History of India (1914)
WHIL	Weber, A : The History of Indian Literature (1878)
ZDMG	Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft

প্রাক্‌ভাষণ
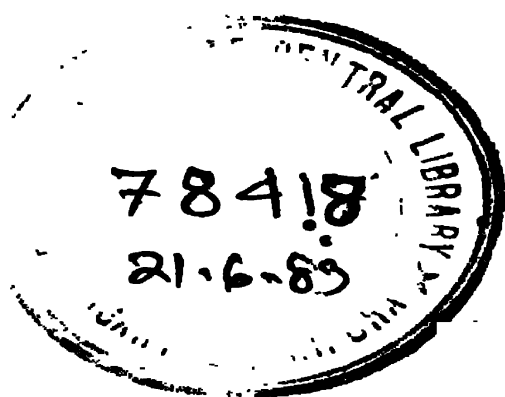
পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে (১৮৭৯-১৯৪০) দেখবার ও তাঁর আলাপ-আলোচনা শুনবার সৌভাগ্য আমার ছাত্রজীবনে হয়েছিল। তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গীয় মহাকোষ' গ্রন্থের প্রকাশিত দুটি খণ্ড আমাদের বাড়িতে ছিল। যদি ১৯৪০ সালে মাত্র একষট্টি বৎসর বয়সে তাঁর দেহত্যাগ না ঘটত তাহলে ঐ মহাকোষ গ্রন্থ হয়ত সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারত। তাঁর সম্পাদিত উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র 'পঞ্চপুষ্পের' কথাও এই সম্পর্কে স্মরণ করা যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কিছুকাল পূর্বে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনাবলী কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশ করবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশের পথে। শাস্ত্রীমহাশয়ের ধারার উত্তরসাধক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। তিনি ভাষাচার্য হরিনাথ দে মহাশয়ের মতো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ছাব্বিশটি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। অনন্য-সাধারণ প্রতিভার অধিকারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের রচনাবলী কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশ করবার সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ গ্রহণ করেন তাঁর জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে। এই সাধু সংকল্প কার্যে পরিণত হল তাঁর রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশের দ্বারা। প্রথম খণ্ডে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত প্রসঙ্গগুলি মুখ্যস্থান অধিকার করেছে। ভারতীয় লিপির উৎপত্তি, তার প্রাচীনতা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা ছাড়াও হিন্দু-সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি ধর্মোৎসবের অর্থাৎ 'রথযাত্রা' বা 'দোল' সম্পর্কিত উৎসবের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাও আলোচ্য খণ্ডে গৃহীত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষায় উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক আলোচনার পথ খুলে দেন। সেই পথেই রমেশচন্দ্র দত্ত, রামদাস সেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তিরা অগ্রসর হয়েছেন। অমূল্যচরণের রচনাপাঠে দেখতে পাই তিনিও যুক্তিহীন বিচারকে গ্রহণ করেন নি,

অন্ধবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেননি, প্রাচীন ভারতের নামে ভাববিহ্বল হননি। তিনি কোনো মনগড়া সিদ্ধান্ত থেকে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হননি। ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকে সংগৃহীত উপাদান-জাত সিদ্ধান্তকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর গদ্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের ভাষার মতো পরিচ্ছন্ন, ঋজু ও দ্ব্যর্থবোধকতাহীন।

তাঁর কৃতী পুত্রদ্বয় বহু পরিশ্রমে দুর্লভ প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন ও মূল্যবান টীকা-টিপ্পনী বিন্যস্ত করেছেন। তার ফলে পাঠকবর্গ বহুল পরিমাণে লাভবান হবেন।

আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্পর্কে বলতেন 'চলমান অভিধান'। সেই জ্ঞানতপস্বী, নিরহংকার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দীপ্যতুল্য প্রবন্ধগুলি সমগ্র সুধী বাঙালী পাঠকের মনোজগতকে আলোকিত করবে এই বিশ্বাস আমরা দৃঢ়ভাবে পোষণ করি। দীর্ঘকাল পূর্বে রচিত হলেও প্রবন্ধগুলি তাদের মননগত গুরুত্ব ও তাৎপর্য হারায়নি।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

মহালয়া, ১৩৮৯

ভূমিকা

(১)

একাধারে বহু ভাষাবিদ্ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের আকর পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এক কিংবদন্তী পুরুষ। দীর্ঘদিন তিনি ছিলেন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্র, অসংখ্য নবীন ও প্রবীণ লেখক, শিল্পী, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও অন্যান্য গবেষকের কাছে তথ্য ও অন্যান্য উপযুক্ত পরামর্শের জন্য পরম নির্ভর। তৎকালীন ছোট, বড়, আঞ্চলিক সব রকম পত্র-পত্রিকায় সংস্কৃতি, সাহিত্য, নাট্যকলা, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও সম্প্রদায়, জাতিবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব, মুদ্রা ও আরও বহু বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ স্বনামে ও ছদ্মনামে (শ্যামল বর্মা ও সত্যব্রত বর্মা) তিনি লিখেছিলেন। সেগুলি তাঁর বিস্তৃত জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। কিন্তু এই সমস্ত প্রবন্ধকে বিষয়-অনুযায়ী বিভক্ত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নি। জীবদ্দশায় তিনি আমাদের তিনটি মাত্র গ্রন্থ উপহার দিয়ে গেছেন। সেগুলি 'চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ' (১৩২৯), 'মহাভারতের কথা' (১৩৪০) ও 'সরস্বতী' (১৩৪০)।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথায় সবই ছিল যাঁর 'নখদর্পণে', আচার্য সুনীতিকুমারের চোখে যিনি ছিলেন 'চলন্ত বিশ্বকোষ', সেই অমূল্যচরণ মৃত্যুর পর স্বাভাবিক নিয়মে ধীরে ধীরে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থের অভাবে তাঁর জ্ঞান ও তথ্য সমৃদ্ধ রচনাগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে যাচ্ছিল।

তাঁর মৃত্যুর ২২ বছর পরে ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে পুত্র শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষের উদ্যোগে 'প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশিত হয়। তদানীন্তন কয়েকটি বিশিষ্ট সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে এই উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রশংসিত হয় এবং উত্তরসূরী গবেষকদের স্বার্থে তাঁর সমগ্র রচনাবলী বিষয়ভিত্তিক বিভাগে প্রকাশিত হওয়া একান্ত দরকার বলে

অভিমত প্রকাশ করা হয়। শৌরীন্দ্রকুমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরও চারখানি গ্রন্থ সংকলন করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। সেগুলি 'লক্ষ্মী ও গণেশ' (১৩৭০), 'ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা (১৩৭২), 'বাংলার প্রথম' (১৩৮৭) ও 'উদ্ভিদ অভিধান' (১৩৮৮)। 'সরস্বতী' বইয়েরও পুনর্মুদ্রণ হয় (১৩৮৭)। কিন্তু এরূপ ব্যয়বহুল কাজ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি।

১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃপক্ষ রমেশ ভবনের পূর্ণ অধিবেশন কক্ষে বহু গুণিজন সমাবেশে অমূল্যচরণের জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেন। এই সভায় অমূল্যচরণের রচনাবলী সত্বর প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন বলে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেও এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ দেখা যায় নি। পরে এই রচনাবলীর বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলী রাজ্য শিক্ষাসচিবের নিকট একটি পরিকল্পনা পেশ করে রচনাবলী প্রকাশ করার জন্য প্রস্তাব দেন। সুযোগ্য শিক্ষাসচিব শ্রীগৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে রাজ্য পুস্তক পর্ষদের পরিচালন সমিতি আমাদের প্রস্তাব অনুমোদন ও কার্যকর করে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। পর্ষদের মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা ঐ সিদ্ধান্ত রূপায়ণের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করেছেন। তাঁর ও রাজ্য পুস্তক পর্ষদের কর্মিগণের সঙ্গে কাজ করে আমরা আনন্দ পেয়েছি। এই প্রতিষ্ঠানে সরকারি লাল ফিতার বেড়াজালে কোন কাজ আটকে থাকে না দেখে তৃপ্তি পেয়েছি। এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম খণ্ড সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হওয়ার মূলে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

(২)

এই রচনাবলীর শেষ খণ্ডে অমূল্যচরণের একটি বিশদ জীবনী দেওয়া হবে। এখানে তাঁর কর্মবহুল জীবনের একটি রূপরেখা দেওয়া হল।

১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর ৫২।২ বিডন স্ট্রীট, কলকাতায় অমূল্যচরণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল ২৪-পরগনা জেলার নৈহাটিতে। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ২৩এ এপ্রিল ঘাটশিলায় স্বগৃহে তাঁর দেহাবসান ঘটে।

উপাধিদ্বারা বাংলাদেশে যে কজন মনীষী পরিচিত অমূল্যচরণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। 'বিদ্যাভূষণ মশাই' বললে লোকে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণকেই বুঝে থাকে। আর সেযুগে 'বিদ্যাভূষণ মশাই' নামে এমনভাবে তিনি খ্যাত হয়েছিলেন যে বহুলোকে জানতেনই না যে তিনি ঘোষ-বংশজাত কায়স্থ। অনেকেই তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে ভুল করতেন।

বিস্ময়কর এক প্রতিভা ছিলেন অমূল্যচরণ—পারিবারিক পরিবেশের সঙ্গে খাপছাড়া স্বমহিমায় মহীয়ান এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। অমূল্যচরণের বংশলতায় তিনি ২৫তম পর্যায়ে পড়েন। মোগল আমলে ২০শ পুরুষ পূর্ববর্তী মহাদেব ঘোষের কৃতিত্বে বংশগত 'মজুমদার' উপাধি-ভূষিত হওয়া ছাড়া এই বংশে অমূল্যচরণের আগে আর কোথাও কোন বিশিষ্টতার ছাপ নেই। অমূল্যচরণকে এই বংশে এক ব্যতিক্রমরূপেই গণ্য করা চলে। পিতা উদয়চাঁদ ঘোষ মজুমদার সওদাগরী অফিসের সামান্য কেরানী ছিলেন। অপর দু ভাই চণ্ডীচরণ ও ধীরেন্দ্রনাথের শিক্ষা বিদ্যালয়ের গণ্ডী পার হয় নি। বাড়ীতে কোন শিক্ষার পরিবেশ ছিল না। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে পঞ্চম সন্তান ও মধ্যম পুত্র অমূল্যচরণও সাংসারিক অনটনের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। শিশুকাল থেকে অনন্যসাধারণ মেধার পরিচয় দিলেও কেশব একাডেমির ছাত্র অমূল্যচরণের নবম শ্রেণীতে শিক্ষা বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল পিতার আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন। এই সময় সৌভাগ্যক্রমে কোহেন নামক এক সাহেব ঘটনাচক্রে তাঁর সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁর পুত্রকে সংস্কৃত শেখাবার জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে তাঁকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। তৎপূর্বেই অমূল্যচরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

সে যুগে মাসিক পঞ্চাশ টাকা এক বিরাট অঙ্কের উপার্জন। বালক বয়সে এরূপ বিপুল অর্থ উপার্জন করেও অমূল্যচরণ বিলাসিতা বা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য একটি পয়সাও ব্যয় করেন নি। তাঁর মধ্যে যে তীব্র জ্ঞানের ক্ষুধা ছিল, সেই ক্ষুধা মেটাতেই তাঁর সমস্ত অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কোনদিনই তিনি তৃপ্ত ছিলেন না। বরং পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত বিভিন্ন বিষয়ের অন্তরঙ্গ চর্চায়

তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। চৈতন্য লাইব্রেরীর প্রায় সমস্ত বই পড়া ইতিমধ্যে শেষ করে ফেলেছিলেন। জ্ঞানের নেশায় অমূল্যচরণ তখন নিজস্ব লাইব্রেরী গড়ায় মন দিলেন এবং বিভিন্ন ভাষা শিখে সেই সেই ভাষায় সঞ্চিত জ্ঞান আহরণের সংকল্প করলেন। অ্যাসেমব্লিজের বৃদ্ধ এডওয়ার্ড সাহেবের কাছে গ্রীকভাষা ও বাড়ীতে মৌলভির কাছে ফারসি ও উর্দু শিক্ষায় ব্রতী হলেন। আশ্চর্য মেধায় অল্প সময়ের মধ্যেই এই তিনটি ভাষা তিনি আয়ত্ত করেন। ভাষাশিক্ষার নেশা তাঁকে তখন এমন অধিকার করে বসেছিল যে বিদ্যালয় জীবনেই স্বচেষ্টায় তিনি ১২টি ভাষা আয়ত্ত করেন। পিটারসন নামক সাহেবকে প্রথমে সংস্কৃত ও পরে গ্রীক পড়িয়ে নিজের ভাষা শিক্ষার অতিরিক্ত খরচ সংগ্রহ করতে লাগলেন। পাঠ্য-বহির্ভূত বিষয়ে অধিক মনোনিবেশ করায় অমূল্যচরণের এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফল মেধানুরূপ হয় নি। এর জন্য তাঁর কোন ক্ষোভ ছিল না। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজে এফ এ পড়া সুরু করলেন। কিন্তু ভাষা শিক্ষা পূর্ববৎ চলতে লাগল। ফলে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে কঠিন শিরঃ-পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে ছ মাস পড়াশুনা বন্ধ রাখতে হয়। এফ এ পড়ায় ছেদ পড়ে। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষাই জীবনে আর গ্রহণ করেন নি। পরে অবশ্য তিনি কাশী-নরেশের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা সমাপন করে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন।

(৩)

অমূল্যচরণ ছিলেন তাঁর পথের একক পথিক। তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার বা সাহায্য করার কেউ ছিল না। এ পথ তাঁর নিজেরই সৃষ্ট। পারিবারিক অর্থানুকুল্যে তাঁর তীব্র জ্ঞান-তৃষ্ণা মেটার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। তাই নিজের ভাষা-জ্ঞানকে মূলধন করে Translating Bureau নামে এক অভিনব প্রতিষ্ঠান খুললেন ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে মাত্র আঠার বছর বয়সে। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল বিভিন্ন ভাষায় লিখিত পত্র ও পুস্তকাদির অনুবাদ করা। এই প্রতিষ্ঠান তাঁর আয়ের পথ সুগম করেছিল এবং আরও ভাষা শিক্ষার কাজ ত্বরান্বিত করেছিল।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি দেশী ও বিদেশী ২৬টি ভাষা স্বচেষ্টায় আয়ত্ত করেন। বস্তুত বাংলাদেশে বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত হিসাবে হরিনাথ দের পরে তাঁকেই স্থান দেওয়া হয়।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ তিনি নানা সাংসারিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। এই সময় বড় ভগ্নীপতির মৃত্যুর পর বড় দিদি ও তাঁর ৭টি সন্তানের দায়িত্ব তাঁকে নিতে হয়। বালবিধবা মেজদিদি আগে থেকেই সংসারে আছেন। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে পিতাও পরলোক গমন করেন। দাদা সামান্য বেতনের কেরানী; সুতরাং সমস্ত সংসার চালানোর গুরুদায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার জন্য পূর্বতন গ্রীক শিক্ষক এডওয়ার্ডের নামে 'এডওয়ার্ড ইন্‌সটিটিউসন' বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেন 'কেশব অ্যাকাডেমি'তে। ইহাই ভারতে ভাষাশিক্ষার সম্ভবত প্রথম বিদ্যালয়। ঐ বৎসরই ১লা ফেব্রুয়ারি ৫৮ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে (বর্তমান বিধান সরণী) ইহা স্থানান্তরিত হয়। ক্রমে ভাষাশিক্ষার সহিত সাধারণ বিদ্যালয়ও খোলা হয়। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে ৬৬ মাণিকতলা স্ট্রীটে একটি বড় বাড়ীতে বিদ্যালয়টিকে তুলে আনা হয়। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন অমূল্যচরণ এবং প্রধান শিক্ষক ছিলেন চারুচন্দ্র মিত্র। অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ দে, হরিমোহন ন্যায়রত্ন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এডওয়ার্ড ইন্‌সটি-টিউসনের ভাষাশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা উভয়ের মানই বেশ উন্নত ছিল। তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা স্যর আলেকজাণ্ডার পেডলার এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "The best school in Calcutta maintained by private enterprise." এই বিদ্যালয় ১৫ বৎসর চলেছিল।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে অমূল্যচরণ নগেন্দ্রনাথ ঘোষের (N. N. Ghosh) কথায় মেট্রোপলিটন ইন্‌সটিটিউসনে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ, কলকাতা) যোগদান করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর কলেজে তিনি পালি, বাংলা ও হিন্দী বিভাগের

প্রধান ছিলেন। এখানে যোগ দেবার আগে কিছুকাল তিনি মিশনারি প্রতিষ্ঠান Doveton College-এ পড়িয়েছিলেন।

মেট্রোপলিটন ইন্‌সটিটিসনে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে জস্টিস স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুরোধে ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে National Council of Education-এ যোগ দেন পালি, জর্মান, ফরাসী প্রভৃতি ভাষাশিক্ষক হিসাবে। পরে অরবিন্দ ঘোষ মামলায় জড়িয়ে পড়লে তাঁর ওপর হিন্দু ও শিখ আমলের ইতিহাস পড়ানোরও ভার পড়ে। এইসময় তাঁর কাছে যাঁরা ইতিহাস পড়তেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিনয়কুমার সরকার। এর কিছুকাল পরে এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার কাজ তিনি ছেড়ে দেন।

(৪)

ছাত্রাবস্থাতেই অমূল্যচরণের অনুবাদ কর্ম ও ইংরেজি প্রবন্ধ রচনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এইসময় মন্মথ দত্তের 'Queen' পত্রিকায় তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। কর্মজীবনের শুরুতে প্রখ্যাত সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যক্তিগত প্রেরণায় তিনি বাংলা রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। অল্পকালের মধ্যেই সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধাবলী বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে বিদ্বৎ-সমাজে তাঁকে পরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে। প্রকৃত-পক্ষে এত বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা বাংলাদেশে আর কোন লেখকের আছে কিনা সন্দেহ। আর এক বিষয়ে তিনি ছিলেন অনন্য। একাধারে বহুভাষাবিদ ও নানাবিষয়ে পণ্ডিত।

অমূল্যচরণের পাণ্ডিত্যের পরিধি যেমন ছিল বিস্তৃত তেমনি প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতাও ছিল বিস্ময়কর। নবীন ও প্রবীণ অজস্র গবেষক নিত্য আসতেন তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধানে আর তিনিও আনন্দের সঙ্গে নির্দ্বিধায় তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারটি উজাড় করে দিতেন তাঁদের কাছে। এ বিষয়ে হেমেন্দ্রকুমার রায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন —"......অমূল্যচরণের অগাধ জ্ঞান-ভাণ্ডারের রত্ন সংগ্রহ করবার জন্যে

এসেছেন কত শ্রেণীর কত অনুসন্ধিৎসু লোক। কেউ সাধারণ প্রবন্ধ লেখক, কেউ ঐতিহাসিক, কেউ প্রত্নতাত্ত্বিক। অমূল্যচরণ ছিলেন যেন মূর্তিমান বিশ্বকোষ। প্রায়ই কোন পুস্তকের পাতা না উল্টেই মুখে মুখে বলে দিতে পারতেন প্রশ্নের উত্তরে দুর্লভ তথ্যের সন্ধান। যেমন বিচিত্র ও বিস্তৃত ছিল তাঁর অধীত বিদ্যার পরিধি, তেমনি বিস্ময়কর ছিল তাঁর স্মৃতি-শক্তি। এইজন্যেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র একটি প্রশ্ন করে তাঁকে লিখেছিলেন : 'তোমার তো সব নখদর্পণে। এক লাইন লিখিয়া তোমার মতামত জানাইবে'।" [যাঁদের দেখেছি (দ্বিতীয় পর্ব) ১৩৫৯ (১৯৫২), পৃ. ১১৬-১৭]।

বহু খ্যাতনামা মনীষী প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধানে তাঁর কাছে চিঠি লিখতেন। তাঁর মৃত্যুর পর মাসিক বসুমতীতে তার কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ চিঠিগুলিতে উপস্থাপিত প্রশ্নগুলির বিষয়-বৈচিত্র্য থেকেই বোঝা যায় অমূল্যচরণের জ্ঞানের পরিধি কত বিস্তৃত ছিল। এই সমস্ত পত্রলেখকদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়, ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অনেকেই তাঁর ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। যেমন, ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় তাঁর 'প্রতাপাদিত্য' (১৩১৩) বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, "নানা ভাষাবিদ ও ঐতিহাসিক তত্ত্বজ্ঞ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ এই গ্রন্থ সম্পাদনে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন তাহা আমরা কদাচ বিস্মৃত হইব না। 'বিশেষতঃ তাঁহার সাহায্য না পাইলে আমরা ডুজারিক ও পাইমেণ্টার প্রকাশে বা অনুবাদে কৃতকার্য হইতে পারিতাম না।" সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পত্রে (২৪।১১।২৮) লিখেছেন, "আপনার বন্ধুত্বলাভ আমার পরম ভাগ্য। আমি নিতান্ত অকিঞ্চন, আপনার সাহায্য ব্যতীত আমি কবিকঙ্কণ সম্পাদনের দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারতাম না। আপনার কাছে আমি চির-কৃতজ্ঞ।" আর একটি পত্রে (১৫।৬।২৯) লিখেছেন, "আপনার কাছে আমি চিরঋণে আবদ্ধ।" অপর এক চিঠিতে বলেছেন, (কোজাগরী পূর্ণিমা, ১৩৩২) "আপনাকে

ভুললে যে আমি অমানুষ কৃতঘ্ন প্রতিপন্ন হয়ে যাবো।" আবার কেউ কেউ তাঁর উপকার বিস্মৃত হয়েছেন। এমনকি তাঁর নামে অপবাদও প্রচার করেছেন। কিন্তু তিনি সত্যকার ঋষির মত এইসব স্তুতি ও নিন্দার উর্দ্ধে ছিলেন।

(৫)

অমূল্যচরণের সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা অনেকগুলি। ১৩১২ সাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বরাবর প্রায় কোন না কোন পত্রিকার সম্পাদনায় তিনি নিযুক্ত ছিলেন। এই পত্রিকাগুলির নাম : বাণী (১৩১২-১৯), ভারতবর্ষ (১৩২০-২১, জলধর সেনের সহিত), সংকল্প (১৩২১, চারুচন্দ্র মিত্রের সহিত), সাপ্তাহিক মর্মবাণী (১৩২২ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সহিত), ইংরেজি ত্রৈমাসিক Indian Academy of Art (১৩২১-২৩), শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক (১৩২৫-৩৪), কায়স্থ-পত্রিকা (১৩২৬, ১৩৩৪ কিরণচন্দ্র দত্তের সহিত, ১৩৩৫ মৃণালকান্তি ঘোষের সহিত), পঞ্চপুষ্প (১৩৩৬-৩৯), শ্রীভারতী (১৩৪৪-৪৭)।

বিখ্যাত সাহিত্যিকেরা তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলিকে উচ্চ মর্যাদার চোখে দেখতেন এবং তাঁর মতামতকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতেন। কবি-শেখর কালিদাস রায় তাঁর 'সাহিত্যিক গোষ্ঠী' প্রবন্ধে লিখেছেন, "সেকালে সম্পাদকও ছিলেন বাঘা বাঘা। রামানন্দবাবু, সুরেশ সমাজপতি, প্রমথ চৌধুরী, মহারাজ জগদিন্দ্র, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন এঁদের তুলনায় তরুণতম।" (শারদীয় যুগান্তর, ১৩৬১)

অমূল্যচরণের 'বাণী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্য-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এডওয়ার্ড ইন্‌সটিটিউসনে এই সাহিত্য-গোষ্ঠীর বৈঠক বসত প্রতি সন্ধ্যায়। হেমেন্দ্রকুমার রায় ও কালিদাস রায়ের স্মৃতিচারণ থেকে এই গোষ্ঠী সম্বন্ধে উদ্ধৃত হল :

"অমূল্যচরণ নিজে কোন দলের ছিলেন না। সেইজন্য তাঁর আসরে আসবার পথ ছিল সকলেরই কাছে খোলা। প্রবীণদের মধ্যে সেখানে

দেখেছি সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল, কবি বেনোয়ারীলাল গোস্বামী, পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী আর ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রভৃতিকে। নবীনদের সংখ্যা অল্প ছিল না, সকলের নাম করতে গেলে জায়গায় কুলোবে না। তবে এইটুকু উল্লেখযোগ্য যে তখনকার ঐ নবীনদের মধ্যে কয়েকজন আজ প্রবীণ হয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। যেমন শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। কেউ কেউ ফুটতে ফুটতে ঝরে গিয়েছেন। যেমন বগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।" (হেমেন্দ্রকুমার রায় : যাঁদের দেখেছি, দ্বিতীয় পর্ব, পৃ ১১৬)

"এই (রবীন্দ্রবিমুখ মানসী, ভারতী ইত্যাদি) দলা-দলির বাইরে একটা সাহিত্য-গোষ্ঠী ছিল—পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের 'বাণী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। এই গোষ্ঠীতে ছিলেন—চারুচন্দ্র মিত্র, গিরিজা বসু, কবিবর করুণানিধান, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, সুধীন ঠাকুর, ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতন্য লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা গৌরহরি সেন। অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্তকে এই গোষ্ঠীতে ধরা যেতে পারে। জলধর ছিলেন, কিন্তু তিনি বক্তা ছিলেন না, শ্রোতাও ছিলেন না, নীরবে চুরুট টানতেন।" (কালিদাস রায় : শারদীয় যুগান্তর ১৩৬১)

পত্রিকা-সম্পাদকরূপে অমূল্যচরণ কিরূপ গুণগ্রাহী ছিলেন ও নবীনদের আত্মপ্রকাশে সুযোগ দিতেন তা কালিদাস রায়ের একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়। কালিদাস রায়ের কথায়—

"তারপর যখন ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি—তখন একদিন কলেজের পথে 'বাণী' পত্রিকা অফিসে গেলাম। সেখানে ছিলেন কবি করুণানিধান, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, চারুচন্দ্র মিত্র, ব্রজেন বাড়ুজ্যে প্রভৃতি। কবিতাটি শোনাইলাম। তাঁদের সকলেরই কবিতাটি ভাল লাগিল। অমূল্যবাবু কবিতাটি একরূপ কাড়িয়া লইলেন 'বাণী'তে ছাপিবেন বলিয়া। 'বাণী' উঠিয়া গেল। অল্পদিন পরে অমূল্যবাবু 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক হইলেন। 'ভারতবর্ষে'র দ্বিতীয় সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হইল। 'নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার'।" (মর্মবাণী, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৫৯)

অমূল্যচরণের সম্পাদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃতম্ (১৩১৯, চারুচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে), Sheir Mutakserin' Vol I, 'জৈনজাতক' (Punjab Sanskrit Series-এর অন্তর্গত), 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' (১৩২৬), 'বিদ্যাপতি' (১৩৩৪), 'শ্রীশ্রীসংকীর্তনামৃত' (১৩৩৬), 'আপিশলী শিক্ষা' (১৩৪২) উল্লেখযোগ্য। এগুলির সম্পাদনায় তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য, নিষ্ঠা ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

অমূল্যচরণের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বঙ্গীয় মহাকোষ' (Encyclopaedia Bengalensis) সম্পাদনা। জীবনের শেষ কটি বছর এই কাজেই তিনি আত্মনিয়োগ করেন এবং এর মধ্যে দিয়ে তাঁর অনন্যসাধারণ মনীষা, সংগঠনশক্তি ও একাগ্রতা প্রকাশ পায়। দুঃখের বিষয় এই অমূল্য মহাকোষ গ্রন্থের মাত্র দু খণ্ড তিনি প্রকাশ করে যেতে পেরেছিলেন। এই মহাকোষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ (পৌষ-সংক্রান্তি ১৩৪১) মন্তব্য করেছিলেন,—

"বঙ্গসাহিত্যের যে পরিমাণ উৎকর্ষ ও বিস্তার হইলে বঙ্গীয় মহাকোষ প্রকাশের সংকল্প রূপ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারে তাহা আমাদের গৌরবের বিষয়। এই মহাকোষ সম্পূর্ণ হইলে বাংলাদেশের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে পারিবে কল্পনা করিয়া উৎসাহ বোধ করিতেছি। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নেতৃত্বে এই মহদনুষ্ঠান সিদ্ধিলাভ করিবে আশা করিয়া একান্ত মনে ইহার সফলতা কামনা ও সম্পাদকের প্রতি বঙ্গদেশের নামে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছিলেন,—

"ভারতবর্ষে ইহার পূর্বে এরকম মহাকোষ (Encyclopaedia) কখনও বাহির হয় নাই। ইহাতে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অভিধানও আছে। তাহা এমন কি Worterbuck-এর চেয়েও ভাল। Encyclopaedia হিসাবে ভারতবর্ষ ও বাঙ্গলার সমস্ত খুঁটিনাটি আছে। গবেষণার চূড়ান্ত। ভারতের বাহিরের কথাও আছে। সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা বর্তমান সময় পর্যন্ত টানিয়া আনা হইয়াছে। প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত। আমার বিশ্বাস এই মহাকোষ সকলেরই উপকারে লাগিবে। ইহা বাঙ্গলায় গৌরব হউক।"

ত্রিপুরা-রাজ-ঐতিহাসিকরূপে অমূল্যচরণ কয়েক বছর কাজ করেছিলেন। এ কাজের জন্যে প্রতি বছর গ্রীষ্মাবকাশ ও পূজাবকাশে ত্রিপুরায় যেতেন। ত্রিপুরা ও তিপ্‌রা জাতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু রাজ-ঐতিহাসিক হিসাবে যে মূল গবেষণা তিনি করেছিলেন তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। ত্রিপুরারাজকে লিখিত বিভিন্ন চিঠির অনুলিপি (copy যা তাঁর বাড়ীতে পাওয়া গেছে) থেকে জানা যায় যে এ বিষয়ে যথেষ্ট কাজ হয়েছিল। এ সম্বন্ধে যেটুকু খবর সংগৃহীত হয়েছে তাতে জানা যায় যে বন্যায় রাজ্য মহাফেজখানার বহু রেকর্ড নষ্ট হয়ে গেছে। তার সঙ্গে অমূল্যচরণের লেখাগুলিও বিনষ্ট।

(৬)

কর্মজীবনে অমূল্যচরণ নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে তিনি আজীবন সেবা করেছেন— কখনও গ্রন্থাধ্যক্ষ, কখন সম্পাদক, কখনও বা সহ-সভাপতিরূপে। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর সঙ্গেও তিনি গোড়া থেকে সংযুক্ত ছিলেন। এখানেও সম্পাদক, সহ-সভাপতি ও ন্যাসরক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন। এসিয়াটিক সোসাইটির তিনি আজীবন সভ্য ছিলেন। সমাজপতি-স্মৃতি সমিতির তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন। থিওজফিক্যাল সোসাইটি ও মহাবোধি সোসাইটির সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। হাওড়া জেলার রাজবলহাট গ্রামের সমাজ-সেবামূলক কাজ ও উন্নয়নে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার স্মরণে গ্রামবাসিগণ 'অমূল্য প্রত্নশালা' স্থাপন করেছেন।

যুবকদের সংগঠনমূলক কাজে তিনি সর্বদাই উৎসাহ দিতেন এবং এরূপ অনেক সংগঠনের সঙ্গে জড়িতও ছিলেন। যুবকদের সংগঠনকে তিনি কিভাবে উৎসাহ ও সাহায্য দিতেন তার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর ছাত্র ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। শিক্ষান্তে সুবোধবাবুরা কয়েকজন বন্ধু পাড়ায় একটি লাইব্রেরী করেন এবং কলকাতা করপোরেশনের তৎকালীন মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক জে. সি. মুখার্জিকে সভাপতি করে

উদ্বোধনের ব্যবস্থা করেন। সভার দিন খেয়াল হল যে সভায় ২।১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি প্রয়োজন। ছুটলেন বিদ্যাসাগর কলেজে বিদ্যাভূষণ মশাইয়ের কাছে। সব শুনে তিনি সভায় যেতে রাজি হলেন এবং কলেজ ফেরৎ যথাসময়েই সভায় উপস্থিত হলেন। কিছু পরেই জে. সি. মুখার্জি উপস্থিত হয়ে সভায় বিদ্যাভূষণ মশাইকে দেখে উদ্যোক্তাদের বললেন 'যে সভায় বিদ্যাভূষণ মশায়ের মত পণ্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত, সেখানে আমার সভাপতিত্ব করা ধৃষ্টতা। তাঁকেই সভাপতি করতে হবে।' উদ্যোক্তারা তো বিস্ময়বিমূঢ়। সভাপতির উপস্থিতিতে সভাপতি পরিবর্তনে তাঁরা ইতস্তত করছেন। তখন জে. সি. মুখার্জি স্বয়ং বিদ্যাভূষণ মশাইকে সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ করলেন। বিদ্যাভূষণ মশাই উত্তরে বললেন 'ছেলেরা লাইব্রেরী করেছে—আপনাকে সভাপতি করার পেছনে নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য আছে। কর্পোরেশনের অনুদান না পেলে বেকার ছেলেরা তো লাইব্রেরী চালাতে পারবে না। আমি সভাপতি হলে তাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। আপনিই সভাপতিত্ব করুন। আমি একটা বক্তৃতা না হয় করব। এ ব্যবস্থাই আমার কাছে বেশী আনন্দদায়ক হবে।' জে. সি. মুখার্জি তৎক্ষণাৎ অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। অমূল্যচরণকেই সভাপতি হতে হয়েছিল।

এই ছোট্ট ঘটনাটির ভিতর দিয়ে অমূল্যচরণের ব্যক্তিমানসটি কি সুন্দর ফুটে উঠেছে। এমনই নিরহঙ্কার, অমায়িক, ছাত্রবৎসল, দরদী ও আত্ম-প্রচারবিমুখ মানুষ ছিলেন তিনি।

অমূল্যচরণের বহুমুখী প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন গৌরবজনক আসনে অধিষ্ঠিত করে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। তিনি মালদহ সাহিত্য সম্মেলনের (১৩১৯), শান্তিপুর সাহিত্য সম্মেলনের (১৩২৭) ও দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের (১৩৪২) (বর্তমানে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন) মূল সভাপতির আসন অলংকৃত করেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের (১৩২৯) সাহিত্য শাখার, মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনের (১৩২৯) ইতিহাস শাখার ও বিহার সাহিত্য সম্মেলনের (১৩৩৪) দর্শন শাখার সভাপতির পদে বৃত হন।

(৭)

অমূল্যচরণ ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখক। তাঁর প্রবন্ধ মূলত যুক্তি-অনুসারী, বিষয়নিষ্ঠ এবং মননশীল। এই দিক দিয়ে তাঁকে রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখের সমধর্মী বলা যায়। তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপটি চমৎকার ফুটে ওঠে। তিনি প্রবন্ধে প্রচুর তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশ করেন। সেগুলিকে সুকৌশলে বিন্যস্ত করে বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তিসহযোগে অগ্রসর হয়ে এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করেন যাতে পাঠক সহজেই তাঁর বক্তব্যের অনুকূল সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছয়। কোন সিদ্ধান্তই তিনি জোর করে পাঠকের ওপর চাপিয়ে দেন না। তাঁর প্রবন্ধ সত্যকার 'প্রবন্ধ' অর্থাৎ 'প্রকৃষ্টরূপে বন্ধনযুক্ত রচনা'। এ বৈশিষ্ট্য খুব কম প্রবন্ধলেখকের মধ্যে দেখা যায়। প্রবন্ধের ভাষাও বেশ সহজবোধ্য ও সাবলীল গতিসম্পন্ন। তিনি নিজে সংস্কৃতে মহা পণ্ডিত হলেও তাঁর লিখিত বাংলাভাষা বিন্দুমাত্র সংস্কৃত ঘেঁষা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে ঘরোয়া বাংলায় লেখা। দুরূহ বিষয় ও তত্ত্বগুলি কেমন সাবলীল সহজ ভাষায় তিনি প্রকাশ করেছেন দেখলে বিস্মিত হতে হয়। বাংলা চলিত শব্দের প্রয়োগও যথেষ্ট পাওয়া যায়। যেমন, হেরফের, এবড়ো-থেবড়ো, হিড়িক, তফাৎ, খুঁটিনাটি, নজর ইত্যাদি।

গবেষণা ও প্রবন্ধ-রচনার কাজে অমূল্যচরণের কোন গুরু ছিলেন বলে জানা বা শোনা যায় না। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় তাঁকে বাংলায় প্রবন্ধ-রচনায় উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু কারও অধীনে তিনি কিছু গবেষণায় কখনও লিপ্ত ছিলেন বা প্রবন্ধ রচনায় কারও কাছে তালিম নিয়েছিলেন কিংবা তথ্যের জন্য কারও দ্বারস্থ হয়েছিলেন এমন খবর পাওয়া যায় না। তবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে যে তিনি খুব সমীহ করতেন এটা তাঁর বহু রচনা থেকেই বোঝা যায়।

অনেকে বলেন অমূল্যচরণের পাণ্ডিত্যের তুলনায় রচনা স্বল্প। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা নগণ্য হলেও তাঁর প্রবন্ধাবলীর সংখ্যা-প্রাচুর্য ও বিষয়-বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক

সকলরকম খ্যাত-অখ্যাত পত্র-পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত। আঞ্চলিক পত্রিকায়ও প্রবন্ধ পাওয়া গেছে। বহু পত্র-পত্রিকা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় অনেক রচনাই সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। তা সত্ত্বেও আমাদের সংগৃহীত প্রবন্ধাবলীতে এই খণ্ডের মত ছটি পূর্ণ খণ্ডে স্থান সংকুলন হবে কিনা সন্দেহ। আর প্রবন্ধগুলি বিষয়-বৈচিত্র্যে, তথ্যের সমাবেশে, পাণ্ডিত্যের গভীরতায় ও গবেষণার দিক দিয়ে অমূল্যচরণের মনীষার সাক্ষ্য বহন করে। এ ছাড়াও আছে তাঁর ইংরেজী প্রবন্ধাবলী, যেগুলি ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি আমাদের বর্তমান রচনাবলীতে স্থান পাবে না। অমূল্যচরণ সম্বন্ধে ঐরূপ মন্তব্য তথ্যভিত্তিক তো নয়ই, বরং তাঁর দৈনিক কর্মসূচি দেখলে ভেবে অবাক হতে হয় কখন তিনি পড়াশুনা ও লেখার কাজ করতেন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের কথাই ধরা যাক। তখন তিনি মেট্রোপলিটন ইনসটিটিউসন ও ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনে অধ্যাপনা করছেন, এডওয়ার্ড ইনসটিটিউসন চালাচ্ছেন, বাণী পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। আবার পাণিনির মত পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা-প্রবন্ধ লিখে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে পাঠ করছেন, ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়কে তাঁর প্রতাপাদিত্য গ্রন্থ রচনায় সর্বতোভাবে সাহায্য করছেন।

(৮)

'অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী' ছ খণ্ডে সম্পূর্ণ করার প্রস্তাব আছে। তবে রাজ্য পুস্তক পর্ষদ অনুমোদন করলে এর কলেবর আরও একখণ্ড বৃদ্ধি পেতে পারে। খণ্ডগুলি যতদূর সম্ভব একই আকার ও আয়তনে রাখার চেষ্টা করা হবে। বিষয়-ভিত্তিক বিভাগে রচনাগুলি স্থান পাবে। স্থান সংকুলন হলে খণ্ডে একাধিক বিষয়-বিভাগের রচনা থাকবে। বিষয়-বিভাগগুলি আপাতত এইরূপ স্থির হয়েছে :

ভারত-সংস্কৃতি, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ধর্মসম্প্রদায়, জাতি-বিজ্ঞান, জাতি-তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, নাট্যকলা, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব ও মূর্তিতত্ত্ব, সাহিত্য, অনুবাদ, জীবনী, ভূমিকা, অভিভাষণ, মহাভারতের কথা, খোসগল্প, বিবিধ রচনা। প্রয়োজনমত বিষয়-বিভাগের নাম পরিবর্তন এবং নতুন বিভাগ

সংযোজনও হতে পারে। কোন বিভাগের রচনাগুলি প্রকাশিত হবার পরে আবিষ্কৃত সেই বিভাগের অন্তর্গত রচনাও 'বিবিধ রচনা' শীর্ষে থাকবে।

এই রচনাবলী প্রকাশে বাংলা ও বিদেশী শব্দের অধুনা স্বীকৃত বানানই গ্রহণ করা হয়েছে। কেবল 'বার্তা' ও 'কার্তিক' শব্দ দুটির ক্ষেত্রে পুরানো বানান রাখা হয়েছে।

অমূল্যচরণ বানানের শুদ্ধি সম্পর্কে বিশেষ সজাগ ছিলেন। তাঁর লেখায় একই শব্দের বানানে বিশেষ হেরফের দেখা যায় না। আগেকার রচনায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী শুদ্ধ বানানই অনুসরণ করেছেন। তবে তিনি বানান সংস্কারেরও পক্ষপাতী ছিলেন। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার সমিতির সদস্য ও সভ্য ছিলেন। তাই পরবর্তী কালে বানান-সংস্কার সমিতি কর্তৃক গৃহীত বানানই অনুসরণ করেছেন তাঁর বঙ্গীয় মহাকোষ' গ্রন্থে। বঙ্গীয় মহাকোষে আধুনিক বানানই দেখতে পাওয়া যায়। সর্বাধুনিককালে আরও কিছু স স্কার সাধিত হয়েছে। যেমন, তস্-যুক্ত শব্দের বিসর্গলোপ। এরূপ সংস্কার নিশ্চয়ই 'বঙ্গীয় মহাকোষে' দৃষ্ট হবে না। বানান-সংস্কারের ব্যাপারে একটি বিষয়ে তাঁর মতভেদ ছিল। যেখানে মূলগত কারণে রেফের পর 'দ্বিত্ব বর্জন' করা চলে না, সেখানে তিনি দ্বিত্ব বর্জন করেন নি। যেমন, বৃৎ-ধাতু নিষ্পন্ন বার্তা বানান লিখতেন বার্ত্তা। অনুরূপে কৃৎ-ধাতু নিষ্পন্ন কার্তিকের বানান হবে কার্ত্তিক। বানান-সংস্কার সম্পর্কে তাঁর এই মৌলিক মত পার্থক্যটি আধুনিক পাঠকের কাছে তুলে ধরার জন্য প্রতীক হিসাবে বার্তা ও কার্তিক শব্দের বানান 'বার্ত্তা' ও 'কার্ত্তিক' রাখা হয়েছে।

প্রবন্ধ শেষে 'প্রসঙ্গ-কথা' নামে সম্পাদকীয় টীকা সন্নিবেশিত হয়েছে। এখানে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের শ্রম-লাঘবের জন্য যথাসাধ্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সম্বন্ধে সংক্ষেপে তথ্য দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ-কথায় যে সমস্ত শব্দের আলোচনা হয়েছে সেইক্রমে মূল প্রবন্ধে সেই সেই শব্দের মাথায় ইংরেজী 1, 2, 3 ইত্যাদি সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে। আর যে সমস্ত শব্দের মাথায় বাংলা ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা ব্যবহৃত

হয়েছে, সেগুলি মূল প্রবন্ধের অঙ্গীভূত পাদটীকার সূচক। লেখকের পাদটীকা যথাযথ রাখা হয়েছে।

এই খণ্ডের শেষে দুটি পরিশিষ্ট দেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধ সম্বন্ধে প্রকাশিত আলোচনা, মতামত ও কিছু তথ্য পরিশিষ্ট 'ক' শীর্ষে আছে আর 'খ' শীর্ষ প্রসঙ্গ-কথারই পরিশিষ্ট।

অমূল্যচরণ প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় লিখেছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রাসঙ্গিক আলোচনায় এক প্রবন্ধে লিখিত অংশবিশেষ কখন-কখন অন্য প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত অংশের শেষে [ ] বন্ধনীর মধ্যে যে প্রবন্ধের অংশ গ্রহণ করা হয়েছে সেই প্রবন্ধের নাম দেওয়া হয়েছে। যেখানে এরূপ বন্ধনী ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি, সেখানে পরিশিষ্ট 'ক'-তে বলা হয়েছে। অন্যত্র আংশিক প্রকাশিত 'পাণিনি' প্রবন্ধের পাঠান্তর ঐ প্রবন্ধে [ ] বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হয়েছে।

স্পষ্টত যেগুলি ছাপার ভুল সেগুলি সংশোধিত হয়েছে।

(৯)

প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু ভারতের সংস্কৃতি। এই খণ্ডে মোট ৩৬টি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলিকে প্রকাশের ক্রম হিসাবে না সাজিয়ে বিষয়বস্তুর দিকে নজর রেখে সাজানো হয়েছে যাতে কিছুটা ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। তাই 'ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা' প্রবন্ধটির স্থান অনেক পরে হলেও এটি আমাদের প্রবন্ধ-সংগ্রহে অমূল্যচরণের লিখিত প্রথম প্রবন্ধ। তখন তাঁর বয়স ২৪ বছরও পূর্ণ হয়নি।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতা সম্বন্ধে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ যে সমস্ত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, বহুক্ষেত্রেই অমূল্যচরণ তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। নানা তথ্য ও প্রমাণাদির সাহায্যে তাঁদের বক্তব্যের অসারতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা তিনি করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ শুধুমাত্র নঞর্থক নয়—নিজ মতও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেছেন সমর্থনসূচক যথেষ্ট যুক্তি ও তথ্যের সমাবেশ করে।

[সাইত্রিশ]

অমূল্যচরণের কর্মজীবন বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম বৎসর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এই সময়ই জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের প্রবল বন্যার স্রোত দেশে প্রবাহিত ছিল। এর প্রতিফলন স্বদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি চর্চায় অবশ্যম্ভাবী ছিল। অমূল্যচরণ এ বিষয়ে এক অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। 'ভারত সংস্কৃতি'র বহু প্রবন্ধেই তার নিদর্শন মিলবে। কিন্তু তাঁর জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিকতা শুধুমাত্র একটা ভাবালুতা ছিল না। তা ছিল বুদ্ধি ও জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত। বহু-ভাষাবিদ অমূল্যচরণ বিদেশীয় ভাবধারা. সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন এবং স্বদেশীয় বিষয়বস্তুর উৎকর্ষ প্রমাণে অনেক ক্ষেত্রে এই জ্ঞান ব্যবহার করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের কল্যাণকর ভাব-সম্পদ আহরণেও যথেষ্ট আগ্রহের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এই বিশ্ব-সচেতনতা স্বাদেশিকতারই অঙ্গীভূত ছিল।

বিষয়ের বিস্তৃতি ও তত্ত্বের গম্ভীরতার জন্য কোন কোন প্রবন্ধ তত্ত্ব, তথ্য ও প্রমাণের ভারে কিছুটা ভারাক্রান্ত বলে শিক্ষার্থী পাঠকের রসগ্রহণে মাঝে মাঝে বাধার সৃষ্টি হতে পারে ভেবে প্রত্যেকটি প্রবন্ধের মূল বক্তব্য এবং প্রয়োজনমত মন্তব্য প্রকাশ করা হল।

'ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা' প্রবন্ধে অমূল্যচরণের জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিকতার স্বরূপ ও যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর স্বাদেশিকতা শুধুমাত্র একটা আবেগ ছিল না। যুক্তি ও প্রমাণাদির ভিত্তিতে এই আবেগ সঞ্চালিত হয়েছিল। সর্বোপরি প্রবন্ধটিতে একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট।

এই প্রবন্ধে অমূল্যচরণ যে চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছেন তার কিছু কিছু পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক পাণিক্কর ও রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখনীতে বিশদভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। (পরিশিষ্ট—ক দ্র.)

'অসুর-জাতি' প্রবন্ধে প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয়. সভ্যতা ও তার পশ্চিমাভিমুখী বিস্তার সম্বন্ধে অমূল্যচরণ একটি তত্ত্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর মতে দ্রবিড়রাই এই সভ্যতার অগ্রদূত। তাঁদের আদি নিবাস ছিল বেলুচিস্তানের মরু-অঞ্চলে। ঐ স্থানটি একদা খুব উর্বর ও জনাকীর্ণ ছিল বলে

ব্রেড্রেনবার্গের ভূতাত্ত্বিক গবেষণা-কেন্দ্রে প্রমাণিত। 'কিন্তু পরে জলাভাব হওয়ায় ঐ স্থান অজন্মা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়; সেইজন্য লোকে বাধ্য হইয়া অন্যত্র উপনিবেশ স্থাপন করে; সিন্ধুনদের তীরভূমি উর্বর দেখিয়া অনেকে দলে দলে সেই পথে আসিয়া বাস করে। দ্রবিড়জাতির অন্য এক শাখা অদৃষ্টান্বেষণে পশ্চিম দিকে গমন করিয়া ইউফ্রেটিস নদের তীরে উপনীত হয়। ইহারা হয় পারস্যের পার্বত্যপ্রদেশ হইতে বাবিলোনিয়ার সমতল ভূমিতে অবতরণ করিয়াছিল, নয় সমুদ্রপথে বেলুচিস্তানের মাকরানের (Makran) সমুদ্রোপকূল হইতে উপস্থিত হইয়াছিল। সুমের ও দ্রবিড়দের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।' (পৃ. ২১)। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ, যেমন H. R. Hall, মনে করেন যে সুমের সভ্যতা বাহির হতে মেসোপটেমিয়ায় আনীত হয়েছিল। তিনি সুমেরীয়-গণকে বিশেষভাবে ভারতীয় ভাবাপন্ন বলে মনে করেন। Sir William Turner প্রমাণ করেছেন যে দ্রবিড়গণ ভারতবাসী। অমূল্যচরণ বলেন, সুমেরীয়দের 'আকৃতি ও পরিচ্ছদে দ্রবিড় জাতিদের সঙ্গে এতটা মিল ছিল যে, উভয় জাতি যে একই সাধারণ জাতি-সম্ভূত, তাহাতে সন্দেহ করিবার উপায় নাই।' (পৃ. ২২)। অধিকন্তু উভয় জাতির ভাষায় শব্দগত মিলও পাওয়া যায়। বেলুচিস্তানের ব্রাহুইদের সঙ্গে আকৃতি ও ভাষার দিক দিয়ে দ্রবিড়দের মিল আছে।

দ্রবিড়দের অপর অংশ সিন্ধুনদের তীরে বসবাস করতে লাগলেন। এই দ্রবিড়গণ যে বেশ উন্নত সভ্যতার অধিকারী হয়েছিলেন, তা মোহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রমাণ করে।

বৈদিক সাহিত্যে ভারতে আর্যাগমন সম্বন্ধে একটি কথাও নেই। কিন্তু দেব ও অসুরের প্রচুর কাহিনী আছে। অমূল্যচরণ দেখিয়েছেন যে ঋগ্বেদের যুগে দেব ও অসুরের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য ছিল না। দেবেরা অসুরদের 'ভ্রাতৃব্য' অর্থাৎ ভ্রাতৃ-তুল্য বলতেন। দেব ও অসুর উভয় শব্দেরই অর্থ ছিল 'ঈশ্বর'। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে উভয়েরই পিতৃভূমি 'স্বর্গ' এবং উভয়েই প্রজাপতি-বংশোদ্ভূত। প্রথমে উভয়ের মধ্যে বেশ মিল ছিল। এমন কি, দেবেরা মর্যাদাসূচক 'অসুর' উপাধিও গ্রহণ

করতেন। কালক্রমে উভয়ের মধ্যে ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাপারে মতের অমিল দেখা দিল। দেবেরা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, কিন্তু অসুরদের সে ব্যাপারে সায় ছিল না। এই মতান্তর মনান্তরে পরিণত হয়ে ধীরে ধীরে দলগত শত্রুতায় পর্যবসিত হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই দেব ও অসুর কারা—তাঁরা কোথা থেকে বা কবে ভারতে এলেন? এ বিষয়ে বেদ নির্বাক। শুধু জানা যায় স্বর্গ তাঁদের উভয়েরই পিতৃভূমি। অমূল্যচরণ তাঁর উপস্থাপিত তথ্য থেকে নিজে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি বা পাঠকের উপর চাপিয়ে দেন নি। কিন্তু তথ্যগুলি যেভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে একটি সম্ভাবনার কথা স্বতই উদিত হয়। সেটি হচ্ছে দেব ও অসুর মূলত একই জাতি। সেই মূল জাতি সিন্ধুতীরে উপনিবেশ-স্থাপনকারী একটি জাতি। এই জাতি দ্রবিড় জাতিও হতে পারে। এই জাতিই কোন এক সময়ে ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাপারে মত-পার্থক্যের ফলে দ্বিধা-বিভক্ত হয়। যাঁরা যজ্ঞের সমর্থক ছিলেন, তাঁরা নিজেদের দেব এবং যজ্ঞের বিরোধীদের অসুর বলতে লাগলেন। এই অসুররা ছিলেন অবেস্তাপন্থী। দেবাসুর গোষ্ঠী দুটির মত-পার্থক্য ক্রমে শত্রুতায় পর্যবসিত হয় এবং এই দ্বন্দ্বের পরিণতিতে অসুররা পরাজিত হতে থাকেন এবং বৈদিক যুগের শেষে অনেক অসুর ভারত থেকে বিদুরিত হন। এই অসুরেরা পারস্য ও তুর্কীস্থানে গিয়ে বাস করতে থাকেন। 'যাঁহারা ভারতের বাহিরে গেলেন, তাঁহাদের প্রভাব ও পরাক্রম বৃদ্ধি পাইলে এখন হইতে ৬ হাজার বৎসর পূর্বে তাঁহারা বাবিলনের শত ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সাম্রাজ্যের নাম হয় অসুর বা আসিরিয়া। টাইগ্রীস নদীর উপকূলে অসুর নামে ইহার রাজধানীও স্থাপিত হয়। এসিয়া-মাইনর হইতে ককেসস পর্বত পর্যন্ত এই অসুরদিগের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহারই কিঞ্চিৎ পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে সুবীররা সুমেরিয়া স্থাপন করেন। মেসোপটেমীয় জাতিরা দ্রবিড়সভ্যতা অর্জন করিয়াছিল। দ্রবিড়রা ভারতবাসী।' (পৃ. ১৯)।

অমূল্যচরণ তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে প্রচুর তথ্য ও প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এইসব উপাদানের গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। এ সত্ত্বেও এই

তত্ত্বটি সম্পূর্ণ স্বীকার করতে হলে কিছু কিছু সমস্যা দেখা দেয়। যেমন, দ্রবিড়-জাতি ও তথাকথিত আর্যজাতির আকৃতি ও সমাজ-ব্যবস্থায় যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। আকৃতিগত পার্থক্যের বিষয়টি অমূল্যচরণ পরবর্তী 'অনার্য' প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। উভয়ের সমাজ-ব্যবস্থা যে পৃথক সে বিষয়ে তিনি সচেতন, কিন্তু তার কোন ব্যাখ্যা দেন নি। বরং স্বীকার করেছেন যে দ্রবিড়সমাজের সঙ্গে অসুরসমাজের মিল থাকলেও ইহা সম্পূর্ণ আর্যভাবশূন্য। অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন যে তাঁর বক্তব্যটি প্রমাণের জন্য আরও উপাদান সংগ্রহ করা দরকার।

অমূল্যচরণের এই বক্তব্যের সমর্থনে যথেষ্ট উপাদান পাওয়া গেলে ম্যাক্‌সমুলর প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের প্রচারিত আর্যজাতিতত্ত্ব অসার হয়ে পড়ে। আনুমানিক ১৫০০ খ্রী-পূর্বাব্দে ভারতে আর্যাগমন সংঘটিত হয়েছিল বলে যে মতটি ঐতিহাসিকদের স্বীকৃতিলাভ করেছে, তাও ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়।

অমূল্যচরণ ভারতে আর্যাগমন সম্বন্ধে প্রচলিত মতটি খণ্ডন করেছেন তাঁর অনার্য প্রবন্ধে।

'অনার্য'—প্রাচ্যবিদ্যাবিদ ইউরোপীয় পণ্ডিত ম্যাকস্‌মুলরই প্রথম প্রচার করেন যে আর্য নামে এক জাতি প্রাচীনকালে ভারতে আগমন করে এদেশ জয় ও অধিকার করেন। আবার ভাষাতত্ত্ববিদ উইলিয়ম জোন্স আবিষ্কার করেন যে সংস্কৃত, লাটিন, গ্রীক, জর্মান প্রভৃতি ভাষাগুলির উৎপত্তি হয় এক মূল ভাষা থেকে। এ থেকে একটা ইণ্ডো-ইউরোপীয় আর্য-জাতিতত্ত্ব রূপ পরিগ্রহ করে। এই জাতিই বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে আসেন গ্রীক ও এসিয়া-মাইনরে, ইরান ও ভারতে।

ভারতে যে সমস্ত প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছিল তার সীমা ১১৫০ খ্রী-পূর্বাব্দ ছাড়ায় না। এই সমস্ত প্রত্নবস্তু এক বিশিষ্ট সভ্যতার পরিচয় বহন করে। কিন্তু ১৯২১-২২ সালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি নগর-কেন্দ্রিক সিন্ধু সভ্যতার সন্ধান পেলেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা।[৫] এই সভ্যতার সময় স্থির করা হয়েছে ৩০০০—১৫০০ খ্রী-পূর্বাব্দ। আবিষ্কৃত সিন্ধু-সংস্কৃতির ধারা পূর্ব-আবিষ্কৃত সংস্কৃতির বিপরীত। একই সময়ে এই দুটি স্বতন্ত্র সভ্যতার

অস্তিত্বের কথা বিশ্বাস করা কঠিন হল। তাই স্থির করা হল ১৫০০ খ্রী-পূর্বাব্দে ভারতে আর্যাগমন সংঘটিত হয়। এর আগেই কোন অজ্ঞাত কারণে সিন্ধু-সভ্যতার বিলোপ ঘটে।

ভারতীয় ঐতিহাসিকগণও এই মতটি নির্বিবাদে মেনে নিয়েছেন।

অমূল্যচরণ 'অনার্য' প্রবন্ধে এই তত্ত্বের প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেন, 'আর্যরা যে বাহির হইতে আসিয়াছেন এই মত প্রায় সকলেই একরূপ নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছেন। মানিয়া লইবার পক্ষে বা বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি আছে, সেগুলি বড়ই ফাঁকা—চূড়ান্ত তো নয়ই'। (পৃ. ৩৮)।

অমূল্যচরণ বলেন—বেদে আর্য শব্দটির ব্যবহার খুবই সীমিত আর সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে কোথাও জাতি-অর্থে ঐ শব্দটির প্রয়োগ নেই। সেইজন্য বৈদিক সাহিত্যে অনার্য শব্দটিও পাওয়া যায় না। বেদে দেব ও অসুরের কথা আছে। উভয়ের সংস্কৃতি ও বিকাশের ধারা স্বতন্ত্র ছিল। তাই দেবদের আর্য বললে অসুরদের অনার্য বলা যেতে পারে।

ঋগ্বেদে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তথাকথিত আর্যদের (দেবদের) পিতৃভূমি —'প্রত্ন ওকঃ'। ইহা কোথায়—ভারতের ভিতরে কি বাহিরে বোঝবার কোনো উপায় নেই। তাঁরা ভারতের বাহির থেকে যে এ দেশে এসেছিলেন এমন কোন প্রমাণ বেদে নেই—বরং কিছু অসুরকে তাঁরা ভারতের বাহিরে পশ্চিমদিকে বিদূরিত করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে। কোন বৈদিক মন্ত্রে আর্যদের কল্পিত বিজয়-কাহিনীরও উল্লেখ পাওয়া যায় না। একটি জাতি ভারতের বাহির থেকে এসে এদেশ জয় ও অধিকার করে নিল অথচ তাদের তদানীন্তন সাহিত্যে সেই জয়ের ও বিজেতৃসুলভ শ্লাঘার কথা সম্পূর্ণরূপে উহ্য থাকল এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ঐতিহাসিকগণ সিন্ধু-সভ্যতাকে আর্য-প্রভাবমুক্ত অনার্য-দ্রবিড় সভ্যতা বলে চিহ্নিত করেছেন। অমূল্যচরণ এ মতও সমর্থন করেন না। তিনি বলেন—মোহেঞ্জোদড়োয় আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুগুলির সঙ্গে ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের উক্তির বেশ ঐক্য আছে। ঋগ্বেদে দেব ও অসুরদের প্রাসাদগুলির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে মোহেঞ্জোদড়োর মন্দিরগুলির সাদৃশ্য আছে। আবিষ্কৃত মৃৎশিল্পে ও মূর্তিক্ষোদিতফলকে আর্য ও দ্রবিড় চিহ্নই বর্তমান।

ঐ সকল স্থানে অনেকগুলি প্রতিমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি আর্য ও দ্রবিড় সভ্যতার নিদর্শন। (পৃঃ ৩৯)। ঐতিহাসিক পুসলকারও অমূল্যচরণের এই মত সমর্থন করেন। [পরিশিষ্ট—ক দ্র.]। সুতরাং ১৫০০ খ্রী-পূর্বাব্দে আর্যাগমনের তত্ত্ব খাটে না।

প্রাচীন কাল সম্বন্ধে দুভাবে জানা যায়,—(১) ঐতিহাসিক সূত্র যার ভিত্তি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও বৈদিক সাহিত্য এবং (২) পুরাণের পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যগত সূত্র। শেষোক্ত সূত্রে ৩০০০ খ্রী-পূর্বাব্দের আগেও আর্যরা যে এ দেশে বাস করতেন তা প্রমাণিত হয়।

আর্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে এমন যথেষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ভারতে এখনও আবিষ্কৃত হয়নি যার ওপর ভিত্তি করে ১৫০০ খ্রী-পূর্বাব্দে আর্যাগমনের সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। আর্য-সংস্কৃতির আরও প্রাচীন নিদর্শন ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হবে না—এমন কথা বলা যায় না। আমাদের মনে হয়, অমূল্যচরণ সেইজন্য বৈদিক সাহিত্য ও ভারতের বাহিরে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ওপর নির্ভর করেছেন।

প্রবন্ধটিতে যে সব তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, তা থেকে অন্তত ভারতে আর্যাগমন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না—বরং আর্য-সংস্কৃতি যে ভারত থেকে বহির্ভারতে বিস্তৃত হয়েছিল, তার সন্ধান পাওয়া যায়। আর পৌরাণিক সূত্রে যা পাওয়া যায় তার সঙ্গে ঐ সব তথ্যের যথেষ্ট সঙ্গতি দেখা যায়।

'বেদাদি গ্রন্থে আর্যশব্দের উল্লেখ'—অসুর-জাতি ও অনার্য প্রবন্ধ দুটিতে বেদ, সংহিতা, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থে 'আর্য' শব্দের কোথায় কতবার উল্লেখ আছে, তা বলা হয়েছে। এই প্রবন্ধে সেই সূত্রগুলি দেওয়া হয়েছে এবং আর্য-শব্দের অর্থের ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হয়েছে। এ দিক দিয়ে দেখলে প্রবন্ধটি পূর্বোক্ত প্রবন্ধ দুটির পাদটীকা।

প্রকাশ-কালের দিক দিয়ে দেখলে প্রবন্ধটি পূর্বোক্ত প্রবন্ধ দুটির বহু পূর্বের।

এই প্রবন্ধের সময় থেকেই অমূল্যচরণ আর্যজাতিতত্ত্বের অসারতা-প্রতিপাদনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বলে মনে হয়।

'বৈদিক যুগে যজ্ঞপ্রথা'—প্রবন্ধটিতে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে যতদিন

আর্যরা আগুন জ্বালাবার সহজ উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন নি, ততদিন অগ্নিপূজা করতেন এবং সারা বছর আগুন জ্বেলে রাখতেন বিভিন্ন কুণ্ডে। আগুন জ্বালাবার সহজ পদ্ধতি আবিষ্কারের পর থেকে আর অগ্নিপূজা করতেন না।

অন্যত্র প্রকাশিত অগ্নিষ্টোম, অগ্নিহোত্র ও অতিরাত্র নামে তিনটি যজ্ঞের খুঁটিনাটি বিবরণ এই প্রবন্ধের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। প্রথম দুটি অগ্নিযাগ ও তৃতীয়টি একটি সোমযাগ।

'অদিতি'—ঋগ্বেদের প্রত্যেক দেবতারই একটি ভৌতিক দৃশ্যরূপ আছে। কিন্তু সকলের প্রকৃত দৃশ্যরূপ নির্ণয় করা যায় নি। অদিতি এইরূপ একজন দেবতা যাঁর ভৌতিক দৃশ্যরূপ ও স্বরূপ সম্বন্ধে ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ অনেক গবেষণা করেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি।

অদিতি আদি দেবমাতা—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে বলা যায় যে তিনি 'অতি বিস্তৃত', 'মহতী', 'স্থির ও অপরিবর্তনীয়া', 'নিষ্পাপা', 'সর্বব্যাপিনী', 'সুন্দর গৃহযুক্তা', 'অদ্বিতীয়া', 'সমুজ্জ্বলদেহা', 'কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারে না' ইত্যাদি। অদিতির এই গুণাবলীকে ভিত্তি করেই পণ্ডিতেরা অদিতির বিভিন্ন রূপ কল্পনা করেছেন। কেহ বলেছেন, অদিতি বলতে 'অনন্ত বা অনন্তত্ব' বোঝায়। কেহ ইঁহাকে 'অবিনাশী দিবালোক' বলেছেন। কাহারও মতে ইনি 'গগনের প্রকাশ'; কেহ বলেন 'অসীম আকাশ'। কাহারও কাছে ইনি 'দৃশ্যমান প্রকৃতি' বা 'অসীম ও অনন্ত শূন্যস্থান'। কেহ 'সর্বব্যাপিনী প্রকৃতি' এবং কেহ বা 'উত্তর খগোলার্ধ' বলে অদিতির ধারণা করেছেন। কেহ অদিতির ধাতুগত অর্থ করে বলেছেন 'বন্ধন থেকে মুক্তি'।

অদিতির অবস্থান নিয়েও নানা উক্তি পাওয়া যায়। কোথাও তাঁকে পৃথিবী বলা হয়েছে, আবার কোথাও বলা হয়েছে সূর্য ও দক্ষের অন্তবর্তী অদিতির অবস্থান।

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন অদিতি সম্পূর্ণ রূপক। পরবর্তী কালে তাঁর প্রতি দেবীত্ব আরোপিত হয়েছে।

অমূল্যচরণ বলেছেন, 'বৈদিক দেবতত্ত্বে অদিতি প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করেন।......তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কোথাও বলা হয় নাই। তবে তাঁহার সমগ্রভাব, বিস্তৃত ভাব, ঔজ্জ্বল্য ও জ্যোতির্ময়তার উক্তি বেদে আছে।' (পৃ. ১০২-৩)

হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ডে অদিতির স্থান যে অতি উচ্চে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যজ্ঞের আদি ও অন্তে এবং বহু শুভকাজেই অদিতিকে আহ্বান করা হয়।

'অত্রি'—বৈদিক পঞ্চঋষির অন্যতম ঋষি অত্রি ও তাঁর সন্তানগণ ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রের উদ্গাতা।

ঋগ্বেদ ও বৈদিক সাহিত্যে অত্রি শব্দ ঋষি ভিন্ন অন্য অর্থেও কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে। ঋগ্বেদে অত্রি সম্পর্কে রূপক আখ্যায়িকাও আছে। এসব সত্ত্বেও অত্রি নামে যে একজন মহাতেজস্বী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন—একথা অনস্বীকার্য। অমূল্যচরণ বলেন, 'অগস্ত্য-ঋষির ন্যায় অত্রির কার্যও যে বহুস্থানব্যাপক, সে সম্বন্ধেও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে সুদূর ইউরোপ পর্যন্ত তাঁহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। চীন দেশেও অত্রির উল্লেখ পাওয়া যায়।' (পৃ. ১১৯)।

এছাড়া পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও অত্রির প্রসঙ্গ দেখা যায়। একজন ঋষির পক্ষে এত দেশ ও কালব্যাপী কার্যে ব্রতী থাকা অসম্ভব। এ সম্বন্ধে অমূল্যচরণ বলেছেন, 'গোত্রপিতার নামে সেই সেই বংশীয় প্রধান পুরুষগণের পরিচয় দেওয়ার প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান ছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বহু প্রমাণ পাইয়াছেন।' (পৃ. ১১৯)।

'বৈদিক যুগের শিল্প'—বৈদিক আর্যরা উৎপাদনমূলক যেসব শিল্পে উন্নত হয়েছিলেন সেগুলির বিষয় বেদাদি গ্রন্থ থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত করে এখানে আলোচিত হয়েছে। দেখা যায়, গৃহাদি, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, শকটাদি ও যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে সে যুগের আর্যরা বেশ দক্ষ ছিলেন।

সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ ও লোহার ব্যবহার যে আর্যরা জানতেন তার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। গৃহাদির যে বর্ণনা আছে, তার

নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তবে বেদ-বর্ণিত বিষয়গুলির ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হওয়া চলে, কেন না এতে যে যুগের বর্ণনা আছে, রচনাকালও সেই যুগেরই।

বৈদিক সাহিত্যে মধু'—মিষ্ট গুণবাচক ও দ্রব্যবাচক উভয় অর্থেই মধু শব্দটির ভুরি-ভুরি প্রয়োগ আছে বৈদিক সাহিত্যে—এই প্রবন্ধে তা দেখানো হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় মধু আর্যদের কাছে কত প্রিয় খাদ্য ছিল।

'অথর্ব, অথর্বন, অথর্বা'—অথর্ববেদ নামের সঙ্গে যুক্ত সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক ঋষি। ঋগ্বেদে অগ্নি প্রসঙ্গে ভৃগু, অথর্বা ও অঙ্গিরার নাম উল্লিখিত হয়েছে। অমূল্যচরণ বলেন—'ঋগ্বেদের বর্ণনা হইতে মনে হয়, এই তিনজন ঋষিই অগ্ন্যুৎপাদন প্রণালী আর্যসমাজে প্রথম প্রবর্তন করেন। সুতরাং সভ্যতার ক্রমবিকাশের আলোচনায় ইঁহাদের আলোচনা অপরিহার্য'। (পৃ. ১৪৩)। অথর্বার উদ্ভাবিত অগ্নি-উৎপাদন পদ্ধতির বর্ণনা আছে একটি ঋকে। এই ঋকের ব্যাখ্যায় নানা মুনির (প্রাচ্য ও প্রতীচ্য) নানা মত। অমূল্যচরণ বলেন—"যাহাই হউক কাষ্ঠ-ঘর্ষণে বা মন্থনে অগ্ন্যুৎপাদন প্রণালী যে অথর্বা উদ্ভাবন করেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না'। (পৃ. ১৪৪)। অথর্বা যজ্ঞপ্রথারও প্রবর্তক ছিলেন।

অমূল্যচরণের মতে অথর্বা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নন। তিনি ঋগ্বেদীয় যুগের বহু পূর্বেকার ঋষি।

'অথর্ববেদ'—প্রচলিত ধারণা—ঋগ্বেদেই সর্বপ্রাচীন বেদ। কিন্তু অমূল্যচরণ বলেন, 'অথর্ববেদ অন্তত অংশত ঋগ্বেদ হইতেও বহু প্রাচীন তাহা ঋগ্বেদের বর্ণনা হইতেই বুঝা যায়।' (পৃ. ১৫১)।

অথর্ববেদকে ভৃগ্বঙ্গিরসবেদ, অথর্বাঙ্গিরসবেদ এবং ব্রহ্মবেদ নামেও অভিহিত করা হয়েছে। ভৃগু, অঙ্গিরা ও অথর্বাই এই বেদের মন্ত্রগুলির রচয়িতা। কিন্তু ভৃগু রচিত মন্ত্রগুলি এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। ভৃগু অঙ্গিরা ও অথর্বার পূর্ববর্তী। সম্ভবত তাঁর রচিত মন্ত্রগুলি অঙ্গিরস ও অথর্বা-মন্ত্রগুলির সঙ্গে মিশে গেছে। অথর্ববেদের ভৃগ্বঙ্গিরসবেদ নামেরও বিশেষ প্রচলন নেই।

অথর্ববেদ মূলত দুই ভাগে বিভক্ত,—(১) ভেষজ বা অথর্বন, এই অংশ শুভ বা মঙ্গলজনক ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত; (২) অভিচার বা যাদু অথবা অঙ্গিরস; যাদু মন্ত্রগুলি ইন্দ্রজাল সম্পর্কিত। এইজন্য সমগ্র অথর্ব-বেদকে অথর্বাঙ্গিরসবেদ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। 'কোন কোন স্থলে অথর্ববেদের স্থলে ইহার প্রধান দুইটি ভাগ পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত আছে। ইহাতে মনে হয়, ইহার দুই ভাগ পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থরূপেই গণ্য হইত। গোপথব্রাহ্মণে বেদের পাঁচটি নামই পাওয়া যায়।' (পৃ. ১৫৪)।

ব্রহ্মবেদ নামটি অত্যন্ত পরবর্তী কালের। এই নামকরণের নানা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সম্ভবত চারটি বেদের মধ্যে একমাত্র অথর্ববেদেই ব্রহ্ম বা ব্রাহ্ম সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা আছে বলে এই নামকরণ এবং এই কারণে ইহাকে অন্যান্য বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও বলা হয়েছে।

অথর্ববেদে প্রধানত শুভাশুভ ব্যাপারে পারিবারিক ক্রিয়াকাণ্ড, অভিচার ও ইন্দ্রজাল, অপদেবতা ও অসুর সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এগুলি ঋগ্বেদের পূর্ববর্তী আর্যদের ধর্মের প্রথম স্তরকেই নির্দেশ করে। এই অংশ খুবই প্রাচীন। আবার ঋগ্বেদের পরবর্তী যুগের একেশ্বরবাদও ইহাতে দেখা যায়। এই অংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অমূল্যচরণ তাই বলেছেন, 'অথর্ববেদের বিষয়বস্তু আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহাতে বেদ-পূর্ব যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বেদের ব্রাহ্মণাংশ রচিত হইবার কাল পর্যন্ত আর্যজাতির গার্হস্থ্য জীবনের ধারা চিত্রিত হইয়াছে।' (পৃ. ১৫৪)। এইজন্য অথর্ববেদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

'অসুর-জাতি' ও 'অনার্য' প্রবন্ধে অমূল্যচরণ ভারতে আর্যাগমন বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বরং নানা যুক্তি প্রমাণ দিয়ে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন যে ভারতীয়রাই পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে সভ্যতার বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু অথর্ববেদ প্রবন্ধে দেখা যায় যে তিনি বিনা প্রতিবাদেই ভারতে আর্যাগমন তত্ত্বটি স্বীকার করে নিয়েছেন। এখানে তিনি বলেছেন, 'বেদ ভারতীয় আর্যগণের ধর্মগ্রন্থ হইলেও, তাঁহারা যে মহাজাতি হইতে পৃথক্ হইয়া ভারতে বিস্তৃতি লাভ করেন, এই প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তাঁহাদিগের সম্বন্ধেও তথ্য লাভ ও সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারা

যায়।' (পৃ. ১৫০)। 'ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতি ভারতে স্বতন্ত্র একটি রূপ পরিগ্রহ করিবার পূর্বে বহির্ভারতের মূল আর্য-সংস্কৃতির সহিত ইহা যে সম্বন্ধবিশিষ্ট ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতি মূল আর্য-সংস্কৃতির একটি শাখা মাত্র॥' (পৃ. ১৫১)।

'অথর্ববেদ' প্রবন্ধে আর্যদের সম্পর্কে উল্লিখিত উক্তিগুলি পড়লে স্বতই মনে হয়, ভারতে আর্যাগমন সম্বন্ধে অমূল্যচরণ তাঁর মত-পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু 'অনার্য' প্রবন্ধটি অথর্ববেদেরও পরে রচিত। সেখানে আবার খুব জোরের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতের প্রতিবাদ করেছেন ও স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। তাই আমাদের মনে হয়, অথর্ববেদ প্রবন্ধে তিনি মুখ্যত অথর্ববেদ সম্বন্ধেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। আর্যাগমন সম্বন্ধে বিতর্ক তোলা এ প্রবন্ধে তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। সুতরাং প্রচলিত মতটিই এখানে পরিবেশন করেছেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

'অতিথিগ্ব'—দিবোদাস অতিথিগ্ব একজন বৈদিক নরপতি। ইনি শম্বর অসুরকে ইন্দ্রের সাহায্যে বধ করেন। পণ্ডিত বেরগেন দিবোদাস ও অতিথিগ্ব দুজন ভিন্ন নরপতি বলে মনে করেন। কিন্তু অমূল্যচরণের মতে তাঁরা অভিন্ন। প্রসিদ্ধ সুদাস রাজা দিবোদাস অতিথিগ্বরই উত্তর পুরুষ। বৈদিক সাহিত্যে অতিথিগ্ব সম্পর্কে কয়েকস্থানে পরস্পরবিরোধী উক্তি আছে। এইজন্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা তিনজন অতিথিগ্ব বর্তমান ছিলেন বলে মত প্রকাশ করেছেন।

'ভারতে লিপির উৎপত্তি'—ভারতীয় লিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচ্য-ভাষাবিদ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা যে সব তত্ত্ব প্রচার করেছেন, সেগুলি এইরূপ—

১। দেবনাগরী বর্ণমালা বিদেশীয় সেমেটিক বা সাইরো-আরেবিয়া থেকে উদ্ভূত।

২। আসিরীয় কিউনিফরম থেকে ভারতীয় লিপির জন্ম।

৩। আরামীয় থেকে পালি অক্ষরের উৎপত্তি।

৪। অশোক বর্ণমালা গ্রীক বা ফিনিসীয় আদর্শে গঠিত।

৫। ভারতীয় বর্ণমালা স্বদেশ-সম্ভূত।

যাঁরা বলেন ভারতীয় লিপি বিদেশ-সঞ্জাত, তাঁদের মতে ৩০০ খ্রী-পূর্বাব্দের আগে ভারতে লিপি-প্রণালী অজ্ঞাত ছিল, অন্তত পাণিনির সময়ে এদেশে কোন লিপি ছিল না। অমূল্যচরণ এই প্রবন্ধে তাঁদের সমস্ত যুক্তি-জাল খণ্ডন করেছেন এবং অষ্টাধ্যায়ী থেকে যথেষ্ট উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে পাণিনির সময়ে এদেশে লিখিত পুস্তক ছিল।

ভারতীয় লিপির উৎপত্তি-কাল নির্দেশে অমূল্যচরণ সক্ষম না হলেও, ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনে তিনি সফল হয়েছেন।

'ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা'—'ভারতে লিপির উৎপত্তি' প্রবন্ধের বক্তব্যের সূত্র ধরে অজস্র প্রমাণাদির সাহায্যে অমূল্যচরণ এই রচনায় পূর্ববর্তী প্রবন্ধের বক্তব্যকে পূর্ণতা দান করেছেন। বেদ থেকে আরম্ভ করে মহাভাষ্য পর্যন্ত বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ থেকে প্রায় ২০০ উদ্ধৃতি দিয়ে এখানে প্রমাণ করেছেন যে বৈদিক যুগ থেকেই ভারতে পুস্তক লেখার রীতি প্রচলিত ছিল।

'ভারতীয় অক্ষরের প্রাচীনত্ব'—'ভারতে লিপির উৎপত্তি' ও 'ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা' প্রবন্ধ দুটির বক্তব্য এই প্রবন্ধে নবরূপে উপস্থাপিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত নতুন তথ্যগুলি সংযোজিত হয়েছে—যেমন মোহেঞ্জোদড়োর নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতার আবিষ্কারের ফলে যে লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় ভারতে খ্রী-পূ. ৩০০০ বৎসরেরও আগে লিপি বিদ্যমান ছিল। অধ্যাপক ল্যাংডন, ড. প্রাণনাথ প্রভৃতির মতে ব্রাহ্মীলিপি মোহেঞ্জোদড়ো লিপি থেকে উদ্ভূত। এ বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নি।

অমূল্যচরণ এই প্রবন্ধে প্রমাণগুলি সুবিন্যস্ত করেছেন দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে। এই শ্রেণী দুটি (১) গ্রন্থোক্তি প্রমাণ ও (২) উৎকীর্ণ-লিপি প্রমাণ। গ্রন্থোদ্ধৃতিগুলি পাদটীকায় দেওয়ার ফলে প্রবন্ধটি বেশ সুখ-পাঠ্য হয়েছে।

'মহাভারত'—বিরাট মহাভারত-সাগর মন্থন করে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে মহাভারতের যে ইতিবৃত্ত অমূল্যচরণ দিয়েছেন তা যেমন তথ্য ও প্রমাণ সমৃদ্ধ তেমনই চিত্তাকর্ষক। দেখা যায় মহাভারত তিনটি সংস্করণের মাধ্যমেই বর্তমান বিরাট কলেবর পেয়েছে। আদিতে ছিল

৮৮০০ শ্লোক, মধ্যে ২৪০০০ শ্লোক ও শেষে ১০০০০০ শ্লোক। আবার ব্যাস-লিখিত মহাভারতের আগেও মহাভারত-কথা প্রচলিত ছিল বলে আমরা জানতে পারি।

নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি মহাভারতের মন্ত্র-শ্লোকটির শেষে 'জয়' শব্দটি যে আদি মহাভারতের নাম সেটি অমূল্যচরণের গবেষণাপ্রসূত। এতাবৎ যা মন্ত্র-শ্লোকরূপে মহাভারত পাঠের আগে উচ্চারিত হত তা অমূল্যচরণের ব্যাখ্যায় মহাভারত-পাঠ-পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে।

বিরাট তথ্যপূর্ণ এই প্রবন্ধের খুঁটি-নাটি আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করার প্রয়োজন আছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় এইরূপ ধারণা দিয়েছিলেন যে কাশীরাম দাস তাঁর পূর্ববর্তী বাংলা মহাভারত-রচয়িতাদের উপর নির্ভর করেই তাঁর মহাভারত রচনা করেন। অমূল্যচরণ ইহার প্রতিবাদ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে কাশীরাম সংস্কৃত ভালোরূপেই জানতেন এবং তাঁর রচিত মহাভারত মোটামুটি মূল মহাভারত-অনুসারী। অমূল্যচরণের এই আলোচনাংশটি যেমন গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ তেমনই চিত্তাকর্ষক।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'বিজয় পণ্ডিতে'র লেখা একটি মহাভারতের উল্লেখ করেছেন। অমূল্যচরণ বলেন, 'বিজয় পণ্ডিত বলিয়া কেহ ছিলেন না। এ মহাভারতখানি পরাগলী মহাভারতেরই সংক্ষিপ্তসার।…"বিজয়-পাণ্ডব" কয়েক স্থানে লিপিকর প্রমাদবশত "বিজয় পণ্ডিতে"র সৃষ্টি করিয়াছে'। (পৃ. ২৮১)।

শ্রীকর নন্দীকেই অমূল্যচরণ বাংলার প্রথম মহাভারত রচয়িতা বলেছেন।

এই প্রবন্ধে প্রদত্ত কাশীরাম দাসের বংশতালিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

কাশীরাম দাসের জন্মস্থান নিয়ে যে বিতর্ক তৎকালে চলছিল, তা নিয়েও অমূল্যচরণ আলোচনা করেছেন এবং নিজ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

'চন্দ্র ও সূর্যবংশ'—রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে বর্ণিত প্রাচীন প্রখ্যাত নরপতিগণের যে বংশতালিকা পাওয়া যায় সেগুলি ঐতিহাসিকগণ

বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন না। এই সমস্ত বংশতালিকা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে আর্যরা ৩০০০ খ্রী-পূর্বাব্দের আগেও ভারতে বসবাস করতেন। পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ স্থির করেছেন যে এদেশে ১৫০০ খ্রী-পূর্বাব্দ নাগাদ আর্যাগমন ঘটে। 'অনার্য' প্রবন্ধে আমরা দেখেছি যে অমূল্যচরণ এই মতবাদে সন্দেহ পোষণ করেন।

এখানে অমূল্যচরণ আলোচনা করেছেন পুরাণোক্ত বিখ্যাত নৃপতিদের বংশলতা কতটা বিশ্বাসযোগ্য।

তিনি বলেন যে মূলত রাজ্যের উত্তরাধিকারী স্থির করার জন্য বংশলতার প্রয়োজন হত। তাই 'ভারতের রাজন্যবর্গের বংশলতা সম্পূর্ণ অলীক নহে—মূলত সত্য'। (পৃ. ৩০২)। অবশ্য স্মৃতিশক্তির অল্পতা-বশত বা ভ্রমবশত দু-একটি ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। কিছু কিছু জাল বংশলতাও যে নেই তা নয়। কিন্তু বিভিন্ন পুরাণ তুলনা করলে জাল বংশলতাগুলি ছেঁকে বার করা যায় এবং ভুল-ভ্রান্তিগুলিও অনেক ক্ষেত্রে অপনোদন করা যায়।

অমূল্যচরণের মতে বংশলতাগুলি ব্রাহ্মণেরা রাজকর্মচারিরূপেই রক্ষা করতেন—ব্রাহ্মণের কর্তব্য হিসাবে নয়। সেইজন্য এগুলিকে মিথ্যা বা কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

'প্রাচীন সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ'—প্রবন্ধের পাদটীকায় বলা হয়েছে যে এটি একটি সংগ্রহ প্রবন্ধ। দেখা যায়—বেদ থেকে মহাভাষ্য পর্যন্ত নানা প্রাচীন গ্রন্থ থেকে কৃষ্ণ-কথা এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। অমূল্যচরণ লিখেছেন—আরও বহু উপাদান তাঁর সংগ্রহে আছে—স্থানাভাবে সেগুলি দেওয়া যায় নি। ভবিষ্যতে সেগুলি আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোন প্রবন্ধ আমরা পাই নি। অমূল্যচরণ এই প্রবন্ধে শুধু তথ্য পরিবেশন করেছেন—কোন সিদ্ধান্তে আসেন নি।

মহাভারতের কৃষ্ণ কেমন করে বাসুদেব হলেন এবং পরব্রহ্ম বিষ্ণুর পূর্ণ অবতাররূপে পূজিত হলেন তার কিছুটা হদিস প্রদত্ত তথ্যগুলি থেকে মেলে। সম্পূর্ণ উপাদান সন্নিবেশিত হলে বোধ হয় ধারণাটি সুপরিস্ফুট হত।

অঙ্গিরা বংশীয় ঘোর ঋষির শিষ্য কৃষ্ণের কথা বেদে পাওয়া যায়। তাঁকে আবার খিলসূক্তে বাসুদেব থেকে অভিন্ন বলা হয়েছে। ছান্দোগ্য-উপনিষদে তিনি আবার দেবকী-পুত্র। মহাভারতের কৃষ্ণও দেবকী ও বসুদেব পুত্র হওয়ায় তাঁর প্রতি ঋষি কৃষ্ণের যাবতীয় গুণাবলী পরবর্তী কালে আরোপিত হয়েছিল বলেই মনে হয়। কারণ মহাভারতে "কোথাও বা তাঁহার ভগবত্তাকে ন্যূনীকৃত করা হইয়াছে, কোথাও বা ভগবত্তা সন্দিগ্ধ বা একেবারে অস্বীকৃত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে কৃষ্ণকে যোদ্ধা প্রভৃতি রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—ভগবত্তা তাঁহাতে যেন আদৌ আরোপিত হয় নাই।" (পৃ. ৩১৫)। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও মনে করেন যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কৃষ্ণ মানুষরূপেই মহাভারতে চিত্রিত হয়েছেন।

কৃষ্ণ-আখ্যান সারা ভারতব্যাপী কত জনপ্রিয় হয়েছিল তা বোঝা যায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের বাইরে বৌদ্ধ ও জৈন জাতকগুলিতে তাঁর কথার যথেষ্ট উল্লেখে।

রামায়ণে কৃষ্ণের উল্লেখ থাকায় অমূল্যচরণ বলেছেন, "বাল্মীকি যখন রাম না হইতে রামায়ণ লিখিতে পারিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণ না হইতেও কৃষ্ণনাম যে তিনি করিতে পারিবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?" (পৃ. ৩১৪)।

অমূল্যচরণ নিজেই লিখেছেন যে এটি একটি সংগ্রহ প্রবন্ধ। এখানে কোন তথ্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। অপ্রয়োজনে এরূপ অবৈজ্ঞানিক উক্তি অমূল্যচরণের মত যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ গবেষকের কাছে আমরা আশা করি নি। ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এই তথ্য থেকে দুটি সম্ভাবনার কথা স্বতই মনে হয়।

১। উক্ত শ্লোকটি রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত।

২। রামায়ণ মহাভারতের পরে লিখিত।

কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক (যেমন রোমিলা থাপার) মনে করেন রামায়ণ মহাভারতের পরে রচিত।

'মহাকাব্যযুগে শিক্ষার ধারা'—সূত্রযুগের শিক্ষার ধারা মহাকাব্যযুগেও অক্ষুণ্ণ ছিল। সূত্রগুলিতে চতুরাশ্রমের প্রত্যেকটির কাজ ও কর্তব্য বিশদ-

ভাবে বলা হয়েছে। শিক্ষাজীবনের প্রত্যেক খুঁটি-নাটি ব্যাপারও জানা যায়।

এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অমূল্যচরণ বলেছেন, "শৈশব হইতে শিশুকে ঘর-সংসারের পক্ষে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইত না। তাই তাহাকে তেমন কোন শিল্প-শিক্ষা দেওয়া হইত না। তাহাকে শুধু মানুষ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইত।" (পৃ. ৩২৩)। ছাত্রদের দেহ ও মনের উন্নতিসাধনের দিকেই সর্বাধিক দৃষ্টি দেওয়া হত। শিক্ষার ভিত্তি ছিল ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্যের স্খলন ছিল অমার্জনীয় অপরাধ।

শিক্ষার কথা বলতে গেলেই শিক্ষক ও পাঠ্য-সূচীর কথা এসে পড়ে। তাই এই দুটি সম্বন্ধেও বহু তথ্য পাওয়া যায় প্রবন্ধটিতে।

রাজা, ধনী ও সর্বসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষা সর্বস্তরে অবৈতনিক ছিল। কিন্তু শিক্ষা-নীতির ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকদের কোন হাত থাকত না।

শিক্ষা তখন দুটি স্তরে হত। প্রাথমিক স্তরের সুরু হত ৩ থেকে ৫ বছর বয়সে। এই স্তরের শিক্ষায় পিতা-মাতা ও শিক্ষকের যৌথ দায়িত্ব থাকত। দ্বিতীয় স্তর সুরু হত গুরুগৃহে দীক্ষান্তে বর্ণানুসারে ৮ থেকে ১২ বছর বয়সে।

রাজপুত্রদের জন্য ভিন্নতর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তাদের সুষ্ঠুভাবে শাসন-কার্য চালাবার উপযোগী করে গড়ে তোলা হত। কৌটিল্য-প্রদত্ত রাজপুত্রদের জন্য পাঠ্য-সূচী এবং বুদ্ধদেবকে যে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়েছিল তার বর্ণনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

'প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি'—প্রবন্ধে বৈদিক সমাজের একটি সর্বাঙ্গীণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছিল আর্য ও আর্যেতর জাতির সম্মিলিত দানে। মোহেঞ্জোদড়োর সভ্যতায় আর্য ও দ্রবিড় উভয়েরই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায় বলে অমূল্যচরণ মনে করেন।

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি বুঝতে হলে প্রাচীন ভারতের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বাহন শিক্ষার সম্বন্ধে পরিচয় আগে দরকার। এই দুটি বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে এ প্রবন্ধে।

[টিপ্পনী]

ব্যক্তিজীবন গড়ে ওঠে পরিবারকে ভিত্তি ও অবলম্বন করে। প্রাচীন ভারতের প্রকৃতি প্রসঙ্গে অমূল্যচরণ বলেছেন 'ভারতীয় পরিবার জীবন প্রথম হইতে আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত'। (পৃ. ৩৩৯)। পরিবার-জীবনকে পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এই আদর্শ। রাষ্ট্রের ভিত্তিও আবার এই পরিবার। পরিবার-জীবনে কুলধর্মকে খুব প্রাধান্য দেওয়া হত। রাষ্ট্রধর্মেরও ওপরে এর স্থান ছিল। এই প্রথা সম্পূর্ণ ভারতীয়।

সমাজের সমষ্টিগত ধর্মই সনাতন ধর্ম। এই সনাতন ধর্ম সমাজের বিভিন্ন অঙ্গকে একতাবদ্ধ রেখেছিল অথচ স্বধর্মে ছিল প্রত্যেকের স্বাধীনতা। ধর্ম, অর্থ, কাম ছিল সমাজ-জীবনের আদর্শ। সংস্কৃতির আদর্শ ছিল সমষ্টিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা।

সংস্কৃতির বাহন শিক্ষার প্রকৃত সূচনা হত তপোবনে। মাতাপিতা ও পরিবারকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে বৃহত্তর পরিবারে গুরুকুলে শিক্ষাগ্রহণ করতে হত। ব্রহ্মচর্যই ছিল শিক্ষার ভিত্তি আর discipline-এর স্থান ছিল শিক্ষারও ওপরে। জ্ঞানলাভ শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলে কখনই বিবেচিত ছিল না। চরম লক্ষ্য ছিল পরম সত্যকে আরাধনা করার যোগ্যতা অর্জন করা। জ্ঞান উপলক্ষ্য মাত্র। discipline-কে বাদ দিয়ে এই পরম সত্যকে লাভ করা যায় না। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে চরিত্রগঠনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হত।

'প্রাচীন ভারতে গ্রাম্য-সমিতি'—প্রাচীন ভারতে সমাজ ও দেশ কিভাবে জনগণের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হত তার একটি চিত্র এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

গণতন্ত্রে জনগণের হাতেই চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে। রাজতন্ত্রে এর বিপরীত—রাজার হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। ইংরেজ দেখিয়েছে রাজতন্ত্র বজায় রেখেও কি করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়।

প্রাচীন ভারতে কিছু কিছু গণতন্ত্রী রাষ্ট্র যে ছিল না তা নয়। তবে প্রধানত রাজ্যগুলি শাসিত হত রাজার দ্বারা। কিন্তু শাসন-ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা সভা ও সমিতি নামে দুটি জনগণের প্রতিষ্ঠানের ওপর থাকত। এই সভা ও সমিতি প্রয়োজন হলে রাজাকে পদচ্যুত করে নতুন রাজা

নির্বাচনও করত। এদের পরামর্শ ছাড়া স্বাধীনভাবে রাজার কিছু করার অধিকার ছিল না এবং সভা-সমিতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত তিনি মানতে বাধ্য থাকতেন।

'সভা ছিল সামাজিকভাবে মেলা-মেশার কেন্দ্র—আর সমিতি ছিল সমগ্র জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ বাণী।' (পৃ. ৩৪৮)।

প্রতি গ্রাম ও নগরের কেন্দ্রে একটি করে 'সভামণ্ডপ' থাকত। সকলকেই প্রত্যহ বিকালে এখানে জমায়েত হতে হত। সভা-সমিতির এটি ছিল পীঠস্থান। এখানে 'সাধারণত আমোদ, প্রমোদ, ক্রীড়া, তর্ক, সাহিত্যালোচনা প্রভৃতি হইত। এ ছিল নিত্য ব্যাপার। ইহার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে নৈমিত্তিক ব্যাপারও হইত। এই নৈমিত্তিক ব্যাপারে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হইত।' (পৃ. ৩৫৩)। তখনকার সমাজ ছিল বর্ণাশ্রয়ী। সমিতিগুলিতে প্রতিটি বর্ণের প্রতিনিধিত্ব থাকত। রাজ্যগুলি ছিল ছোট ছোট। রাজা থাকতেন নগরে এবং নগরকে বেষ্টন করে থাকত গ্রামগুলি।

পরবর্তী কালে যখন বড় বড় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখন রাজশক্তি সঙ্কুচিত করার উদ্দেশ্যে ও রাজকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য বিভিন্ন বর্ণের প্রতিনিধিত্বমূলক অমাত্য-সভার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই অমাত্য-সভার পরামর্শ না নিয়ে রাজার কোন কিছু করার অধিকার ছিল না।

'অতিথিসংবিভাগ' ও 'অণুব্রত' প্রবন্ধ দুটি জৈন-সম্প্রদায়ের গৃহীদের জন্য ব্রত। অতিথি-সংবিভাগের অপর নাম বৈয়াবৃত্ত্য। এই ব্রত গ্রহণ করলে জৈন সাধুকে বিধিমতে সেবা করতে হয়। অণুব্রত একটি লঘু ব্রত। প্রবন্ধ দুটিতে ব্রত দুটির বিধি, পুণ্যফল, প্রকারভেদ ও অতিচার সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা আছে।

'বৌদ্ধযুগে শিল্প-শিক্ষা'—অমূল্যচরণ বলেছেন, 'বৌদ্ধশাস্ত্র ও ইতিহাস আলোচনা করিয়া বলিতে পারা যায় যে, প্রথম হইতেই বৌদ্ধবিহার শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। এক-একটি বৌদ্ধবিহারই ছিল এ দেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। বুদ্ধের সময় থেকে দীর্ঘকাল পর পর্যন্ত জেতবনবিহার বৌদ্ধ-দর্শনের কেন্দ্র ছিল।' (পৃ. ৩৭৫)। কিন্তু কোন বৌদ্ধবিশ্ববিদ্যালয়েই ব্যবহারিক শিল্প-

শিক্ষা দেওয়া হত না। তবে বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যে নানাবিধ শিল্প, শিল্পিগণ ও শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি অবলম্বন করে এই প্রবন্ধের মাল-মশলা সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতেও বহু বিদ্যাপীঠের খ্যাতি ছিল। এগুলির মধ্যে তক্ষশিলা যে শিল্প-শিক্ষারও কেন্দ্র ছিল এ খবর আমরা বৌদ্ধজাতকেই সর্বপ্রথম পাই।

বৌদ্ধযুগে সাধারণত শিল্প-শিক্ষা পুরুষানুক্রমেই চলত। তবে জাতি-ব্যবসায় বদল করার বহু দৃষ্টান্ত জাতকগুলিতে পাওয়া যায়।

কারিগরদের কারখানাই ছিল শিল্প-বিদ্যালয়। 'শহরের এক-একটা অংশে বিশেষ শ্রেণীর শিল্পী বা কারিগরেরা থাকিত। বিশেষ বিশেষ শহর বিশেষ শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। দূরদেশ থেকে লোকে সেখানে সেই শিল্প শিখিতে আসিত। বারাণসীর হস্তিদন্তকর্মের বোধ হয় বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল।' (পৃ. ৩৭৯) শিল্পীদের যাতে ক্ষতি না হয় রাজা তা দেখতেন।

তুলার বস্ত্র, রেশমের কাপড়, কম্বল, লোমের পোষাক ইত্যাদির আলাদা আলাদা শিল্পী ছিল। তাছাড়া জাহাজনির্মাণশিল্পী, কাষ্ঠশিল্পী, যানশিল্পী, রথশিল্পী, রংশিল্পী, হস্তিদন্তের কারুকার্যশিল্পী প্রভৃতি নানা শিল্পীর কথা বৌদ্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায়। চিত্রণ-শিল্পে খুবই উন্নতি হয়েছিল। এমন কি fresco চিত্রণও ছিল। অলঙ্কার ও চর্মশিল্পের কথাও পাওয়া যায়। এছাড়া ঝুড়ি বোনা, মাদুর বোনা প্রভৃতির কথাও আছে। সর্ববিধ শিল্পীরা অষ্টাদশ গণে বিভক্ত ছিল।

'আপিশলী শিক্ষা'—আপিশলী পাণিনীর পূর্বেকার বৈয়াকরণ। পাণিনীর সঠিক কাল-নির্ণয় সম্ভব না হলেও তাঁর কালের একটা ব্যাপ্তি-সীমা পাওয়া যায়। কিন্তু আপিশলীর কাল সম্বন্ধে সেরূপ কোন ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব হয় নি। তবে 'শিক্ষা' গ্রন্থগুলি প্রাতিশাখ্যগুলি অপেক্ষা প্রাচীন বলে পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন। তাই আপিশলী যে খুবই প্রাচীন কালের লোক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এখানে 'শিক্ষা' একটি পারিভাষিক শব্দ। কেহ কেহ বেদাঙ্গ বলতে পাণিনির ব্যাকরণকেই বোঝেন। প্রকৃতপক্ষে বেদাঙ্গ ছটি—'শিক্ষা' তাদের

অন্ততম। 'শিক্ষা' 'বৈদিক সূত্রের প্রকৃত উচ্চারণ ও যথাযথ আবৃত্তি বিষয়ে শিক্ষা দেয়'। 'শিক্ষা'কে ঠিক ব্যাকরণ বলা চলে না। তবে ব্যাকরণের 'উচ্চারণ ও আবৃত্তি'—অংশ এর বিষয়-বস্তু।

আপিশলী-রচিত 'শিক্ষা'র মূল ও অমূল্যচরণ-কৃত তার বঙ্গানুবাদ এই রচনায় দেওয়া হয়েছে। তৎপূর্বে সংযোজিত হয়েছে একটি ভূমিকা।

'পাণিনি'—গোল্ডস্টুকর পাণিনির ব্যাকরণকেই বেদাঙ্গ নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু অমূল্যচরণ এ মত স্বীকার করেন নি। তিনি বলেন বেদাঙ্গ বেদের অংশ নয়—বেদের পরিশিষ্ট। বেদের অর্থ বুঝতে হলে বেদাঙ্গের জ্ঞান থাকা দরকার। বেদাঙ্গ কোন ব্যক্তিবিশেষের গ্রন্থ নয়—সামগ্রিকভাবে ব্যাকরণশাস্ত্রকেই বেদাঙ্গ বলে।

বেদের ব্রাহ্মণ-আমলেই শব্দশাস্ত্রের কিছু কিছু আলোচনা হয়েছিল। শব্দের অর্থ নিয়ে মত-পার্থক্য দেখা দিলে শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যের উৎপত্তি হয়। আবার শব্দের দার্শনিক ব্যাখ্যা নিয়ে মত-বিরোধের ফলে নিরুক্তের জন্ম হয়। পদযোজন, উচ্চারণ প্রভৃতি ব্যাপারেও নজর দেবার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সব কারণেই ব্যাকরণ নামক বেদাঙ্গের উৎপত্তি হয়।

পাণিনির বহু পূর্ব থেকেই যে ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দের অস্তিত্ব ছিল তার অনেক প্রমাণ তৈত্তিরীয়-আরণ্যক, ছান্দোগ্য-উপনিষদ, শতপথ-ব্রাহ্মণ, গোপথ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে আছে।

পাণিনি তাঁর ব্যাকরণেই পূর্ববর্তী ৩২ জন শাব্দিকের উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন ভারতে আটজন বৈয়াকরণ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এঁরা—ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলী, শাকটায়ন, পাণিনি, অমর ও জিনেন্দ্র। ইন্দ্রই আদি ব্যাকরণ-প্রণেতা। পাণিনির আবির্ভাবের পর ইন্দ্র-ব্যাকরণের চর্চা ধীরে ধীরে লোপ পায়।

পাণিনির ব্যাকরণের নাম অষ্টাধ্যায়ী। ইহাতে ৮টি অধ্যায় আছে, প্রতি অধ্যায়ে ৪টি পাদ ও সমগ্র ব্যাকরণে ৩৮৬৩টি সূত্র আছে। অষ্টাধ্যায়ীর ৮টি অধ্যায়ে ব্যাকরণে যা কিছু আলোচ্য বিষয় সমস্ত প্রকাশিত হয়েছে। আলোচিত সর্ববিষয়ে পাণিনির অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও দূরদর্শিতার পরিচয় আছে।

[পাতায়]

পাণিনির জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

পাণিনির কাল সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। অমূল্যচরণ তাঁদের প্রত্যেকের মত বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। তা ছাড়া চীন-পরিব্রাজক য়ুয়ন্-চয়ঙের কথা, বঙ্গীয় মত, তিব্বতীয় মত, সংস্কৃত সাহিত্য প্রভৃতি আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু সঠিক কাল-নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। তবে পাণিনি খ্রী-পূ. ৪র্থ শতেকের বহু পূর্বের বৈয়াকরণ বলেই তিনি মত প্রকাশ করেছেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে পাণিনির জন্মস্থান শালাতুর। অমূল্যচরণ এই মত অগ্রাহ্য করেছেন এবং অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে তিনি মগধবাসী ছিলেন। শালাতুর তাঁর পূর্বপুরুষদের নিবাসভূমি ছিল।

বৈয়াকরণ পাণিনি ও কবি পাণিনি একই ব্যক্তি ছিলেন কিনা এ বিতর্কে অমূল্যচরণ আর যান নি।

'অঙ্গ' অর্থাৎ বেদের অঙ্গ। বেদের ৬টি অবয়ব—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। ইহারা বেদাঙ্গ নামে অভিহিত। বেদাঙ্গের সাহায্যেই বেদের অর্থ বোঝা যায়। ইহা বেদের অংশ নয়—বেদের পরিশিষ্ট।

'অগ্রহার'—প্রাচীন ভারতে রাজারা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণপণ্ডিত, পুরোহিত, অধ্যাপক, শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা, বৈদ্য, সাধু, অমাত্য প্রভৃতিকে অগ্রহার নামে খুব সম্মানজনক একটি বৃত্তি দান করতেন। বৃত্তিভোগীকে অগ্রহারিক বলা হত। অগ্রহারিককে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি বা গ্রাম দান করা হত বৃত্তিস্বরূপ। তিনি সাধারণত বংশানুক্রমে এই অগ্রহার ভোগ করবার অধিকার পেতেন।

আবিষ্কৃত অসংখ্য তাম্রশাসন ও অন্যান্য লিপিমালার মধ্যে নানাবিধ অগ্রহার বৃত্তিদানের নিদর্শন পাওয়া গেছে। বর্তমান প্রবন্ধে সেগুলি সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে।

সভাসমিতির কথা—বৈদিক যুগে প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে সভাসমিতি নামে একটি করে সংঘ থাকত। স্থানীয় প্রত্যেকেরই এই প্রতিষ্ঠানে প্রত্যহ যোগদান বাধ্যতামূলক ছিল। সভাসমিতি দুটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন

করত। একদিকে রাজা, রাজ্য, রাজনীতি প্রভৃতি-সংক্রান্ত জটিল সমস্যার মীমাংসা, অপরদিকে ধর্ম, নীতি ও সমাজরক্ষামূলক কার্যাবলী। দ্বিতীয় কার্যাবলীই এই রচনার আলোচ্য বিষয়।

সভাসমিতি ছিল অনেকটা আধুনিক ক্লাবগুলির মত। সংঘশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের অগ্রগতিমূলক কাজে যুবশক্তিকে প্রণোদিত করাই এই রচনার উদ্দেশ্য।

'সংস্কৃতি ও সাহিত্য'—এদেশে ধর্ম সর্ববস্তুর মধ্যে এক অখণ্ড যোগ স্থাপন করেছে। আবার সর্ববস্তুকে এক অখণ্ড পূর্ণের প্রকাশরূপে দেখা হয়েছে। তাই সর্ববস্তুই ধর্মের অঙ্গ, সর্ববিদ্যাই শাস্ত্র।

ভারত-সংস্কৃতি ধর্মকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। সাহিত্য সংস্কৃতির বাহন। সাহিত্যও তাই ধর্মকে অবলম্বন করেই বিকশিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত যা জানা গেছে বাংলা সাহিত্যের আদি পদকর্তা ছিলেন সিদ্ধ পুরুষ, মহাযোগী সরহ। ইনি ছিলেন বাঙালী এবং এঁর পূর্বনাম রাহুলভদ্র।

সরহ শুধু পদ-রচনা করেন নি। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ বজ্রযানতন্ত্রের প্রধান সাধক ও শ্রেষ্ঠ প্রচারক। তাঁর কাল ৬০০-৬৫০ খ্রী.।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সরহ-রচিত চারটি চর্যাগীতি আবিষ্কার করেছেন। এই পদগুলির সাধারণ অর্থ খুব সরল, কিন্তু আধ্যাত্মিক অর্থ অতি গূঢ়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন রূপের সন্ধান পাওয়া যায় সরহের এই পদগুলির মধ্যে। এগুলির ভাষা মাগধী-প্রাকৃত ও মাগধী-অপভ্রংশের রূপান্তরিত একটা রূপ। ক্রমবিকাশের ফলে এই রূপের একটা পরিণত রূপের পরিচয় পাওয়া যায় ১৪০০ সালের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনাদিতে। তবে শ্রীচৈতন্যের সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যায়।

'অনশন'—কত বিচিত্র উদ্দেশ্যেই না মানুষ অনশন করে। পৃথিবীর সব দেশেই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ধর্মব্যাপারে, মন্ত্রতন্ত্রে, দীক্ষায় ও সামাজিক প্রথা হিসাবে মানুষ অনশন করে আসছে। এ ব্যাপারে সভ্য ও অসভ্য

জাতিতে বিশেষ ভেদ নেই। প্রায়শ্চিত্ত, শোক, সংস্কার-আচার এবং স্বপ্ন ও অলৌকিক দর্শন লাভের জন্যও অনশন পালিত হয়। প্রায় সকল জাতিরই অনশন ধর্মানুষ্ঠানের একটি অঙ্গ। কেবল জোরোয়স্ত্রীয় ধর্মে অনশন পাপ বলে গণ্য। কিন্তু জোরোয়স্ত্রীয়গণ শোকে তিন রাত্রি অনশন করে থাকেন। বৌদ্ধমতে অনশন দেহশুদ্ধ করে না। কিন্তু সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে অনশনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত।

জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সব বিচিত্র কারণে অনশনের বিধি আছে সেগুলির বর্ণনা পাই এই প্রবন্ধে। তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মে ইহার স্থান এবং বিশেষ করে ভারতীয় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে ইহার প্রভাবের কথা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

এত বিচিত্র কারণে অনশন পালিত হয় যে তা থেকে অনশনের উৎপত্তির মূল কারণ নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে ধর্মব্যাপার যে এর উৎপত্তির মূল কারণ নয় একথা বলা যায়। অমূল্যচরণ বলেন, 'অতি প্রাচীন কালে খাদ্যাভাবে বাধ্য হইয়া মানুষকে কখনও কখনও অনশনে থাকিতে হইত ; এইরূপে অনশনে থাকার জন্য মানুষের মনে কিংবা স্বাস্থ্যে সময়ে সময়ে যে সুফল ফলিত, তাহাই বিচার করিয়া পরে স্বেচ্ছাকৃত অনশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে'। (পৃ. ৪৮০)।

'অতিকৃচ্ছ্র'—এটি একটি দ্বাদশদিনব্যাপী কষ্টসাধ্য প্রায়শ্চিত্তব্রত। লোহার দণ্ড দিয়ে গোহত্যা করলে এই ব্রত করে প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান দিয়েছেন ঋষি অত্রি। আবার পণ্ডিতের অন্নগ্রহণকারী ব্রাহ্মণের জন্যও ঐ একই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা।

পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণের আঘাতকারীকে এই প্রায়শ্চিত্তব্রত পালন করার বিধান দিয়েছেন যাজ্ঞবল্ক্য।

'অতিকৃচ্ছ্র' ব্রত পালনের নিয়মাবলী এবং সান্তপন, প্রাজাপত্য ও কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র নামে তিনটি প্রায়শ্চিত্তব্রতের সঙ্গে এই ব্রতের পার্থক্যও এ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

অলঙ্কার—মানুষ অলঙ্কার ভালবাসে কেন? এই প্রশ্নের দার্শনিক ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে অমূল্যচরণ খুঁজে পেয়েছেন অলঙ্কার-সৃষ্টির উৎস।

একদা প্রকৃতির রহস্য-উন্মোচনে অক্ষম মানুষ ব্যাধি ও দুর্দৈব থেকে আত্মরক্ষার জন্য রক্ষাকবচ ধারণ করত। তার সৌন্দর্যচেতনা এই কবচকেই ধীরে ধীরে অঙ্গসজ্জার অলঙ্কারে রূপান্তরিত করেছে। আদিম মানুষ কতই না বিচিত্ররূপে অঙ্গসজ্জা করত। তার পরের ইতিহাস অঙ্গভূষণের ক্রম-বিকাশের ধারা বয়ে চলেছে।

মানুষ মাত্রই কোন না কোনভাবে দেহকে অলঙ্কৃত করে থাকে। এমন কি, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীও রুদ্রাক্ষ, কর্ণাভরণ, মালা, সিন্দুর ধারণ করেন। অমূল্যচরণের দৃষ্টিতে এগুলিও অলঙ্কারের নামান্তর।

ভারতেই অলঙ্কারের বৈচিত্র্য ও সমাদর সবচেয়ে বেশী। বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এই ধারা চলে আসছে। প্রাচীন যুগের অলঙ্কারেও অসাধারণ কারুকার্য, উন্নতমানের শিল্পচাতুর্য ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় কৃষ্টি-প্রভাবিত দেশ-গুলির (যেমন, বর্মা, মঙ্গোলিয়া, বালি, যবদ্বীপ প্রভৃতি) অলঙ্কার-রীতি মোটামুটি ভারতের অলঙ্কারেরই অনুরূপ।

বেদে অলঙ্কার শব্দটি না থাকলেও সমার্থক শব্দ পাওয়া যায় এবং বৈদিক যুগে অলঙ্কারের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। দেব ও অসুর উভয়েই নানা অলঙ্কারে ভূষিত হতেন। বিশেষ বিশেষ দেবতার বিশেষ বিশেষ অলঙ্কার দেখে দেবমূর্তি চিহ্নিত করা হয়।

ম্যাকডোনেল ও কীথ তাঁদের বৈদিক সূচিতে ২১টি অলঙ্কারের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অমূল্যচরণ বৈদিক সাহিত্য থেকে ৫৩টি অলঙ্কারের নাম সংগ্রহ করেছেন।

গহনার নাম অলঙ্কার হল কেন? এ সম্বন্ধে এক প্রাচীন সুরসিক ঋষির সরস ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই প্রবন্ধে।

মৌর্যযুগে অলঙ্কার ব্যবসায়ে সততা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে গহনা-তৈরির ব্যবস্থা ছিল তাও জানা গেল।

এছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থ ও কাব্যে বর্ণিত, ভাস্কর্যে-দৃষ্ট ও দেশ-বিদেশে ব্যবহৃত নানা অলঙ্কারের বর্ণনাও পাই।

[একষট্টি]

দেশকালপাত্র ভেদে রুচির তারতম্য সত্ত্বেও পুরানো রীতি-পদ্ধতির একটা সূক্ষ্ম আভাস আধুনিক অলঙ্কারেও রয়ে গেছে।

'রথযাত্রা'—হিন্দুদের রথযাত্রা উৎসবের উৎপত্তি, হেতু ব্যাখ্যা এবং পালনীয় নিয়ম-পদ্ধতির বিশদ বিবরণে সমৃদ্ধ 'রথযাত্রা' প্রবন্ধটি। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মতে—বৌদ্ধদের রথযাত্রা উৎসবের অনুকরণে হিন্দুদের এই উৎসবের সূচনা হয়েছিল। অমূল্যচরণ নানা যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে এ মত খণ্ডন করেছেন।

বাংলা ও পুরী ছাড়া ভারতের অন্যত্র রথযাত্রার তাৎপর্য হল—কংসের আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন থেকে মথুরা যাত্রা। কিন্তু পুরীধামের রথযাত্রা কৃষ্ণের রাজধানী থেকে লীলাভূমি বৃন্দাবনে যাত্রা। স্থানিক বিশ্লেষণ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণনা থেকে এই ধারণাই পাওয়া যায়। এ ব্যাখ্যা বাস্তবসম্মত নয় বলে অমূল্যচরণ গ্রহণ করতে পারেন নি। প্রকৃত ব্যাখ্যা কি হবে তা গবেষণার বিষয়। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে পুরীর রথযাত্রা শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত লীলার উৎসব উপলক্ষে নয়। ইহা একান্তই শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত একটি আধ্যাত্মিক ভাবের উৎসব।

জগন্নাথদেবের হস্তপদহীন দারুব্রহ্মমূর্তির যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টায় নানা প্রামাণিক গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে।

কাত্যায়নী দুর্গাদেবীর নাম কেন যাদবদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী একানংশা হল, কেমন করে তিনি আবার কৃষ্ণ-বলরাম মধ্যবর্তিনী সুভদ্রা দেবীতে রূপান্তরিত হলেন তার সঙ্গত ব্যাখ্যা পাই এ প্রবন্ধে।

বাংলা ও উড়িষ্যার জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ছাড়াও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত নানা দেব-দেবীর রথযাত্রার কথা, বহির্ভারতের নেপাল, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচলিত দেব-দেবীর রথযাত্রা, এমনকি ইউরোপে সিসিলি দ্বীপে যীশু-জননী মেরীর রথযাত্রা বিষয়ও বিবৃত হয়েছে। এই সকল দৃষ্টান্ত রথযাত্রা উৎসবের প্রাচীনত্ব ও সার্বভৌমিকত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করে।

দোল—দোল বা বসন্তোৎসব ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং বহির্ভারতের নেপালে অঞ্চলভেদে যে যে পৃথক নামে

ও পদ্ধতিতে এই উৎসব পালিত হয়, সেগুলির বিশদ বিবরণ আছে এই প্রবন্ধে।

দোল উৎসবের উৎপত্তি ও কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে নানারকম গল্প, কাহিনী ও মতামত পাওয়া যায়। এগুলিও পরিবেশিত হয়েছে।

মুঘল সম্রাট অক্‌বরের সময়ে, অযোধ্যার নবাব আসফ-উদ্-দৌলার সময়ে ভারতে মুসলমানদের মধ্যেও দোল উৎসবের যথেষ্ট সমারোহ ছিল। 'দরবার-অক্‌বরী' ও 'কুল্লীয়াৎ' তার গ্রন্থে নিদর্শন পাওয়া যায়।

বসন্ত ঋতুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে ও প্রকৃতির নবজাগরণে আনন্দ প্রকাশের মাধ্যমে, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিককালে পালিত এই উৎসবের মধ্যে একটি সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় বলে অমূল্যচরণ মত প্রকাশ করেছেন।

'প্রাচীন পুথির বিবরণ'—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-পুথিশালায় সংগৃহীত প্রাচীন বাংলা পুথির বিবরণ ও তৎসহ সামগ্রিকভাবে ভারতের প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে তথ্যবহুল ও বিশ্লেষণী আলোচনা সম্বলিত এই ভূমিকাটি ভারতীয় প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে একটি সার্থক রচনা।

এই বিবরণটি দুটি স্তরে প্রকাশিত হয়। অমূল্যচরণ ৫৮৩ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে অবহিত করলেও আরও কিছু তথ্য পরিবেশনের প্রয়োজন আছে।

১ নং থেকে ১০০ নং পুথির বিবরণ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্তৃক সংকলিত হয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায়। এটি সাহিত্য পরিষদের পক্ষে রামকমল সিংহ প্রকাশ করেন ১৩৩০ বঙ্গাব্দে (১৯২৪ খ্রী.) (সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী ৪৩ নং, ৩য় খণ্ড ১ম সংখ্যা দ্র.)। তারপর ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে (১৯২৬ খ্রী.) অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় এবং বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের সংকলনে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে রামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১০১ নং থেকে ২০০ নং পুথির বিবরণ। এই বিবরণটির সঙ্গেই ভূমিকাটি সংযুক্ত ছিল (সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী ৪৩ নং ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা দ্র.)।

এই ভূমিকা থেকে আমরা জানতে পারি যে বৈদিক যুগে ভারতে পুথিশালার অস্তিত্বের প্রমাণ না থাকলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় খ্রী-পূ. ৪র্থ

শতকে তক্ষশিলা, বারাণসী ও পাটলিপুত্রের প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠগুলিতে পুথিশালা ছিল। ফা-হিয়ান, য়ুয়ন চয়ঙ ও ই-সিঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রমাণ করে ৫ম—৭ম খ্রী. শতকে তাম্রলিপ্তি, পাটলিপুত্র ও নালন্দায় বহুসংখ্যক বৃহদায়তন পুথিশালা ছিল। গুপ্তযুগে ও হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে হিন্দু মন্দিরগুলির গ্রন্থভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছিল। ৬৫০—১০০০ খ্রী. শতকে ভারতের সর্বত্র মঠে, মন্দিরে, রাজা ও ধনীর গৃহে ব্যাপকভাবে পুথি সংগৃহীত হয়েছিল। ৯ম শতকে ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলা গ্রন্থভাণ্ডারের জন্য বিখ্যাত ছিল। ১০ম-১২শ শতকে রাজপুতানা, গুজরাত, থরড, পাটন প্রভৃতি স্থানে জৈন বিহারগুলিতে বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। মধ্যযুগে চালুক্যরাজগণ এবং সুলতান ও মুঘল আমলে মুসলমান শাসকগণও পুথিশালার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশের ও বহির্ভারতের কয়েকটি প্রাচীন সভ্যদেশের পুথিশালার বিষয়ও আলোচিত হয়েছে।

প্রাচীন পুথি কি কালি দিয়ে, কিসে এবং কিভাবে লেখা হত, পোকা ও আবহাওয়ার হাত থেকে সেগুলি রক্ষার কি ব্যবস্থা ছিল, প্রাচীন পুথির শ্রেণী ও প্রকারভেদ, বানান, ব্যবহৃত ভাষার উৎস, সুষ্ঠু সম্পাদনার নিয়ম-পদ্ধতি প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়েও এই রচনায় আলোকপাত করা হয়েছে।

(১০)

পরিশেষে এই রচনাবলীর উৎকর্ষের জন্যে যিনি বহুমূল্য সময় ব্যয় করে আমাদের কর্মপন্থানির্দেশ, তত্ত্বাবধান ও অভিজ্ঞ পরামর্শ দিয়েছেন— তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং আমাদের উপদেষ্টা ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য। তাঁকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। স্বনামখ্যাত শ্রদ্ধেয় ড. দীনেশচন্দ্র সরকার কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন এবং 'শ্রমণ' ও 'Jain Journal'-এর সম্পাদক শ্রদ্ধেয়

শ্রীগণেশ লালওয়ানী জৈনধর্ম পর্যায়ের প্রবন্ধগুলির তথ্য সংগ্রহে বিশেষ সাহায্য ও পরামর্শ দিয়েছেন—তাঁদের উভয়ের কাছে আমাদের ঋণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক ও অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ও গ্রন্থাগারিক শ্রীশান্তিময় মিত্র এবং সুদক্ষ কর্মিগণ গ্রন্থাগারের পূর্ণ সুযোগ আমাদের দিয়েছেন এবং সকল সময়ে আন্তরিকভাবে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে আমাদের অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় পাঠাগারের গ্রন্থ ব্যবহারের বিশেষ সুবিধা দিয়েছেন, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের কর্মিগণ প্রতি ব্যাপারে আমাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন—এঁদের সকলকেই আমরা সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

রচনাবলীর সম্পাদনা ও সংকলনে শ্রীঅশোক উপাধ্যায় ও শ্রীদীপঙ্কর নন্দীর সহযোগিতা ও পরামর্শ আন্তরিক উল্লেখের দাবী রাখে। আর যাঁদের উৎসাহ ও স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা না পেলে এরূপ দুরূহ কাজে ব্রতী হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হত কিনা সন্দেহ, তাঁদের কথা এই সূত্রে স্মরণ না করলে কর্তব্যের ত্রুটি থেকে যায়—তাঁরা হলেন: (সর্বশ্রী) রাসবিহারী রায়, অজিত ঘোষ, বিমলকুমার পাল, অরুণচাঁদ দত্ত, শঙ্কর ভট্টাচার্য, প্রশান্তকিশোর রায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ ঘোষ, অশোকা সিকদার, অনুরাধা বসু, অশোকা সরকার, ভারতী চট্টোপাধ্যায়, অরুণা চট্টোপাধ্যায়, মীরা বক্সী, সুছন্দা মিত্র, প্রবীর নন্দী, মৌসুমী বসু, সুপর্ণা ঘোষ, ভাস্কর ভট্টাচার্য, সুখেন ঘোষ, বিনয় যোশী, শচীন ঘোষ, অনুপ চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্র ঘোষ, দেবব্রত বসু।

এই বিপুলায়তন মূল্যবান রচনাবলীর প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদ একটি জাতীয় কর্তব্য পালন করে সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়েছেন। সুষ্ঠুভাবে প্রকাশন ও মুদ্রণ ব্যাপারে নবজীবন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীকালীচরণ পাল ও তাঁর সুদক্ষ কর্মীদের সহযোগিতা ও সাহায্য ধন্যবাদের সঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

[পরিষটি]

চিত্রশিল্পী শ্রীনির্মল কর্মকার॰॰প্রবন্ধের অন্তর্গত ক্ষতিগ্রস্ত চিত্রগুলি মুদ্রণযোগ্য করেছেন, 'রয়াল হাফটোন' সংস্থা প্রচ্ছদ ও অন্যান্য চিত্রগুলির ব্লক সুচারুরূপে নির্মাণ করেছেন এবং প্রচ্ছদ ছেপেছেন। বর্মণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস নৈপুণ্যের সঙ্গে বই বাঁধাইয়ের কাজ সম্পন্ন করেছেন। এঁদের অবদান আমরা স্বীকার করি।

প্রথম খণ্ডের রচনাবলী সম্পাদনে ও রচনা সংগ্রহে ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে মতামত ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

সম্পাদক

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮২

ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা

ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা বলিতে হইলে নানা কথারই আলোচনা আসিয়া পড়ে, ব্যাপারও বিরাট হইয়া উঠে। প্রাসঙ্গিক বহু বিষয়ের অবতারণা না করিলে বিষয়টিও পরিস্ফুট হয় না। কাজেই সর্বপ্রথমে দিগ্‌দর্শন হিসাবে বর্ত্তমান প্রবন্ধে কয়েকটা কথা বলিব। পরে মূল বিষয়ের সূচনা করিব।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই যে মানবজাতি বিভক্ত হইয়া গিয়াছে তাহা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন। আর্য, নিগ্রো, মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিভাগের পশ্চাতে নৃতত্ত্বও বিশেষ কোন সংবাদ দিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের সংস্কৃতি (culture) ও সভ্যতার (civilization) বৈশিষ্ট্যও অস্বীকার করা যায় না। ভৌগোলিক সংস্থানের ফলে দীর্ঘ যুগ যাপন করিয়া বিভিন্ন খণ্ড-খণ্ড মানব-সমাজ এক-একটি সংস্কৃতি—তথা সভ্যতা বিশিষ্ট সত্তা বা ব্যক্তিত্ব লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই মানব-সমাজের আকৃতির বৈশিষ্ট্য যেমন অস্বীকার করা সম্ভব নয়, তেমনি তাহার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যও অবশ্য স্বীকার্য।

আবার সকল মনুষ্যের মধ্যে এমন একটি সাধারণ বস্তু আছে যাহা মানুষকে অন্য সকল জীব হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে; তাহা মানব-মনের সর্ব-সাধারণত্ব। আর ইহাই বিশ্বমানবতার নিদানভূত।

একটা জাতিকে সাধারণ মনুষ্যজাতি হইতে পৃথক্ করিয়া বিশেষ নামে যে অভিহিত করি তাহার নীতি হইতেছে এই যে, সকল মনুষ্যসমাজ হইতে

এক-একটি বিশেষ অংশ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ খণ্ডে প্রাচীন কাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছে। ফলে, এক-একটি বিশেষ অংশের অনুষ্ঠান ও ধর্মের স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাই এক-একটি জাতির ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য বা সংস্কৃতি। এই বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বহু ব্যাপারে ইহাদের মধ্যে পরস্পরের ঐক্য ও সাধারণত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। এক জাতি যাহা ভাবিয়াছে, অন্য জাতিও হয়তো সেই একই ভাবনা করিয়াছে; এক জাতির সমস্যা হয়তো অন্য জাতির সমস্যার সঙ্গে অনেকাংশে মেলে, তাহার সমাধানেও হয়তো অদ্বিতীয়ত্ব নাই; কিন্তু একটি জাতির চিন্তার ধারা এবং সমাধানের ধারায় অপূর্বত্ব থাকিবেই। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল দেশেই আছে অথচ তজ্জন্য পরিচ্ছদ, আবাস, আহার ইত্যাদি পৃথিবী জুড়িয়া এক নয়। ইহাদের পার্থক্য অসামান্য। দেশ-কাল-পাত্রে এই সমস্যার রূপের বিশেষ হেরফের হইয়াছে। চিন্তার ক্ষেত্রে ইহা আরও বেশী সত্য। বিভিন্ন দেশের প্রশ্ন হইয়াছে বিভিন্ন—সমাধানও বিভিন্ন। বাহ্য জীবনের বৈচিত্র্য অপেক্ষা অন্তর্জীবনের বৈষম্য এত অধিক তীব্র যে কল্পনাই করা যায় না, তাই অন্তর্জীবনের এই বৈষম্য বা ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই একটি বিশেষ জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতি টিঁকিয়া থাকিতে পারে।

পৃথিবীর সকল প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। অধুনা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা নূতন সভ্যতার মধ্যে প্রাচীন সভ্যতার কোন কোন রেশ আবিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের নিকট তাহার প্রাত্যহিক জীবনে ইজিপ্ট, বাবিলোনিয়া, আসিরিয়া বা মায়া-সভ্যতা মৃত। এমন কি গ্রীক-রোমও যেন প্রত্নাগারে স্থান পাইয়াছে। ইহাদের সভ্যতা মানুষের প্রতিদিনকার জীবনে মরিয়া গিয়াছে। আজ অতীতের বক্ষের কঙ্কাল-পঞ্জর দেখি, দেখিয়া বিস্মিত হই, উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করি—সে প্রশংসা এমন কি কাব্যের আকারও পাইতে পারে, তাহা কোন শিল্পীর অনুপ্রেরণাও যোগাইতে পারে, কিন্তু মানুষের জীবনে তাহার স্থান ও সার্থকতা কোথায়?

সকল প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে মাত্র একটি বাঁচিয়া আছে। সেই অদ্বিতীয় গৌরবের স্থান ভারতীয় সভ্যতার। (চৈনিক সভ্যতা বলিতে

যাহা বুঝি তাহা ভারতীয় সভ্যতার একটি বিশিষ্ট পরিণতি, অন্য দেশে, অন্য জাতির সংমিশ্রণে এক বিচিত্র রূপ।)

অন্য দেশে অন্য যে সভ্যতা উদ্ভূত হইয়াছিল তন্মধ্যে এমন প্রেরণা ছিল না, এমন গভীরতা ছিল না যাহার ব্যাপকতা এত বেশী। সে সকল সভ্যতার সমস্যা ছিল সাময়িক, তাহাদের চিন্তা বর্তমানকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। সেখানে পরের সভ্যতা নূতন কথা লইয়া আসিয়াছে, পরের চিন্তা নূতন আলোক লইয়া আসিয়াছে, সেই নূতন বাণীকে বাধা দিবার মত শক্তি পুরাতনের ছিল না। সে সমস্ত পুরাতন সভ্যতা ছিল মাত্র পাথরের —ইটের সভ্যতা—সেনা-বাহিনীর সভ্যতা। বাহ্য জীবনের বহু প্রয়োজনের, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের, আরামের বন্দোবস্ত তাঁহারা করিয়াছেন, কিন্তু অন্তর্জীবনের গূঢ় সমস্যার—সত্যকার জীবন-সমস্যার কোন বাণী সে সকল সভ্যতায় নাই। প্রাণহীন এরকম বস্তু-সভ্যতা বাঁচিতে পারে না। ভারতীয় সভ্যতার প্রাণস্পন্দন ছিল বলিয়াই সে বাঁচিয়াছে। ইহাকে 'আধ্যাত্মিক' বলিয়া কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত অধরপ্রান্তে একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছেন। ইহার বস্তু-সভ্যতার অংশ কতটা তাহা এখানে বিচার্য নয়। কিন্তু এ-টুকু বুঝিতে হইবে যে, ইহা বিশেষ করিয়া আধ্যাত্মিক বলিয়াই বাঁচিয়াছে। মাত্র এই সভ্যতারই আত্মা আছে—তাই সে মরে নাই।

ভারতের চিন্তা পৃথিবীর বস্তুতেই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। বস্তুর আশ্রয় যাহা, বস্তুর অতীত যাহা তাহারই সন্ধান সে পাইয়াছে। ভারত রূপের মধ্যে অরূপের সাধনা করিয়াছে। নশ্বর ভঙ্গুরকে অতিক্রম করিয়া ভারতের সাধনা হইতেছে শাশ্বত নিত্যের। এই জগতের প্রাণের সন্ধানে তাহার যাত্রা। অমৃতের পথ পাইয়া সে চলিয়াছে। ভারতে জীবন অতি দীর্ঘ সাধনা—অবিদ্যা হইতে মুক্তির সাধনা, বিদ্যার আবির্ভাবের সাধনা।

ভারতবর্ষে লেখাপড়া ও সংস্কৃতি কোন দিন এক বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সংস্কৃতি ভারতের অন্তরের বস্তু, অক্ষরপরিচয়ে সাহিত্য-জ্ঞান কোন দিন তাহার জ্ঞাপক ছিল না। এ-দেশে বিদ্যা কখনও academic ব্যাপার বলিয়া গৃহীত হয় নাই। বিদ্যা তাহার অন্তরের সামগ্রী। দর্শনও

কোন দিন বুদ্ধির পরিচয়-জ্ঞাপক মাত্র হয় নাই—ইহা ছিল ভারতবাসীর প্রাণস্বরূপ। দর্শন ও ধর্ম কোন সময়ে এদেশে দুটি পৃথক বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ধর্মের গোড়ার কথাটি হইয়াছে সর্ববস্তুর মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ; সর্ববস্তু একটি অখণ্ড পূর্ণত্বের প্রকাশ মাত্র। তাহার macrocosm ও microcosm সর্ববিদ্যাই ধর্মের মধ্যে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। চতুঃষষ্টি শিল্পকলাও ধর্মের বাহন হইয়াছে। শিল্পকলা-গ্রন্থেরও তাই নাম হইয়াছে শাস্ত্র। ধর্মের মত ব্যাপক শব্দ ভারতীয় ভাষায় আর নাই। ধর্ম সকলের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে, সকলকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে বলিয়া এদেশে কোন বিদ্যা watertight compartmentএর মত হয় নাই। সর্ববিদ্যার শেষ বাণী ধর্ম; তাহাদের মধ্যে কোন বিদ্বেষ ঘটে নাই। প্রাচীন যুগে ধর্ম ভিন্ন তাই এদেশে কাব্য হয় নাই, স্থাপত্য হয় নাই, শিল্প-সৃষ্টি হয় নাই। আমাদের শিল্পে বিদেশীরা বস্তুতন্ত্রের অভাববোধ করেন। সত্য বটে, বাস্তবের সঙ্গে আমাদের শিল্প মেলে না। কিন্তু সাধনার দিক দিয়া দেখিলে কোন গোলযোগ থাকে না। ভারতের সাধনা concrete-এর মধ্য দিয়া abstractএর; রূপের মধ্য দিয়া অরূপের। লিঙ্গপূজার মধ্যে আমরা ইহারই সাক্ষাৎ পাই; মূর্তিপূজায় অবিকল নিছক মনুষ্যমূর্তি যে দেখি না তাহারও ব্যাখ্যা ইহাই। এখানে abstractকে মূর্তি দিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে, তাহা concreteএর হুবহু নকল হইতে পারে না।

অতি প্রাচীন যুগেই আমরা পরিব্রাজকদের কথা শুনিতে পাই। চির-পথিক তাঁহারা, দেশদেশান্তরে বিরামহীন যাত্রার ব্রত তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহাদের সাধনার ফল তাঁহারা প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। দরিদ্রতম কৃষকের কুটিরেও তাঁহাদের গতি—রাজ-অতিথিও তাঁহারা। তাই প্রাচীন যুগে গ্রামে গ্রামে এই পরিব্রাজকদের জন্য কুটাহলশালার[1] অস্তিত্ব। গ্রামবাসীরাও কুটাহলশালার গর্বে গৌরববোধ করিয়াছে। যেখানে ইঁহাদের বিচার-সভা বসিত সেখানে ইঁহারা গ্রামবাসীদের উপদেশ দিতেন। রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিতে কি সাহায্য করিয়াছে তাহা আজও নিরূপিত হয় নাই। প্রতি ভারতবাসীর মর্মে ইহারা প্রাণসঞ্চার করিয়াছে। ভারতের অষ্টাদশ পুরাণকথা ভারতের মর্মকথা হইয়াছে।

অতি প্রাচীন যুগে আমরা যাত্রা ও কথকতার পরিচয় পাই। এগুলি যে কত বড় শিক্ষার বাহন তাঁহা আজও ঠিক বোঝা হয় নাই। নিরক্ষর কৃষকের মুখে কত অজানা সাধক কবির যে গান আজও শুনা যায় তাহা দর্শনের গভীরতম মূল তত্ত্বের ব্যাখ্যা। চর্যাচর্য, দেহতত্ত্ব, বাউল, ভাসান, মঙ্গলগান প্রভৃতি সঙ্গীত এ যুগেও কত শত বৎসর ধরিয়া নিরক্ষরদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। ভারতের বারব্রতও সেই প্রাচীন সংস্কৃতি বহন করিয়া আসিয়াছে। শিক্ষা ও লেখাপড়া এক বস্তু নয়—এ কথাটা যদি একবার উপলব্ধি করিতে পারি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব আমাদের নিরক্ষর গ্রামবাসীদের মত শিক্ষিত গ্রামবাসী পৃথিবীতে আর নাই।

ভারতবর্ষে আর্যদের কেমন করিয়া দেখা পাওয়া গেল সে প্রশ্নের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক মীমাংসা আজও হয় নাই। তবে আদিম যুগের কয়েকটি আর্য দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সুদূর বোঘাস কুই[2]—শিলালিপিতে, তেল-এল-অমরনার[3] পত্রাবলীতে এবং বাবিলনের কাসাইটদের[4] দলিলপত্রে। কাসাইটরা হিমালয়ের (সিমলিয়ার) উল্লেখ করিয়াছে। মিত্তানীদের সহিতও আর্যদের সম্পর্ক ভারতবর্ষে আর্যাগমনের পূর্বে হইয়াছিল, এ কথা এখন আর বলা চলে না। তেল-এল-অমরনার পত্রাবলীতে সংস্কৃত নাম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বোঘাস কুই-লিপিতে সংস্কৃত সংখ্যা আছে, বৈদিক শব্দের সহিত ইহার শব্দের মিল আছে। ভারতবর্ষের সহিত এসিয়া মাইনরের সাক্ষাৎ সম্পর্ক। এই দূর দেশে হিন্দুদেবতারা শান্তিদেবতারূপে দেখা দিয়াছেন। শান্তির বাণী লইয়াই ভারতবর্ষের প্রথম আন্তর্জাতিক পরিচয়। শান্তিই ভারতের সনাতন বাণী—শান্তিই ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ প্রতীক। সে যুগের অপর সকল সভ্যতার আন্তর্জাতিক পরিচয় গ্রহণ করিতে গিয়া দেখিতে পাই—সে পরিচয় তাহাদের লুণ্ঠনে। সে লুণ্ঠন হয় ব্যবসাচ্ছলে নয় প্রকাশ্য সৈন্যবলে। সেদিনও ইজিপ্ট তৃতীয় থুটমোসিসের[6] বিশ্বজয়ের জয়গীতি দুন্দুভিদ্বারা ঘোষণা করিতেছিল, এথেনিয়নরা ক্রীট দখল করিতেছিল এবং ফিনীসিয়রা এই প্রাচীন যুগে বাণিজ্যচ্ছলে পৃথিবী লুণ্ঠন করিয়া প্রথম আসিরিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। আসিরিয়ার অসুরেরা জাগিতেছিল।

মোহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায়[7] যে সভ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত সুমেরীয় সভ্যতার একটা সহজ ঐক্য ও সামঞ্জস্য আছে। মার্শাল[8] (ASI., AR. 1923-24) বলিয়াছেন; সিন্ধু-উপত্যকায় যে সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার উৎপত্তি, অতিবৃদ্ধি ও পরিণতি ঐ স্থানেই হইয়াছে। নীলনদীর তীরে ফারওয়াদের সভ্যতার মত উহা ঐস্থানের একান্ত সম্পত্তি। আর মেসোপটেমিয়ায় সুমেরীয় সভ্যতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে বেশ ধারণা করিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষের অঙ্কপ্রদেশই ঐ সভ্যতার আদি ভূমি; এবং বাবিলন, আসিরিয়া ও পশ্চিম এসিয়ার সাধারণ সংস্কৃতি পরে সেখানে ছড়াইয়া পড়িয়া বদ্ধমুল হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির দ্রবিড়ীয় অংশের ইতিহাস আজও লিখিত হয় নাই; কিন্তু ইহা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার তাহা অস্বীকার করা যায় না। দ্রবিড়ী রক্তের মত সেই সংস্কৃতি আর্য-সংস্কৃতির সহিত বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে। লিঙ্গপূজা, নাগপূজা, বৃক্ষপূজা, মাতৃকাপূজা প্রভৃতি দ্রবিড়ীয় ভিন্ন অন্য ব্যাখ্যায় এই সংস্কৃতিতে স্থান পাইতে পারে না। যজ্ঞস্থলে প্রতিমাপূজার ব্যাখ্যা দ্রবিড়ীয় বলিয়া সম্ভব হয়।

বেলুচিস্তানের দ্রবিড়ী ব্রাহুই ভাষা[9] অনেক ব্যাপারেরই সূচনা করে। আবার দ্রবিড়ীরও পূর্বে নেগ্রিটো[10] সম্পর্কও প্রমাণিত হইতেছে।

বৈদিক যুগ হইতেই ইরানের সহিত ভারতের সম্বন্ধ। অশোকের সময় ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইরান-সম্পর্কের অকাট্য নিদর্শন পাওয়া যায়। মৈত্রী বাণীপ্রচারক এই অশোক প্রথম প্রচার করিলেন—পৃথিবীবাসী সকলেই ভ্রাতা। ইহাপেক্ষা বৃহত্তর আন্তর্জাতিক বাণী আর নাই। তিনি পৃথিবী বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র এই বাণী পৌঁছাইয়া দিবার জন্য। তাই সেই বিজয়ের তিনি নাম দিয়াছিলেন 'ধর্মবিজয়'। তিনি চাহিয়াছিলেন বিশ্বের কল্যাণ। তিনি বলিয়াছিলেন—ধর্মের দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ জয়ই একমাত্র জয়।

আর এই যুগেই রোম পৃথিবীর বৃহত্তর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় রোমক সভ্যতার পরিচয় দিতেছিল।

খ্রীস্টপূর্ব শতকে প্রবল-প্রতাপ মেনেন্দরকে[11] একাগ্র ও ঐকান্তিক বৌদ্ধ-

রূপে দেখি, বৈষ্ণব ভাগবতরূপে হেলিওডোরসের[12] পরিচয় পাই। চীনে বৌদ্ধ প্রচারক মেলে, আর তথাকথিত গান্ধারশিল্পে গ্রীক সংস্কৃতির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এই যুগের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় —ভারতবর্ষ সকলকে গ্রহণ করিয়াছে; কত অজানাকে স্থান দিয়াছে। এমন সময় গিয়াছে যখন ভারতে পর-সংস্কৃতির একটা রাসায়নিক সংমিশ্রণ চলিয়াছিল। ইজিপ্ট, এসিয়া মাইনর, পারস্য সকলের সহিতই ভারতের কোলাকুলি। তারপর পরের যুগে দলে দলে অসভ্য বর্বর আসিয়া ভারতের দুয়ারে হানা দিয়াছে। তাহাদের ফিরিয়া যাইতে হয় নাই। ভারতবর্ষ শক, হুন, মোঙ্গল, পহ্লব, চীন সকলকেই গ্রহণ করিল। ভারতের অপূর্ব সবল সংস্কৃতিকে ইহারা নষ্ট করিতে পারে নাই, ভারতের আশ্চর্য প্রভাবে তাহারা গর্বিত হিন্দু হইয়া গেল। ভারতবর্ষের গৌরবময় ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অংশ ইহাদেরই কীর্তি—রাজপুতরূপে। দ্রবিড়ী অন্ধ্রসম্রাট গোতমীপুত্র শাতকর্ণি[13] নিজেকে এক-ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব করিলেন, চতুর্বর্ণের সংমিশ্রণ বন্ধ করিয়াছেন বলিয়া শিলালিপিতে অঙ্কিত করিলেন; শক উসভদাত[14], রুদ্রদামা[15] হিন্দুধর্মের প্রতিপালক হইলেন। সংস্কৃতির এমন বিরাট রাসায়নিক সংমিশ্রণ পৃথিবীর ইতিহাসে বড় ঘটে নাই। ভারতের উদার-নীতিতে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্বন্ধ সকল দেশেরই হইয়াছে। আর ইহার পরেই ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ঐতিহাসিক উপকরণ জুটিতে আরম্ভ হইল। বৃহত্তর ভারতের স্থচনা দেখা গেল। চীনে তো বহুপূর্বেই বৌদ্ধ ভিক্ষু গিয়াছিল। এখন তাহাদের সংখ্যা বেজায় বাড়িয়া উঠিল। ভারতীয় নাবিকে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ছাইয়া গেল। বৌদ্ধ ভিক্ষু পৌঁছিল, ব্রাহ্মণও পৌঁছিল। এসব ঘটিল খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষে। অফগানিস্তান পার হইয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু মধ্য-এসিয়া ছাইয়া ফেলিল। চীন পার হইয়া তাহারা জাপানে দেখা দিল। ভারতের প্রতিবেশী তিব্বত, সেও বৌদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইল।

[প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪১, পৃ. ৫৭০-৫১৩]

প্রসঙ্গ-কথা

'ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা' প্রবন্ধটি 'প্রবাসী' মাসিক-পত্রিকায় (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত) ১৩৪১ শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মৃত্যুর ২৫ বছর পরে ১৩৭২ সালে তাঁর ৫৬টি প্রবন্ধের সংকলনগ্রন্থ 'ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা'য় (ড. সুশীলকুমার গুপ্ত সম্পাদিত) এটি প্রথম প্রবন্ধরূপে পুনর্মুদ্রিত হয়।

1 প্রবাসীতে মুদ্রিত মূল প্রবন্ধে মুদ্রাকর-প্রমাদে 'কুটাহলশালা'র স্থলে 'কুটাহনশালা' ছাপা আছে। সংকলিত গ্রন্থেও এই ভুল সংশোধিত হয় নি। বর্তমান প্রবন্ধে সংশোধিত শব্দ দেওয়া হয়েছে।
কুটাহলশালা (প্রাকৃত—কুতুহলশালা): প্রাচীন কালে দেশ-বিদেশ থেকে আগত পরিব্রাজকেরা গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করতেন এবং আলোচনায় বসতেন। সেই পরিব্রাজকদের আশ্রয় এবং আলোচনার স্থল ছিল কুটাহলশালা। —*MDPFN*, i. p. 629

2 বোঘাস কুই (Boghaz Keui): এসিয়া মাইনরের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামটি তুরস্ক সাম্রাজ্যের অঙ্গোরা প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে এখানের ধ্বংসাবশেষে অনেক ভাস্কর্য ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। —*En. Brit.* iii. p. 778, *MEML*, p. 227, *MMBA*, pp. 5, 262, 280

3 তেল-এল-অমরনা (Tel-el-Amarna): প্রাচীন মিশরের রাজধানী অখেত-অতোন, চতুর্থ আমেনোফিস (ইখনতোন) কর্তৃক স্থাপিত ১৩৬০ খ্রী-পূ.। বর্তমান নাম তেল-এল-অমরনা। ইখনতোনের মৃত্যুর পর এই রাজধানী পরিত্যক্ত হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ১৮৯১-৯২ খ্রী. অধ্যাপক ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি কর্তৃক ধ্বংসস্তূপ খননকার্য আরম্ভ হলে রাজপ্রাসাদ, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, বহু প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়। —*En. Brit.*, xxi. p. 893, *MEML*, pp. 323, 328

4 কাসাইট : প্রাচীন মিডিয়ার অধিবাসী জাতিবিশেষ। এঁরা সমগ্র বাবিলন অধিকার করেছিলেন। অসুর-জাতি দ্র.। —*MMBA*, p. 218

5 মিতানী, মিত্তান্নী, মিটানি : উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন জাতি ও রাজ্য। —*MEML*, p. 323

6 ৩য় থুটমোসিস (Thutmosis III) : মিশরের ফ্যারাও ১৮শ বংশীয় রাজা। এঁর সময় সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। মেডিকোর যুদ্ধে জয়লাভ করে মিশর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। প্যালেস্টাইন, ফিনিসিয়া ও এসিয়া মাইনরের তৎকালীন রাজ্যসমূহ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে।—*En. Brit.*, viii. p. 47

7 মোহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা : ১৯২১-২২ খ্রী. একটি প্রাচীন নগরকেন্দ্রিক সিন্ধুসভ্যতার সন্ধান পান ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা উত্তর-পশ্চিম ভারতে। সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলার মোহেঞ্জোদড়ো ও পঞ্জাবের মন্টগোমারী জেলার হরপ্পা নামে স্থান দুটির ধ্বংসস্তূপসমূহ হতে ভারতীয় এক সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। আনুমানিক ৩০০০ থেকে ১৫০০ খ্রী-পূ. এই সভ্যতা স্থায়ী ছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। —কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী : **প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো**, ভূমিকা পৃ. ১১

8 মার্শাল (Marshall, Sir John Hubert) (১৮৭৬—১৯৫৮) : সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার অধিকর্তা (১৯০২—১৯২৮)। জন্ম—ইংলণ্ডের চেস্টারে। শিক্ষা—ডালউইচে ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রত্নতত্ত্বে তাঁর শিক্ষাগুরু আর্থার জন ইভান্স। ভারতে তাঁর আমলে ভীটা, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, নালন্দা, বৈশালী, শ্রাবস্তী, সারনাথ, সাঁচী, তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানে উৎখননের কাজের ফলে প্রাচীন ভারতের বহু ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু তাঁর সর্বোত্তম কীর্তি প্রাক্-ইতিহাস যুগের সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রস্থলগুলিতে উৎখনন ও এই সভ্যতার প্রকৃত মূল্যায়ন। অবশ্য মোহেঞ্জোদড়োতে উক্ত সভ্যতার নিদর্শন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ই আবিষ্কার করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি স্বদেশে

প্রত্যাগমন করেন। তিনি যৌথভাবে Mohenjodaro and The Indus Civilisation, 3 vols. (1931), The Monuments of Sanchi, 3 vols. (1940), Taxila, 3 vols. (1951) সম্পাদনা করেন। তাঁর গ্রন্থ—Excavations at Taxila : The Stupas and Monasteries at Jaulian (১৯২১), ই.। —ভা-কো.

9 ব্রাহুই ভাষা : ব্রাহুইরা প্রাচীন বালুচি-গোত্রীয়, দ্রবিড় থেকে কিছু ভিন্ন। —*D.R. Bhandarkar Volume* (1940), p. 115

10 নেগ্রিটো : ভারতীয় উপমহাদেশের আর্যপূর্ব প্রাচীন প্রধান ছয়টি জাতির মধ্যে প্রাচীনতম সভ্যজাতি। এরা কৃষ্ণবর্ণ খর্বকায়। বর্তমান-কালে আসল নেগ্রিটো জাতির নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মিনকোপি জাতিতে, মলয় উপদ্বীপ ও পূর্বসুমাত্রায় সেমাং জাতিতে। ভারতে নেগ্রিটো জাতীয় কালো মানুষ এখন একপ্রকার বিলুপ্ত হয়েছে বলা যেতে পারে। —রোমিলা থাপার, পৃ. ১১

11 মেনেন্দর : মিনান্দার, বৌদ্ধগ্রন্থে তাঁর নাম বলা হয়েছে মিলিন্দ। বিদেশীয় গ্রীকেরা কপিশা, গান্ধার, শাকল ও পঞ্জাবের বহুস্থানে রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। গ্রীসের দিমিত্রিয় বংশীয় মেনেন্দর অন্ধ্রদেশের এক প্রসিদ্ধ রাজা। ইনি ইন্দো-গ্রীক রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন। এঁর রাজধানী ছিল শাকল (শিয়ালকোট) বা শাগল। মেনেন্দার ইন্দো-গ্রীক শক্তিকে আরও দুর্ধর্ষ করে তুললেন। তাঁর অধিকারে ছিল সোয়াট উপত্যকা, হাজারা জেলা ও ইরাবতী (রাভি) নদী পর্যন্ত সমগ্র পঞ্জাব। তাঁর মৃত্যুকাল ১১৫ খ্রী-পূ.। পতঞ্জলির সমসাময়িক। শোনা যায় তাঁর জনপ্রিয়তা এত বেশী ছিল যে তাঁর দেহাবশিষ্ট ভস্ম সংগ্রহের জন্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন শহরগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গিয়েছিল। 'মিলিন্দ পঞহো' (মিলিন্দ প্রশ্ন) নামে পালিভাষায় এক গ্রন্থে শাকল বা শাগল দেশের রাজার সঙ্গে বৌদ্ধাচার্য নাগসেনের কথোপকথন লিপিবদ্ধ আছে ও কাশ্মীরদেশীয় কবি ক্ষেমেন্দ্র-রচিত 'বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা'য় মিলিন্দের নাম উল্লেখ আছে। মিলিন্দ নিঃসন্দেহে একজন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজা ছিলেন। —Goldstüker : *Panini, his place*

in Sanskrit Literature, p. 234, *DCI.*, pp. 16-17; রোমিলা থাপার, পৃ. ৬৭, *VSEHI*, pp. 213, 225

12 হেলিওডোরস (Heliodoros): একজন গ্রীক দূত। ইনি তক্ষশিলাবাসী দিওনের (Dion) পুত্র। মহারাজ আন্তি অলিকিতের কাছ থেকে হেলিওডোরস শুঙ্গবংশের অন্যতম রাজা কাশীপুত্র ভাগভদ্রের কাছে (তাঁর রাজত্বের ১৪ বছরে) আসেন। ১৯০৯ খ্রী. ভিলসা নগরে আবিষ্কৃত এক শিলাস্তম্ভের খোদিত লিপিতে জানা যায় হেলিওডোরস বাসুদেবের গরুড়ধ্বজ স্তম্ভ স্থাপন করেন। এই গ্রীক দূত হেলিওডোরস বাসুদেবের ভক্ত ছিলেন। গ্রীক হওয়া সত্ত্বেও ইনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। —রোমিলা থাপার, পৃ. ৬৮, *VSEHI*, p. 240

13 শাতকর্ণি (শাতকর্ণী, সাতকর্ণী): সাতবাহন রাজাদের মধ্যে যিনি প্রথম বিখ্যাত হন, তিনি গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী। চতুর্দিকে সামরিক শক্তি বিস্তার করে তিনি 'পশ্চিমাঞ্চলের প্রভু' খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সাঁচির একটি শিলালিপিতে তাঁকে 'রাজন্ শ্রীশাতকর্ণী' বলা হয়েছে। 'দক্ষিণাপথপতি' উপাধিও তিনি গ্রহণ করেন। শাতকর্ণী ব্রাহ্মণ্যবাদের সমর্থক ছিলেন ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন এবং শকদের উচ্ছেদ করেছিলেন।

শাতকর্ণীর পুত্র বাশিষ্ঠীপুত্র লিখে গেছেন, 'গৌতমীপুত্র শকদের উচ্ছেদ করে ক্ষত্রিয় গর্ব খর্ব করেছিলেন। তিনি চার বর্ণের মধ্যে মিশ্রণও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে ব্রাহ্মণদের স্বার্থরক্ষার জন্য নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। শাতকর্ণীর মা একটি শিলালিপিতে লিখেছেন—গৌতমীপুত্র শক, যবন ও পল্লবদের বিতাড়িত করেছিলেন। খ্রী. দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধ তাঁর রাজত্বকাল। শাতকর্ণীর বিধবা মহিষী নয়নিকা নানাঘাট-লিপি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। সেই নানাঘাট-লিপিতে শাতকর্ণীকে 'এক-ব্রাহ্মণ' বলা হয়েছে। —*JRAS.* (*n. s.*), (1390), p. 639; *DCI*, pp. 14, 16

14 উসভদাত (উসভদত্ত, ঋষভদত্ত, প্রা. উসভদাত): উসভদাত নামটির অপেক্ষা উসভদত্তের প্রচলন বেশী। ডাফের Chronology of India-য় উসভদত্ত বন্ধনী মধ্যে (উসভদাত) এবং প্রাকৃত অভিধানে ঋষভদত্ত বন্ধনী (উসভদাত) আছে। উসভদাত ছিলেন শক রাজা

দিনিকের পুত্র ও ক্ষত্রপ রাজা নহপানের জামাতা। এঁর রাজত্বকাল খ্রী. প্রথম শতক। নাসিকের একটি গুহায় তাঁর আদেশে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি আছে। তা থেকে জানা যায়—রাজা উসভদাত একটি তন্তুবায় সংঘকে ঐ গুহা ও তিন হাজার কাহাপন দান করেন। ঐ অর্থ বিনিয়োগের সুদ হতে, যে কোন সম্প্রদায় বা অঞ্চলের সংঘ-সদস্যের গুহায় থাকার সময় পোষাক ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহিত হবে। —*BASSI*, i. p. 4. ; *DCI*. p. 23, রোমিলা থাপার, পৃ. ৭১, ৭৩

15 রুদ্রদামা (রুদ্রদামন): সুবিখ্যাত শক রাজা। তিনি কচ্ছ অঞ্চলের অধিবাসী। জুনাগড়ে প্রাপ্ত ১৫০ খ্রীস্টাব্দের একটি দীর্ঘ শিলালিপিতে তাঁর কীর্তিকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

তিনি দৃঢ় হস্তে ধর্মকে পালন করেছেন। তিনি নানা বিদ্যা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী; যুদ্ধে কৌশলী ও দ্রুতগতি ও অত্যন্ত সুলক্ষণযুক্ত; 'মহাক্ষত্রপ' উপাধিতে ভূষিত।

সাতবাহন রাজাদের সঙ্গে শকদের বহুদিনের বৈরিতা দূর করার উদ্দেশ্যে নিজ কন্যার সঙ্গে সাতবাহন রাজার বিবাহ দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্পর্কের তেমন উন্নতি হয় নি। পরবর্তী কালে সাতবাহন রাজাকে তিনি দুবার যুদ্ধে পরাজিত করেন। কিন্তু নিকট সম্পর্কের জন্য উচ্ছেদ করেন নি। —রোমিলা থাপার, পৃ. ৭০-৭৩, *VSEHI* pp. 210, 217

অসুর-জাতি

বেদপন্থী ও অবেস্তাপন্থীদের পূর্বপুরুষগণ পূর্বে এক স্থানে এক সঙ্গে বাস করিতেন। তাঁহারা যেখানে থাকিতেন, তাঁহাকে তাঁহারা 'স্বর্গ' বলিতেন। বেদপন্থীদের পূর্বপুরুষগণ আপনাদিগকে 'দেব' বলিতেন ও অন্য দলকে 'অসুর' নামে পরিচিত করিতেন। তখন দেব ও অসুর 'ঈশ্বর' (Lord) অর্থেই প্রযুক্ত হইত। দেব ও অসুরদের পরস্পর বেশ মিল ছিল। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়া বুঝিতেন। সহোদর ভ্রাতা না হইলে তখন 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়া পরিচয় দিবার প্রথা ছিল। এখন যেমন পিতৃব্য বলিলে বাপ না বুঝাইয়া খুড়া, জ্যেঠা বুঝায়, তখন তেমনই ভ্রাতৃব্য বলিলে সহোদর ভ্রাতা না বুঝাইয়া অপর সকলকে বুঝাইত। ক্রমে উভয় দলের মধ্যে ধর্মমতের পার্থক্য ঘটিল। ভৃগু অগ্নিপূজার প্রবর্তন করিলেন। দেবগণ যজ্ঞ করিতে সুরু করিলেন। প্রথম প্রথম অসুররাও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন, পরে তাঁহারা যজ্ঞে রাজি হইলেন না। শেষে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, দেব বলিলে যজ্ঞকারী মাত্রই বুঝাইত। শতপথ-ব্রাহ্মণ তাই দেবের সংজ্ঞা দিয়াছেন—'যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ' (১.৫.৫.২৬)। অসুররা সারা বৈদিক সাহিত্যে স্বর্গবাসী। প্রথম প্রথম 'অসুর' শব্দ বৈদিক যুগে দেবতাদের নিকট খুব শ্রদ্ধাবাচক, মর্যাদাব্যঞ্জক ছিল। বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে যাঁহারা খুব বড় হইতেন, তাঁহারা 'অসুর' উপাধিতে ভূষিত হইতেন। মরুৎ, দ্যৌ, বরুণ, ত্বষ্টা, অগ্নি, বায়ু, পূষা, সবিতা,

পর্জন্য—ইঁহারা সকলেই বেদে সম্মানসূচক 'অসুর' পদবাচ্য ছিলেন। ইঁহাদের অলৌকিক শক্তি ছিল বলিয়া ইঁহাদিগকে বৈদিক ঋষিরা অসুর বলিতেন।

মরুৎ (ঋ. ১.৬৪.২)—তে জজ্ঞিরে দিব ঋষ্বাস উক্ষণো রুদ্রস্য মর্যাসুরাঃ অরেপসঃ।

দ্যৌ (ঋ. ১.৩১.১)—ইংদ্রায় হি দৌরসুরো ইত্যাদি।

ইন্দ্র (ঋ. ১.৫৪.৩)—বৃহচ্ছ্রবা অসুরো বর্হনা কৃতঃ পুরো হরিভ্যাং বৃষভো রথো হি যঃ।

বরুণ (ঋ. ২.২৭.১০)—ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা অসুর যে চ মর্তাঃ।

ত্বষ্টা (ঋ. ১.১১০.৩)—ত্যং চিচ্চমসমসুরস্য ভক্ষণমেকং ইত্যাদি।

অগ্নি (ঋ. ৫.১২.১)—প্রাগ্নয়ে বৃহতে যজ্ঞিয়ায় ঋতস্য বৃষ্ণে অসুরায় মন্ম।

বায়ু (ঋ. ৫.৪২.১)—শৃণোত্বতুর্তপংথা অসুরো ময়োভূঃ।

পূষা (ঋ. ৫.৫১.১১)—স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি ইত্যাদি।

সবিতা (ঋ. ৫.৪৯.২)—প্রতিপ্রয়াণমসুরস্য বিদ্বান্ত সূক্তৈর্দেবং সবিতারং দুবস্য।

পর্জন্য (ঋ. ৫.৬৩.৩)—চিত্রেভিরভ্রৈরুপ তিষ্ঠথো রবং দ্যাং বর্ষয়থো অসুরস্য মায়য়া।

ইন্দ্র পূর্বে বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। শুষ্ণাসুর তাঁহার প্রতি মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে প্রতিমায়ায় বধ করিয়াছিলেন। 'মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং শুষ্ণমবাতিরঃ।'—ঋ. ১.১১.৭

বেদে ১০৫ বার অসুর শব্দ আছে, সবই ভাল অর্থে প্রযুক্ত, কেবল ১৫ বার দুষ্ট অর্থে প্রযুক্ত। যত দিন দেব ও অসুরে মিল ছিল, তত দিন 'অসুর' বলিলে মর্যাদা, প্রভাব বুঝাইত। কিন্তু যখন মনের অমিল হইতে লাগিল, তখন উভয়ে উভয়ের প্রতি আকর্ষণ ভুলিয়া গেলেন। উভয় দলে বেশ শত্রুতাও চলিতে লাগিল। প্রথম প্রথম এক এক জন অসুরের সঙ্গে এক এক জন দেবতার যুদ্ধ হইত। শেষে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে এক দল অপর দলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে গোড়ায় অসুররা

দেবতাদের জ্বালাইয়া মারিত। শেষে দেবতারা বহু কষ্টে ছলে কৌশলে জয়ী হইলেন। এ সম্পর্কে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমের[1] উদাহরণ খুব প্রসিদ্ধ। যুদ্ধের সময় দেব ও অসুর উভয়েই ইন্দ্রকে পাইবার জন্য, তাঁহার সাহায্যের জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদে ইন্দ্র সম্পর্কে (১.৭.১০) দেবতারা বলিয়াছিলেন—'অস্মাকংস্তু কেবলঃ।' অসুরদের কিক্ষিপ্ত করিয়া দিবার জন্য ইন্দ্রকে তাঁহারা বার বার ডাকিয়াছেন (৮.৮৫.৯)

অগ্নি তাঁহাদের ভরসা দিয়াছিলেন যে, অসুরদের বিধ্বস্ত করিবার জন্য তিনি মন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিবেন (১০. ৫৩. ৪)। অসুরদের বড় বড় বীর ছিল। পিপ্রু অসুরের, শম্বর অসুরের অনেকগুলি দুর্গ ছিল। শম্বরের ছিল অন্তত ৯০টি (১. ১৩০. ৭) কিংবা ৯৯টি দুর্গ (২. ১৯. ৬)। বর্চী অসুরের লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা ছিল। নিজেও খুব তিনি দুর্দান্ত। দেবতাদের অনেক সময় এই সব দুর্দান্ত অসুরদের উপর নির্ভরও করিতে হইত (১০. ১৫১. ৩)। যখন যুদ্ধ বাধিত, ইন্দ্র, বিষ্ণু, অগ্নি, সূর্য দেবতার হইয়া যুদ্ধ করিতেন। ইন্দ্র অসুর পিপ্রুর কেল্লা নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন (১০. ১৩৮. ৩)। ইন্দ্র-বিষ্ণু অসুর বর্চীর লক্ষ বীরকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন (৭. ৯৯. ৫)। অসুরদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া ইন্দ্র (৬. ২২. ৪), অগ্নি (৭. ১৩. ১) ও সূর্যের (১০. ১৭০. ২) নাম হইয়াছিল—'অসুরহা'। রুদ্র ছিলেন নিজে মহা অসুর (৫. ৪২. ১১); অসুররা তাঁহার ভক্ত ছিল। দেবাসুরের যুদ্ধের পর হইতে যখন দেবতারা অসুরদের একেবারে হটাইয়া দিলেন (১০. ১৫৭. ৪), তখন দেবতারা অসুরদের শত্রু বলিয়াই উল্লেখ করিতেন, তাঁহাদের ভ্রাতৃব্য বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেন। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে তাই দেখিতে পাই—

'এতয়া বৈ দেবা অসুরান্নতৎ ক্রামন্নতি পাপ্মানং ভ্রাতৃব্যং ক্রামতি য এতয়া স্তুতে।'

এ সময় আর ভ্রাতৃব্য ভাই ছিল না; ভাষ্যকার বলেন, ভ্রাতৃব্য শব্দের অর্থ শত্রু। পরে যে কারণেই হউক, এমন হইল যে, দুই দলে কোন সম্পর্কই রহিল না।

অসুরদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহারা গুহ্যবিদ্যা জানিতেন। এই

বিদ্যার নাম ছিল—মায়া। ইহারই প্রভাবে তাঁহারা অসামান্য শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

যখন দেবতারা অসুরদের নিকট হইতে একবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, সেই সময়ে বা তাহার পরে যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, সেগুলি অসুরদিগকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন না। শতপথ-ব্রাহ্মণে দেখা যায়, দিন দেবতাদের, আর অসুরদের সঙ্গে অন্ধকার (২. ৪. ২. ৫)। তৈত্তিরীয়-সংহিতাও বলেন, রাত্রি অসুরদের (১. ৫৯. ২)। তবে এ কথা সকলেই বলেন, অসুররা প্রজাপতির সন্তান। পূর্বে তাঁহারা দেবতাদের সমান ছিলেন। বৈদিক যুগের শেষাশেষি অসুর বলিলে আর দেবতা বুঝাইত না, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অসুর শব্দের একেবারে অর্থ পরিবর্তিত হইয়া গিয়া দাঁড়াইল—অপদেবতা। শতপথব্রাহ্মণে অসুরদিগকে রাক্ষস বলা হইয়াছে। ইহারা দেবনিন্দক। তবে প্রজাপতি যে দেব ও অসুরের পিতা, শতপথ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শতপথ অসুরদিগকে মেরুনিম্নবাসী বলিয়াছেন। মায়া অসুরদের বেদ। পরাবসু ইঁহাদের হোতা। ইহাতে নমুচি অসুর, স্বর্ভানু অসুর, কপিল অসুর, কালকাঙ্গ অসুর প্রভৃতির কথা আছে। কালকাঙ্গ অসুর রাশীকৃত অগ্নিবেদী করিয়া স্বর্গে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পুরাণে অসুরদিগের অনেক কথা আছে। পুরাণ বর্বরদিগকে অসুর ও রাক্ষস এই সাধারণ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অসুরগণ রুদ্রোপাসক ছিলেন। তাঁহাদের শৈবও বলা যাইতে পারে। লিঙ্গপুরাণ বলেন, অসুর ও রাক্ষসগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম করিয়া দেবাদিদেব শিবের নিকট কয়েকটি বর পান। শিবের রক্ষিত হইয়া তাঁহারা দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন ও তাঁহাদিগকে পরাভূত করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ শিবের নিকট এক জন বিঘ্নবিনাশকারী বিঘ্নেশ্বরকে সৃষ্টি করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। বিঘ্নেশ্বর অসুর ও রাক্ষসদের পুণ্যসঞ্চয়ে বাধা জন্মাইবেন, তাহা হইলে তাঁহারা আর শিবের নিকট বর পাইবেন না। শিব সন্তুষ্ট হইলেন। পার্বতীর গর্ভে শিবাংশ বিঘ্নেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়া বিঘ্ন জন্মাইতে ও দেবতাদের শুভফল উৎপাদন করিতে লাগিলেন।

মৎস্যপুরাণ বলেন, দেবাসুরে ১২ বার যুদ্ধ হয় (৩৯—৫২ অ.)। (৫৮ অ.) প্রহ্লাদ যখন পরাজিত হন, তখন ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হন। অসুরগুরু শুক্র অসুরদের ত্যাগ করিয়া দেবতাদের কাছে যান। অসুরগণ প্রার্থনা করিলেন যেন তিনি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ না করেন। শুক্র সাহায্য করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করেন (৬০ অ.)। কিন্তু দেবতারা আবার অসুরদিগকে আক্রমণ করেন। অসুররা শুক্রের নিকট গমন করায় আক্রমণকারীরা চলিয়া যান। শুক্র তাঁহাদের পূর্বকৃত অপরাধের কথা স্মরণ করাইয়া সৌভাগ্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে বলেন। তিনি আরও বলেন, 'যাও শিবের ধ্যান কর; শিবের নিকট কয়েকখানি শস্ত্র প্রার্থনা কর, তাহাদেরই প্রভাবে তোমাদের জয় হইবে' (৬৫ অ.)। তখন তাঁহারা দেবতাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর শত্রুতাচরণ করিবেন না; তাঁহারা তপ করিবেন। শুক্র মহাদেবের নিকট গিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী গ্রন্থ প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব তাঁহাকে একটি কঠিন অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন। ১ হাজার বৎসর ঊর্ধ্বপদ হইয়া তাঁহাকে তিনি তপ করিতে বলেন। শুক্র তাহাতেই রাজি হইলেন। অসুরদের এই নিঃসহায় অবস্থার সুযোগ পাইয়া দেবতারা তাঁহাদের আক্রমণ করিলেন। অসুররা শুক্রের মাতার নিকট গেলেন। তিনিও সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু দেবতারা আবার আক্রমণ করিলেন। শুক্রমাতা তখন মায়াবলে ইন্দ্রকে অসহায় করিলেন। ইত্যাদি—

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, অসুর হয়গ্রীব ব্রহ্মার নিকট হইতে বেদ অপহরণ করেন। বিষ্ণু তাঁহাকে হত্যা করেন। ভাগবতপুরাণে দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনের কথা আছে। কূর্ম ও বায়ুপুরাণে হিরণ্যকশিপুর কাহিনী আছে। ইনিও অসুর। এইরূপ পুরাণাদিতে অসুরদের বহু কথাই আছে। মহাভারতে বাণাসুরের কথা আছে। বাণাসুর রুদ্রোপাসক। তিনি বাণপ্রতীকে লিঙ্গোপাসনা করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম 'বাণ' হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ তাঁহাকে দেব রুদ্রোপাসক বলিয়াছেন। হরিবংশ, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ তাঁহাকে 'বাণরাজ' বলিয়াছেন। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ তাঁহাকে 'ইষুত্রিকাণ্ড' বলিয়াছেন। বাণরাজ ও তাঁহার অনুব্রত

অসুররা বাণেরই রুদ্রোপাসনা করিতেন। মূর্তিতত্ত্বে যেখানে অসুর থাকে, তাহার হাতে একটি বাণ দিবার ব্যবস্থা আছে।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ প্রতীচ্য সব স্থাপর্ণগণ সম্পর্কে বলিয়াছেন,—'পূতায়ৈ বাচো বদিতারঃ'। ইঁহারা পবিত্র ভাষা বলিতেন। পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণে ব্রাত্যগণের ভাষা জঘন্য বলিয়া তাহার নিন্দা আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে (৩.২.১.২৪) অসুরদের ভাষার নিন্দা করা হইয়াছে। আর ব্রাহ্মণগণ যাহাতে ভাষা ম্লেচ্ছিত না করেন, তজ্জন্য উপদেশ করা হইয়াছে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের উক্তি তাই 'ন ব্রাহ্মণো ম্লেচ্ছেৎ'। পতঞ্জলিও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—'তেঽসুরা হেলয়ো হেলয়ো ইতি কুর্বন্তঃ পরাবভূবুঃ তস্মাৎ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতং বৈ নাপভাষিতং বৈ।' পাণিনি (৬.১.১৬০) ম্লেচ্ছ বা অসুরদের শব্দকে 'উঞ্ছ্য' শব্দের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। পাণিনির সময়ে অসুররা বিশেষ যোদ্ধৃজাতি ছিল। যোদ্ধ পর্শুজাতির সঙ্গে পশুগণের ম্লেচ্ছভাষাভাষী অসুরের উল্লেখ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে ম্লেচ্ছ বলিতে বর্বর (barbarian) বুঝাইত।

সংস্কৃতে 'অসুর' শব্দের ব্যাখ্যা

পুরাণে অসুর শব্দ অসু (অর্থাৎ প্রাণ) হইতে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। বায়ুপুরাণের নবম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে প্রজাপতির জঘন হইতে অসুরদের উৎপত্তি।

'ততোঽস্য জঘনাৎ পূর্বমসুরা জজ্ঞিরে সুতাঃ।
অসুঃ প্রাণঃ স্মৃতো বিপ্রাস্তজ্জন্মানস্ততোঽসুরাঃ॥'—৪

ঋগ্বেদে 'অসুর' শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। ১. ৩৫. ৭ ঋকের ভাষ্যে সায়নাচার্য বলিয়াছেন—'অসুরঃ অসু ক্ষেপণে অস্যতি শত্রূন্ ইত্যসুরঃ। অসেরুরন্।' উ, ১.৪৩ নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বম্। যদ্বা। অসূন্ প্রাণান্ রাতি দদাতি ইত্যসুরঃ।'

আরও আমরা পাই—

'সমৎসরেণাসুর ইত্যুপেয়ুষা চিরায় নাম্নঃ প্রথমাভিধেয়তাম্।
ভয়স্য পূর্বাবতরস্তরস্বিনা মনঃসু
যেন দ্যুসদাং ন্যধীয়ত॥'—৪.৩

যে উড়াইয়া দেয়, তাহাকে অসুর বলে। বহুকাল পরে এই বলবান দানব অসুরনামের প্রকৃত পাত্র হইয়া উঠিল ; হিংসায় দেবগণের মনে ভয়ের প্রথম সঞ্চার হইল।

যাস্কের নিরুক্তে (৩. ৮) অসুর শব্দের একটি নিরুক্তি দেওয়া হইয়াছে। যাস্ক বলেন, ব্রহ্মা 'সু' অর্থাৎ যাহা ভাল, তাহা হইতে 'সুরে'র উৎপত্তি করিয়াছেন, ইহা প্রসিদ্ধ। আর 'অসু', অর্থাৎ খারাপ ধাতু হইতে 'অসুরের' সৃষ্টি করিয়াছেন।

বৈদিক যুগের শেষভাগে অসুররা আর্যদিগের সঙ্গে পৃথক হইয়া পড়েন এবং ভারতের গণ্ডী পার হইয়া পারস্য বা তুর্কীস্থানে গিয়া বাস করেন। আর্যগণ যখন ভারতে বেশ জাঁকিয়া বসিলেন, তখন যে সমস্ত অসুর ভারতের বাহিরে যাইবার উপায় করিতে পারিলেন না, তখন হটিতে হটিতে প্রয়াগ, ছোটনাগপুর, মির্জাপুরের দিকে গিয়া আড্ডা গাড়িলেন। কেহ বা তিব্বত দিয়া কামরূপ গিয়া উপস্থিত হইলেন। কতক দক্ষিণ-ভারত পর্যন্ত গিয়া আশ্রয় লইলেন। যাঁহারা ভারতের বাহিরে গেলেন, তাঁহাদের প্রভাব ও পরাক্রম বৃদ্ধি পাইলে এখন হইতে ৫ হাজার বৎসর পুর্বে তাঁহারা বাবিলনের শত ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সাম্রাজ্যের নাম হয় অসুর বা আসিরিয়া। টাইগ্রীস নদীর উপকূলে অসুর নামে ইহার রাজধানীও স্থাপিত হয়। এসিয়া মাইনর হইতে ককেসস পর্বত পর্যন্ত এই অসুরদিগের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহারই কিঞ্চিৎ পুর্বে ভারতবর্ষ হইতে সুবীররা সুমেরিয়া স্থাপন করেন। মেসোপটেমীয় জাতিরা দ্রবিড়সভ্যতা অর্জন করিয়াছিল। দ্রবিড়রা ভারতবাসী। বড় বড় পণ্ডিতদের মধ্যে কাহারও কাহারও ধারণা, ভারতবাসীরা বিদেশীয় সভ্যতা ধার করিয়া আত্মসাৎ করিতে খুব পটু। আবার কাহারও বা বিশ্বাস, ভারতবাসী সভ্যতাব্যাপারে গ্রীস ও বাক্ট্রিয়ার নিকট অনেকাংশে ঋণী। ইহাদের মধ্যে আবার এক শ্রেণীর লেখক বলিয়া থাকেন যে, পারস্যপ্রভাব ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। একসময়ে যে সুমেরগণ পারস্যোপ-সাগরের অন্তরীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, একথা কিন্তু অস্বীকার করিতে পারা যায় না। আর এই সুমেররাই যে দ্রবিড়জাতীয়, তাহাতে

কোন সন্দেহ নাই। মেসোপটেমিয়ায় ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় জাতির প্রাচীন সভ্যতার যে বিস্ময়জনক নিদর্শন পাওয়া যায়, সেই সভ্যতার জন্য তাহারা সুমেরদের নিকটই ঋণী।

দ্রবিড়জাতির উৎপত্তির ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন। দ্রবিড়রা ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন জাতি। কেহ কেহ বলেন, ইহারা সর্বপ্রথমে ভারতের বাহিরে কোন দেশে বাস করিত। যদি তাহাই হয়, এখন তবে তাহাদের আদিম নিবাসের সন্ধান পাওয়া অতি দুরূহ। ইহাদের আদিম বাসস্থান সম্বন্ধে কেহই কোন কথা বলিতে পারেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে দ্রবিড় জাতি অতি প্রাচীনকাল হইতেই অবস্থিত। হনলি (Hunley)[2] মত প্রকাশ করিয়াছেন, দ্রবিড়দের অস্ট্রেলিয়ার আদিমবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। স্ক্লেটারও (Sclater)[3] অনুমান করেন, পূর্বে একটি বহু বিস্তৃত মহাদেশ ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াকে সংযুক্ত করিয়া অবস্থিত ছিল। ইহা এখন ভারত মহাসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত। স্ক্লেটারের অনুমান সত্য হইলে দ্রবিড়জাতির পক্ষে অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা বিচিত্র নহে। কিন্তু স্যর উইলিয়ম টরনর (Sir William Turner)[4] প্রমাণ করিয়াছেন যে, দ্রবিড়গণ ভারতবাসী।

বেলুচিস্তানের সুদূরবর্তী উচ্চ ভূখণ্ডের মধ্যভাগে ব্রাহুইগণের[5] বাস। ইহাদের ভাষা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহাদের ভাষার সহিত দ্রবিড় ভাষার নিকট-সম্বন্ধ। ইহা ভিন্ন ইহারা যে সুমের-বংশভুক্ত, তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গ্রীয়ারসনের[6] লিখিত মতগুলি বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দ্রবিড়দিগের মধ্যে ব্রাহুইরাই বিশেষভাবে জাতীয় ভাব বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। অতএব সুমেররা যে ভারতবর্ষ ও তন্নিকটবর্তী স্থানসকল হইতে ঐ প্রদেশে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে।

ব্রাহুইরা যদি দ্রবিড়দের জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া থাকে, তাহা হইলে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, দ্রবিড়রা পূর্বে বেলুচিস্তানেই থাকিত, সেখান হইতেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিল।

ভ্রেডেনবার্গের[7] ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে

যে, একসময়ে বেলুচিস্তানের মরুপ্রদেশ অত্যন্ত উর্বর ও জনাকীর্ণ ছিল। কিন্তু পরে জলাভাব হওয়ায় ঐ স্থান অজন্মা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়; সেইজন্য লোকে বাধ্য হইয়া অন্যত্র উপনিবেশ স্থাপন করে; সিন্ধুনদের তীরভূমি উর্বর দেখিয়া অনেকে দলে দলে সেইখানে আসিয়া বাস করে। দ্রবিড়-জাতির অন্য এক শাখা অদৃষ্টান্বেষণে পশ্চিম দিকে গমন করিয়া ইউফ্রেটিস নদের তীরে উপস্থিত হয়। ইহারা হয় পারস্যের পার্বত্যপ্রদেশ হইতে বাবিলোনিয়ার সমতল ভূমিতে অবতরণ করিয়াছিল, নয় সমুদ্রপথে বেলুচিস্তানের মাকরানের (Makran) সমুদ্রোপকূল হইতে উপস্থিত হইয়াছিল। সুমের ও দ্রবিড়দের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।[১]

ইউফ্রেটিস উপত্যকার প্রাচীন জাতিরা উচ্চ সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। সুমেরজাতিই সেই সভ্যতার পথিপ্রদর্শক। হল (H. R. Hall)[৪] এই সুমেরজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সুমের-সভ্যতা বাহির হইতে মেসোপটেমিয়ায় আনীত হয়, এরূপ অনুমান করিবারও অনেক কারণ আছে। সুমেররা যে ভারতবর্ষীয় কোন জাতি, ইহারা যে জলপথে এবং স্থলপথে পারস্যের মধ্য দিয়া ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রাসের মধ্যবর্তী উপত্যকায় উপনীত হইয়াছিল, তাহা অসম্ভব নহে। ভারতবর্ষ মানব-সভ্যতার প্রাচীনতম একটি কেন্দ্র, ঐ বিষয়ে সন্দেহ করিবার বিশেষ কিছু নাই। যে সকল অ-সেমেটিক ও অনার্য জাতি পূর্বাঞ্চল হইতে পশ্চিমাঞ্চলে সভ্যতা বিস্তার করিতে আসিয়াছিল, তাহারা এতটা ভারতীয় ভাবাপন্ন যে, তাহাদিগকে ভারতীয় জাতি বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক। হল সুমেরদিগকে বিশেষরূপে ভারতীয় ভাবাপন্ন বলিয়াই মনে করেন। বাবিলোনিয়ার প্রাচীন নগরগুলির ভূগর্ভ খনন করিয়া যে সকল ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, প্রত্নবস্তুতাত্ত্বিকগণ সেইগুলির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, দক্ষিণ-বাবিলোনিয়ার উপনিবেশ স্থাপনকারী সুমেররাই বাবিলোনীয় সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা। নগরের নিম্নতম সমতল ভূমির অভ্যন্তর খনন দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সুমের-সভ্যতা এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, লোক তাম্র ব্যবহার করিতেছিল। তেল্লায় (Tella)[৫] সুমের জাতির খ্রীস্ট জন্মের ৪ হাজার বৎসর পূর্বের তাম্রনির্মিত যন্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। ১৮৭০

খ্রীস্টাব্দে ভারতের মধ্যপ্রদেশে কতকগুলি প্রাগৈতিহাসিক তাম্রযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। দেখা যায়, বাবিলোনিয়ায় প্রাপ্ত যন্ত্রসকলের সহিত ইহাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সুমেররা নগরনির্মাণে ও জলপ্রণালী খননকার্যে বিশেষ নিপুণ ছিল। যতদূর ইতিহাসে জানিতে পারা যায়, সুমেররাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের পূর্বে নগরনির্মাণ-কৌশল আবিষ্কার করে।[২] তাহাদের প্রত্যেক নগরে একটি করিয়া নগর-দেবতা থাকিত। ইনিই নগরস্বামী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই দেবতার যিনি প্রধান পুরোহিত, তিনি বংশানুক্রমে নগর শাসন করিতেন। প্রাচীন বাবিলোনিয়ার প্রধান নগর নিপ্‌পুরে যে দেবমন্দির ছিল, তাহা এনিল (Ennil) দেবকে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। এই এনিলদেবের নামের সহিত দ্রবিড় জাতির চন্দ্রদেবের নামের বেশ মিল আছে। বাবিলোনীয় পুরাণে দ্রবিড়দের সূর্যদেবের নাম Bal পাওয়া যায়। নিপ্‌পুরের মন্দিরে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক উপকরণ পাওয়া যায়। সেইগুলির সাহায্যে নির্ধারিত হইতে পারে যে, খ্রীস্ট-জন্মের ৪ হাজার বৎসর পূর্বের সুমেরগণ বহু জনাকীর্ণ সুশাসিত নগরে বাস করিত। ঐ সময়েরও বহু পূর্বে তাহারা সভ্যতাসম্পন্ন হইয়াছিল। ঐ সময়েও তাহারা ধাতু-নির্মিত বস্তু ব্যবহার করিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, তখনও তাহারা লিখিতে জানিত।

সুমেরদের যে সকল ক্ষোদিত মূর্তি পাওয়া যায়, সেই সকল মূর্তিতে দেখা যায়, সুমেররা মুণ্ডিতমস্তক ও লোহিত পরিচ্ছদাবৃত। তাহাদের আকৃতি ও পরিচ্ছদে দ্রবিড় জাতিদের সঙ্গে এতটা মিল যে, এই উভয় জাতি যে একই সাধারণ জাতিসম্ভূত, তাহাতে সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

এই সুমেরদিগের দ্বারা মেসোপটেমিয়ায় বাবিলোনীয় ও আসিরীয় সভ্যতা সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। সুমের-আগমনের পূর্বে আসিরীয় সভ্যতা বাবিলোনীয় সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সুমের-সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া আসিরীয় সভ্যতা বাবিলোনীয় সভ্যতা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল। এই উভয় জাতির শারীরিক গঠনের পার্থক্য ছিল না। ভাষাতেও সম্বন্ধ নিকটতর ছিল। কিন্তু তাহাও শেষে জাতীয় চরিত্রে বিভিন্ন হইয়া পড়ে।

আসিরীয়গণ সবল, দৃঢ় এবং যোদ্ধজাতি, সমরসজ্জাতেই ইহাদের সভ্যতা-বিস্তার। ইহাদের বন্দীরা বড় বড় মন্দির, রাজপ্রাসাদ, প্রাচীর প্রভৃতি নির্মাণ করিত। স্ত্রীলোকরা শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি করিত। কৃষিব্যাপার ক্রীতদাসদিগের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইত। আসিরীয়গণ বীরের পূজা করিত। অস্সুর বা অসুর ইহাদের জাতীয় দেবতা। ইনি প্রথমে গ্রাম্যদেবতা ছিলেন, পরে জাতির উপাস্য হন। আসিরীয় প্রভাবের সময় এই দেবতার বলে আসিরীয় রাজা শত্রুজয় করিয়াছিলেন। ইহারা দেবতার মন্দির নির্মাণ করিত। ইহাদের লিপি বা অনুশাসনগুলি সুমেরীয় ভাষায় লিখিত। ইহাদের মধ্যে গুরুপুরোহিতের প্রাধান্য খুব বেশী ছিল। আসিরীয়গণ এক সময় এত দূর প্রভাবান্বিত হইয়াছিল যে তাহাদের শাসনদণ্ড ককেসস্ হইতে ভারতসাগর পর্যন্ত এবং ভূমধ্যসাগর হইতে গঙ্গার উপত্যকাভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই বীরজাতির শৌর্যবীর্যের প্রভাব চারিদিকে বিঘোষিত হইয়াছিল।

আসিরিয়ার প্রাচীন রাজধানীর নাম 'অস্সুর'। পূর্বে অস্সুর ইহার মাত্র গ্রাম্য দেবতা ছিল। আসিরিয়া যেমন মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল, অমনই তাহার গ্রাম্য-দেবতা জাতীয় দেবতায় পরিণত হইল। কিন্তু অস্সুর নাম অক্ষুণ্ণ রহিল। এই দেবতা একটু জটিল রকমের ছিল। ইহার উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল, তাহাও সমস্যার বিষয়।

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা নানা রকমে অসুর শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন যে, অস্সুর দেবতা সুমেরিয়া হইতে সমানীত হইয়াছিল। এই কথা বলিবার পক্ষে একটা যুক্তি আছে। বাইবেলের Genesis-এর দশম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে পাওয়া যায়,—'Out of that kind (shiner) went forth Asshur, and builded Nineveh' Delitzsch[10] ও Jastrow[11] Asshur বা 'Ashur-কে Ashir-এর সহিত অভিন্ন মনে করেন। অস্সুর হয় ত Etana[12] বা Gilgamesh[13]-এর মত একজন বীর ছিলেন। ইঁহারই নাম হইতে অস্সুর নাম হইয়াছে। আসিরীয় লিপির অক্ষরগুলি শরমণ্ডিত। আসিরীয়গণ 'শ'র স্থানে 'স' উচ্চারণ করিত আর 'অস্সুর' ও 'অসুর' উভয় পদই ব্যবহার

করিত। দেববাচক অস্সুরের বানানে দুইটি শান্বিত শর। কিন্তু কোথাও আবার একটি শরও দেখা যায়। ঐরূপ শান্বিত শর আমাদের 'স' স্থানেই ব্যবহার করা হইত। কাজেই আসিরীয়গণ যে অসুর শব্দ ব্যবহার করিত, তাহা বলিতে পারা যায়। অসুর শব্দ হইতে আরও অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। 'অসরিদ' (asarid), 'অসরিদুত' (asariduta) 'অসরিদ্দন' (asariddan), 'অসুরিতে' (asurite), 'অসর্রিতে' (asarrite), 'টেলসুর্রি' (telasurri) পদগুলি সবই 'অস্সুর' হইতে ব্যুৎপন্ন। এই সকল পদে দুইটি 'স'র একটি সমূলে বিলুপ্ত। সুতরাং অসুর ও অস্সুর লইয়া বিশেষ গোলে পড়িতে হয় না। আসিরিয়ার ভাষায় অস্সুর বা অসুর শব্দ মর্যাদাসূচক। ঐ শব্দ হইতে জাত অসরিদ শব্দের অর্থ প্রধান, বিখ্যাত; অসরিদুতের অর্থ প্রাধান্য, খ্যাতি; অসরিদ্দনের অর্থ প্রধান; অসুরিতে বলিলেও প্রধাণ বুঝায়। অসর্রিতের অর্থ উচ্চ; টেলসুর্রি একটি উন্নত বা বিখ্যাত দেশের নাম।

ভারতীয় অসুর ও আসিরীয় অসুর যে একসময় এক জাতি ছিল, তাহা বলিবার পক্ষে কয়েকটি প্রমাণ দিতে পারা যায়।

প্রথমত দেখিতে পাওয়া যায় যে, আসিরীয় অসুররা তাঁহাদের শ্মশান তৈয়ার করিতেন দুই রকমে। এক রকম শ্মশান ছিল তাঁবুর আকারের; আর এক প্রকার শ্মশান ছিল ডিম্বাকৃতি মৃৎপাত্রাকারের। এদিকে আমরা শতপথ-ব্রাহ্মণে দেখি, দেবতাদের শ্মশান ছিল চতুরস্রাকার, আর এক-শ্রেণীর অসুরদের শ্মশান গোলাকৃতি ছিল। 'যা আসুর্য প্রাচ্যাস্বদ যে ত্বৎ পরিমণ্ডলানি (শ্মশানানি কুর্বতে)'—১৩.৮.১.৫। এই প্রাচ্য অসুররা কাহারা এবং কোথায় থাকিত, এখন স্থির করা সহজ নহে। কোন কোন পণ্ডিত প্রাচ্য অর্থে মগধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন, শতপথের লেখক মিথিলাবাসী। তাঁহার উল্লিখিত প্রাচ্যদেশ বলিলে মিথিলা হইতে পূর্বদিগ্‌বর্তী কোন স্থান বুঝিতে হইবে। বিশেষত প্রাচ্য এবং মগধ পৃথক পৃথক দেশ বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ থাকায়, প্রাচ্য অর্থে মগধ ধরিয়া লওয়া সঙ্গত নহে। যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ভারতীয় অসুর ও আসিরীয় অসুরদের শ্মশান একই রকমে হইত।

দ্বিতীয়ত—আসিরীয় অসুররা মার্ডুকের প্রতীক-পূজা করিত। এই প্রতীক বাণাকৃতি। ইহারা Storm God-এর উপাসনা করিত। ভারতীয় অসুরগণ ছিল রুদ্রোপাসক। বেদে রুদ্রও Storm God। অসুরদের উপাসনার প্রতীক যে বাণ ছিল, তাহা আমরা পূর্বে বাণাসুর প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। তাহার পর ভারতীয় অসুরদের বিদ্যা ছিল মায়া। আসিরীয় অসুরগণও ইহার যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে G. Smith[14] 'Assyrian Discoveries' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেব-দেবীর মূর্তি আছে, এগুলি যাদুতে ব্যবহৃত হইত। British Museum, Bab. Room-এ (Nos. 996—1009) সেগুলি রক্ষিত আছে। এই মিউজিয়মে আর একটি bronze রাক্ষস-মূর্তি আছে (No. 574); এটিও যাদুতে ব্যবহৃত হইত। ইহারা যে নানা রকমের রক্ষাকবচ ব্যবহার করিত, তাহার বহু নিদর্শন এখন পাওয়া গিয়াছে। (Western Asiatic Inscriptions, 11. 67. r. 29 দ্র.।)

ভারতীয় অসুরগণ দুর্গ-নির্মাণপটু ছিল। বেদে তাহার বহু নিদর্শন আছে। আসিরীয় অসুররাও এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। তাহার পর মিটানি রাজ্যের সহিত যে আসিরীয় রাজ্যের যুদ্ধব্যাপার, তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। Tel-el-Amarna[15] হইতে Tusratta[16] যে পত্রগুলি মিসরের তৃতীয় Amenhotep[17] কে লিখিয়াছিলেন, সেগুলি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলির সময় boghas-koi[18] লিপির সময়ের অনুরূপ। এই পত্রগুলিতে উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়ায় মিটানি জাতির উল্লেখ আছে। এখানে যে সকল রাজা রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও নামও পাওয়া যায়। এই রাজাদের মধ্যে তুস্‌রত্ত, অর্ততম, সুত্তর্ন, অর্তসুমর প্রভৃতি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও নাসত্যের পূজা করিতেন, তাহারও বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। সে অনেক কালের কথা। এগুলি যে আর্য নাম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহার পর ৫ শত বৎসর কাশীয় জাতি (১৭৪৬—১১৮০ খ্রী-পূ.) মিডিয়া হইতে গিয়া সমগ্র বাবিলন অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরও রাজাদের ও দেবতাদের নাম আর্য

নাম। ইঁহাদের Shurias, Marytas সূর্য ও মরুৎ। Simalia আর্যদের হিমালয়। অনেক পরে অসুরবনিপালের লাইব্রেরীতে (৭০০ খ্রী-পূ.) আসিরিয়ার ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে যে সকল দেবতা পূজিত হইতেন, তাঁহাদের একটি তালিকা পাওয়া গিয়াছে। ৭ জন ভাল angel এবং ৭ জন খারাপ spirit-এর পূর্বেই একটি নাম আছে—Assara-Mazas। Assara-Mazas যে অসুর মজদা, সে বিষয়ে কোন্ সন্দেহ নাই। কেন না, ইঁহার নাম ৭ জন Amesha spentas ও ৭ জন Daivaর সঙ্গে থাকে। এখানেও তাই। ইরানীদের অসুর শব্দ ও অহুর শব্দের মত মর্যাদামূলক।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া আসিরীয় অসুরদিগকে ভারতীয় অসুরদের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। তবে এ কথা স্বীকার্য, প্রমাণের জন্য আরও উপাদান সংগ্রহ করা আবশ্যক।

এখন একটা মস্ত কথা বিচার্য। আসিরীয় লিপিগুলি পাঠ করিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পূর্বকালে ইঁহারা তাম্রপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁহাদের ব্যবহার্য তাম্র এসিয়া মাইনর হইতে আনিতেন। বর্তমান ভারতে আমরা একটি জাতি দেখিতে পাই। এই জাতির নামও অসুর। ইহারা ছোটনাগপুরে বাস করে। ইহাদের সংখ্যা ৪ হাজার ৮ শত ৯৪। ইহারা আজও প্রাথমিক জাতির ন্যায় কাঠের বুমরাং অস্ত্র ব্যবহার করে। জাতি-তত্ত্বে ইহারা কোলেরীয়। প্রাচীনকালের বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত অসুরদের ইহারা বংশধর কি না, তাহা বলিবার মত কোন প্রমাণ নাই। তবে ইহারা যে প্রাচীন জাতি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। উত্তর-পশ্চিম হইতে কোলেরীয় ও দ্রবিড় জাতি ছোটনাগপুরে প্রবেশ করিবার বহু পূর্বে উত্তর-ভারতের কোন স্থান হইতে আর্যদিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া ইহারা সম্পূর্ণ-রূপে না হইলেও আংশিকভাবে এখানে বাস করিত। ছোটনাগপুরে এখনও তামার খনির চিহ্ন পাওয়া যায়। এখানকার প্রবাদ যে, অসুররাই এই তামার খনিতে কাজ করিত। তামার খনিগুলিও প্রাচীন। যে সময় সে খনিগুলিতে কাজ হইত, তাহা এখন হইতে ২ হাজার বৎসরেরও কম নহে। কোলরা যখন আর্যদের ভয়ে ছোটনাগপুরের পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল, তখন তাহারা এখানে এই অসুরদিগকে দেখে।

তমোলুক অতি প্রাচীন স্থান। ইহার প্রাচীন নাম তাম্রলিপ্তি। তাম্রলিপ্তি নামের কারণ এতদিন ঠিক ধরা পড়ে নাই। কেহ কেহ ভাবিতেন, তামল বা দামল জাতিরা এখানে বাস করিত বলিয়া ইহার নাম তামলিপ্তি বা দামলিপ্তি। ঐ নামেও যে এক সময়ে তমোলুকের প্রসিদ্ধি ছিল, তাহারও সাহিত্যিকপ্রমাণ আছে। তামল-দ্রবিড়গণ এক সময়ে তমোলুক অধিকার করিয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু ইহাদের অধিকারেরও পূর্বে তমোলুকের নাম ছিল তাম্রলিপ্তি। তামার লেপা (তাম্র দ্বারা লিপ্ত) বলিয়া ইহার নাম হইয়াছিল তাম্রলিপ্তি। কিছু কাল পূর্বে তমোলুকের নিকট সিংভুম ও ধলভূমের মধ্যে তামার বিশেষ বিশেষ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সিংভুম হইতে গাঙপুর স্টেট পর্যন্ত ৪০ ক্রোশ ব্যাপিয়া তামার খনি ছিল। ভূতাত্ত্বিকরা এই তামার খনিগুলির নিদর্শন মাটি খুঁড়িয়া পাইয়াছেন। অনেক dolmen ও পাইয়াছিলেন। এই ৪০ ক্রোশ স্থানকে স্থানীয় লোক 'অসুরগড়' বলে। দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। পূর্ণিয়াজিলার দুলালগঞ্জ গ্রাম হইতে ইহা ৪ মাইল ও মহানন্দার সামান্য একটু পূর্বে। দুর্গটি খুব প্রাচীন। এই সমস্ত স্থানের তামা তমোলুক বন্দর দিয়াই যাইত। তমোলুক বন্দরে তামা অপর্যাপ্ত পরিমাণে থাকিত। নিজামরাজ্যেও ঠিক এইরূপ তামার খনি পাওয়া গিয়াছে। এখানেও অনেক dolmen আছে। বর্তমানে মুসলমানরা এই জায়গাকেও 'অসুরগড়' বলে। দ্রবিড়গণ ইহাকে 'রাক্ষসগুড়িয়ম্' বলে। সুপ্রাচীনকালে এখানকার তামাও তমোলুক বন্দরে আসিয়া জমা হইত। তমোলুক বন্দর দিয়া যে তামা ভারতে ও ভারতের বাহিরে যাইত, তাহা অনুমান করিবার কারণও আছে।[৩] আমরা দেখিতে পাই যে, আসিরীয় অসুররা তামা ব্যবহার করিত। তাহারা যে ভারতীয় অসুরদিগের ন্যায় তাম্রপ্রিয় জাতি, এসিয়া মাইনর হইতে তাম্র আনয়নই তাহার প্রমাণ।

তাম্রশাসনেও অসুরদের রাজত্বের কথা পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত আমি দুইটি অনুশাসনের সন্ধান জানিতে পারিয়াছি। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে কীলহর্ন ১০৮৪ বিক্রমাব্দের পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর রাজ্যপালদেবের পাদানুধ্যাত ত্রিলোচনপালের তাম্রশাসন সম্পাদন করেন।[৪] ত্রিলোচন-

পাল প্রয়াগ সন্নিকটে গঙ্গাতীরে বাসকালে অসুরাডকবিষয়ান্তর্গত লেডুণ্ডাক গ্রামে যে সমস্ত রাজপুরুষ ও ব্রাহ্মণোত্তরগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সংবাদ প্রেরণ করেন। তাম্রশাসনের কিয়দংশের পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ওঁ স্বস্তি শ্রীপ্রয়াগসমীপ-গঙ্গাতটাবাসে পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ—পরমেশ্বর--শ্রীবিজয়পালদেব--পাদানুধ্যাত--পরমভট্টারক-মহারাধিরাজ--পরমেশ্বর-শ্রীরাজ্যপালদেব-পাদানুধ্যাত-পরমভট্টারক-মহারাধিরাজ--পরমেশ্বর-শ্রীমত্রিলোচন-পালদেবঃ অসুরাডকবিষয়ে লেডুণ্ডাকগ্রামে সমুপ-গতান্ রাজপুরুষাম্ ব্রাহ্মণোত্তরাংশ্চ।

কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্রের দ্বিতীয় তাম্রশানেও অসুররাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অনুশাসনে ২০শ ছত্রে আমরা পাই :—

"অসুরেশপত্তলায়াং কমোলীগ্রামবাসিনো নিখিলজন-পদানুপগতানপি চ রাজরাজ্ঞী-যুবরাজ মন্ত্রি-পুরোহিত-প্রতীহার, সেনাপতি—"

বেহারের অন্তর্গত রাজগিরে 'জরাসন্ধকী বৈঠক' আছে। ইহা অতি প্রাচীন। ফগুর্সনের[২০] মতে ইহা প্রাক্‌মৌর্যযুগে নির্মিত। আসিরিয়ায় Birs Nimrudএর ইহা ঠিক নকল বলিলেও চলে। 'আসিরিয়ার অসুরদের সঙ্গে ভারতীয়দের আদান-প্রদান ছিল। ইহা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত।

পাদটীকা

১ Journal of the Mythic Society-তে 'First Town Planners,' শীর্ষক প্রবন্ধে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাহা সুচারুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

২ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র ঘোষ প্রণীত : *First Town Planners* দ্র.।

৩ তাম্রলিপ্তি নাম যে তামায় লেপা বলিয়া হইয়াছিল, তাহার সন্ধান ও কারণগুলি আমার বন্ধু সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়

প্রথমে আমাকে বলেন। তাঁহার এই সাহায্যের জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ? দ্রবিড় সম্পর্কেও তিনি কয়েকটি উপকরণ দিয়াছেন। সেই উপকরণগুলিও এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। সে জন্যও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

৪ Indian Antiquary, ১৮৮৯, পৃ. ৩৩।

[মাসিক বসুমতী, ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ, পৃ. ১৯১-৯৮]

প্রসঙ্গ-কথা

1 ত্রিবিক্রম—অসুররাজ বলি ত্রিলোক জয় করলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। যজ্ঞান্তে দানব্রতী বলির কাছে বিষ্ণু বামনরূপে অবতীর্ণ হয়ে ত্রিপদ পরিমিত স্থান ভিক্ষা চান। বলি রাজি হলে বামনরূপী বিষ্ণু প্রথম পদে পৃথিবী, দ্বিতীয় পদে অন্তরীক্ষ ও তৃতীয় পদে পাতাল অবরোধ করেন এবং বলিকে পাতালে প্রেরণ করেন। বিষ্ণুর এই ত্রিপাদ বিক্রমণকে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম বলা হয়।—বিষ্ণু প্রবন্ধ দ্র.

2 হর্নলি : পরিশিষ্ট দ্র.

3 Sclater : ডারউইনের বিবর্তবাদ অনুসরণ করে Sclater দেখান যে এক জাতীয় (same species) প্রাণীদের পৃথিবীর বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং এরূপ হলে ঐ বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডগুলি একদা সংযুক্ত ছিল বলে সিদ্ধান্ত হয়। ঐ তত্ত্ব অবলম্বন করে Sclater পৃথিবীর সমগ্র ভূখণ্ডকে ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করেন। —*En. Brit.*, x. p. 152, xiii. p. 964

4 Turner, Sir William : ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ্। গ্রন্থ—India Malayia : Contributions to the Craniology of the people of the Empire of India and of the Natives of Borneo, the Malayas, the Natives of Formosa and the Tibetans (Edinburgh, 1899-1907)

5 ব্রাহুই : 'ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

6 Grierson. Sir George (১৮৫১— ?) : ভাষাতত্ত্ববিদ্। বঙ্গদেশে আগমন ১৮৭৩ খ্রী.। বিহারের স্কুলসমূহের পরিদর্শক, ১৮৮০, পাটনার অতিরিক্ত কমিশনর ১৮৯৬, ভারত সরকার সহযোগে Linguistic Survey-র তত্ত্বাবধায়ক ১৮৯৮—১৯০২। তিনি বহু গ্রন্থ-

রচনা করেন তন্মধ্যে—The Languages of India (Cal. 1903), Indo-Aryan —Family Eastern Group, (Cal. 1899), Ishkashmi, Zebaki and Yazghulami, an account of the three Eranian dialects (Lond. 1920) ই.—*BDIB*, জী-কো.

7 ভ্রেড্রেনবার্গ : আমেরিকার দক্ষিণাংশে আলাবামা দেশের অন্তর্গত। —*En. Brit.*, xxiv, p. 118.

8 Hall, H. R (১৮৭৩-১৯৩০) —ব্রিটিশ পুরাতত্ত্ববিদ্। গ্রীস, ঈজীয়, প্রাচ্য দেশের পুরাতত্ত্ব নিয়ে কয়েকটি বই লিখেছেন। Catalogues of Egyptian Scarabs in the British Museum (1913) অন্যতম।

9 Tella (Tello): বাবিলনের ল্যাগেশ নগরের তেল্লো নামে স্থানে মাটির স্তূপ থেকে কারুকার্যখচিত প্রাচীন রৌপ্যভাণ্ড ও সুমের জাতির প্রাচীন সভ্যতার অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সভ্যতা প্রায় ২য় খ্রী-পূর্বাব্দের।—*MMBA*, p. 120

10 Delitzsch, Friedrich (১৮৫০— ?): জর্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ। লাইপজিগ, বার্লিন, ব্রেসলাউ প্রভৃতি কলেজের সেমিটিক ও আসিরীয় জাতির ভাষা ও পুরাতত্ত্বের অধ্যাপক।—*En. Bnit.*, viii. p. 168

11 Jastrow, Morris (১৮৬১—১৯২১): আমেরিকান প্রাচ্যবিদ্যাবিদ ও অধ্যাপক। গ্রন্থ—Aspects of Religious Belief and Practice in Babylonia and Assyria (1911), The Civilisation of Babylonia and Assyria (1916)—*En. Brit.* xii. p. 970

12 Etana: বাবিলনের দুই পৌরাণিক বীররাজার অন্যতম। এটানার বাহন ছিল ঈগল পাখি, ঠিক আমাদের গরুড় পাখির মত সেও সাপের শত্রু। এটানার বীরত্বের অনেক কাহিনী সুমের জাতির পৌরাণিক উপাখ্যানে বিবৃত আছে।—*MMBA*, pp. 163-66

13 Gilgamesh: বাবিলোনিয়ায় সুমের জাতির সুপ্রচলিত পৌরাণিক বীর। পরবর্তী কালে রূপকথার মত এর বীরত্ব কাহিনী হিব্রু,

ফিনিসিয়া, সিরিয়া, গ্রীস, রোম, এসিয়া মাইনর, এমন কি ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।—*En. Brit.*, x. p. 350 ; *MMBA*, pp. 155ff.

14 Smith, George (১৮৪০—১৮৭৬) : আসিরিয়ার ভাষা, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্। এঁর প্রধান বই—Assyrian Discoveries (6th ed. London 1876).

15 Tel-el-Amarna : 'ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

16 Tusratta : মিতান্নির রাজা। প্রাচীন মিশরের রাজা ৩য় আমেনহোতেপ ও তাঁর জামাতা অখেনতোনের সহিত পত্র বিনিময় করেছিলেন।—*MMBA*, p. 282

17 ৩য় আমেনহোতেপ (Amenhotep III) : মিশরের প্রসিদ্ধ রাজা (আনু. ১৪০০ খ্রী-পূ.)। এঁর সময় বর্তমান আনাটোরিয়ায় (খাটি দেশ) হিটাইট-রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়। সেই হিটাইট রাজ্যের ইতিহাস তেল-এল-অমরনায় প্রাপ্ত লিপি ও বোঘাস কুইয়ের আবিষ্কার হতে উদ্ধার হয়েছে।—*HCUB*

18 Boghas(z)-Koi(keui) : 'ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

19 Kielhorn, Franz : ডেকান কলেজের সংস্কৃত বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক। সংস্কৃত পুথি ও পুরাতত্ত্ব নিয়ে অনেকগুলি বই লেখেন —Classified Alphabetical Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the South Division of the Bombay Presidency (Bombay, 1869), Katyayana and Patanjali : their relation to each other, and to Panini (Bombay, 1876), Remarks on the Sikshās, with an account of the Sikshās Collected (Bombay, 1876), Report on the Search for Sanskrit Manuscripts in the Bombay Presidency (Bomb. 1880-81).—*WHIL*, pp. 25, 61, 68, 95 ই.

20 Fergusson, James (১৮০৮-৮৬): বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ। ব্যবসায়সূত্রে ভারতে আসেন, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন এবং পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু বই লেখেন—Illustrations of the Rock-cut Temples of India (Lond. 1845), History of Architecture in all countries from the earliest times to the present day, (3 vols. Lond. 1862-65), The Study of Indian Architecture (Lond. 1867). ই.।—*BDIB*

অনার্য

অনার্য শব্দে বুঝায় আর্যেতর। আর্য-সংস্কৃতির যাহা বাহিরে তাহাকেও অনার্য বলিতে পারা যায়। অনার্য বুঝিতে হইলে প্রথমে আর্য কি তাহা বুঝিতে হইবে। বর্তমান কালে আর্য এবং অনার্য—জাতি হিসাবে ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু এই আর্য শব্দ বৈদিক যুগে কখনও জাতিবাচক ছিল না। ঋগ্বেদে আর্য শব্দের প্রয়োগ বত্রিশ বার দেখিতে পাওয়া যায়। বত্রিশটি সূক্তে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য[1] এই আর্য শব্দের নয় প্রকার অর্থ করিয়াছেন। যথা,

(১) বিজ্ঞ যজ্ঞানুষ্ঠাতা
(২) বিজ্ঞ স্তোতা
(৩) বিজ্ঞ
(৪) অরণীয় বা সর্বগন্তব্য
(৫) উত্তমবর্ণ
(৬) ত্রৈবর্ণিক
(৭) মনু
(৮) কর্মযুক্ত, দেবোপাসক
(৯) কর্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ

দেখা যাইতেছে, আর্য শব্দ সর্বত্র শ্রেষ্ঠ জাতি বা সম্মানসূচক সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। আর্যেরা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন, অগ্নিপূজা করিতেন, যজ্ঞে স্তুতিপাঠ করিতেন, সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন।

অথর্ববেদে (৪.২০.৪ ; ১৯.৬২.১) 'সমগ্র মানবজাতি' অর্থে আর্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণগ্রন্থে আর্য শব্দ শূদ্রেতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকেই বুঝাইত। এই তিন বর্ণ ই যজ্ঞক্রিয়াধিকার-

প্রাপ্ত বলিয়া যে কেবল আর্য, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে। এমন কি তাঁহারা শূদ্রের সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত করিতেন না; কোন প্রয়োজন হইলে তৃতীয় ব্যক্তিকে দিয়া প্রয়োজন জানাইবার বিধি ছিল।

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ও ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে আর্য শব্দের স্বল্প প্রয়োগ দেখা যায়। 'আর্যভূমি', 'আর্যদেশ' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনু 'জাতি' অর্থে আর্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। নিরুক্তকার যাস্ক[৪] 'জাতি সংজ্ঞা' রূপে আর্য শব্দ ব্যবহার করিলেও 'আর্যঃ= ঈশ্বরপুত্রঃ' এরূপও দেখাইয়াছেন। নিঘন্টুকার ঈশ্বরার্থে আর্যশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাহা অর্য শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ঞ্চ প্রত্যয় করিয়া আর্য=ঈশ্বরপুত্র এরূপ অর্থ করিয়াছেন। এই সময়ে আর্যগণ এরূপ জ্ঞানী, বিদ্বান্ এবং উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি ও সভ্যতাসম্পন্ন ছিলেন যে, সেই শুদ্ধাত্মা বিমল ঋজুস্বভাব আর্যদিগকে 'ঈশ্বরপুত্র' নামে অভিহিত করিয়া নিরুক্তকার আদৌ অত্যুক্তি দোষে দোষী হন নাই।

পাণিনি[৫] তাঁহার সূত্রবিশেষে (পা. ৬. ২. ৫৮.) 'আর্যে ব্রাহ্মণকুমারয়োঃ' এইরূপ বলিয়াছেন। তিনি অর্য শব্দের অর্থ যে 'বৈশ্য' ও 'স্বামী' তাহারও স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। একটি সূত্রের বার্তিকে অর্য ও ক্ষত্রিয়ের পার্থক্যও বিশেষ করিয়া বুঝান হইয়াছে।

ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, আর্য শব্দ অর্য শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৈদিক সংহিতার পরবর্তী যুগে এই শব্দে বৈশ্যদিগকে বুঝাইত। কারণ, তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যসমাজে পুরোহিত ও সৈনিক ব্যতীত অপর সকলেই বৈশ্যভাবাপন্ন ছিলেন। বেদে মাত্র একস্থানে শূদ্রেতর আর্য অর্থে অর্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বাজসনেয়ী-সংহিতায় (১৪. ৩০; ২০. ১৭) আর্য শব্দের এই একই অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। বাজসনেয়ী-সংহিতায় এক স্থানে (২৬. ২) ব্রাহ্মণ, রাজন্য ও শূদ্রের সহিত অর্য শব্দের প্রয়োগ আছে। সুতরাং তথায় বৈশ্য ভিন্ন অন্য কোনও অর্থ হইতে পারে না। লাট্যায়নসূত্রে (৮. ৩. ৬) লিখিত আছে 'অর্যাভাবে যঃ কশ্চার্যোবর্ণঃ'। ভাষ্য যথা—'যদি বৈশ্যো ন লভ্যতে যঃ কশ্চার্যোবর্ণঃ স্যাৎ, ব্রাহ্মণো বা ক্ষত্রিয়ো বা'। শতপথ-ব্রাহ্মণেও (৮.৪.৩.১২) এই অর্থ গৃহীত হইয়াছে।

Ludwig[4] (Der Rigveda, iii. 212) ইহাঁর অর্থ বৈশ্যই বুঝিয়াছেন। Zimmer[5] (I. C. 11714, 204, 216, 435)-এও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈদিক যুগের পর 'বৈশ্য' ও 'কৃষক' অর্থে 'অর্য' শব্দ ব্যবহৃত হইত। শুক্ল-যজুঃ-সংহিতায় এই অর্য শব্দের প্রয়োগ কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। মহীধর[6] ১৪.৩০ সূত্রের ভাষ্যে 'স্বামী' ও 'বৈশ্য' অর্থই ধরিয়াছেন।

অবেস্তাপন্থীদের জেন্দ ভাষায়, 'অইর্য' (Airya) আর্য শব্দের অর্থদ্যোতক। অইর্য বলিলে সম্ভ্রান্ত-বংশীয় বা সম্ভ্রান্ত (of good family, noble) বুঝাইত। ইঁহাদের ভাষায় আর্যেতর যদি কাহাকেও বুঝাইতে হইত, তাহা হইলে তাঁহারা অনইরান (Anairan) শব্দ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু এই অনইরানের বিপরীত শব্দ ছিল 'অইরান'। নিজেদের শ্রেণীকে বুঝাইতে হইলে ইঁহারা 'অইরান' শব্দ এবং আপনাদের শ্রেণীর বহির্ভূত কাহাকেও বুঝাইতে হইলে 'অনইরান' শব্দ ব্যবহার করিতেন। এই জেন্দ ভাষা হইতে পরে গ্রীক ও রোমান ভৌগোলিকেরা অনিয়রকই (Aniarakai) বা লাটিন অনরিয়াকে (Anariacæ) নামক মিডিয়াবাসী জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধদিগের সময় এই বৈদিক আর্য শব্দের অরিয়, অয়্যির ও অয্য এই তিন প্রকার রূপ ছিল। আর্যেতর বুঝাইতে তাঁহারা অনরিয় শব্দ ব্যবহৃত করিতেন। এই অরিয় শব্দের অর্থ ছিল, right, good, ideal, noble, আর অনরিয় বুঝাইতে undignified, uncultured প্রভৃতি বুঝাইত। বৈদিক যুগে যাহারা আর্যসংস্কৃতি মানিয়া চলিত না তাহাদের বিশেষ কোন নাম বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিক সাহিত্যে শেষে যখন বেদের ব্যাখ্যা চলিতেছিল সেই সময় যাস্ক আর্য-সভ্যতা, আর্য-শিষ্টাচার-বিগর্হিত কিছু বুঝাইবার জন্য বোধ হয় সর্বপ্রথম 'অনার্য' শব্দ প্রয়োগ করেন। তাঁহার উক্তি এইরূপ, 'কীটক নামদেশো অনার্যনিবাসঃ'—নিরুক্ত, ৬. ৩২।

পরবর্তী কালে মনুসংহিতায়ও কয়েকবার 'অনার্য' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই অনার্য শব্দের ব্যাখ্যায় কুল্লুটভট্ট[7] ও মেধাতিথি[8] অনার্য শব্দে জাতি বুঝিয়াছেন। কিন্তু মনুসংহিতার শ্লোক

হইতে এইরূপ অর্থের কোন হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত শ্লোকে অনার্য শব্দে আর্য সংস্কৃতি বহির্ভূত আর্যেতর শ্রেণীকেই বুঝাইয়াছে। আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকেও 'অনার্য' শব্দের প্রয়োগ পাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তি-করমর্জুন'। টীকাকারগণের মধ্যে আনন্দগিরি[9] 'অনার্যজুষ্ট' শব্দে বুঝিয়াছেন 'শিষ্টগর্হিতম্, শ্রীধরস্বামী[10] বুঝিয়াছেন 'আর্যৈরসেবিতম্', নীলকণ্ঠ[11] বুঝিয়াছেন 'ভীরুভিজুষ্টসেবিতম্', বিশ্বনাথ[12] অর্থ করিয়াছেন 'সুপ্রতিষ্ঠিত-লোকৈরসেবিতম্' , কেবল বলদেব[13] ও মধুসূদন[14] এই অনার্য শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'আর্যৈর্মুমুক্ষুভিনজুষ্টং ন সেবিতম্'।

ঋগ্বেদে কৃষ্ণগর্ভ (১.১০১), শিশ্নদেব (৭.২১.৫; ১০.৯৯.৩), শিম্যু (১.১১৮; ৭.১৮.৫), ক্রব্যাদ (১০.৮৭.২), ও কিমিদিন (১০.৩৭.২৪) প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে এই সমস্ত শব্দে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনার্য জাতি বুঝিয়াছেন। অনেক পণ্ডিত যাতুবীন (?), অযজ্জন, মূসদেব, ব্রহ্মবিস (?) দাস, দস্যু প্রভৃতি শব্দে অনার্য বলিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে যাঁহারা আর্য ও আর্যেতর তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

বৈদিক যুগে যেমন আর্যগণের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ ঐ সময়ে আর্যেতরগণেরও অস্তিত্ব ছিল। এই আর্যেতরগণের ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য আর্যগণ হইতে অনন্যসাধারণ ছিল। শিক্ষাদীক্ষা, বিদ্যাবুদ্ধি, সভ্যতা, ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্পের ধারা এবং ধর্ম, আচার ও অনুষ্ঠানের অবদান আর্য ও আর্যেতর এই পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়াই আর্য যাহা ভাবিয়াছে, আর্যেতর কোনও সম্প্রদায় হয়তো সেই একই ভাবনা করিয়াছে, আর্যের সমস্যা হয়তো আর্যেতরের সমস্যার সহিত অনেকাংশে মিলিতে পারে, তাহার সমাধানেও হয়তো অদ্বিতীয়ত্ব না থাকিতে পারে, কিন্তু উভয়ের চিন্তার ধারা এবং সমাধানের ধারায় অপূর্বত্ব থাকিবেই। বৈদিক যুগের আর্য ও আর্যেতর সম্প্রদায়ের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে বৈদিক যুগের প্রকৃতির সন্ধান প্রথমেই লইতে হইবে।

আর্য ও আর্যেতরগণ লইয়াই বৈদিক ভারত। ভারতবর্ষে আর্যদের

কেমন করিয়া প্রথমে দেখা পাওয়া গেল সে সমস্যার সমাধান আজও ভাল করিয়া হয় নাই। ভাষাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ প্রভৃতির সাহায্যে অনেক দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত বিপুল পরিশ্রম করিয়া আর্যদের আদি নিবাস স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অটো শ্রাডের[15] (Otto Schrader) স্থির করিলেন দক্ষিণ রাশিয়া, জেয়াঁ দে মরগ্যান[16] (J. de Morgan) দেখাইলেন সাইবেরিয়া, ডক্টর গাইল্স্[17] (Dr. Giles) প্রমাণ করিলেন—আর্যদের আদি নিবাসের পূর্ব সীমান্তে কার্পেথিয়ান, দক্ষিণ সীমা বলকান, পশ্চিম সীমা অষ্ট্রিয়ান আল্পস্ এবং উত্তর সীমা এর্জ.গেবির্গে। এইরূপ কেহ দেখাইলেন এসিয়া মাইনর, কেহ বা বলিলেন ভারতবর্ষ। আর্যরা যে বাহির হইতে আসিয়াছেন এই মত প্রায় সকলেই একরূপ নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছেন। মানিয়া লইবার পক্ষে বা বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি আছে, সেগুলি বড়ই ফাঁকা—চূড়ান্ত তো নয়ই।

ঋগ্বেদের প্রাচীন সূক্তগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যে যথেষ্ট তাহা অস্বীকার করা চলে না। আর্যদের যে একটা প্রাচীন আবাসস্থল ছিল ইহারই দু-এক জায়গায় তাহার একটু ইঙ্গিত আছে। তাঁহাদের সেই প্রাচীন নিবাসভূমি —বেদের 'প্রত্ন ওকঃ' ভারতের ভিতরে কি বাহিরে তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। তাঁহারা যে বাহির হইতে আসিয়াছিলেন তাহার একটিও প্রমাণ বেদে নাই। বরং কতিপয় জাতিকে তাঁহারা ভারতের বাহিরে পশ্চিম দিকে বিদূরিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদে আছে (৭.৫.৬)। যাহা হউক, আর্যরা ভারতবাসী হউন অথবা বাহির হইতেই আসুন তাঁহাদের সংস্কৃতি বা culture সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঋগ্বেদ যে শুধু আর্য-সংস্কৃতির ক্রমপরিণতির ইতিবৃত্ত-নির্ণয়ে সহায়তা করে তাহা নহে, এইগুলি হইতে আমরা সেই সময়ের আর্য-অধ্যুষিত স্থানাদি সম্বন্ধেও অনেক সন্ধান পাইতে পারি। ইহাতে কতক-গুলি স্থানের ভৌগোলিক বর্ণনাও পাওয়া যায়। সেই সকল বর্ণনাও রাবি নদীর তীরস্থ প্রদেশকে নির্দেশ করে। রাবির তীর হইতে পঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তানকে কেন্দ্র করিয়া যে আর্যসভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। কয়েক বর্ষ পূর্বে সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে

'মোহেঞ্জোদড়োকে'[১৪] কেন্দ্র করিয়া ধ্বংসস্তুপ হইতে যে সমস্ত প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার হইয়াছে সেগুলি ঋগ্বেদের সূক্তসকলের উক্তিরই প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই প্রাচীন সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি অন্তত খ্রী-পূ° ৩০০০ বর্ষ পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার সাক্ষ্য দেয়। এই আবিষ্কার-গুলি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন পরিচয় কিনা সে সম্বন্ধেও কথা উঠিয়াছে। মোহেঞ্জোদড়ো প্রভৃতি স্থানে ভূগর্ভ-খননে যে সমস্ত মন্দির ও অট্টালিকার উদ্ধার হইয়াছে বিশেষজ্ঞদের মতে সেগুলি শুধু একটি যুগের সাক্ষ্য দেয় না, ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরে সঞ্চিত বিভিন্ন যুগের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের পরিচয় দিয়া থাকে। বিশেষত এইগুলি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিরই পরিচায়ক সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ এক মত প্রকাশ করিয়াছেন। মোহেঞ্জোদড়োর মন্দিরগুলির সহিত পরবর্তী কালের দ্রবিড়পদ্ধতির মন্দিরগুলির সাদৃশ্য আছে। সুম্ব ও বৈখানস-সূত্রানুযায়ী যজুর্বেদীর আদর্শে কল্পিত মন্দিরের অনুযায়ী হরপ্পার মন্দিরেও রহিয়াছে। এ ছাড়া ধ্বংসস্তুপ হইতে আবিষ্কৃত বিভিন্ন দ্রব্যগুলি ভারতীয় ইতিবৃত্তের অনেক উপকরণ যোগাইয়াছে।

আবিষ্কৃত মন্দিরগুলি হইতে অনেকগুলি চক্রাকার প্রস্তর, বিভিন্ন প্রকার দাবার ঘুঁটি, বিভিন্ন জন্তুর মূর্তি-ক্ষোদিত ফলকাদি, আসবাবপত্র, অলঙ্কার, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্রপত্রাদিও পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির সহিত ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদবর্ণিত দ্রব্যাদিরও সাদৃশ্য আছে। ঐতিহাসিকগণ ইহাকে তাম্রযুগের নিদর্শন বলিয়া নির্দেশ করেন। মন্দিরগুলিতে কূপ ও স্নানাগার প্রভৃতির সুন্দর বন্দোবস্ত রহিয়াছে। আবিষ্কৃত এই মন্দিরগুলি তখনকার সভ্যতার সুন্দর চিত্র। ঋগ্বেদে আর্য ও দস্যুগণের প্রাসাদগুলির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে মোহেঞ্জোদড়োর মন্দিরগুলির সাদৃশ্য বড় কম নয়।

এই সকল স্থানে অনেকগুলি প্রতিমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি আর্য ও দ্রবিড় সভ্যতার নিদর্শন। ড. হলের[১৯] ধারণা, ভারতীয় মৃৎশিল্পে সুমেরীয়-পূর্ব (Pre-Sumerian) প্রভাব পড়িয়াছিল ; কিন্তু এ ধারণা অমূলক। আবিষ্কৃত মৃৎশিল্পের নিদর্শন ও মূর্তিক্ষোদিত ফলকগুলিতে আর্য ও দ্রবিড় চিহ্নই বর্তমান।

তদানীন্তন প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বাবিলন ও ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরস্থ

অনেক প্রদেশের বিশেষ সম্পর্ক ছিল, এই সম্পর্কের মধ্যেও আর্য ও দ্রবিড়ের যে সম্বন্ধ তাহা লক্ষ্য করা যায়।

আর্য ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে দ্রবিড় জাতির দান বড় কম নয়। প্রাচীন দ্রবিড়-সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে আর্যভাবশূন্য। আর্যদের সহিত ইহাদের সমাজগঠনেরও পার্থক্য রহিয়াছে। দ্রবিড়-সমাজে মাতৃপক্ষ হইতে পরিবার গঠিত, আর্যসমাজে কিন্তু পিতৃপক্ষ হইতে গঠিত। তথাকথিত 'অসুর' সমাজের সহিত দ্রবিড়-সমাজ গঠনের অনেকটা মিল আছে। আর্যগণ যাহাকে ময় অসুর বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন সেই ময়ই দ্রবিড়-সভ্যতার বিজ্ঞান সাধনার চরম সাক্ষ্য দান করিতেছে। পূর্ত ও স্থপতি-বিদ্যায় আর্য আদর্শ বিশ্বকর্মা, দ্রবিড় আদর্শ ময়দানব।

সুমেরীয়, কাল্ডীয়, ঈজীয় ও মিশরীয় জাতিরা সভ্যতার উপর দ্রবিড়-প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয়। দ্রবিড় জাতি নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিল, দ্রবিড় ভাষায় তাহার পরিচয় রহিয়াছে। সংস্কৃত নৌ-সম্বন্ধীয় শব্দাবলী দ্রবিড় ভাষা হইতেই গৃহীত। এই দ্রবিড় জাতি যে বাহির হইতে ভারতে আসিয়াছিল এরূপ কোন প্রমাণও নাই। অতি প্রাচীনকালে যে ভারতবর্ষ ও মেসোপটেমিয়ার যোগাযোগ ছিল ২১০০ খ্রী-পূ র একখানি ফলক ও অন্যান্য নিদর্শন হইতে, তাহা প্রমাণিত হয়। কয়েক বৎসর হইল প্রত্নানুসন্ধানে বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ছয় জনকে ভারতের বাহিরে অতি দূর-দেশে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, নাসত্য, সূর্য ও মরুৎ—এই ছয় জন দেবতার উল্লেখ আছে বোগাস কুই[20] শিলালেখে, তেল্ এল্-অমরনার[21] পত্রাবলীতে এবং বাবিলনের কাসাইটদের রেকর্ডসমূহে। মিটানি রাজ্যের সহিত আসিরিয়া রাজ্যের যুদ্ধব্যাপার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তেল্-এল্-অমরনার হইতে তুস্রত্ত[22] যে পত্রগুলি মিশরের তৃতীয় অমেনহোতেপকে লিখিয়াছিলেন সেগুলি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলির সময় বোগাস কুই লিপির সময়ের অনুরূপ। এই পত্রগুলিতে উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়ার মিটানি জাতির উল্লেখ আছে। এখানে যে সকল রাজা রাজত্ব করিতেন তাঁহাদের কাহারও কাহারও নামও পাওয়া যায়। এই রাজাদের মধ্যে তুসরত্ত, অর্ততম, সুত্তর্ন, অর্তসুমর প্রভৃতি

ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও নাসত্যের পূজা করিতেন। এগুলি যে আর্য নাম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তারপর পাঁচশত বৎসর কাশীয় জাতি (১৭৪৬-১১৮০ খ্রী-পূ.) মিডিয়া হইতে গিয়া সমগ্র বাবিলন অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরও রাজাদের এবং দেবতাদের নাম আর্য নাম। ইঁহাদের স্যুরিয়স ও মরীতস সূর্য ও মরুৎ। সিমলিয় আর্যদের হিমালয়। দেখা যাইতেছে, কাসাইটরা হিমালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং মিটানির সহিত আর্যদের সম্পর্ক ভারতবর্ষে পৌঁছিবার পূর্বে, এই পুরাতন ভ্রান্ত ধারণা আর টিকিতে পারে না। আর্যদের ধর্ম পারস্যের মধ্য দিয়া এসিয়া মাইনরে যায় নাই। ভারত হইতেই আর্যধর্ম বরাবর এসিয়া মাইনরে গিয়াছে। অভিগমনে পারস্যের মধ্যস্থতার কোন প্রয়োজনও হয় নাই। যদি হইত, তাহা হইলে এই দেবতাদের নামগুলিতে পারস্যদের ভাষার অন্তত একটু ছিটেফোঁটাও থাকিত। পক্ষান্তরে দেখা যাইতেছে, অমরনার পত্রাবলীতে দেবতাদের নামগুলি আদৌ ম্লেচ্ছিত হয় নাই। সেগুলিতে ভারতীয় রূপ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পারস্য মধ্যস্থ থাকিলে খ্রী-পূ. ১৪শ শতকে এমন কি ১৭৬০ খ্রী-পূর্বাব্দেও তুসরত্ত ও সুতর্ন প্রভৃতি শব্দগুলিকে অম্লেচ্ছিতরূপে দেখিতে পাইতাম না। বোগাস কুইলিপিতে যে সমস্ত সংখ্যাবাচক নামের উল্লেখ আছে তাহাদের সহিত বৈদিক সংখ্যা নামের সাক্ষাৎ সাদৃশ্য আছে। এছাড়া বৈদিক শব্দের সহিত কয়েকটি শব্দেরও বেশ মিল আছে। এই সুদূর প্রদেশে আর্য দেবতারা শান্তির ভাবই প্রকটিত করিয়াছেন। আর শান্তির এই বাণী লইয়াই ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক পরিচয়।

ইরানী জাতিও সম্ভবত ভারত হইতে পশ্চিমে অগ্রসর হইয়াছিল। ইহারাও বেদবর্ণিত অসুর জাতির সমপর্যায়ভুক্ত। বেদ ও অবেস্তার আলোচনায় ঋগ্বেদকেই প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। বেদের অনেক আখ্যানের সঙ্গে অবেস্তার আখ্যানের সাদৃশ্য আছে। তাহাদের ক্ষৌর-কর্মের প্রণালী, পরিধেয়ের পদ্ধতি, তাঁহাদের জয়ধ্বনিসূচক শব্দের সহিত আর্যদের অনেক মিল আছে। যঁও, মর্ক, বেরেত্রয়, ত্রেতন—অথর্ববেদের যণ্ড, মর্ক, বৃত্রঘ্ন, ত্রিতআপ্ত। বেদপন্থী ও অবেস্তাপন্থীদের পূর্বপুরুষগণ পূর্বে একস্থানে এক সঙ্গে বাস করিতেন। তাঁহারা যেখানে থাকিতেন, তাহাকে

তাঁহারা 'স্বর্গ' বলিতেন। বেদপন্থীদের পূর্বপুরুষগণ আপনাদিগকে 'দেব' বলিতেন ও অন্য দলকে 'অসুর' নামে পরিচিত করিতেন। তখন দেব ও অসুর 'ঈশ্বর' (Lord) অর্থেই প্রযুক্ত হইত। দেব ও অসুরদের পরস্পর বেশ মিল ছিল। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃব্য বলিয়া বুঝিতেন। সহোদর ভ্রাতা না হইলে তখন 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়া পরিচয় দিবার প্রথা ছিল। এখন যেমন পিতৃব্য বলিলে বাপ না বুঝাইয়া খুড়া, জ্যেঠা বুঝায়, তখন তেমনই ভ্রাতৃব্য বলিলে সহোদর ভ্রাতা না বুঝাইয়া অপর সকলকে বুঝাইত। ক্রমে উভয় দলের ধর্মমতের পার্থক্য ঘটিল। ভৃগু অগ্নিপূজার প্রবর্তন করিলেন। দেবগণ যজ্ঞ করিতে সুরু করিলেন। প্রথম প্রথম অসুররাও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন, পরে তাঁহারা যজ্ঞে রাজি হইলেন না। শেষে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, দেব বলিলে যজ্ঞকারী মাত্রই বুঝাইত। শতপথ-ব্রাহ্মণ (১.৫.৫.২৬) তাই দেবের সংজ্ঞা দিয়াছেন—'যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ'। অসুররা সারা বৈদিক সাহিত্যে স্বর্গবাসী। প্রথম প্রথম 'অসুর' শব্দ বৈদিক যুগে দেবতাদের নিকট খুব শ্রদ্ধাবাচক, মর্যাদা-ব্যঞ্জক ছিল। বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে যাঁহারা খুব বড় হইতেন, তাঁহারা 'অসুর' উপাধিতে ভূষিত হইতেন। মরুৎ, দ্যৌ, বরুণ, ত্বষ্টা, অগ্নি, বায়ু, পূষা, সবিতা, পর্জন্য —ইঁহারা সকলেই বেদে সম্মানসূচক 'অসুর'—পদবাচ্য ছিলেন। ইঁহাদের অলৌকিক শক্তি ছিল বলিয়া ইঁহাদিগকে বৈদিক ঋষিরা অসুর বলিতেন।

বেদে ১০৫ বার অসুর শব্দ আছে, সবই ভাল অর্থে প্রযুক্ত, কেবল ১৫ বার দুষ্ট অর্থে প্রযুক্ত। যত দিন দেব ও অসুরে মিল ছিল, তত দিন 'অসুর' বলিলে মর্যাদা, প্রভাব বুঝাইত। কিন্তু যখন মনের অমিল হইতে লাগিল, তখন উভয়ে উভয়ের প্রতি আকর্ষণ ভুলিয়া গেলেন। উভয় দলে বেশ শত্রুতাও চলিতে লাগিল। প্রথম প্রথম এক-একজন অসুরের সঙ্গে এক-একজন দেবতার যুদ্ধ হইত। শেষে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে একদল অপর দলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে গোড়ায় অসুরেরা দেবতাদের জ্বালাইয়া মারিতেন। শেষে দেবতারা বহু কষ্টে ছলে কৌশলে জয়ী হইলেন। এই সম্পর্কে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমের উদাহরণ খুব প্রসিদ্ধ। যুদ্ধের সময় দেব ও অসুর উভয়েই ইন্দ্রকে পাইবার জন্য, তাঁহার সাহায্যের

জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদে (১.৭.১০) ইন্দ্র সম্পর্কে দেবতারা বলিয়াছেন, 'অস্মাকংস্ত কেবলঃ'। অসুরদের বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবার জন্য ইন্দ্রকে তাঁহারা বার বার ডাকিয়াছেন (৮.৮৫.৯)।

অগ্নি তাঁহাদের ভরসা দিয়াছিলেন যে, অসুরদের বিধ্বস্ত করিবার জন্য তিনি মন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিবেন (১০.৫৩.৪)। অসুরদের বড় বড় বীর ছিল। পিপরু অসুরের, শম্বর অসুরের অনেকগুলি দুর্গ ছিল। শম্বরের ছিল অন্তত ৯০টি (১.১৩০,৭) কিংবা ৯৯টি (২.১৯.৬)। বর্চী অসুরের লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা ছিল। নিজেও তিনি খুব দুর্দান্ত। দেবতাদের অনেক সময় এইসব দুর্দান্ত অসুরদের উপর নির্ভর করিতে হইত (১০ ১৫০.৩)। যখন যুদ্ধ বাধিত ইন্দ্র, বিষ্ণু, অগ্নি, সূর্য—দেবতার হইয়া যুদ্ধ করিতেন। ইন্দ্র অসুর পিপরুর দুর্গ নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন (১০.১৩৮.৩)। ইন্দ্র ও বিষ্ণু অসুর বর্চীর লক্ষ বীরকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিলেন (৭.৯৯ ৫)। অসুরদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইন্দ্র (৬.২২.৪), অগ্নি (৭.১৩.১) ও সূর্যের (১০.১৭০.২) নাম হইয়াছিল 'অসুরহা'। রুদ্র ছিলেন নিজে মহা অসুর (৫.৪২.১১), অসুরেরা তাঁহার ভক্ত ছিল। দেবাসুরের যুদ্ধের পর হইতে যখন দেবতারা অসুরদের একেবারে হটাইয়া দিলেন (১০.১৫৭.৪) তখন দেবতারা অসুরদিগকে শত্রু বলিয়া উল্লেখ করিতেন, তাঁহাদিগকে 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেন।

আমরা দেখিতে পাই, বেদে দস্যু, দাস—ইহাদের উল্লেখ আছে। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণত্বক্। বৈদিক দেবতাদের শ্বেতবর্ণ বলা হইয়াছে। এই দস্যুদের অনার্য বলা হয়। আর্য ও অনার্য এই যে দুইটি জাতি বলিয়া দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তজ্জন্য প্রধানত আমরা মনীষী মাক্স্‌মুলরকেই দায়ী করিব।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ম্যাক্স্‌মুলর[১৩] 'আর্য' বলিয়া এক জাতির ধুয়া তোলেন। এই জাতিকে তিনি গৌরবর্ণ ও বিশিষ্ট সুসভ্য বলিয়া পরিচয় দেন। আর তাঁহার এই অভিমত সাধারণে বিশেষ আদৃত হইয়া পড়ে। ম্যাক্স্‌মুলর বলেন যে, এই আর্য জাতি নানা দলে দক্ষিণে, দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পশ্চিমে সভ্যতা বিস্তার করিতে করিতে ভারতবর্ষে, পারস্যে, আরমেনিয়ায় এবং ইউরোপের নানা দেশে ছড়াইয়া পড়ে।

ইহারই সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মতবাদের খুব প্রতিবাদ চলে। ফলে ভাষা এক হইলে জাতিও এক হইবে, এ সিদ্ধান্ত টিকিল না। শেষে ১৮৯১ খ্রী. ম্যাক্স্‌মুলর নিজে যে ভ্রান্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লেখেন—"To me an ethnologist who speaks of an Aryan race, Aryan blood, Aryan eyes and hair, is as great a sinner as a linguist who speaks of a dolichocephalic dictionary or a brachycephalic grammar. It is worse than a Babylonian confusion of tongues, it is downright theft. কিন্তু তথাপি আজও জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ আর্যজাতিরূপ মতবাদের মোহ ছাড়িতে পারেন নাই। এই মোহে পড়িয়া তাঁহারা ছয় প্রকার মতবাদকে ধ্রুবসত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া থাকেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে সেগুলির কোনটির মধ্যে সত্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের ছয়টি মতবাদ এই :—

(১) ১২০০ খ্রী-পূ. গৌরবর্ণ এক যোদ্ধজাতি উত্তর ভারত জয় ও অধিকার করে—ইহারা আপনাদিগকে আর্য নামে পরিচিত করিত।

(২) আর্যগণ দুইবার ভারত জয় করে। প্রথম বারে তাহারা আপন আপন স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া উত্তর-পশ্চিম হইতে পঞ্জাবে প্রবেশ করে এবং ভারতের আদিম অধিবাসীদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়া তথায় বসবাস করে। আর ইহাদের বংশে জাঠ ও রাজপূতগণ উৎপন্ন হয়। ইহাদের শারীরিক আকার ও গঠনে একটা বিশেষত্ব আছে। তারপর দ্বিতীয় বারে আর একদল আর্য গিলগিট্ ও চিত্রলের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করে ও মধ্যদেশ জয় করে। এই আর্যেরা কিন্তু বর্বর জাতিদের মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ করিয়া মিশ্র জাতি উৎপাদন করে।

(৩) যে সমস্ত বর্বর জাতিকে আর্যেরা একেবারে নষ্ট করিয়া দেয় অথবা বশীভূত করে তাহাদের নিতান্ত অসভ্যতার জন্য আর্যেরা তাহাদিগকে 'দস্যু' এই ঘৃণিত নামে পরিচিত করিত।

(৪) ভারতীয় আর্যগণ অসভ্য দস্যুদিগের সংসর্গ-হেতু বর্ণের আবিষ্কার করে।

(৫) বিজেতা আর্যগণ যে ধর্মবিশ্বাস নিজেদের সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহাই হিন্দুপুরাণ বলিয়া অভিহিত হয়।

(৬) এই আর্যেরা বৈদিক ভাষায় বাক্যালাপ করিত। এই ভাষাই বিন্ধ্যপর্বতের উত্তর হইতে এবং মহারাষ্ট্র প্রদেশে এই সমস্ত জাতিকে আর্য করিয়া লইয়া অসভ্য জাতির ভাষাকে বিতাড়িত করে। এই জন্য এখানকার বর্তমান ভাষা বৈদিক ভাষা সঞ্জাত। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে ইহারা যথেষ্ট বাধা পায়। কাজেই এখানকার ভাষা প্রধানত নিজস্ব ভাষা বজায় রাখিলেও বৈদিক ভাষা হইতে ব্যুৎপন্ন কোন সংস্কৃত রীতির শব্দ ভাষায় প্রবেশ করে।

ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব বুঝাইবার জন্যই আর্যদের ভারত বিজয়ের মতবাদ আবিষ্কৃত হয়। ১৭৮৬ খ্রী. স্যর উইলিয়ম জোন্স[24] সপ্রমাণ করেন যে সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, জর্মান ও কেলটিক একটি বিশিষ্ট ভাষা হইতে ব্যুৎপন্ন। ১৮৩৫ খ্রী. বপ্[25] (Bopp) এই মতটি যুক্তিদ্বারা দৃঢ় করেন। ইহা হইতে এবং বৈদিক মন্ত্রের ভাষা ও অবেস্তার ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়া স্থির হয় যে, বৈদিক ভাষা নিশ্চয়ই ভারতের বহির্ভূত অঞ্চল হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। এই পর্যন্ত ভিত্তিটা কিছু দৃঢ়।

তারপর প্রশ্ন হইতেছে যে, বৈদিক ভাষা কেমন করিয়া ভারতে প্রবেশ করিল? বিজেতারা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল এইটিই প্রচলিত মত। এই মতের পক্ষপাতীরা এই বিজয়ের প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। যদি আমরা ধরিয়া লই যে, বৈদিক ভাষা ভারতে প্রচলিত হইবার অব্যবহিত পরেই বৈদিক মন্ত্রগুলি রচিত হইয়াছিল, তাহা হইলে এই বৈদিক মন্ত্রগুলি হইতে কিছু কাজ হইতে পারে। এই মতটি আমরা বেশ মানিয়া লইতে পারি, কেননা যদিও অবেস্তা ও বেদের শব্দ ও পদের উচ্চারণে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তথাপি দুইটি ভাষা পরস্পরের এত সন্নিকট যে, অবেস্তার একটা সম্পূর্ণ ছত্র শুধু অক্ষর-পরিবর্তনের সূত্রের সাহায্যে বৈদিক ছত্রে পরিবর্তিত করিতে পারা যায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, অবেস্তা ভাষার সহিত বৈদিক ভাষার যে পার্থক্য, তাহা অধিক দিনের নয়। সুতরাং তাহাদের ভাষা ভারতে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই বৈদিক মন্ত্রগুলি রচিত হইয়াছিল।

যদি ভাষাটি বিজেতাদের ভাষারূপেই আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের এই কল্পিত বিজয়ের অনতিকাল পরেই যে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র বিরচিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়ে বিজয়-কাহিনীর কোন না কোন ঘটনার উল্লেখ থাকিবেই। এ কথা সত্য যে, দস্যুদের সঙ্গে আর্যদের পরস্পর যুদ্ধের কথার প্রায়ই উল্লেখ আছে। কিন্তু সেগুলি শুধু গোরু, বাছুর, রমণী প্রভৃতি সম্পদ্ লাভের জন্য যুদ্ধ। মনুষ্যসৃষ্টির পর হইতেই সমগ্র পৃথিবীতে অসভ্য জাতিরা এই দ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিত। একটা জাতিকে সরাইয়া বা হটাইয়া দিবার অথবা বিদেশী শত্রুদের নিকট হইতে দেশ কাড়িয়া লইবার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য সম্প্রতি হোর্নলে-[26] গ্রীয়ার্সন[27]-রিজলি[28] মতবাদের আবিষ্কার হইয়াছে।

আর্যদের প্রথম দল দলবদ্ধ হইয়া অথবা এক-এক দল ক্রমান্বয়ে সপরিবারে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তভূমির বহির্দেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করে। তাহারা সঙ্গে করিয়া স্ত্রীলোক লইয়া আসিয়াছিল। এরূপ অনুমান না করিয়া আমরা কোন প্রকারে পঞ্জাব ও রাজপুতানার লোকেদের আর্য-লক্ষণের সমধিক বিশুদ্ধি বিষয়ের কল্পনাই করিতে পারি না। Type-এর বিশুদ্ধি বলিলে তাঁহারা বোঝেন যে, জাঠ ও রাজপুতগণ কয়েকটি বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন। রিজলি লিখিয়াছেন—"They have a dolicho-cephalic head, leptorhine nose, a long, symmetrical narrow face, a well-developed forehead, regular features, a high facial angle, tall stature, a very light brown skin. যখন আদিম আর্যগণ 'dolicho-cephalic leptorhine type, বলিয়া জাতিতত্ত্ব-জগতে Penkar[29] মতবাদের জয়জয়াকার চলিতেছিল, তখনই রিজলি এই রায় দিয়াছেন। রিজলি তখন জানিতেন না যে, তারপর বহু dolicho-cephalic (দীর্ঘকপালী) জাতির আবিষ্কার হইবে। ডক্টর হাডন[30] Proto-Nordics-এর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তারপর তুর্কীস্তানের উস্থন (Wusun) জাতি, সাকাজাতি, অস্ট্রেলিয়ার দীর্ঘকপালী (dolicho-

cephal) জাতি প্রভৃতি অনেক জাতির সংবাদ বাহির হইয়াছে। ইহার উপর অধ্যাপক বোয়াস[৩১] (Prof. Boas) দেখাইয়াছেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় শারীরিক লক্ষণের যথেষ্ট ব্যত্যয় হইয়া থাকে। আমরা যে সমস্ত শারীরিক লক্ষণের উপর জোর দিয়া থাকি, সেগুলি একেবারে ভুল হইয়া যায়। ম্যারেট[৩২] এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া বোয়াসের পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন। তিনিও পঞ্জাব ও রাজপুতানার লোকেদের আকৃতি সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব-লিখিত মতের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার উপর এই অংশে এত বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষ ঘটিয়াছে যে, ইহাদের বিশুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, একথা কোন ঐতিহাসিকই বলিতে পারেন না। পারস্য, ইউরোপীয়, গ্রীক, পার্থিয়ান, বাক্‌ট্রিয়, সিথীয়, হূণ, আরব, তুর্কী ও মোঙ্গলেরা ক্রমান্বয়ে এই স্থানটি যে শুধু জয় করিয়াছিল, তাহা নয়—এইখানে বসবাস করিয়া লোকেদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

বৈদিক মন্ত্রগুলি আর্যদের দ্বারা তাঁহাদের নিজেদের উপকারের জন্য রচিত হইয়াছিল। বহু মন্ত্রে দস্যুদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে। যে সমস্ত জায়গায় দস্যুদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশ স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, দস্যুরা অলৌকিক শত্রু, অল্প সংখ্যক স্থলেই তাহারা মানুষ। বেদ হইতে বেশ বোঝা যায় যে, আর্য ও দস্যু বা দাসের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা সভ্যতা ও জাতিগত পার্থক্য নয়—cult বা ধর্মগত পার্থক্য। আর্য ও দস্যু বা দাস শব্দ প্রধানত ঋগ্বেদ-সংহিতায় আছে। ঋক্-সংহিতায় আর্য শব্দ ৩২ বার মাত্র মন্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে জাতি বিজেতা সে জাতি আপনার গৌরবকাহিনীর উল্লেখ বারবারই করিবে। আর্য শব্দের বিরল প্রয়োগে মনে হয়, ইঁহারা বিজেতৃজাতি নয়—ইঁহারা দেশ জয় করিয়া অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করেন নাই।

দাস শব্দের উল্লেখ ৫০ বার এবং দস্যু শব্দের উল্লেখ ৭০ বার আছে। কয়েকটি স্থানে এই দুইটি শব্দের উল্লেখ দুই অর্থে দেখিতে পাওয়া যায়। দাস শব্দের অর্থ চাকর এবং দস্যু শব্দের অর্থ ডাকাত। যেখানে এই দুই অর্থে ইহাদের প্রয়োগ নাই সেখানে আর্যদের বিরোধী দানব বা মানুষ।

ইন্দ্রারাধনায় আর্য শব্দ ২২ বার এবং অগ্নি-আরাধনায় ৬ বার আছে। ইন্দ্রব্যাপারে দাস শব্দ ৪৫ বার, দুই বার অগ্নি-ব্যাপারে। দস্যু শব্দ ইন্দ্র-ব্যাপারে ৫০ বার এবং অগ্নি-ব্যাপারে ৯ বার। ইন্দ্র ও অগ্নির সহিত আর্য ও দাস বা দস্যু শব্দের পুনঃপুন প্রয়োগ দেখিয়া বলিতে পারা যায় যে, আর্যগণ ইন্দ্র ও অগ্নির উপাসক ছিলেন এবং দাস বা দস্যুরা বিরোধী ছিল। আর্যগণ যে ইন্দ্রকে পূজা করিতেন এবং ইন্দ্রও যে তাঁহাদিগকে গোরু প্রভৃতি লইয়া দ্বন্দ্বের সময় সাহায্য করিতেন, তাহা ঋগ্বেদ হইতে প্রমাণিত হয়। অগ্নিকে মাঝে রাখিয়া আর্যগণ ইন্দ্রকে আহুতি দিতেন। আর ইন্দ্রের পরেই অগ্নি তাঁহাদের সহায় ছিলেন।

দাস বা দস্যু কাহারা? ইহারা ইন্দ্র, অগ্নি-পূজার বিরোধী। যে যে স্থানে দস্যু বলিলে মানুষ বুঝায়, সেই সেই স্থানে এই অর্থটি স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ১.৫১.৮, ১৯; ১.৩২.৪; ৪.৪১.২; ৬.১৪.৩ সূক্তে ইহাদিগকে অব্রত অর্থাৎ আর্যদিগের ব্রত-বিরহিত বলা হইয়াছে। ৫.৪২.৯ সূক্তে অপব্রত ৮.৫৯.১১ ও ১০.২২.৮ সূক্তে অন্যব্রত বলা হইয়াছে। ১.১৩১.৪, ১.৩৩.৪ ও ৮.৬৯.১১ সূক্তে দস্যুদিগকে অয়জবান বলা হইয়াছে অর্থাৎ ইহারা যজ্ঞ করে না। ৪.১৬.৯; ১০.১০৫.৮ সূক্তে অব্রহ্ম—ইহারা আরাধনা করে না এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাখে না বলা হইয়াছে। অন্যান্য ঋকে ইহাদিগকে অনৃচঃ, ব্রহ্মদ্বিষঃ, অনিন্দ্র বলা হইয়াছে। এইরূপে ঋগ্বেদের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, দস্যুরা যাদু ও মন্ত্র-ব্যাপারে দেবতার ধার ধারিত না।

ঋগ্বেদের যে কোন স্থান হইতে প্রমাণিত হইবে যে, ধর্ম ও পূজা-পদ্ধতি লইয়া আর্য ও দস্যুর বিবাদ (cult with cult and not one of race with race), ইহাদের বিবাদ জাতিগত বিবাদ নয়।

এতদিন ধরিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ আর্য ও দস্যু বলিলে দুইটি বিভিন্ন জাতি বুঝিতেন বলিয়া বেদে তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, ফলে কিন্তু পর্বতের মূষিক প্রসব হইয়াছে। ঋগ্বেদে ৬.২৯.১০ সূক্তে দস্যুদিগকে 'অনাস' বলা হইয়াছে। ইহা হইতে ম্যাক্সমুলর ও হাডন বলেন যে, দস্যুদের নাক চ্যাপটা ছিল। সুতরাং তুলনায় আর্যদের নিশ্চয়ই টিকল নাক হইবে। সায়ণ

প্রভৃতি-ভাষ্যকার ইহার অর্থ করিয়াছেন মুখহীন অর্থাৎ শোভন-ভাষাশূন্য। দস্যু ও রাক্ষসদের যে সকল নাক মন্দির প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি বেশ টিকল। উল্লিখিত সূক্তে অনাস মনুষ্যদের লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই—দানবদের নির্দেশ করা হইয়াছে। এরূপ স্থলে এই একটি মাত্র শব্দ হইতে দস্যুদের আকৃতি ঠিক করা আদৌ সমীচীন হয় নাই।

হোলকার কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয়ও দাস বা দস্যুদিগের প্রাধান্য ও উন্নত অবস্থা-সম্বন্ধেও বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহারা আর্যদিগের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না (Indo-Aryan Polity during the period of the Rigveda—Jour. dept. of letters, vol. v হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন)। সেই সমস্ত উক্তি আলোচনা করিলে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, দাসগণ পাঁচ শত পুরীর অধিপতি ছিল। দস্যুগণ আর্যদের সমকক্ষ শত্রু ছিল। ইন্দ্র যেমন দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন, আর্যদের বিরুদ্ধেও তেমনিই যুদ্ধ করিতেন। একটি ঋকে আছে যে ইন্দ্র আর্য ও দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন।

[বঙ্গীয় মহাকোষ, ২খ. পৃ. ৪০৯-৪১৫]

1 সায়ণাচার্য : বেদভাষ্যকার। ১৪শ খ্রী. তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে হাম্পিন নগরের কাছে জন্ম। পিতা—মায়ন ও মাতা—শ্রীমতী দেবী। সায়ণাচার্য প্রথমে বিদ্যাতীর্থ ও পরে শঙ্করানন্দের শিষ্য। বিদ্যানগরের রাজা ২য় হরিহর শৈশবে পিতৃহীন হলে সায়ণাচার্য রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজকার্য পরিচালনা করেন। তিনি তিরুভেলম যুদ্ধে চোল রাজগণকে পরাজিত করেন, ২য় মহম্মদ শা'র কবল থেকে নিজ রাজ্য রক্ষা করেন ও গরুড় নগর আক্রমণ করে গরুড় নগরের শাসনাধিকার সহস্তে রাখেন। তাঁর মৃত্যু—১৩৮৭ খ্রী.। তিনি ঋগ্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ ও কয়েকটি আরণ্যক ও উপনিষদের ভাষ্য করেন।—সনৎস্.

2 যাস্ক : নিরুক্তকার। পাণিনির পূর্ববর্তী। ইনি বৈশম্পায়নের শিষ্য এবং তিত্তিরের গুরু।—*WHIL*, iii, p. 41

3 পাণিনি : বৈয়াকরণ আচার্য। পাণিনি দ্র.

4 Ludwig, Alfred : জর্মান প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্। গ্রন্থ—Die Nachrichen des Rig- und Atharvaveda über Geographie, Geschichte und verpassung des alten Indiens (Prag. 1875).

5 Zimmer, Heinrich : জর্মানদেশীয় পণ্ডিত। বৈদিক সংস্কৃতি নিয়ে জর্মান ভাষায় কয়েকখানি বই রচনা করেন। গ্রন্থ : Altindisches Die Cultur der Vedischen Arier nach den Saṁhitā dergestelit (Berlin, 1879).

6 মহীধর আচার্য : যজুর্বেদ-ভাষ্যকার। ১৬শ শতাব্দীতে কাশীধামে জন্ম। পিতা—আচার্য রামভক্ত। রত্নেশ্বর মিশ্রের কাছে শিক্ষা। এঁর ভাষ্যের নাম—বেদদীপ। ইহা ছাড়া ইনি কাত্যায়ন-গৃহ্যসূত্র-ভাষ্য, ঈশোপনিষদ্‌ভাষ্য, বিষ্ণুভক্তিকল্পলতাপ্রকাশ প্রভৃতি রচনা করেন।—সনৎস্.

7 কুল্লূকভট্ট : সুপ্রসিদ্ধ বাঙালী স্মার্তপণ্ডিত ও মনুসংহিতার ভাষ্যকার। ১৩-১৪শ শতাব্দীতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে ভট্টনারায়ণ-বংশে জন্ম। পিতা—পণ্ডিত দিবাকর ভট্ট। ১৪শ শতাব্দীতে বারাণসীধামে তাঁর 'মন্বর্থমুক্তাবলী' নামে মনুসংহিতার টীকা প্রণীত হয়। টীকায় আত্মপরিচয়ে 'গৌড়নন্দনবাসি নাম্নি' বলা হয়েছে।—জী-কো., সনৎস্মৃ.

8 মেধাতিথি : মনুসংহিতা-ভাষ্যকার। ৯ম শতাব্দী কাশ্মীরবাসী বীরস্বামীর পুত্র। মেধাতিথি কাশ্মীর মতান্তরে সিন্ধুদেশে মনুভাষ্য রচনা করেন।—সনৎস্মৃ.

9 আনন্দগিরি (বা আনন্দজ্ঞান) : শঙ্করবিজয়-প্রণেতা ও টীকাকার। ৯ম শতাব্দী মতান্তরে ১৫শ শতাব্দী। শুদ্ধানন্দের শিষ্য। ইনি উপনিষদের, বেদান্তসূত্রের, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা প্রভৃতি রচনা করেন। —জী-কো., সনৎস্মৃ.

10 শ্রীধরস্বামী (১৪শ শতাব্দী) : টীকাকার। গুজরাতের মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। 'ভাগবতভাবার্থদীপিকা' গুজরাতে রচিত। গীতার সুবোধিনী টীকা, বিষ্ণুপুরাণের টীকাও ইনি রচনা করেন।—সনৎস্মৃ.

11 নীলকণ্ঠ : দেবীভাগবতের টীকাকার। ১৬-১৭শ শতাব্দী দাক্ষিণাত্যে জন্ম। পিতা—রঙ্গনাথ দেশিক। মাতা—লক্ষ্মীদেবী। গুরু—কাশীনাথ ও শ্রীধর। ইনি শাক্তবেদান্তী ছিলেন। অপর গ্রন্থ—শক্তিবিমর্ষিণী।—সনৎস্মৃ.।

12 বিশ্বনাথ (চক্রবর্তী) : দ্বৈতাদ্বৈতবাদী এবং টীকাকার। জন্ম—১৬৬৪ খ্রী. নবদ্বীপ, দেবগ্রাম। 'সারার্থদর্শনী' নামে (১৭০৪ খ্রী.) ভাগবতের টীকা রচনা করেন। অন্যান্য গ্রন্থ—ভগবদ্গীতার টীকা, বাগার্থচন্দ্রিকা, স্বপ্নবিলাসামৃত ই.।—ভা-কো.

13 বলদেব (বিদ্যাভূষণ) (১৮শ শতাব্দী) : বিখ্যাত বৈষ্ণবও দার্শনিক। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য। জয়পুরপতি-আহূত মহাসভায় চৈতন্য-সম্প্রদায়ের বেদান্তভাষ্য উপস্থাপন করেন এবং বিচারে প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। গ্রন্থ—গোবিন্দভাষ্য, শ্রীমদ্ভাগবতটীকা, ষট্‌সন্দর্ভটীকা প্রভৃতি।—ভা.-কো.

14 মধুসূদন সরস্বতী (১৭শ শতাব্দী): অদ্বৈতসিদ্ধিকার। পিতা—কাশ্যপগোত্রীয় পুরন্দর আচার্য। ফরিদপুর, কোটালিপাড়ায় জন্ম। বারাণসীধামে বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর শিষ্য। দণ্ডগ্রহণের পর শ্রীক্ষেত্রে সিদ্ধি লাভ। গোবর্ধন মঠের মঠাধীশ। ঐ স্থানেই মৃত্যু। , অপর গ্রন্থ—ভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থদীপিকা ই.।—বিশ্বকো.

15 Otto Schrader : জর্মান প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্। গ্রন্থ—Prehistoric antiquities of Aryan People ই A Manual of Comparative Philology and the Earliest ,Culture (Tr. from German, Lond, 1890).

16 J de Morgan : ফরাসী ঐতিহাসিক। গ্রন্থ : La Préhistoire Orientale (Paris, 1925).

17 Dr Giles : পরিশিষ্ট দ্র.

18 মোহেঞ্জোদড়ো : 'ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

19 ডঃ হল : 'অসুর-জাতি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

20 বোগাস কুই : 'ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

21 তেল-এল-অমরনা : ঐ

22 তুস্‌রত্ত : 'অসুর-জাতি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

23 Max Muller, Friedrick (1823-1900) : জর্মানদেশীয় প্রাচ্যবিদ্যাপণ্ডিত। লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ ডি (১৮৪৩)। সংস্কৃত অধ্যয়ন বার্লিনে অধ্যাপক বোপের কাছে ও প্যারীতে বুর্নুফের কাছে। অক্সফোর্ডে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান—পরে ১৮৬৮ খ্রী. আমৃত্যু তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রধান অধ্যাপক। তাঁর সম্পাদিত ছয় খণ্ডে সমগ্র ঋগ্বেদ সাহিত্য—সায়ণভাষ্যসহ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত (১৮৪৯-৭৩)। গ্রন্থ—Rig-veda Pratisakhya, text with German trns. (1859-69), The Six Systems of Indian Philosophy (1899), The Science of Languages, 2 vols. (1861-

63), Three Lectures on the Vedanta Philosophy (1894), A History of Ancient Sanskrit Literature (1859) ই. ।—ভা-কো.

24 Sir William Jones (1746-1794)—প্রাচ্যবিদ্যা ও ভাষাতত্ত্ববিদ্। তিনি গ্রীক, লাতিন, হিব্রু, আর্বী, ফার্সী, ইতালীয়, স্পেনীয়, পর্তুগীজ, জর্মান প্রভৃতি ভাষায় অভিজ্ঞ। ফার্সী ব্যাকরণ রচনা করেন (১৭৭১)। ভারতে আসেন ১৭৮৩ সালে ও কলকাতায় সুপ্রীম কোর্টের জজ হন। নাইট উপাধি লাভ করেন। কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৭৮৪, ১৫ জানুয়ারি) এবং সভাপতি। গ্রন্থ : Commentaries on Asiatic Poetry (১৭৮৪), কালিদাসের 'শকুন্তলার অনুবাদ (১৭৮৯), ঋতুসংহার সম্পাদন করেন বাংলা অক্ষরে (১৭৯২)। এ ছাড়াও লণ্ডনে 'Works of Sir William Jones', ৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৭৯৯ সালে ।—জী-কো.

25 Bopp, Franz (1791-1869) : জর্মান ভাষাবিদ্ ও সংস্কৃত পণ্ডিত। ১৮১২ খ্রী. ফরাসী দেশে এসে সংস্কৃত ভাষায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। ফরাসী দেশে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। ভারততত্ত্ববিদ্ শ্লেগেল ও ম্যাক্সমুলর তাঁর কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তিনি জর্মান ভাষায় প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন ও সাহিত্য নিয়ে বহু বই লেখেন। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বই তাঁর বিখ্যাত। —Wood : *Nutshell Enc. of Uni. Information* (1901)

26 হোর্নলে (Hoernle, Augustus Rudolf Frederic) (1841—?) —প্রত্নতত্ত্ব ও লিপিতত্ত্ববিদ্। বেনারসের জয়নারায়ণ কলেজের অধ্যাপক (১৮৭০), অধ্যক্ষ, কলকাতা ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ (১৮৭৭), ও পরে কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ (১৮৮১-৯৯)। ইনি Archaeological Survey of India-র The Bower Manuscript, Facsimile leaves, Nagri transcript, Romanised transliteration and English translation with notes সম্পাদন করেন (১৮৮৩) ।—*LYB*

27 শ্রীরামপন : 'অসুর জাতি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

28 রিজলি (Risley, Sir Herbert Hope) (1851—?): ইংরেজ জাতিতত্ত্ববিদ্। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করে বাঙলায় আগমন (১৮৭৩), বাঙলা সরকারের সচিব (১৮৯১), ভারত সরকারের হোম সেক্রেটারি (১৮৯২), অর্থনৈতিক সচিব (১৮৯৪), ভারতের জাতিতত্ত্ব সংকলন বিভাগের অধ্যক্ষ (১৯০১)। গ্রন্থ— The Tribes and Castes of Bengal, 2 vols. (1891-), The People of India (1908), Manual Anthropometry (1908), Primitive Marriage in Bengal ই.।—*BDIB*

29 Penka, Karl—জর্মানদেশীয় ভাষাতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ববিদ্। গ্রন্থ— Origines Ariacae. Linguistisch-ethnologische untersuchungen Zur ältesten Geschichte der arischen Völker und Sprachen (1883).

30 ড. হাডন (Haddon, A.C.): ইংরেজ জাতিতত্ত্ববিদ্। গ্রন্থ— Study of Man (Lond. 1898), The Races of Men and their Distribution (Cambridge, 1924).

31 Prof. Boas Franz (1858—?): আমেরিকার নৃতত্ত্ববিদ্। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক (১৮৯৯), আমেরিকার মিউজিয়ম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রির জাতিতত্ত্ব-বিভাগের কিউরেটর (১৯০১-০৫)। তিনি উত্তর-পশ্চিম আমেরিকা, উত্তর-পূর্ব এশিয়ার সম্বন্ধে সম্পর্কিতার বিবরণ প্রকাশ করেন। কয়েকটি বই—The Mind of Primitive Men (1911), Anthropologist's View of War (1912), Anthropology of Modern Life (1928) ই.।—*HCUB*

32 ম্যারেট (Marett, Robert R): অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানথ্রোপলজি বিভাগের রীডার। গ্রন্থ—Threshold of Religion. ই.

বেদাদি গ্রন্থে আর্যশব্দের উল্লেখ

ভারতে আর্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আর্যশব্দে পূর্বে কি বুঝাইত এবং এখনই বা কি বুঝায় তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। আর্যশব্দটি অতি প্রাচীন শব্দ। বেদে ইহার যথেষ্ট প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়! এই শব্দটির অর্থ পূর্বে কি ছিল এবং ক্রমশ ইহার কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাই আমরা সর্বাগ্রে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

ঋগ্বেদ-সংহিতায় আমরা যে কয়বার আর্যশব্দের প্রয়োগ পাইয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। বিজানীহ্যার্যান্ যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে
রন্ধয়া শাসদব্রতান্।
শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্তাতে
সধমাদেষু চাকন।১.৫১.৮

২। স জাতূভর্মা শ্রদ্দধান ওজঃ পুরো বিভিংদন্ন-
চরদ্বি দাসীঃ।
বিদ্বান্বজ্রিন্দস্যবে হেতিমস্যার্যং সহো
বর্ধয়া দ্যুম্নমিংদ্র।১.১০৩.৩

৩। যবং বৃকেণাশ্বিনা বপংতেষং দুহংতা
মনুষায় দস্রা।

অভিদস্যুং বকুরেণা ধমংতোরু . .

জ্যোতিশ্চক্রথুরার্যায় ।১.১১৭.২১

৪। ইন্দ্রঃ সমৎসু যজমানমার্যং প্রাবদ্বিশ্বেষু শতমূতিরাজিষু

স্বর্মীড় হেষ্বাজিষু ।১.১৩০.৮

৫। তম্ ত্বা দেবাসোঽ জনয়ন্ত দেবং বৈশ্বানর

জ্যোতিরিদার্যায় ।১.৫৯.২

৬। বেধা অজিন্বত্রিষধস্থ আর্যমৃতস্য ভাগে

যজমানমাভজৎ। ১.১৫৬.৫

৭। অপাবৃণোর্জ্যোতিরার্যায় নি সব্যতঃ সাদি

দস্যুরিন্দ্র। ২.১১.১৮

৮। সসানাত্যাঁ উত সূর্যং সসানেন্দ্রঃ সসান

পুরুভোজসং গাং।

হিরণ্যয়মুত ভোগং সসান হত্বী দস্যূন্প্রার্যং

বর্ণমাবৎ। ৩.৩৪.৯

৯। অহং ভূমিমদদার্যায়াহং বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্যায়।

অহমপো অনয়ং বাবশানা মম দেবাসো

অনু কেতমায়ন্। ৪.২৬.২

১০। উতত্যা সদ্য আর্যা সরয়োরিন্দ্র পারতঃ।

অর্ণাচিত্ররথাবধীঃ। ৪.৩০.১৮

১১। ইংদ্রো বিশ্বস্য দমিতা বিভীষণো যথাবশং নয়তি

দাসমার্যঃ। ৫.৩৪.৬

১২। আ সংযতমিন্দ্র ণঃ স্বস্তিং শত্রুতূর্যায়

বৃহতীমমৃধাং।

যযা দাসান্যার্যাণি বৃত্রা করো বজ্রিন্ত্সুতুকা

নাহুষাণি। ৬.২২.১০

১৩। ত্বং তাঁ ইন্দ্রোভয়াঁ অমিত্রান্দাসা

বৃত্রাণ্যার্যা চ শূর।

বধীর্বনেব সুধিতেভিরৎ কৈরা পৃৎসু দর্ষি
নৃণাং নৃতম। ৬.৩৩.৩

১৪। আভির্বিশ্বা অভিযুজো বিষূচীরার্যায়
বিশোহব তারীর্দাসীঃ। ৬.২৫.২

১৫। হতো বৃত্রাণ্যার্যা হতো দাসানি সৎপতী
হতো বিশ্বা অপ দ্বিষঃ! ৬.৬০.৬

১৬। ত্বং দস্যূঁরোকসো অগ্ন আজ উরু
জ্যোতির্জনয়ন্নার্যায়। ৭.৫.৬

১৭। দাসা চ বৃত্রা হতমার্যাণি চ সুদাস-
মিন্দ্রাবরুণাবসাবতং। ৭.৮৩.১

১৮। আ যোহনয়ৎ সধমা আর্যস্য গব্যা তুৎসুভ্যো
অজগন্নুধা নৃন্। ৭.১৮.৭

১৯। য ঋক্ষাদংহসো মুচত্তো বার্যাৎসপ্ত সিন্ধুসু।
বধর্দাসস্য তুবিনৃম্ণ নীনসঃ। ৮.২৪.২৭

২০। উপো ষু জাতমার্যস্য বর্ধনমগ্নিং নক্ষৎত নো
গিরঃ। ৮.১০৩.১

২১। ইংদ্রং বর্ধংতো অপ্তুরঃ কৃন্বংতো বিশ্বমার্যং। ৯.৬৩.৫

২২। এতে ধামান্যার্যা শুক্রা ঋতস্য ধারয়া। ৯.৬৩.১৪

২৩। যো নো দাস আর্যো বা পুরুষ্টুতাদেব ইন্দ্র
যুধয়ে চিকেতিত। ১০.৩৮.৩

২৪। অহং শুষ্ণস্য শ্নথিতা বধর্যমং ন যো রর
আর্যং নাম দস্যবে। ১০.৪৯.৩

২৫। সূর্যং দিবি রোহয়ন্তঃ সুদানব আর্যাব্রতা
বিসৃজন্তো অধি ক্ষমি। ১০.৬৫.১১

২৬। যস্তে মন্যোহবিধদ্বজ্র সায়ক সহঃ ওজঃ
পুষ্যতি বিশ্বমানুষক্।
সাহ্যাম দাসমার্যং ত্বয়া যুজা সহস্কৃতেন
সহসা সহস্বতা। ১০.৮৩.১

২৭। দাসম্ভ বা মঘবন্নার্যম্ভ বা সনুতর্যুবয়া
বধৎ। ১০.১০২.৩

২৮। বি সূর্যো মধ্যে অমুচদ্রথং দিবো বিদদ্দাসায়
প্রতিমানমার্যঃ। ১০.১৩৮.৩

২৯। অয়মে মি বিচাকশদ্বিচিন্বন্দাসমার্যং। ১০.৮৬.১৯

৩০। প্রৈষামনীকং শবসা দবিদ্যুতদ্বিদৎ স্বর্মনবে
জ্যোতিরার্যং। ১০.৪৩.৪

৩১। সমজ্রা পর্বত্যাবসূনি দাসা বৃত্রাণ্যার্যা জিগেথ। ১০.৬৯.৬

৩২। যদী বিশো বৃণতে দস্মমার্যা অগ্নিং হোতারমধ-
ধীরজায়ত। ১০.১১.৪

সায়ণাচার্য উল্লিখিত ৩২টি সূত্রের নয় প্রকার অর্থ করিয়াছেন।

১। বিজ্ঞ যজ্ঞানুষ্ঠাতা
২। বিজ্ঞ স্তোতা
৩। বিজ্ঞ
৪। অরণীয় বা সর্বগন্তব্য
৫। উত্তমবর্ণ
৬। ত্রৈবর্ণিক
৭। মনু
৮। কর্মযুক্ত, দেবোপাসক
৯। কর্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ

দেখা যাইতেছে যে আর্যশব্দ সর্বত্র 'শ্রেষ্ঠ জাতি' বা 'সম্মান' সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন, যজ্ঞে স্তুতিপাঠ করিতেন, সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন।

অথর্ববেদে "সমগ্র মানবজাতি" অর্থে আর্যশব্দ ব্যবহৃত হইত।

১। তয়াহং সর্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্যঃ—৪.২০.৪
২। তেনাহং সর্বং পশ্যামি উত শূদ্রং উতার্যং—৪.২০.৮

৩। প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।
প্রিয়ং সর্বস্য পশ্যত উত শূদ্রে উতার্যে। ১৯.৬২.১

বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণগ্রন্থে আর্যশব্দ শূদ্রেতর ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় এই তিন বর্ণকেই বুঝাইত। শতপথ-ব্রাহ্মণে স্পষ্ট লিখিত আছে—"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণই কেবল আর্য। কেননা তাঁহারা যজ্ঞক্রিয়াধিকার প্রাপ্ত। তাঁহারা কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সহিতই কথা কহিবেন। এই তিন বর্ণ ভিন্ন অন্য যাহার তাহার সহিত কথা কহিবেন না। যদি শূদ্রের সহিত কথা কহিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তিনি অন্যকে বলিবেন "এই শূদ্রকে এইরূপ বল"—ইহাই নিয়ম"।

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৭.৫.৯.৮) আর্য ও শূদ্রের চর্মনিমিত্ত কলহের কথা আছে।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে আর্যশব্দ, যথা—

'অযুবমার্যস্য রাষ্ট্রং ভবতি'—৮.৫.২

মনু 'জাতি' অর্থে আর্যশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 'আর্যভূমি' 'আর্যদেশ' তাহার নিদর্শন।

নিরুক্তকার যাস্কও জাতি সংজ্ঞারূপে আর্যশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ 'বিকারমস্যার্যেষু' (২.১.৪) উক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অন্যত্র (৬ ৫.৩) যাস্কই আবার দেখাইয়াছেন যে—

আর্যঃ = ঈশ্বরপুত্রঃ।

নিঘণ্টুতে 'ঈশ্বর' বুঝাইতে 'অর্য' শব্দের প্রয়োগ আছে (২.২২)। অর্যের অপত্যার্থে আর্য=ঈশ্বরপুত্র।

আর্যগণ এই সময়ে সুসভ্য, বিজ্ঞানাদি বিষয়ে জ্ঞানবান ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণে বিভক্ত ছিলেন। এই শুদ্ধাত্মা বিমল ঋজুস্বভাব আর্যগণকে "ঈশ্বরপুত্র" নামে অভিহিত করিয়া নিরুক্তকার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন।

পাণিনি ৬.২.৫৮ সূত্রে লিখিয়াছেন 'আর্যব্রাহ্মণকুমারয়োঃ'। তিনি আবার ৩.১.১০৩ সূত্রে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, 'অর্য শব্দের 'বৈশ্য ও স্বামী'

—'অর্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ ; ৪.১.৪৯ সূত্রের বার্ত্তিকে অর্য ও ক্ষত্রিয়ের পার্থক্যও ভাল করিয়া বুঝান হইয়াছে।

আর্যশব্দ 'অর্য' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। বৈদিক যুগের পরযুগে এই অর্যশব্দ বৈশ্যদিগকে বুঝাইত। এইরূপ হইবার কারণ এই যে তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য সমাজে পুরোহিত ও সৈনিক ব্যতীত অপর সকলে বৈশ্যভাবাপন্ন ছিল। ঋেদের কেবল একস্থানে শূদ্রেতর আর্য অর্থে অর্যশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। বাজসনেয়ী-সংহিতায় (২০.১৭ ; ১৪.৩০) আর্যশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতেও আর্যশব্দের অন্য অর্থ নাই। বাজসনেয়ী-সংহিতার এক স্থানে (২৬.২) ব্রাহ্মণ, রাজন্য ও শূদ্রের সহিত অর্যশব্দের প্রয়োগ আছে। সুতরাং তথায় বৈশ্য ভিন্ন অন্য কোনও অর্থ হইতেই পারে না। ৪.৩.৬ লাট্যায়ন সূত্রে লিখিত আছে 'অর্যাভাবে যঃ কশ্চার্যোবর্ণঃ। ভাষ্য যথা—

'যদি বৈশ্যো ন লভ্যতে যঃ কশ্চার্যোবর্ণঃ স্যাৎ, ব্রাহ্মণো বা ক্ষত্রিয়ো বা।' শতপথ-ব্রাহ্মণেও (৮.৪,৩,১২) এই অর্থ গৃহীত হইয়াছে। Ludwig (Der Rigveda III, 212) ইহার অর্থ বৈশ্যই বুঝিয়াছেন। Zimmer (IC. 11714, 204, 216, 435) এও দেখিতে পাওয়া যায় যে বৈদিক যুগের পর 'বৈশ্য' ও 'কৃষক' অর্থে 'অর্য' শব্দ ব্যবহৃত হইত। শুক্ল যজুঃ সংহিতায় এই অর্য শব্দের প্রয়োগ কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। মহীধর ১৪.৩০ সূত্রের ভাষ্যে 'স্বামী' ও 'বৈশ্য' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

[ঐতিহাসিক চিত্র, ১৩১৭, পৃ. ৩১৭-৩২৩]

বৈদিক যুগে যজ্ঞ-প্রথা

ভারতীয় আর্যরা যজ্ঞ করিতেন। স্বর্গ কামনায় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। তাঁহাদের যজ্ঞ ছিল তিন রকমের। প্রথমত বেদীতে অগ্নি জ্বালাইয়া তাহাতে তাঁহারা দুগ্ধ, নবনীত ও শস্য আহুতি দিতেন; এবং দ্বিতীয়ত তাঁহারা পশুবলি দিতেন, এবং তৃতীয়ত তাঁহারা যজ্ঞীয় তৃণের উপর এক রকম ন্যুব্জাকৃতি পাত্রে সোম ঢালিতেন। যজমান যিনি যজ্ঞ করিতেন তিনি তাঁহার গৃহে পুরোহিতদের নিমন্ত্রণ করিতেন। যজ্ঞস্থলে দেবতাদের অবতরণের জন্য নানা প্রকারে স্তুতি করা হইত। স্বর্গ হইতে বায়ুপথে আরোহণ করিয়া আকাশ পথে যজ্ঞভূমিতে অবতরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইত। দেবতারা এইরূপে অবতরণ করিয়া, যজমানের পত্নী ও পুরোহিতগণের সহিত বসিয়া পান ভোজন করিবার জন্য যজমান তাঁহাদিগকে আবাহনও করিতেন। ঋগ্বেদের প্রথম দিক্‌কার সময়ে এই সমস্ত অনুষ্ঠান হইত। সে সময় প্রাচীন আর্যগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণ অধিকার করিয়াছিলেন; তখন তাঁহারা সিন্ধুনদের উপরের প্রদেশই আপনাদের আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছিলেন। সুতরাং সেই সময়ে কাবুল নদের উপত্যকা, সোয়াট নদী, কুরম, গোমল প্রভৃতির উপর তাঁহাদের স্বামিত্ব ছিল। ঋগ্বেদের শেষের দিকের সময় আর্য-সভ্যতা যমুনা ও গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তখন আর্যরা নর্মদা বা বিন্ধ্যপর্বত জানতেন না, ঋগ্বেদে তাহাদের উল্লেখও নাই। কিন্তু সমস্ত বৈদিক যুগের মধ্যে আর্য-সভ্যতা সমস্ত হিন্দুস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণে ও

বিন্ধ্যগিরির উত্তরে সমস্ত দেশ আর্য-সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। যে সময় আর্য-সভ্যতার কেন্দ্র গঙ্গার উপত্যকায় ছিল যজুর্বেদে সেই সময়েরই দ্যোতনা পাওয়া যায়। যজুর্বেদের সময় চারিবর্ণ তো দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হইয়াছিলই, অধিকন্তু পরবর্তী যুগে যে সমস্ত মিশ্রজাতির নাম পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই উল্লেখ যজুর্বেদে আছে।

এই সময় যজ্ঞ ছিল একটা সাধারণ ব্যাপার। যজ্ঞ না করিলে প্রত্যবায় ছিল। বেদী নির্মাণ করিয়া যজ্ঞ করিতে হইত। বেদীও ছিল অনেক প্রকার।

অগ্নির সহিত সকল বেদী অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। বৈদিক ভারতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান সকল সময়েই হইত। বৈদিক যজ্ঞেও তিনি প্রকার অগ্নির কথা জানিতে পারা যায়। এই তিন অগ্নির নাম গার্হপত্যাগ্নি, আহবনীয়াগ্নি ও দক্ষিণাগ্নি। বৈদিক সাহিত্যে তিন অগ্নির যথেষ্ট আলোচনা আছে। এই তিন অগ্নির আকার,—গার্হপত্যাগ্নি+চতুষ্কোণ কুণ্ড, আহবনীয় অগ্নি=ত্রিকোণকুণ্ড* দক্ষিণাগ্নি—বর্তুলকুণ্ড।

এই তিন অগ্নির সঙ্গে সকলের সম্বন্ধ। লোকে এই তিন অগ্নি রাখিত। ক্রমশ প্রাচীন বৈদিক ভারতে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন ঋষিরা অগ্নি প্রজ্বলিত না রাখিয়া তাহা নিবাইয়া রাখিতেন। সে সময় তাঁহারা অগ্নির আরাধনার জন্য কোনই অনুষ্ঠান করিতেন না। তবে তাঁহারা সযত্নে বেদী রক্ষা করিতেন।—ঋগ্বেদ, ১.১৩৬.৩।

বৈদিক যজ্ঞে কতকগুলি যজ্ঞপাত্রের দরকার। সেগুলি সাধারণত বিকংকত কাষ্ঠ (flacourtia sapida) দিয়া তৈরি করিতে হয় [বৈকংকতানি পাত্রানি—কাত্যা. সূ ১ ৩ ৩১]।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে (৪র্থ অধ্যায়) নিম্নলিখিত যজ্ঞপাত্র ও দ্রব্যের নাম পাওয়া যায়—জুহূ, উপভৃত, ধ্রুবা, অগ্নিহোত্রহবনী, কপাল, আজ্যপাত্রী, পুরোডাশপাত্রী, উপবেশ, যড়বক্ত, ঔষধ, হোতৃষদন, শূর্প, অন্বাহার্যতণ্ডুল, শম্যা, ইড়াপাত্রী, অন্বাহার্যপাত্র, অভ্রি, প্রণীতা, আজ্যস্থালী, স্ফ্য, শৃতাধান, অন্তর্ধানকট, উপসর্জনীপাত্র, যোক্ত্র, পূর্ণপাত্র, প্রাশিত্রহরণ, কুশমুষ্টি, ইধ্মবর্হিঃ, বেদিতৃণ, হোতৃসমিৎ, সমিৎ, উলূখল, সন্নাহনাবচ্ছাদনতৃণ, মুসল, উপল, পরিধি, বিধৃতি, পবিত্রচ্ছেদন, স্রুব, কৃষ্ণাজিন।

পাদটীকা

* রাসায়নিক চিহ্নে সমস্ত তালিকায় সমত্রিকোণ (△ equilateral triangle) দ্বারা অগ্নি বোঝান হইয়া থাকে। শত বৎসর পূর্বে বিলাতী মতের চিকিৎসকেরা সমত্রিকোণ চিহ্ন ব্যবহার করিতেন। এই পুরাতন পদ্ধতি এখনও লোপ পায় নাই। অগ্নিজ্ঞাপক এই ত্রিকোণের চূড়াগ্র উপরের দিকে থাকে। অগ্নি বুঝাইতে হইলে মিশরেও ঠিক এইরূপ ত্রিকোণ প্রতীক (symbol) ব্যবহৃত হইত। অগ্নিশিখা উপরের দিকে উঠিয়া এইরূপ ত্রিকোণাকার ধারণ করে বলিয়া ত্রিকোণের চূড়াগ্র (apex) উপরের দিকে করিবার নিয়ম। জল কিন্তু নিম্নগামী বলিয়া নীচের দিকে যায়। নীচের দিকে ইহার গতি বুঝাইবার জন্য জলদ্যোতক ত্রিকোণের চূড়াগ্র নীচের দিকে থাকে।

[এই প্রবন্ধের সঙ্গে অন্যত্র প্রকাশিত তিনটি যন্ত্রের বিবরণ সংযুক্ত হল।—স.]

বৈদিক যজ্ঞে ব্যবহৃত কতিপয় পাত্র

(১)
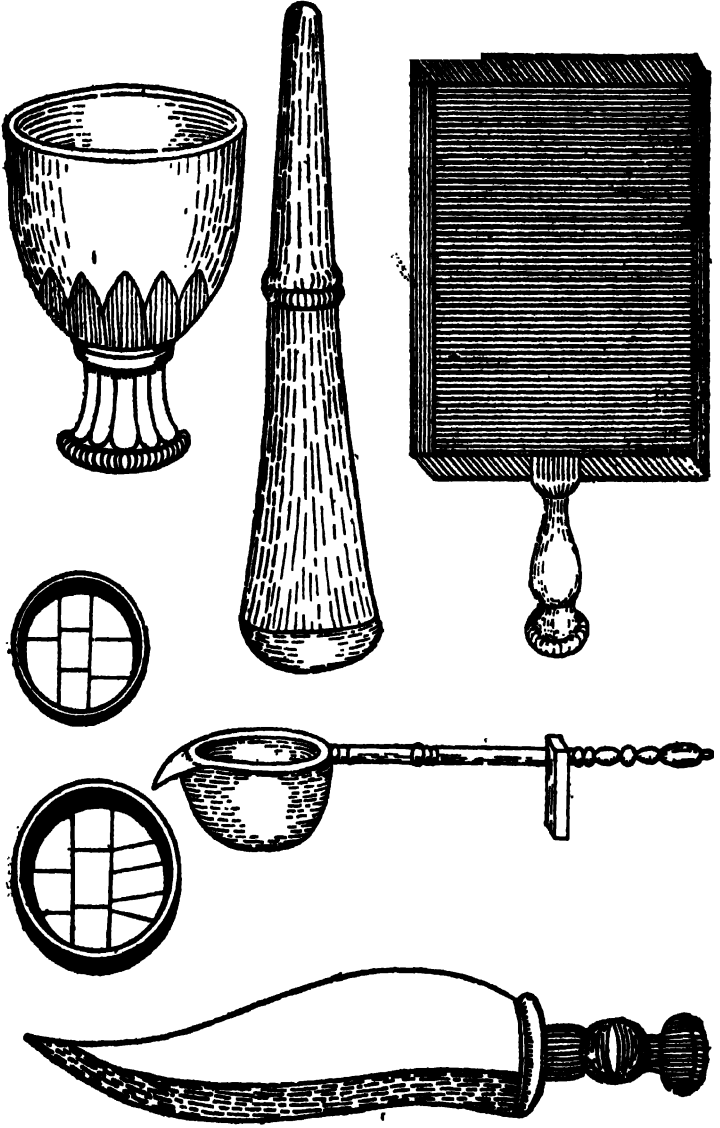
অগ্নিষ্টোম

প্রজাসৃষ্টি-কল্পনায় প্রজাপতি-কর্তৃক প্রবর্তিত পঞ্চদিনসাধ্য বসন্তকালীন যজ্ঞ-বিশেষ। ইহাতে অগ্নির স্তুতি আছে।

স্বর্গ কামনায় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। বৈদিক যুগে এই শ্রেণীর যজ্ঞের প্রচলন ছিল। যে যজ্ঞ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত এবং পুরোডাশ, পিষ্টক প্রভৃতি আহুতি দিয়া সম্পন্ন হইত, তাহার নাম 'হবির্যজ্ঞ'; আর যে যজ্ঞ সোমরস আহুতি দিয়া অনুষ্ঠিত হইত তাহার নাম 'সোমযজ্ঞ' বা 'সোমযাগ'। যজ্ঞশেষে সোম পান করা হইত। কৃষ্ণযজুর্বেদে যজ্ঞের নাম ও সৃষ্টির কথা জানিতে পারা যায়; 'প্রজাপতির্যজ্ঞানসৃজত। অগ্নিহোত্রং অগ্নিষ্টোমঞ্চ পৌর্ণমাসীঞ্চোকৃথঞ্চামাবাস্যাঞ্চতিরাত্রম্'—কৃ-য° ১.৬.৯। অথর্ববেদের গোপথ-ব্রাহ্মণ (পূ. ১.২৮, উ. ৩.২ ই.) হইতে জানিতে পারা যায়, ভৃগু ও অঙ্গিরা ঋষিই প্রথমে সোম-যাগ প্রচলন করেন।

সোমযজ্ঞ প্রধানত ৭ প্রকারের। অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও অপ্তোর্যাম। এগুলি ব্রাহ্মণদিগের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইত। এতদ্ভিন্ন রাজসূয় ও অশ্বমেধযজ্ঞও সোমযজ্ঞের মধ্যে পরিগণিত হইত, কিন্তু এই দুইটি ব্রাহ্মণেরা করিতেন না। সোমযজ্ঞের নানা শ্রেণী থাকা স্বত্বেও অগ্নিষ্টোমকেই সকলের প্রকৃতি স্বরূপ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়, কারণ এই শ্রেণীর যজ্ঞসমূহের সকল অনুষ্ঠানই সোমযজ্ঞের করণীয়। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ-ভাষ্যে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বলিয়াছেন, এই সাতটি সংস্থার উদ্দেশ্য হইতেছে, অগ্নিস্তুতি, 'অগ্নিষ্টোমসংস্থাঃ ক্রতুঃ'—ঋ. ৬. ৪৮. ১-২; কিন্তু বাজপেয়-সংহিতায় ৯ম ও ১০ম স্তোত্রে অগ্নির স্তব আছে।

এই যজ্ঞ বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হইত, কারণ ঐ সময়ে প্রচুর সোম পাওয়া যাইত। 'বসন্তেঽগ্নিষ্টোমঃ' (কা-শ্রৌ. সূ. ৭. ১. ৫)। ইহার অপর একটি নাম জ্যোতিষ্টোম—'বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেত' (আপ-শ্রৌ. সূ. ১০.২৫)।

সোমযজ্ঞ তিন প্রকারের—'অহীন', 'সত্র' ও 'একাহ'। যাহা একদিনে অনুষ্ঠিত হইত তাহার নাম 'একাহ'; ২ হইতে ১২ দিনব্যাপী যে যজ্ঞ হইত তাহার নাম 'অহীন', আর এক পক্ষ কি বহুকালব্যাপী হইলে সেই যজ্ঞের নাম হইত 'সত্র'। সত্র আবার 'দীর্ঘসত্র' ইত্যাদি বহু-প্রকারের ছিল।

'এষ বৈ যজ্ঞঃ স্বর্গ্যো যদগ্নিষ্টোমঃ'—তা-ব্রা. ৪. ২. ১১। স্বর্গকামনায় অগ্নিষ্টোম অনুষ্ঠিত হইত। ইহা সর্বাপেক্ষা সহজ ও সাধারণ সোমযাগ। এই যাগে একটিমাত্র পশু-বলি হইয়া থাকে। অগ্নিকে একটিমাত্র ছাগ আহুতি দিতে হয়। এই যাগে বারটি স্তোত্র গীত হইয়া থাকে। 'দ্বাদশাগ্নিষ্টোমস্য স্তোত্রাণি'—তৈ-ব্রা. ১. ২. ২. ১; তা-ব্রা. ৪. ২. ১২। —একটি বহিষ্পবমান-স্তোত্র[১], প্রাতঃসবনে চারিটি আজ্যস্তোত্র[২], মধ্যাহ্ন-সবনে মাধ্যন্দিনপবমান[৩] এবং চারিটি পৃষ্ঠ্যস্তোত্র[৪]। সায়ংসবনে ত্রিত্য (বা আর্ভব)-পবমান[৫] এবং অগ্নিষ্টোম-সাম। এই শেষ স্তোত্র হইতেই এই যজ্ঞের নামকরণ হইয়াছে। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সাধারণত এই যজ্ঞ 'অগ্নিষ্টোমসংস্থঃ ক্রতুঃ' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। তাই শ-ব্রাহ্মণেও (৫. ১. ৩. ১) পাওয়া যায়—'আগ্নেয়ং অগ্নিষ্টোম আলভতে'। ইহার সায়ণভাষ্য এইরূপ—'অগ্নিঃ স্তূয়তেঽস্মিনিত্যগ্নিষ্টোমো নাম সাম, তস্মিন্ বিষয়ভূত আগ্নেয়মালভতে, এতেন পশুনাঽস্মিন্ বাজপেঽগ্নিষ্টোমসংস্থং ক্রতুচেবানুষ্ঠিতবান্ ভবতি'। অথবা অগ্নির স্তোমে এই যজ্ঞের পর্যবসান হইত বলিয়া ইহার নাম অগ্নিষ্টোম।

সোমযাগে যতগুলি স্তোত্র অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও অপ্তোর্যামে হইয়া থাকে ততগুলি শস্ত্রও বিহিত। অগ্নিষ্টোমে দ্বাদশ (১২) শস্ত্র, অত্যগ্নিষ্টোমে ত্রয়োদশ (১৩), উক্থে পঞ্চদশ (১৫), ষোড়শীতে ষোড়শ (১৬), বাজপেয়ে সপ্তদশ (১৭), অতিরাত্রে পঞ্চবিংশতি (২৫) এবং অপ্তোর্যামে ত্রয়স্ত্রিংশৎ (৩৩)।

এই যজ্ঞে অগ্নিরই স্তব করা হইত বলিয়া ইহার নাম অগ্নিষ্টোম ('অগ্নেঃ স্তোমঃ স্তবনং ইত্যগ্নিষ্টোমঃ')। ইহাতে অগ্নির স্তোত্র ও পূজা প্রধান

অনুষ্ঠেয় হইলেও আনুষঙ্গিক বহু দেবতারও পূজা চলিত। যজ্ঞ-কার্যে সুনিপুণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারাই ইহা সম্পন্ন হইত।

ব্রাহ্মণগ্রন্থে অগ্নিষ্টোমের যথেষ্ট প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও ইহাকে আত্মা[৬], কখনও বীর্য[৭], প্রতিষ্ঠা[৮], ত্রিবিৎ[৯] আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কখনও বা ইহাকে ব্রহ্মা[১০], জ্যোতি[১১], সূর্য[১২], অগ্নি[১৩], বা সংবৎসর[১৪] বলা হইয়াছে। অগ্নিষ্টোম সকল যজ্ঞের মূলস্বরূপ[১৫] বলিয়া ইহাকে 'জ্যেষ্ঠযজ্ঞ'[১৬] নামেও আখ্যাত করা হইয়াছে। দেবতারা এই যজ্ঞদ্বারা ভূলোক জয় করিয়াছেন[১৭]।

প্রথমে সুলক্ষণযুক্ত পবিত্র ভূমি যজ্ঞক্ষেত্রের জন্য নির্ধারিত হইত, পরে যেখানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইত, সেই স্থানই যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইত। 'তদুহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। বার্ষ্ণায় দেবযজনং জোষয়িতুমৈম। তৎসাত্যযজ্ঞোঽব্রবীৎ সর্বা বাঽইয়ং পৃথিবী দেবী দেবযজনং যত্র বাঽ অস্যৈ ক্ব চ যজুষৈব পরিগৃহ্য যাজয়েদিতি।'—শ-ব্রা. ৩. ১. ১. ৪। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিয়াছিলেন—'আমরা এক সময়ে বার্ষ্ণের জন্য যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতেছিলাম, পথিমধ্যে সাত্যযজ্ঞের সহিত দেখা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, সকল স্থানেই যজ্ঞ হয়, তোমরা যেখানে মন্ত্র লাভ করিবে সেইখানেই বার্ষ্ণকে লইয়া যজ্ঞ করিতে পার'।

স্থান নির্দিষ্ট হইলে তথায় প্রথমে একটি মণ্ডপ নির্মাণ করা হইত। উহা চারিদিকে সমান ও প্রত্যেক দিকে ১২ অরত্নি-প্রমাণ। কনুই হইতে হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল পর্যন্ত মাপকে 'অরত্নি' বলা হইত; উহা পুরা এক হাত ছিল না, কনুই হইতে মুষ্টিবদ্ধহস্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই মণ্ডপের নাম 'প্রাচীন বংশ'। ইহার চারিটি দ্বার থাকিত বলিয়া ইহাকে চতুর্দ্বার মণ্ডপও বলা হইত। মণ্ডপের চারিদিক তৃণাচ্ছাদিত করা হইত।

যজ্ঞমণ্ডপ-নির্মাণের পর যজ্ঞের দ্রব্যসম্ভার আহরিত হইত। তৎপরে ঋত্বিগ্‌গণ যজমানকে সেই গৃহে লইয়া গিয়া দীক্ষা দান করিতেন।

হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতৃভেদে ঋত্বিক চতুর্বিধ। সকল যজ্ঞে সমান সংখ্যক ঋত্বিকের প্রয়োজন হইত না। সোমযাগে ১৬ জন ঋত্বিকের প্রয়োজন। ইঁহারা চারিগণে বিভক্ত—অধ্বর্যুগণ, ব্রহ্মগণ, হোতৃগণ ও

পূর্ব
উত্তর
দক্ষিণ
পশ্চিম
যূপ
ধিষ্ণ্য
ঐষ্টিক বেদি
আ·ধ= আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্য
মা·ধ= মার্জ্জালীয়
অন্যান্য ধিষ্ণ্য
১ অচ্ছাবাক, ২ নেষ্টা
৩ পোতা, ৪ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী
৫ হোতা, ৬ মৈত্রাবরুণ
শ= হবির্দ্ধান শকটদ্বয়
আ= আহবনীয়, দ= দক্ষিণাগ্নি, ব= ব্রহ্মার আসন
হ = হোতার আসন

যজ্ঞভূমি পরিচয়
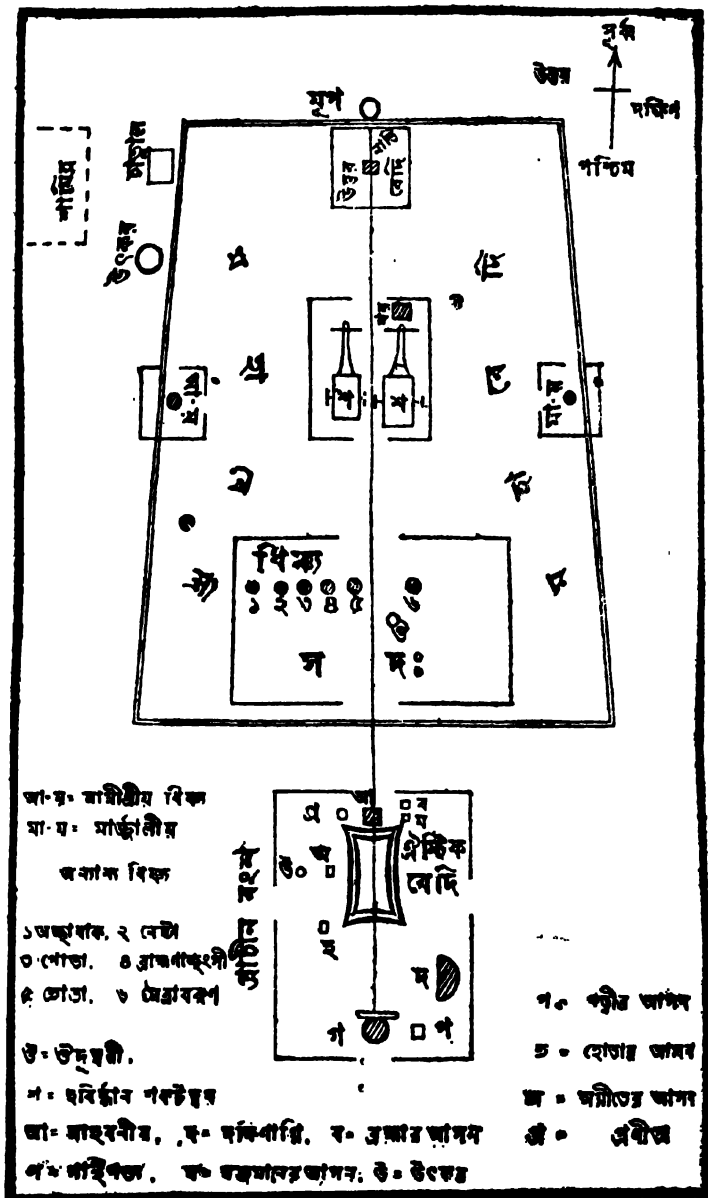
উদ্‌গাতৃগণ। এক-একটি গণে চারিটি-চারিটি করিয়া ষোড়শ সংখ্যা পূর্ণ হয়। চতুর্গণ যথা—

ক	খ
অধ্বর্যুগণ	ব্রহ্মগণ
১ অধ্বর্যু	১ ব্রহ্মা
২ প্রতিপ্রস্থাতা	২ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী
৩ নেষ্টা	৩ আগ্নীধ্র
৪ উন্নেতা	৪ পোতা

গ	ঘ
হোতৃগণ	উদ্‌গাতৃগণ
১ হোতা	১ উদ্‌গাতা
২ মৈত্রাবরুণ বা প্রশাস্তা	২ প্রস্তোতা
৩ অচ্ছাবাক	৩ প্রতিহর্তা
৪ গ্রাবস্তুৎ	৪ সুব্রহ্মণ্য

উল্লিখিত ক্রম-অনুসারে সংখ্যানেরও ১ম, ২য়—ইত্যাদি ক্রম হইবে। অধ্বর্যুগণে অধ্বর্যু প্রথম, প্রতিপ্রস্থাতা দ্বিতীয় ইত্যাদি। তদনুসারে দক্ষিণায়ও ক্রমের বিধি। অধ্বর্যু যতগুলি গো পাইবেন তাহার অর্ধেক প্রতিপ্রস্থাতা পাইবেন। অধ্বর্যুর ভাগের তৃতীয় অংশ নেষ্টা পাইবেন, চতুর্থ অংশ উন্নেতা। ইঁহাদগকে অর্ধী, তৃতীয়ী, পাদী ও বলা হইয়া থাকে। গণান্তরেরও এইরূপ ব্যবস্থা। এই ঋত্বিগ্‌গণকে বেদত্রয়-সম্বন্ধীয় কর্ম করিবার জন্যই বরণ করা হইয়া থাকে। আপস্তম্ব বলেন, এই ষোলজন ঋত্বিক্ ছাড়া এই যজ্ঞে 'সদস্যে'রও প্রয়োজন আছে। তাহা হইলে ১৭ জন ঋত্বিকের আবশ্যক। ইঁহাদের মধ্যে চারিজন প্রধান ঋত্বিক্; যথা—হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা। অবশিষ্ট ঋত্বিকেরা ঐ চারি জনের সাহায্য করিতেন। হোতার সাহায্যকারী তিনজন—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক ও গ্রাবস্তুৎ। উদ্‌গাতার সাহায্যকারী প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা ও সুব্রহ্মণ্য। অধ্বর্যুর সাহায্যকারী প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা। ব্রহ্মার সাহায্যকারী ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা ও আগ্নীধ্র।

দেবতার স্তব ও আহ্বানকার্য হোতাকে করিতে হইত। যজ্ঞে আহুতিদান হইতে হোমদ্রব্য প্রস্তুত করা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক প্রধান কর্ম-সকল অধ্বর্যুকে করিতে হইত। উদ্গাতা দেবতার সন্তোষজনক সামগান করিতেন। কর্ম-বিশেষে অনুমতি দেওয়া এবং সকলের কার্য দেখাশুনা করা ও জপ করা ব্রহ্মার কার্য। সদস্যের কার্য দোষগুণ পর্যবেক্ষণ করা।

বসন্তকালের যে কোন পুণ্যদিনে এই অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান করিতে হয় —প্রারম্ভে আভ্যুদয়িক। সাধারণত শুক্লা একাদশীতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমায় অগ্নিষ্টোম সমাপন করিতে হয়। ইহাই সম্প্রদায়গত বিধি। আভ্যুদয়িকের পর ঋত্বিগ্‌বরণ। সোমপ্রবাক নামক ঋত্বিক্‌কে প্রথমে বরণ করিতে হয়। ইনি বৃত হইয়া অধ্বর্যু প্রভৃতির গৃহে গমন করেন, সেখানে তাঁহাদিগকে বলেন—অমুকশর্মার যজ্ঞ হইবে, সেখানে আপনাদিগকে ঋত্বিকের কার্য করিতে হইবে। এইরূপ বাক্যে তাঁহাদিগকে লইয়া যজমানের গৃহে আগমন করেন। যজমান এইসকল ঋত্বিক্‌কে বরণ করেন। শাখান্তরে সদস্যবরণও উক্ত হইয়াছে (আপ-শ্রৌ. ১০. ১. ৯-১০)।

কিন্তু প্রচলিত শ্রুতিতে তাহা নিষিদ্ধ (শ-ব্রা. ১০. ৪. ১. ১৯)। অতঃপর বৃত ঋত্বিগ্‌গণকে মধুপর্ক দান করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠান গৃহে করিয়া তারপর অগ্নিসমারোহণপূর্বক যেখানে সোমদ্বারা যজন হইবে সেই স্থানে যজমান গমন করেন। এইস্থানে শালা বা বিমিত নির্মাণ করিয়া বিতান প্রস্তুত করিতে হয়। তারপর অরণি মন্থন করিয়া তাহা হইতে উত্থিত অগ্নিচয় কুণ্ডসমূহে যথারীতি স্থাপন করিতে হইবে। অপরাহ্ণে যজমান ও তৎপত্নী অভীষ্ট ভোজন করিবেন, নাও করিতে পারেন। তবে প্রথম দিনেই ইঁহারা ভোজন করিতে পারিবেন। অবশিষ্ট চারিদিন তাঁহাদিগকে উপবাস করিতে হইবে। অতঃপর অবভৃথ। অনন্তর পুনরায় উভয়ের ভোজন। মধ্যে ব্রতপ্রাশন বিহিত। এই সময়ে ঋত্বিকেরা যজমানকে যজ্ঞমণ্ডপে লইয়া গিয়া দীক্ষিত করেন। দীক্ষা-গ্রহণের সময় যজমান প্রথমে ক্ষৌরকর্ম, পরে স্নান ও নববস্ত্র পরিধান করিয়া মাঙ্গল্যদ্রব্য ধারণ করেন। পশ্চাৎ জ্ঞাতি-কুটুম্বের সহিত যজ্ঞশালায় নীত হন। ঋত্বিকেরা দর্ভপিঞ্জলী অর্থাৎ কুশগুচ্ছের দ্বারা তাঁহার সর্বাঙ্গ মার্জন করেন।

বেদমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে যজমানকে 'প্রাচীন-বংশ' নামক যজ্ঞ-মণ্ডপের পূর্বদ্বার দিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করান। প্রবেশের পরেই তাঁহাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করাইতে হয়। এই কার্য করিতে মাত্র একটি ক্ষুদ্র হোম করান হইয়া থাকে। ইহার নাম 'দীক্ষণীয়া ইষ্টি'। এই ইষ্টিতে অগ্নাবিষ্ণু দেবতার উদ্দেশে একাদশটি পুরোডাশ হোম করা বিধেয়।

তৎপরে যে যজমান ইতঃপূর্বে সোমযাগ করেন নাই তাঁহার জন্য 'ত্বমগ্নে স প্রথা অসি জুষ্টো হোতা বরেণ্যঃ। ত্বয়া যজ্ঞং বিতন্বতে' (ঋ. ৫. ১৩. ৪)। এবং 'সোম যাস্তে ময়োভুব উতয়ঃ সন্তি দাশুষে। তাভির্নোঽবিতা ভব' (ঋ. ১. ৯১. ৯)—এই দুইটি ঋঙ্মন্ত্র হোতা অধ্বর্যুর আদেশ-অনুসারে পাঠ করেন। এই দুইটি যাজ্যা ভাগদ্বয়ের পুরোঽনুবাক্যরূপে পঠিত হয়।

তৎপরে যাজ্যাভাগ দান-কর্মাঙ্গে নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্র অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে হবিঃপ্রদানের জন্য অনুবাক্যা বা যাজ্যারূপে ব্যবহৃত হয়।

১ম—'অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানাং সংগতানামুত্তমো বিষ্ণুরাসীৎ।
যজমানায় পরিগৃহ্য দেবান্ দীক্ষযেদং হবিরাগচ্ছতং নঃ॥[১৮]

২য়—অগ্নিশ্চ বিষ্ণো তপ উত্তমং মহো দীক্ষাপালায় বনতং হি শক্রা।
বিশ্বেদেবৈর্যজ্ঞিয়ৈঃ সংবিদানৌ দীক্ষামস্মৈ যজমানায় ধত্তম্॥'[১৯]

দীক্ষাকার্য শেষ হইলে প্রথমে প্রতিপ্রস্থাতা উচ্চৈঃস্বরে দেবতা ও মনুষ্যদিগকে শুনাইয়া বলেন, 'দীক্ষিতোঽয়ং ব্রাহ্মণঃ' অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইলেও ব্রাহ্মণ বলা হইত।[২০]

তৎপরে দ্বিতীয় দিনের কৃত্য। দীক্ষিত যজমান নিজে 'প্রায়ণীয়েষ্টি' নামক ক্ষুদ্র যাগ করেন। এই যাগে পঞ্চ দেবতা—অদিতি, পথ্যাস্বস্তি, অগ্নি, সোম ও সবিতা; তন্মধ্যে অদিতি প্রধান। এই যজ্ঞে চরু পাক করিয়া তাহার দ্বারা অদিতি এবং (আজ্য) ঘৃতের দ্বারা পথ্যাস্বস্তি, অগ্নি, সোম ও সবিতা এই চারি দেবতার উদ্দেশ্যে যাজ্যাহুতি দিতে হয়। অনুযাজের পর শংযুবাক সমাপ্তি। এই ইষ্টি সম্পন্ন হইলেই প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞের আরম্ভ হয়। পরে 'উদয়নীয়া ইষ্টি' করিয়া সোমযজ্ঞের শেষ করিতে হয়। প্রথমে প্রতিপ্রস্থাতা নামক ঋত্বিক্ 'উপসব' প্রদেশে একখানি বৃষচর্ম বিস্তার করেন এবং তাহার উপরে কুশ বিছাইয়া

তদুপরি সোমলতার বোঝা স্থাপন করেন। সোমবিক্রেতা সোমের অংশগুলি বা তন্তুসকল পরীক্ষা এবং পরিষ্কার করিতে থাকে। পরে ১৭জন ঋত্বিক্‌-সহ যজমান তথায় আসিয়া উহা একটি অরুণবর্ণ পিঙ্গলচক্ষু এক বৎসরের গোবৎসের বিনিময়ে ক্রয় করেন। পরে বিক্রেতাকে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করিয়া রাজা সোমকে শকটে তুলিয়া সেই 'প্রাচীন বংশ' নামক যজ্ঞগৃহে পূর্বদ্বার দিয়া আসিয়া 'আহবনীয়' নামক অগ্নিকুণ্ডের দক্ষিণ দিকে একখানি কাষ্ঠের পিঁড়ির উপর মৃগচর্ম বিছাইয়া তাহার উপর রাখিতে হয়। এই সময়ে 'আতিথ্যেষ্টি' নামক অপর একটি ছোট রকমের যজ্ঞ করিতে হয়।[২১] ইহা খণ্ডেষ্টি। ইহার উদ্দেশ্যে রাজা সোম যজমানের গৃহে অতিথি হইয়া আসিতেছেন। অতিথির যথোপযুক্ত সৎকার করা কর্তব্য, এইজন্য তাঁহার উদ্দেশে আতিথ্য হবিঃ নির্বপণ করা হয়। ইহার পরে সোমপ্রবহণ (৩ অ. ১ খ.) অগ্নিমন্থন, (৫ খ.) আতিথ্যেষ্টি, (৬ খ.), প্রবর্গ্যকর্ম (৪ অ. ১ খ.), উপসদিষ্ট (৮ খ.), উপাংশু সোমপ্যায়ননিহ্নব (৯ খ.) যথাবিধি সম্পন্ন করিতে হয়। ইহাদের ভিতর আমরা কয়েকটি যজ্ঞসম্বন্ধে কিছু বলিব। উপসদ যজ্ঞটি সোমযজ্ঞের বিঘ্নকারী অসুরদিগের পরাভবের জন্য করিতে হয়। ইহাতে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সোম ও বিষ্ণু দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাহুতির দ্বারা হোম করিতে হয়। এই যজ্ঞ তিন দিনব্যাপী। তৃতীয় দিনে প্রাতঃকালে প্রবর্গ্য উপসদের কৃত্য সম্পাদন করিয়া সৌমিকী মহাবেদী নির্মাণ করিতে হয়। ইহা বংশশালার সম্মুখে তিন পদ পরিমিত ভূভাগ ছাড়িয়া পূর্ব-পশ্চিমে আয়ত ও বিস্তৃত করিয়া নির্মিত হয়। এই বেদীটির উপরিভাগ ও চারিদিক লতা-বিতান দ্বারা আবৃত করা হয়। ইহার সম্মুখ-ভাগের নাম 'অংস' ও পশ্চাদ্‌ভাগের নাম 'শ্রোণী'। অংসপ্রদেশে দশপদ-পরিমিত একটি বেদী রচনা করা হয়। ইহাকে 'উত্তর বেদী' বলা হয়, ইহা দেখিতে অগ্নিহোত্র বেদীর মত কৃশমধ্য। এই বেদীর অংসদেশের উত্তরভাগে পূর্ব-পশ্চিমে একপদ আয়ত এক বেদী নির্মিত হয়। ইহার আকারও অগ্নিহোত্র বেদীর মত। ইহার পর মহাবেদীর মধ্যভাগে শ্রোণী রেখা টানা হয়। মধ্য হইতে অংস পর্যন্ত এই রেখার নাম 'পৃষ্ঠ্যা'। মহাবেদীর উত্তরাংশের পশ্চাদ্‌ভাগে তিন পা দূরে 'চত্বালক' নামে একটি

গর্ত খনন করা হয়। ইহা হইতে বার পা দূরে 'উৎকর' নামক আর একটি গর্ত খনিত হয়।

এইগুলি নির্মিত হইলে অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা 'হবির্ধান' নামক দুইখানি শকট সেই উৎকর গর্তে ধৌত করিয়া পশ্চিম ধার দিয়া বেদীতে আনিয়া শ্রোণীর নিকটে রাখেন এবং 'পৃষ্ঠ্যা' নামক রেখার দক্ষিণ পার্শ্বে একখানি শকট মধ্যে রাখিয়া দক্ষিণ-উত্তর ক্রমে ৩ অরত্নি এবং ৯ অরত্নি পরিমিত চতুরস্র এবং চারিটি স্তম্ভবিশিষ্ট একটি মণ্ডপ নির্মাণ করেন। এই মণ্ডপের নাম 'হবির্ধান' মণ্ডপ। ইহার পূর্ব ও পশ্চিমে দুইটি দরজা থাকে। বীরণ অর্থাৎ শরপত্রের মাদুর দিয়া চারিদিক আচ্ছাদিত করা হয়।

তৎপরে মণ্ডপের মাঝখানে সমান চারিটি প্রকোষ্ঠ তৈয়ারী করিতে হয় এবং উহার অগ্নিকোণস্থ প্রকোষ্ঠের মাঝখানে এক হাত প্রমাণ সমচতুরস্র কাল্পনিক রেখা টানিয়া প্রত্যেক কোণের প্রান্তভাগে বিস্তারে অর্ধহস্ত ও গভীরতায় এক হস্ত এরূপ চারিটি গর্ত করিতে হয়। এই গর্তগুলির মুখে বরুণ কাঠের অথবা যজ্ঞডুমুর কাঠের চারিখানি ফলক দ্বারা পুটিত অর্থাৎ বন্ধ করিতে হয়। এই কাঠের উপর বৃষচর্ম ও তদুপরি শিলাপট্ট বা পাথরের পাটা রাখিতে হয়। ইহাতেই রসনিষ্কাষণের জন্য সোম পিষ্ট হইয়া থাকে।

'হবির্ধান'-মণ্ডপের সম্মুখে 'পৃষ্ঠ্যা' নামক স্থানের দক্ষিণে হবির্ধান মণ্ডপের মত 'সদোমণ্ডপ' নির্মিত হইয়া থাকে অর্থাৎ মহাবেদী বা সৌমিক বেদীর পশ্চিমাংশে এই মণ্ডপ। এই মণ্ডপ দশ অরত্নি প্রমাণ পূর্বায়ত, নয় অরত্নি দীর্ঘ, চতুরস্র, স্তম্ভসুশোভিত এবং সুপরিষ্কৃত। এই সদোমণ্ডপের ঠিক মধ্যভাগে যজমানের তুল্য-প্রমাণ একটি উদুম্বরীস্থূণা (অর্থাৎ যজ্ঞডুমুর কাঠের খোঁটা) প্রোথিত করা হয়। ইহার পশ্চাতে সদোমণ্ডপ ও হবির্ধান-মণ্ডপের উত্তরভাগে আগ্নীধ্রশালা নির্মিত হইয়া থাকে। ইহার পরিমাপ পূর্বেরই মত, কেবল ইহা পূর্বপশ্চিমে একটু দীর্ঘ। ইহার অর্ধাংশ বেদীর প্রান্তপ্রদেশে প্রবিষ্ট এবং অপর অর্ধাংশ বাহিরে নিঃসৃত থাকে। দক্ষিণ ও পূর্বদিকে ইহার দুইটি দ্বার থাকে। এই সদোমণ্ডপের মধ্যে উত্তর হইতে দক্ষিণে সারি বাঁধিয়া ৬টি 'ধিষ্ণ্য' থাকে। এগুলি মৃত্তিকা ও কাঁকরের এক হস্ত প্রমাণ বেদী। 'ধিষ্ণ্য'গুলির প্রায় মধ্যভাগে ঔদুম্বরী

স্থাপিত হয়। ধিষ্ণ্যগুলির মধ্যে দুইটি ধিষ্ণ্যের মধ্যে যেটি দক্ষিণভাগে অবস্থিত সেটির নাম 'মার্জালীয়', আর যেটি উত্তরভাগে অবস্থিত তাহার নাম 'আগ্নিধ্রীয়' অগ্নিকুণ্ড। সদোমণ্ডপমধ্যে অচ্ছাবাকের জন্য ১টি, নেষ্টার জন্য ১টি, পোতার জন্য ১টি, ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর জন্য ১টি ও মৈত্রারুণের জন্য ১টি; আগ্নীধ্রর জন্যও ১টি ধিষ্ণ্য থাকে। এই সাতটি ধিষ্ণ্য দক্ষিণ হইতে উত্তরে যথাক্রমে মৈত্রাবরুণ, হোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা, অচ্ছাবাক ও আগ্নীধ্র এই সাত জন ঋগ্বেদী ঋত্বিকের জন্য। সবনত্রয়ে শস্ত্রপাঠের সময় ঐ ঋত্বিকেরা আগ্নীধ্র হইতে অগ্নি লইয়া নিজ নিজ ধিষ্ণ্য জ্বালিতে থাকেন। এই মণ্ডপমধ্যে ধিষ্ণ্যের পার্শ্বে শস্ত্রপাঠকেরা শস্ত্রপাঠ করেন ও ঔদুম্বরী ধরিয়া উদগাতারা স্তোত্রগান করেন।

মহাবেদীর সম্মুখে এবং আহবনীয় কুণ্ডের নিকটে যজ্ঞীয় যূপস্তম্ভ প্রোথিত করা হয়। যজ্ঞীয় যূপসকল অষ্টাস্র বা আট পোয়ালে হইত। বিশেষ বিশেষ যজ্ঞে ইহার উচ্চতার তারতম্য হইত। সোমযজ্ঞে যূপের উচ্চতা পঞ্চ অরত্নি হইতে পঞ্চদশ অরত্নি পর্যন্ত হইত। যূপগুলি খদির কাষ্ঠ বা তাহার অভাবে পলাশ কাষ্ঠের হইত।

সোমযাগে অধিকার পাইবার পূর্বে তিন দিন ধরিয়া যে সকল কর্ম অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহার নাম 'প্রবর্গ্য যজ্ঞ'। এই যজ্ঞ দুই দিন পূর্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে ও তৃতীয় দিন পূর্বাহ্ণে দুই বার করিতে হয়। উপসদিষ্টির পর ইহা করা উচিত। ইহাতে ছয় জন ঋত্বিকের আবশ্যক—ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্যু, অগ্নীৎ, প্রতিপ্রস্থাতা ও প্রস্তোতা। প্রধান হব্যের নাম 'ঘর্ম'। মহাবীর নামক মৃদ্ভাণ্ডে গোদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ মিশাইয়া পাক করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। অধ্বর্যু মহাবীর নির্মাণ ও ঘর্ম পাক হইতে আহুতি দান পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় কাজগুলি করেন। এই কার্যে প্রতিপ্রস্থাতা তাঁহার সাহায্য করিয়া থাকেন। প্রস্তোতা সামগান করেন, হোতা প্রত্যেক কর্মের অনুকূল স্তব বা অভিষ্টব মন্ত্র পাঠ করেন। যজ্ঞান্তে সকলে ঘর্ম-শেষ ভক্ষণ করেন। ইহার পর চতুর্থ দিনে 'বৈসর্জন' নামক হোম করিতে হয়।

এইদিনেই অগ্নীষোমীয় পশু যূপে বন্ধন করা হয়। অগ্নি-প্রজ্বালন ও সোম-প্রণয়ন হইলেই তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য অগ্নিষোমীয় পশুযাগ করা

উচিত। অগ্নীষোমীয় পশু দুই বর্ণের হওয়াই উচিত, কারণ এই যজ্ঞ অগ্নি ও সোমের উদ্দিষ্ট। ব্রহ্মবাদীরা কিন্তু এই নিয়ম মানিয়া চলেন না। তাঁহাদের মতে পশু স্থূল হওয়া কর্তব্য।

বংশশালার উত্তর বেদীস্থিত সোমলতা আনীত হইয়া যখন হবিধান-মণ্ডপে রাখা হয়, তখন যজ্ঞের পশুকে পবিত্রজলে স্নান করাইয়া যূপের সম্মুখে পশ্চিম মুখে রাখিতে হয়। পরে কুশপিঞ্জলিযুক্ত প্লক্ষ-শাখার দ্বারা স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপূত করা হয়। প্লক্ষ ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্য।—ঐ-ব্রা. ৭. ৬. ৩৫ ইহার পর হইতে পশু-হনন পর্যন্ত যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয় সেগুলির নাম পশ্বালম্ভন।

যজ্ঞকার্যের জন্য জাতদন্ত, অবিকৃতাঙ্গ, নীরোগ ও পুষ্ট একটিমাত্র ছাগই গ্রহণ করা বিধেয়। এই প্রকারের পশু যজ্ঞস্থলে নীত হইলে ঋত্বিকরা উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকেন। তৎপরে তাঁহারা আধুনিক বলিদান প্রথায় ছাগকে হনন না করিয়া 'সংগপন' কার্য সম্পন্ন করিতেন অর্থাৎ মুষ্ট্যাঘাত প্রভৃতি নিষ্ঠুর উপায়ে ছাগকে বধ করিতেন। এই কার্য যে কোন ব্যক্তি সম্পন্ন করিতে পারিতেন। ইহার পর উহার হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষ, যকৃৎ, বৃক্কদ্বয়, সম্মুখের বামপদ, পার্শ্বদ্বয়, দক্ষিণ শ্রোণী, পায়ুনাল, বপা ও বসা প্রভৃতি কয়েকটি অঙ্গ কাটিয়া 'শামিত্র' নামক অগ্নিকুণ্ডে পাক করিয়া মন্ত্রগান করিয়া আহুতি প্রদান করিতে হয়। এই হোমের কার্যের নাম 'অগ্নীষোমীয় পশুযাগ'।

ইহার পর ঋত্বিকেরা এই দিন চাত্বাল ও উৎকর ভূমির উত্তরভাগে অবস্থিত জলাশয় হইতে জল আনিয়া যজ্ঞশালায় রাখেন। এই জলের বৈদিক নাম 'বসতীবরী'। এই দিবস রাত্রিকালে যজমান ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পুরাতন ঐতিহ্য ও দেবচরিত্র শ্রবণ করিতেন; এইজন্য এই-দিনের নাম ছিল 'উপবসথ'।

ইহার পরদিনের নাম 'সুত্যাদিবস'।[২২] ইহা পঞ্চম দিনের নামান্তর। এই দিনে অধ্বর্যু প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া হবিধান-শকট হইতে সোম আহরণ করিয়া উপসবস্থলে রাখিয়া দেন। অধ্বর্যু অতি প্রত্যূষে উঠিয়া হোতাকে 'প্রেষমন্ত্রে' উদ্বুদ্ধ করেন অর্থাৎ এই মন্ত্রদ্বারা

কর্মানুষ্ঠানে প্রেরণা আনয়ন করেন। হোতাও প্রাতরনুবাক্ পাঠ করিয়া অশ্বিনীকুমারকে স্তব করিতে থাকেন, আগ্নীধ্র পুরোডাশ প্রভৃতি তৈয়ারী করেন এবং উন্নেতা সোমপাত্রসকল সুবিন্যস্ত করিতে থাকেন। সোমপাত্র গ্রহ ও স্থালী ভেদে দুই প্রকার। গ্রহগুলি কাষ্ঠ-নির্মিত ও স্থালীগুলি মৃত্তিকা-নির্মিত।

তৎপরে হবির্ধান-শকটের অক্ষ-প্রদেশে দুইখানি ঔর্ণবস্ত্র অর্থাৎ মেষ-লোমের কম্বল সোমরস-শোধনজন্য স্থাপন করা হয়। উহার একখানি প্রাদেশ ও অপরখানি অরণি পরিমাণ। তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যবর্তী স্থানের পরিমাপকে 'প্রাদেশ' বলে।

ইহার পর দক্ষিণ হবির্ধান-শকটের নিম্নে মৃন্ময় দ্রোণকলস স্থাপন করা হয় এবং উত্তর হবির্ধান-শকটের উপরে উপভৃত ও আধবনীয় নামক দুইটি বৃহৎ কলস রাখা হয়। অধিকন্তু উত্তর শকটের নিম্নে ১০খানি কাষ্ঠ চমস ও ৫টি মৃন্ময় ঘট স্থাপিত করা হয়। এইসকল কার্য উন্নেতাই করিয়া থাকেন।

পরে অধ্বর্যুর আদেশক্রমে যজমান ও তাঁহার পত্নী এবং চমসাধ্বর্যু ঘটদ্বারা জল আনয়ন করেন। পুরুষেরা যে জল আনেন তাহার নাম 'একধনা' ও তাঁহাদের পত্নীর আনীত জলের নাম 'পান্নেজন'। অধ্বর্যু এই দুই প্রকার জল পূর্বকথিত 'বসতীবরী' জলের সহিত মিশ্রিত করেন। পরে যজমান, প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও অধ্বর্যু এই কয়জন ঋত্বিক্ 'সোমাভিষব' ফলকের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া উপলখণ্ড লইয়া অনুজ্ঞা বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকেন। ইহার পর অধ্বর্যু পাঁচ মুঠা সোম সেই প্রস্তরফলকে রাখিবেন, প্রতিপ্রস্থাতা সেই সোমপুঞ্জ হইতে ছয়টি সোমের অংশু গ্রহণ করিয়া আপনার অঙ্গুলি-সন্ধিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। পরে সকলে একত্র হইয়া পেষণকার্য করিবেন। ইহা হইতে সোম নিষ্কাশিত হইবে। এই নিষ্কাশনের নাম 'সোমাভিষব'। ইহা দিনে তিনবার মাত্র করা হয়—প্রাতঃকালীন সোমাভিষবের নাম প্রাতঃসবন, মধ্যে মধ্যাহ্নসবন, সায়ংকালে সায়ংসবন। অভিষুত সোমরস আহুতি প্রদত্ত হয়, অবশিষ্ট ভাগ পানার্থ রক্ষিত হয়।

'সোমাভিষব' হইয়া গেলে ঋত্বিগ্‌গণ 'মহাভিষব' অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে সোম পেষণ আরম্ভ করিয়া দেন। অধ্বর্যু ইহাতে জল-সেচন করিতে থাকেন। উত্তমরূপে পিষ্ট হইলে উহা আধবনীয় কলসে ফেলিয়া আলোড়ন করিতে থাকেন। পরে উহা বস্ত্রের দ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া লওয়া হয়। সেই রস ক্রমে 'গ্রহ', 'চমস' ও 'কলসে' পূর্ণ করা হয়। এই সময় নানা প্রকার বেদমন্ত্রের পাঠ হয় ও সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনী-কুমার, বিশ্বদেব, মহেন্দ্র, বৈশ্বানরাগ্নি, চৈত্রাদি চতুর্দশ মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা[২৩], ইন্দ্রাগ্নি, মরুদ্গণ সহিত ইন্দ্র, ত্বষ্টসহিত অগ্নিপত্নী স্বাহা বা অগ্নায়ী সোমযোগের দেবতাবৃন্দের উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হয়।

পরে ঋত্বিগ্‌গণ ও যজমান যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবেন। ঋত্বিক্ ও যজমানের সোমপানবিধি একরূপ নয়। ঋত্বিকেরা প্রত্যেক সবনেই অবশিষ্ট সোম পান করিবেন; যজমান কেবল সায়ং-সবনে পান করিবেন।

যজ্ঞ শেষ হইলে যজমান সদোমণ্ডপে গিয়া ঋত্বিগ্‌গণকে দক্ষিণা দান করিবেন। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের দক্ষিণাবিভাগ-ক্রমে দ্বাদশ শত গাভী, অভাবে শত গাভী এবং সুবর্ণ, বস্ত্র, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দভ, মেষ, ছাগ, অন্ন, যব ও মাসকলাই।

ইহার পরে যজ্ঞে নিযুক্ত ঋত্বিকেরা সপত্নীক যজমান, বন্ধু, বান্ধব, সুহৃদ্-বর্গসহ কোন মহানদীতে, অভাবে কোন পুণ্য জলাশয়ে গমন করিয়া 'অবভৃথ' স্নান করিয়া থাকেন। যাইবার সময় প্রস্তোতা সাম গান করিতে করিতে যান ও পত্নীসহ যজমান ও বন্ধুবান্ধবেরা 'নিধন' বাক্য গায়িতে গায়িতে যান। এই 'নিধন' বাক্য আমাদের গানের 'ধুয়া'র ন্যায়। জলাশয়ের নিকট গিয়া সপত্নীক যজমান পুরোডাশাহুতি দিলে সকলে জল-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। স্নানান্তে যজমান ও তাঁহার পত্নী দীক্ষাকালে গৃহীত কৃষ্ণাজিন-আদি ত্যাগ করেন ও বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া 'উদয়নীয় ইষ্টি'-প্রভৃতি সম্পন্ন করিবার জন্য যজ্ঞস্থলে দেবযজন দেশে ফিরিয়া আসেন। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞেই যে কেবল অবভৃথ স্নানের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নয়, ইহা সমস্ত বৃহৎ যজ্ঞেরও অঙ্গ।

পাদটীকা

১ সামগানসমূহের উত্তরাগ্রন্থে তৃচাত্মক সূক্তগুলি আম্নাত হইয়াছে — সাম-উ. ১.১.১-৯। সূক্তগুলির প্রথম সূক্ত—'উপাস্মৈ'। 'দবিদ্যুততত্যা'—দ্বিতীয় এবং 'পবমানস্য তে'—তৃতীয় সূক্ত। জ্যোতিষ্টোমের প্রাতঃসবনানুষ্ঠানে এই তিনটি সূক্তের মধ্যে গায়ত্র সাম গীত হইবে। এই সূক্তত্রয়গানসাধ্য স্তোত্রকে 'বহিষ্পবমান' বলে। পবমানার্থ ও সম্বন্ধত্বহেতু এই স্তোত্রস্থ ঋকৃগুলির 'বহি' নামে অভিহিত হইবার তাৎপর্য।

২ 'আ নমস্তাজ্জয়ন্ত্যেভিরিত্যাজ্যামি'—ঐ-ব্রা. ২.৫.৪ ; তা-ব্রা. ৭.২। উত্তরাগ্রন্থে তিনটি বহিষ্পবমান সূক্ত ব্যতীত চারিটি সূক্ত আম্নাত হইয়াছে। এই চারিটি প্রাতঃসবনে গায়ত্র সাম দ্বারা গীত হয়। ইহাদের নাম আজ্যস্তোত্র।

৩ উত্তরাগ্রন্থে আজ্যস্তোত্র ব্যতীত যে তিনটি সূক্ত, সেই তিনটি মাধ্যন্দিন-সবনে গায়ত্রা-হংমহীষব-রৌরব-যৌধাজয় শনসান দ্বারা গীয়মান পঞ্চ-স্তোত্র মাধ্যন্দিনসবনস্তোত্র।

৪ বৃহৎ, রথন্তর, বৈরূপ, বৈরাজ, শাক্ক ও রৈবত এই ছয়টি সামকে 'পৃষ্ঠ' বলে।—তা-ব্রা. ৭.৬.৭ ; তৈ-ব্রা. ১.২.২.৩। 'পৃষ্ঠানাংসমূহঃ পৃষ্ঠ্যঃ'—পা-ব্রা. ৪.২.৪২। 'স্পৃশতি প্রাপ্নোতি স্বর্গো লোকোঽনেন সামষট্‌কেন ইতি পৃষ্ঠ্যঃ স্বর্গং লোকমস্পৃশংস্তস্মাৎ পৃষ্ঠ্যঃ'—শ-ব্রা. ১২.২.২.১১। রথন্তরাদি ছয়টি স্তোত্রকে পৃষ্ঠ্যস্তোত্র বলে। সপ্তম কোন পৃষ্ঠ্যস্তোত্র নাই।—তৈ-স. (সা.) ১.১৫।

৫ তৃতীয়সবনে গেয় গায়ত্র-সংহিত-শফ পৌষ্কলশ্যাবাস্বগন্ধীগব-সামদ্বারা নিষ্পাদ্য আর্ভব ছয়টি পবমান স্তোত্র ঋভুনামক দেবগণকর্তৃক দৃষ্ট।—তা-ব্রা. ৮.৪.৫।

৬ আত্মা বা অগ্নিষ্টোমঃ।—তা-ব্রা. ১৯.৫.১১।

৭ বীর্যং বা অগ্নিষ্টোমঃ।—তা-ব্রা. ৪.৫.২১।

৮ প্রতিষ্ঠা বা অগ্নিষ্টোমঃ।—কৌ-ব্রা. ২৫.১৪।

৯ ত্রিবৃদগ্নিষ্টোমঃ।—য.-৩.৯।

১০ ব্রহ্মা বা অগ্নিষ্টোমঃ।—কৌ-ব্রা. ২১.৫।

১১ জ্যোতির্বা অগ্নিষ্টোমঃ।—কৌ-ব্রা. ২৫.৯।

১২ যো বা এষ (সূর্যঃ) তপত্যেষোঽগ্নিষ্টোম এষ সাহ্নঃ।—ঐ-ব্রা. ৩.৪৪। যো হ বা এষ (সূর্যঃ) তপত্যেষোঽগ্নিষ্টোম এষ সাহ্নঃ।—গো-ব্রা. উ. ৭.১০।

১৩ অগ্নিরগ্নিষ্টোমঃ।—ঐ-ব্রা. ৩.৪১। অগ্নির্বাঽগ্নিষ্টোমঃ—শ-ব্রা. ৩.৯. ৩ ৩২।

১৪ অগ্নিষ্টোমো বৈ সংবৎসরঃ।—ঐ-ব্রা. ৪. ১২।

১৫ অগ্নিষ্টোমো বৈ যজ্ঞানাং মুখম্।—কৌ-ব্রা. ১৯.৮। যজ্ঞমুখং বা অগ্নিষ্টোমঃ।—তৈ-ব্রা. ১.৮.৭.১ ; তা-ব্রা. ১৮.৮.১।

১৬ জ্যেষ্ঠযজ্ঞো বা এস যদগ্নিষ্টোমঃ।—তা-ব্রা. ৬.৩.৮। এষ বাব যজ্ঞঃ (='মুখ্যো যজ্ঞঃ'—সায়ণ) যদগ্নিষ্টোমঃ, একস্মা অন্যো যজ্ঞঃ কামায় ক্রিয়তে সর্বেভ্যোঽগ্নিষ্টোমঃ।—তা-ব্রা. ৬.৩ ১-২।

১৭ অগ্নিষ্টোমেন বৈ দেবা ইমং লোকং (ভূলোকং) অভ্যজুয়ন্।—তা-ব্রা. ৯.২.৯ ; ১০.১.৩।

১৮ কা-স. ৪.১৬ ; তৈ-ব্রা. ২.৪.৩.৩ ; আপ-শ্রৌ ৪.২.৩।

১৯ ঐ-ব্রা. ১.৪.৮ ; তৈ-ব্রা. ২.৪.৩ ৪ ; আপ-শ্রৌ ৪.২.৩।

২০ প্রযন্তি স্বর্গমনয়া সা প্রায়ণীয়া। ইহা দ্বারা ইষ্টি করিয়া সোমযাগ আরব্ধ হয়।—কা-শ্রৌ. ৭.৫.১৩ : আপ-শ্রৌ. সূ. ৪.২.১৮ ; ৪.৩.১। যেদিন সোম ক্রয় করা হয় সেইদিনই প্রায়ণীয়েষ্টি করিতে হয়।—তৈ-স. ৬.১.৫.১ ; শ-ব্রা. ৩.২.৩.২ ; নিরুক্ত ১৩.১.৭।

২১ আতিথ্যেষ্টির দেবতা বিষ্ণু ; নবকপাল পুরোডাশ—দ্রব্য।

২২ যস্যাং ক্রিয়ায়াং সোমেঽভিসূয়তে সা সুত্যা।

২৩ প্রকৃত মাস দ্বাদশ হইলেও দুইটি মলমাসের সহিত চতুর্দশ হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী

[W. Caland & V. Henry : L'Agnistoma ; Eggeling : *Satapatha-Brahmana* ; SBE, xxvi. 299-301 ; xli. xii-xiv, 11sq ; xlii 589 ; xliii-287n ; xliv. 140n, 295sq ; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ : ঐ. : যজ্ঞকথা ; ড. রামদাস সেন : ঐতিহাসিক রহস্য ; A. Weber : *The Satapatha-Brahmana* ; বিদ্যাধর শর্মা : কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র, কাশী ; রামনারায়ণ

বিদ্যারত্ন : আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র ; Alfred Hillebrandt : *The Sankhayana-Srauta-Sutra* ; Dr. R. Garbe : *Vaitana-Sutra* ; আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ : লাট্যায়নশ্রৌতসূত্র ; Dr. A. Weber : *The Srauta-Sutra of Katyayaua* ; Dr. R. Garbe : *The Srauta-Sutra of Apastamba* ; Dr. F. Knauer : *Das Manava-Srauta-Sutra* ; এবং পাদটীকা দ্র.]

[বঙ্গীয় মহাকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০-৪০৬ এবং প্রণব পত্রিকায় ১৩৪৩, পৌষ সংখ্যায় আংশিক প্রকাশ, পৃ. ২৯২-২৯৪]

(২)

অতিরাত্র

রাত্রিব্যাপী সোমযাগ-বিশেষ। অতিরাত্র যাগে রাত্রিকালে নির্দিষ্ট সময়ে তিনটি পর্যায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক পর্যায়ে সোমপূর্ণ চমস ঋত্বিকৃগণের নিকট চারিবার ঘুরাইয়া আনিতে হয়। এক-একবার ঘুরাইয়া আনিবার সময় এক-এক শস্ত্র ও এক-এক যাজ্য পঠিত হয়। যাজ্যান্তে সোমাহুতি হয়। প্রথম পর্যায়ে প্রথমে হোতার, পরে মৈত্রাবরুণের, অতঃপর ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর ও তৎপরে অচ্ছাবাকের চমস ঘুরাইয়া আনা হয়। এইরূপ আরও দুইটি পর্যায় অনুষ্ঠিত হয়। চমস ঘুরিয়া আসে বা পরিভ্রমণ করে বলিয়া ইহার 'পর্যায়' (round) আখ্যা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে অতিরাত্র যাগে রাত্রির পর্যায় হইতেছে ১২টি।[১] এই ১২টি পর্যায়ে ১২টি স্তোত্র ভিন্ন ভিন্ন সুরে গীত হয়। তারপর প্রভাতে সামবেদের (২. ৯৯-১০৪) ৬টি সন্ধিস্তোত্র গীত হয়। ইহা হোতার আশ্বিন শস্ত্রের অনুরূপ। এই আশ্বিন শস্ত্র প্রাতরনুবাকের প্রকারভেদমাত্র। প্রাতরনুবাক সাধারণত সোমযাগের সুত্যাদিবসের প্রথমেই প্রযুক্ত হয়।

অতিরাত্রসংস্থে সরস্বতীদেবীর জন্য চতুর্থ পশু ছাগ যূপালব্ধ করিতে হয়। অথবা অতিরাত্রে মেষী চতুর্থ পশু হয়।[২] ষোড়শিস্তোত্র, শস্ত্র ও পশু অতিরাত্রযাগের অন্তর্ভুক্ত কি না তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ একমত নহেন। রাত্রিকালের অনুষ্ঠানের পূর্বকৃত্য-সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৪. ৬) কেবল পঞ্চদশ স্তোত্র ও শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই ব্রাহ্মণ ষোড়শীকে অতিরাত্রের অংশরূপে স্বীকার করে নাই। পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণে (২০. ১. ১ই.)[৩] দুই প্রকার অতিরাত্র স্বীকৃত হইয়াছে—একটিতে ষোড়শী থাকিবে, অপরটিতে থাকিবে না। কিন্তু কাত্যায়ন (৯. ৮. ৫) ষোড়শীর প্রয়োগ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তৈত্তিরীয়ের

(৬. ৫. ১১) অনুবর্তী হইয়া আশ্বলায়নেরও (৫. ১১. ১) মতে ষোড়শী অতিরাত্রের অংশ। তবে ষোড়শী অবশ্য কর্তব্য কি না বুঝা যায় না। অতিরাত্র অতি প্রাচীন যাগ। ঋগ্বেদে (৭. ১০৩. ৭) এই যাগ অতিরাত্র নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এটি যে একটি সারা রাত্রি-ব্যাপী মহাকোলাহলপূর্ণ সোমপান-মহোৎসব তাহা এমন কি পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য হইতেও বেশ বোঝা যায়। Eggeling[৪] বলেন, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, অতিরাত্রে পর্যায়সমূহে শস্ত্রযাজ্যাদি বিধান এইরূপ যে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ জগতী, অনুষ্টুপ্ এই চারিটি ছন্দের প্রথম তিনটি দিবসে ও অবশিষ্ট অনুষ্টুপ্ রাত্রিকালেই প্রযোজ্য। সেইজন্য উহা রাত্রির স্বরূপ। 'পান্তমা বো অন্ধসঃ' (৮. ৯২. ২) এই অন্ধস্-শব্দযুক্ত অনুষ্টুভে রাত্রির শস্ত্রের আরম্ভ হয়।

হোতাকে সোমলতা বা সোমার্থক এই অন্ধস্-শব্দযুক্ত পানার্থক পা ধাতুনিষ্পন্ন পীতশব্দযুক্ত এবং মত্ততাজন্য হর্ষার্থক মদশব্দযুক্ত চারিটি অভিরূপ ত্রিষ্টুপ্ দ্বারা প্রথম পর্যায়ের চারিটি চমসের যাজ্যা করিতেই হয়। ইহা হোতার অবশ্যকর্তব্য। আর ঋগ্বেদেও (২. ১৯. ১) আমরা ইহারই দ্যোতনা স্পষ্ট দেখিতে পাই—

'অপায্যস্যান্ধসো মদায় মনীষিণঃ সুবানস্য প্রয়সঃ।'

এখানেও 'পা'-ধাতু, 'অন্ধস্'-শব্দ ও 'মদ'-শব্দ আছে। এখানে মত্ততার জন্য সোমপানও করা হইয়াছে। সুতরাং মনে হয়, অতিরাত্রের এই প্রথা প্রথম হইতেই চলিয়া আসিতেছিল।

অতিরাত্রের কার্যাবলী বিচার করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অতিরাত্রের অনুষ্ঠান সমস্ত দিবস হইয়া পররাত্রিতে চলিতে থাকে। এইজন্যই বোধহয় অতিরাত্র নামের সার্থকতা। লাট্যায়নও (৯. ৫. ৪) সম্ভবত এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ইহার শেষাংশকে 'যজ্ঞপুচ্ছ' বলিয়াছেন। আর এই পুচ্ছ মাসের শেষভাগ অতিক্রম করিয়া থাকে এবং ইহাতেই যজ্ঞের পরিসমাপ্তি হয়।

পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণ (২০) এবং লাট্যায়নে (৯. ৫. ৬) অতিরাত্র ও অপ্তোর্যামকে 'একাহ' না বলিয়া 'অহীন' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

অতিরাত্র ও অপ্তোর্যাম একাহ হইতে অহীনে পরিবর্তিত অবস্থার (transition) সূচনা করিয়া দেয়। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (৩. ৪১) পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অপ্তোর্যামকে সোমযাগ বলিয়াছেন, কিন্তু তৈত্তিরীয়-সংহিতা অপ্তোর্যামকে সোমযাগের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করে নাই। অপ্তোর্যাম অতিরাত্রের অধিকতর প্রবৃদ্ধি ; অতিরাত্রকে আরও বাড়াইয়া অতিরাত্রে চারিটি অতিরিক্ত স্তোত্র ও শস্ত্র যোগ করিয়া দিয়া অপ্তোর্যাম অতিরাত্রকে অধিকতর প্রবর্ধিত করিয়াছে।[৫] ব্রাহ্মণে (২. ৭. ১৪) ইহার প্রয়োগাদি প্রদত্ত হইয়াছে।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে অতিরাত্রের-উৎপত্তি —কোন একসময়ে দেবগণ দিনকে এবং অসুরগণ রাত্রিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। উভয়পক্ষই সমানবীর্য লাভ করিয়াছিলেন এবং পরস্পর কেহ কাহাকেও পরাভূত করিতে সমর্থ হন নাই। ইহাতে ইন্দ্র অসুরদিগকে রাত্রি হইতে অপসারণ করিবার জন্য দেবতাদিগকে একযোগে আহ্বান করিলেন—কিন্তু কোন দেবতাই তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিতে সাহস করিলেন না, কারণ তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারকে মৃত্যুর মত ভয় করিতেন। এইজন্য এখনও লোকে রাত্রিকালে গৃহের বাহিরে আসিতে ভয় পায় এবং রাত্রিকে মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ বলিয়া ভাবিয়া থাকে।

ইন্দ্রের আহ্বানে কেবল ছন্দেরা ইন্দ্রের অনুগমন করিয়াছিল। ইন্দ্র ছন্দোগণসহ অতিরাত্র ক্রতুতে রাত্রির কর্ম নির্বাহ করেন। তাহাতে নিবিৎ বা পুরোরুক্ বা ধায্যা বা অন্য দেবতার উদ্দিষ্ট শস্ত্র পঠিত হয় নাই। রাত্রিতে অনুষ্ঠিত পর্যায়সমূহদ্বারাই তাঁহারা যজ্ঞভূমি পরিক্রমণ করিয়া অসুরদিগকে নিরাকরণ করিয়াছিলেন। প্রথম পর্যায়দ্বারা পূর্বরাত্র হইতে, মধ্যম পর্যায়-দ্বারা মধ্যরাত্র হইতে এবং শেষ পর্যায়দ্বারা শেষরাত্র হইতে তাঁহারা অসুর-দিগকে নিরাকরণ করিয়াছিলেন।

পাদটীকা

১ এক-এক বারের অনুষ্ঠান এক-এক পর্যায়। এই পর্যায়গুলি ১৫শ স্তোমবিশিষ্ট। প্রথম ঋকে ৩ বার তৎসাম পাঠ করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋকে এক-একবার পাঠ করিতে হইবে। ইহাই প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়ে ৫টি সংখ্যা পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম ঋক্ একবার পাঠ করিয়া দ্বিতীয় ঋক্ তিনবার পাঠ করিতে হইবে। তৃতীয় ঋক্ একবার। এখানেও ৫টি সংখ্যা পূর্ণ হয়। তৃতীয় পর্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় ঋক্ এক-একবার পাঠ করিয়া তৃতীয় ঋক্ তিনবার পাঠ করিতে হইবে। এখানেও পঞ্চ সংখ্যা পূর্ণ হয়। সমস্ত মিলিয়া পঞ্চদশ। ইহাই পঞ্চদশ স্তোম।

পর্যায়গুলির মধ্যে দুই-দুই পর্যায়ের স্তোম সংখ্যা একযোগে তিনটি হয়। অথবা ষোড়শিসাম একুশটি। সন্ধিস্তোত্র নয়টি—এইরূপে অতিরাত্র মাসের স্বরূপ ; কেননা, মাসে রাত্রি ৩০টি। মাস হইতে সংবৎসর সম্পাদিত হয়। সংবৎসরই অগ্নিবৈশ্বানর। অগ্নিই অগ্নিষ্টোম। এইরূপে সংবৎসরের অনুসরণ করিয়া অতিরাত্র অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে। তৎপ্রবিষ্ট অতিরাত্রের অনুসরণ করিয়া অপ্তোর্যাম অতিরাত্রস্বরূপ হয় এবং অগ্নিষ্টোমে প্রবেশ করে।

প্রথম পর্যায়ে স্তোত্রগানে অসুরদের অশ্ব ও গরু, মধ্যম পর্যায়ে স্তোত্রগানে শকট ও রথ এবং অন্তিম পর্যায়ে স্তোত্রগানে অসুরদের বস্ত্র, হিরণ্য ও মণি কাড়িয়া লওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে স্তোত্রের প্রথম চরণ, মধ্যম পর্যায়ে স্তোত্রের মধ্যম চরণ ও অন্তিম পর্যায়ে স্তোত্রের অন্তিম চরণ দুইবার করিয়া উচ্চারিত হয়।

দিবসের কর্ম পবমানযুক্ত, রাত্রির কর্ম পবমানযুক্ত নহে ; কিন্তু দিবস ও রাত্রির উভয়েই পবমানযুক্ত ও সমানভাগযুক্ত। তাহার কারণ অতিরাত্রে 'ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতম্' (৬. ৯২. ১৯), ইদং বসো সুতমন্ধঃ (৮. ২. ১) এবং 'ইদং হ্যন্বোজ সা সুতম্' (৩. ৫১. ১০) ইত্যাদি মন্ত্রে স্তোত্রগান হয় ও শস্ত্র পাঠ হয় ; তাহাতেই রাত্রির কর্ম পবমানযুক্ত হইয়া থাকে, দিন কর্মের সহিত সমান ভাগযুক্ত হয়।

দিবসে পনের স্তোত্র এবং রাত্রিতে বারটি স্তোত্র, তাহাদের নাম

অপিশর্বর। (প্রতি পর্যায়ে চারিবার সোমাহুতি, শস্ত্রপাঠ ও স্তোত্র-গান হয়, অতএব তিন পর্যায়ে বারোটি স্তোত্র।) ইহা ছাড়াও তিন দেবতার উদ্দেশে রথান্তর নামক সন্ধিস্তোত্র উচ্চারিত হয়। এইরূপে দিবসকর্ম ও রাত্রিকর্ম পঞ্চদশ স্তোত্রযুক্ত হয়।

২ 'সরস্বত্যৈ চতুর্থোঽতিরাত্রে, মেষী বা।'—কা-শ্রৌ. ৯. ৮. ৫।

'অতিরাত্রসংস্থে জ্যোতিষ্টোমে চতুর্থশ্ছাগঃ। সরস্বত্যৈ যূপে আরব্ধব্যঃ। পশুত্রয়ং তু পূর্বোক্তমেব। অথবা অতিরাত্রে চতুর্থঃ পশুর্মেষী স্যাৎ।'—ঐ।

'অতিরাত্রে পশুচতুষ্টয়ং স্তোমায়নম্। এবঞ্চ অগ্নিস্তোমসংস্থায়াং এক এব পশুঃ কার্যঃ। উক্থ্যসংস্থায়াং আগ্নেয়ঃ প্রথমঃ, ঐন্দ্রাগ্নো দ্বিতীয় ইতি পশুদ্বয়ং কার্যম্। ষোড়শিসংস্থায়াং আগ্নেয়ঃ, ঐন্দ্রাগ্নঃ, ঐন্দ্রশ্চেতি পশুত্রয়ম্। অতিরাত্রে ইমে ত্রয়ঃ, মেষী চতুর্থী ইতি পশুচতুষ্টয়মিতি।'—ঐ, ৯. ৮. ৬।

৩ তু.—লাট্যা-শ্রৌ ৮. ১. ১৬; ৯. ৫. ২৩ (সভাষ্য)।

৪ *SBE*, xli. p xviii

৫ বাজপেয় কদাচ প্রকৃত সোমযাগ রূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী

[কা-শ্রৌ.; লাট্যা-শ্রৌ.; শাঙ্খা-শ্রৌ.; তৈ-স.; Weber : শ-ব্রা.; Eggeling: *Satapatha Brahmana*, Intro.; Keith : *Krishna Yajurveda*; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ]

[বঙ্গীয় মহাকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২-৭৩]

(৩)

অগ্নিহোত্র

বিবাহান্তে অগ্ন্যাধান অনুষ্ঠানের পর গৃহস্থকর্তৃক প্রতিদিন সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে আচরণীয় কর্ম। অগ্নিহোত্রযাগে কেবল অধ্বর্যু নামক ঋত্বিকের প্রয়োজন ; তিনি যজমান কর্তৃক বৃত হইয়া গার্হপত্য অগ্নি হইতে জ্বলন্ত অগ্নি লইয়া আহবনীয় অগ্নিতে স্থাপন করেন। মনুর মতে স্ত্রীলোকের অগ্নিতে আহুতি দেওয়া নিষিদ্ধ ; যে স্ত্রীলোক এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে সে নরকে যায় (মনু. ১১.৩৭)। এই যজ্ঞে বিশেষ লক্ষণযুক্ত গাভী হইতে হোমদ্রব্য (ক্ষীর) দোহন করিতে হয়। এই হোমদ্রব্য যতক্ষণ গাভীর শরীরে থাকে, তখন উহার দেবতা রুদ্র ; যখন বৎসের স্পর্শ আসে, তখন উহার দেবতা বসু ; যখন উহা দোহন করা যায়, তখন দেবতা অশ্বিদ্বয় ; দোহনান্তে দেবতা সোম ; অগ্নিতে পাকের সময় দেবতা বরুণ ; পাত্রমধ্যে তাপে স্ফীত হইয়া উঠিবার সময় দেবতা পূষা ; পাত্র হইতে উথলিয়া পরিবার সময় দেবতা মরুদ্‌গণ : বুদ্বুদযুক্ত অবস্থায় দেবতা বিশ্বদেবগণ ; শর পড়িলে দেবতা মিত্র ; অগ্নি হইতে নামাইয়া রাখিলে দেবতা দ্যাবাপৃথিবী ; হোমের জন্য গ্রহণের উপক্রম করিলে দেবতা সবিতা ; গ্রহণ করিয়া লইয়া যাইবার সময়ে দেবতা বিষ্ণু : বেদিতে রাখিলে দেবতা বৃহস্পতি ; প্রথম আহুতিকালে দেবতা অগ্নি ; শেষ আহুতিকালে দেবতা প্রজাপতি এবং আহুতির পর দেবতা ইন্দ্র। এইরূপে অগ্নিহোত্রের হোম-দ্রব্য বিশ্বদেবদৈবত, (উল্লিখিত) ষোড়শ অবস্থাযুক্ত এবং পশুগণে প্রতিষ্ঠিত হয়। যিনি ইহা জানেন, তিনি বিশ্বদেবদৈবত, ষোড়শ-কলান্বিত ও পশুগণে প্রতিষ্ঠিত অগ্নিহোত্র যজ্ঞদ্বারা সমৃদ্ধ হন। —ঐ-ব্রা ৫ ২৫.১।

অগ্নিহোত্র যজ্ঞে বৈকল্য ঘটিলে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। যে যজমানের অগ্নিহোত্রী গাভী (যে গাভীর দুগ্ধে অগ্নিহোত্র নিষ্পন্ন হয়)

বৎস-সংযোগের পর দোহনকালে বসিয়া পড়ে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রথমে সেই গাভীকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—

"যস্মাদ্ভীষা নিষীদসি ততো নো অভয়ং কৃধি। পশূন্নঃ সর্বান্ গোপায় নমো রুদ্রায় মীঢুষে।"—যাহার ভয়ে তুমি বসিয়াছ, তাহা হইতে আমাদের অভয় দাও, আমাদের সকল পশুকে রক্ষা কর; সেচনসমর্থ রুদ্রকে প্রণাম।

গাভীকে উঠাইবার মন্ত্র—"উদস্থাদ্ দেব্যদিতিরায়ুর্যজ্ঞপতাবধাৎ। ইন্দ্রায় কৃণ্বতী ভাগং মিত্রায় বরুণায় চ।"—দেবী অদিতি উঠিয়াছেন, উঠিয়া (যজমানে) আয়ু স্থাপন করিয়াছেন—ইন্দ্রকে, মিত্রকে ও বরুণকে আপনার ভাগ দিয়াছেন।

তৎপরে তাহার বাঁটে ও মুখে জল দিয়া সেই গাভী ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়।

অগ্নিহোত্রী গাভী বৎস-সংযোগের পর দোহনকালে হাম্বারব করিলে, সে ক্ষুধা জানাইবার জন্যই ঐরূপ রব করিয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ স্থলেও প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। ইহার শান্তির জন্য 'সূয়বসাদ্ভগবতী হি ভূয়াঃ' (ভগবতী তুমি সুন্দর তৃণভোজিনী হও) এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গাভীকে অন্ন (তৃণাদি) ভোজন করাইতে হয়।

অগ্নিহোত্রী গাভী বৎস-সংযোগের পর দোহনকালে বিচলিত হইয়া যদি ক্ষীর ফেলিয়া দেয় তাহা হইলে ভূমিতলে ফেলিয়া দেওয়া ক্ষীর হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করা নিয়ম—

"যদদ্য দুগ্ধং পৃথিবীমসৃপ্ত যদোষধীরত্যসৃপদ্ যদাপঃ। পয়ো গৃহেষু পয়ো অঘ্ন্যায়াং পয়ো বৎসেষু পয়ো অস্তু তন্ময়ি॥" যে দুগ্ধ ভূমিতে পড়িয়াছে উহা ওষধির (ঘাসের) উপর পড়িয়াছে, যাহা জলে পড়িয়াছে, সেই দুগ্ধ আমাদের গৃহে, আমাদের গাভীতে, আমাদের বৎসে ও আমাদের শরীরে (উদরে) স্থানলাভ করুক।

যে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিবে, উহা যদি হোমের পক্ষে পর্যাপ্ত হয়, তবে উহার দ্বারাই হোম করিতে হইবে। কিন্তু যদি সমস্ত দুগ্ধই ভূমিতে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে অন্য গাভী আনিয়া দোহন করিয়া নিঃসৃত ক্ষীর হইতে হোম করা বিধেয়। যদি অন্য গাভী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে দধি বা

যবাগূ প্রভৃতি হোমদ্রব্যে হোম করিতে হইলে। তদভাবে অন্তত 'অহং শ্রদ্ধাং জুহোমি' এই সঙ্কল্প করিয়া শ্রদ্ধাদ্বারাও হোম করা যায়।—ঐ-ব্রা ৫.২৫.২।

'শ্রদ্ধাহোমে' কোন পার্থিব পদার্থের প্রয়োজন হয় না। ইহাতে দক্ষিণা দিতে হয় না; এইজন্য ইহাকে 'ভাবনাহোম'ও বলে।—ঐ-ব্রা. ৫.২৫.৩।

ভাবনাহোমে যজমানের পক্ষে আদিত্য যূপস্বরূপ, পৃথিবী বেদিস্বরূপ, ওষধি বর্হিস্বরূপ, বনস্পতিসকল ইধ্মস্বরূপ, জল প্রোক্ষণীস্বরূপ ও দিক্‌সমূহ পরিধিস্বরূপ। যে ইহা জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, তৎসম্পর্কীয় যাহা কিছু বিনষ্ট হয়, যে কেহ মরিয়া যায়, যাহা কিছু হারাইয়া যায়, সে সমস্তই যজ্ঞে প্রদত্ত বস্তুর মত স্বর্গলোকে তাহার নিকট ফিরিয়া আসে।

অগ্নিহোত্র-প্রশংসা—

এই অগ্নিহোত্রে সংবৎসরের মধ্যে সায়ংকালীন আহুতি সংখ্যা ৭২০; সংবৎসর মধ্যে প্রাতঃকালীন আহুতিসংখ্যাও ৭২০।

সায়ংকালে আহুতির সময় (ঋত্বিগ্‌রূপে কল্পিত) দেবগণের হস্তে মনুষ্যগণকে, এমন কি জগতে যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই দক্ষিণাস্বরূপ অর্পণ করা হয়। দেবগণে দক্ষিণাস্বরূপে সমর্পিত হইলে মনুষ্যগণ (রাত্রিকালে) গৃহবুদ্ধিশূন্য হইয়া শয্যায় লীন হইয়া পড়ে। প্রাতঃকালে আহুতির সময় মনুষ্যগণের হস্তে দেবগণকে, এমন কি জগতে যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই দক্ষিণাস্বরূপ দেওয়া হয়। তখন দেবগণ (মনুষ্যগণের) অধীন হইয়া 'আমি এই কার্য করিব, আমি ঐ স্থানে যাইব', এইরূপ বলিতে বলিতে (মনুষ্যের) অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য করিবার চেষ্টা করেন, অর্থাৎ প্রাতর্হোমে মনুষ্যগণই ঋত্বিক, দেবগণ ও জাগতিক পদার্থ তাহাদের নিকট প্রদত্ত দক্ষিণা। দিনের বেলায় দেবতারা মনুষ্যের অধীন হইয়া তাহাদের হিতসাধনার্থ নিযুক্ত থাকেন।—ঐ-ব্রা. ৫.২৫.৩।

হোমকাল—

পূর্বে অগ্নিহোত্র দুই দিনে আহুত হইত, পরে এক দিনে হইবার ব্যবস্থা হয়[১]। সূর্য অস্তগত হইলে সায়ংহোম করিলে অনুদিত

থাকিতে প্রাতঃকালে হোম করিলে এক দিনে অগ্নিহোত্রের হোম হয়; আর অস্তগমনের পর সায়ংকালে ও উদয়ের পর প্রাতঃকালে হোম করিলে দুই দিনে হোম হয়। 'যে অনুদয়ে হোম করে সে চব্বিশ বৎসরে গায়ত্রী লোক প্রাপ্ত হয়; আর যে উদয়ে হোম করে, সে বার বৎসরে উহা লাভ করে। সে ব্যক্তি দুই বৎসর অনুদয়ে হোম করিলে এক বৎসরে কৃত উদয়ে হোমের ফল হয়।' যে ইহা জানিয়া উদয়ে হোম করে, সে সংবৎসরের ফল পায়। যে অস্তগমনের পর সায়ংহোম করে ও উদয়ের পর প্রাতর্হোম করে, সে দিন ও রাত্রি উভয়ের তেজেই হোম করিয়া থাকে; কারণ রাত্রি অগ্নির তেজেই তেজস্বতী এবং দিন আদিত্যের তেজেই তেজস্বী। যে ইহা জানিয়া উদয়ের পর হোম করে, তাহার দিন ও রাত্রি উভয়ের তেজেই হোম করা হয়—ঐ-ব্রা. ৫.২৫ ৪।

আদিত্য অতিথির ন্যায় হোমকর্তার গৃহে বাস করেন। যে ব্যক্তি হোম না করে, সে সেই (অতিথিরূপী) দেবতাকে বাহির করিয়া দেয়। সুতরাং ঐ দেবতা তাহাকে এই লোক ও ঐ (স্বর্গ) লোক, উভয় লোক হইতেই বাহির করিয়া দেন।—ঐ-ব্রা. ৫.২৫.৫।

হোমমন্ত্র—

সায়ংকালে 'ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ' এই মন্ত্রে এবং প্রাতঃকালে 'ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ সূর্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্যঃ' এই মন্ত্রে হোম করিতে হয়।—ঐ-ব্রা. ৫.২৫.৬।

অপত্নীকের অগ্নিহোত্র ত্যাগ করা নিষিদ্ধ; সে যদি অগ্নিহোত্র আহরণ না করে তাহা হইলে অনদ্ধা[২] (অসত্যনামা) হইবে।—ঐ-ব্রা. ৭.৩২.৮। বিবাহের পর অগ্নিহোত্রকারীর পত্নীবিয়োগ হইলে সেই অগ্নিহোত্র নষ্ট হয়, তিনি নিম্নোক্তরূপ বাচিক অগ্নিহোত্র হোম করিবেন। তিনি পুত্র, পৌত্র ও নপ্তাদিগকে এই কথা বলিবেন, যে ইহলোকে ও ঐ (পর) লোকে (শ্রেয়ঃ আবশ্যক); ইহলোকে যে স্বর্গ (শুনা যায়) অস্বর্গ অনুষ্ঠান (কাম্য কর্ম) দ্বারা সেই স্বর্গলোকে আরোহণ করিবে। এইরূপে সেই ব্যক্তি ঐ (স্বর্গ) লোকের অবিচ্ছেদ সম্পাদন করেন। যে ব্যক্তি (পুনরায় বিবাহ দ্বারা)

পত্নী ইচ্ছা করেন না, তাঁহার উক্ত বাক্যে প্রেরিত (পুত্রাদি) অগ্নিহোত্র আধান করেন।

মানসিক অগ্নিহোত্র-অনুষ্ঠানে (অপত্নীক ব্যক্তির) শ্রদ্ধাই পত্নী ও সত্যই যজমান; শ্রদ্ধা ও সত্য (একযোগে) উত্তম মিথুনস্বরূপ।—ঐ-ব্রা. ৭.৩২ ৯।

অগ্নিহোত্রী প্রবাসকালে অথবা প্রবাস হইতে ফিরিয়া অথবা স্বগৃহে তুষ্ণীম্ভাবে অগ্নির উপস্থান করিবে। অগ্নির ভয় নিবারণের জন্য 'অভয়ং বো অভয়ং মেঽস্তু' (তোমার অভয় হউক, আমার অভয় হউক) এইমন্ত্রে উপস্থান করিবে।—ঐ-ব্রা. ৭.৩২.১১।

অগ্নিহোত্র বৈকল্যের বিবিধ প্রায়শ্চিত্তবিধি—

আহিতাগ্নি হইয়া উপবসথের দিনে যজমান মরিয়া গেলে তাহার যাগ হইবে না। অগ্নিহোত্রের ক্ষীর বা সান্নায্য[৩] অথবা অন্য কোন হোমদ্রব্য অগ্নিতে পাকের পর আহিতাগ্নি যজমানের মৃত্যু হইলে তাহার পার্শ্বে ঐসকল দ্রব্য একসঙ্গেই দগ্ধ করিতে হয়। হোমদ্রব্য বেদিতে স্থাপিত হইলে যদি আহিতাগ্নির মৃত্যু হয়, তাহা হইলে যে যে দেবতার উদ্দেশ্যে ঐ হোমদ্রব্য গৃহীত হইয়াছে, 'তাভ্য স্বাহা' এইমন্ত্রে সেই সেই দ্রব্যদ্বারা আহবনীয়ে নিঃশেষে হোম করিতে হয়।

আহিতাগ্নি ভার্যার নিকটে অগ্নিহোত্র রাখিয়া যদি প্রবাসে মারা যান, তাহা হইলে গাভীর নিকটে অন্য একটি বৎস আনিয়া সেই গাভীর দুগ্ধে হোম করিতে হয়; অথবা যে-কোন গাভীর দুগ্ধেও হোম করা যায়। অন্য মতে মৃতব্যক্তির শরীর (অস্থ্যাদি অবয়ব) আহরণ করিয়া আনয়ন করা পর্যন্ত (আহবনীয়াদি) সকল অগ্নিই বিনা হোমে সর্বদা জ্বালিয়া রাখিতে হইবে। যদি তাহার শরীর না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ৩৬০- সংখ্যক পলাশবৃক্ষের ছিন্ন বৃন্ত আহরণ করিয়া উহতে পুরুষমূর্তি গঠন করিয়া অগ্নিত্রয় স্পর্শ করিয়া অগ্নি নিবাইয়া দিতে হয়। ইহার মধ্যে দেড় শত বৃন্তে কায়, দুই পঞ্চাশ ও দুই বিংশে সক্‌থিদ্বয় এবং দুই পঁচিশে উরুদ্বয় গঠন করিয়া অবশিষ্ট ২০ খানি মস্তকের উপরে স্থাপন করা নিয়ম।
—ঐ-ব্রা. ৭.৩২.১।

যদি সায়ংকালে দুগ্ধ সান্নায্য কোনরূপে দোষযুক্ত বা অপহৃত হয়, তাহা হইলে প্রাতঃকালের দুগ্ধকে দুই ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগকে সংস্কৃত করিয়া তদ্দ্বারা যাগ করিতে হইবে। যদি প্রাতঃকালের দুগ্ধ দোষযুক্ত হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট বা মহেন্দ্রের উদ্দিষ্ট পুরোডাশ তাহার স্থানে নির্বাপণ করিয়া যাগ করিতে হয়। সকল সান্নায্যই দোষযুক্ত হইলে ইন্দ্রের বা মহেন্দ্রের উদ্দেশ্যে পূর্বের মত পুরোডাশ হইবে। সমুদয় হোমদ্রব্য দোষযুক্ত বা অপহৃত হইলে আজ্যদ্বারা হবি প্রস্তুত করিয়া দেবতানুসারে আজ্যহবির্দ্বারা ইষ্টিযাগ করা বিহিত; তৎপরে আর একটি ইষ্টি যথাবিধি বিস্তার করিতে হয়।—ঐ-ব্রা. ৭.৩২.৩।

অগ্নিহোত্রের দুগ্ধপাকের সময় অশুদ্ধ হইলে, ঐ সমুদয় দুগ্ধ স্রুকে সেচন করিয়া পূর্বমুখে উত্থিত হইয়া আহবনীয়ে সমিধ্ স্থাপন করিতে হইবে এবং পরে আহবনীয়ের উত্তর ভাগ হইতে উষ্ণ ভস্ম বাহির করিয়া অগ্নিহোত্রের মন্ত্রদ্বারা মনে মনে, অথবা প্রাজাপত্য মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা ঐ ভস্মে হোম করিতে হইবে। অগ্নিহোত্রের দুগ্ধ পাকের সময় বাহিরে পড়িয়া বা উথলিয়া গেলে শান্তির জন্য জলের ছিটা দিয়া দক্ষিণ হস্তে উহা স্পর্শ করিয়া মন্ত্র জপ করিতে হয়।

অগ্নিহোত্র দ্রব্য পাকের পর পূর্বমুখে লইয়া যাইবার সময় যদি পড়িয়া যায়, তাহা হইলে অধ্বর্যু যদি পশ্চিমমুখে ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে যজমানকেও স্বর্গলোক হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে; সুতরাং তিনি সেই স্থানে বসিয়া থাকিবেন ও অন্য ব্যক্তি অগ্নিহোত্রের অবশিষ্ট অংশ আনিয়া দিলে তিনি স্রুকে উন্নয়নপূর্বক হোম করিবেন। স্রুক্ যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে কিন্তু অন্য স্রুক্ আনিয়া হোম করিতে হইবে এবং সেই ভাঙ্গা স্রুকের দণ্ডভাগ পূর্বে রাখিয়া ও উহার পুষ্করভাগ পশ্চিমে রাখিয়া স্রুক্‌টিকে আহবনীয়ে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

আহবনীয়ে অগ্নি বর্তমান থাকিলেও গার্হপত্যের অগ্নি নিবিয়া গেলে, আহবনীয়ের সমুদয় অগ্নি ভস্মসমেত তুলিয়া লইয়া গার্হপত্য স্থানে রাখিয়া সেখান হইতে পূর্বমুখে আহবনীয়ে অগ্নি আনয়ন করিতে হইবে।—ঐ-ব্রা. ৭.৩২.৪।

আহবনীয়ে অগ্নি থাকিতে থাকিতেই গার্হপত্যের অগ্নি আহবনীয়ের জন্য আহরণ করা বিধি নয়। এইরূপ করিলে পূর্ববর্তী অগ্নিকে বাহির করিয়া দিয়া অপর অগ্নি স্থাপন করা নিয়ম। আর আহবনীয়ে অগ্নি দেখিতে না হইলে অগ্নিবান্ দেবতার উদ্দেশ্যে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করা বিধি। এই কর্মে 'অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে' (ঋ. ১.১২.৬) এই মন্ত্র অনুবাক্যা ও 'ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা' (ঋ. ৮.৪৩.১৪) যাজ্যা হইবে; কিংবা পুরোডাশনির্বপণের পরিবর্তে 'অগ্নয়ে অগ্নিবতে স্বাহা' (ঐ-ব্রা. ৭.৬১) বলিয়া আহবনীয়ে কেবল আজ্যের আহুতি দিতে হয়।

গার্হপত্য ও আহবনীয় উভয় অগ্নির পরস্পর সংযোগ ঘটিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এইরূপ স্থলে অগ্নিবীতির উদ্দেশ্যে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বাপণ করা নিয়ম। এই কর্মে অনুবাক্যা 'অগ্ন আয়াহি বীতয়ে' (ঋ. ৬.১৬.১০) ও যাজ্যা 'যো অগ্নিং দেববীতয়ে' (ঋ. ১.১২.৯) অথবা 'অগ্নয়ে বীতয়ে স্বাহা' (ঐ-ব্রা. ৭.৬২) বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিতে হয়।

যদি ত্রিবিধ অগ্নিরই সংযোগ ঘটে, তাহা হইলে অগ্নি বিবিচির উদ্দেশ্যে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিতে হয়। ঐ কর্মে অনুবাক্যা 'স্বর্ণবস্তো-রুষসামরোচি' (ঋ. ৭.১০.২) ও যাজ্যা 'ত্বামগ্নে মানুষীরীড়তে বিশঃ' (ঋ. ৫.৮.৩) বা 'অগ্নয়ে বিবিচয়ে স্বাহা' (ঐ-ব্রা. ৭.৬.৩) বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিতে হয়। অগ্নিসমূহ অন্য অগ্নির সহিত সংসৃষ্ট হইলে অগ্নি ক্ষামবানের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিতে হইবে। ঐ কর্মে অনুবাক্যা 'অক্রন্দদগ্নিস্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ' (ঋ. ১০.৪৫.৪) ও যাজ্যা 'অধা যথা নঃ পিতরঃ পরাসঃ' (ঋ. ৪.২.১৬) অথবা 'অগ্নয়ে ক্ষামবতে স্বাহা' (ঐ-ব্রা. ৭.৬.৪) বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিতে হয়।

অগ্নিসমূহ গ্রাম্য অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে অগ্নি সংবর্গের, দিব্য অগ্নিদ্বারা সংসৃষ্ট হইলে অগ্নি অপ্সুমানের, শবাগ্নি সংসৃষ্ট হইলে অগ্নি শুচির, আরণ্য অগ্নি সংসৃষ্ট হইলে অগ্নি সংবর্গের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিতে হয়। অগ্নি সংবর্গের প্রায়শ্চিত্তে অনুবাক্যা 'কুবিৎসু নোগবিষ্টয়ে' (ঋ. ৮.৭৫.১১), যাজ্যা 'মা নো অস্মিন্ মহাধনে' (ঋ. ৮.৭৫.১২) অথবা 'অগ্নয়ে সংবর্গায় স্বাহা' (ঐ-ব্রা. ৭.৭.১) মন্ত্র বলিতে হয়। অগ্নি অপ্সুমানের

অনুবাক্যা 'অপ্স্বগ্নে সধিষ্টব' (ঋ. ৮.৪৩.৯) ও যাজ্যা 'ময়ো দধে মেধিরঃ পূতদক্ষঃ' (ঋ. ৩.১.৩) অথবা 'অগ্নয়ে অপ্সুমতে স্বাহা' (ঐ-ব্রা. ৭ ৮.২) মন্ত্র বলিতে হয়। অগ্নিশুচিতে অনুবাক্যা 'অগ্নিঃ শুচিব্রততমঃ' (ঋ. ৮.৪৪.২১) ও যাজ্যা 'উদগ্নে শুচয়স্তব' (ঋ' ৮.৪৪.১৭) অথবা 'অগ্নয়ে শুচয়ে স্বাহা' (ঐ-ব্রা. ৭.৭.৩) মন্ত্র বলিতে শেষোক্ত স্থলে অর্থাৎ যাহার অগ্নিসমূহ আরণ্য অগ্নিতে দগ্ধ হয় সে স্থলে প্রায়শ্চিত্ত যদ্যপি অগ্নিদাহের পূর্বে প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অরণিদ্বয়ের সহিত অগ্নিসমারোপণ কিংবা আহবনীয় বা গার্হপত্য হইতে উল্মুক (অগ্নি-খণ্ড) বাহির করিতে হয়। এইরূপ কার্য করিতে না পারিলে অগ্নিসংবর্গের উদ্দেশে পূর্বোক্ত অনুবাক্যা ও যাজ্যা বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়, অথবা 'অগ্নয়ে সংবর্গায় স্বাহা' বলিয়া আহবনীয়ে দিতে হয়।

আহিতাগ্নি যজমান উপবসথ দিনে অশ্রুপাত করিলে অগ্নিব্রতপতির এবং অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় ইষ্টিযোগ করিতে না পারিলে অগ্নিপথিকৃতের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিতে হয়। অগ্নিব্রতভৃতে অনুবাক্যা 'ত্বমগ্নে ব্রতভৃচ্ছুচিঃ' (আশ্ব-শ্রৌ. ৩.১২.১৪) ও যাজ্যা 'ব্রতানি বিভ্রদ্ ব্রতপা অদব্ধঃ' (আশ্ব-শ্রৌ. ৩.১২.১৪), অগ্নিব্রতপতি দোষে অনুবাক্যা 'ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি' (ঋ. ৮.১১.১) ও যাজ্যা 'বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি' (ঋ. ১০.২.৪) অথবা 'অগ্নয়ে ব্রতপতয়ে স্বাহা' (ঐ-ব্রা. ৭.৮.২) বলিতে হয়। অগ্নিপথিকৃতের উদ্দেশ্যে অনুবাক্যা 'বেত্থা হি বেধো অধ্বনঃ' (ঋ ৬.১৬.৩) ও যাজ্যা 'আ দেবানামপি পন্থামগন্ম' (ঋ. ১০.২.৩) অথবা 'অগ্নয়ে পথিকৃতে স্বাহা' (ঐ-ব্রা. ৭.৮.৩) মন্ত্র বলিতে হয়।

যদি সকল অগ্নিই নিবিয়া যায়, তাহা হইলে অগ্নি তপস্বান্; অগ্নি জনদ্বান্ ও অগ্নি পাবকবানের উদ্দেশ্যে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বাপণ করা বিধেয়। এই কার্যে অনুবাক্যা 'আয়াহি তপসা জনেষু' (আশ্ব-শ্রৌ. ৩.১২.২৭) এবং যাজ্যা 'আনো যাহি তপসা জনেষু' (ঐ) অথবা 'অগ্নয়ে তপস্বতে জনদ্বতে পাবকবতে স্বাহা' (ঐ-ব্রা. ৭.৮.৪) মন্ত্র বলিতে হয় (ঐ-ব্রা. ৭.৩২.৫-৭)।

কূর্মপুরাণে উপরিভাগে ২৪ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অবশ্য

আচরণীয় অগ্নিহোত্রাদি নিয়ম উক্ত হইয়াছে। ব্যাস বলিলেন সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে বিধান-অনুসারে অগ্নিহোত্র হোম করিতে হয়। কৃষ্ণপক্ষান্তে (অমাবস্যায়) দর্শ নামক যাগ ও শুক্লপক্ষশেষে পৌর্ণমাস নামক যাগ করিবে। নূতন শস্য উঠিলে ব্রাহ্মণদিগকে উহা দ্বারা যজ্ঞ করিতে হয়; ঋতুর অন্তে চাতুর্মাস্য যজ্ঞ করা বিধি, অয়নের অন্তে পশুযজ্ঞ এবং বৎসরের অন্তে সোমরসসাধ্য অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিতে হয়। যে সকল সাগ্নিক ব্রাহ্মণ দীর্ঘজীবী হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নবান্ন (নবশস্যেষ্টি) এবং পশুযাগ না করিয়া অন্ন বা মাংস ভক্ষণ করেন না। যাহারা নবান্ন ও পশুদ্রব্যদ্বারা যজ্ঞ না করিয়া নবান্ন বা মাংস ভক্ষণ করেন তাঁহারা স্বীয় প্রাণকেই ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন। প্রতি পর্বে সাবিত্রী হোম ও শান্তি হোম করিতে হয়। আর অষ্টকা ও অন্বষ্টকায় সকলেরই পিতৃদিগের নিত্য শ্রাদ্ধ করা বিধি। গৃহস্থাশ্রমবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এইগুলি নিত্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম; অপর কর্মগুলি অধর্ম বলিয়া আখ্যাত। নাস্তিক্য বা আলস্যবশত যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ অগ্ন্যাধান বা যজ্ঞ না করে, সে বহুতর নরক ভোগ করে এবং তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, কুম্ভীপাক, বৈতরণী, অসিপত্রবন এবং অন্যান্য ঘোরতর নরকসমূহ ভোগ করিয়া অন্ত্যজকুলে শূদ্রযোনিতে জন্মলাভ করে। সেইজন্য বিশেষত ব্রাহ্মণের যত্নের সহিত অগ্ন্যাধান করিয়া বিশুদ্ধাত্মা হইয়া পরমেশ্বরকে পূজা করা উচিত (১. ১০)।

"তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ব্রাহ্মণো হি বিশেষতঃ।
আধায়াগ্নিং বিশুদ্ধাত্মা যজেত পরমেশ্বরম্॥"১০

ব্রাহ্মণদিগের অগ্নিহোত্র অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর কিছুই নাই, সেকারণ তাঁহাদের সর্বদা অগ্নিহোত্র দ্বারাই ঈশ্বরের আরাধনা করা নিয়ম :—

"অগ্নিহোত্রাৎ পরো ধর্মো দ্বিজানাং নেহ বিদ্যতে।
তস্মাদারাধয়েন্নিত্যমগ্নিহোত্রেণ শাশ্বতম্॥"১১

সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে সোমযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে। সোমলোক-স্থিত মহেশ্বরকে সোমযোগ দ্বারা আরাধনা করিতে হয়। মহাদেবের

আরাধনায় সোমযজ্ঞ অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ নাই, অথবা তাহার সমানও কোন যজ্ঞ নাই; একারণ সেই শ্রেষ্ঠ সোমযজ্ঞ দ্বারাই তাঁহার আরাধনা করিতে হয় :—

"এষ বৈ সর্বযজ্ঞানাং সোমঃ প্রথম ইষ্যতে।
সোমেনারাধয়েদ্দেবং সোমলোকমহেশ্বরম্ ॥১৪
ন সোমযাগাদধিকো মহেশারাধনে ক্রতুঃ।
সমো বা বিদ্যতে তস্মাৎ সোমেনাভ্যর্চয়েৎ পরম্ ॥১৫

অগ্নিহোত্র দ্বিবিধ—

কাম্য এবং নিত্য। কাম্য মাসসাধ্য ও নিত্য যাবজ্জীবনসাধ্য। বিবাহের পর বিহিত মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিস্থাপনপূর্বক এই হোম করিতে হয়। যাবজ্জীবনসাধ্য হোমের রক্ষিত অগ্নির দ্বারা অন্তিমে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের দাহকার্য হইয়া থাকে। যাবজ্জীবন এই যাগ করিতে হইলে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে হোম করিতে হয়। এই যজ্ঞে বিবাহের পর ব্রাহ্মণেরা বসন্তকালে, ক্ষত্রিয়েরা গ্রীষ্মকালে এবং বৈশ্যেরা শরৎকালে অগ্নিস্থাপন করিয়া থাকেন। হোমের উপকরণ দুগ্ধ (ক্ষীর) দধি, যবাগূ, ঘৃত, অন্ন, তণ্ডুল প্রভৃতি। প্রথম দিন যে উপকরণ লইয়া যজ্ঞের সংকল্প করা হয়, জীবনাবধি সেই দ্রব্য দ্বারাই হোম করা বিধেয়। যে দিনে অগ্নি স্থাপন করা হয়, সেই দিনেই সায়ংকালে প্রথম হোম করিতে হয়। শত হোম সম্পূর্ণ হইলে প্রাতে সূর্যদেবতার ও সন্ধ্যায় অগ্নিদেবতার হোম করা বিধেয়।

অগ্নিহোত্রকারীরা পরলোকে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ভোজন করেন, দর্শপূর্ণমাস যাজীরা পক্ষান্তে, চাতুর্মাস্যযাজীরা চারি মাস অন্তরে, পশুবন্ধযাজীরা ছয় মাস অন্তর, সোমযাজীরা বৎসরান্তে এবং অগ্নিচিৎরা শতবর্ষান্তর আপন ইচ্ছামত ভোজন করেন বা আদৌ আহার করেন না, অর্থাৎ তাঁহারা প্রথমে যে আহার করেন তদ্দারাই একশত বৎসর আহারের কার্য চলিয়া থাকে; তৎপরে তাঁহারা আহার করিতেও পারেন, নাও পারেন, কারণ তখন তাঁহারা অমরত্ব লাভের আশায় একরূপ নিশ্চিন্ত থাকেন এবং দেবতাদের স্বভাব প্রাপ্ত হন (শ-ব্রা. ১০. ১. ৫. ৪)।

বৈশ্বানরবিদ্যার দ্বারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করে। চিত্ত শুদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞান হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানে পুরুষ সর্বাত্মক হইয়া থাকেন। এইজন্য ছান্দোগ্যোপনিষদে (৫.২৪.৫) আম্নাত হইয়াছে—'যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্যুপাসতে। এবং সর্বাণি ভূতান্যগ্নিহোত্রমুপাসতে॥"

অগ্নিহোত্রের ফল কি তাহা নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা হইতে জানিতে পারা যায়। একদা বিদেহরাজ জনক শ্বেতকেতু আরুণেয়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, অগ্নিহোত্র যাগ করিলে কি ফললাভ হয়? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, অগ্নিহোত্রী চিরজীবন সম্পৎশালী ও জয়যুক্ত হন এবং আদিত্য ও অগ্নির সাহচর্য লাভ করিয়া উহাদের লোকে বাস করিতে থাকেন (শ-ব্রা. ১১.৬.২.২)।

এই প্রশ্নের উত্তরে সোমসুষ্ম সাত্যযজ্ঞি বলিয়াছিলেন—অগ্নিহোত্রী কমনীয়, জয়শ্রী-যুক্ত ও সম্পৎশালী হইয়া থাকেন এবং আদিত্য ও অগ্নির সাহচর্য লাভ করিয়া উহাদের লোকে বাস করিবার অধিকারী হন (শ-ব্রা. ১১.৬.২.৩)।

যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, যখন আমি গার্হপত্য হইতে অগ্নি আহবনীয়ে স্থাপন করি তখন অগ্নিহোত্রকেই উদ্ধার করি; কারণ যখন আদিত্য (সূর্য) অস্ত যান তখন দেবতারা তাঁহার অনুসরণ করেন এবং যখন তাঁহারা দেখেন যে আমি অগ্নি তুলিলাম, তখন তাঁহারা পশ্চাদ্দিকে গমন করিতে থাকেন। তাহার পর যজ্ঞীয় পাত্রগুলি পরিষ্কৃত হইয়া বেদীর উপর রক্ষিত হইলে এবং অগ্নিহোত্রী গাভীর দোহন-কার্য সম্পন্ন হইলে, যখন তাহারা আমাকে দেখিতে পান ও আমিও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই, তখন আমি তাহাদের আনন্দবর্ধন করি (শ-ব্রা. ১১.৬.২.৪)।

পাদটীকা

১ সায়ণ-মতে ইহা অনুচিত।

২ যিনি দেবগণ, পিতৃগণ বা মনুষ্যগণের পূজা করেন না, তিনি অনদ্ধা নামে অভিহিত হন।

৩ দর্শপূর্ণমাসে সান্নায্য নামক ক্ষীর হোম হয়।

গ্রন্থপঞ্জী

[ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (আনন্দাশ্রম, Bib. Ind.); রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ; M. Haug : ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ; শতপথ-ব্রাহ্মণ ; প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাদি]

[বঙ্গীয় মহাকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১১-৪১৫]

অদিতি

ঋগ্বেদে যে সমস্ত দেবতার উল্লেখ আছে, তাহাদের দৃশ্যরূপ যে ভৌতিক তাহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু সেই সমস্ত দেবতার দৃশ্যরূপ কি প্রকার তাহা এ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হয় নাই। এই দৃশ্যরূপ সম্বন্ধে বৈদিক পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অগ্নি, সবিতা, সূর্য, মরুৎ, বায়ু, উষা, রাত্রি, দ্যাবাপৃথিবী প্রভৃতির স্বরূপ স্পষ্ট ও সুপরিচিত। কিন্তু এমন অনেকগুলি দেবতা আছেন যাঁহাদের স্বরূপ এরূপ নয়। এইজন্য প্রাচীনকাল হইতে দেবতাগণের স্বরূপ-নির্ণয়ের প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতদের অনুসন্ধান-ফল ভিন্ন হইয়াছে। অধুনাতন পণ্ডিতগণের মতও নানাপ্রকার। এ অবস্থায় অদিতির স্বরূপ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা কঠিন।

বেদে ও বৈদিক সাহিত্যে অদিতি

কোন দেবতার স্বরূপদ্যোতক শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে সেই দেবতা বা শব্দের যত বেশীবার উল্লেখ থাকে, অর্থনিরূপণের পক্ষে সুবিধা তত বেশী হইয়া থাকে। ঋগ্বেদে অদিতি শব্দের প্রয়োগ অন্যূন ১৪০ বার আছে। এই শব্দে শতাধিক স্থানে অদিতি নামক দেবী লক্ষিত হইয়াছে। এইসকল স্থানে অদিতিকে সম্বোধন করা হইয়াছে কিংবা অন্যান্য দেবতার সহিত অথবা শুধু অদিতির উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট স্থানগুলিতে অদিতি শব্দে অন্যান্য দেবতা অথবা তাঁহাদের গুণোদ্যোতক বলিয়া উল্লিখিত

হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ঋগ্বেদে অদিতি শব্দ কোন কোন স্থানে অগ্নির গুণবাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।—

"যস্মৈ ত্বং সুদ্রবিণো দদাশোঽনাগাস্ত্বমদিতে সর্বতাতা"—ঋ. ১.৯৪.১৫

(হে শোভনধনযুক্ত অখণ্ডনীয় অগ্নি। যে সর্বযজ্ঞে বর্তমান যজমানকে তুমি পাপ হইতে নিষ্কৃতি প্রদান কর)।

'ত্বমগ্নে অদিতির্দেব দাশুষে ত্বং হোত্রা
ভারতী বর্ধসে গিরা।
ত্বমিলা শতহিমাসি দক্ষসে ত্বং
বৃত্রহা বসুপতে সরস্বতী।'—ঋ. ২.১.১১

(হে দেব অগ্নি, তুমি হব্যদাতার পক্ষে অদিতি। তুমি হোত্রা, ভারতী, তুমি স্তুতি দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। তুমি শত বৎসরের ইলা, তুমি দানসমর্থ। হে ধনপালক, তুমি বৃত্রহন্তা, তুমি সরস্বতী)।

'বিশ্বেষামদিতির্যজ্ঞিয়ানাম্'—৪.১.২০

(অগ্নি সমস্ত যজ্ঞীয় দেবতার অদিতিস্বরূপ অর্থাৎ পোষক)। 'সমিধা যো নিশিতী দাশদদিতিং ধামভিরস্য মর্তাঃ'—৮.১৯.১৪ (যে মনুষ্য এই অগ্নি অবয়বের সহিত অখণ্ডনীয় অদিতিকে সমিধের দ্বারা পরিচর্যা করে)। ৭.৯.৩ ঋকেও অগ্নির বিশেষণরূপে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে।—'অমূরঃ কবিরদিতির্বিবস্বান্তসুসংসন্মিত্রো অতিথিঃ শিবো নঃ'—অমূঢ়, কবি, অদীন, দীপ্তিমান, শোভনগৃহবিশিষ্ট, মিত্র, অতিথি ও আমাদের মঙ্গলকর (অগ্নি)। আবার ৮.৪৮.২ ঋকে সোমকে (চন্দ্র বা সোমলতাকে) অদিতিরূপে সম্বোধন করা হইয়াছে। ৫.৪৪.১১ ঋকে সোমরস পান করিয়া যে মত্ততা হয় তাহাকে অদিতি অর্থাৎ অদিতির ন্যায় বিস্তৃত বলা হইয়াছে।—'শ্যেন আসামমদিতিঃ কক্ষ্যো মদো বিশ্ববারস্য যজতস্য মায়িনঃ' বিশ্ববার, যজত ও মায়ী (এই তিন ঋষির সোমরসজনিত) মত্ততা শ্যেনপক্ষীর ন্যায় শীঘ্রগামী ও অদিতির ন্যায় বিস্তৃত। 'বৃষ্ণে যত্তে বৃষণো অর্কমর্চানিন্দ্র গ্রাবাণো অদিতিঃ সজোষাঃ।' এই ৫.৩১.৫ ঋকের 'গ্রাবাণো অদিতিঃ' পদের অর্থ সম্ভবত 'অতি বিস্তৃত পাষাণসকল'। ১০.১১.১ ঋকেও 'অদিতির'র অর্থ 'অতি বিস্তৃত'।—'বৃষা বৃষ্ণে দুদুহে দোহসা দিবঃ পয়াংসি যহ্বো অদিতেরদাভ্যঃ'।

প্রায় পঞ্চষষ্টির ও অধিক ঋকে দেবী অদিতিকে আবাহন করা হইয়াছে। অন্যান্য দেবতার সহিত অন্তত ৪০ বার তিনি সম্বোধিত হইয়াছেন। দেখা যায়, অন্যূন ৩৮ বার মিত্র ও বরুণের সহিত অদিতিকে সম্বোধন করা হইয়াছে। দ্যাবাপৃথিবীর সহিত অন্তত ২৭ বার এবং সিন্ধুর সহিত ২০ বার, অর্যমা ও ইন্দ্রের সহিত ১২ বার, ভগদেবতার সহিত ৯ বার, অগ্নি ও মরুদ্‌গণের সহিত ৬ বার, পূষা, বিষ্ণু ও সবিতার সহিত ৪ বার, সোম ও বায়ুর সহিত ৩ বার, রুদ্রগণ, বসু ও ব্রহ্মণস্পতির সহিত ২ বার এবং অন্যান্য দেবতার সহিত ১ বার দেবী অদিতিকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদের বহু স্থানে যেখানে অদিতির কথা বলা হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার অনেকগুলি গুণেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। ৫. ৬৯. ৩; ৭. ৩৮. ৪; ৮. ১৮. ৪; ১০. ১০. ২; ১০. ২৬. ৩ প্রভৃতি সূক্তে তাঁহাকে দেবী আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। ১. ২৪. ১, ২ ও ৮. ৫. ৩ ঋকে অদিতিকে 'মহতী'—বিরাট্ বলা হইয়াছে। অদিতি 'অনর্ব্বা' অর্থাৎ স্থির ও অপরিবর্তনীয়া (২. ৪০. ৬; ৭. ৪০. ৪; ১০. ৯৭. ১৪)। তিনি নিষ্পাপা—অনাগা (১. ২৪. ১৫; ১. ১৬২. ২)। কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারে না। তিনি 'অনেহস' (সায়ণ ১০. ৬৩. ১০)। অদিতি, মাতা (৮. ২৫. ৩)। তিনি 'সর্বতাতি', 'উরুব্যচা' অর্থাৎ 'সর্বব্যাপিনী' (৫. ৪৬. ৬; ১০. ১০০. ১)। তিনি 'সুসন্তানবিশিষ্টা' (৩. ৪. ১১)—তাঁহার পুত্রগুলি রাজা, তিনি 'রাজমাতা' (২. ২৭. ৭)। তিনি 'সুহবা'—সম্যক্ আহুতা (৭. ৪০. ৪)। তাঁহার গৃহ অতি সুন্দর বলিয়া তিনি 'সুশর্মা' (১০. ৬৩. ১০)। তিনি 'অদ্বিতীয়া' (৮. ১৮. ৬)। তিনি সমুজ্জ্বলদেহা 'ঋতাবতি' (৮. ২৫. ৩)। তাঁহার গতি 'প্রোজ্জ্বল' (ঋতাবৃধ—৮. ৮২. ১০)।

অদিতি-সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যাপার ঋগ্বেদে উল্লিখিত আছে। ঋষি-শুনঃশেপ[১] যূপে আবদ্ধ হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন—'কে আমাকে এই মহতী অদিতিতে (পৃথিবীতে) আবার মুক্তিদান করিবে যাহাতে আমি পিতা ও মাতা (দ্যাবাপৃথিবী) দর্শন করিতে পারি'।—১. ২৪. ১। দীর্ঘতমার মতে মিত্রাবরুণ একত্র ভ্রমণ করিয়া অদিতিকে রক্ষা করেন।—১. ১৫২.

৬। একদা ইন্দ্র মহিমাদ্বারা অদিতি (পৃথিবী) ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন—৭. ১৮. ৮। ১০. ৬৩. ২ ঋকে বিশ্বদেবগণকে আহ্বান করিয়া প্রার্থনা করা হইতেছে, তাঁহারা যেন অদিতি ও আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। ১. ১১৩. ১৯ ঋকে উষাকে দেবগণের মাতা ও অদিতির প্রতিস্পর্ধিনী বলা হইয়াছে। ১০. ৫. ৭ ঋকে বলা হইয়াছে—অগ্নি অসৎ বটেন, সৎও বটেন; তিনি পরম ব্যোমে সংস্থিত আছেন। তিনি অদিতির উপরে, দক্ষের উপরে সূর্যরূপে জন্মিয়াছেন। এখানে সায়ণ বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির পূর্বে যে অপরিণত অবস্থা ছিল তাহাকে অসৎ বলা হইয়াছে, আর সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা সৎ। ১০. ৭২ সূক্তে জগৎ-সৃষ্টির ব্যাপার সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্বকালে ব্রহ্মণস্পতি দেবকর্মকারের ন্যায় দেবতাদিগের নির্মাণ করিলেন। অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল।—১০. ৭২. ২। দেবোৎপত্তির পূর্বতনকালে অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল। পরে উত্তানপদ (বৃক্ষ—সায়ণ) হইতে দিক্‌সকল জন্মগ্রহণ করিল। উত্তানপদ হইতে ভূ জন্মিল, ভূ হইতে দিক্‌সকল জন্মিল, অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন (অতএব অদিতি দক্ষের কন্যা; দক্ষ আবার অদিতির পুত্র)—১০. ৭২. ৪। অদিতি যে জন্মিলেন তিনি দক্ষের কন্যা; তাঁহার পরে দেবতারা জন্মিলেন ইঁহারা কল্যাণমূর্তি ও অবিনাশী।—১০. ৭২. ৫। দেবতারা এই বিশ্বব্যাপী জলমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই নৃত্য হইতে প্রচুর ধূলি উৎপন্ন হইল। মেঘসমূহের ন্যায় দেবতারা সমস্ত ভুবন আচ্ছাদন করিলেন। এই সমুদ্রতুল্য আকাশের মধ্যে সূর্য নিগূঢ় ছিলেন; দেবতারা সেই সূর্যকে প্রকাশ করিলেন। অদিতির দেহ হইতে আট পুত্র জন্মিয়াছিলেন। তিনি তন্মধ্যে সাতটি লইয়া দেবলোকে গেলেন; কিন্তু মার্তণ্ড নামক পুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এই অতি পূর্বতনকালে অদিতি সপ্তপুত্র লইয়া চলিয়া গেলেন, আর মার্তণ্ডকে জন্মের জন্য এবং মৃত্যুর জন্য প্রসব করিলেন।—১০. ৭২. ৫-৯।

অদিতির পুত্রগণ বা আদিত্যগণের সহিত অদিতির সম্বন্ধের গুরুত্ব

যথেষ্ট। আদিত্যগণ অদিতির পুত্র। ২.০২৭. ১. ঋকে (=উ. ম. য. ৩৪. ৫৪ = কা. ১১. ১২ = নি. ১২. ২৬) ছয় জন আদিত্যের নাম আছে। ছয় আদিত্য—মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। ঋকৃটি এই—

> ইমা গির আদিত্যেভ্যো ঘৃতস্নূঃ
> সনাদ্রাজভ্যো জুহ্বা জুহোমি।
> শৃণোতু মিত্রো অর্যমা ভগো
> নস্তুবিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ ॥

মৈত্রায়ণী-সংহিতাতে দক্ষের নাম নাই। তাহাতে আছে—'অদিতির্বৈ প্রজাকামৌদনমপচৎ সোচ্ছিষ্টমাশ্নাত্তস্যাধাতা চার্যমা······মিত্রশ্চ······বরুণশ্চ ······অংশশ্চ ভগশ্চাজাযেতাম্।'—১ ৬. ১২ = তৈ-ব্রা. ১. ১. ৯. ১০২। আদিত্যগণ অদিতির সন্তান। এ অদিতি কিন্তু কাশ্যপপত্নী নহেন। ইনি সকল দেবের জনয়িত্রী—আদিদেবমাতা। যাস্ক ইঁহাকে 'আদিনা দেবমাতা' বলিয়াছেন। ৯. ১১৪. ৩. ঋকে 'দেবা আদিত্যা যে সপ্ত তেভিঃ' প্রভৃতি বচনে আদিত্যের সংখ্যা ৭ বলা হইয়াছে, কিন্তু কাহারও নাম করা হয় নাই। অতঃপর ১০. ৭২. ৮ ঋকে আছে যে, অদিতির আটপুত্র; তন্মধ্যে অদিতি মার্তণ্ডকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সাতটিকে লইয়া দেবলোকে গমন করেন। এখানেও আদিত্যগণের নাম নাই। আটজন আদিত্যের নাম সর্বপ্রথম তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে (১. ১. ৯. ১-৩) পাওয়া যায়। নামগুলি এই—ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্। অতএব দেখা যাইতেছে, পূর্বের ছয় জনের মধ্যে দক্ষ স্থানে হইলেন 'ধাতা'। নূতন দুই জন যুক্ত হইল—'ইন্দ্র' ও 'বিবস্বান্'। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণমতে অংশ অষ্ট আদিত্যের অন্যতম। শতপথ-ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের কথা আছে। তাঁহারা দ্বাদশ মাসের আদিত্য—'দ্বাদশ মাসাঃ সংবৎসরস্যৈতহ্আদিত্যাঃ এতে হীদং সর্বমাদদানা যন্তি তে যদিদং সর্বমাদদানা যন্তি অস্মদাদিত্যা ইতি'।—১১. ৬. ৩. ৮।

বৈদিক দেবতত্ত্বে অদিতি প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করেন। কিন্তু সমগ্র ঋগ্বেদে কোন একটি সম্পূর্ণ সূক্ত তাঁহার নাই। অধিকাংশ সূক্তে তাঁহার

পুত্র আদিত্যগণের সহিত অদিতি উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কোথাও বলা হয় নাই। তবে তাঁহার সমগ্রভাব, বিস্তৃতভাব, ঔজ্জ্বল্য ও জ্যোতিষ্মত্তার উক্তি বেদে আছে। মিত্র ও বরুণের ন্যায় তিনি জীবকুলের পুষ্টিদাত্রী। তিনি প্রাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় স্তুত হইয়া থাকেন। আদিত্যগণ তাঁহার পুত্র, কিন্তু একমাত্র তাঁহাকে তাঁহাদের ভগিনী বলা হইয়াছে। তাঁহাকে বসুগণের কন্যাও বলা হইয়াছে।[২] (৮. ১০. ১৫) যজুর্বেদে অদিতি একবার বিষ্ণুর পত্নী নামে অভিহিত হইয়াছেন।[৩]

বৈদিক যুগের পরবর্তী সাহিত্যে তিনি দক্ষের কন্যা, বিবস্বান্, বিষ্ণু এবং দেবগণের মাতা। অথর্ববেদে[৪] তাঁহাকে ঋতের পত্নী বলা হইয়াছে। মাতৃত্বকে তাঁহার বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে। তাঁহার একটি আখ্যা 'পস্ত্যা' (=গৃহিণী—৪. ৫৫. ৩ ; ৮. ২৭. ৫) হইতেও তাঁহার মাতৃত্বের আভাস পাওয়া যায়। পাপ হইতে মুক্তি দিবার জন্য সতত তাঁহাকে আহ্বান করা হয়। এই ব্যাপারে বরুণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যেহেতু বরুণ পাপিগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া থাকেন। পাপ হইতে মুক্তি দিবার জন্য বরুণ (১. ২৪. ১৫), অগ্নি (৪. ১২. ৪), সবিতা (৫. ৮২. ৬) ও অন্যান্য দেবতাকে তাঁহার পূর্বে আহ্বান করা হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার নামের আদিম ধারণা হইতে তাঁহাকে বিছিন্ন করা যায় না। অদিতির আদিম ধাত্বর্থ বন্ধন হইতে মুক্তি। অনপরাধ ও অদীন করিয়া দিবার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠাতা আদিত্যগণের আশ্রয় প্রার্থনা করিত (ঋ. ৭. ৫১. ১)।

পাপ হইতে মুক্তিদান ব্যতীত অন্য সম্পর্কেও অদিতিকে দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু আদিত্যগণ নয়, অন্য সকল দেবতাও অদিতি হইতে উৎপন্ন। আকাশস্বরূপে তিনি তাহাদিগকে মধুমিশ্রিত দুগ্ধ যোগাইয়া থাকেন। কিন্তু তৈত্তিরীয়-সংহিতা[৫] ও অন্যান্য গ্রন্থ তাঁহাকে পৃথিবী হইতে অভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করে। নৈরুক্তিকদিগের সময় এই মত এত প্রবল হইয়াছিল যে এই শব্দটি পৃথিবীর পর্যায় শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু অদিতি ঋগ্বেদে (১০. ৬৩. ১০) প্রায়ই পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র। অদিতি আকাশ, অন্তরিক্ষ, মাতা, পিতা, পুত্র, সকল দেব, পঞ্চজন এবং জন্ম ও

জন্মের কারণ হইতে অভিন্ন।—ঋ. ১. ৮৯.১০। দক্ষ যিনি তাঁহার পুত্র তিনিই আবার তাহার পিতা।—ঋ. ১০. ৭২. ৪, ৫।

অদিতি গাভী

ঋগ্বেদের কয়েকটি স্থানে (১. ১৫৩. ৩; ৮. ৯০. ১৫; ১০. ১১. ই.) এবং পরবর্তী সংহিতায় (বাজ-স. ১৩. ৪৩. ৪৯) অদিতি গাভী নামে উক্ত হইয়াছে। ৯. ৯৬. ১৫ ঋকে সায়ণ অদিতির অর্থ করিয়াছেন—গাভী; এখানে অদিতি হইতে (স্বর্গ বা গাভী হইতে) যে পয় (শুভ্র জ্যোতি বা দুগ্ধ) দোহন করা হয় তাহার সহিত সোমের (চন্দ্র বা সোমরসের) তুলনা হইয়াছে। যজুঃ-সংহিতার (৩৮. ২) আছে—'অদিতির্হি গৌঃ'—শ-ব্রা. ২৪. ২. ১. ৭; ১. ৩. ৪. ৩৪। মন্ত্র-ব্রাহ্মণও (২. ৮. ১৫) অদিতির গাভী অর্থ দিয়াছে—'মা গামনাগামদিতিং ব ধষ্ট'। নিঘণ্ট (২. ১১) ও কৌ-নি. ৪. ২২ অদিতিকে বলিয়াছে—'গোনাম'।

অদিতি বাক

নিঘণ্টু (১. ১১) ও কৌ-নি.(১০২) অদিতিকে বলিয়াছে—'বাঙ্ নাম'। শতপথ-ব্রাহ্মণে কোথাও কোথাও বলিয়াছে—'বাগ্বাঽঅদিতিঃ' (৬. ৫. ২. ২০); 'অদিতিরস্যু যশীর্ষ্ণী (বাক্) ইতি' (৩. ২. ৪. ১৬)।

নিরুক্ত (১১. ২১) একস্থানে অদিতিকে অগ্নি নামে অভিহিত করিয়াছে—'অগ্নিবপ্যাদিতিরুচ্যতে'। এ ছাড়া অদিতিকে 'অদীবা দেবমাতা'ও বলা হইয়াছে (নি. ৪. ২২)।

অদিতি পৃথিবী

Pischel (PVS. 2, 86) অদিতি অর্থে পৃথিবী বুঝাইয়াছেন। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থেও ইঁহার উক্তির সমর্থন আছে। নিরুক্ত ও নিঘণ্টুতেও অদিতির এই পৃথিবী অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণ কয়েক স্থানে অদিতিকে পৃথিবী হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। 'ইয়ং (পৃথিবী) হেবাদিতিঃ'—শ-ব্রা. ৩. ২. ৩. ৬; 'ইয়ং (পৃথিবী) বাঽঅদিতির্মহী'—ঐ, ৬. ৫. ১. ১০। এ সম্পর্কে তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণের বচন এইরূপ—'ইয়ং

(পৃথিবী) বৈ দেব্যদিতির্বিশ্বরূপী'—১. ৭. ৬. ৬ ; 'ইয়ং (পৃথিবী) বৈ দেব্যদিতিঃ'—১. ৪. ৩. ১। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণও (১. ৮) বলিয়াছে—'ইয়ং (পৃথিবী) হ্যদিতিঃ'। 'অদিতিঃ ইতি পৃথিবীনাম' ইহা নিঘণ্টু (১. ১) ও কৌৎসব্যনিঘণ্টুর (৭২) উক্তি। 'অদিতেঃ উপস্থ অদিতেঃ উপস্থাৎ', 'অদিতে উপস্থ' এই বৈদিক উক্তির অর্থ 'অদিতির উপর'।

নিঘণ্টু, নিরুক্ত ও ব্রাহ্মণগ্রন্থে অদিতি অর্থ 'পৃথিবী' বলা হইয়াছে ; সায়ণ তদনুসারে ঋগ্বেদের কয়েকস্থানে অদিতির অর্থ পৃথিবী প্রতিপাদন করিয়াছেন ; কিন্তু ঋগ্বেদের কয়েকস্থানে আবার অদিতি ও পৃথিবীর পৃথক নির্দেশ আছে ; সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদের ঐ সকল স্থানে অদিতির অর্থ 'পৃথিবী' নয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত মন্ত্র প্রদত্ত হইল—

'ইন্দ্রাগ্নী মিত্রাবরুণাদিতিং স্বঃ পৃথিবীং
দ্যাং মরুতঃ পর্বতাঁ অপঃ।
হুবে বিষ্ণুং পূষণং ব্রহ্মণস্পতিং ভগং নু
শংসং সাবতারমূতয়ে॥'—৫. ৪৬. ৩।

'দ্যৌঽষ্পিতঃ পৃথিবি মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতর্বসবো মৃলতা নঃ।
বিশ্ব আদিত্যা অদিতে সজোষা অস্মভ্যং
শর্ম বহুলং বি যন্ত॥'—৬. ৫১. ৫।

'সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণম্
অদিতিং সুপ্রনীতিম্।
দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তীমা
রুহেমা স্বস্তয়ে॥'—১০. ৬৩. ১০।

'আ যে বিশ্বা স্বপত্যানি তস্থুঃ
কৃণ্বানাসো অমৃতত্বায় গাতুম্।
মহ্না মহদ্ভিঃ পৃথিবী বি তস্থে মাতা
পুত্রৈরদিতির্ধায়সে বেঃ॥'—১. ৭২. ৯।

এই সমস্ত মন্ত্রে একই স্থানে পৃথিবী ও অদিতি স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ঋগ্বেদের এইসকল স্থানে অদিতি ও পৃথিবী বিভিন্ন দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে অদিতি সম্পর্কে কয়েকটি উপাদান ও আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। ইহাতে অদিতি ও কশ্যপের অনুরূপ ব্যাখ্যাও আছে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (২. ১) একটি আখ্যায়িকা আছে তদনুসারে যজ্ঞ সোমযাগাভিমানী দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন ; তখন সেই দেবগণ কোনও যজ্ঞাদি করিতে পারিতেন না এবং যজ্ঞ জানিতে পারিতেন না। তৎপরে তাঁহারা অদিতিকে বলিলেন, তোমার প্রসাদে আমরা এই যজ্ঞকে প্রকৃষ্ট-রূপে জানিব ; অদিতি বলিলেন, তাহাই হউক ; কিন্তু আমি তোমাদের নিকটে বর প্রার্থনা করিতেছি। দেবগণ বলিলেন, প্রার্থনা কর ; তিনি এই বর চাহিলেন—যজ্ঞসকল সোমযোগাদি মৎপ্রায়ণ অর্থাৎ আমাকে লইয়া আরব্ধ হউক এবং মদুদয়ন অর্থাৎ আমাকে লইয়া অবসান হউক। দেবগণ কহিলেন, তাহাই হইবে। চরু অদিতির বরদ্বারা প্রার্থিত হইয়াছিল বলিয়া প্রায়ণীয় চরু অর্থাৎ যজ্ঞারম্ভের ইষ্টিতে প্রদত্ত চরু ও উদয়নীয় চরু অর্থাৎ যজ্ঞ-সমাপ্তির ইষ্টিতে প্রদত্ত চরু অদিতি দেবতার অংশ।

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৬. ১. ৫. ২) আছে—'পথ্যাং স্বস্তিমরজন্ প্রাচীমেব, তয়া দিশং প্রাজানন্ অগ্নিনা দক্ষিণা সোমেন প্রতীচীং সাবিত্রো-দীচীমদিত্যোর্ধ্বাম্'।

উত্তরদিকে সবিতার যাগ করা হয় বলিয়া উত্তর-পশ্চিম কোণে সমধিক-পবন সঞ্চরণ করে। এই বায়ু সবিতার দ্বারা প্রেরিত হইয়াই এইদিকে প্রবাহিত। সবিতা প্রেরক দেবতা। ঊর্ধ্বদিকে অদিতির যাগবিধান হইয়া থাকে—'উত্তমামদিতিং যজতি' ঊর্ধ্বে অবস্থিত অদিতির যাগ করিতে হয়।

প্রাণ ও অপান বায়ু যথাক্রমে অগ্নি ও সোম ; সবিতা যজ্ঞকর্মে প্রেরণের জন্য ও অদিতি প্রতিষ্ঠার জন্য উপযোগী। এইরূপ অগ্নি ও সোম দুই চক্ষুঃ-স্বরূপ। সবিতা যজ্ঞকর্মে নিয়োগের জন্য ও অদিতি প্রতিষ্ঠার জন্য উপযোগী।

দেবগণ অন্তর্হিত যজ্ঞকে চক্ষুদ্বারাই জানিয়াছিলেন ; যাহা দুর্জ্ঞেয়, তাহা চক্ষুদ্বারাই জানা যায়, এবং সেইহেতু মুগ্ধ দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তি ইতস্তত বিচরণ করিয়া যখনই কোন চিহ্ন দেখিতে পায় তখনই পথ জানিতে পারে।

দেবগণ এই ভূমিতেই যজ্ঞকে জানিয়াছিলেন, তৎপরে ইহাতেই যজ্ঞের

আয়োজন করিয়াছিলেন। ইহাতেই যজ্ঞ বিস্তার করা হয় এবং উপকরণাদি ইহাতেই সংগৃহীত হয়। এই ভূমিই অদিতি। সেইজন্য অন্তিম (উত্তমা) দেবতা অদিতির যজন হয়। উত্তমা অদিতির যে যজন হয়, তদ্দ্বারা যজ্ঞরই জ্ঞান জন্মায় ও স্বর্গলোক-প্রাপ্তি ঘটে।

প্রায়ণীয় চরু অদিতির উদ্দিষ্ট এবং উদয়নীয় চরুও অদিতির উদ্দিষ্ট। যজ্ঞকে ধরিবার জন্য, যজ্ঞকে অশিথিল করিবার জন্য ও যজ্ঞে গ্রন্থি বন্ধনের জন্য এই দুই চরু বিহিত হইয়া থাকে। এই অদিতি সবনের দেবতা।—'যাঃ প্রায়ণীয়স্য যাজ্যাবত্তা উদয়নীয়স্য যাজ্যাঃ কুর্যাৎ, পরাঙমুং লোকমারোহেৎ প্রমায়ুকঃ স্যাদ্যাঃ প্রায়ণীয়স্য পুরোহনুবাক্যাস্তাঃ উদয়নীয়স্য যাজ্যাঃ করোত্যস্মিন্নেব লোকে প্রতিতিষ্ঠতি।—৬. ১. ৫. ৫।

যজ্ঞাগ্নির চতুর্দিকে জলসেচনের সময় অদিতির আবাহন করিতে হয়। —খাদির-গৃহ্যসূত্র ১. ২. ১৭; গোভিলগৃহ্যসূত্র ১. ৩. ✱। বৈশ্বদেব ও অশ্বমেধ (শ.-ব্রা. ১৩. ১. ৮. ৪) যজ্ঞে অদিতি আরাধিত হইয়া থাকেন। —শাঙ্খা-গৃ. ২. ১৪. ৪। শিশুর রক্ষা ও মঙ্গলের জন্য অদিতির আবাহন করিতে হয়।—ঐ, ১. ২৭. ৭। চৌলক্রিয়ায় (আশ্ব-গৃ. ১. ১৭. ৭), উপনয়নে (হিরণ্য-গৃ. ১. ১. ৪. ৬) ও আপ্রী স্তোত্রে (আপ্রী-সূক্ত, ১১) অদিতিকে আবাহন করা কর্তব্য। যজমানের অগ্নিহোত্রী গাভী বৎস-সংযোগের পর দোহনকালে বসিয়া পড়িলে—'উদস্থাদ্ দেব্যদিতিরায়ুর্যজ্ঞ পত্যাবধাৎ। ইন্দ্রায় কৃণ্বতী ভাগং মিত্রায় বরুণায় চ'। দেবী অদিতি উঠিয়াছেন, উঠিয়া যজ্ঞপতি যজমানে আয়ু স্থাপন করিয়াছেন, ইন্দ্রকে, মিত্রকে ও বরুণকে আপনার কন্যা দিয়াছেন। এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া গাভীকে উঠাইতে হয়।—শ-ব্রা. ১২. ৪. ১. ৯; ঐ-ব্রা ৫. ২।

এতদ্ভিন্ন রাজাভিষেকে অদিতির আবাহন প্রযোজন।—শ-ব্রা. ৫. ৩. ৫. ৩৭। পত্নীরক্ষার জন্য, অথবা দীর্ঘায়ু-লাভের জন্যও অদিতিকে আহ্বান করা হয়।—অ. ৯. ১১।

পূর্ণাহুতি দিয়া অগ্ন্যাধেয় সমাপ্ত হয়। ইহার পর মৃদুস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অগ্নিহোত্র করিতে হয়। অগ্ন্যাধেয়ের ন্যূনকল্পে ১২ দিন পরে তিনটি ইষ্টি করিতে হয়। প্রথম ইষ্টি অগ্নিপবমানের উদ্দেশে, দ্বিতীয় ইষ্টি

অগ্নিপবমান ও অগ্নিশুচির জন্য। তৃতীয় ইষ্টিতে অদিতির জন্য সিদ্ধান্নের পূর্ণপাত্র দিতে হয়।—শ-ব্রা. ২. ২. ১. ৬; SBE, 304n. ইহার ফলশ্রুতি এই যে এই হবির্দ্বারা এই লোক হইতে যজমান উর্ধ্বলোকে সমারোহণ করে—'প্রচ্যবত ইব বা এসো স্মাল্লোকাৎ—ইমান্ হি লোকান্ সমারোহন্নোতি'। যেহেতু অদিতি এই পৃথিবী আর যজমান ইহাতে সুদৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হয়। অদিতির জন্য দুইটি সংযাজ্যাতে বিরাজ অথবা ত্রিষ্টুভ বা জগতীছন্দের প্রয়োজন। কারণ ইহারা প্রত্যেকেই পৃথিবী। তথাপি বিরাজের বৈশিষ্ট্যহেতু বিরাজই হইবে।—শাঙ্খায়ন ১৬. ১০. ১। পুরুষমেধযজ্ঞের পর এক বৎসর ধরিয়া অনুমতি, পথ্যাস্বস্তি ও অদিতিকে হবির্দান করিতে হয়।

প্রায়ণেষ্টিতে অদিতির জন্য চরুর বিধি। দেবতারা পৃথিবীতে যজ্ঞ করিবার সময় অদিতিকে যজ্ঞ হইতে বাদ দিয়াছিল। অদিতি ইহাতে যজ্ঞ বিশৃঙ্খল করিয়া দেন। ফলে দেবগণ অদিতির উপর যজ্ঞ বিস্তার করিয়া যজ্ঞ অবগত হইলেন না। তাঁহারা যখন বুঝিলেন যে অদিতিই ইহার কারণ, তখন অদিতির জন্য প্রায়ণীয়ে চরুর ব্যবস্থা হইল। এইরূপ উদয়নীয় চরুরও অদিতির জন্য ব্যবস্থা হয়।—শ-ব্রা. ৩. ২. ১-৬। এইরূপ করিয়া তাহারা অদিতির সাহচর্য লাভ করে ও অদিতি হয়।—ঐ, ১২. ১. ৩. ২। অমাবস্যা ইষ্টিতে অদিতিকে চরু দেওয়া হয়।—শ-ব্রা. ৯. ১. ৩. ১। সৌত্রামণী যাগ ও তৃতীয় সাংবৎসর যাগে অদিতির জন্য চরু। দশপেয়যাগে ('প্রযুজাম্ হবীংষি') ছয়টি চরু দিতে হয়—একটি সরস্বতীর জন্য, একটি পূষার জন্য, মিত্র, ক্ষেত্রপতি, বরুণ ও অদিতির জন্য একটি। অদিতির জন্য একটি মঞ্জিষ্ঠা গাভী (বৎস-সমেত) ধরিয়া রাখা হয়। ইহা অদিতির জন্য বলি।—৫. ৫. ২. ৭-৮। সোমোৎসবে অদিতির জন্য প্রায়ণীয় হবিঃ।

পুরাণে অদিতি

মহাভারত মতে অদিতি প্রাচেতস দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের পত্নী। দ্বাদশ আদিত্য অদিতির পুত্র। —১. ৬৬. ১২। বিবস্বান্ হইতে অদিতির উৎপত্তি হইয়াছে। —১. ৬৩. ৪।

অদিতি দেবতাদিগের মাতা (মহা. ৯. ৪৫. ১৩); বিশেষত তিনি তেত্রিশ দেবতার মাতা (রা. ৩. ১৪. ১৪)। এতদ্ব্যতীত পবন, মারুত (মহা. ১২. ৩২৯. ৫৯) প্রভৃতি তাঁহার সন্তান। রামায়ণে (২. ৯২. ২১) ধাতা তাঁহার পুত্র। আবার মহাভারতে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে ইন্দ্র সর্বপ্রধান ও প্রিয়তম। ইন্দ্র যখনই বাহিরে অবস্থান করিতেন অদিতি তাঁহার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিতেন। মহাভারতে (৩. ২৩০. ২৯) তিনি রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রেবতীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন। রামায়ণে (৪. ১. ২০) তাঁহার গর্ভকে রাবণের গোপন আশ্রয়স্থল বলা হইয়াছে। কিন্তু কল্যাণী মাতৃত্বের দেবীরূপেই ইনি সমধিক পরিচিতা। এই মাতৃত্বের বশেই তিনি দেবতাদের জয়লাভের জন্য হিমবৎ পর্বতে বিনশন শিখরে রন্ধন করিয়াছিলেন এবং রন্ধন করিবার সময় আপনার কর্ণাভরণ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন; এই কর্ণাভরণ নরকের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া সূর্যদেবকে দেওয়া হয় (মহা. ৩. ১৩৫. ৩; ৩০৭. ২১)। অসুরদিগের জনপদ প্রাগ্‌জ্যোতিষে নরক ভৌম তাঁহার কর্ণকুণ্ডল রাখিয়াছিলেন। নাগগণ এই কর্ণকুণ্ডল চুরি করে এবং তাহাদিগের নিকট ইহাতেই নরক ভৌম তাহা লাভ করে। কর্ণের মৃত্যু হইলে অদিতি সূর্যকে তাঁহার কর্ণকুণ্ডল দান করিয়াছিলেন (মহা. ৩. ৩০৭. ১৮ ই.)।

পুনর্বসুর উপরে অদিতির অধিষ্ঠান (রা. ১. ১৮. ৮)। দেবতাদের মাতৃরূপেই তিনি অসুরকুলের মাতা দিতির নিকট বাধাপ্রাপ্ত হন। দিতি ও অদিতি উভয়েই কশ্যপের পত্নী। তপশ্চর্যার জন্য অদিতি ব্রাহ্মণের নিকট আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন (মহা. ১৩. ৮৩. ২৭)। বিভিন্ন পুরাণে তাঁহার পুত্র আদিত্যগণ সংখ্যায় একাদশ হইতে ত্রয়োদশ জন। তবে মহাভারত-মতে আদিত্যগণের সংখ্যা দ্বাদশ (৩. ১৩৪. ১৯)। ইঁহারা কশ্যপ প্রজাপতি মারীচের ঔরসে অদিতি-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই যোদ্ধা। ইন্দ্র ইঁহাদিগের মধ্যে প্রধান এবং বিষ্ণুকেও ইহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যত্র দেখা যায় ইন্দ্রের সিংহাসন-অধিকারী বলিরাজকে হত্যা করিবার জন্য তিনি বিষ্ণুর প্রজনন করিয়াছিলেন।

মহাভারতে (১২. ৩২৮. ৫৩) বিশ্বে ব্যাপ্ত পবন অদিতির পুত্ররূপে কথিত হইয়াছে। বসু ও রুদ্রগণও তাঁহার পুত্র। পৃথিবী, পর্বতসমূহ পৃথিবীর কর্ণকুণ্ডল। বিষ্ণু পৃথিবীকে উদ্ধার করিলে কশ্যপ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য পৃথিবীর নাম হয় কাশ্যপী (মহা. ১২. ৪৯. ৭১ ই.)। আবার হরিবংশে অদিতিকে দুর্গা হইতে অভিন্ন প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এখানেই দেখা যায়, অদিতি দেবতাদিগের নিকট মাতৃরূপা, কৃষকদিগের নিকট সীতা এবং ভূতদিগের নিকট পৃথিবী বা ধরণী। হ্রী, শ্রী প্রভৃতি তাঁহারই নামান্তর।

পূর্বোল্লিখিত কুণ্ডলসংক্রান্ত ব্যাপারের অন্যান্য পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ আছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি নরকাসুর অদিতির অমৃতস্রাবী কুণ্ডলদ্বয় হরণ করিলে (বিষ্ণুপু. ৫. ২৯. ১১) শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে পরাজিত ও নিহত করিয়া (ঐ, ৫. ২৯. ২০-১) কুণ্ডলদ্বয় অদিতিকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য সত্যভামার সহিত স্বর্গে গমন করিলেন (ঐ, ৫. ২৯. ৩৫)। ইন্দ্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণ অদিতির নিকট গমন করিয়া ঐ কুণ্ডলদ্বয় তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন (ঐ, ৫. ৩০. ৪)। ইন্দ্র অদিতির পুত্র (ঐ, ৫. ২৯. ১১)।

পুরাকালে কশ্যপ বরুণের গাভী অপহরণ করিয়াছিলেন। কশ্যপের দুই পত্নী ছিলেন,—নাম অদিতি ও সুরভি (হরি. হরি. ৫৫. ২১-২২)। ব্রহ্মার শাপে অদিতি শ্রীকৃষ্ণের মাতা দেবকীরূপে, সুরভি রোহিণীরূপে এবং কশ্যপ বসুদেবরূপে জন্মগ্রহণ করেন।—হরি. হরি. ৫৫. ৩৫. ৩৮।

অগ্নিপুরাণে (৪. ১-১১) বৈবস্বত মন্বন্তরে বিষ্ণুর অবতার বামন কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। ইনি বলিরাজকে বঞ্চনা করেন। ভাগবতে (২. ৭. ১৭) এবং বিষ্ণুপুরাণেও (৩. ১. ৪৩) এই একই কথা আছে।

মার্তণ্ডদেব (সূর্য) কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। অদিতির পুত্র দেবগণকে দৈত্যগণ কর্তৃক নির্যাতিত হইতে দেখিয়া অদিতি সূর্যের আরাধনা করিতে আরম্ভ করেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া সূর্যদেব অদিতিকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে অদিতি সূর্যকে তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে বলিলেন। যথা-সময়ে গর্ভবতী অদিতি কঠোর ব্রতানুষ্ঠান আরম্ভ করিলে কশ্যপ গর্ভনষ্টের

আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করেন; ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এক অণ্ড প্রসব করেন। কশ্যপ ইহাকে মৃত অণ্ড মনে করেন। সেই জন্য এই অণ্ড হইতে প্রসূত সন্তান মার্তণ্ড নামে খ্যাত হইলেন।—ব্রহ্মপু.৩২.১০.৪০।

কশ্যপ দক্ষকন্যা সুরভিকে বিবাহ করেন। অদিতিও কশ্যপের পত্নী। কশ্যপের অপর পত্নীগণের নাম দিতি, দনু, কালা, অরিষ্টা, সুরমা, খশা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু এবং মুনি। —বিষ্ণুপু. ১.১৫ ১২৫-২৬; মৎস্যপু. ৬. ১-২।

অদিতি দক্ষকন্যা। ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের উৎপত্তি হইলে পুনর্বার ব্রহ্মার বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের ভার্যা উৎপন্ন হইলেন, তাহা হইতে অদিতি, দিতি, কালা, অনায়ু, সিংহিকা, মুনি, প্রাধা, ক্রোধা, সুরভি, বিনতা, সুরমা, দনু ও কদ্রু নামে কন্যাগণ জন্ম গ্রহণ করেন। এই সকল কন্যাকেই কশ্যপ বিবাহ করেন।—হরি. ভবিষ্য. ৩৬. ২০. ২৩। অদিতির গর্ভে অর্যমা, বরুণ, মিত্র, পুষা, ধাতা, পুরন্দর, ত্বষ্টা, ভগ, অংশু, সবিতা ও পর্জন্য জন্মগ্রহণ করেন।—হরি. ভবিষ্য. ৩৬. ৩০. ১।

পুরাণোক্ত এই সমস্ত আখ্যায়িকা ব্যতীত—দেবীভাগবত (৪. ৩), স্কন্দ, কালিকা (২৬. ২৮), ব্রহ্মাণ্ড (৬৬. ৬০-৬৭) প্রভৃতি কয়েকখানি পুরাণে অদিতি সম্বন্ধে কোন কোন আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। বামনপুরাণ (২৮. ১২-১৩) যেভাবে অদিতির ব্যাখ্যা করিয়াছে তাহাতে অদিতিকে রূপক বলিয়াই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অদিতি ভগবানকে বলিলেন, 'হে কেশব আমি তোমাকে উদরে বহন করিতে সমর্থ হইব না। কেননা, তুমি সমুদয় বিশ্বের উদ্ভবক্ষেত্র ও সকলের ঈশ্বর। তোমাতে সমস্ত সংসার প্রতিষ্ঠিত আছে।' ইহা শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন—'অহঞ্চ ত্বাং বহিষ্যামি স্বাত্মানং চৈব নন্দিনি। ন চ পীড়াং করিষ্যামি স্বস্তি তেঽস্তু ব্রজাম্যহম্'।

অদিতি সম্বন্ধে কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বিশেষ পরিশ্রম করিয়া তথ্যানুসন্ধান করিয়াছেন। অধ্যাপক পিশেল[1] অদিতির পৃথিবী অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন (Ved. Stud. II. 86)। পরবর্তী ব্রাহ্মণাদি বৈদিক সাহিত্যে পিশেলের মতের সমর্থন আছে। কিন্তু ঋগ্বেদের উক্তির সহিত এই অর্থের ঐক্য বা সামঞ্জস্য নাই। হিলেব্রান্ডট[2] (Ved. Myth. iii.

408f ; তু. ঋ. ১. ১১৫. ৫) ও রোট[3] (ZDMG. vi. 68ff) প্রায় একরূপ মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে অদিতির অর্থ দ্যুলোকের প্রকাশাভ্যন্তরে অবস্থিত 'অনন্ত বা অনন্তত্ব'। দ্যুলোক ও প্রকাশের সহিত অদিতির সম্বন্ধ। তাঁহারা অদিতিকে অবিনাশী দিব্যলোকরূপে ব্যাখ্যা করেন। কোলিনে[4] (Trans. 9th Or. Congress, i 396—410 ; Museon, xii. 81—90) প্রায় অনুরূপ মতাবলম্বী—তিনি অদিতিকে গগনের প্রকাশ (light of the sky) বলিয়াছেন। বেরগেনের[5] মতে (SBE, xxxii. 241) 'দ্যৌরদিতি'র পরিণতিতে অদিতির দেবীত্ব হইয়াছে। এই অদিতি অসীম আকাশরূপে দেবগণকে পীযূষ জোগাইয়া থাকেন। এই মতবাদে তিনি প্রকাশের (light) অবিনাশিত্বের উপরই মর্যাদাসম্পন্ন। ম্যাক্‌সমূলার[6] (Rel. ved. iii. 88—98) বলেন, অদিতি অসীম আকাশরূপে দৃশ্যমান অনন্ত প্রকৃতি। তিনি অদিতির অর্থ করিয়াছেন পৃথ্বী ; মেঘমণ্ডল ও আকাশ—প্রত্যক্ষগোচর অসীম ও অনন্ত শূন্যস্থান, এরূপ অর্থও করিয়াছেন। তাঁহার নিজের উক্তি এইরূপ :—

"Aditi, an ancient God or Goddess, is in reality the earliest name invented to express the infinite,......the visible infinite, visible, as it were, to the naked eye, the endless expanse beyond the earth, beyond the clouds, and beyond the sky."—Ved. Hymns, 241. ডক্টর মুয়ের[7] ঋ. ২. ৮৬. ১০ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় অদিতির অর্থ 'সৃষ্টির সর্বাত্মকত্ব' অথবা 'তদ্রূপ দেবতা' করিয়াছেন ('a personification of universal, all embracing Nature or Being'—OST. v. 37)। গ্রিফিথ[8] যে অর্থ করিয়াছেন তাহাতে অদিতি বলিতে "অনন্ত বা অনন্তত্ব" বুঝায়। ঋগ্বেদের 'কস্য নূনম্‌······ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ করিবার সময় ম্যাক্‌সমূলর প্রমুখ পণ্ডিতগণ অদিতি অর্থে 'অসীম অথবা দৃশ্যমান অনন্ত শূন্যস্থান' না বুঝিয়া 'মুক্তি বা মুক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা' বুঝিয়াছেন। ওয়ালিস[9] (Cosmology, 45ff ; তু. von Schroeder, Arische Religion,

ii. 400) ও ওল্‌ডেন্‌বর্গ[10] (Rel. des Veda, 202ff ; SBE, xlvi. 329) অদিতির অর্থ করিয়াছেন 'বন্ধন হইতে মুক্তি' (freedom from bondage), গেল্‌ড্‌নর[11] (Zur Kosmogonie des RV., 5) বলেন, অদিতি অর্থে 'অখণ্ডত্ব' (undividedness), 'সম্পূর্ণত্ব' (completeness) বুঝায়। এই সমস্ত অর্থ কতদূর সুসঙ্গত তাহা অনুসন্ধেয়।

অদিতি যে সম্পূর্ণ রূপক, ইহাও কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমে অদিতি বলিলে কোন ব্যক্তিবিশেষকে বুঝাইত না। ক্রমশ ঋষিগণ-কর্তৃক তাহা অন্তরীক্ষ স্থানে প্রযুক্ত হইল। এইরূপে অদিতি ক্রমে দেবীত্বে পরিণত হয়।

শুনঃশেপ-ঘটিত আখ্যানে অদিতির 'পৃথিবী' অর্থে কেহ কেহ আপত্তি করেন। পণ্ডিত কৃষ্ণশাস্ত্রী ঘুলে[12] শুনঃশেপ সম্পর্কিত মন্ত্রে 'পৃথিবী' অর্থ যে ভুল তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঋগ্বেদে পিতামাতার অর্থ 'দ্যাবাপৃথিবী'। উদাহরণস্বরূপ তিনি ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন—'পিতা মাতা চ ভুবনানি রক্ষতঃ'।—ঋ. ১. ১৬০. ২; 'দ্বে স্রুতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্যানাম্। তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎসমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরং চ'।—ঋ. ১০. ৮৮. ১৫; 'দ্যৌর্নঃ পিতা পৃথিবী মাতা'।—ঋ. ১. ১৯১. ৬; 'দ্যৌষ্পিতঃ পৃথিবী মাতঃ'।—ঋ. ৬. ৫১. ৫; 'আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্ মাতরং পুরঃ। পিতরং চ প্রযন্ত্‌স্বঃ'।—ঋ. ১০. ১৮৯. ১। ঘুলে মহাশয় বলেন, শুনঃশেপ যে পিতৃ-কর্তৃক যূপে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার নিকট যাইবার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হইবেন কেন? তাঁহার মাতাও তাঁহার এই দুর্দশার কারণ। আর পৃথিবীর উপরে থাকিয়া তাঁহাকেই বা তিনি চাহিবেন কেন? সুতরাং অদিতির 'পৃথিবী' অর্থ ভুল। তিনি বলেন, অদিতির অর্থ 'উত্তরখগোলার্ধ' এবং 'দিতি'র অর্থ 'অধঃখগোলার্ধ'।—দিতি ঔর অদিতি (গঙ্গা, ১৯৩২, জানু. পৃ. ৯৫-১০৪)।

পাদটীকা

১ শুনঃশেপকে যূপে বন্ধন করা হইয়াছিল (৫. ২. ৭)। এখানে 'আবদ্ধ' বুঝাইতে 'দিত' (দা [বন্ধন করা]+ক্ত) পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার বিশেষ্যপদ 'দিতি'=বন্ধন binding. সুতরাং অদিতি—বন্ধনরাহিত্য, bondlessness, unbinding। ৮. ৬৭. ১৪ ঋকে আদিত্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—'তোমরা হিংসাকারীদিগের মুখ হইতে বদ্ধ চোরের ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা কর'—'তে ন আস্নো বৃকাণামাদিত্যাসো মুমোচত। স্তেনং বদ্ধমিবাদিতে'।

২ ঋ. ৮. ১০১. ১৫ ; তু. অ. ৬. ৪. ১. ঋকে অদিতির ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণের উল্লেখ আছে।

৩ তৈ-স. ৭. ৫. ১৪ ; বাজ-স. ২৯. ৬০।

৪ ৭. ৬. ২=বাজ-স. ২১. ৫।

৫ ঋ. ২. ৭২. ৯ ; অ. ১৩. ১. ৩৮।

গ্রন্থপঞ্জী

[A. A. Macdonell : Vedic Mythology ; A. B. Keith : The Rel. and Phil. of the Veda and Upanishads, 1925, pp 215-19 ; Hopkins : JAOS, pp 17, 91 ; Vedic Hymns, SBE, pp 32, 241 ; Hillebrandt : Aditi, p 20 এবং নিবন্ধে প্রদত্ত নির্দেশ]।

[বঙ্গীয় মহাকোষ, ২য় খ. পৃ. ১৬৮-১৭৪]

প্রসঙ্গ-কথা

1 অধ্যাপক পিশেল (Pischel, Karl Richard) (1849-1904) : জর্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্। জন্ম—ব্রেসলাউ শহরে। হালে ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ইনি জর্মানভাষায় বেদ, কালিদাসের শকুন্তলা, থের ও থেরীগাথা (১৮৮৩), হেমচন্দ্রের প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণ (১৮৭৭-৮০), অভিধান, দেশিনামমালা (১৮৮০) প্রভৃতি কোন-কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা, অনুবাদ, সম্পাদনা প্রভৃতি করেন। গেল্ড্নার (Geldner, Karl F) সহ তিনি Vedische Studien (Stuttgart, 1889-97) ২ খণ্ড রচনা করেন।—ভা-কো.

2 হিলেব্রান্ড্ট (Hillebrandt, Alfred) : জর্মানদেশীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্। গ্রন্থ—Über die Göttin Aditi (Breslau, 1876), Vedische Mythologie (ঐ, 1891)—*WHSL*

3 রোট (Roth, Rudolf von) (1821-1895) : জর্মানদেশীয় পণ্ডিত। বৈদিক সাহিত্য ও বৈদিক যুগের ইতিহাস রচনা করে প্রসিদ্ধ হন। বৈদিক ভাষাতত্ত্ব, অথর্ববেদ, অবেস্তা নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। বোটলিংকের সংস্কৃত অভিধান প্রণয়নে ইনি সহযোগী ছিলেন। অন্যতম গ্রন্থ—Abhandlung über den Atharva Veda (Tübingen, 1856)।

4 কোল্‌নিনে : পরিশিষ্ট দ্র.

5 বেরগেন (Bergaine, Abel) : ফরাসীদেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। গ্রন্থ—Manuel pour étudier le Sanscrit Védique (Victor Henry সহ, Paris, 1890), Le Religion Vedique ; 3 Vols. (Paris, 1878-83)।

6 ম্যাক্‌স্‌মূলর (Max Muller, Friedrick) : 'অনার্য' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

7 ড. মুয়ের (Muir, J) (1810-1882): ব্রিটিশ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ১৮২৯ খ্রী. নর্থ-ওয়েস্ট-প্রভিন্সে কর্মসূত্রে ভারতে আগমন। বেনারসে কুইন্স কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৪৪), ফতেপুরে জজিয়তীও করেন। ভারতে থাকতে সংস্কৃত চর্চা করেন এবং ভারতে ও ইংলণ্ডে থেকে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ—Indra as represented in the Hymns of the Rigveda (Edinburgh, 1868), Original Sanskrit Texts on the Origin and History of the People of India, 5 vols (1873-74)।—*BDIB*

8 গ্রিফিথ (Griffith, Ralph Thomas Hotchin) (1826- ?) : শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিত। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ, বেনারস কলেজের অধ্যাপক (১৮৫৪-৬২) ও অধ্যক্ষ (১৮৬৩-৭৮)। অযোধ্যা প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ (১৮৭৮-৮৫)। 'পণ্ডিত' নামে একখানি সংস্কৃত পত্রিকা প্রকাশ ও ৮ বছর সম্পাদনা করেন। গ্রন্থ—Scenes from the Ramayan (১৮৬৮), The Ramayan of Valmiki (১৮৭০), The Hymns of Rigveda (১৮৮৯-৯২), The Hymns of Atharva-veda (১৮৯৫), The text of the white Yajur-veda (১৮৯৯) ই.।—ঐ

9 ওয়ালিস : পরিশিষ্ট দ্র.

10 ওল্‌ডেন্‌বার্গ (Oldenberg, Hermann): সংস্কৃতজ্ঞ জর্মান পণ্ডিত। ইনি জর্মান ভাষায় দীপবংস, গৃহ্যসূত্র অনুবাদ করেন এবং থের ও থেরীগাথা, বিনয়পিটক প্রভৃতি সম্পাদনা করেন। গ্রন্থ—Die Religion des Vedas (বার্লিন, ১৮৯৪), Hymnen des Rigveda (ঐ, ১৮৮৮)।

11 গেল্‌ড্‌নার (Geldner, Karl): সংস্কৃতজ্ঞ জর্মান পণ্ডিত। ইনি অধ্যাপক পিশেলের Vedische Studien (১৮৮৯-৯৭) গ্রন্থ প্রণয়নে সহযোগী ছিলেন।

12 কৃষ্ণস্বামী ঘুলে : পরিশিষ্ট দ্র.

অত্রি

ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অত্রি। ঋগ্বেদে অন্যূন চল্লিশবার একবচনে 'অত্রি' এবং অত্রিবংশীয় ঋষিগণ অর্থে বহুবচনে 'অত্রয়ঃ' পদের উল্লেখ আছে। অগ্নি, ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয় ও বিশ্বদেবগণের উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদের বহু সূক্ত মহর্ষি অত্রি-কর্তৃক ঈরিত। মনুর ন্যায় অত্রিও লোকপিতৃগণের অন্যতম বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন।- ঋ. ১. ৩৯. ৯। মহর্ষি অত্রি বৈদিক পঞ্চজাতির (পঞ্চজনের) অন্তর্গত ছিলেন।—ঋ. ১. ১১৭. ৩।

অত্রিশব্দের নিরুক্তি

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৩. ১৩. ১০) একটি আখ্যায়িকা আছে—দেবগণ প্রজাপতির রেত অগ্নিদ্বারা বেষ্টিত করিয়াছিলেন···মরুতেরা তাহা কম্পিত করিয়াছিলেন। অগ্নি বৈশ্বানর তাহা কঠিন করিয়াছিলেন। সেই রেতো-মধ্যে যে অংশ প্রথমে উদ্দীপ্ত হইল তাহাই আদিত্য হইল। দ্বিতীয় যে অংশ ছিল, তাহা ভৃগু হইল। বরুণ সেই ভৃগুকে গ্রহণ করিলেন। সেইজন্য তিনি বারুণি ভৃগু। যে তৃতীয় অংশ দীপ্তি পাইয়াছিল, তাহা আদিত্য হইল। অবশিষ্ট সমস্ত দগ্ধ হইয়া অঙ্গার হইয়াছিল। তাহা হইতে অঙ্গিরোগণ হইলেন। ইত্যাদি। ইহারই অনুরূপ একটি আখ্যায়িকা শতপথ-ব্রাহ্মণে (১. ৪. ৫. ১৩) অত্রির উৎপত্তি সম্বন্ধে পাওয়া যায়। তদ্ধৈতদ্দেবাঃ। রেতঃ (বাচঃসকাশাৎ পতিতং গর্ভং) চর্মন্বা যস্মিন্ বা বভ্রুস্তদ্ধ স্ম পৃচ্ছন্ত্যত্রেব ত্যাহদিতি ততোঽত্রিঃ সম্বভূব।'—শ-ব্রা. ১. ৪. ৫. ১৩। যাস্ক (নি. ৩. ১৭) এই দুইটি আখ্যায়িকা জুড়িয়া দিয়া বলিয়াছেন

যে অগ্নির অর্চি হইতে প্রথমে ভৃগু উদ্ভূত হন। তারপর অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা এবং তৃতীয়ত সেই একই স্থান হইতে অত্রি উৎপন্ন হইলেন।—'অত্রৈব তৃতীয় মৃচ্ছতীত্যূচুস্তস্মাদত্রিঃ, ন ত্রয় ইতি।'—নি. ৩. ১৭ (শ-ব্রা. অত্রেব ত্যদিতি—১. ৪. ৫. ১৩)। যাস্কের এই ব্যুৎপত্তি হইতে কেহ কেহ অত্রির অর্থ করিয়াছেন—'অত্রয়ঃ ত্রিভিঃ কামক্রোধলোভদোষৈঃ রহিতাঃ' অথবা 'অবিদ্যমানত্রিবিধদুঃখাঃ'। সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন—'আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকভেদভিন্নাস্ত্রিবিধা দুঃখানুভবা যস্য ন বিদ্যতে সঃ'। যাস্ক অত্রির অন্য অর্থও করিয়াছেন—'অত্রিমগ্নিরন্তরৌষধিবনস্পতিষ্বপ্সু তম্'—নি. ৬. ৩৬। শতপথ-ব্রাহ্মণে (১৪. ৫. ২. ২) অন্যত্র 'যিনি অন্ন ভক্ষণ করেন তাঁহাকে অত্রি' বলা হইয়াছে।—'বাগেবাত্রির্বাচা হ্যন্নমদ্যতেঽত্তির্হ বৈ নামৈতদ্যদত্রিরিতি।' সম্ভবত এই অর্থ প্রতিপাদন করিবার জন্য কেহ কেহ √অদ্+ঔণাদিক ত্রিপ্ প্রত্যয় করিয়া অত্রি শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন [অদেস্ত্রিনিশ্চ—উণা. ৬. ৭৬। অত্র চকারাৎ ত্রিবনুবর্ততে। তেনাদ্ধাতোস্ত্রিপ্]। বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী[1] প্রভৃতি পণ্ডিতও এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। ঋগ্বেদেও একবার মাত্র (২. ৮. ৫) এই অর্থের দ্যোতনা দেখিতে পাওয়া যায়।

'অত্রিমনু স্বরাজ্যমগ্নিমুক্থানি বাবৃধুঃ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়ো দধে॥'

অর্থাৎ শত্রুদিগের বিনাশক এবং স্বয়ং শোভমান অগ্নির উদ্দেশে উক্থসকল বর্ধিত হইয়াছে। অগ্নি সমস্ত শোভা ধারণ করিয়াছেন। এখানে অগ্নি শব্দের বিশেষণরূপে 'অত্রি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এইজন্য কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে, অত্রি শব্দটি হব্যভুক্ অর্থে অগ্নিকে বুঝাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। পরে ইহাতে ঋষিত্ব আরোপিত হইয়াছে। এই অনুমান সমর্থনযোগ্য নয়। অত্রি শব্দের অর্থ হব্যভুক্ হইতে পারে এবং অশ্বিদ্বয় কর্তৃক শতদ্বার যন্ত্রগৃহ হইতে অগ্নির উদ্ধার (৭. ৭৮. ৪; ১০. ৮০. ৩) কাল্পনিক রূপক হইতে পারে। তাই বলিয়া ইহা যে কোন ঋষিবিশেষের নাম হইতে পারে না, একথা স্বীকার করা যায় না। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের কয়েকটি সূক্তের ঋষি স্বয়ং অত্রি এবং এই মণ্ডলের অপর সকল

সূক্তের ঋষি তাঁহার কোন না কোন অপত্য। অত্রির কন্যা অপালা ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৯১ সূক্তের অন্যতম উদ্দিষ্টা। অত্রি যে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশেষত অগস্ত্য ঋষির ন্যায় অত্রির কার্যও যে বহু স্থানব্যাপক, সে সম্বন্ধেও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে সুদূর ইউরোপ পর্যন্ত তাঁহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। চীনদেশেও অত্রির উল্লেখ পাওয়া যায়।

হিন্দুর ধর্মগ্রন্থাদি ভারতীয় ইতিবৃত্তের প্রধান উপাদান। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য প্রাচীনগ্রন্থে অত্রির কথা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের অত্রি বা অগস্ত্য রামায়ণ অথবা মহাভারতের সময় পর্যন্ত বর্তমান থাকিতে পারেন না বলিয়া অনেকে অত্রি অথবা অগস্ত্যের আখ্যানগুলিকে নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। কিন্তু গোত্র-পিতার নামে সেই সেই বংশীয় প্রধান পুরুষগণের পরিচয় দেওয়ার প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান ছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বহু প্রমাণ পাইয়াছেন।

ঋগ্বেদে অত্রি

অত্রি ঋষিকে অসুরগণ মায়াদ্বারা রচিত শতদ্বার যন্ত্রগৃহে আবদ্ধ করিয়া তাহাতে তুষের আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল। অত্রি সেই সময়ে অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়াছিলেন এবং অশ্বিদ্বয়ও তাঁহাকে সে স্থান হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন (ঋ. ১. ১১৭. ৩; ১. ১১৬. ৮; ১. ১১২. ৭; ৫. ৭৮. ৪; ১০. ৮০. ৩)। ইন্দ্রও অত্রিকে পথ দেখাইয়া দস্যুদিগের মায়া হইতে উদ্ধার করেন (ঐ, ১. ৫১. ৩; ৮. ৩৮. ৬)। অশ্বিদ্বয় অত্রিকে পাপ ও অন্ধকার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন (ঐ, ৭. ৭১. ৫)। যুদ্ধের সময় অত্রি, ভরদ্বাজ, কণ্ব প্রভৃতি ঋষিকে অগ্নি রক্ষা করিয়াছিলেন (ঐ, ১০. ১৫০. ৫)। অশ্বিদ্বয় হিমদ্বারা দীপ্যমান অগ্নি নিবারণ করিয়া তাঁহাকে অন্নযুক্ত বলপ্রদ খাদ্য দিয়াছিলেন (ঐ, ১. ১১৬. ৮)। অশ্বিদ্বয় অত্রিকে পথ-দেখাইয়াছিলেন (ঐ, ১. ১১২. ১৬)। অত্রির অপত্য সপ্তবধ্রি ঋষিকে অশ্বিদ্বয় তাঁহার ভ্রাতৃব্যগণ-কর্তৃক বদ্ধ পেটিকা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন (ঐ, ৫. ৭৮.

৫-৯)। অশ্বিদ্বয়-কর্তৃক অত্রির জন্য রক্ষাগৃহ নির্মিত হইয়াছিল। সপ্তবধ্রির কথা ঋগ্বেদের অন্যত্রও পাওয়া যায় (ঐ, ৮. ৭০. ৯; ১০. ৩৯. ৯)। ঋগ্বেদে একস্থলে (১. ১১২. ৭) অশ্বিদ্বয়ের স্তুতিতে বলা হইয়াছে—

'যাভিঃ শুচন্তিং ধনসাং সুষংসদং
তপ্তং ঘর্মমোম্যাবন্তমত্রয়ে'।

অর্থাৎ, যে সকল উপায়দ্বারা শুচন্তিকে ধনবান্ ও শোভনীয় গৃহসম্পন্ন করিয়াছিলে, যে সকল উপায়দ্বারা অত্রির জন্য গাত্রদাহকারী উত্তাপও সুখকর করিয়াছিলে··· ···ইত্যাদি।

সায়ণ তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—অসুরগণ অত্রিকে শতদ্বার যন্ত্রগৃহে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে পীড়া দিবার জন্য অগ্নি জ্বালাইয়াছিল, অশ্বিদ্বয় শীতল জলদ্বারা সে অগ্নি নিবাইয়া দিলেন। যাস্ক এই উপাখ্যানটি একটি উপমামাত্র মনে করেন। অত্রি অর্থে অগ্নি (অদ্ ধাতু ভক্ষণে হব্যভুক্)। সূর্য কিরণতপ্ত গ্রীষ্মকালে অগ্নির ক্ষুধা কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলে, বর্ষাকালের বৃষ্টিদ্বারা পুনরায় উত্তেজিত হয়।

অন্যত্র আছে, (ঐ, ১০. ১৪৩. ১-৩), অত্রি ঋষি যজ্ঞ করিয়া বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন এবং অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে পুনর্যৌবন দান করেন।

'ত্যং চিদত্রিমৃতজুরমর্থমশ্বং ন যাতবে।
কক্ষীবন্তং যদী পুনা রথং ন কৃণুথো ন বং॥ ১॥
ত্যং চিদশ্বং ন বাজিনমরেণবো যমত্নত।
দৃঢ়ং গ্রন্থিং ন বি ষ্যতমত্রিং যবিষ্ঠমা রজঃ॥ ২॥

—১০. ১৪৩

হে অশ্বিদ্বয়! অত্রি ঋষি যজ্ঞ করিয়া বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে তোমরা এরূপ করিলে যে, তিনি ঘোটকের ন্যায় গন্তব্যস্থানে গেলেন। যেমন জীর্ণ রথকে নূতন করা হয়, তদ্রূপ তোমরা কক্ষীবান্ ঋষিকে নবযৌবন প্রদান করিলে।

প্রবলপরাক্রান্ত শত্রুরা অত্রিকে শীঘ্রগামী ঘোটকের ন্যায় বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল। যেরূপ দৃঢ়তর গ্রন্থি খুলিয়া দেয়, তদ্রূপ তোমরা অত্রিকে মোচন করিলে, তিনি যুবা পুরুষের ন্যায় পৃথিবী অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৪০ সূক্তে দেখা যায়, অত্রি মহাতেজস্বী ঋষি ছিলেন। স্বর্ভানু নামক দৈত্যের দ্বারা চন্দ্র-সূর্য আচ্ছন্ন হইলে তিনি নিজের জ্যোতিঃদ্বারা অন্ধকার দূর করেন ও চন্দ্র-সূর্যকে স্বস্থানে স্থাপন করেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে (৪ ৩. ৪. ২১) ও অথর্ববেদেও (১৩. ২. ৪. ১২-৩৬) ইঁহার উল্লেখ আছে। বেদে রাহুর কথা নাই; পরন্তু পুরাণে স্বর্ভানু রাহুর একটি নাম। সুতরাং উক্ত সূক্তে সূর্য ও চন্দ্র-গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে।

অত্রি বলিতেছেন—হে সূর্য! যখন আসুর স্বর্ভানু তোমাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল, নিজ স্থান-নিরূপণে অসমর্থ হতবুদ্ধি ব্যক্তি যেরূপ দৃষ্ট হয়, তৎকালে ত্রিভুবনও সেইরূপ লক্ষিত হইয়াছিল।

হে ইন্দ্র! যখন তুমি সূর্যের অধঃস্থিত স্বর্ভানুর সেই সকল মায়া দূরে অপসারিত করিয়াছিলে, তখন অত্রি চারিটি ঋকের দ্বারা কার্যবিঘাতক অন্ধকারদ্বারা সমাচ্ছন্ন সূর্যকে প্রকাশিত করিলেন।

[সূর্য বলিতেছেন] হে অত্রি! আমি তোমার আত্মীয়, দ্রোহকারী যেন ক্ষুধাবশত ভীষণ অন্ধকারদ্বারা আমাকে গ্রাস না করে, তুমি মিত্র ও সত্যপরায়ণ; তুমি ও রাজা বরুণ উভয়ে আমাকে রক্ষা কর।

তখন সেই ঋত্বিক্ (অত্রি) সূর্যকে উপদেশ দিয়া প্রস্তরখণ্ডের ঘর্ষণ করিয়া এবং স্তোত্রদ্বারা দেবগণকে পূজা করিয়া, মন্ত্রপ্রভাবে অন্তরীক্ষে সূর্যের চক্ষু সংস্থাপিত করিলেন—তিনি স্বর্ভানুর সমস্ত মায়া দূরে অপসারিত করিলেন।

আসুর স্বর্ভানু অন্ধকারদ্বারা সূর্যকে আবৃত করিলে অত্রির পুত্রগণই অবশেষে তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন, অন্য কেহ তাহাতে সমর্থ হন নাই।—ঋ. ৫. ৪০. ৫-৯।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, চন্দ্র অথবা সূর্যগ্রহণ কালে কোনরূপ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইত বা এই সূক্তদ্বারা ইন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি দেবগণকে আহ্বান করা হইত। অত্রিই এই সূক্তের ঋষি। অত্রি ও অত্রিপুত্রগণই এই সূক্তের দ্রষ্টা বলিয়া স্বর্ভানুর (রাহুর) মায়া হইতে তাঁহাদিগের দ্বারা সূর্য ও চন্দ্রকে মুক্ত করিবার কথা ঋক্‌গুলিতে বর্ণিত হইয়াছে।

শতপথ-ব্রাহ্মণে দেখা যায়, অত্রি 'বাক্' হইতে উৎপন্ন (১. ৪. ৫. ১৩) এবং অত্রি ও বাক্ অভিন্ন (১৪. ৫. ২. ৫)।

রামায়ণ ও মহাভারতে অত্রি

রামায়ণে অত্রি সপ্তর্ষির (সপ্ত নক্ষত্র) অন্যতম, এবং অত্রিকে সেখানে উত্তর গগনে অবস্থিত বলা হইয়াছে (রা. ৭. ১. ২ ই.)। তিনি অন্যতম মহর্ষি (মহা. ৩. ২৮১. ১৪ ; ৫. ১৭৬. ৪৬ ; ১৩. ৬. ৩৭)। আঙ্গিরস, বাশিষ্ঠ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ঋষিবংশের সহিত আত্রেয় বংশেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (মহা. ৩. ২৬. ৭)। অত্রিকে একস্থানে উশনার (শুক্রের) পুত্র বলা হইয়াছে (মহা ১. ৬৫. ৩৬ ; ৬৬. ৪৬ ই.)। দুর্বাসা মুনি অত্রির পুত্র বলিয়া উল্লিখিত (রা. ১. ২৫. ২১)। কুবেরের সপ্তর্ষির মধ্যে অত্রি একজন (মহা. ৫. ১১১. ১৪ ; ১৩. ১৫১. ৩৮)। অত্রিকে ব্রহ্মার পুত্রও বলা হইয়াছে (ঐ, ১৩. ৬৫. ১)। তিনি সোমের (চন্দ্রের) পিতা, এজন্য তাঁহাকে চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ বলা হয় (ঐ, ৭. ১৪৪. ৪ ই. ; ১২. ২০৮. ৯ ; ১৩. ১৫৫. ১২)। তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র-গণের অন্যতম (রা ১. ৫. ৯)। সূর্য অস্ত গেলে যে সপ্তর্ষি পৃথিবী আলোকিত করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অত্রি এক জন (মহা. ১২. ৩৩৬. ২৭ ই. ; ১. ১২৩ ৫০ ; হরি. হরি. ৭. ৭-৮)। অত্রি হইতে অগ্নির উৎপত্তি (মহা. ৩. ২২২. ২৮)। অত্রি নিমি রাজার পুরোহিত ছিলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম নিমিকে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা দেন (ঐ, ১৩. ৯১. ২০)। রাহু শরদ্বারা সূর্য ও চন্দ্রকে বিদ্ধ করিলে অত্রি সূর্য ও চন্দ্র হইয়া আলোক দান করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছিলেন (ঐ, ১৩. ১৫৭. ৮ ই.)। তিনি সমুদ্রতল পাইবার জন্য শতবর্ষ ধরিয়া চেষ্টা করেন (ঐ, ১. ২১. ১৩)। দেহতত্ত্বে তিনি পারদর্শী ছিলেন (ঐ, ১২. ২১৪. ২৩)।

অত্রিঋষি কুলপতি। পত্নী অনসূয়ার অনুরোধে তিনি বেণপুত্র পৃথুর যজ্ঞে গমন করেন। তিনি রাজাকে 'ঈশ্বরস্বরূপ' বলিয়া আশীর্বাণী উচ্চারণ করিলে গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠেন। সনৎকুমার সেই বিরোধের মীমাংসা করেন। পৃথু অত্রিকে ১০ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ও দশভার রত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রগণকে তাঁহা অর্পণ করিয়া উত্তরে তপস্যার্থ যাত্রা করেন। অত্রি-পত্নী অনসূয়াও বিশেষ তপঃসম্পন্না রমণী ছিলেন। অনাবৃষ্টির সময়ে তিনি শুষ্ক গঙ্গার জল আনয়নপূর্বক পৃথিবীকে সিক্ত

করেন। একবার তাঁহার কোন সখীকে মাণ্ডব্য ঋষি 'আগামী কল্য তুমি বিধবা হইবে' এইরূপ অভিশাপ দেন। অনসূয়া এই অভিশাপ ব্যর্থ করিবার জন্য এক রাত্রিকে দশরাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ করিয়া সে অভিশাপ ব্যর্থ করেন (রা. ২. ১১৭. ১১)। বনবাসকালে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশকালে রামচন্দ্র অত্রির আশ্রমে গমন করিলে অনসূয়া সীতাকে পাতিব্রত্য-ধর্মে উপদেশ দিয়া দিব্যমাল্য, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, আভরণ ও আশ্চর্য অঙ্গরাগ অনুলেপন দিয়াছিলেন (রা. ১. ১১৮)।

পুরাণে অত্রি

কূর্মপু. (পূ. ২, ২২-২৪) মতে পিতামহ ব্রহ্মা যোগবিদ্যা-প্রভাবে মরীচি, ভৃগু, অত্রি প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী সাধক, ব্রাহ্মণোত্তম ব্রাহ্মণদিগকে সৃষ্টি করেন। এজন্য অত্রি ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া কথিত (লিঙ্গপু. পূ. ৫. ৯-১০)। ব্রহ্মাণ্ডপু (৯. ৯৫) মতে ব্রহ্মার কর্ণ হইতে অত্রির জন্ম। আবার ভাগবতে (৩. ২২. ২১-২৪) দেখা যায়, ব্রহ্মার নেত্র হইতে অত্রি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি দশজন প্রজাপতির অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ডপু. (৯. ৬৩-৬৫) ও পদ্মপু. (সৃষ্টি. ৩. ১৬৬. ৮)-এ ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ 'নবব্রহ্মা' নামে উল্লিখিত। অত্রিপত্নী অনসূয়া দক্ষের কন্যা (কূর্মপু. ৮. ১৯-২০; ব্রহ্মাণ্ডপু. ১০. ২৬-৩২)। কূর্মপু. (পূ. ১৩. ৭-৮) মতে অনসূয়ার গর্ভে অত্রির সোম, দুর্বাসা ও দত্তাত্রেয় নামে তিন পুত্রের জন্ম হয়। কিন্তু লিঙ্গপু. (পূ. ৫. ৩৪-৫০) এবং ব্রহ্মাণ্ডপু. (২৮. ২০-২১) মতে অত্রি ও অনসূয়ার পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। কন্যার নাম শ্রুতি। লিঙ্গপু.-তে পাঁচ পুত্র—ভব্য, মূর্তি, মন্দচারী, অপ ও সোম এবং ব্রহ্মাণ্ড-পু.-তে পাঁচ পুত্র—সত্যনেত্র, হব্য, আপোমূর্তি, শনীশ্বর ও সোম। ব্রহ্মাণ্ড-পু.-এ (২৮. ২০) শ্রুতি শঙ্খপাদের মাতা ও প্রজাপতি কর্দমের পত্নী। ঘৃতাচীর গর্ভে অত্রির বেদবেদাঙ্গ নিরত স্বস্ত্যাত্রেয় প্রভৃতি পুত্রগণের জন্ম হইয়াছিল (কূর্মপু. পূ. ১৯. ১৮-১৯)। অন্যত্র ভদ্রার গর্ভে অত্রিপুত্র সোমের জন্ম; অন্যান্য পত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণ স্বস্ত্যাত্রেয় নামে প্রখ্যাত—তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ দত্ত ও কনিষ্ঠ দুর্বাসা। ব্রহ্মবাদিনী আমলা অত্রির কন্যা,

ইনি সর্বকনিষ্ঠা। অত্রির দুই গোত্রের মধ্যে শ্যাব, প্রত্বস, ববল্গু এবং গহ্বর এই চারিজন ভূমণ্ডলে প্রথিত। আত্রেয়দিগের এই চারি প্রকার ভেদ। অত্রি প্রভাকর বলিয়া কীর্তিত। কথিত আছে, সূর্য রাহুর আক্রমণে আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন। তাহাতে ত্রিলোক অন্ধকারাভিভূত হইবার উপক্রম হইলে অত্রিই জগতে প্রভা প্রবর্তিত করেন। ভূতলে পতনোন্মুখ সূর্য ব্রহ্মর্ষির শুভাশীষলাভে আর আকাশ হইতে বিচ্যুত হন নাই। এইজন্য মহর্ষিরা অত্রিকে প্রভাকর আখ্যা দিয়াছিলেন (কূর্মপু. পূ. ৬৩. ৬৮-৮২)। সপ্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষির অন্যতম অত্রি (ঐ, পূ. ৫০. ১৫; হরি. হরি. ৭. ৮-৯)। দ্বাদশ কলিযুগে অত্রি মহাদেবের অবতার (কূর্মপু. পূ. ৫২. ৭; লিঙ্গপু. পূ. ৭. ২১-৩৫; ২৪. ৫৫-৫৮)। আবার চতুর্দশ দ্বাপরে আঙ্গিরসবংশ্য গৌতমের পুত্র অত্রি (বায়ুপু. ২৩. ১৫২-৫৪)।

পৃথুর যজ্ঞে অত্রির গমন ও দানগ্রহণ সম্বন্ধে আখ্যান আছে; তিনি ইন্দ্রকে যজ্ঞবিঘ্নকারী বলিয়া ভর্ৎসনা করেন এবং বধ করিতে আজ্ঞা দেন (ভা. ৪. ১৯. ১০-২০)।

বৈদিক ঋষি অত্রির নামের সহিত পৌরাণিক কালে আত্রেয়গণের নামসাদৃশ্য থাকায় অত্রি সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অত্রি ও অত্রিবংশীয়গণ সম্বন্ধে সুপণ্ডিত Pargiter[২] মহোদয় বহু পরিশ্রম করিয়া কয়েকটি যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত উপকরণ ও যুক্তির অনুবর্তী হইয়া নিম্নে এই ব্যাপার সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য প্রদত্ত হইল।

পৌরাণিক ঋষি অত্রির নাম বহু আত্রেয়ের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। আত্রেয়গণের বংশতালিকা ব্রহ্মাণ্ডপু. (৩. ৮. ৭৩-৮৬), বায়ুপু. (৭০, ৬৭-৭৮) ও লিঙ্গপু. (পূ. ৬৩. ৬৮-৭৮) প্রদত্ত আছে। এই বংশতালিকা ব্রহ্মপু. (১৩. ৫-১৪) ও হরি. হরি. (৩১. ১৬৫৮, ১৬৬১-৮—ASB-সং)-এ উল্লিখিত বংশতালিকার অনুরূপ। মৎস্যপু. (১৯৭)-এ আত্রেয় ঋষি ও গোত্রসমূহের একটি তালিকা আছে। বংশতালিকাটি খুবই সংক্ষিপ্ত।[১] উহাতে প্রথম পৌরাণিক সোমের পিতৃরূপে অত্রির সহিত প্রভাকরের একত্ব প্রতিপাদনে অস্পষ্টতার সৃষ্টি হইয়াছে। উহাতে দেখান হইয়াছে যে, একটি ব্রাহ্মণ্য আখ্যান হইতে প্রভাকর ও স্বস্ত্যাত্রেয় নামের উৎপত্তি।

যে প্রভাকর অত্রি বা আত্রেয় নামে কথিত হন,[২] তিনি এই বংশের প্রথম আত্রেয় এবং তাঁহার ঐতিহাসিক অস্তিত্বও স্বীকার করা হইয়াছে। ইনি ভদ্রাশ্ব[৩] বা রৌদ্রাশ্ব[৪] ও ঘৃতাচীর দশ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই রৌদ্রাশ্ব একজন পৌরব নৃপতি। বায়ু, মৎস্য ও ভাগবতপুরাণে তাঁহার মহিষীর নাম ঘৃতাচী এবং বায়ুপু. ব্রহ্মপু. ও হরিবংশে তাঁহার দশ কন্যার ও উহাদের সহিত প্রভাকরের বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। বংশতালিকা হইতে জানা যায়, প্রভাকরের পুত্র দশ জন, তাঁহারা স্বস্ত্যাত্রেয় নামে কথিত হইয়াছেন[৫] এবং প্রভাকর হইতেই শ্রেষ্ঠ আত্রেয় গোত্রগণের উৎপত্তি। তাঁহার স্বস্ত্যাত্রেয় বংশধরগণের (পুত্র নহে) মধ্যে দত্ত ও দুর্বাসা ঋষি বিশেষ প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য।[৬]

দত্ত আত্রেয় বা দত্তাত্রেয়[৭] হৈহয় নৃপতি অর্জুন কার্তবীর্যের আখ্যানের সহিত সংশ্লিষ্ট।[৮] সুতরাং অর্জুন কার্তবীর্য দত্তাত্রেয়েরই একজন বংশধর। পরবর্তী কালের আখ্যায়িকাসমূহে তাঁহাকে ভ্রমবশত অন্যান্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে।[৯] এই দত্তাত্রেয় হিতৈষী ও নিষ্কলঙ্করূপে প্রসিদ্ধ[১০] এবং ইনি বিষ্ণুর ৪র্থ অবতাররূপে প্রথিত।[১১] অবশ্য কোথাও কোথাও ইঁহাকে কামোপভোগ ও মদ্যপান করিতে দেখা যায়।[১২] কথিত আছে, নিমি নামে ইঁহার এক পুত্র ছিল, তিনিই প্রথম শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন।[১৩]

দুর্বাসা আত্রেয় দত্তের ভ্রাতৃরূপে কথিত[১৪] হইলেও তাহা আবার স্থির করিয়া বলা যায় না, কারণ কোন নৃপতির সহিত ইঁহার কোন সংশ্রব নাই। আখ্যানসমূহেই প্রায় ইঁহার নাম পাওয়া যায়।[১৫] ইনি একজন কোপন ও উগ্রস্বভাব ঋষি ছিলেন।[১৬] ইঁহার চরিত্রের বিশেষ পরিচয় কৃষ্ণের কাহিনীতেই পাওয়া যায়। প্রায়ই ইঁহার অভিশাপ হইতে অনেকের দুর্ভাগ্য আনীত হইয়াছে।[১৭] তবুও ইঁহাকে শিবের অবতার বলা হয়।[১৮] ইঁহার বংশ হইতে কোন গোত্রের উৎপত্তি হয় নাই।

বংশতালিকা হইতে জানা যায়, দত্ত হইতে যে সমুদয় গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে চারিটি প্রসিদ্ধ এবং সেগুলি শ্যাবাশ্ব, মুদ্গল (বা প্রত্বস), বলারক (বা বাগ্ভূন্ধ বা ববলুণ্ড) ও গবিষ্ঠিরের নামে পরিচিত। মৎস্যপু. (১৯৭, ৫, ৭, ৮)-এ মাত্র শ্যাবাশ্ব ও গবিষ্ঠিরের উল্লেখ

পাওয়া যায়। ছয়জন আত্রেয় মন্ত্রকর্তা[১৯] অত্রি, অর্চনান, শ্যাবাশ্ব, গবিষ্ঠির, বল্‌গূতক (বা অবিহোত্র বা কর্ণক) ও পূর্বাতিথি। বল্‌গূতক ঋষি ও বলারক গোত্র একই বলিয়া মনে হয়।

অর্চনানের পুত্র শ্যাবাশ্ব। ঋগ্বেদে উভয়েরই উল্লেখ আছে। শ্যাবাশ্ব বহু মন্ত্ররচয়িতা।[২০] তাঁহার পুত্র অন্ধীগুও[২১] একটি মন্ত্র রচনা করেন। অর্চনান ও শ্যাবাশ্ব রাজা রথবীতি দর্ভ্যের জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন এবং শ্যাবাশ্ব তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তরন্ত ও পুরুমীঢ় ইঁহাদের সমসাময়িক এবং উভয়েই বিদদশ্বের পুত্র।[২২] শ্যাবাশ্ব তাঁহার দুইটি সূক্তে ত্রসদস্যুর উল্লেখ করিয়াছেন।[২৩] এই ত্রসদস্যুর উল্লেখ আরও অনেক বৈদিক সূক্তে আছে। এক্ষেত্রে অর্চনান ও শ্যাবাশ্বকে তাঁহারই ঠিক পরবর্তী সময়ের বলা যাইতে পারে।

অন্যান্য আত্রেয়দিগের মধ্যে একজন (বা কয়েকজন) অত্রি ত্র্যরুণ, ত্রসদস্যু, অশ্বমেধ ও রাজা রৌসমের[২৪] নিকট হইতে ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছিলেন। এই অত্রির যথানির্দেশ করিতে পারা যায় না। আর একজন বভ্রু ঋণঞ্চয়ের পুরোহিত ছিলেন।[২৫]

ব্রহ্মা অত্রিকে প্রজাসৃষ্টি ও বেদরক্ষার ভার দিয়াছিলেন। অত্রিই সর্বপ্রথম পশ্চিমদেশে যাত্রা করেন। এখানেই তাঁহার তুহিনরশ্মি নামক কন্যার জন্ম হইয়াছিল। এই কন্যার জন্মের পর তিনি শঙ্খনাগা নদীতীরে শঙ্খপর্বতে গমন করেন। তথায় শ্বেতগিরিতে তিনি ব্রহ্মার তপস্যায় নিমগ্ন হন।

অত্রির জ্যেষ্ঠ পুত্র শাঙ্কায়ন অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত উগ্রস্বভাব, যথেচ্ছভোজী ও গুহাবাসী ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্রও জ্যেষ্ঠের অনুরূপ হয়। অত্রি পুত্রদিগের সুমতি আনিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলে, তাহারা কিভাবে পর্বতে বাস করিবে, গ্রামসন্নিবেশ করিবে, যে সকল স্থানে তাহারা বাস করিবে সেই সকল স্থানকে 'অত্রি' নামে অভিহিত করিবার উপদেশ প্রভৃতি দিয়া সিন্ধুদেশে গমন করেন। এখানে দেবনিকা পর্বতে বাস করিবার সময় তিনি বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই প্রজাগণ আপনাদের বাসের জন্য 'দেবনগর' স্থাপন করিয়াছিল।

অত্রি-সংস্কৃতি ভারত হইতে ভারতের বাহিরে বহুদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতের পশ্চিমপার্শ্বস্থ দেশগুলিতে অত্রিকে 'অদ্রিস্' বা 'ইদ্রিস্' নামে অভিহিত হইতে দেখা যায়। অত্রি চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ, কারণ তিনি চন্দ্রের পিতা। চন্দ্রবংশীয় নৃপতি দেবনহুষ মেরুপর্বতের নিম্নদেশে অত্রির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হইলে তথায় বিশ্বকর্মাকে দিয়া একটি নগর নির্মাণ করান এবং এই নগরের তিনি নামকরণ করেন 'দেবনহুষনগর'। কাহারও কাহারও মতে 'দেবনহুষনগর' ও 'দৈবনহুষ' শব্দ দুইটি ইউনানী Dionysius ও Dionysiopolis শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত। এক্ষেত্রে অত্রিকে ইউনানী নৃপতি ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের পূর্বপুরুষ বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। অত্রির সহিত প্রাচীন ইউরোপেরও অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল বলিয়াও অনেক পণ্ডিত মনে করিয়া থাকেন।

অত্রিবংশে গোত্রপ্রবর্তক ঋষি

অত্রিগোত্র প্রধানত কর্দমায়ন ও শারায়ণ, এই দুই শাখায় বিভক্ত। অর্ধপণ্য, উদ্দালকি, করজিহ্ব, কর্ণজিহ্ব, কর্ণিরথ, কর্দমায়নশাখেয়, গোণীপতি, গোণায়নি, গোপন, গৌরগ্রীব, গৌরজিন, চৈত্রায়ণ, ছন্দোগেয়, জলদ, তকীবিন্দু, তৈলপ, ভদগপাদ, লেদ্রাণি, বামরথ্য, শাকলায়নি, শারায়ণ, শৌণ, শৌক্রতব (শাক্রতব, শোক্রতব), সবৈলেয় (সচৈলেয়), সৌনকর্ণি (শৌনবকর্ণিরথ), সৌপুষ্পি ও হরপ্রীতি (রসদ্বীচি),—এই সকল মহর্ষিবংশে আর্ষেয়প্রবর তিনটি, যথা—অত্রি, আর্চনানশ (ত্রিবরাতাম) ও শ্যাবাশ্ব। এই সকল ঋষিবংশে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। ঊর্ণনাভি, গবিষ্ঠির, দাক্ষি, পর্ণবি, বলি, বীজবাপি, ভলন্দন, মৌঞ্জকেশ, শিরীষ ও শিলর্দনি,—এই সকল ঋষিবংশেও আর্ষেয়প্রবর তিনটি, যথা—অত্রি, গবিষ্ঠির ও পূর্বাতিথি। এ সকল ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহবিধান নাই। —মৎস্যপু. ১৯৭. ১-৮।

কালেয়, বালেয়, বামরথ্য, ধাত্রেয় ও মৈত্রেয়—ইঁহারা আত্রেয়-তনয়। এই সকল ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহ বিহিত নয়।—ঐ, ৯-১০।

অত্রিবংশে মন্ত্রকর্তা ঋষি

বায়ুপু. (১. ৫৯. ১০৪), মৎসপু. (১৪৫. ১০৭-১০৮) ও ব্রহ্মাণ্ডপু. (২. ৩২. ১১৮) মতে অত্রিবংশীয় মন্ত্রকর্তা ঋষিগণের নাম—

বায়ুপু.	মৎস্যপু.	ব্রহ্মাণ্ডপু.
অত্রি	অত্রি	অত্রি
অর্চিসন	অর্ধস্বন	অর্বসন
		অবিহোত্র
	কর্ণক	
নিষ্ঠুর	গবিষ্ঠির	গবিষ্ঠির
পূর্বাতিথি	পূর্বাতিথি	পূর্বাতিথি
বল্গূতক		
শ্যামাবান্	শ্যাবাস্য	শাবাশ্ব

পাদটীকা

১ কূর্মপু. ১. ১৯. ১৮-১৯এ বর্ণনাটি অধিকতর সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট।

২ বায়ুপু ৯৯. ১২৭।

৩ মৎস্যপু. ৪৯. ৪ ; অগ্নিপু. ২৭৭. ৩।

৪ মহা. ১. ৯৪. ৩৬৯৮ ; বায়ুপু. ৯৯. ১২৩. ৭ ; বিষ্ণুপু. ৪. ১৯. ১ ; গরুড়পু. ১. ১৪০. ২ ; ভা. ৯. ২০. ৩ ; ব্রহ্মপু. ১৩. ৪ ; হরি. ৩১. ১৬৫৮ (ASB-সং)।

৫ একজন স্বস্ত্যাত্রের উল্লেখ বৃহদ্দে. ৩. ৫৬ ও হরি. ১৬৮. ৯৫৭১-এ, এক জনকে ঋ. ৫. ৫০. ৫১ সূক্তের রচয়িতারূপে ও আর এক জনের উল্লেখ বৃহদ্দে. ১. ১২৮-এ পাওয়া যায়।

৬ মার্কপু. ১৭. ৬-১৬-এ ইহাদের জন্ম ও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

৭ ব্রহ্মপু. ২১৩. ১০৬, ১১০ ; মার্কপু. ১৭. ৭ ; মহা. ১৩. ১৫৩. ৭২২৪।

৮ মহা. ৩. ১১৫. ১১০৩৬ ; ১২. ৪৯. ১৭৫০-১ ; ১৩. ১৫২. ৭১৮৯, ১৫৩. ৭২২৪. ১৫৭. ৭৩৫৩ ; বায়ুপু. ৯৪. ১০-১১ ; ব্রহ্মাণ্ডপু. ৩. ৬৯. ১০-১১ ; ব্রহ্মপু. ১৩. ১৬১ ; হরি. ৩৩. ১৮৫২-৬, ৪২. ২৩০৯ (ASB-সং) ; মার্কপু. ১৮ ও ১৯ ; মৎস্যপু. ৪৩. ১৫ ; পদ্মপু. ৫.

১২. ১১৮ ; বিষ্ণুপু. ৪. ১১. ৩ ; ভা. ৯. ১৫. ১৭, ২৩. ১৪ ; অগ্নিপু. ২৭৪-৫।

৯ দৃষ্টান্তস্বরূপ—ঐলরাজ আয়ু—পদ্মপু. ২. ১০৩. ১০১-৩৫ ; পরে অলর্ক—মার্কপু. ১৬.১২ ; ৩৭. ২৬ ; ব্রহ্মপু. ১৮০. ৩১-২ ; গরুড়পু. ১.২১৮।

১০ মার্কপু. ১৭. ৬. ১৩, ১৮।

১১ বায়ুপু. ৯৮. ৮৯ ; ব্রহ্মাণ্ডপু. ৩. ৭৩. ৮৮ ; মার্কপু. ১৭. ৭ ; ব্রহ্মপু. ২১৩. ১০৬-১৩ ; হরি. ৪২. ২৩০৫-১২ (ASB—সং)।

১২ মার্কপু. ১৭. ২০. ৫ ; ১৮. ২৩. ২৮-৩১ ; পদ্মপু. ৩, ১০৩, ১০৬-৯, ১১৪।

১৩ মহা. ১৩. ৯১. ৪৩২৮-৪৬। কিন্তু ১৪. ৯২. ২৮৮৭ শ্লোকে জমদগ্নিকে প্রথম শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকারী বলা হইয়াছে।

১৪ অত্রির উভয় পুত্রের উল্লেখ—ব্রহ্মপু. ১১৭. ২ ; অগ্নিপু. ২০, ১২।

১৫ দৃষ্টান্তস্বরূপ :—অম্বরীষের কাহিনীর সহিত—ভা. ৯. ৪. ৩৫ ই. ; নৃপতি শ্বেতকির কাহিনীর সহিত—মহা. ১. ২২৩. ৮০২৮, ৮১৩২-৪১ ; রাম দাশরথির সহিত—পদ্মপু. ৬. ২৭১. ৪৪ ; ভীষ্মের সহিত—মহা. ১৩. ২৬. ১৭৬৩ ; কুন্তীর সহিত—মহা. ১. ৬৭. ২৭৬৮, ১১১. ৪৩৮৫ ; পাণ্ডবদিগের সহিত—মহা. ৩. ৮৫. ৮২৬৫ , কৃষ্ণের সহিত—হরি. ২৯৮-৩০৩ (ASB-সং) ; পৌরাণিক—অগ্নিপু. ৩. ১-২।

১৬ মার্কপু ১৭. ৯. ১৬ ; বিষ্ণুপু. ১. ৯. ৪. ৬ ; মহা. ৩. ২৫৯. ১৫৪১৫ ই.

১৭ মহা. ১৩. ১৫৯. ৭৪১৪ ই.

১৮ শকুন্তলাকাব্য ৪র্থ অ. দ্র.

১৯ বায়ুপু. ৫৯. ১০৪ ; ব্রহ্মাণ্ডপু ২.৩২. ১১৩-১৪ ; মৎস্যপু. ১৪৫. ১০৭-৯।

২০ ঋ. ৫. ৫২-৬১, ৮১, ৮২ ; ৮. ৩৫-৩৮ ; ৯. ৩২—শ্যাবাশ্ব রচিত।

২১ ঐ, ৯. ১০১ অন্ধীগু রচিত।

২২ ঋ. ৫. ৬১ ও বেদার্থ, বৃহদ্দে. ৫. ৫০-৮১ ; V 9. i 36 ; SBE, xxxii. 359.

২৩ ঋ. ৮. ৩৬. ৭, ৩৭. ৭।

২৪ বৃহদ্দে. ৫. ১৩. ৩১।

২৫ ঐ, ৫. ১৩. ৩৩-৩৪।

প্রসঙ্গ-কথা

1 বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী—পরিশিষ্ট দ্র.

2 Pargiter, Frederick Eden : পুরাণতত্ত্ববিদ। ইনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস হতে অবসর গ্রহণ করার পর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হন। সেই সময় হতে পুরাণতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেন। গ্রন্থ—The Purāna Text of the Dynasties of the Kali Age (London, 1913).

বৈদিক যুগের শিল্প

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে দশম অধ্যায়ে শিল্পকারের উৎপত্তি বিষয় এইরূপ কথিত আছে, অঙ্গিরাপুত্র সুরাচার্য বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী বরস্ত্রীর গর্ভে অষ্টম বসু প্রভাসের ঔরসজাত দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা —শূদ্রাতে বীর্যাধান করায় তাঁহার নয়টি শিল্পকারী পুত্রের জন্ম হয়। তন্মধ্যে মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক অর্থাৎ তন্তুবায়, কুম্ভকার ও কংসকার এই ছয়টি প্রধান। আর সূত্রধর, চিত্রকর ও স্বর্ণকার তিনটি। ইহারা ব্রহ্মশাপহেতু পতিত। অপিচ, অমরকোষের ভরত-টীকায় শিল্পের অর্থ এইরূপ :—"বাৎস্যায়নোক্ত-নৃত্যগীত বাদ্যাদিশ্চতুঃষষ্টি বাহ্যক্রিয়াঃ তথা আলিঙ্গনচুম্বনাদি চতুঃষষ্টি অভ্যন্তর ক্রিয়াঃ কলাঃ আদিনা স্বর্ণকারাদি-কারুকর্মগ্রহঃ। এতৎ সর্বং শিল্পং কথ্যতে।"

অতএব, ভরতপ্রস্থান অনুসারে আমাদিগকে নৃত্য, গীত, বাদ্যাদি আলিঙ্গনচুম্বনাদি ১২৮টি বাহ্যাভ্যন্তর ক্রিয়াগুলিকেও শিল্প বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। শাস্ত্রে, শিল্প বা শিল্পকারের এইরূপ একটা আখ্যা ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পরন্তু শিল্পার্থবিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। ইহাতে আমরা বৈদিক যুগের শিল্পের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া ভারতীয় শিল্পের প্রাচীনত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

আর্যজাতি অতি সুপ্রাচীনকালেই সভ্যতাসোপানে আরূঢ় হইয়া শিল্প-বিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। এক্ষণে ভারতে শিল্পোন্নতি বিষয়ে

যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু বৈদিক আর্যগণ অপেক্ষা আধুনিক ভারতবাসিগণ যে শিল্পবিষয়ে অধিক উন্নতি করিয়াছেন, তাহা কখনই বলা যাইতে পারেনা। আজকাল কতকগুলি কলকারখানা লইয়াই আমাদের শিল্পবিদ্যার উৎকর্ষ হইয়াছে বলিয়া মনে করি। বস্তুত কলকারখানা ব্যতীত আমাদের শিল্পোন্নতির উপায়ান্তর নাই। এ বিষয়ক উন্নতি চেষ্টাও আবার বৈদেশিক প্রকারে। যাহা হউক যৎকালে জগতের তাবৎ জাতি অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন হইয়া বন্যপশুর ন্যায় অসভ্যাবস্থায় কালযাপন করিতেছিল—যৎ-কালে বর্ণমালার সৃষ্টি বিষয়ে অন্য কোন জাতি কল্পনাও করে নাই; তৎ-কালে আর্যজাতি যে কত শিল্পোন্নতির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়। প্রাচীন আর্যজাতির শিল্পকীর্তিকলাপের চিহ্নমাত্রও অধুনা দৃষ্টিগোচরের সম্ভাবনা নাই, সত্য। কিন্তু তাঁহাদের যাবতীয় কীর্তি-নিচয়ের জ্বলন্ত ইতিহাস—আমাদের প্রাচীনতম অবলম্বন 'বেদ' শাস্ত্রে অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং সুপ্রাচীন আর্য শিল্পালোচনার পক্ষে বৈদিক যুগের শিল্পানুশীলনই সর্বপ্রথমে কর্তব্য।

বৈদিক কালে আর্যগণ কর্তৃক মৃৎকুটীর বড় একটা ব্যবহৃত হইত না। সাধারণত তাঁহারা ইষ্টক বা প্রস্তর নির্মিত বৃহৎ প্রাসাদ রচনা করিয়া বাস করিতেন। তাঁহাদের গৃহগুলি ছাদযুক্ত এবং গবাক্ষ ও দ্বারবিশিষ্ট হইত (১. ১১৩. ৪)। গৃহ ইষ্টক নির্মিত হইত এবং সবিশেষ প্রচলিত ছিল। গৃহ নির্মাণের জন্য চুন, সুরকি প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত (৪. ৪৭. ২)। বেদে "ইষ্টকাস্তম্ভ" অট্টালিকা ইত্যাদি বহু ইষ্টক ও প্রস্তর নির্মিত অট্টালিকার অস্তিত্ব বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে। ঋগ্বেদে "সহস্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহ" (৭. ৪৪. ৫), সহস্রস্তম্ভ রক্ষিত প্রাসাদ (২. ৪১. ৫), "বিস্তৃত বাসস্থান" (১. ৩৬. ৪), "প্রস্তরগৃহ", "বক্রপ্রস্তর" ইত্যাদির বহুল প্রয়োগ বিদ্যমান। তৎকালে গৃহ নানারূপে ও নানা উপাদানে নির্মিত হইত। গৃহ রচনা পদ্ধতি যে তৎকালে বিশেষ উন্নত ছিল তাহার একটি কারণ আমরা দেখিতেছি। তৎকালে আর্যগণ এরূপভাবে গৃহ রচনা করিতেন যে, রচনা দোষে বায়ু-পিত্ত-কফ কোন ধাতুই যেন বক্র বা দূষিত হইয়া গৃহবাসিগণকে ব্যাধিগ্রস্ত না করে (৬. ৪৯. ৯)। গৃহগুলি একতল হইতে

ত্রিতল পর্যন্ত নির্মিত হইত। অধিকন্তু, অধিক স্তম্ভযুক্ত থাকায় উহা যে অতি সৌন্দর্যময় ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই (২. ১. ৫ ; ৫. ৬২. ২)। বশিষ্ট ঋষি "একটি ত্রিতল বাসভূমির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন।" এই বাক্য ত্রিতল গৃহের বিদ্যমানতার বিষয়ে সাক্ষী।

আর্যগণ পরিচ্ছদ বিষয়েও যথোচিত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ ও আজকালকার পরিচ্ছদে বড় বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। তাৎকালিক বস্ত্রবয়ন পটুতার বিষয় ঋগ্বেদে বহুবার কথিত হইয়াছে। (২. ৩৮. ৪ ; ২. ৩. ৬ ; ৬. ৯. ১ ; ৪. ৪০. ৬ , ৩. ৩. ২ ; ১০. ১০৭. ৯ ; ৫. ২৯. ১৫) যজু ও সামবেদে বস্ত্রের অনেক উল্লেখ আছে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৭. ১৮) স্বর্ণখচিত কার্পেটের উল্লেখ দেখা যায়। বৈদিককালে বস্ত্রবয়নের চারিটি উপাদান ছিল। পশম, চর্ম, কার্পাস, মেষলোম (৩ ৫. ৪)। সূত্রগুলি কখন কখন বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করাও হইত। প্রত্যুত শ্বেতবস্ত্রই তৎকালে বিশেষ আদৃত হইত (৩৲৩৯. ২) সচরাচর তন্তু নির্মিত বস্ত্রে পিরাণ অথবা তনুত্রাণ (আঙ্গা) ও উষ্ণীষ ব্যবহৃত হইত। (শতপথব্রাহ্মণ ১৪. ২. ১. ৮ , অথর্ববেদ, ১৫. ২. ১)। স্ত্রীলোকগণ টানা ও পড়েন দ্বারা বস্ত্রবয়ন করিতে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন (৬ ৯. ২)। তাঁহারা সর্বশরীর সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখিতেন এবং পরিধেয়ের উপর কঞ্চুক ব্যবহার করিতেন ও সর্বপ্রকার উষ্ণীষ ধারণ করিতেন। বিবাহকালে মেষলোমের বস্ত্র ব্যবহৃত এবং যৌতুকস্থানে উহা উপহার প্রদত্ত হইত। আর্যগণ চর্মের অতি পরিষ্কার কার্য জ্ঞাত ছিলেন। ভিস্তিরা চর্মদ্বারা পথ জলসিক্ত করিত। আর্য স্বয়ং বহুবিধ জুতা ব্যবহার করিতেন (আর্য-সভ্যতা গ্রন্থোদ্ধৃত Buhler's Apastamba, p. 14)। এই সমস্ত জুতা চর্মে প্রস্তুত হইত। ঋগ্বেদে নাপিত ও ক্ষৌরকার্যের বিষয় উল্লিখিত আছে (১. ১৬৪. ৪৪ ; ১. ৯২ ৪ , ১০. ১৪২. ৪), সুতরাং স্থির হইতেছে যে ক্ষৌরকার্যোপযোগী দ্রব্যেরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। অলঙ্কার ধারণ প্রথা অমাদের দেশে বোধ করি চিরকালই প্রচলিত আছে। কেননা সুদূর প্রাচীন বৈদিকযুগেও আমরা বহুবিধ সুন্দর অলঙ্কারের বাহুল্য দেখিতে পাই। বৈদিকযুগেও স্বর্ণালঙ্কার (১. ৩৫. ৪)

বলয়, (৪. ৫৩. ৪) অঙ্গুরীয় ও চিত্রিত কণ্ঠমালা (২. ৩৩. ১০), সুবর্ণ কুণ্ডল, মেখলা, মল (২.১২২.১৪) ইত্যাদি অলঙ্কার বিশেষ প্রচলিত ছিল। মুক্তাদিখচিত স্বর্ণ অলঙ্কারের যে খুব প্রচলন ছিল তাহা তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ (৩. ৬৬৫) ও যজুর্বেদের নানাস্থানে উক্ত আছে। 'মালা' ব্যতীত বক্ষে 'রুক্ম' নামে এক প্রকার অলঙ্কারও উল্লিখিত হইয়াছে। বৈদিককালে শঙ্খ প্রবলাদিও নানা কারুকার্যে ব্যবহৃত হইত। ইহাও উক্ত আছে যে স্ত্রীলোকেরা নানারূপ নৈপুণ্যে তাঁহাদের কেশ বন্ধন করিতেন' (৪. ৮৬)। কিন্তু সে নিপুণতা কিরূপ, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আমোদ-প্রমোদের জন্য তাঁহারা শালগুঞ্জিকা (৩. ৩২. ২৩) ও অন্যান্য ক্রীড়া সামগ্রীর ব্যবহার করিতেন (৩৩. ১৮৫)। শততারবিশিষ্ট বীণাযন্ত্র ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রও তৎকালে প্রচলিত ছিল। বৈদিক আর্যগণ শিশু বা খদির কাষ্ঠ-নির্মিত রথ ও গাড়ী ব্যবহার করিতেন। (৪. ৬৩. ৫ ; ৩. ৫৩. ১৯) অশ্ব ও গর্দভ এই গাড়ী ও রথ বহন করিত। চক্রগুলি পিতল নির্মিত, রথস্তম্ভাদি লৌহময়। বোধ হয়, ঐ সময়ে দু-একখানি স্বর্ণমণ্ডিত রথেরও প্রচলন ছিল। এই রথগুলির বসিবার স্থানসকলও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। রথের সম্মুখে কাষ্ঠনির্মিত অশ্বাদির সন্নদ্ধ থাকিত। সাধারণত চর্মতন্তু, চর্মরশ্মি (লাগাম) ব্যবহৃত হইত। ফলত দেখা যাইতেছে যে বৈদিক রথ চালন বা গঠন বিদ্যা বর্তমানকাল অপেক্ষা হীন ছিল না। ঋগ্বেদে ত্রিস্তম্ভবিশিষ্ট ত্রিকোণ যান (১. ৪৭.২) "তিনটি বসিবার স্থানযুক্ত যান" (২. ২৮৩. ১) ইত্যাদি প্রয়োগও পরিলক্ষিত হয়। মনোহর দৃশ্য জলযান (জাহাজ) ও নৌকা ব্যবহার বিষয় বেদে অনেক স্থলেই উক্ত হইয়াছে। বৈদিক আর্যগণ শুধু যে শিল্পী ছিলেন তাহা নয় তাঁহারা বীরও ছিলেন। তাঁহারা যুদ্ধে আত্ম রক্ষার জন্য বর্ম হস্তঘ্ন, চর্ম (ছাল) প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ব্যবহার করিতেন। শত্রুকে আক্রমণ করিবার সময়ে তাঁহারা বর্শা, পরশু, বাশী (বাইশ), ধনুর্বাণ, ও লৌহাগ্র কাষ্ঠময় বিষাক্ত বাণ ব্যবহার করিতেন। রণবাদ্য, মধ্যে দুন্দুভি, ক্ষোণী, কর্করী ও ঢক্কা তাঁহাদের ব্যবহারে আসিত। এই বস্তুগুলি যেমন তাঁহারা নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিতেন, তেমনই তাঁহারা দক্ষতার সহিত নির্মাণ করিতেন। এ সমস্ত নির্মাণ বিষয়ে

তাঁহারা আধুনিকদিগের অপেক্ষা কোন অংশে অবনত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

বৈদিক শিল্প বিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। আর্যদিগের পরিচ্ছদ, যুদ্ধাস্ত্র, অলঙ্কার ও গৃহাদি নির্মাণ বিষয়ে যাহা কিছু বলা হইল তাহা হইতে তাঁহাদের তৎকালীন শিল্প বিষয়ের যৎসামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র। তাঁহারা যে শিল্পোন্নতি বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের এই আভাস্ দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীত হইতে পারে। যাহা হউক বৈদিক যুগের শিল্পালোচনা করিতে গিয়া আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে মৃণ্ময় এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রময় দ্রব্য তৎকালে নির্মিত হইত। সূত্রধর, কর্মকার, তন্তুবায়গণ যথাক্রমে কাষ্ঠকার্য, অলঙ্কারগঠন এবং বহুমূল্য সূক্ষ্মবস্ত্রবয়নে বিলক্ষণ পটু ছিল। তৎকালে গজদন্তের কারুকার্যেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা বোধ হয় কাচ ও রেশম ব্যবহার জানিতেন না। সে যাহা হউক, সুদূর প্রাচীন বৈদিক শিল্পনিচয় আলোচনা করিলে সকলকেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে, শুধু দু-একটি শিল্প বিষয়ে কেন সমগ্র শিল্প বিষয়েই আর্যগণ এককালে সর্বজাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

['কমলা' ১৩১০, পৌষ, পৃ. ৮৫-৮৭]

বৈদিক সাহিত্যে মধু

ভারতের সর্বপ্রাচীন সংস্কৃতি বৈদিক সংস্কৃতি। এই প্রাচীনতম সংস্কৃতির যুগ হইতেই ভারতে নানাভাবে 'মধু'র ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। সাধারণত মধু অর্থে মিষ্ট এবং এই মিষ্টতার বিশেষত মধ্বাসবের গুণাবাচক সংজ্ঞায় প্রয়োগ দেখা যায়। ঋগ্বেদ-ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে যে কোন দ্রব্যের বা বিষয়ের মাধুর্যসম্পন্ন গুণ ব্যক্ত করিয়া মধু শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে[১] ঋগ্বেদের ১ম অধ্যায়ে ৯০ সূক্তে আছে—

'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরংতি সিংধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সংত্বোষধীঃ॥ ৬
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎপার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ ৭
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবংতু নঃ॥' ৮

অর্থাৎ সমুদয় যজমানের জন্য বায়ু মধুবর্ষণ করে; নদীসমূহ মধুক্ষরণ করিয়া থাকে—ওষধিসকলও মাধুর্যসম্পন্ন হউক। রাত্রি ও উষা মধুর হউক, পার্থিব জনপদ মধুময় হউক, যে নভোমণ্ডল সকলের পালনকর্তা সেই আকাশও মধুর হউক। বনস্পতি আমাদের প্রতি মধুর হউক, সূর্যও মধুর হউক, ধেনুগুলি মধুর হউক।

বৃহদারণ্যক-উপনিষদে (২.৫) দধ্যচ আথর্বণ-কর্তৃক অশ্বিনীদ্বয়কে

'মধুবিদ্যা' শিক্ষাদানব্যপদেশে, মধু শব্দের এইরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। দধ্যচ বলিয়াছেন—

"এই পৃথিবী ও সর্বভূত মধুময়, সেইরূপ তেজোময় অমৃতময় পুরুষ ও তাঁহার অন্তর্নিহিত তেজোময় অমৃতময় আত্মা উভয়েই মধুর (১); সর্বভূতে জল (আপঃ) মধুর এবং সর্বভূতই জলের মাধুর্যসম্পন্ন, সেইরূপ জলমধ্যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ ও দেহমধ্যে বীজ-(রৈতসঃ)রূপে সেই পুরুষের অধিষ্ঠান মধুর (২); সর্বভূতে অগ্নি মাধুর্যযুক্ত এবং সর্বভূতই অগ্নির মাধুর্যসম্পন্ন, সেইরূপ অগ্নিমধ্যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষের অবস্থান ও দেহমধ্যে বাগ্-(বাঙ্ময়)রূপী সেই পুরুষ মধুর (৩); সর্বভূতে বায়ু মধুময় এবং সর্বভূতই বায়ুর মাধুর্যসম্পন্ন, সেইরূপ বায়ুমধ্যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ ও দেহমধ্যে প্রাণরূপী সেই পুরুষ মধুর (৪); সর্বভূতে সূর্য (আদিত্য) মধুময়[২] এবং সূর্যের মাধুর্যসম্পন্ন, সেইরূপ সূর্যমধ্যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ ও দেহমধ্যে চক্ষু-(চাক্ষুষঃ)রূপী সেই পুরুষের অবস্থান মধুর (৫); সর্বভূতে দিক্ (দিশঃ) মধুময় এবং সর্বভূতই দিকের মাধুর্যসম্পন্ন, সেইরূপ দিগ্মধ্যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ ও কর্ণ-(শ্রৌত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকঃ)রূপী সেই পুরুষ মধুর (৬); সর্বভূতে বিদ্যুৎ মধুময় এবং সর্বভূতই বিদ্যুতের মাধুর্যসম্পন্ন, সেইরূপ বিদ্যুন্মধ্যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ ও দেহমধ্যে তেজো-(তৈজসঃ) রূপী সেই পুরুষ মধুর (৭); সর্বভূতে চন্দ্র মধুময় এবং সর্বভূতই চন্দ্রের মাধুর্যসম্পন্ন, সেইরূপ চন্দ্রমধ্যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ ও দেহমধ্যে মানসরূপী সেই পুরুষ মধুর (৮); সর্বভূতে বজ্র (স্তনয়িত্নু) মধুময় এবং সর্বভূতই বজ্রের মাধুর্যসম্পন্ন, সেইরূপ বজ্রমধ্যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ ও দেহমধ্যে শব্দ ও স্বর-(সৌরব)রূপী সেই পুরুষ মধুর (৯); সর্বভূতে আকাশ মধুময় এবং সর্বভূতই আকাশের মাধুর্যসম্পন্ন, সেইরূপ আকাশ-মধ্যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ ও দেহমধ্যে হৃদ্যাকাশরূপী সেই পুরুষ মধুর (১০); সর্বভূতে ধর্ম মধুময় এবং সর্বভূতই ধর্মের মাধুর্যসম্পন্ন, সেইরূপ ধর্মমধ্যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ ও দেহমধ্যে ধর্মরূপী সেই পুরুষ মধুর (১১); সর্বভূতে সত্য মধুময় এবং সর্বভূতই সত্যের মাধুর্যসম্পন্ন, সেইরূপ সত্যমধ্যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ ও দেহমধ্যে সত্যরূপী সেই পুরুষ

মধুর (১২); সর্বভূতে মানুষ মধুময় এবং সর্বভূতই মানুষের মাধুর্যসম্পন্ন, সেইরূপ মানুষমধ্যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ ও দেহমধ্যে মানুষরূপী সেই পুরুষ মধুর (১৩); সর্বভূতে আত্মা মধুময় এবং সর্বভূতই আত্মার মাধুর্যসম্পন্ন, সেইরূপ আত্মায় তেজোময় অমৃতময় পুরুষ ও দেহমধ্যে আত্মারূপী সেই পুরুষ মধুর (১৪)—এই আত্মা সর্বভূতের অধিপতি, সর্বভূতের রাজা।[৩]

ঋগ্বেদে অশ্বিনীদ্বয় একটি অশ্বের মস্তক উপহার দিয়া দধ্যচের তুষ্টিসাধন করিলে দধ্যচ তাঁহাদিগকে মধুদ্রব্যের সন্ধান দেন।[৪] সমুদয় দেবতাদের মধ্যে অশ্বিনীদ্বয়ই মধুর সহিত সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। মধু ইঁহাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় দ্রব্য।[৫] ইঁহাদের একটি মধুপূর্ণ চর্মাধার আছে (ঋগ্বেদ ৪. ৪৫. ৩); একবার একশত কলস মধু ইঁহারা ঢালিয়া দিয়াছিলেন (ঐ, ১. ১১৭. ৬)। ইঁহাদের অঙ্কুশ বা 'মধুকশা'র বৈশিষ্ট্য এই যে, উহার দ্বারা ইঁহারা যজ্ঞ ও যজ্ঞকারীর উপর মধু আস্তৃত করেন।[৬] অথর্ববেদে ৯.১ অধ্যায়ে অশ্বিনীদ্বয়ের উদ্দেশ্যে মন্ত্র ঈরিত হইয়াছে। উহার প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে—স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, সমুদ্র, অগ্নি ও বায়ু ইহাতে মধুকশার উৎপত্তি হইয়াছে; 'মধুকশা' অমৃতে আচ্ছাদিত—প্রতি প্রজাই (জীব) উহা প্রার্থনা করিয়া থাকে। ঋগ্বেদে অশ্বিনীদ্বয়ের রথের নাম 'মধুবর্ণ' বা 'মধুবাহন'। একমাত্র ইঁহাদেরই মধু বিশেষ প্রিয়—এজন্য ইঁহাদের 'মধুয়ু' বা 'মাধ্বী' অথবা মধুপানকারী বলিয়া 'মধুপা' বলা হয়।[৭] যে সকল যজ্ঞকারী পুরোহিত ইঁহাদের আহ্বান করেন, ঋগ্বেদে (১০. ৪১. ১৩) তাঁহাদের 'মধুপাণি' বলা হইয়াছে। ইঁহারা মধুমক্ষিকাকে মধু দান করেন (ঋগ্বেদ ১. ১১২. ২১; ১০. ৪০. ৬) এবং ইঁহাদেরও মধুমক্ষিকার সহিত তুলনা করা হয় (ঐ, ১০. ১০৬. ১০)।

বেদ, সংহিতা ও ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে মধুর বিশেষ পবিত্রতা ঘোষিত হইয়াছে। ধর্মের অনুষ্ঠানাদির সহিত ইহা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অথর্ববেদে (১.৩৪) মধুকে ব্যক্তিগত প্রীতির প্রতীক বলিতে দেখা যায়; তথায় স্ত্রীলোকদের ভালবাসা লাভ করিবার পক্ষে যষ্টিমধুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে (১৪.[illegible]৩.৩০) প্রাণ অর্থে মধু শব্দের উল্লেখ আছে। বৈদিক সাহিত্যে সোম[৮] বা দুগ্ধকেও[৯] মধু বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে;

বৈদিক সাহিত্যে এই উভয় বস্তুরই বিশেষ গুরুত্ব বর্তমান। উত্তরকালে মধু দ্রব্যকেই বিশেষভাবে মধু বলিয়া নির্দেশ করা হয়।[১০]

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম দশ সূক্তদ্রষ্টা ঋষি মধুচ্ছন্দার সহিত মধুদ্রব্যের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। ঐতরেয়-আরণ্যকে (১. ১. ৩. ৪-৭) মধুচ্ছন্দার গায়ত্রীমন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। উহাতে আছে—মধুচ্ছন্দার এই নাম হওয়ার কারণ এই যে, ইনি ঋষিদিগের জন্য মধু প্রার্থনা করেন। প্রধানত মধু খাদ্য, সমস্তই মধুময় এবং সমস্ত ইচ্ছা মধুর হওয়ার জন্য মধুচ্ছন্দার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, ইহাতে সমুদয় আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধিলাভ করে। যিনি এই মন্ত্র জানেন তাঁহার সমুদয় আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা সাধিত হয়।

বৈদিক যুগের পরবর্তী কালে ধর্মানুষ্ঠানের সহিত মধুর ব্যবহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। শুধু ধর্মকার্য নয়, মানবজীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহারে, সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে ইহার উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। মনুসংহিতা ও সূত্রগ্রন্থসমূহে অতিথিকে 'মধুপর্ক' দানের উল্লেখ আছে।[১১] সাধারণত দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, জল বা ক্ষেত্রজ শস্যের সহিত মধু মিশাইয়া মধুপর্ক প্রস্তুত করিবার বিধি।[১২] প্রধানত ঋষি, পণ্ডিত, গুরু, পুরোহিত, শ্রোত্রিয়, নৃপতি, জামাতা, শ্বশুর, মাতুল, স্নাতক প্রভৃতি মধুপর্ক পাইবার অধিকারী ছিলেন। ইঁহাদের বিদায়কালের এক বৎসর পরে ইঁহারা পুনরাগমন করিলে মধুপর্কদান করা হইত।[১৩] মনুসংহিতায় (৩. ৩) আছে—যিনি কর্তব্যপরায়ণ এবং যিনি পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে বেদবিদ্যা লাভ করিয়াছেন তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া মধুপর্ক দেওয়া উচিত। মনু (৯. ২০৬) ইহাও বলিয়াছেন, যিনি বিবাহে অথবা মধুপর্কের সহিত উপহার লাভ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত পাণ্ডিত্যের অধিকারী। যজ্ঞ বা পিতৃপুরুষের সম্মানার্থ কৃত অনুষ্ঠানে অতিথিকে মধুপর্কদানের সহিত সেখানে পশু বলি দেওয়া যাইতে পারে, এরূপ বিধানও মনু (৫. ৪১) দিয়াছেন। শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রেও (২. ১৬. ১) মনুর এই বিধানের প্রতিধ্বনি আছে, তবে তাহাতে মধুপর্কদান অনুষ্ঠানের সহিত সোমযজ্ঞেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গোভিল-গৃহ্যসূত্রে (৪. ১০. ১৪) দেখা যায়, মধুপর্ক-গ্রহণকারীকে গ্রহণের পূর্বে মধুর উদ্দেশে 'তুমি মহামহিমান্বিত',

এইরূপ বলিতে হয়; কিন্তু হিরণ্যকশিপু গৃহ্যসূত্রে (১. ৪. ১৩. ৯) 'অমৃত তোমার দ্বারা মণ্ডিত' বলিয়া মধুপর্ক গ্রহণের বিধান আছে।

বাজপেয় যজ্ঞে মধু একটি প্রধান দ্রব্য।[১৪] শতপথ-ব্রাহ্মণে (৫. ১. ২ ১৯) বাজপেয় যজ্ঞে 'মধুগ্রহ' পাত্রের ব্যবহার আছে। অধ্বর্যু মধুগ্রহ গ্রহণ করিয়া উহা 'সোমগ্রহ' পাত্রের মধ্যস্থলে রক্ষা করেন। পরে পুরোহিতদিগের পাত্রে উহা ঢালিয়া দেওয়া হয়। শতপথ-ব্রাহ্মণে (৫. ১. ৫. ২৮) দেখিতে পাওয়া যায়—রথচালন-প্রতিযোগিতায় একজন বৈশ্য বা রাজন্য উপস্থিত থাকেন, তিনি বেদীর উত্তর মণ্ডপে উপবেশন করেন। অধ্বর্যু ও যজ্ঞকারী মধুগ্রহহস্তে শকটের সম্মুখদ্বার দিয়া এবং এক নেষ্টা সুরাপাত্রহস্তে পশ্চাদ্দ্বার দিয়া বাহিরে আসিয়া রাজন্য বা বৈশ্যের হস্তে তাঁহাদের স্ব স্ব পাত্র অর্পণ করেন। সুরা মিথ্যা, দুঃখ ও তমসার প্রতীক এবং মধু অমর জীবনের প্রতীক। এজন্য রাজন্য বা বৈশ্য মধুগ্রহ পাত্রধারী ব্রাহ্মণের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। ইহাতে তাঁহার অমর জীবনের পথ প্রশস্ত হয়।

শতপথ-ব্রাহ্মণে (৯. ২. ১. ১১) যজ্ঞে ঘৃত ও দধির সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া অগ্নি-বেদীতে আহুতি দিবার বিধান আছে। ইহারই ৫. ৩. ৪. ১৭ বচনে নৃপতি কর্তৃক শিশিরকণার সহিত মধু মিশাইয়া উৎসর্গ করিতে দেখা যায়। উৎসর্গের সময় মধুকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বলিতে হয়—'তুমি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, তুমি রাজত্ব দিয়া থাক—আমাকে তুমি রাজত্ব দাও'।

মধু হিন্দু বা তথাকথিত আর্যদের যে অতি পবিত্র জিনিস সে বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। অতি প্রাচীন যুগ হইতেই ইহা দেবখাদ্যরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। বৈদিক যুগে অশ্বিনীদ্বয়ের সংস্কৃতি হইতেই খাদ্যরূপে মধুর পরিচয় পাওয়া যায়।[১৫] মধুমক্ষিকারা মধু আহরণ করিয়া মধুচক্র পূর্ণ করে। এজন্য সংহিতা ও ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে মধুমক্ষিকাকে 'মধুকৃৎ' বলা হইয়াছে।[১৬] কোন কোন স্থলে দেখা গিয়াছে মধুচক্র হইতে মধু আহরণ করা পাপকার্য, এ কারণ মধু আহরণ করিবার সময় এমন একটি পবিত্র বৃক্ষশাখা ভগবান্ বিষ্ণুকে উদ্দেশ করিয়া লইয়া যাইবার রীতি আছে যাহাতে সেই পাপ আহরণকারীকে স্পর্শ করিতে না পারে। বিষ্ণুকে

উদ্দেশ করিয়া ঐ শাখা লইয়া যাইবার প্রধান কারণ এই যে, প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে বিষ্ণু পদ্মপত্রে উপবিষ্ট মধুমক্ষিকারূপে কল্পিত হইয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণের কপালও নীলবর্ণ মক্ষিকাদ্বারা ভূষিত বলা হইয়াছে। নবজাত সন্তানের আয়ুষ্যক্রিয়ায় ও অন্নপ্রাশনে মধু একটি প্রধান উপকরণ। অষ্টক্যে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে মধুদান করিবার বিধি আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে (৬. ২. ২. ৯৩) দীক্ষাকালে মধুপান নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে; কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ব্রহ্মচারীও মধুপান করিতে পারেন না (ঐ, ১১. ৫. ৪. ১৮)।

পাদটীকা

১ ঋগ্বেদ ১. ৯০. ৬-৮, ১৮৭. ২; ৩. ১. ৮; ৪. ৩৪. ২, ৪২. ৩; বাজসনেয়ি-সংহিতা ৮৩. ১০ প্রভৃতি দ্র.

২ ছান্দোগ্য-উপনিষদেও (৩. ১. ১) সূর্যকে দেবতাদের নিকটও মধুময় বলা হইয়াছে—'অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু'। সূর্যকে মধুর বলিবার একটি বিশেষ কারণ এই যে, বৈদিক যুগে সূর্য একপ্রকার অমৃত বা মধুর স্থানরূপে পরিগণিত ছিল এবং এই মধু যজ্ঞবিশেষের দ্বারা আনয়ন করিবার ব্যবস্থা ছিল।—*Sacred Books of the East*, xlviii, 335. শঙ্করের বেদান্তসূত্রের ভাষ্যেও (১. ৪. ১০) মধুকে সূর্যের রূপক বলিয়া ধরা হইয়াছে।

৩ ঋগ্বেদের ১. ১১৬. ১২, ১১৭. ২২; ৬. ৪৭. ১৮ মন্ত্রগুলিতে অশ্বিনীদ্বয়কে 'মধু-বিদ্যা' জ্ঞাপন করা উপলক্ষ্যে দধ্যচ আথর্বণের স্তুতিগান করা হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণেও (৪. ১. ৫. ১৭-৮; ১৫. ১. ৪. ১৩) অশ্বিনীদ্বয়ের স্তুতিতে মধু শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

৪ ঋগ্বেদ ১. ১১৬. ১২, ১১৭. ২২, ১১৯. ৯।

৫ Hillebrandt: *Vedisehe Mythologie*, i. 237

৬ ঋগ্বেদ ১. ২২. ৩, ১৫৭. ৪; অথর্ববেদ ১০. ১. ৫, ৭. ১৯; পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণ ২১. ১০. ১২; Bergaigne: La Religion Vedique, ii. 433. হেনরী সাহেবের মতে 'বিদ্যুতের কশাঘাতে মেঘের জল ঢালিয়া দেওয়া'র ইহা একটি রূপকমাত্র। ওল্‌ডেনবার্গ ইহাকে

প্রভাত-শিশিরকণা বলিয়া ধরিয়াছেন।—*Les livres,* viii et ix de *l'Atharva-veda,* 115.

৭ Macdonell: *Vedic Mythology,* 49-50.

৮ ঋগ্বেদ ১. ১৯. ৯; ২. ১৯. ২, ৩৪. ৫, ৩৬. ৪; ৩. ৪৩. ৩; ৪. ১৮. ১৩ প্রভৃতি। বিশেষত সোম যখন যজুর্বেদীয় অমৃত অর্থে গৃহীত হইয়াছে, তখনই মধু শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।—Hillebrandt: *Vedische Mythologie,* i, 2434.

৯ ঋগ্বেদ ১. ১১৭. ৬, ১৬৯. ৪, ১৭৭. ৩; ৩. ৮. ১; ৭. ২৪. ২; বাজসনেয়ি-সংহিতা ৬. ২ প্রভৃতি।

১০ ঋগ্বেদেও কয়েকটি সূক্তে মধুদ্রব্যের স্থলে মধু শব্দের প্রয়োগ আছে: ৪. ৪৫. ৪; ৭. ৩২. ২; ৮. ৪. ৮, ২৩. ২৫।

১১ আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র ১. ২৪; পারস্কর-গৃহ্যসূত্র ১. ৩; হিরণ্যকেশি-গৃহ্যসূত্র ১. ৪. ১২. ১১-৯, ১৩. ৬-৯; গোভিল-গৃহ্যসূত্র ৪. ১০ ৫—মধুপর্কদান অনুষ্ঠানবিধি দ্র.

১২ আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র ২. ৪. ৮. ৯, হিরণ্যকেশি-গৃহ্যসূত্র ১. ৪ ১২. ১১-২।

১৩ আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র ২. ৪. ৮. ৫-৮, বাশিষ্ঠ-শ্রৌতসূত্র ১১. ১, বৌধায়ন-শ্রৌতসূত্র ২৩. ৬. ৩৬; মনুসংহিতা ৩ ১১৯-২০।

১৪ শতপথ-ব্রাহ্মণ ৫. ১. ১, কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র ১৪. ২. ৯. ১৫-৮।

১৫ Hillebrandt: *Soma und verwandte Gotter,* 239ff; Weber: *Indische Studien,* i. 290, *SBE,* xii. p xxxiv.

১৬ তৈত্তিরীয়-সংহিতা ১. ৫. ৬. ৫, ৪. ২. ৯. ৬, তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ ৩. ১০. ১০. ১; শতপথ-ব্রাহ্মণ ১. ৬. ২. ১-২; ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৩. ১. ২; ৬. ৯. ১।

[মোদক-সংহিতা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৪৩, পৃ. ৯২-৯৮। "শ্রীশ্যামল বর্মা" ছদ্মনামে লিখিত।]

অথর্ব, অথর্বন্, অথর্বা

সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক ঋষি। অথর্ববেদ ইহার নামের সহিত সংশ্লিষ্ট। ঋগ্বেদে ১৪ বার অথর্বনের ও বহুবার অথর্বাদিগের উল্লেখ আছে। অথর্বা অগ্নি-পুরোহিত বলিয়া খ্যাত। অগ্নি প্রসঙ্গে ভৃগু, অঙ্গিরা ও অথর্বা—এই তিনটি নাম ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদের বর্ণনা হইতে মনে হয়, এই তিনজন ঋষিই অগ্ন্যুৎপাদন প্রণালী আর্যসমাজে প্রথম প্রবর্তন করেন। সুতরাং সভ্যতার ক্রমবিকাশের আলোচনায় ইঁহাদের আলোচনা অপরিহার্য।

অথর্বা ঋষিকর্তৃক অগ্নি আনয়ন ও যজ্ঞ-প্রবর্তনের কথা ঋগ্বেদে স্পষ্টই উল্লেখ আছে ; বিশেষত ঋগ্বেদের সে সকল বর্ণনা হইতে আমরা বৈদিক যুগের অগ্ন্যুৎপাদন-প্রণালী-সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারি :—

'ইমমু ত্যমথর্ববদগ্নিং মংথন্তি বেধসঃ।
যমংকুয়ন্তমানয়ন্নমূরং শ্যাবাভ্যঃ॥'

—ঋ. ৬. ১৫. ১৭।

'হে অগ্নি! যজ্ঞে দেবকাম যজমানের কল্যাণার্থ প্রাদুর্ভূত হও। যজ্ঞের সমৃদ্ধিবিধায়ক অমরগণকে আনয়ন কর। দেবগণের নিকট আমাদিগের যজ্ঞ বহন কর।'

'ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত। মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ॥'—ঋ. ৬. ১৬. ১৩ ; তৈ-ব্রা. ৩. ৫. ১১ ; বাজ-স. ৩০. ১৫।

'হে অগ্নি! অথর্বা ঋষি শিরোবৎ বিশ্বের ধারণকারী পুষ্কর হইতে মন্থন করিয়া তোমাকে নিঃসারিত করিয়াছেন।'

অথর্বার অগ্ন্যুৎপাদন-প্রণালী-সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে। উপরিউক্ত ঋকে দেখা যায়, তিনি পুষ্কর হইতে মন্থন করিয়া অগ্নি উৎপন্ন করিয়াছিলেন। সায়ণ পদ্মপত্রের উপর প্রজাপতি-কর্তৃক বিশ্বসৃষ্টির আখ্যান-অনুযায়ী এখানে পুষ্করের অর্থ পদ্ম করিয়াছেন। অরণিকাষ্ঠের ঘর্ষণে যজ্ঞের অগ্নি-উৎপাদনের কথা বৈদিক সাহিত্যে রহিয়াছে; এইহেতু অগ্নি-উৎপাদনকালে অরণি-কাষ্ঠের ছিদ্রে কাষ্ঠদণ্ড আরোপণ করিয়া রজ্জুর সাহায্যে তাহা মন্থন করিতে হয়। এইজন্য কোন কোন মনীষী[1] পুষ্কর অর্থে অরণি-কাষ্ঠের ছিদ্র বুঝিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন, পদ্মপত্র-সংযোগে দাবানল সংগ্রহের আভাস ইহাতে পাওয়া যায়; যাহাই হউক, কাষ্ঠ-ঘর্ষণে বা মন্থনে অগ্ন্যুৎপাদন-প্রণালী যে অথর্বা উদ্ভাবন করেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সম্ভবত অঙ্গিরা ঋষি এই প্রণালীর অধিকতর উন্নতিসাধন করেন।—ঋ. ৩. ২৯. ২; ৩. ২৩. ২-৩; ৭. ১. ১; ১০. ৭. ৯।

ঋগ্বেদের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অঙ্গিরা, অথর্বা, ভৃগু এবং অঙ্গিরোবংশীয় ঋষিগণের দ্বারা অগ্নিপূজা ও অগ্নি-হোমাদি প্রবর্তিত হয়। অগ্নি মানব-সভ্যতার প্রধান সহায়। এইহেতু ঋগ্বেদে অগ্নির এবং অগ্নির সহিত সংশ্লিষ্ট ইন্দ্র, ত্বষ্টা, মরুৎ প্রভৃতি দেবগণের এত স্তুতি দেখা যায়। ভৃগু, অথর্বা ও অঙ্গিরার নাম ঋগ্বেদের বহু স্থলে এমনভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে যে, মনে হয় তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ নিকট সম্পর্ক ছিল। অথর্ববেদের ভৃগ্বঙ্গিরস, অথর্বাঙ্গিরস প্রভৃতি নাম সর্বজনবিদিত। অথর্ববেদীয় চুলিকোপনিষদে অথর্বাদিগকে 'ভৃগূত্তমাঃ' বলা হইয়াছে। ইহার উপর নির্ভর করিয়া পণ্ডিতগণ ইঁহাদিগকে অভিন্ন বা একই বংশীয় বলিয়া মনে করেন।[2]

ঋগ্বেদে দধ্যঙ্ নামে অথর্বার এক পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় (৬. ১৬. ১৪; ১. ১১৬. ১২; ১. ১১৭. ২২)। অগ্নি-উৎপাদনের সহিত তাঁহার নামও সংশ্লিষ্ট (১. ১১৬. ১২)। ইনিই পুরাণের দধীচি। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণেও (৩. ২. ১৩. ১০) অথর্বা, অঙ্গিরা ও ভৃগু—অগ্নি-পুরোহিতরূপে

বিখ্যাত। অথর্বা যে ভৃগুর পুত্র এবং অঙ্গিরা যে অথর্বার পুত্র সে সম্বন্ধেও প্রমাণের অভাব নাই।[৩]

অথর্বা যে যজ্ঞ প্রবর্তন করেন এবং ভৃগুগণ যে দেবতুল্য ছিলেন তাহা নিম্নোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়।

'যজ্ঞৈরথর্বা প্রথমো বিধারয়দ্দেবাদক্ষৈর্ভৃগবঃ
সং চিকিত্রিরে ॥'—ঋ. ১০. ৯২. ১০।

'অথর্বা নামে ঋষি সর্বপ্রথমে যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে তুষ্ট করিলেন। দেবতারা এবং ভৃগু-বংশীয়েরা বলপ্রকাশপূর্বক গমন করিয়া সেই যজ্ঞ অবগত হইলেন।'

'অগ্নির্জাতো অথর্বণা বিদদ্বিশ্বানি কাব্যা। ভুবদ্দূতো বিবস্বতো বি বো মদে প্রিয়ো যমস্য কাম্যো বিবক্ষসে ॥'—ঋ. ১০. ২১. ৫।

'অথর্বা নামক ঋষি অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, এই অগ্নি সর্বপ্রকার যজ্ঞকার্য জানেন। ইনি যজ্ঞকর্তার দূতস্বরূপ হইয়া দেবতাদিগকে সংবাদ দেন। ইনি যমের প্রিয়পাত্র। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইতেছেন।'

'যজ্ঞৈরথর্বা প্রথমঃ পথস্ততে ততঃ সূর্যো
ব্রতপা বেন আজনি।
আ গা আজদুশনা কাব্যঃ সচা যমস্য
জাতমমৃতং যজামহে ॥'

—ঋ ১. ৮৩. ৫।

অথর্বা যজ্ঞদ্বারা প্রথমে (অপহৃত গাভীগণের) পথ বাহির করিয়াছিলেন। পরে ব্রতপালনকারী কমনীয় সূর্য উৎপন্ন করিয়াছিলেন; অথর্বা ঐ গাভী-সকল প্রাপ্ত হইলেন, কবির পুত্র উশনা ইন্দ্রের সহায় হইয়াছিলেন। (অসুর) দমনের নিমিত্ত সমুৎপন্ন এবং অমর ইন্দ্রের পূজা করি।

অথর্বা, মনু ও দধ্যঙ্ যজ্ঞ করিয়াছিলেন (১. ৮০. ১৬)। ইন্দ্র অথর্বার সহায় (১০. ৪৮. ২)। ঋগ্বেদে অথর্বা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নহেন; কিন্তু ঋগ্বেদে এমনভাবে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি ঋগ্বেদীয় যুগের বহুপূর্বে যে বর্তমান ছিলেন, তাহা বুঝা যায় ও কোন কোন

স্থলে তিনি দেবত্বও প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের (১০. ৮৭. ১২) বর্ণনায় একস্থলে অগ্নিকে বলা হইয়াছে—'অথর্ববজ্জ্যোতিষা দৈব্যেন সত্যং ধূর্বংতমচিতং ন্যোষ', অর্থাৎ 'অথর্বা ঋষির ন্যায় তুমি সত্যধ্বংসকারী নির্বোধকে দিব্য তেজের দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেল।'

ঋগ্বেদের কোন কোন স্থানে অথর্বন্ শব্দে পুরোহিত বুঝাইয়াছে। দশম মণ্ডলের ১২০ সূক্তের ঋষি বৃহদ্দিব আথর্বন্। কোন কোন স্থলে অগ্নি পুরোহিত অথর্বা অগ্নির সহিত এক হইয়া গিয়াছেন (৮. ৯. ৭)। অথর্বণেরা (পুরোহিতগণ) সোম মিশ্রিত করেন (৯. ৪. ২)। অথর্ববেদে দেখা যায়, তিনি ইন্দ্রকে সোম দান করেন (অ. ১৮. ৩. ৫৪)। বরুণ অথর্বকে একটি ধেনু দান করিয়াছিলেন (অ. ৫. ১১; ৭. ১০৪); ইনি দেবগণের সহচর এবং স্বর্গে বাস করেন (অ. ৪. ১. ৭)। শতপথ-ব্রাহ্মণে অথর্বন্ প্রাচীন ঋষি বলিয়া খ্যাত (৬. ৪. ২. ১)। অঙ্গিরোগণ, নবগ্বগণ, ভৃগুগণ ও অথর্বগণ পিতৃগণ (ঋ ১০. ১৪. ৬)। তাঁহারা স্বর্গে বাস করেন এবং তাঁহারা দেবতা (অ. ১১ ৬. ১৩)। তাঁহারা দৈত্যগণকে ওষধিদ্বারা বধ করেন (অ. ৪. ৩৭. ৭)। অবেস্তায় আথ্রবন (āthravan) অর্থে অগ্নি-পুরোহিত। ['আথর' স্থানে আতর্=অগ্নি=বৈদিক অথর্, অথর্যু=অগ্নিশিখা—ঋ. ৭. ১. ১]।

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিতে অথর্বার সহিত অগ্নির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখা যায়। অগ্নির স্বাহা, স্বধা প্রভৃতি বিভিন্ন নাম আছে; পুরাণ ও কাব্যগুলিতে এইসকল নাম অবলম্বনে বহু কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে। দেখা যায়, স্বাহা শবদাহনে ভীতা হইয়া অথর্বনের মধ্যে লুক্কায়িত হন।—মহা. ৩. ২২২. ৭ ই.। অভিচার ক্রিয়ায় অগ্নির এক নাম অথর্বন্।—মহা. ৩. ২৫১. ২১ ই.। মহার্ণবে মগ্ন অগ্নিকে অথর্বা উদ্ধার করেন।—মহা. ৩. ২২৪. ৮।

অথর্ববেদ অথর্বাদিগের অমূল্য কীর্তি বহন করিতেছে। ইহা ভৃগ্বঙ্গিরসবেদ, অথর্বাঙ্গিরসবেদ বা ব্রহ্মবেদ নামেও খ্যাত। ইহার দুই ভাগ—এক ভাগ অথর্বন্, অন্য ভাগ অঙ্গিরা। প্রাচীনকালে বড় বড় যাগ-যজ্ঞের যেমন ব্যবস্থা ছিল, তেমনই পূজা-পার্বণ, শান্তিসস্ত্যয়ন, মন্ত্রণা, আত্মরক্ষার্থ

শত্রুর উৎপীড়নরোধ, এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা বা আধিব্যাধির ব্যবস্থাও ছিল। অথর্বা ও অঙ্গিরোগণ এইসকল বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বিশেষত রাজ-পুরোহিতগণকে এইসকল সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইত। এইহেতু অথর্বা বা অঙ্গিরোগণই পৌরোহিত্যে অধিকারী ছিলেন। অথর্ববেদকে তাঁহাদের কৌলিক ধর্মগ্রন্থ বলা যাইতে পারে; ইহার অধিকাংশই এইসকল মন্ত্রতন্ত্রে পরিপূর্ণ। অথর্ববেদে শান্ত, দান্ত ও লোকহিতকর শুভ বিষয়ের সহিত অথর্বার নাম সংযুক্ত।[৪]

উপনিষদে অথর্বাকে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মুণ্ডক-উপনিষদে (১. ১. ১-২) উক্ত হইয়াছে—

'ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব, বিশ্বস্য
কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্বায়
জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥
অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাথর্বা তাং
পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরান্॥'

ইহা হইতে আমরা পাইতেছি যে, অথর্বা ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ব্রহ্মার নিকট অথর্বা 'ব্রহ্মবিদ্যা' প্রাপ্ত হন। অথর্বা সেই বিদ্যা আবার অঙ্গিরাকে প্রদান করেন। অঙ্গিরা ভারদ্বাজ সত্যবাহকে তাহা বলেন। সত্যবাহ তাহা আঙ্গিরসকে প্রদান করেন।

পুরাণে অথর্বা

(ক) ভাগবত-পুরাণে অথর্বা ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের ঋষি। ইনি অঙ্গিরসের পুত্র। মাতা—সতী।—ভা. ৬. ৬. ১৯। মহাভারতও ইহাই বলিয়াছে।—মহা. ২. ১১. ২০; ৫. ১৮. ৬। অথর্বার কর্দমকন্যা চিত্তি (নামান্তর শান্তি) হইতে দুই পুত্র হয়—অশ্বশিরা ও দধ্যঙ্।—ভা. ৪. ১. ৪১। বায়ুপুরাণ-মতে আঙ্গিরস অথর্বার তিন পত্নী। তন্মধ্যে

মরীচিনন্দিনী সুরূপা হইতে বৃহস্পতি, কর্দমকন্যা স্বরাট্ হইতে গৌতম, বামদেব, অবন্ধ্য, উশিজ ও উতথ্য এবং মনুকন্যা পথ্যা হইতে বিষ্ণু। এতদ্‌ভিন্ন অথর্বার দুইটি মানসপুত্র—সংবর্ত ও বিচিত্ত জন্মগ্রহণ করেন।—বায়ুপু. ৬৫. ৯৮-১০১। মৎস্যপুরাণ (১৯৬.৪) অথর্বার পরিবর্তে অঙ্গিরা করিয়া সুরূপার পুত্রগণের নাম দিয়াছেন—বৃহস্পতি, গৌতম, সংবর্ত, উতথ্য, বামদেব, অজস্য ও ঋষিজ। ভাগবত (১০. ৭৪. ৯) বলেন, অথর্বা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে অন্যতম ঋত্বিক্ ছিলেন। মহাভারতে আছে নহুষ ইন্দ্রপদ হইতে ভ্রষ্ট হইলে মূল ইন্দ্র সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। অঙ্গিরা এইসময় অথর্ববেদ-মন্ত্রদ্বারা ইন্দ্রের সংকার করেন। ইন্দ্র তাই ঐ বেদের নাম দিলেন অথর্বাঙ্গিরস।—মহা ৫. ১৮. ৫-৮। (খ) পাবক অগ্নি প্রথম, লৌকিক অগ্নি। তাঁহার পুত্র ব্রহ্মোদনাগ্নি। ইহারই নামান্তর—ভরত ও বৈশ্বানর। ইনিই দেবগণের হব্য বহন করিতেন। অথর্বা নামক ঋষি পুষ্করোদধি মন্থন করেন। অগ্নি দেবগণের হব্য বহন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন; মৃত্যুর পর তিনি অথর্বার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন—তখন নাম হয় আথর্বণ।—মৎস্যপু. ৫১. ৭-৯। (গ) অগ্নি-বিশেষ। অথর্বা লৌকিকাগ্নি—পুষ্করোদধিমন্থনে উৎপন্ন। ইহার পুত্র দধ্যঙ্গ।—বায়ুপু. ২৯. ৮। (ঘ) ঋষি ভৃগুর নামান্তর। ভৃগুর পুত্র অঙ্গিরা। 'অথর্বা তু ভৃগুর্জ্ঞেয়োঽপ্যাঙ্গিরাঽথর্বণঃ সুতঃ।'—বায়ুপু. ২৯. ৯। কিন্তু মৎস্যপু. (৫১. ১০) মতে অথর্বা ঋষি ভৃগুর পুত্র; অঙ্গিরা অথর্বার পুত্র। (ঙ) অথর্বা নামক জাতি-বিশেষ। পূর্বে অথর্বা নামে ব্যক্তিবিশেষ এই জাতির নেতা ছিলেন। অথর্বার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে এই জাতির নেতা হন। এইরূপ প্রথা পারসিক জাতির মধ্যে অদ্যাপি প্রচলিত। (চ) শিবের নাম-বিশেষ। 'অথর্বাণং সুশিরসং ভূতযোনিম্'—হরি. ৭২.৩৩। (ছ) বসিষ্ঠ।—কিরাত. ১০. ১০॥ বো-রো.॥ (জ) ক্লী, অথর্বেদ॥ মে. বো-রোঃ॥ (ঝ) প্রাণ। 'প্রাণো বাঽথর্বা'—শ-ব্রা. ৬. ৪. ২. ১। (ঞ) প্রজাপতি, ব্রহ্মা। 'অথর্বা বৈ প্রজাপতিঃ'—গো-ব্রা. পূ. ১. ৪। (ট) সোম॥ মনি.।

পাদটীকা

১ Macdonell : *Vedic Mythology*, p. 141

২ *Ancient Indian Historical Tradition*

৩ Dr. Keith : *Religion and Philosophy of the Vedas*, pp. 223-26

৪ M. Bloomfield : *The Atharvaveda*, pp. 7. 8, 9.

[বঙ্গীয় মহাকোষ, ২ খ. পৃ. ১৩৪-১৩৬ .

অথর্ববেদ

অথর্ববেদ চারি বেদের অন্যতম। ইহা ২০ কাণ্ডে বিভক্ত। ২০ কাণ্ডে সর্বসমেত ৭৩০ সূক্তে অন্যূন ৬০৯০ মন্ত্র আছে।[১]

ভারতীয় আর্য-জাতির সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদ। আর্য-সভ্যতার ইতিবৃত্ত আলোচনায় বেদের স্থান সর্বোপরি। এমন সু-প্রাচীন গ্রন্থ আর নাই। এই বেদ হইতে প্রাচীন আর্যগণের রীতি-নীতি ও জীবন-প্রণালী সম্বন্ধে বহু তথ্য জানিতে পারা যায়। বেদ ভারতীয় আর্যগণের ধর্মগ্রন্থ হইলেও, তাঁহারা যে মহাজাতি হইতে পৃথক্ হইয়া ভারতে বিস্তৃতিলাভ করেন, এই প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তাঁহাদিগের সম্বন্ধেও তথ্যলাভ ও সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারা যায়। বিশেষত প্রাচীন গ্রীক, রোমান, শ্লাভ ও টিউটন-জাতিসমূহের প্রাচীন আখ্যানসমূহের সহিত বেদাদির বহু সামঞ্জস্য আছে। ভারতের প্রতিবেশী ইরানীজাতির প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ অবেস্তার সহিতও বেদের সুস্পষ্ট ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন আর্যসভ্যতার আলোচনায় অথর্ববেদের বিশেষ গুরুত্ব লক্ষিত হয়। তাহার একটি কারণ এই যে, আর্য-জাতি প্রধানত অগ্নিপূজক; ভৃগু, অঙ্গিরা ও অথর্বা—এই তিনজন ঋষি অগ্নিপুরোহিত নামে প্রসিদ্ধ। বিশেষত ইহারাই অগ্নি, যাগযজ্ঞ ও হোমাদির প্রবর্তন করেন এবং অথর্ববেদ বিশেষভাবে এই তিনজন ঋষির নামের সহিত সংশ্লিষ্ট। শ্লাভ, টিউটন ও ইরানীয় জাতির সুপ্রাচীন পৌরাণিক আখ্যানগুলিতে যেসকল দেবতা বা অসুরের আখ্যান

আছে, তাহাদের সহিত বৈদিক দেবতা ও অসুরগণের নাম এবং আখ্যানের অনেকাংশে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতি ভারতে স্বতন্ত্র একটি রূপ পরিগ্রহ করিবার পূর্বে বহির্ভারতের মূল আর্য-সংস্কৃতির সহিত ইহা যে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় আর্যসংস্কৃতি মূল আর্যসংস্কৃতির একটি শাখামাত্র। ইহা মূল হইতে পৃথক্ হইয়া বৈদিক যুগ হইতে ক্রমশ স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। শুধু ভারত কেন অন্যান্য দেশেও আর্য-সংস্কৃতি মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে; অন্যান্য দেশে প্রতিদ্বন্দ্বী নবধর্মের প্রভাবে প্রাচীন ধারা লুপ্ত, কিন্তু ভারতে প্রাচীন ধারাই ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে; সেইজন্য ভারতের প্রাচীন ধারার সন্ধান পাইতে কষ্ট হয় না। ঋগ্বেদই সাধারণত সর্বপ্রাচীন বেদ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু অথর্ববেদ অন্তত অংশত ঋগ্বেদ হইতেও যে বহু প্রাচীন তাহা ঋগ্বেদের বর্ণনা হইতেই বুঝা যায়। অথর্বা, অঙ্গিরা ও ভৃগু—এই তিন জন অগ্নির ও যাগযজ্ঞের প্রবর্তক বলিয়া ঋগ্বেদে কীর্তিত। আবার অথর্বা ঋষির নামে অথর্ববেদ খ্যাত। ইহার নামান্তর অথর্বাঙ্গিরসবেদ (অথর্বন্+অঙ্গিরস), ভৃগ্বঙ্গিরসবেদ (ভৃগু+অঙ্গিরস) ও ব্রহ্মবেদ। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, এই তিন ঋষিই এই বেদের প্রবর্তক, কিংবা এই তিন বংশীয় ঋষিদিগের মধ্যে যে সকল যাগযজ্ঞ, হোমাদি ও মন্ত্রতন্ত্রের প্রচলন ছিল, সেগুলি পরে অথর্ববেদ (অথর্বাঙ্গিরসবেদ ও ভৃগ্বঙ্গিরসবেদ) নামে পরিচিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে এরূপভাবে এই তিন ঋষির নাম আছে যে, ইহারা যে ঋগ্বেদীয় যুগের বহু পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় (ঋ. ১.৮০.১৬; ৬.১৫.১৭; ৬.১৬.১৩); সুতরাং ইহাদিগের প্রবর্তিত ধর্ম যে ঋগ্বেদ হইতেও প্রাচীন তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

ভারতীয় আর্যসভ্যতার আদিযুগে যে বেদ-বিভাগ হয় নাই, ভারতীয় শাস্ত্রগুলিই তাহার প্রমাণ দিতেছে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদ-বিভাগ করিয়া বেদব্যাস আখ্যা লাভ করেন—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বেদব্যাসের সময় নিশ্চিতরূপ নির্ণীত না হইলেও তিনি যে বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষত পাণিনিতে চারিবেদ তথা অথর্ববেদের উল্লেখ

আছে (৪. ৩. ১৩৩; ৬. ৪. ১৭৪)। মহাভারত (৩. ২০৩. ১৫; ৫. ১০৮. ১০; ৩. ৩০৫. ২০; ২. ১১. ১৯), রামায়ণ (২. ২৬. ২১) প্রভৃতি গ্রন্থে অথর্ববেদের কথা আছে। বৌদ্ধ ও জৈনগণ বেদধর্ম-বিরোধী; ইঁহারা প্রসঙ্গক্রমে বা প্রতিকূলভাবে বেদের নাম করিয়াছেন। বুদ্ধবচনে তিন বেদের কথা আছে; জৈন 'সূতকৃতাঙ্গ'সূত্রে[1] (২. ২৭) অথর্ববেদের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ সুত্তনিপাতের অট্‌ঠকবগ্‌গে (১৪. ১৩) অথর্ববেদের (অথব্বনবেদের) ক্রিয়াকাণ্ড-সম্বন্ধে নিন্দা আছে। এতদ্ভিন্ন পালিপিটকের[2] নানা স্থানে এইরূপ ক্রিয়াকাণ্ডের নিন্দা আছে।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায়, বৈদিকযুগের পরবর্তী কালে বেদগুলির বিভাগ ও নামকরণ হয়। মূলত এইরূপ নাম বা বিভাগ ছিল না। সাধারণত দেবতাদিগের স্তুতি, তাঁহাদের নিকট আয়ু, আরোগ্য, ধন, গাভী প্রভৃতি কামনা, শত্রুনিধনের জন্য প্রার্থনা, শান্তি, পুষ্টি, অভিচার ও ঐন্দ্রজালিক নানারূপ ক্রিয়াকাণ্ডেই বৈদিক মন্ত্রগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে; কোন কোন মন্ত্রে বা সূক্তে সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের উপলব্ধির কথাও আছে। এই মন্ত্রগুলি প্রধানত ঋক্ (স্তুতি), যজূংষি (ক্রিয়াকাণ্ড), সামানি (সঙ্গীত) ও অথর্বাঙ্গিরসাঃ (শুভ ও অশুভ) নামে খ্যাত ছিল। পরবর্তী কালে এইগুলি সংকলন করিয়া গুণানুসারে বিভাগ করা হয়। কিন্তু এইরূপে বিষয়-অনুযায়ী বেদ-বিভাগ হইলেও সকল বেদেই উপরিউক্ত চারি প্রকার মন্ত্র কতক কতক আছে। অথর্ববেদে শুভ এবং আভিচারিক মন্ত্রতন্ত্রের প্রাধান্য থাকিলেও তাহাতে ঋক্ কিংবা যজূংষির অভাব নাই। অধিকন্তু ইহাতে ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে; এইজন্য ইহা 'ব্রহ্মবেদ' নামে খ্যাত (বৈতানসূত্র ১. ১; গো-ব্রা. ১. ১. ২২; ২. ১৬. ১৯; ৫. ১৫. ১৯; ২. ২. ৬)। এইহেতু এক হিসাবে অন্যান্য বেদ হইতে ইহার শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপন্ন হয়।[২]

পারিবারিক ক্রিয়াকাণ্ড ও ঐন্দ্রজালিক বিষয়ই অথর্ববেদে প্রধান ব্যাপার। ইহার শেষাংশ ও কৌশিকসূত্রের কর্মকাণ্ড অপদেবতা ও অসুরলোক-সম্বন্ধে আলোচনায় পরিপূর্ণ। ইহা হইতে ঋগ্বেদের পূর্ববর্তী যুগের ধর্মের প্রথম স্তরের আভাস পাওয়া যায়; এই অংশ বহু প্রাচীন।

আবার ধর্ম সম্বন্ধে চরম পরিণতির আদর্শও ইহাতে আছে। ইহাতে গৌণভাবে বহু দেবতার কথা থাকিলেও মুখ্যত ইহা একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহাতে ব্যক্তিগতভাবে কোন বিশেষ দেবতার স্তুতি না করিয়া একসঙ্গে বহু দেবতার স্তুতি করা হইয়াছে। এই স্তুতিগুলি ঋগ্বেদের ন্যায় একই ধারার। অথর্ববেদে সকল পৌরাণিক আখ্যানের ধারার সন্ধানও পাওয়া যায়। বৈদিক বা শ্রৌত ক্রিয়াকাণ্ড হইতে আথর্ব ক্রিয়াকাণ্ড সম্পূর্ণ ভিন্ন; ইহা সম্পূর্ণ পারিবারিক ব্যাপার। ইহাতে পারিবারিক অগ্নি-হোমাদির কথাই আছে; শ্রৌত ক্রিয়ার ন্যায় ইহাতে সোমাহুতি দিবার ব্যবস্থা নাই। এই হিসাবে গৃহ্যসূত্রের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

ভারতীয় আর্যগণের জীবনযাত্রা প্রণালীর ইতিবৃত্ত আলোচনায় অথর্ব-বেদ ও গৃহ্যসূত্রের আলোচনা অপরিহার্য। গৃহ্যসূত্র বহু পরবর্তী কালে গ্রথিত হইলেও সূত্রগুলি যে প্রাচীন এবং বংশানুক্রমে ইহার অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল তাহা বুঝা যায়। গৃহ্যসূত্রে গৃহস্থের করণীয় কর্তব্য-সম্বন্ধে নানা বিধিনিষেধ, হোম ও মন্ত্রপাঠের কথা আছে। বিভিন্ন ঋষিবংশের গৃহ্যসূত্রে নানারূপ পার্থক্যও আছে। গৃহ্যসূত্রগুলির মন্ত্রব্রাহ্মণ বা মন্ত্রপাঠও আছে। পারিবারিক শুভ বা আভিচারিক ক্রিয়াদির অনুষ্ঠানে এইসকল মন্ত্রপাঠ করা হইত। অথর্ববেদের সংহিতাগুলি এইরূপ মন্ত্রেরই সমষ্টি; সুতরাং গৃহ্যসূত্রের মন্ত্রগুলি প্রধানত অথর্ববেদ হইতেই গৃহীত। অবশ্য গৃহ্যসূত্র ও অথর্ববেদ ঋগ্বেদের পরবর্তী কালে সংকলিত ও সুসংবদ্ধ হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের ভাষা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষত অথর্ববেদ ও গৃহ্যসূত্রে রীতিমত নিয়মকানুন প্রবর্তিত দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ববেদে অগ্নি, ইন্দ্র, মরুৎ প্রভৃতি দেবতাগণের উল্লেখ আছে, কিন্তু কাহাকেও প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই; দেবগণ অথর্ববেদে অসুর, রক্ষ, দৈত্য, ডাকিনী ও পিশাচাদির হন্তৃরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। ইহার অধিকাংশ সূক্তই অতি প্রাথমিক স্তরের ধর্ম-বিশ্বাসের সহিত চরম পরিণতিমূলক ব্রহ্মবাদও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে (অ. ৮. ৬; ১০. ৭; ১৩. ৮)। ইহাতে বলা হইয়াছে আত্মা ও ব্রহ্মসম্বন্ধে জ্ঞানলাভই প্রকৃষ্ট লক্ষ্য; 'অসৎ' (non-being) সম্বন্ধে বিস্তৃত

আলোচনা ইহাতে আছে (অ. ৪. ১৯. ৬)। অথর্ববেদের বিষয়বস্তু আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহাতে বেদপূর্ব যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বেদের ব্রাহ্মণাংশ রচিত হইবার কাল পর্যন্ত আর্যজাতির গার্হস্থ্য জীবনের ধারা চিত্রিত হইয়াছে। ইহার বিষয়বস্তু প্রাচীন হইলেও ইহাতে একাধারে প্রাচীন ও বৈদিক ভারতের তথ্য পাওয়া যায়।

অথর্ববেদের বিষয়বস্তুকে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। সাধারণত ইহার একটি ভাগ শুভ ও মঙ্গলজনক কার্যের দ্যোতক; এই ভাগ বৈদিক-সাহিত্যে 'ভেষজানি' (অ. ১৬. ৬. ১৪) 'শান্ত' ও 'পৌষ্টিক' নামে অভিহিত। অপর ভাগ ঐন্দ্রজালিক ও আভিচারিক ক্রিয়াবর্গ লইয়া গঠিত; বৈদিক সাহিত্যে তাহা যাতু বা অভিচার নামে অভিহিত (শ-ব্রা. ১০. ৫. ২. ১০)। অথর্ববেদের শুভ বা মঙ্গলকর ভাগ 'অথর্বন্' এবং ঐন্দ্রজালিক বা আভিচারিক অংশ 'অঙ্গিরস' বলিয়া পরিচিত। এইহেতু সমগ্র অথর্ববেদ 'অথর্বাঙ্গিরসবেদ' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে (অ. ১০. ৭. ২০)। অথর্ববেদ বলিতে মাত্র 'অঙ্গিরস' শব্দটি একবার মাত্র তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৭. ৫. ১১. ২) ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থের কয়েকস্থানে দ্বন্দ্বসমাস নিষ্পন্ন 'অথর্বাঙ্গিরস' নামটি পাওয়া যায় (মহা. ৩. ৩০৫. ২০ ; ৮. ৪০. ৩৩; যাজ্ঞ ১. ৩১২ ; মনু. ১১. ৩৩ ; বৌধা. ২. ৫. ৯. ১৪)। কোন কোন স্থলে অথর্ববেদের স্থলে ইহার প্রধান দুইটি ভাগ পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত আছে। ইহাতে মনে হয়, প্রথমে ইহার দুই ভাগ পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থরূপেই গণ্য হইত। গোপথব্রাহ্মণে বেদের পাঁচটি নামই পাওয়া যায়—'ঋচি যজুষি সাম্নি শান্তেঽথ ঘোরে'—গো-ব্রা. ১. ২. ২১ ; ১. ৫. ১০। ঋক্, যজু ও সাম এই ত্রয়ীর ব্যাহৃতি 'ভূঃ', 'ভুবঃ' ও 'স্বঃ' ; কিন্তু অথর্ববেদের দুই ভাগের পৃথক্ পৃথক্ ব্যাহৃতি—'শান্ত' ভাগের 'ওম্' এবং 'ঘোরের' 'জনত্'—গো-ব্রা. ১. ২. ২৪ ; ১. ৩. ৩। এতদনুসারে আথর্ব ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবহৃত উদ্ভিদাদিকেও 'আথর্বণ বা শান্ত (শুভ)' এবং আঙ্গিরস (আভিচারিক)—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। আরও দেখা যায়, প্রথমে আথর্বণ-বেদ ও আঙ্গিরস-বেদ সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল।—শ-ব্রা. ১৩. ৪. ৩. ৩ ; আশ্ব-শ্রৌ. ১০. ৭. ১ ; শাংখ্যা-শ্রৌ. ১৬. ২. ৯। পুরাণে আঙ্গিরস-বেদ বহি-

ভারতের মগদিগের (পারসীদিগের) চারিবেদের অন্যতম বলা হইয়াছে (Wilson[3] in Reinaud's Memoire sur l'Inde, p. 394; Weber[4], IS. i. p. 292, note)।

আভিচারিক ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াদি বৈদিক শাস্ত্রাদিতে নিন্দিত না হইলেও ইহার স্থান খুব উচ্চে নহে। সুতরাং শুভকর 'ভেষজ'কে বেদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও আভিচারিক 'ঘোরে'র বেদে উল্লেখ না করিয়া অনেক স্থলে পরিত্যাগ করা হইয়াছে (অ. ১১. ৬. ১৪)। 'যাতু' ভেষজের অপর ভাগ (অ. ৬. ১৩. ৩)। উভয়ই অথর্ববেদে পূজিত। অঙ্গিরা ঋষির নাম বেদের 'ঘোর' অংশের সহিত কি কারণে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে, তাহা ঋগ্বেদে অঙ্গিরোগণের চরিত্রচিত্র হইতেই বুঝা যায় (ঋ. ১০. ১০৮. ১০)। কৌশিকসূত্রে (১৩৫. ১) আঙ্গিরস বৃহস্পতিকে যাতুবিদ্যার দেবতা বলা হইয়াছে। সম্ভবত বেদের শান্ত ও ঘোর অংশ প্রথমে যথাক্রমে আথর্বণ ও আঙ্গিরস নামে অভিহিত হইত। ক্রমে তাহা যুক্ত হয় এবং পরবর্তী কালে শুধু 'অথর্ববেদ' নাম ধারণ করে।

অথর্ববেদের অপর দুইটি নাম হইতেছে—'ভৃগ্বঙ্গিরস' ও 'ব্রহ্মবেদ'। এই দুইটি নাম পরবর্তী কালের। ভৃগ্বঙ্গিরস (ভৃগু+অঙ্গিরস) নামটি শুধু অথর্ববেদের গ্রন্থাদিতেই পাওয়া যায়। গোপথ-ব্রাহ্মণে (১. ২. ৩) ভৃগু অথর্বনের পূর্ববর্তী, আরও বলা হইয়াছে (১. ২. ২২) অথর্বা ও অঙ্গিরোগণ ভৃগুর চক্ষু। চুলিকোপনিষদে (১০) অথর্বণদিগের মধ্যে ভৃগুগণকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদেও দেখা যায় (১০. ১৪. ৬; ১০. ৯২. ১০) ভৃগু, অঙ্গিরা ও অথর্বা—এই তিনটি নাম প্রায়ই সম্বন্ধবিশিষ্ট। সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হয়, এই তিন ঋষি হয় একই বংশীয় ছিলেন, নতুবা বেদের শান্ত ও আভিচারিক মন্ত্রগুলি এই তিন ঋষি বা এই তিন বংশের ঋষিগণদ্বারা রচিত। সম্ভবত ভৃগু বা ভৃগু-বংশীয় ঋষিগণ রচিত মন্ত্রগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে কিংবা আথর্বণ ও আঙ্গিরস মন্ত্রগুলির সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। এইজন্য এই নামটির তত প্রচার নাই।

'ব্রহ্মবেদ' নামটি অত্যন্ত পরবর্তী কালে উৎপন্ন হইয়াছে। অথর্ববেদেও শব্দটির প্রয়োগ একান্ত বিরল। বেদাদি আলোচনা করিলে দেখা যায়।

সমগ্রভাবে 'ধর্ম' বা 'শাস্ত্র' বুঝাইতে ঋগ্বেদে কোন নামের প্রয়োগ নাই। যাগাদিতে বিভিন্ন ব্যক্তির (হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্যু) প্রয়োজন হইত। সকলেই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন না। ব্রাহ্মণসমূহে সকল বেদের জ্ঞানকে 'সর্ববিদ্যা' বলা হইয়াছে। পরবর্তী কালে তাহার পরিবর্তে 'ব্রাহ্ম' এবং যে 'ব্রাহ্ম' বা 'ব্রহ্ম' জানে তাহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হইয়াছে (তৈ-স. ৭.৩.১.৪)। বস্তুত দেব ও যজ্ঞের রহস্যকে ব্রহ্মবিদ্যা বুঝাইয়া এক অর্থে অথর্ববেদের নাম 'ব্রহ্মবেদ' হইয়াছে। বৈদিক যাগ সম্পন্ন করিতে যে চতুর্থ ব্যক্তির প্রয়োজন হয় তাহাকে বুঝাইতে 'ব্রহ্মা বদতি জাতবিদ্যাম্' বলা হইয়াছে (SBE, xlii. p. liv, note 1)। ঋগ্বেদে (৭. ৭. ৫) অগ্নিকে 'ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। এইসকল কারণে অগ্নি-পুরোহিতদিগের প্রণীত মন্ত্র 'ব্রহ্মবেদ' নামে খ্যাত হইতে পারে। বিশেষত অথর্ববেদে (১০. ২; ১০. ৭) ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মসম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনাও রহিয়াছে; সুতরাং ইহার 'ব্রহ্মবেদ' নাম নিরর্থক নহে।[৩]

বিভিন্ন ঋষি-পরম্পরায় বেদাদি শাস্ত্র চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ নয়জন ঋষির শিষ্য পরম্পরাক্রমে অথর্ববেদের নয়টি শাখার কথা জানিতে পারা যায়। অবশ্য নয়টি শাখার গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় না। শৌনকীয় নামক শাখায় অথর্ববেদেই পাওয়া যায়। অন্যান্য শাখার উল্লেখ বিভিন্ন স্থলে পাওয়া যায়। সায়ণ তাঁহার অথর্ববেদের ভাষ্যের ভূমিকায় অথর্ববেদের শাখাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন; অথর্ববেদের চরণব্যূহেও শাখাগুলির কথা আছে। কোন কোন স্থলে শাখাগুলির ভুল নামও আছে। সর্বজনগ্রাহ্য নয়টি শাখার নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

(১) পৈপ্পলাদ

(পৈপ্পলাদক, পৈপ্পলাদি, পিপ্পলাদ, পৈপ্পল, পৈপ্পলায়ন ই.) বা ঋষি পিপ্পলাদির শাখা। অথর্ববেদের পরিশিষ্ট এবং অথর্ব উপনিষদ্গুলি ভিন্ন অন্যত্র এই শাখার উল্লেখ নাই। এমন কি কৌশিকসূত্র, বৈতানসূত্র কিংবা গোপথ-ব্রাহ্মণে এই নামটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। শৌনকীয়-সূত্রের তিনটি মন্ত্র (অ. ১৯. ৫৬-৫৮) অথর্ববেদের ৮ম পরিশিষ্টে 'পৈপ্পলাদ-মন্ত্রাঃ'

বলা হইয়াছে। অথর্বোপনিষদ্‌গুলির অধিকাংশই পৈপ্পলাদ কিংবা শৌনকীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত।

(২) তৌদ বা তৌদায়ন

এই শাখা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। প্রায়ই ইহা স্তৌদ ও স্তৌদায়ন নামে অভিহিত হইয়াছে। অথর্ব-পরিশিষ্টে (২৩. ৩) আছে—'আস্কন্ধাত্বরসো বাহপীহতি স্তৌদায়নৈঃ স্মৃতা'।

(৩) মৌদ বা মৌদায়ন

অথর্ববেদের পরিশিষ্টে বহুবার এই শাখার উল্লেখ আছে। একস্থলে (২. ৪) বলা হইয়াছে যে, শৌনক ও পৈপ্পলাদ শাখার পুরোহিতগণই পৌরোহিত্যের উপযুক্ত পাত্র, জলদ বা মৌদশাখার পুরোহিতগণের উপর যে রাজ্যের ভার দেওয়া হয়, তাহা অবিলম্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

(৪) শৌনকীয় বা শৌনকী

শৌনকীয় শাখাই অধুনা বিশেষভাবে প্রচলিত। অথর্ববেদের যে প্রাতিশাখ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 'শৌনকীয়া চতুরাধ্যায়িকা' নামে খ্যাত। অথর্ববেদের পরিশিষ্টগুলিতে বহুবার শৌনক, শৌনকি, শৌনকীয় প্রভৃতি নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত উপনিষদ্‌গুলিতে (মুণ্ড-উ. ১. ১. ৩ ; ব্র-উ. ১) শৌনককে অথর্ববেদের অন্যতম প্রধান ঋষি বলা হইয়াছে। এমন কি অথর্ববেদের উপনিষদের নামও 'শৌনকোপনিষদ্'।

(৫) জাজল

মহাভাষ্য মতে ঋষি জজলি এই শাখার প্রতিষ্ঠাতা। অথর্ব-পরিশিষ্টে (২৩. ২) আছে—'বাহুমাত্রা দেবদর্শৈর্জাজলৈরন্নমাত্রিকা'।

(৬) জলদ

মৌদ-শাখার সহিত ইহার উল্লেখ আছে (অ.—পরিশিষ্ট ২. ৪)। অথর্ব-পরিশিষ্টে (২৩. ২) বলা হইয়াছে—

'জলদায়নৈর্বিতস্তির্বা ষোড়শেহতি তু ভার্গবঃ'।

(৭) ব্রহ্মবেদ

চরণব্যূহ ভিন্ন অন্য কোন অথর্ব-গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই।

(৮) দেবদর্শ বা দেবদর্শী

কৌশিক-সূত্রে শৌনকীয়ের সহিত ইহার উল্লেখ আছে (৮৫. ৭-৮)। ব্যাকরণে 'শৌনক'গণের রূপ 'দেবনর্শনিনঃ'। অন্যত্রও ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

(৯) চারণবৈদ্য

সর্বত্রই ইহার উল্লেখ আছে। এতদ্ভিন্ন কৌশিকসূত্র (৬. ৩৭) ও অথর্ব-পরিশিষ্টে (২৩. ২) এই শাখার কথা বলা হইয়াছে—

'চারণবৈদ্যৈর্জম্ভে চ মৌদেনাহষ্টাঙ্গুলানি চ'।

অথর্ববেদের সূত্রগুলির সহিত প্রত্যক্ষভাবে কোন ঋষির নাম সংশ্লিষ্ট নাই। নয়টি শাখার কয়েকটি নাম কোন ঋষিবিশেষের নাম হইতে উৎপন্ন নহে। দেখা যায়, শ্রৌতক্রিয়ার চতুর্থ পুরোহিত বা ব্রহ্মা হইতে 'ব্রহ্মবেদ' নামটির উৎপত্তি হইয়াছে। 'চারণবৈদ্য' বলিতে পরিব্রাজক চিকিৎসকগণ বা তাঁহাদিগের বিদ্যাকে বুঝাইয়াছে। এইরূপ 'জলদ' (জলদানকারী) বলিতে জলদ্বারা নিষ্পন্ন আভিচারিক ক্রিয়াদিই বুঝায়।[৪]

অথর্ববেদের সংহিতা-শাখার প্রধান দুইটি—শৌনকীয় ও পৈপ্পলাদ শাখা।

প্রাচীন ভাষায় লিখিত সংহিতা কিংবা কাশ্মীর হইতে প্রাপ্ত একখানি সংহিতা ভিন্ন কোন শাখারই কোন সংহিতা অথবা সূত্রগ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন সংহিতাখানি এবং কৌশিকসূত্র, বৈতানসূত্র ও গোপথ-ব্রাহ্মণকে শৌনকীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়। অথর্ববেদের প্রাতিশাখ্যখানির নাম 'শৌনকীয়া চতুরাধ্যায়িকা'; ইহাকে প্রাচীন গ্রন্থখানিরই নবীন সংস্করণ বলা যাইতে পারে। অথর্ব-পদ্ধতির (কৌশিক. ১.৬) মতে বৈতানসূত্র শৌনকীয়সূত্র; বৈতানসূত্র যে কৌশিকসূত্র অবলম্বনে রচিত, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং বৈতানসূত্রকে শৌনকীয়-সূত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে দ্বিধা থাকে না। দেখা যায়, কোন

কোন স্থলে 'দেবদর্শী' 'শৌনকে'র বিরোধী (কৌশিক. ৮৫. ৭. ৮)। কৌশিকসূত্রে মূল প্রাচীন গ্রন্থখানিরও বহু অংশ আছে। বৈতানসূত্রে ও কৌশিকসূত্রে কাশ্মীরে প্রাপ্ত সংহিতার বহু অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

কাশ্মীরে প্রাপ্ত সংহিতাখানিকে পৈপ্পলাদ শাখার অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহাকে 'আথর্বণিকা-পৈপ্পলাদ শাখা' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অথর্ব-পরিশিষ্টকে (৩৪. ২০) 'পিপ্পলাদি-শান্তিগণ' বলা হয়; কেন না, প্রাপ্ত সংহিতার প্রারম্ভ-প্রতীক হইতেছে—'শং নো দেবী।' তারপর পৈপ্পলাদ ও শৌনকীয় শাখার অনেক স্থলে মিলও রহিয়াছে; এই হেতু অনেকেই ভুল করিয়া থাকেন। সম্ভবত পিপ্পলাদি শৌনক হইতে প্রাচীন। সায়ণও শৌনকীয় সংহিতার ভাষ্যে কোন কোন স্থলে পৈপ্পলাদের পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।[৫]

পৈপ্পলাদ শাখা

শৌনকীয় শাখার অথর্ববেদ-সংহিতার ন্যায় পৈপ্পলাদ শাখার অথর্ববেদও ২০ অংশে (কাণ্ডে) বিভক্ত। প্রত্যেক অংশ আবার অনুবাক ও সূক্তে বিভক্ত।[৬] দেখা যায় মূল প্রাচীন গ্রন্থের 'শং নো দেবী' (১. ১. ৬) বলিয়া যে মন্ত্র আছে, তাহার সহিত ইহার উদ্বোধন শ্লোকের বিশেষ সামঞ্জস্য আছে। শৌনকীয় সংহিতার উদ্বোধনমন্ত্র ইহার দ্বিতীয় অনুবাকের প্রথম মন্ত্র। অবশিষ্ট খণ্ডগুলির প্রতীক এইরূপ—২ অরসং প্রাচ্যম্ (৪. ৭. ১); ৩ আ ত্বা গন্ (৩. ৪. ১); ৪ হিরণ্যগর্ভঃ (৪. ২. ৭); ৫ পিশঙ্গবাহ্বে সিন্ধুজাতায়ৈ; ৬ তদ্ ইদ্ আস (৫. ২. ১); ৭ সুপর্ণস্ত্বা (৫. ১৪. ১); ৮ কথা দিব অসুরায় (৫. ১১. ১); ৯ ঊর্ধ্বা অস্য (৫. ২৭. ১); ১০ ন তদ্ বিদো যদ্; ১১ বৃষা তেঽহম্; ১২ ইমং স্তোমমর্হতে (২০. ১৩. ৩); ১৩ অগ্নিস্তক্মানম্ (৫. ২২. ১); ১৪ ইন্দ্রস্য নু (২. ৫. ৫); ১৫ সম্যগ্ দিগ্ভ্যঃ; ১৬ অন্তরায় (৮. ১. ১); ১৭ সত্যং বৃহদৃতম (১২. ১. ১); ১৮ সত্যেনোত্তভিতা (১৪. ১. ১); ১৯ দোষো গায় (৬. ১. ১); ২০ ধীতী বা যে (৭. ১. ১)।

শৌনকীয় শাখার প্রথম কাণ্ড হইতে সপ্তম কাণ্ড পর্যন্ত পৈপ্পলাদে প্রায় অবিকল রহিয়াছে (৮-১৪)। পঞ্চদশ কাণ্ডের প্রথম অংশ শৌনকীয় শাখার

অনুরূপ। শৌনকীয় শাখার ১৬শ ও ১৭শ কাণ্ড প্রায় অবিকৃতভাবে পৈপ্পলাদে আছে। শৌনকীয়ের ১৯শ কাণ্ডের (ইহার ৭২ সূক্তের ১২শ ঋক্ ব্যতীত) ঋক্‌গুলি পৈপ্পলাদ শাখার গ্রন্থের নানা সূক্তে বিক্ষিপ্ত আছে। এইরূপ আলোচনা করিলে দেখা যায়, উভয় শাখায় বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে।[৬]

পৈপ্পলাদ শাখার একখানি পুঁথি ভিন্ন অন্য কিছুই পাওয়া যায় নাই। এখানি সংহিতা-গ্রন্থ, ইহার কোন পদপাঠ বা ভাষ্যও নাই।

শৌনকীয় শাখার সংহিতা, বহুপদপাঠের পুঁথি ও সূত্রগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। কৌশিক-সূত্র ও বৈতান-সূত্র শৌনকীয় শাখারই অন্তর্ভুক্ত। কৌশিক ও বৈতানসূত্রকে বিধানসূত্র বা সংহিতাবিধি বলা যায়। এইগুলির সহিত গৃহ্যসূত্রের কতক কতক সাদৃশ্য আছে। সায়ণকেই অথর্ববেদের ভাষ্যকার বলিতে পারা যায়। অথর্ববেদের একমাত্র ব্রাহ্মণগ্রন্থ 'গোপথ-ব্রাহ্মণ' শৌনকীয় শাখারই অন্তর্ভুক্ত।

হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী অথর্ববেদের কর্মকাণ্ড (ritual literature) পাঁচটি কল্পে বিভক্ত। এই পাঁচটি কল্পকে উপবর্ষ 'শ্রুতি' আখ্যা দিয়াছেন। যে সকল ঋষি এই পাঁচটি কল্পের কার্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা পঞ্চকল্প বা পঞ্চকল্পী নামে অভিহিত হন।[৭] উল্লিখিত পঞ্চকল্প এইরূপ : ১ কৌশিকসূত্র বা সংহিতা-বিধি (বা সংহিতা-কল্প), ২ বৈতানসূত্র বা বৈতান-কল্প, ৩ নক্ষত্রকল্প, ৪ শান্তিকল্প এবং ৫ আঙ্গিরস-কল্প বা অভিচার-কল্প (বা বিধান-কল্প)। শেষোক্ত তিনটি কল্প পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত। অথর্বপরিশিষ্ট বহু-বিষয়ক ; তন্মধ্যে কয়েকটি এইরূপ :—১ নক্ষত্রকল্প (জ্যোতিষ-বিষয়ক), ২ শান্তিকল্প (ঐ), ৩ ইন্দ্রমহোৎসব, ৪ স্কন্দযাগ বা ধূর্তকল্প (চৌরবিদ্যা), ৫ গণমালা, ৬ আসুরকল্প (ডাকিনী বা যাদুবিদ্যা), ৭ শ্রাদ্ধকল্প, ৮ উত্তমপটল, ৯ কৌৎসব্যানিরুক্তনিঘণ্টু, ১০ চরণব্যূহ, ১১ গ্রহযুদ্ধ, ১২ অদ্ভুতশান্তি, ১৩ ঔশনসাদ্ভুতানি প্রভৃতি।

আথর্ব উপনিষদ্

অথর্ববেদের (৪৯শং) পরিশিষ্ট। চরণব্যূহের মতে নিম্নোক্ত ২৭ খানি উপনিষদ্ অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত।—১ মুণ্ডক, ২ প্রশ্ন, ৩ ব্রহ্মবিদ্যা, ৪ ক্ষুরিকা,

৫ চুলিকা, ৬ অথর্বশির, ৭ অথর্বশিখা, ৮ গর্ভ, ৯ মহা, ১০ ব্রহ্ম, ১১ প্রাণাগ্নিহোত্র, ১২ মাণ্ডুক্য, ১৩ নাদবিন্দু, ১৪ ব্রহ্মবিন্দু, ১৫ অমৃতবিন্দু, ১৬ ধ্যানবিন্দু, ১৭ তেজোবিন্দু, ১৮ যোগশিখা, ১৯ যোগতত্ত্ব, ২০ নীলরুদ্র, ২১ পঞ্চতাপিনী, ২২ একদণ্ডিসংন্যাস, ২৩ অরুণি, ২৪ হংস, ২৫ পরমহংস, ২৬ নারায়ণ ও ২৭ বৈতথ্য।

সর্বসমেত প্রায় ২৩৫ খানি উপনিষদ্ পাওয়া গিয়াছে; এগুলির মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত আধুনিক। অথর্ববেদের উপরিউক্ত ২৭ খানি উপনিষদ্ সম্বন্ধেও একথা বলা হয়। বিষয়বস্তু ও ভাষারীতি-অনুযায়ী অথর্ববেদের উপনিষদ্গুলির বিভাগ বেবর সাহেব করিয়াছেন। তৎকৃত বিভাগ[৮] এইরূপ—১ পুরে বেদান্তোপনিষদ্ (প্রাচীন বেদান্ত), ২ যোগোপনিষদ্, ৩ সংন্যাসোপনিষদ্, ৪ শিবোপনিষদ্ ও ৫ বিষ্ণুপনিষদ্।

অথর্ববেদের বৈয়াকরণিক ও আভিধানিক গ্রন্থগুলির মধ্যে অথর্ববেদ-প্রাতিশাখ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রিকাণ্ডমণ্ডনে পাণিনিকৃত আথর্বণ-সূত্রের উল্লেখ আছে। তদ্ভিন্ন অথর্বপরিশিষ্টে* নিরুক্ত, নিঘণ্টু, চরণব্যূহ ও উত্তমপটল প্রভৃতি রহিয়াছে।[৯]

শৌনকীয়-সংহিতা

শৌনকীয়-শাখার অথর্ববেদসংহিতা ২০ কাণ্ডে বিভক্ত; প্রত্যেক কাণ্ডে আবার অনুবাক (পাঠ) ও সূক্ত (স্তোত্র) রহিয়াছে। কাণ্ডগুলির অর্থ-সূক্ত (অর্থানুযায়ী বিভাগ) ও পর্যায়সূক্ত (কয়েকটি সূক্তের সমষ্টি) বিভাগও আছে। গোপথব্রাহ্মণে (১. ১. ৫ ও ৮) ২০ কাণ্ডের অঙ্গিরা ও অথর্বার বংশধর ২০ জন দ্রষ্টা ঋষির উল্লেখ আছে। কিন্তু নানা কারণে তাহা সমর্থন করা যায় না।

অথর্ববেদের বিষয়বস্তুকে মোটামুটি ১৪টি ভাগে বিভক্ত করা যায়[১০] যথা—১ ভৈষজ্যানি—রোগ ও ভূতপ্রেত নিবারণের মন্ত্র, ২ আয়ুষ্যাণি—দীর্ঘজীবন ও স্বাস্থ্যলাভের মন্ত্র, ৩ আভিচারিকাণি ও কৃত্যাপ্রতিহরণানি—অসুর, যাদুকর ও শত্রুর উপদ্রববারণের মন্ত্র, ৪ স্ত্রীকর্মাণি—স্ত্রীলোকের আবশ্যক মন্ত্র, ৫ সাংমনস্যানি—সভায় আধিপত্য, নানা বিষয়কর্মে জয়-

লাভ প্রভৃতির মন্ত্র, ৬ রাজকর্মাণি—রাজার আবশ্যক মন্ত্র, ৭ ব্রাহ্মণগণের হিতকর মন্ত্র, ৮ পৌষ্টিকানি—সম্পদ্ লাভ ও আপদ্‌বারণের মন্ত্র, ৯ প্রায়শ্চিত্তানি—কুকর্ম ও পাপ হইতে নিষ্কৃতির মন্ত্র, ১০ সৃষ্টিতত্ত্ব ও দার্শনিক মন্ত্র, ১১ ক্রিয়াকাণ্ডমূলক মন্ত্র, ১২ ব্যক্তিগত চিন্তাধারামূলক মন্ত্র, ১৩ বিংশকাণ্ড, ১৪ কুন্তাপসূত্র।

১ ভৈষজ্যানি

অথর্ববেদে প্রাচীন ভারতে কিরূপে রোগনির্ণয় ও তাহার চিকিৎসা হইত তাহা জানিতে পারা যায়। পরবর্তী কালে চিকিৎসাশাস্ত্র 'আয়ুর্বেদ' নামে অভিহিত হয়, হিন্দু-শাস্ত্রমতে ইহা অথর্বেরই উপবেদ। ঋগ্বেদেও কয়েকটা ঋকে রোগ আরোগ্যের ইঙ্গিত আছে (১. ১. ১৯১ ; ৭. ৫০ ; ৮. ৯১ ; ১০. ৫৭-৬০ ; ১০. ১৩৭, ১৬১, ১৬৩)। অথর্ববেদে রোগ আরোগ্যকর মন্ত্র, বা ক্রিয়া 'ভেষজম্' নামে অভিহিত। দেখা যায়, ঔষধি বা উদ্ভিদাদির সাহায্যে চিকিৎসা করা হইত ; এইরূপ আরোগ্যকর উদ্ভিজ্জ 'ভেষজী' নামে অভিহিত হইয়াছে। জলের চিকিৎসাও ছিল, এইরূপ জল অথর্ববেদে 'ভেষজীঃ' নামে খ্যাত। সাধারণত রোগ আরোগ্যকর মন্ত্র বা ক্রিয়াগুলি ভূত-প্রেত-নিবারক ক্রিয়া বা মন্ত্রের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে এবং 'ভেষজম্' বলিতে এইরূপ ক্রিয়াও বুঝাইয়াছে। অথর্ববেদে তক্‌মন্ (জ্বর), যক্ষ্মা, আস্রাব (অতিসার), অপচিৎ (অপচী=দুষ্টক্ষত), কুষ্ঠ, জলোদর, কৃমি প্রভৃতি নানা রোগের কথা আছে। রোগ-প্রতিকারের জন্য ও ভূত-প্রেতাদির উপদ্রব নিবারণের জন্য মাদুলিধারণের ব্যবস্থাও অথর্ববেদে দেখা যায় (অ. ১. ২২ ; ১. ২৫ ; ৫. ৪ ; ৫. ২২ ; ৬. ২০ ; ৬. ১০৯ ; ১৯. ৩৯ ; ১. ১০ ; ৭. ৮৩ ; ৬. ২৪ ; ১. ২ ; ২. ৩ ; ৫. ১৩ ; ৫. ১৬ ; ৬. ১২ ; ৭. ৫৬ ; ৯. ৮. ১. ২ ; ৬. ১৩৭. ৩)।

২ আয়ুষ্যাণি

স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের মন্ত্র ও ক্রিয়াগুলির সহিত 'ভেষজম্'-গুলি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট (অ. ২. ১৫-৭ ; ২. ২৮ ; ৭. ৩২ ; ১. ৩০ ; ৩. ১১ ; ৫. ২৮, ৩০ ; ৬. ৪১, ৫৩ ; ১৯. ২৪, ২৭, ৫৮ ; ৭০)।

৩ আভিচারিকাণি ও কৃত্যাপ্রতিহরণানি

বেদ ও বৈদিক গ্রন্থাদিতে দেখা যায়, প্রাচীন আর্যগণকে শত্রুর উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইত। এই ব্যাপারে সাধারণত তাঁহারা দেবগণের সাহায্য কামনা করিয়া স্তুতি করিতেন। তাঁহাদের প্রার্থনার ঐশ্বরিক শক্তি বা কোনরূপ দৈববলে শত্রুর অনিষ্ট হইবে, এইরূপ বিশ্বাস তাঁহাদের ছিল। এতদ্ভিন্ন এক শ্রেণীর মন্ত্রে দেখা যায়, মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে অথবা তদনুযায়ী কাজ করিলে শত্রু, সর্প, ভূতপ্রেতাদি নিবারিত হয়। ঋগ্বেদেও অনুরূপ মন্ত্র রহিয়াছে (ঋ. ৭. ১০৪ ; ১০. ৮৪, ১২৮, ১৫৫)। অথর্ববেদের এই ভাগে শত্রুর অনিষ্টকর, এমন কি প্রাণঘাতক মন্ত্রাদিও আছে। এতদ্ভিন্ন যাদুবিদ্যা বা মায়াপ্রভাবে যাদুকর ও শত্রুগণের বিনাশসাধন এবং তাহাদের অনুষ্ঠিত অভিচারক্রিয়া হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় আছে। এইসকল মন্ত্রের সহিত ঋষি অঙ্গিরার নাম সংশ্লিষ্ট (অ. ১. ৭, ৮, ২৮ ; ৬. ৩৭ ; ৭. ১৩, ৫৯ ; ৫. ২৯ ; ৭. ৩৪ ; ৮. ৩ ; ১৯. ৬৫, ৬৬ ; ২. ১১-২ ; ৮. ৫ ; ১০. ১. ৬ ; ৫. ৩১. ১২)।

৪ স্ত্রীকর্মাণি

অথর্ববেদে স্ত্রীলোকের করণীয় কর্তব্যগুলির বিশেষ বর্ণনা আছে এবং গৃহ্যসূত্রের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া আমরণ তাহাকে নানা অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। স্বামীর প্রেমলাভ ও তুষ্টিসাধনই তাহার প্রধান কর্তব্য বলিয়া গণ্য। কিন্তু পুরুষের মন নানা দিকে আকৃষ্ট হয়, বিশেষত সপত্নী ও অন্য স্ত্রীলোকের আকর্ষণ হইতে তাহাকে রক্ষার জন্য, সন্তানলাভ, সন্তানের ও স্বামীর মঙ্গলের জন্য, স্ত্রীলোককে নানাপ্রকার অনুষ্ঠান করিতে হইত। অথর্ববেদে স্ত্রীলোকের মঙ্গলকর বহু মন্ত্র থাকে (৬. ১৩০-২ ; ৭. ৩৫-৮)।

৫ সাংমনস্যানি

নানা কার্যে সাফল্যলাভের মন্ত্র ও ক্রিয়া ইহার অন্তর্ভুক্ত। হৃদ্য, সংবনন এবং বশীকরণ প্রভৃতি মন্ত্রও ইহার অন্তর্ভুক্ত। মিলন, আকর্ষণ ক্রোধদমন

প্রভৃতির মন্ত্রও আছে (কৌশিক. ৩৬. ২৮-৩১ ; ৭৬. ৮. ৯ ; ৭৯. ১০ ; অ. ৬. ৪২. ৪৩ ; ৩১-২ ; ৬. ৬৪, ৭৩ ; ৭. ৫২)।

৬ রাজকর্মাণি

অথর্ববেদের মন্ত্র ও কর্মকাণ্ড জনসাধারণের মঙ্গলকর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আথর্ব-পুরোহিত সাধারণের জন্য নানারূপ ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করিতেন। এইরূপ শান্তি, হোম ও অভিচার-ক্রিয়াদির অনুষ্ঠানের জন্য তিনি গ্রামযাজী ও পূগযাজ্ঞিয় বলিয়া অভিহিত হইতেন। অপর দিকে রাজা ও পুরোহিতগণের সর্ববিধ স্বার্থসংরক্ষণেও অথর্ববৈদিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। রাজা ও পুরোহিতগণকে এইসকল ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে অথর্ববৈদিক অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতে হইত। অথর্ব ব্রাহ্মণ যেমন রাজপুরোহিত থাকিতেন, যুদ্ধক্ষেত্রে রাজাকে রক্ষা করাও তাঁহার ধর্ম ছিল। রাজার অভিষেক, নির্বাচন, শক্তি, সম্পদ, আত্মরক্ষা, রাজ্যরক্ষা, শত্রুদমন, এমনকি রাজার আধ্যাত্মিক মঙ্গলামঙ্গল সমস্তই আথর্বপুরোহিতের উপর নির্ভর করিত। অথর্ববেদে এই বিষয়ক বহু সূক্ত আছে (১. ১৯-২১ ; ৩. ১-৫ ; ৬. ৬৫-৭)। কৌশিক-সূত্রেও এইরূপ বহু সূত্র 'রাজকর্মাণি' নামে অভিহিত (১৪-১৭)। সূত্রগুলিতে (অ. ৩. ৩. ২ ; ৪. ৬) রাজাকে ইন্দ্রের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে। একটি সূক্তে (৪. ৮) রাজার অভিষেকের কথা ও রাজোচিত গুণের কথা বর্ণিত আছে। অপর একটি সূক্তে (৩. ৪) রাজার মর্যাদা স্পষ্টই বুঝা যায়। রাজচক্রবর্তীত্ব লাভের প্রক্রিয়া কয়েকটি সূক্তে আছে (৪. ২২ ; ৬. ৫৪, ৮৬-৮ ; ৭. ৮৪)। রাজার রক্ষার জন্য পর্ণকাষ্ঠের মাদুলির ব্যবস্থা ছিল (৩. ৫)। হস্তীর শক্তি-বৃদ্ধির সুষ্ঠু উপায়ও ছিল (৩. ২২)। রাজা ও ব্রাহ্মণগণের যশের প্রার্থনা বহু শ্লোকে আছে। এগুলিতে রাজা এবং ব্রাহ্মণের বহু প্রশংসা পাওয়া যায় (৬. ৩৯. ৫৮, ৬১, ৬৯)।

৭ ব্রাহ্মণ-সম্পর্কীয় সূক্ত

অথর্ববেদে ব্রাহ্মণদিগের মর্যাদা ও স্বার্থসংরক্ষণের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা 'দেব' আখ্যা গ্রহণ করিয়া নিজেদের মর্যাদা সুরক্ষিত

করিয়াছেন দেখা যায়। ব্রাহ্মণেরাই দেবতা ও মানবসমাজের মধ্যবর্তী; তাঁহাদিগের পৌরোহিত্য বা প্রতিনিধিত্বেই সাধারণে দেবতাদিগের নিকট নিজেদের ইহলৌকিক অথবা পারত্রিক সর্ববিধ মঙ্গলামঙ্গলের আবেদন জানাইতে পারে। রাজাও আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা ও প্রজারক্ষায় সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণের অধীন। সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থ যাহাতে কোনপ্রকারে নষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থাও ছিল। ব্রাহ্মণের পত্নী-লোভী ও ধন-লোভিগণ অতিশয় পাপী ও ঘৃণ্য বলিয়া গণ্য হইত। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যাচারকারীদিগের প্রতিও কঠোর শাস্তির বিধান ছিল (অ. ৫. ১৭-৯; ১২. ৫)।

ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে সাধারণের পূজার্হ করিবার জন্য জ্ঞানচর্চায় পবিত্র জীবন-যাপনে কার্পণ্য করিতেন না। (অ. ৬. ৫৮, ৬৯; ৪. ৩০; ৬. ১০৮; ১৯. ৪, ৪১-৩; ৭. ৫৪, ৬১)।

৮ পৌষ্টিকানি

প্রায় সমস্ত বৈদিক সূক্তকেই ঐশ্বর্য ও আপন্মুক্তির প্রার্থনা বলা যায়। অথববেদে কামনাসিদ্ধির বহু প্রক্রিয়া রহিয়াছে। ইহাতে গৃহনির্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া নির্বিঘ্নে জীবন-যাপনের প্রায় সকল প্রণালীই বর্ণিত আছে। ইহাতে গৃহনির্মাণ (৩. ১২), বজ্রপাত হইতে গৃহরক্ষা (১. ১৩; ৭. ১১; ৭. ৪১), অগ্নিদাহ হইতে গৃহরক্ষা (৬. ২১; ৬. ১০৬), নদীর গতিপরিবর্তন বা নূতন খালে নদী পরিবর্তন (৩. ১৩), ক্ষেত্রকর্ষণ (৩. ১৭), শস্যবৃদ্ধি (৩. ২৪; ৬. ৭৯), শস্য হইতে কীট-নিবারণ (৬. ৫০), অনাবৃষ্টি-নিবারণ (৪. ১৫; ৬. ২২; ৭. ১৮), গবাদি পশুর মঙ্গলকার্য (২. ২৬; ৩. ১৪; ৪. ২১; ৭. ৭৫) প্রভৃতি সংক্রান্ত বহু মন্ত্র-তন্ত্র আছে।

এতদ্ভিন্ন আয়ু, আরোগ্য ও ঐশ্বর্যলাভের জন্য বহু মন্ত্র ও প্রক্রিয়া ইহাতে রহিয়াছে (অ. ১. ১৫; ২. ২৬; ১৯. ১; ৪. ১৩; ৭. ৬৯; ১. ৩১; ৬. ১০)।

আপদ্-নিবারণের মন্ত্রগুলির অধিকাংশই নানারূপ অভিচার-ক্রিয়ার

সহিত সংশ্লিষ্ট (অ. ১. ২৬ ; ৪. ২৩-২৯ ; ৬. ৩, ৪, ৭ ; ৭. ১১২ ; ১১. ২ ; ১৯. ৪৭-৪৯)।

৯ প্রায়শ্চিত্ত

যজ্ঞকার্যে ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা শ্রৌতশাস্ত্রে ভূরি ভূরি আছে। বেদে 'প্রায়শ্চিত্ত' শব্দটি নাই ; অথর্ববেদে 'প্রায়শ্চিত্ত' শব্দটি একবার মাত্র আছে (১৪. ১. ৩০)। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে ইহার অভাব নাই। জ্ঞানত কিংবা অজ্ঞানত কোন পাপকর্ম করিলে তাহার শাস্তি অনিবার্য ; সুতরাং সেই শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। অথর্ববেদে প্রায়শ্চিত্তের বহু মন্ত্র ও ক্রিয়ার কথা আছে। পাপমুক্তি, ঋণমুক্তি, রোগমুক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এগুলিকে বিভক্ত করা যায় (অ. ৬. ১১০-১২১ ; ৬. ৬৩, ৮৪ ; ৬. ১৯ ; ৫১ ; ৩. ২৯ ; ৭. ৮ ; ৬. ৭১ ; ৭. ৫৩৭)।

১০ সৃষ্টিতত্ত্ব ও ব্রহ্মবাদমূলক সূক্ত

অথর্ববেদের সৃষ্টিতত্ত্বমূলক সূক্তগুলির সহিত ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব ও ব্রহ্মবাদমূলক সূক্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে। সাধারণ পুরোহিতের কার্যের সহিত ইহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর এই সকল সূক্তের সবই যে পরবর্তী কালে রচিত তাহাও মনে হয় না। কারণ অন্য ব্যাপারের মন্ত্রেও এসকল কথা আছে (অ. ৪. ১৯ ; ৯. ২)। কয়েকটি সূক্তে (১০. ২ ; ১১. ৮) পুরুষের উৎপত্তি, প্রকৃতি, আকার ও দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—মন্যু (ইচ্ছা) সংকল্পের গৃহ হইতে আকূতিকে (বুদ্ধি) পরিচালন করে ; তপ ও কর্ম পরিণয়ার্থী ; ব্রহ্মই ইহাদের মধ্যে প্রধান। ইহাদের মিলনে আবার মন্যু (প্রাণ, অপান, চক্ষু প্রভৃতি) হইতে পুরুষের উৎপত্তি। অন্যত্র (৯. ২. ৫) আছে, বাক্, বিরাট্ হইতে ব্রহ্মের উৎপত্তি। বিরাট্ই সৃষ্টির মূলপ্রকৃতি। তাঁহার দুই বৎস (সূর্য ও চন্দ্র) জল হইতে উদ্ভূত। আত্মা ও ব্রহ্ম-সম্বন্ধে চরমকথা সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায় (১০. ৮, ৪৩, ৪৪)। এইরূপ নানা মন্ত্রে অথর্ববেদ পরিপূর্ণ।

১১—১৩ বৈদিক কর্মকাণ্ড, ব্যক্তিগত চিন্তামূলক ও বিংশকাণ্ড

বৈতানসূত্রকে অথর্ববেদের শ্রৌতসূত্র বলা যাইতে পারে, কিন্তু বৈতান-সূত্র অত্যন্ত পরবর্তী কালে রচিত; সুতরাং ইহাতে অন্যান্য বৈদিক কর্ম-কাণ্ডের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বৈতানসূত্রে অথর্ববেদের ২০শ কাণ্ড সম্পূর্ণভাবে পুনর্লিখিত হইয়াছে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম কাণ্ডের বহু মন্ত্রও ইহাতে স্থান পাইয়াছে; এইগুলি বৈদিক কর্মকাণ্ডেরই দ্যোতক। বিশেষত অন্যান্য শ্রৌতশাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহাতে নূতন রূপ দেওয়া হইয়াছে। কৌশিকসূত্রের সহিতও ইহার সাদৃশ্য আছে। সুতরাং মূলত অথর্ববেদে এই সূক্তগুলি কর্মকাণ্ডমূলক ছিল বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নয়। অথর্ববেদের কর্মকাণ্ডমূলক সূক্তগুলি অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় পরবর্তী সূত্রগুলি রচিত হইয়াছিল। বৈদিক কর্মকাণ্ডে 'অগ্নিষ্টোম' অন্যতম অনুষ্ঠান। অথর্ববেদের সূক্তে (৬. ৪৭-৪৮) কর্মকাণ্ডের একটা সাধারণ আভাস পাওয়া যায়। বৈতানসূত্রে (২১. ৭) তিন 'সবনের' সহিত ইহা আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু অথর্ববেদের এই সকল সূক্ত অন্যান্য বেদ হইতে বা অন্যান্য বেদের অনুসরণে রচিত কি না সন্দেহ হইতে পারে। একটি সূক্তে (৬. ৪৮) যজুর্বেদের বিধানের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকিলেও অন্যান্য শ্রৌত-বিধির সহিত ইহাতে পার্থক্য আছে। কৌশিকসূত্রে (৫৬. ৪ ; ৫৯. ২৬-২৭) ইহার উল্লেখ আছে। এই সূত্র-গুলির বিষয়বস্তু বিচার করিয়া মনে হয় সবন হইতেই এগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। বহু সূক্তে এইরূপে অন্যান্য বেদের সহিত সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য আছে। সুতরাং অথর্ববেদের সহিত এগুলিকে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট করা যায় না।

এতদ্ভিন্ন অথর্ববেদে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক প্রকার কর্মকাণ্ডের কথা আছে, তাহা 'হবির্যজ্ঞের' সহিত সংশ্লিষ্ট। নানা উদ্দেশ্যে এইরূপ 'হবির্যজ্ঞ' সম্পন্ন হইত। হবির বিশেষণ হইতেই এইরূপ যজ্ঞের উদ্দেশ্য বুঝা যায়।— 'সাংশ্রাব্য হবিঃ' (১. ১৫ ; ২. ২৬ ; ১৯. ১) নৈর্বাধ্য হবিঃ (৬. ৭৫), সমান হবিঃ (৬. ৬৪), যশঃ হবিঃ (৬. ৩৯) ইত্যাদি।

অথর্ববেদের একটি বৃহৎ অংশ (১৩শ কাণ্ড—১৮শ কাণ্ড) সম্পূর্ণ

পৃথক্ ব্যাপারমূলক। ১৩শ কাণ্ডে রোহিতের (সূর্য দেবতা) উদ্দেশ্যে চারিটি সুদীর্ঘ স্তোত্র আছে। ইহাতে সূর্যকে বিশেষভাবে আথর্বগণের হিতকারী বলা হইয়াছে। এই কাণ্ডের নাম রোহিতকাণ্ড।

১৪শ কাণ্ডকে আথর্বগণের বিবাহ কাণ্ড বলা যায়। ঋগ্বেদের সূর্য-সূক্তের (ঋ. ১০. ৮৫) সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে, ইহাতে অতিরিক্ত অনেকগুলি মন্ত্র আছে, সেগুলি ঋগ্বেদে নাই। গৃহ্যসূত্রে এই মন্ত্রগুলি কোথাও কোথাও একটু পরিবর্তিত আকারে আছে।

১৫শ কাণ্ডে ব্রাত্যগণের প্রশংসা আছে। ইহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া সূক্তগুলি রচিত। এখানে ব্রাত্য বলিলে কি বুঝায় সায়ণ ও হুইট্‌নী[১] তাহা বুঝান নাই। তবে ব্রাত্যগণ যে উপনয়ন-সংস্কার-বর্জিত স্মৃত্যুল্লিখিত আর্য নয় তাহা স্থির। ব্রাত্যেরা আর্য ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিল না। ইহারা অপবিত্র, অর্ধসভ্য ছিল (পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণ ১৭. ১. ২)। ব্রাত্যস্তোমের দ্বারা ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ-সমাজে গ্রহণ করা হইত (পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণ ১৭. ১; লাট্যায়ন-শ্রৌতসূত্র ৮. ৬)। অথর্ববেদে ইহারা ব্রহ্মচারী (১১. ৫), ইহাদের ব্রাহ্মণ্যে দীক্ষার আভাসও আছে (অথর্ব ১৫. ২) এই কাণ্ডে বহু সাম-মন্ত্র স্থান পাইয়াছে।

১৬শ কাণ্ডের দুইটি অংশ। প্রথম অংশে (১ম অনুবাক) জলের স্তুতিমূলক মন্ত্র আছে; অথর্ব-পরিশিষ্টে (১০) এইগুলিকে 'অভিষেক মন্ত্র' বলা হইয়াছে। অন্য অংশে (৫-৯) স্বপ্নভ্রমণ-নিবারক মন্ত্র আছে।

১৭শ কাণ্ড বিশেষভাবে 'আয়ুষ্যাণি'র সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহাতে (বিষাসহির উদ্দেশ্যে) একটি সূক্ত আছে।

১৮শ কাণ্ডের চারিটি সূক্ত (চারি-অনুবাক) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ামূলক। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সূক্তের সহিত এইগুলির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ইহার নাম যমকাণ্ড—অমঙ্গলপ্রদ বলিয়া বৈদিকগণ ইহা অভ্যাস করেন না।

১৯শ কাণ্ডে ৭২ সূক্ত। ইহার ২৩শ সূক্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, ১৮শ কাণ্ড পর্যন্ত প্রথমে অথর্ববেদ ঈরিত হইয়াছিল। এই সূক্ত প্রকারান্তরে অথর্ববেদের সূচীর সন্ধান দিয়াছে এবং আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র পদ্ধতিক্রমে অথর্ববেদের ঋষিগণের (অর্থাৎ সূক্তগুলির) বর্ণনা করিয়াছে। শতর্চী,

মাধ্যম, ক্ষুদ্রসূক্ত ও মহাসূক্ত—আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রপদ্ধতি। ২৩শ ও ২২শ সূক্তের বচন যথাক্রমে এইরূপ—

আথর্বণানাং চতুর্ঋচেভ্যঃ স্বাহা।১। পঞ্চর্চেভ্যঃ স্বাহা।২। ষড়ৃচেভ্যঃ স্বাহা।৩। সপ্তচেভ্যঃ স্বাহা।৪। অষ্টর্চেভ্যঃ স্বাহা।৫। নবর্চেভ্যঃ স্বাহা।৬। দশর্চেভ্যঃ স্বাহা।৭। একাদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৮। দ্বাদশর্চেভ্যঃ স্বাহা।৯। ত্রয়োদশর্চেভ্যঃ স্বাহা।১০। চতুর্দশর্চেভ্যঃ স্বাহা।১১। পঞ্চদশর্চেভ্যঃ স্বাহা।১২। ষোড়শর্চেভ্যঃ স্বাহা।১৩। সপ্তদশর্চেভ্যঃ স্বাহা।১৪। অষ্টাদশ-র্চেভ্যঃ স্বাহা।১৫। একোনবিংশতিঃ স্বাহা।১৬। বিংশতিঃ স্বাহা।১৭। মহৎকাণ্ডায় স্বাহা।১৮। তৃচেভ্যঃ স্বাহা। ১৯। একর্চেভ্যঃ স্বাহা।২০। ক্ষুদ্রেভ্যঃ স্বাহা।২১। একদৃচেভ্যঃ স্বাহা।২২। রোহিতেভ্যঃ স্বাহা।২৩। সূর্যাভ্যাং স্বাহা।২৪। ব্রাত্যাভ্যাং স্বাহা।২৫। প্রাজাপত্যাভ্যাং স্বাহা।২৬। বিষাসহ্যৈ স্বাহা।২৭। মঙ্গলিকেভ্যঃ স্বাহা।২৮। ব্রাহ্মণে স্বাহা।২৯।

আঙ্গিরসানামাদ্যৈঃ পঞ্চানুবাকৈঃ স্বাহা।১। ষষ্ঠায় স্বাহা।২। সপ্ত-মাষ্টমাভ্যাং স্বাহা।৩। নীলনখেভ্যঃ স্বাহা। ৪। হরিতেভ্যঃ স্বাহা।৫। ক্ষুদ্রেভ্যঃ স্বাহা।৬। পর্যায়িকেভ্যঃ স্বাহা।৭। প্রথমেভ্যঃ সঙ্খেভ্যঃ স্বাহা।৮। দ্বিতীয়েভ্যঃ সঙ্খেভ্যঃ স্বাহা।৯। তৃতীয়েভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা।১০। উপোত্তমেভ্যঃ স্বাহা।১১। উত্তমেভ্যঃ স্বাহা।১২। উত্তরেভ্যঃ স্বাহা।১৩। ঋষিভ্যঃ স্বাহা।১৪। শিখিভ্যঃ স্বাহা।১৫। গণেভ্যঃ স্বাহা।১৬। মহাগণেভ্যঃ স্বাহা।১৭। সর্বেভ্যোঽঙ্গিরোভ্যো বিদগণেভ্যঃ স্বাহা।১৮। পৃথক্‌সহস্রাভ্যাং স্বাহা।১৯। ব্রহ্মণে স্বাহা।২০।

অর্থাৎ আথর্বগণের চারি ঋকে গ্রথিত ঋষিগণের (=সূক্তসমূহের) প্রতি স্বাহা। পাঁচ ঋকে গ্রথিত ঋষিগণের প্রতি স্বাহা। ক্রমশ এইরূপ ১৮শ ঋকে গ্রথিত ঋষিগণের প্রতি স্বাহা। অতঃপর, ১৯শ ও ২০শের প্রতি স্বাহা। পুনরায়, তিন ঋকে গ্রথিত। এক ঋকে গ্রথিত, ক্ষুদ্র, এক হইতে ন্যূন ঋকে গ্রথিত মহাকাণ্ডের প্রতি স্বাহা। প্রথম ১২শ কাণ্ডকে উপলক্ষ্য করিয়া এই বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। কেন না, তার পরের পাঁচটি তাহাদের নাম ও সংখ্যাক্রমে বিবৃত হইয়াছে। যথা—রোহিতসূক্তের প্রতি স্বাহা

(১৩শ), সূর্যার (২) সূক্তের প্রতি স্বাহা (১৪শ), দুই ব্রাত্যসূক্তের প্রতি (১৫শ), দুইটি প্রজাপতি সূক্তের প্রতি (১৬), দুইটি বিষাসহি সূক্তের প্রতি (১৭), মাঙ্গলিক সূক্তের প্রতি (১৮শ) স্বাহা। ব্রাত্য ও প্রজাপতি সূক্তের দ্বিসংখ্যা এই কাণ্ডগুলিতে নিবদ্ধ বর্তমান সূক্তসংখ্যার সহিত সমঞ্জস নয়। কিন্তু অন্যান্য কাণ্ডের সংখ্যার মিল থাকায় সম্ভবত ১৯শ কাণ্ড সংযোজিত হইবার পর এই দুই কাণ্ডের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। হুইটনী বলেন, এই (১৯শ) কাণ্ডের সূক্তগুলি পিপ্পলাদ-শাখার অন্যকাণ্ডে চলিয়া গিয়াছে। ব্লুমফীল্ড[6] বলেন, বৈতানসূত্র-মতে সোমযাগে শস্ত্র ও স্তোত্ররূপে ঈরিত হইত বলিয়া কুন্তাপ-সূক্ত ব্যতীত ২০শ কাণ্ডের সমস্ত সূক্তই ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। মোটের উপর অন্যূন ১২০০ অথর্বমন্ত্র ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত।

২০শ কাণ্ডে সর্বশুদ্ধ ১৪৩টি সূক্ত আছে। এগুলির মধ্যে মাত্র ১৩টি সূক্তে আথর্ব-বৈশিষ্ট্য আছে (২, ৪৮, ১২৭-৩৩ ; ও ৩৪ সূক্তের ১২, ১৬ ও ১৭ ঋক্, ১০৭ সূক্তের ১৩ ঋক্)। কুন্তাপ-সূক্তগুলির (১২৭-১৩৬) বৈশিষ্ট্য আছে। পৈপ্পলাদ-শাখায় এতগুলির কোন উল্লেখ নাই। উপরি-উক্ত সূক্তগুলি ভিন্ন অন্য প্রায় সূক্তই ইন্দ্রের স্তুতি-বিষয়ক এবং ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডল হইতে গৃহীত ; অবশ্য স্থানে স্থানে একটু-আধটু পরিবর্তন আছে। এই কাণ্ড শস্ত্রকাণ্ড নামে অভিহিত।

শৌনকীয়-সংহিতার ২০শ কাণ্ডের সূক্তগুলি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। আর এই কাণ্ডটি প্রথমে অথর্বসংহিতায় ছিল না, পরে সংযোজিত হইয়াছে। আর ১৯শ কাণ্ডটি মূলত সংহিতার অন্তর্গত ছিল না। এ ছাড়া অথর্ববেদ-সংহিতার সূক্তগুলির প্রায় ⅐ অংশ ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। অধিকন্তু অথর্ববেদে যতগুলি ঋক্ ঋগ্বেদের ঋকের সহিত অভিন্ন সেগুলি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশিষ্ট ঋক্গুলির অধিকাংশ ১ম ও ৮ম মণ্ডলে পাওয়া যাইবে। ১৯শ ও ২০শ কাণ্ড বাদ দিয়া ১৮টি কাণ্ডে সূক্তগুলি বেশ বিশিষ্ট পদ্ধতিতে অতি সাবধানে সাজান হইয়াছে। প্রথম সাতটি কাণ্ডের প্রত্যেক সূক্তে চারিটি করিয়া ঋক্ আছে, দ্বিতীয় কাণ্ডের কোন সূক্তে ৮টির কম অথবা ১৮টির বেশী ঋক্ নাই। ৬ষ্ঠ

কাণ্ডে ১৪২টি সূক্ত এবং প্রত্যেক সূক্তে প্রায়ই তিনটি করিয়া ঋক্। ৭ম কাণ্ডে ১১৮টি সূক্ত আছে—তন্মধ্যে অধিকাংশতেই ১টি বা দুটি ঋক্।

৮ম কাণ্ড হইতে ১৪শ কাণ্ড, ১৭শ ও ১৮শ কাণ্ডের সূক্তগুলি সবই খুব দীর্ঘ, তবে ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতম ঋক্ ৮ম কাণ্ডের ১ম সূক্তে এবং বৃহত্তম ঋক্ ১৮শ কাণ্ডের ৪র্থ সূত্রে। ৮ম কাণ্ডের ১ম সূত্রের ঋক্ সংখ্যা ২১ এবং ১৮শ কাণ্ডের ৪র্থ সূত্রের ঋক্ সংখ্যা ৮৯। ১৫শ কাণ্ড ও ১৬শ কাণ্ডের বেশীর ভাগ গদ্যে ব্রাহ্মণগ্রন্থের সদৃশ ভাষা ও পদ্ধতিতে রচিত।

এইতো গেল ঋক্‌সংখ্যা-সন্নিবেশের কথা। ঋক্‌গুলির বিষয়-সন্নিবেশ সম্বন্ধেও একটা প্রণালীর সন্ধান পাওয়া যায়। ২, ৩, ৪, এমন কি অধিক সূক্ত যখন একই বিষয়ের হয় তখন প্রায় দেখা যায় সেগুলি পাশাপাশি বসিয়া থাকে।

কাণ্ডের মধ্যে আবার তিনটি প্রধান বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। (১) ১ম হইতে ৬ষ্ঠ কাণ্ড—৭ম কাণ্ডে ইহাদের পরিশিষ্ট প্রদত্ত হইয়াছে: এই সাতটি কাণ্ডের বিষয়বস্তু নানা রকমের এবং ইহাদের সূক্তগুলি ছোট-ছোট। (২) ৮ম হইতে ১২শ কাণ্ড; ইহাদেরও বিষয়বস্তু নানাবিধ—কিন্তু এগুলির সূক্তসমূহ দীর্ঘ এবং (৩) ১৩শ হইতে ১৮শ কাণ্ড—১৯শ কাণ্ডে ইহাদের পরিশিষ্ট সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৩শ কাণ্ড হইতে ১৮শ কাণ্ড পর্যন্ত প্রত্যেক কাণ্ডের বিষয়বস্তু কোন একটি বিশিষ্ট প্রকরণ-সম্বন্ধে রচিত। যেমন ১৩শ কাণ্ড রোহিত-কাণ্ড (লোহিত সূর্যের সম্বোধন আছে বলিয়া) ১৪শ কাণ্ড—বিবাহ-কাণ্ড; ইহাতে কেবল বিবাহ-বিষয়ক স্তুতি। ১৫শ—ব্রাত্যকাণ্ড।। ১৮শ কাণ্ড—যমকাণ্ড, ইহা মৃত সৎকার-সম্বন্ধীয় সূক্ত। ১৬শ কাণ্ড—দুঃস্বপ্ন বিষয়ে রচিত। ১৭শ কাণ্ড—বিষাসহি সম্বোধনে লিখিত।

১৪ কুন্তাপ-সূক্ত

অথর্ববেদের ২০শ কাণ্ড (১২৭-৩৬) কুন্তাপসূক্ত। এই সূক্তগুলি ঋগ্বেদীয় শাকল সংহিতায় নাই। এগুলি পরে যজ্ঞার্থে ঋগ্বেদের অন্য কোন

শাখা হইতে সংযোজিত হইয়া থাকিবে। সায়ণ বলেন যে, ইহা খিলসূক্ত। একমাত্র যাগ-ব্যাপারের জন্যই যে এইগুলির প্রয়োজন হইত তাহা ঐতরেয় (৬.৩২, ৩৩) ও কৌষীতকি (৩০.৫) হইতে জানিতে পারা যায়। ঐতরেয়ে কুন্তাপ শব্দ ব্যবহার হয় নাই, কিন্তু কৌষীতকিতে হইয়াছে। ঐতরেয়ে নারাশংস, রৈভি, কারব্যা পরিক্ষিতিয়া প্রভৃতির নাম কুন্তাপ সম্পর্কে উল্লিখিত আছে। গোপথ-ব্রাহ্মণেও ইহাই কুন্তাপের ব্যাখ্যারূপে একটু-আধটু পরিবর্তন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।

গোপথ-ব্রাহ্মণ

গোপথ-ব্রাহ্মণের দুই ভাগ—পূর্ব-ব্রাহ্মণ ও উত্তর-ব্রাহ্মণ। পূর্ব-ব্রাহ্মণের পাঁচটি প্রপাঠক এবং উত্তর-ব্রাহ্মণের ছয়টি প্রপাঠক। পূর্ব-ব্রাহ্মণ ভাগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের রীতি অনুসরণ করে নাই। ইহাতে উপনিষদে বর্ণিতব্য বিষয়ের অবতারণা অত্যন্ত অধিক। কোন কোন অংশ সম্পূর্ণভাবে উপনিষদের প্রকৃতি ধারণ করিয়াছে; গোপথ-ব্রাহ্মণের একটি অংশ (১.১.১৬-৩০) সম্পূর্ণভাবে প্রণবোপনিষদের সমতুল্য। এক স্থলে ইহা উপনিষদ্ নামের দাবী করিতেছে (১.১.৩১-৩৮)। বৈতান-সূত্র কিংবা অন্য কোন শ্রৌতগ্রন্থের সহিত কর্মকাণ্ডাদি বিষয়ে ইহার কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না।

পূর্ব-ব্রাহ্মণের প্রথম প্রপাঠকের কয়েকটি মন্ত্রে (১.১.১-১৫) সৃষ্টি-তত্ত্বের কথা আছে; ইহা প্রায় উপনিষদের প্রকৃতি-সম্পন্ন। ইহাতে ব্রহ্মের ধর্ম হইতে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের উৎপত্তির কথা আছে। এই প্রপাঠকের অন্য অংশে (১.১.১৬-৩০) প্রণব অর্থাৎ 'ওম্' হইতে বিশ্বসৃষ্টির কথা আছে। অপর একটি অংশে গায়ত্রী-মাহাত্ম্য আলোচিত হইয়াছে (১.১.৩১-৩৮)।

১.১.৩৯ আচমন-বিধি। ইহাকে বৈতান (১.১৯) ও কৌশিক-সূত্রের (৩.৪; ৯.২২) টিপ্পনী বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রপাঠকে ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা আছে (১.২.১-৯)। ইহাতে বহু বিষয়ের অবতারণা আছে; অগ্ন্যাধেয় (১.২.

১৮-২১), সান্তপন (১ . ২. ২২-২৩), ব্রহ্মৌদন (১ . ২. ১৫-১৭) প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

তৃতীয় প্রপাঠকেও (১ . ৩ , ১-৫) অথর্বগণের ও অঙ্গিরোগণের প্রশংসা আছে। কোন কোন স্থলে তাহাদিগকে 'দেব' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে (১ . ৩ . ১)। কয়েক স্থলে (১ . ৩ . ৬-১০) পূর্ণিমা ও অমাবস্যা যজ্ঞের রহস্যময় ব্যাখ্যাও আছে। অধিকন্তু এই প্রপাঠকে অগ্নিহোত্র (১ . ৩ . ১১-১৬), অগ্নিষ্টোম ও দীক্ষা (১ . ৩ . ১৭-২৩) প্রভৃতি বিষয় আছে।

চতুর্থ প্রপাঠকে বাৎসরিক সত্রের রহস্যময় ব্যাখ্যা। পঞ্চম প্রপাঠকের প্রথম অংশ (১ . ৫ . ১-২২) সত্র-সম্বন্ধীয়, অন্য অংশ (১ . ৫ . ২৩-২৫) যজ্ঞ-সম্বন্ধীয়।

উত্তরব্রাহ্মণের নাম যজ্ঞকর্ম বলা যাইতে পারে। ইহাতে প্রথম প্রপাঠকে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা যাগ (২ . ১ . ১-১২), কাম্যেষ্টি (২ . ১ . ১৩-১৬), আগ্রায়ণ, অগ্নিচয়ন, চাতুর্মাস্য (২ . ১ . ১৭-২৬) প্রভৃতি বিষয় আছে। দ্বিতীয় প্রপাঠকে অগ্নিষ্টোমের তনূনপ্ত্র ক্রিয়া, (২ . ২ . ১-৪), প্রবর্গ্য কর্ম (২ . ২ . ৫-৬) উপসদদিন ও অগ্নিষ্টোম (২ . ২ . ৭-১২), স্তোমভাগমন্ত্র (২ . ২ . ১৩-১৫) প্রভৃতি আছে।

তৃতীয় প্রপাঠকে অগ্নিষ্টোম, বষট্‌কার, অনুবষট্‌কার, ঋতুগ্রহ (২. ৩. ১-১১), একাহের প্রাতঃসবন (২. ৩. ১২-১৯), মাধ্যন্দিন সবন (২. ৩. ২০-২, ৪. ৪) প্রভৃতি বিষয় আছে।

চতুর্থ প্রপাঠকে মাধ্যন্দিন সবন (২. ৪. ১-৪), তৃতীয় সবন (২. ৪. ৫-১৮), ষোড়শি-যাগ প্রভৃতি বিষয় আছে।

পঞ্চম প্রপাঠকে অতিরাত্র-কর্ম (২. ৫. ১-৫), সৌত্রামণী, বাজপেয়, অপ্তোর্যাম-কর্ম (২. ৫. ৬-১০), অহীনসত্র-যজ্ঞ (২. ৫. ১১-২, ৬. ১৬) প্রভৃতি বিষয় আছে।

ষষ্ঠ প্রপাঠকে অহীন-যজ্ঞের বিষয় বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে।

ছন্দ

অথর্ববেদের মূল ভাগের ছন্দ অন্যান্য বৈদিক ছন্দের মত। স্বল্প পরিসর ঋকে গায়ত্রী, অনুষ্টুভ, পংক্তি, এবং দীর্ঘপরিসর ক্ষেত্রে ত্রিষ্টুভ ও জগতীছন্দ

অনুবর্তিত হইয়াছে। শৌনকীয়-শাখার গ্রন্থের ১৫শ কাণ্ড এবং ১৬শ কাণ্ডের প্রায় সমস্তই গদ্যে রচিত। বিশেষত এই দুই কাণ্ডে গদ্য ও পদ্য স্থানে এমনভাবে মিশ্রিত হইয়াছে যে, তাহা গদ্যে কি পদ্যে রচিত তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই ভগ্ন ছন্দের ও নানা ছন্দের মিশ্রণ দেখা যায়; ইহাতে মনে হয়, পরবর্তী কালে রচিত কোন কোন অংশ মূল রচনার সহিত মিশাইয়া দেওয়ায় এই বিকৃতি ঘটিয়াছে। কোন কোন সূক্তের (১. ১৩; ১. ১৮; ২. ২৯; ৪. ১৬ প্রভৃতি) অনুষ্টুভে আরম্ভ ও ত্রিষ্টুভে শেষ হইয়াছে। কোন কোন স্থলে অনুষ্টুভ ও গায়ত্রীর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে (২. ৩২; ৪. ১২)। বিবাহ-সূক্ত ও শ্রাদ্ধসূক্ত বৈদিক অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত। ঋগ্বেদের অনুষ্টুভ ছন্দের রীতি অথর্ববেদের অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয় নাই। পরন্তু গৃহ্যসূত্রের ছন্দোরীতির সহিত অথর্ববেদের ছন্দোরীতির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে অথর্ববেদ-সংহিতা ব্রাহ্মণের ভাষা ও রীতিতে রচিত।

অথর্ববেদের সহিত অন্যান্য বেদ ও বৈদিক মন্ত্রের সাদৃশ্য

অথর্ববেদের কাণ্ডগুলির প্রায় সপ্তমাংশের সহিত ঋগ্বেদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বিশেষত ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল হইতে ইহার প্রায় অর্ধেক বিষয়বস্তু গৃহীত হইয়াছে। সাদৃশ্যমূলক অংশগুলির মধ্যে সূর্য-সূক্ত (অ. ১৪) ও শ্রাদ্ধসূক্ত (অ. ১৮) ভিন্ন প্রায় সমস্ত মন্ত্রগুলিই ঋগ্বেদের অনুযায়ী।

যজুর্বেদের বিষয়বস্তুর সহিত বহুস্থলে অথর্ববেদের সাদৃশ্য থাকিলেও কোন্‌টির বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী তাহা বলা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৈত্রায়ণি-সংহিতা (১. ৫. ২) ও আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রের অগ্নিসম্বন্ধীয় পাঁচটি মন্ত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অথর্ববেদে (২. ১৯) এই পাঁচটি ছাড়াও এই সঙ্গে একই ভাবে বায়ু, সূর্য, চন্দ্র ও অপ্‌-সম্বন্ধে চারিটি সূত্র আছে। এইরূপে মৃগারসূক্তগুলিতে (অ. ৪. ২৩-৯) যজুর্বেদের মন্ত্র আছে।

শ্রৌতসূত্র এবং অথর্ববেদের এমন কয়েকটি বিষয় আছে যে, তাহাদের সহিত ঋগ্বেদ কিংবা যজুঃ-সংহিতার কোন সাদৃশ্য নাই। এই সকল বিষয়ে শ্রৌতসূত্র ও অথর্ববেদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়,

অথর্ববেদের ২. ৬ সূক্ত বাজসনেয়ি-সংহিতা (২৭. ১), তৈত্তিরীয়-সংহিতা (৪. ১. ৭. ১ ই.), ও মৈত্রায়ণি-সংহিতায় (২. ১২. ৫) আছে; অবশ্য দুই-এক স্থলে যে পাঠান্তর নাই তাহা নয়।

অথর্ববেদের ঋষি

পূর্বোল্লিখিত ১৯শ কাণ্ডের ২৩শ সূক্ত নিশ্চয়ই পরে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে কোন সূক্তের ঋষির উল্লেখ নাই, কেবল সাধারণভাবে আথর্বণ সংজ্ঞাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। দেখা যায়, পরে এই সংজ্ঞা অথর্ববেদে ঋষিগণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে এই ঋষিগণকে আথর্বণ এই সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পাণ্ডুরঙ পণ্ডিত-প্রকাশিত সায়ণ-ভাষ্যে এক-একটি সূক্তের ঋষি-নাম প্রদত্ত হয় নাই। অজমের-সংস্করণেও কোন ঋষির নাম নাই। গোপথ-ব্রাহ্মণের প্রারম্ভে একটি আখ্যায়িকা আছে। এই আখ্যায়িকানুসারে ব্রহ্মা প্রথমে তাঁহার ঘর্ম হইতে ভৃগুকে সৃষ্টি করেন; ভৃগু অথর্বা হইলেন এবং অথর্বা অঙ্গিরা হইলেন। এই অথর্বা তপ সাধন করিলেন এবং বিংশতি আথর্বণ ঋষি উৎপন্ন হইল। এক সূক্ত, দুই সূক্ত ও ততোধিক সূক্তের ঋষিগণ উৎপন্ন হইলেন। ইঁহারা সকলে আঙ্গিরস-মন্ত্র দর্শন করিলেন। ঋষিগণের সংখ্যা ২০ হওয়ায় বেদও ২০টি কাণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল। এই আখ্যায়িকায় বর্ণিত ব্যাপারের যাথার্থ্যও স্বীকার করিতে পারা যায় না। কেন না ২০ কাণ্ডের প্রত্যেকটি এক-একটি ঋষির নয়, মহামতি ব্লুমফীল্ডও ইহা পরবর্তী কালের বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আখ্যায়িকাটি কিন্তু গোপথ-ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ইহাও পরবর্তী যুগের। কিন্তু সর্বানুক্রমণী গোপথ-ব্রাহ্মণের আরও পরবর্তী কালের। প্রাচীনতর পঞ্চপটলিকাও গোপথ-ব্রাহ্মণের পরবর্তী। এই পর্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, সূক্তগুলির ঋষিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া আথর্বণ অথবা অথর্বন্ ও আঙ্গিরস এই সাধারণ নামে পরিচিত ছিলেন। মধ্যে মধ্যে ভৃগু ও ব্রহ্মার নাম সংযোজিত হইত। এই দুইটি অনুক্রমণী কোন্ সময়ে রচিত তাহা জানা যায় না। সায়ণের সময়ে এই দুইটির নাম জানা থাকিলে, তাঁহার ভাষ্যে ইহাদের উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত। এই জন্য সায়ণ-ভাষ্যে প্রত্যেক-

সূক্তের ঋষির নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু হুইটনী তাঁহার অথর্ববেদের অনুবাদে সর্বানুক্রমণী হইতে সূক্তের ঋষিগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই ঋষি-নামগুলি উচ্ছোচন, উন্মোচন প্রভৃতি নামের ন্যায় যথেচ্ছভাবে কল্পিত হইয়াছে। এই সূক্তের ঋষিনামগুলি ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। আর এইরূপ হওয়াও স্বাভাবিক। 'শং নো দেবী'-সূক্তকার ঋষির নাম সিন্ধু-দ্বীপ। কিন্তু সর্বত্র এইরূপ হয় নাই, সূক্তের বিষয়বস্তু হইতে ঋগ্বেদেও ঋষি নামের সূচনা করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ পুরুষসূক্তে নারায়ণ ঋষির নাম করা যাইতে পারে। অথবা বিবাহসূক্তের ঋষি সূর্যারও নাম করা যাইতে পারে। এই নামগুলি ঋগ্বেদ ও অথর্ব উভয় বেদেই অভিন্ন। সর্বানুক্রমণীতেও অথর্ববেদের সূক্তকারের নাম করিবার সময় এই পদ্ধতি অনেক সময় অনুসৃত হইয়াছে এবং তদনুসারে ব্রহ্মা, প্রজাপতি, যম প্রভৃতি নামের সহিত সূক্তের নাম সূচিত হইয়াছে। অনুক্রমণীতে উল্লিখিত ঋষিগণের নামের সংখ্যা বড় বেশী নয়। হুইট্‌নী অথর্ববেদের ঋষিদিগের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। ডক্টর রাইডার[7] ও ল্যানম্যান[8] এই তালিকা বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। পরে ১৯৩০ খ্রী. চিন্তামণিবামন বৈদ্য[9] তাহা পুনরায় মিলাইয়াছেন। নিম্নে অথর্ববেদের ঋষিগণের নাম এই সমস্ত সংগ্রহ হইতে প্রদান করা হইল। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্রাত্য-সূক্তের কোন ঋষির নাম প্রদান করা হয় নাই। যমকাণ্ডের ঋষির নাম অথর্বন্। ১৭৫টি সূক্ত অথর্বন্‌কে উদ্দিষ্ট এবং ১০০টি সূক্ত ব্রহ্মার উদ্দেশে ঈরিত। 'অথর্বাঙ্গিরস'-এর উদ্দেশ্যে ১৫টি। ক্রিমিনিবারণ উদ্দেশ্যে ৩টি সূক্তের ঋষি কণ্ব। রমণীর প্রেমলাভের ৩টি সূক্তের ঋষিও কণ্ব। দ্যূতক্রীড়ায় জয়লাভ করিবার জন্য ৪টি সূক্তের ঋষি বাদরায়ণি। বসিষ্ঠ, গৃৎসমপ্রভাদির নাম এই তালিকায় নাই। দুই-একটি সূক্তের ঋষি হইয়াছেন বিশ্বামিত্র ও কশ্যপ। তাঁহারা কিন্তু যাতুসম্বন্ধীয় সূক্তের ঋষি। অথর্ববেদে বিশ্বামিত্রের গায়ত্রীর নাম পাওয়া যায় না। কণ্ব, কক্ষীবান্, পুরুমীঢ়, অগস্ত্য, জমদগ্নি, অত্রি, কশ্যপ ও বামদেব নামক কয়েকটি ঋগ্বেদীয় ঋষির নাম যমকাণ্ডের পিতৃগণের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।[১১]

নিম্নলিখিত ঋষিগণের নাম অথর্ববেদের ভিন্ন ভিন্ন কাণ্ডের সূক্তে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

অগস্ত্য (৬. ১৩৩)।

অঙ্গিরা, অথর্বাঙ্গিরা, প্রত্যঙ্গিরা বা ভৃগ্বঙ্গিরা (১. ১২-৪, ২৫ ; ২. ৩, ৫-১০, ৩৫ ; ৩. ৭ ; ৪.৮, ১১, ৩৯, ১-৮ ; ৫. ১২, ১৪-২২ ; ৬. ১০, ১১-৩, ৭২, ৮৩-৪, ৯১, ৯৪-৬, ১০১, ১২৩-৩২, ১২৭ ; ৭. ৩০-১, ৫০-১, ৭৪, ৭৭, ৯০, ৯৩, ১১৫-৮ ; ৮. ৮ ; ৯.৩, ৮ ; ১০. ১, ২৭, ৩৯ ; ১১. ১০ ; ১৯. ৩-৪, ২২, ৩৪-৫)।

অঙ্গিরা প্রচেতা (৬. ৪৫-৭)।

অথর্বা, বৃহদ্দিব অথর্বা বা সিন্ধুদ্বীপ অথর্বকৃতি (১. ১-৩. ৬, ৯-১১, ১৫, ২০-১, ২৩, ২৭, ৩০, ৩৪-৫ ; ২. ৪, ৭, ১৩, ১৯-২৩, ২৯, ৩৪ ; ৩. ১-৫, ৮, ১০, ১৫-৬, ১৮, ২৬-৭, ৩০; ৪. ৩-৪, ১০, ১৫, ২২, ৩১, ৩৪ ; ৫. ১-৩, ৫-৮, ১১, ২৪, ২৩ ; ৬. ১-৭, ১৩, ১৭-৮, ৩২-৩, ৩৬-৪০, ৫০, ৫৮-৬২, ৬৪-৯, ৭৩-৪, ৭৮-৮০, ৮৫-৯০, ৯২, ৯৭-৯, ১০৯-১৩, ১২৪-৬, ১৩৮-৪০ ; ৭. ১-৭, ১৩-৪, ১৮, ৩৪-৮, ৪৫, ২, ৪৬-৯, ৫২, ৫৬, ৬১, ৭০-৩, ৭৬, ৭৮-৮১, ৮৫-৭, ৯১-২, ৯৪, ৯৭-৯, ১০১-৬ ; ৮.৭, ৯ ; ৯. ১-২ ; ১০. ৩, ৭, ৯ ; ১১. ২-৩, ৭ ; ১২. ১ ; ১৭. ১-৪ ও অবশিষ্ট কা. ; ১৯. ১৪-২০, ২৩-৪, ২৬, ৩৭-৮)।

অথর্বা বীতহব্য (৬. ১৩৬-৭)

অথর্বাচার্য (৮. ১০ ; ১২. ৫ কশ্যপ)।

অপ্রতিরথ (১৯ ১৩)।

আথর্বণ (ভৃগু আথর্বণ ২.৫)।

উপরিবভ্রব (৬. ৩০-১)।

ঋভু (৪.১২)।

কবন্ধ (৬. ৭৫-৭)

কশ্যপ (১০. ১০ ; ১২. ৪-৫)।

কশ্যপ মারীচ (৭. ৬২-৩)

কাঙ্কায়ন (৬. ৭০ ; ১১. ৯)।

কাগ্ব (২. ৩১-২ ; ৫. ২৫)।

কাপিঞ্জল (২. ২৯ ; ৭. ৯৫-৬)।

কুৎস (১০.৮)।

কৌরুপথি (৭. ৫৮ ; ১০. ১৮)

কৌশিক (৬. ৩৫, ১৭-১২ ; ১০. ৫, ২৮-৩৫)।

গরুৎমা (৪. ৬-৭ ; ৫. ১৩ ; ৬. ১২, ১০০ ; ৭. ৫৮ ; ১০. ৪)।

গার্গ্য (৬. ৪৯ ; ১৯. ৭, ৮)।

গোপথ (১৯. ২৫, ৪৭-৮, ৫০)।

গোপথ ভরদ্বাজ (১৯. ৪৯)।

চতন (১. ৭-৮, ১৬, ২৮ ; ২.১৪, ১৮, ২৫ ; ৪. ৩৬ ; ৫. ২৯ ; ৬ ৩২, ১-২, ৩৪; ৭. ৩-৪)।

জগদ্বীজং পুরুষ (৩. ৬)।

জটিকায়ন (৬. ৩৩, ১১৬)।

জমদগ্নি (৬. ৩৯, ১০২)।

ত্বষ্টা (৬ ৮১)।

দ্রবিণোদাঃ (১. ১৮)।

ধ্রুবহন (৬. ৬৩)।

নারায়ণ (১০. ২ ; ১৯. ৬)।

পতিবেদন (২, ৩৬)।

প্রজাপতি (২. ৩০ ; ৪. ৩৫ ; ৬. ১১ ; ৭. ১০২ ; ১৬.১ ; ১৯. ৪৬)।

প্রমোচন (৬. ১০৬)।

প্রশোচন (৬. ১০৪)।

প্রস্কণ্ব (৭. ৩৯-৪৪ ; ৪৫-১)।

বভ্রুপিঙ্গল (৬. ১৪)।

বাদরায়ণি (৪. ৩৭-৮ ; ৭. ৫৯, ১০৯)।

বৃহৎসেছকন্ (৬. ৫৪ তু. শক্র)।

বিহব্য (১০. ৫, ৪২-৫০ অথর্বা)।

বেণ (২. ১ ; ৪. ১-২)।

বেণ শিস্তাতি (১. ৩৩ ; ৪. ১৩ ; ৬. ১০, ১৯, ২১-৪, ৫১, ৫৬-৭, ৯৩, ১০৭ ; ৭. ৬৮-৯ ; ১১.৬)।

শন্তু (২. ২৮)।

শিস্তাতি (১. ৩৩ ; ৪. ১৩ ; ৬. ১০, ২১-৪, ৫১, ৫৬-৯, ৯৩, ১০৭ ; ৭. ৬৮-৯ ; ১১.৬)।

শুক্র (২. ১১ ; ৪. ১৭-৯, ৪৯ ; ৫.১৪, ৩১ ; ৬. ১৩৪-৫ ; ৭. ৬৫ ; ৮. ৫, ১২, ৮)।

শুনঃশেপ (৬. ২৫ ; ৭. ৮৩)।

শৌনক (৬. ১৬ ; ৭. ৬, ১০৮ ; ৮.৫)।

সাবিত্রি (২. ২৬ ; ১৯.৩১)।

সবিতা সূর্যা (১৪ কা.)।

সিন্ধুদ্বীপ (১. ৪-৫ ; ৭. ৩৯ ; ১০. ৫, ৭-২৪ ; ১৯ ২)।

সিন্ধুদ্বীপ অথর্বাকৃতি (১. ৬ অথর্বা)।

অথর্ববেদের বিভাগ

কাণ্ড-সূক্ত-ঋক্

কাণ্ড	সূক্ত	ঋক্
১	৩৫	১৫৩
২	৩৬	২০৭
৩	৩১	২৩১
৪	৪০	৩২৪
৫	৩০	৩৭৬
৬	১৪২	৪৫৪
৭	১১৮	২৮৬
৮	১০	২৫৯

কাণ্ড	সূক্ত	ঋক্
৯	১০	৩০২
১০	১০	৩৫০
১১	১০	৩১৩
১২	৫	৩০৪
১৩	৪	১৮৮
১৪	২	১৩৯
১৫	১৮	১৪১
১৬	৯	৯৩
১৭	১	৩০
১৮	৪	২৮৩
১৯	৭২	৪৫৬
২০	১৪৩	৯৪১

কাণ্ড-অনুবাক-প্রপাঠক

কাণ্ড	অনুবাক	প্রপাঠক
১	৬	২
২	৬	৪
৩	৬	৬
৪	৮	৯
৫	৬	১২
৬	১৩	১৫
৭	১০	১৭
৮	৫	২১
৯	৫	২১
১০	৫	২৩
১১	৫	২৫
১২	৫	২৭

কাণ্ড	অনুবাদ	প্রপাঠক
১৩	৪	২৮
১৪	২	২১
১৫	২	৩০
১৬	২	৩১
১৭	১	৩২
১৮	৪	৩৪
১৯	৭	৩৪
২০	৯	৩৪

অথর্ববেদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব[১২]

অথর্ববেদের সূক্তগুলির অধিকাংশই অভিচারমন্ত্র হওয়ায় অতি অল্প সূক্ত হইতেই ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 'ভৃগুং হিংসিত্বা সৃঞ্জয়া বৈতহব্যা পরাভবন্' (৫. ১৯) এইরূপ মন্ত্রের নিদর্শন অতি অল্পই আছে। তবে এইরূপ মন্ত্র হইতে প্রাচীন ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতির যুগের সামাজিক অবস্থা-সম্বন্ধে অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। একটি মন্ত্রে (৫. ২২) দেখা যায়, আর্যগণ তক্মন্ নামক জ্বরের বিরুদ্ধে মগধ ও অঙ্গ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তক্মন্‌কে পূর্বাঞ্চলে মগধ ও অঙ্গরাজ্যে এবং গান্ধার ও মুজবান্ পর্বত অতিক্রম করিয়া বাহিরে বাল্হিকে যাইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, সে যুগে আর্যদিগের রাজ্য পশ্চিমে গান্ধার হইতে পূর্বে অঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সূক্তটি হইতে ইহাও দেখা যায়, মুজবান্ পর্বতের পরে বাল্হিক। সুতরাং সম্ভবত গান্ধারও আর্যরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তক্মনের উল্লেখ হইতে স্থির করা যায় যে, আর্যদিগের রাজ্যে তখন জ্বরের প্রকোপ ছিল; এই রোগকেই আর্যরাজ্যের বাহিরে ইহার স্বভূমি মুজবান্, বাল্হিক ও মহাবৃষে বিতাড়নের ব্যবস্থা হয়। (মহাবৃষ কোথায় জানা যায় না, তবে বর্তমান বল্খ্‌ই প্রাচীন বাল্হিক) "ওকো অস্য মুজবন্ত ওকো অস্য মহাবৃষাঃ। যাবজ্জাতস্তক্মংস্তাবানসি বল্হিকেষু ন্যোচরঃ ॥—অ. ৫. ২২. ৫। একটি

মন্ত্রে (৫. ২২. ৭) পাওয়া গিয়াছে, এক জন স্থূলদেহা শূদ্রা রমণীকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে কম্পিতা করিবার জন্য তক্‌মন্‌কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

'তক্মন্ম্ জবতো গছ বল্‌হিকান্বা পরস্তরাম্।
শূদ্রামিছ প্রফর্বং তাং তক্‌মন্বীব ধূনুহি ॥'

—অ. ৫. ২২. ৭।

ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, ভারতীয় আর্যগণের রাজ্যে আর্যগণের অপেক্ষা শূদ্রদিগের মধ্যে এই ম্যালেরিয়া জাতীয় জ্বরের প্রকোপ ছিল বেশী।

উপরোক্ত মন্ত্র ও অন্যান্য কয়েকটি মন্ত্র হইতে জানিতে পারা যায়, তৎকালে ভারতীয় জাতি চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তিনটি উচ্চশ্রেণী 'আর্য' নামে অভিহিত হইত। চতুর্থ শ্রেণী, ইতর শ্রেণী এবং এই শ্রেণীর নাম শূদ্র। অবশ্য আর্যগণ শূদ্রদিগকে অযথা উৎপীড়ন বা অবজ্ঞা করিত না। '(প্রিয়ং সর্বস্য উত শূদ্র উত আর্যে'—১৯. ৬)। ৪. ২২ সূক্তে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উল্লেখ আছে এবং উহাতে এই দুই শ্রেণীকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। বিশ্‌গণ চাষী আর্য এবং ইহারাই প্রজাসাধারণ; এক জন ক্ষত্রিয় ইহাদিগের নৃপতি এবং তিনি ইহাদিগকে শাসন করেন। কয়েকটি সূক্তে ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি সূক্তে (৫. ১৯) দেখা যায়, এই সময় ব্রাহ্মণগণ নৃপতিগণকর্তৃক উৎপীড়িত ও ঘৃণিত হইতেন। কিন্তু যে সমুদয় নৃপতি বা জাতি ব্রাহ্মণদিগের উপর অত্যাচার করিত তাহারা সমৃদ্ধিলাভ করিত না। 'উগ্রো রাজা মন্যমানো ব্রাহ্মণং যো জিঘৎসতি। পরাবৎসিচ্যতে রাষ্ট্রং ব্রাহ্মণো যত্র জীয়তে॥' ৫. ৯৬। তখন ব্রাহ্মণের মর্যাদা পূত ছিল এবং উত্তরকালে তাঁহারা সামাজিক জীবনে বিশেষ স্থান লাভ করেন। গাভীকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করা হইত, তাহার বিশেষ মূল্যও ছিল। একটি দীর্ঘ সূক্তে (১২. ৪) গাভীর গুণকীর্তন আছে; এখানে গাভী 'বশা' নামে উল্লিখিত; এই সূক্তে ব্রাহ্মণকে গাভীদানের বিশেষ প্রশংসা আছে। ভারতীয় আর্যগণ যে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এবং চতুর্থ শ্রেণী শূদ্র যে তাহাদের

সেবার জন্য নিয়োজিত ছিল, তাহার উল্লেখ ঋগ্বেদেও আছে; ঋগ্বেদে তাহারা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদিগের মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলির উল্লেখ অবশ্য অথর্ববেদে নাই; পরবর্তী কালে সামাজিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ সংঘটিত হইয়াছিল।

অথর্ববেদের সময়েও আর্যেরা কৃষিকর্মে ব্রতী ছিল। অথর্ববেদে কৃষি, গো ও অশ্বের শ্রীবৃদ্ধির জন্য স্তোত্র আছে। প্রজা-সাধারণের নাম ছিল বিশ্। তাহারা রাজগণ কর্তৃক শাসিত হইত। সাধারণত রাজাদিগের একটা নির্বাচনেরও প্রথা ছিল। রাজাদের নির্বাচনের সময় উপযুক্ত স্তোত্র আবৃত্তি করা হইত। রাজাদের জন্য মণি ও দর্ভবন্ধনের বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল (ঐ, ১৯. ২৭-৩৩)। ১৯শ কাণ্ডের শেষ সূক্তে রাজসূয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজারা প্রায়ই পরস্পর যুদ্ধ করিতেন— অনার্য শত্রুদের সহিত তাঁহারা যুদ্ধ করিতেন। শত্রুরা ভ্রাতৃব্য নামে অভিহিত হইত। ইহারা সম্ভবত ইরানী বা অসুর।

রাজাদের শাসিত প্রদেশগুলি (state) বড় ছিল না—সেগুলিকে সকল সময়ে রাজ্যও (kingdoms) বলা হইত না। সেগুলি ছোট ছিল এবং রাষ্ট্র নামে অভিহিত হইত (অ. ১৯. ২৪)। এ যুগের প্রজারা দুর্বল ছিল না।

অথর্ববেদের সময় সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বলিতে পারা যায় যে, ঋগ্বেদের যুগে বিবাহ-প্রথা যেরূপ ছিল এসময়েও ঠিক সেইরূপ ছিল। তবে সূক্তাদির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। দেখা যায়, ঋগ্বেদের বিবাহসূক্ত (১০. ৮৫) একেবারে সম্পূর্ণভাবে অথর্ববেদে গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু কতকগুলি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে বিবাহ-সূক্তে ঋক্-সংখ্যা ৪৭; কিন্তু অথর্ববেদের দুইটি বিবাহ-সূক্তের ঋক-সংখ্যা যথাক্রমে ৬৪ ও ৭৫। ঋগ্বেদের যুগের মত অথর্ববেদের সময়েও বর-কর্তৃক কন্যার পাণি-গ্রহণ বিবাহ-অনুষ্ঠানের প্রধান ব্যাপার ছিল। কন্যাদানের অধিকার কন্যার পিতারই ছিল, আর বরকেই কন্যার জন্য তাহার নিকট যাইতে হইত। অধুনাতন রীতির ন্যায় কন্যার পাণিগ্রহণ কন্যার গৃহেই হইত—বরের গৃহে

হইত না। বিবাহের জন্য বরের বিপুল সমারোহে শোভাযাত্রার উল্লেখ অথর্ববেদে আছে। যাহাতে নবদম্পতি দীর্ঘায়ু ও প্রজা লাভ করিতে পারে তজ্জন্ম গাভী ও কম্বল দান করা এবং নানা মন্ত্রোচ্চারণ করা হইত।

অথর্ববেদে শিক্ষা ও ছাত্রজীবন

অথর্ববেদের যুগে ব্রহ্মচারীরা বড় বড় চুল রাখিত, মেখলা বন্ধন করিত, মৃগচর্ম পরিধান করিত এবং যজ্ঞকুণ্ডে অরণি সংযোগে আহুতি দিত। তখন ভিক্ষাই তাহাদের উপজীবিকা ছিল। ছাত্রেরা যেভাবে জীবন অতিবাহিত করিত তাহার খুঁটিনাটির পরিচয় পরবর্তী কালের ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে পাওয়া যায়। উভয় যুগের পদ্ধতি প্রায় এক রকম ছিল। তৈ-স. (৬. ৩. ১০. ৫), শ-ব্রা. (১১. ৫. ৪) উপনয়নকালে সকল কর্তব্যের বিবরণ পাওয়া যায়। গোপথ-ব্রাহ্মণে (১. ২. ১-৮) ব্রহ্মচর্যের বিধিনিষেধের হৃদয়গ্রাহী বিবরণ আছে। অথর্ববেদের ন্যায় সুপ্রাচীনকালে উপনয়নকে দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া গণ্য করা হইত।

'আচার্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং
কৃণুতে গর্ভমন্তঃ।
তং রাত্রীস্তিস্র উদরে বিভর্তি তং জাতং
দ্রষ্টমভিসংযন্তি দেবাঃ॥'
—অ. ১১. ৫. ৩।

মেখলা-বন্ধনের সময় যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত সেগুলি বলিয়া দিত যে, তাহার বন্ধনী শ্রদ্ধার কন্যা ও ঋষিদিগের ভগিনী। তাহার পবিত্রতা ও ব্রত-সংরক্ষণের শক্তি যথেষ্ট। বন্ধনী তাহাকে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবে।

'শ্রদ্ধায়া দুহিতা তপসোঽধি জাতা স্বস ঋষীণাং ভূতকৃতাং বভূব।'
—অ. ৬. ১৩৩. ৪।

আচার্যকে তখনকার সময়েও অধ্যাত্মব্যাপারে পূজা করা হইত।

তু.—'আচার্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং
কৃণুতে গর্ভমন্তঃ।'—অ. ১১. ৫. ৩।

অথর্ববেদের সময়ে রমণীগণ মণিমুক্তাদি কি কি অলঙ্কার পরিধান করিতেন তাহার উল্লেখ অথর্ববেদে আছে।

অথর্ববেদের যে সকল মন্ত্র সমস্যাসূচক সেগুলি অনুসন্ধিৎসাদ্যোতক। যজুর্বেদের 'প্রশ্নী' ও অথর্ববেদের 'প্রবাচিক' সম্ভবত এক ধরণেরই ছিল। একাধিক সূক্তে অথর্ববেদে ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠী ও শ্রেষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক বলা হইয়াছে। যজু ও অথর্ববেদের সূক্তগুলি শিশুগণের ভবিষ্যৎ-নির্দেশক উপদেশে পূর্ণ। অথর্ববেদের ষষ্ঠ কাণ্ড হইতে দীক্ষার নিয়মগুলি বেশ স্পষ্ট।

ছাত্রদের মধ্যে তর্কযুদ্ধ হইত। যে ছাত্র অন্য ছাত্রদিগকে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করিত তাহাকে পুরস্কারস্বরূপ 'কবি' বা 'বিপ্র' উপাধি প্রদান করা হইত। অথর্ববেদে যে তর্ক আরম্ভ করিত তাহাকে 'প্রাশ' (opener) ও প্রতিপক্ষ যাহারা উত্তর দিত তাহাদের 'প্রতিপ্রাশ' (opponent) বলিত।—অ. ১১. ৩; ১৫. ১ ২. ২৭; ১. ৭।

অথর্ববেদের সময় ছাত্রদিগকে কাজ করিতে হইত, কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে হইত, ভিক্ষা করিতে হইত ও আচার্যের গরু চরাইতে হইত।

—অ. ১১. ৫. ৪; ১১. ৬. ৯।

অথর্ববেদে উদ্ভিজ্জাদির ভৈষজ্যব্যাপার বিশিষ্টভাবে উল্লিখিত আছে।

ছাত্রেরা পড়াশুনা শেষ হইলে আচার্য গৃহ হইতে স্বগৃহে গমন করিত। এইরূপ ছাত্রদের নাম ছিল 'স্নাতক'। অথর্ববেদে ইহাদের জন্য নানাবিধ উপদেশ আছে। স্নাতকেরা মন সুস্থ এবং দেহ নিরাপদ রাখিবে। দন্ত ও চক্ষুর জন্য তাহাদের বিশেষ যত্ন লইতে হইবে। অযথা উত্তাপ বা গোলমাল হইতে সতত বিরত থাকিবে। স্নাতকের মন সকল সময় আরাধনাপ্রবণ থাকিবে। বৈদিক ধর্মপ্রচারের জন্য তাহাকে যথাসাধ্য চেষ্টা ও প্রযত্ন করিতে হইবে। বৈদিক আদর্শে সে তাহার চরিত্র গঠন করিবে। এইরূপ করিয়া সে সকলের শুভেচ্ছা ও প্রীতি অর্জন করিবে।

অথর্ববেদের চল্লিশের অধিক মন্ত্রে ছাত্রজীবন-সম্বন্ধে উপদেশাদি আছে।[১৩] ছাত্রদের বিদ্যামন্দিরে প্রবেশের কথা লইয়া এই বেদের আরম্ভ এবং বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া বাহির হইবার কথা-প্রসঙ্গে এই বেদের পরিসমাপ্তি।—অ. ১. ১; ১৯. ৭১-২।

অথর্ববেদে ছাত্র ও শিক্ষকদের ব্যাপারের যথেষ্ট প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, আঙ্গিরস ও ভৃগুগণ প্রধানত আচার্যের কাজ করিতেন।

অথর্ববেদের যে সমস্ত মন্ত্রে শিক্ষাব্যাপার নিবদ্ধ সেগুলিকে বিশেষত চারি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। প্রথমত, বৈদিক ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিবার সময় নানাবিধ অনুষ্ঠান করিতে হইত; তদনুরূপ অনুষ্ঠানপূর্ণ মন্ত্র। দ্বিতীয়, বৈদিক পাঠ সমাপন ও বিদ্যামন্দির পরিত্যাগ। তৃতীয়, ছাত্রজীবন। চতুর্থ, শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিষয়।

১৮শ কাণ্ডে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রাচীন পূর্বপুরুষদিগকে, আঙ্গিরসগণকে, নবগ্বগণকে, অথর্বন্ ও ভৃগুগণকে এবং বিবস্বান্‌কে ঋগ্বেদের (১০. ১৪. ৬) মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই স্মরণ করা হইত।

'অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো
ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।......
বিবস্বন্তং হুবে যঃ পিতা তেঽস্মিন্‌বর্হিষ্যা নিষদ্য॥'
—অ. ১৮ ১. ৫৮-৯।

এ ছাড়া আরও নতুনমন্ত্র উচ্চারিত হইত। সর্বাগ্রে পরলোকের ও যমের প্রশংসাসূচক মন্ত্র ঈরিত হইত। সাধারণত মৃতদেহ দাহ করা হইত। তবে 'অনগ্নিদগ্ধের'ও উল্লেখ আছে। সতীদাহের প্রাচীন প্রথানুসারে মৃত স্বামীর পার্শ্বে উপবিষ্টা নারীর উল্লেখও অথর্ববেদে আছে।

'ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নি পদ্যত
উপ ত্বা মর্ত্য প্রেতম্।
ধর্মং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্মৈ প্রজাং দ্রবিণং
চেহ ধেহি॥' —অ. ১৮. ৩. ১।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় যাবতীয় মন্ত্রোচ্চারণ করা হইত। সমস্ত পিতৃগণের প্রতি নমস্কার-মন্ত্রে শ্রাদ্ধের অবসান হইত।

অথর্ববেদে পতি বিদ্যমান থাকিতে পত্যন্তর-গ্রহণের কথাও আছে। যথা,

'যা পূর্বং পতিং বিত্ত্বাথান্যং বিন্দতেঽপরম্।
পঞ্চৌদনং চ তাবজং দদাতো ন বি যোষতঃ॥' —অ. ৯. ৫. ২৭।

পুনর্ভূর কথা ইহাতে আছে।—

'সমানলোকো ভবতি পুনর্ভুবাপরঃ পতিঃ।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি॥'

—অ. ৯. ৫. ২৮।

অথর্ববেদের সময় ব্রাহ্মণের প্রভাব ও প্রতিপত্তির উদাহরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

সুপণ্ডিত ম্যাক্‌ডোনেল[10] অনুমান করেন যে, অথর্ববেদে যে সুর অনুস্যূত তাহা প্রাগৈতিহাসিক সুর। অন্যান্য সংহিতা অপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক ব্যাপার ইহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। সভ্যতার ইতিহাস হিসাবে ইহা ঋগ্বেদ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্। ম্যাক্‌ডোনেলের স্বীয় উক্তি এইরূপ—'The spirit which breathes in it is that of a prehistoric age. A few of its actual charms probably date with little modification from the Indo-European period ; for, as Adalbert Kuhn[11] has shown, some of its spells for curing bodily ailments agree in purpose and content, as well as to some extent in form, with certain old German, Lettic and Russian charms'. 'It contains more theosophic matter than any of the other Sanhitas. For the history of civilisation, it is on the whole more interesting and important than the Rigveda itself.' (p. 186)। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এই অথর্ববেদ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সমগ্র বেদের একমাত্র প্রতিনিধিস্বরূপ বেদশীর্ষে এই বেদ মহাভাষ্যে স্থান পাইয়াছে।

অথর্ববেদের অধিকাংশই বিষ ঝাড়াইবার, রোগ তাড়াইবার, পতিকে বশ করিবার, শত্রুকে নাশ করিবার বা এই প্রকার ব্যাপারের মন্ত্রে পরিপূর্ণ। এগুলির মধ্যে ভাষার বা কবিত্বের বৈশিষ্ট্য নাই বলিলেই চলে। তবে এমন কতকগুলি মন্ত্র আছে, যেগুলির ভাষা গম্ভীর, শব্দচাতুর্য ও বাক্‌ছন্দে সেগুলি সুন্দর, মাধুর্যে গীতিকবিতার সমতুল্য। উদাহরণস্বরূপ একটি সূক্ত

উদ্ধৃত হইল। এই সূক্তে শিরাগুলিকে রক্তাভরণা কুমারীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথম তিনটি সূক্তের ভাবা এইরূপ—

'অমূর্যা যন্তি যোষিতো হিরা লোহিতবাসসঃ।
অভ্রাতর ইব জাময়স্তিষ্ঠন্তু হতবর্চসঃ॥
তিষ্ঠাবরে তিষ্ঠ পর উত ত্বং তিষ্ঠ মধ্যমে।
কনিষ্ঠিকা চ তিষ্ঠতি তিষ্ঠাদিদ্ধমনির্মহী॥
শতস্য ধমনীনাং সহস্রস্য হিরাণাম্।
অস্থুরিন্মধ্যমা ইমাঃ সাকমন্তা অরংসত॥' —অ. ১. ১৭. ১-৩।

অথর্ববেদের ১ম কাণ্ড ২৩শ সূক্তের ১ম দুইটি ঋকে শ্বেতকুষ্ঠ ও পলিত রোগের শান্তির উপায় বর্ণিত আছে। প্রথমে সাদা দাগগুলি শুষ্ক গোময় দিয়া এরূপভাবে ঘষিতে হইবে যাহাতে সেই স্থানগুলি লাল হইয়া যায়। তারপর তদুপরি মন্ত্রদ্বারা চারিটি ঔষধ পিষিয়া প্রলেপ দিতে হইবে। ঔষধ চারিটির নাম—ভাঙ্, হলুদ, নীবারধান্য ও নীলিকা। ইহাতে রোগ আরাম হইয়া যাইবে। প্রথম মন্ত্র, যথা—

'নক্তংজাতাস্যোষধে রামে কৃষ্ণে
অসিক্নি চ।
ইদং রজনি রজয় কিলাসং পলিতং চ যৎ॥'

হে হরিদ্রে, নীবারধান্য। ইন্দ্রবারুণি ও নীলিকে! তোমরা রাত্রিতে উৎপন্ন হইয়াছ। হে রঞ্জনকারিণীগণ! এই যে শ্বেতকুষ্ঠ ও পলিত ইহাদিগকে তোমরা স্বীয় স্বীয় বর্ণে রঞ্জিত কর।

৩য় কাণ্ডের ১১শ সূক্তের প্রয়োগ দুইটি রোগে হইয়া থাকে। একটি বালগ্রহ রোগ এবং অপরটি নিরন্তন স্ত্রী-সঙ্গমে উৎপন্ন যক্ষ্মারোগ। পচা মাছের সহিত মন্ত্রের দ্বারা ভাত খাওয়ান এই রোগের বিধি। ইহার দ্বিতীয় মন্ত্রটি এই প্রকার—

'যদি ক্ষিতায়ুর্যদি বা পরেতো যদি মৃত্যো-
রন্তিকং নীত এব।
তমা হরামি নির্ঋতেরুপস্থাদস্পার্ষমেনং
শতশারদায়॥'

যদিই বা এই রোগীর আয়ু ক্ষীণ হইয়া গিয়া থাকে, যদি এ-রোগী মরণের নিকট নীত হইয়া থাকে, আমি ইহাকে মৃত্যুর নিকট হইতে এই লোকে আনিয়া দিতেছি এবং শতবর্ষ জীবিত থাকিবার শক্তি প্রদান করিতেছি। এই কাণ্ডের ২৫শ সূক্তের ২য় ঋক্ স্ত্রীকে বশে আনিবার জন্য প্রযুক্ত। ইহার প্রয়োগ কয়েক প্রকারের। তন্মধ্যে দ্বিতীয় এই মন্ত্রটি

'আধীপর্ণাং কামশল্যামিষুং সঙ্কল্পকুল্মলাম্।
তাং সুসন্নতাং কৃত্বা কামো বিধ্যতু ত্বা হৃদি॥'

হে কামিনি! কামদেব স্বীয় বাণে রতি-অভিলাষের শল্যকে বিষয়-সঙ্কল্পের কুল্মল[১৪] দ্বারা যুক্ত করিয়া এবং মানসী পীড়ারূপ পক্ষ লাগাইয়া উহাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করিয়া তোমার হৃদয়কে বিদ্ধ করুক।

৪র্থ কাণ্ড ১৬শ সূক্তের প্রথম দুইটি মন্ত্রের আরও কিছু প্রয়োগ আছে। তৃতীয় মন্ত্র হইতে শেষ মন্ত্র পর্যন্ত ধূমকেতুর উৎপাতশান্তির জন্য স্তুতি। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র নিম্নে ক্রমানুসারে প্রদত্ত হইল—

'উতেয়ং ভূমির্বরুণস্য রাজ্ঞ উতাসৌ
দ্যৌর্বৃহতী দূরেঅন্তা।
উতো সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী উতাস্মিন্নল্প
উদকে নিলীনঃ।'

'উত যো দ্যামতিসর্পাৎপরস্তান্ন স মুচ্যাতৈ
বরুণস্য রাজ্ঞঃ।
দিব স্পশঃ প্র চরন্তীদমস্য সহস্রাক্ষা
অতিপশ্যন্তিভূমিম্॥'

'সর্বং তদ্রাজা বরুণো বি চষ্টে যদন্তরা
রোদসী যৎপরস্তাৎ।
সংখ্যাতা অস্য নিমিষো জনানামক্ষানিব
শ্বঘ্নী নি মিনোতি তানি॥'

এই পৃথিবী ও ঐ সীমাহীন আকাশও রাজা বরুণের বশতাপন্ন। দুইটি সমুদ্র বরুণের দুই দিকের দুইটি উদর (কক্ষ)। তথাপি তিনি এই অত্যল্প জলে নিলীন হইয়া আছেন।

যে শত্রু আকাশ হইতেও পলায়ন করিয়া যায় সেও রাজা বরুণের নিকট হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। তাঁহার চর আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া পৃথিবীর উপর চারিদিকে ঘুরিতে থাকে এবং সহস্র নেত্রদ্বারা ভূমির প্রতি কোণ দেখিতে থাকে।

রাজা বরুণ সকল কিছুই দেখিয়া থাকেন—তাহা আকাশ ও ভূমির মধ্যে থাকুক, বা উহার উপরেও থাকুক না কেন (তাঁহার দৃষ্টি এড়াইবার যো নাই), মনুষ্যের প্রতি পলক তিনি গণনা করিতেছেন। জুয়ারী যেমন পাশা দেখিয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও পাপীদিগকে পাপানুসারে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

৫ম কাণ্ডের ১৯শ সূক্তের ১৪শ মন্ত্রে যাহারা ব্রহ্মচারীদিগের গাভী চুরি অথবা যাহারা তাঁহাদিগকে দুঃখ দেয়, সেই দুষ্ট ব্যক্তিদিগের অভিচারের জন্য প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রটি এইরূপ—

'যেন মৃতং স্নপয়ন্তি শ্মশ্রূণি যেনোন্দতে।
তং বৈ ব্রহ্মজ্য তে দেবা অপাং ভাগমধারয়ন্॥'

হে ব্রহ্মাপকারী! যে জল দিয়া মৃতকে স্নান করান হয় এবং যে জল দিয়া তাহাদের শ্মশ্রু (দাড়ি) ভিজাইয়া দেওয়া হয়, দেবতারা তোমারই জন্য তোমারই ভাগে সেই জল রাখিয়া থাকে।

এই কাণ্ডের ২১শ সূক্তে শত্রুর সৈন্যকে ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্য প্রয়োগ কথিত হইয়াছে। সমস্ত বাদ্য ধুইয়া বাদ্যগুলির উপর টগর ও উশীরের প্রলেপ লাগাইয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তিনবার বাদ্যগুলি বাজাইয়া বাদ্যকারগণকে সেগুলি প্রদান করিবার বিধি কথিত হইয়াছে। ষষ্ঠ মন্ত্র এইরূপ—

'যথা শ্যেনাৎপতত্রিণঃ সংবিজন্তে অহর্দিবি
সিংহস্য স্তনথোর্যথা।
এবা ত্বং দুন্দুভেঽমিত্রানভি ক্রন্দ প্র
ত্রাসয়াথো চিত্রানি মোহয়॥'

যেমন বাজের ভয়ে পক্ষী উদ্বিগ্ন হইয়া পলায়ন করে, যেমন লোক সিংহের গর্জনে কাঁপিতে থাকে, সেইরূপ হে দুন্দুভি, তুমি গর্জন করিয়া শত্রুগণকে ভয় দেখাও এবং তাহাদের চিত্তকে উদ্বিগ্ন কর।

৬ষ্ঠ কাণ্ডের ১০৫তম সূক্ত কাশি, শ্লেষ্মা প্রভৃতি রোগের শান্তি তথা অগ্নি-দাহ প্রভৃতির নিবৃত্তির নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সূক্তের মন্ত্র তিনটি এই—

'যথা মনো মনস্কেতৈঃ পরাপতত্যাশুমৎ।
এবা ত্বং কাসে প্র পত মনসোঽনু
প্রবায্যম্॥'

'যথা বাণঃ সুসংশিতঃ পরাপতত্যাশুমৎ।
এবা ত্বং কাসে প্র পত পৃথিব্যা অনু
সংবতম্॥'

'যথা সূর্যস্য রশ্ময়ঃ পরাপতন্ত্যাশুমৎ।
এবা ত্বং কাসে প্র পত সমুদ্রস্যানু
বিক্ষরম্॥'

ওরে কাশি, যেমন মন নিজ বিষয়েতে শীঘ্র চলিয়া যায়, তেমনই তুইও এই পুরুষকে ছাড়িয়া ঐদিকে চলিয়া যা। ওরে কাশি যেমন তীক্ষ্ণ সুসজ্জিত তীর জ্যা হইতে বাহির হইয়া যায়, তেমনই তুইও এই পুরুষকে ছাড়িয়া পাতালের দিকে বাহির হইয়া যা। ওরে কাশি, যেমন সূর্যের কিরণ অতি শীঘ্র বাহির হইয়া যায়, তেমনই তুইও রোগীকে ছাড়িয়া সমুদ্রের তরঙ্গে চলিয়া যা।

৭ম কাণ্ডের ১২শ সূক্তের ২য় হইতে ৬ষ্ঠ পর্যন্ত পাঁচটি মন্ত্র সভায় জয়লাভ করিবার জন্য কোন প্রকারে বিনিযুক্ত করা হয়। ২য় মন্ত্র যথা—

'বিদ্ম তে সভে নাম নরিষ্টা নাম বা
অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে যে সন্তু
সবাচসঃ॥'

হে সভা! আমি তোমার নাম জানি। তোমার নাম নরিষ্টা। অতএব যত তোমার সভাসদ্ হউক, সকলে আমার মতেই মত দিবে।

(নরিষ্টা শব্দের অর্থ অহিংসিত বা অনভিভবনীয়, কেন না সভার কথা সকলকেই মানিতে হয় ; এইজন্য ইহার এই নাম।)

৮ম কাণ্ডের ১ম অনুবাকে প্রথম দুই সূক্তের নাম 'অর্থসূক্ত'। উপনয়ন-কর্মাদিতে ইহাদের বিনিয়োগ হইয়া থাকে। ৪র্থ মন্ত্র এই—

'উৎক্রামাতঃ পুরুষ মাব পথা মৃত্যোঃ
পড়্বীশমবমুঞ্চমানঃ।
মা ছিত্থা অস্মাল্লোকাদগ্নেঃ সূর্যস্য
সংদৃশঃ ॥'

হে পুরুষ, এই মৃত্যুর পাশ হইতে বাহির হইয়া এস ; পড়িও না যেন। মৃত্যুর শৃঙ্খল কাটিয়া ফেল। এই লোক হইতে পৃথক হইও না ; চিরঞ্জীব হইয়া অগ্নি ও সূর্যকে দর্শন করিতে থাক।

১১শ কাণ্ডের ৫ম সূক্তে ব্রহ্মচারীর মাহাত্ম্য সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ১৮শ, ১৯শ ও ২১শ মন্ত্র প্রদত্ত হইল—

'ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে
পতিম্।
অনড্বান্ব্রহ্মচর্যেণাশ্বো ঘাসং জিগীষতি ॥'
'ব্রহ্মচর্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমপাঘ্নত।
ইন্দ্রো হ ব্রহ্মচর্যেণ দেবেভ্যঃ স্বরাভরৎ ॥'
'পার্থিবা দিব্যাঃ পশব আরণ্যা
গ্রাম্যাশ্চ যে।
অপক্ষাঃ পক্ষিণশ্চ যে তে জাতা
ব্রহ্মচারিণঃ ॥

ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই কন্যা পতি প্রাপ্ত হয়। বৃষ ও অশ্ব ব্রহ্মচর্যদ্বারাই ঘাস খাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্যের তপস্যা দ্বারা দেবগণ মৃত্যুকে হনন করিয়া অমর হইয়াছে। আর ব্রহ্মচর্যেরই সাধন দ্বারা দেবতাগণের জন্য ইন্দ্র স্বর্গ হইতে আগমন করেন। পার্থিব, দিব্য, আরণ্য ও গ্রাম্য পশুগণ, পক্ষহীন প্রাণী ও পক্ষযুক্ত পক্ষী সমস্তই ব্রহ্মচারী হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

১২শ কাণ্ডের প্রথমে অতিসুন্দর পৃথিবীসূক্ত আছে। ১ম সূক্তের ৪১শ ও ৪৪শ মন্ত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল—

'যস্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যা
বৈ্যলবাঃ।
যুধ্যন্তে যস্যামাক্রন্দো যস্যাং বদতি
দুন্দুভিঃ।
সা নো ভূমিঃ প্র ণুদতাং সপত্নানসপত্নং মা
পৃথিবী কৃণোতু॥'
নিধিং বিভ্রতী বহুধা গুহা বসু মণিং
হিরণ্যং পৃথিবী দদাতু মে।
বসূনি নো বসুদা রাসমানা দেবী দধাতু
সুমনস্যমানা॥'

যে ভূমির উপর বিনাশশীল মনুষ্য নৃত্য-গীত করে, যাহার উপর যুদ্ধ করে এবং দুন্দুভি-ধ্বনি করে, সেই পৃথিবী আমার শত্রুগণকে মারিয়া তাড়াইবে এবং আমাকে নিষ্কণ্টক করিবে।

গুপ্ত স্থানসমূহে বহু নিধি লুকাইয়া রাখিয়াছেন এই পৃথিবী। ইনি ধন, রত্ন ও স্বর্ণ দান করুন এবং ভূরি সম্পত্তি প্রদান করিয়া প্রসন্না ভূমি আমাদিগকে অনন্ত কল্যাণ অর্পণ করুন।

১৭শ কাণ্ডে একটি সূক্ত আছে, তাহা উপনয়নাদি অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত। এই সূক্তের ১৯শ মন্ত্র সাংখ্য-বেদান্ত-বৌদ্ধাদি দর্শনের মূলীভূত।

'অসতি সৎ প্রতিষ্ঠিতং সতি ভূতং প্রতিষ্ঠিতম্। ভূতং হ ভব্য আহিতং ভব্যং ভূতে প্রতিষ্ঠিতম্। তবেদ্বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি। ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং মা ধেহি পরমে ব্যোমন্।'

অসৎ, অভাব শূন্যে—নিরস্ত সমস্তোপাধিক নাম—রূপরহিত অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মে—সৎ, ভাব না প্রত্যক্ষ মায়ার প্রপঞ্চ প্রতিষ্ঠিত বা অধ্যস্ত।

অথর্ববেদমূর্তি-স্বরূপ

চরণব্যূহ কাত্যায়ন-প্রণীত পরিশিষ্ট-সূক্ত। ইহাতে অথর্ববেদ পৈপ্পলাদ, শৌনক প্রভৃতি দশটি শাখায় বিভক্ত। ইহাদের বেদের পরিমাণ ১২,০০০।

এগুলি নক্ষত্র, বিধান, অধিকারবিধি, অভিচার ও শান্তি ইত্যাদি শাখায় বিভক্ত। চরণব্যূহের শেষে চারিখানি বেদের চারিটি পুরুষ-মূর্তি কল্পিত হইয়াছে। ইহাতে অথর্ববেদের গোত্র—বৈখানস। চারি বেদের চারিটি উপবেদ। অথর্ববেদের উপবেদ—অর্থশাস্ত্র।

মুক্তিকোপনিষদে (১২) অথর্ববেদের শাখার সংখ্যা ৫০ দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতে অন্যান্য বেদের শাখার কথা আছে, অথর্ববেদের শাখার কথা নাই।

শ্রীতত্ত্বনিধি[12] (পৃ. ৯৬৯-৯৭) অথর্ববেদের মূর্তি কল্পনা করিয়া তাহার স্বরূপ এইরূপ বলিয়াছে—

'অথর্বণাভিধো বেদো ধবলো মর্কটাননঃ।
অক্ষমালান্বিতো বামে দক্ষে কুম্ভধরঃ১৫
স্মৃত' ॥ ১4

শ্বেতবর্ণঃ ॥ ১।

অথর্ববেদপত্নী সমিৎ-স্বরূপ, যথা—

'সমিল্লক্ষণমুচ্যতে। শূকরাস্যা চকোরাক্ষী
চম্পকাভা সিতাংশুকা।
ভুজৈশ্চতুর্ভিঃ সন্ধত্তে স্রুক্‌স্রুবৌ কমলং
ঘটম্ ॥ কনকবর্ণা।'

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে কালিকাদেবী অথর্ববেদের দেবতা। অথর্ববেদানুযায়ী কোন ক্রিয়াই কালী বা তারাদেবী ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। সৌরব্রাহ্মণগণ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে উৎকলের বিভিন্ন স্থানে যে সকল আঙ্গিরসগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, তাঁহারা অথর্ববেদী ব্রাহ্মণ নামেও অভিহিত হন। ভবিষ্যপুরাণে কথিত আছে, অথর্বণ ও অথর্বাঙ্গিরসগণ একমাত্র সূর্যের উপাসনায় অন্যান্য বেদানুসরণকারিগণের অনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন।—ভবিষ্যপু. ১০৬. ১০

১৮৫৫ খ্রী. রোট[13] ও হুইটনী বহু পরিশ্রম করিয়া অথর্ববেদ-সংহিতা সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ খ্রী. প্রাগ্ হইতে লুড্‌উইগ[14] তাঁহার ঋগ্বেদের ৩য় খণ্ডে অনেকগুলি সূক্ত জর্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়া

ছিলেন। ১৮৭৯ খ্রী. টুবিনগেন[15] হইতে ১০০টি সূক্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৮৪ খ্রী. বেবের অথর্ববেদের কিয়দংশ Indische Studien-এ প্রকাশ করেন। Indische Studien-এর ৪র্থ, ৫ম, ১৩শ, ১৭শ ও ১৮শ খণ্ডে অথর্ববেদের ১ম হইতে ৫ম এবং ১৪শ কাণ্ড তিনি জর্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খ্রী. গটিন্‌গেন[16] হইতে ফ্লোরেন্স[17]-কর্তৃক ৬ষ্ঠ কাণ্ডের ১—৫০ সূক্ত প্রকাশিত হয়। ১৮৮৮ খ্রী. স্টাটগার্ট হইতে গ্রিল[18] কয়েকটি নির্বাচিত সূক্তের জর্মান ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার পর পারী হইতে ১৮৯১-৬ খ্রী. ভি হেনরী ৭ম হইতে ১৩ কাণ্ড ফরাসী ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খ্রী. শঙ্কর পাণ্ডুরঙ[19] পণ্ডিত সায়ণাচার্যের টিকা-সম্বলিত অথর্ববেদসংহিতা সম্পাদন করিয়া বোম্বাই হইতে বাহির করেন। অথর্ববেদের একটি সম্পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদ ১৮৯৬ খ্রী. গ্রিফিথ[20] বারাণসী হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বর্ষেই (১৮৯৫-৬ খ্রী.) বেবর Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften-এ এই বেদের ১৮শ কাণ্ড অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। অতঃপর Indische Studien-এর ১ম খণ্ডে ঔফ্রেক্ট[21] কর্তৃক ১৫শ কাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৯৭ খ্রী. ব্লুমফীল্ড অথর্ববেদ-সংহিতায় নির্বাচিত সূক্তের ইংরেজী অনুবাদ SBE Series-এ বাহির করেন। হুইটনী একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রায় শেষ করিয়াছিলেন। ল্যান্‌ম্যান্ তাহা টিপ্পনী সমেত সম্পাদন করেন। এই অনুবাদগ্রন্থ ১৯০৫ খ্রী. আমেরিকা (HOS) হইতে প্রকাশিত হয়। ব্লুমফীল্ড Grundriss (II. 1. B.)-এ অথর্ববেদের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াছেন। ব্লুমফীল্ডের এই গ্রন্থ হইতে বর্তমান নিবন্ধে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

ব্লুমফীল্ডের মতে ৭৩০, হুইটনীর মতে ৫৯৮; শঙ্কর পাণ্ডুরঙ পণ্ডিতের মতে ৭৫৯ এবং অজমের-সংস্করণে ৭৩১ সূক্ত আছে। ব্লুমফীল্ডের ৬০০০, হুইটনীর মতে ৫০৩৮ (ভূমিকা—পৃ. ৪৭) এবং পাণ্ডুরঙ পণ্ডিতের মতে ৬০১৫ ঋক্ আছে। পাণ্ডুরঙ পণ্ডিতের ভূমিকায় লিখিত আছে যে কয়েকটি পাণ্ডুলিপিতে ঋক্ বা মন্ত্র সংখ্যা ৬০১৫। গুজরাতের এক সংস্করণে গ্রন্থসংখ্যা ৬৬৮০ ঋক্ আছে। গ্রন্থ বলিলে ৩২ অক্ষর (letters) বোঝায়। সুতরাং অক্ষর-হিসাবে ৬৬৮০×৩২ =২, ১৩, ৭৬০। কিন্তু ঋগ্বেদের অক্ষরসংখ্যা ৪,৩২,০০০। ঋগ্বেদের তুলনায় দেখা যায়, অথর্ববেদের সূক্ত ও অক্ষর সংখ্যা ঋগ্বেদের অর্ধেকের কিছু বেশী।

ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে অথর্ববেদ চতুর্থবেদ নয়। ইহা সর্বশেষেও সঙ্কলিত হয় নাই। অন্যান্য বেদের তুলনায় ইহা অর্বাচীন নয়। তাঁহারা এ সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি সমীচীন বলিয়াছেন নিম্নে তাহাদের আভাস প্রদত্ত হইল।

বেদের একটি নাম 'ত্রয়ী'; তেমনই তাহার আর একটি প্রসিদ্ধ নাম 'ব্রহ্ম'। একসঙ্গে চারিবেদের নাম লইতে হইলে ক্রম অনুসারে ঋক্, যজু, সাম এবং সর্বশেষে 'অথর্ব' বলিতে হয়। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অথর্বের নাম শেষেই করিতে হয়—পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—'অল্পাচ্ তরম্'—২. ২. ৩৪। যে সকল শব্দে কম স্বর থাকে সেগুলি পূর্বে বসিয়া থাকে। অথর্বশব্দে সর্বাপেক্ষা অধিক স্বর রহিয়াছে বলিয়া ইহার নাম সকলের শেষে আসিয়াছে। এইজন্য 'ত্রয়ী'র গণনা এক দিক্ দিয়া করা ঠিক নয়। অথর্বকে 'ত্রয়ী'র মধ্যে ধরিলেও কোন একটি ত্রয়ীর বাহিরে পড়িবে। কিন্তু 'ত্রয়ী' শব্দে 'ঋক্, যজুঃ ও সাম নামক তিন প্রকার মন্ত্রসম্বলিত' এইরূপ অর্থই বুঝায়। এই নিমিত্ত ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ—এই চারি বেদের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে 'ত্রয়ী'—কোন না, চারিটির প্রত্যেকের মধ্যে তিন প্রকারের মন্ত্র আছে। তবে সংখ্যায় কমবেশী। মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাসূত্রে স্পষ্ট লিখিয়াছেন—'তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা'—২. ১. ৩২,

'শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ'—২. ১. ৩৩, 'তেষাং ঋগ্ মন্ত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা' —২. ১. ৩৫, 'গীতিষু সামাখ্যা'—২. ১. ৩৬, 'শেষে যজুঃ শব্দঃ'—২. ১. ৩৭। বেদের বিধি বাক্যাবলীর নাম 'মন্ত্র'। মন্ত্রসমুদয় পরিবর্জন করিলে অবশিষ্ট বেদ-ভাগের নাম হয় 'ব্রাহ্মণ'। আবার মন্ত্রসমুদয়ের মধ্যে যেগুলিতে অর্থানুসারে চরণের ব্যবস্থা সেগুলিকে 'ঋক্' নামে অভিহিত করা হয়। 'গান'গুলিকে সাম বলা হয় এবং শেষ মন্ত্রগুলিকে 'যজুঃ' বলা হয়। এই তিন প্রকারের মন্ত্র চারি বেদে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রত্যুত বেদ এক, মন্ত্ররূপে ভিন্ন ভিন্ন ঋষির ভিতর দিয়া প্রকটিত হইয়াছে। বেদব্যাস প্রথমে ইহাকে মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ এই দুই খণ্ডে বিভক্ত করেন। তারপর পুনরায় যজ্ঞকর্মের সুবিধার জন্য প্রত্যেককে চার ভাগ করেন। বেদসমূহদ্বারা প্রধান ব্যাপার যে যজ্ঞ তাহা সাধিত হয়। আর যজ্ঞে (১) মন্ত্রোচ্চারক 'হোতা', (২) স্বরসংযোগে গানকারী 'উদ্গাতা' (৩) স্বয়ং যজ্ঞানুষ্ঠাতা 'অধ্বর্যু' এবং পুরোহিত 'ব্রহ্মা'। সমগ্র যজ্ঞকার্য নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য এই চারি জনের মধ্যে যদি একজন না থাকে তাহা হইলে যজ্ঞের অনুষ্ঠান সর্বথা অসম্ভব হয়। এই জন্যই এই চারি জন পৃথক্ পুরোহিতের জন্য ব্যাসদেব মন্ত্রকে পৃথক পৃথক চার 'সংহিতা'তে বিভাগ করেন। হোতার জন্য ঋক্, উদ্গাতার জন্য সামগান, অধ্বর্যুর জন্য যজুর্মন্ত্র এবং ব্রহ্মার জন্য সাধারণত সকল প্রকারের মন্ত্র অথবা 'ব্রহ্ম' বিহিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং দ্বৈপায়ন এক স্থানে বিশেষ ঋক্‌সমষ্টি, দ্বিতীয় স্থানে বিশেষ করিয়া সামগান। তৃতীয় স্থানে যজুর্মন্ত্র এবং চতুর্থ স্থানে সমস্ত ঐহিক আমুষ্মিক ফলপ্রদ 'ব্রহ্ম' মন্ত্রকে একত্র সন্নিবেশ করিয়াছেন। আর ঐ সমস্ত মন্ত্রের প্রাধান্য ও বাহুল্যবশত ইহাদের নাম ক্রমশ ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ বা ব্রহ্মবেদ হইয়াছে। এইরূপে আবার এই বেদ-চতুষ্টয়ের নাম—'বেদ', 'ব্রহ্ম' এবং 'ঋক্ যজু সাম'ও হইয়াছে। এরূপ হইবার কারণ পূর্বোল্লিখিত তিন প্রকারের মন্ত্র প্রত্যেক সংহিতায় আছে। যেখানে যেখানে কেবল ঋক্ যজু সাম শব্দ আছে, সেখানে সেখানে ইহাদের তাৎপর্য জৈমিনীয় সূত্রানুসারে মন্ত্রবিশেষকেই বোঝায়, সংহিতাবিশেষকে নয়।

৩ M. Bloomfield : *The Atharvaveda*, 10-11, 30-32.

৪ ঐ. 13.

৫ Whitney : *Festgruss an R. V. Roth*, 29.

৬ M. Bloomfield : *The Atharvaveda*, 14-15.

৭ ঐ, 16-17.

৮ *Indisehe Studien*, 251 ; Weber : *Indische Litt.*, 173 ; Deussen, 543.

* অথর্ববেদ-পরিশিষ্টে নিম্নলিখিত পরিশিষ্টগুলি আছে—১ নক্ষত্রকল্প, ২ রাষ্ট্র-সংবর্গ, ৩ রাজপ্রথমাভিষেক, ৪ পুরোহিতকর্মণি, ৫ পুষ্যাভিষেক, ৬ পিষ্টরাত্রীকল্প, ৭ আরাত্রিক, ৮ ঘৃতাবেক্ষণ, ৯ তিলধেনুবিধি, ১০ ভূমিদান, ১১ তুলাপুরুষবিধি, ১২ আদিত্য-মণ্ডক, ১৩হিরণ্যগর্ভবিধি, ১৪ হস্তি-রথ দানবিধি, ১৫ অশ্বরথদানবিধি, ১৬ গোসহস্রবিধি, ১৭-১৮খ রাজকর্ম-সাংবৎসরীয়, ১৮গ বৃষোৎসর্গ, ১৯ ইন্দ্রমহোৎসব, ১৯খ ব্রহ্মযাগ, ২০ স্কন্দযাগ বা ধূর্তকল্প, ২১ সীতারলক্ষণ, ২২ অরণিলক্ষণ, ২৩ যজ্ঞপাত্রলক্ষণ, ২৪ বেদিলক্ষণ, ২৫ কুণ্ডলক্ষণ, ২৬ সমিল্লক্ষণ, ২৭ স্রুবলক্ষণ, ২৮ হস্তলক্ষণ, ২৯ জ্বালালক্ষণ, ৩০ লঘুলক্ষ-হোম, ৩০খ বৃহল্‌-লক্ষহোম, ৩১ কোটিহোম, ৩২ গণমালা, ৩৩ ঘৃতকম্বল, ৩৪ অনুলোমকল্প, ৩৫ আসুরীকল্প, ৩৬ উচ্ছুষ্মকল্প, ৩৭ সমুচ্চয়প্রায়শ্চিত্তানি, ৩৮ ব্রহ্মকূর্চবিধি, ৩৯ তড়াগাদিবিধি, ৪০ পাশুপতব্রত, ৪১ সন্ধ্যোপাসনবিধি, ৪২ স্নানবিধি, ৪৩ তর্পণবিধি, ৪৪ শ্রাদ্ধবিধি, ৪৫ অগ্নিহোত্রহোমবিধি, ৪৬ উত্তমপটল, ৪৭ বর্ণপটল, ৪৮ কৌৎসবৎনিরুক্তনিঘণ্টু, ৪৯ চরণব্যূহ, ৫০ চন্দ্রপাতিপদিক, ৫১ গ্রহযুদ্ধ, ৫২ গ্রহসংগ্রহ, ৫৩ রাহুচার, ৫৪ কেতুচার, ৫৫ ঋতুকেতুলক্ষণ, ৫৬ কূর্মবিভাগ, ৫৭ মণ্ডলানি, ৫৮ দিগ্‌দাহলক্ষণ, ৫৮খ উল্কালক্ষণ, ৫৯ বিদ্যুল্লক্ষণ, ৬০ নির্ঘাতলক্ষণ, ৬১ পরিবেধলক্ষণ, ৬২ ভূমিকম্পলক্ষণ, ৬৩ নক্ষত্র-গ্রহোৎপাতলক্ষণ, ৬৪ উৎপাতলক্ষণ, ৬৫ সদ্যোবৃষ্টিলক্ষণ, ৬৬ গো-শান্তি, ৬৭ অদ্ভুতশান্তি, ৬৮ স্বপ্নাধ্যায়, ৬৯ অথর্বহৃদয়, ৭০ ভার্গবীয়াণি, ৭০খ গার্গ্যাণি, ৭০গ বার্হস্পত্যানি, ৭১ ঔশনসাদ্ভুতানি, ৭২ মহভূতানি।—ব-ম. ২য় খ. পৃ. ১৫৫

৯ M. Bloomfield : *The Atharvaveda*, 20.

১০ ঐ, 57-58

১১ কণ্বঃ কক্ষীবান্‌ পুরুমীঢ়ো অগস্ত্যঃ শ্যাবাশ্বঃ সোভর্যর্চনানাঃ।

বিশ্বামিত্রোঽয়ং জমদগ্নিরত্রিরবন্তু নঃ কশ্যপো বামদেবঃ ॥
বিশ্বামিত্র জমদগ্নে বসিষ্ঠ ভরদ্বাজ গোতম বামদেবঃ।
শর্দির্নো অত্রিরগ্রভীন্নমোভিঃ সুসংশাসঃ পিতরো
মৃড়তা নঃ ॥—অ. ১৮. ৩. ১৫-১৬।

১২ C. V. Vaidya : *Hist. of Sans. Litt. (1930), 167-72.*

১৩ অ. ১. ১ ; ১. ৯ ; ১. ৩০ ; ১. ৩৪ই.। ১. ২৭ ; ২. ২৯ই.। ৩. ৮ ; ৩. ৩১ই.। ৪. ১ ; ৪ ৯ ; ৪. ১৫ ; ৪. ৩১ই.।

১৪ বাণে লৌহমুখ জুড়িবার পদার্থের নাম কুল্মন।

১৫ তু.—হেমাদ্রি কুন্তের পরিবর্তে খট্বাঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন।—ব্রতখণ্ড. ১০৫ পৃ.।

গ্রন্থপঞ্জী :

[C. V. Vaidya ; Hist. of Sans. Literature, Poona 1930, 152-81 ; M. Bloomfield : The Atharvaveda, Strass. 1899 ; Weber : Hist. of Indian Literature, Lond. 1878 ; Folk-Medicine in Ancient India, Nature, lviii. 233f ; Roth : Dissertation on the Atharva Veda., 22f ; Colebrooke : Misc. Essays, i. 9 ; Roth : Literature and Hist. of the Veda ; A. A. Macdonell : Vedic Mythology, Strass. 1897 ; Whitney : Oriental & Lingsuistic Studies, 22f ; R. Ghosh : Hist. of Hindu Civilisation, Cal. 1889 ; M. Winternitz : Hist. of Indian Literature, i. Cal. 1927 ; Madhusudansarasvati ; Prasthanabheda, Indische Studien, i. 16 (Deussen, Allgemeine Geschichte der Philosophie, i. pt. i, 50) ; Lassen ; Indische Alterthumskude, i. 523 ; E, W. Hopkins ; Religions of India, Boston 1895 ; Lond. 1896 ; M. Bloomfield : Hymns of the Atharvaveda—SBE, xlii. Intro ; ঐ : Religions of the Veda, N. Y. & Lond. 1908 ; A. Barth : Religions of India (Eng. tr.), Lond. 1882 ; A. Hillebrandt : Vedische Mytho-

logie, 3v. Breslau 1891-1902, সংক্ষিপ্ত সং—1910 ; Max Muller : Hist. of Ancient Sans. Literature ; JRAS, ii. (n. s.), 33, 272, 301 ; xv (n. s.) 427 ; বারাণসীপ্রসাদ ত্রিবেদী : অথর্ববেদ (জানুয়ারী. ১৯৩২)।

[বঙ্গীয় মহাকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭-১৫৪]

প্রসঙ্গ-কথা

1 সূতকৃতাঙ্গ সূত্র (সূত্রকৃতাঙ্গ)—জৈনগণ ৪৫ খানি সিদ্ধান্ত গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন—তার মধ্যে ১২ খানি অঙ্গ। সূত্রকৃতাঙ্গ এই অঙ্গেরই অন্তর্গত।—'জৈনধর্ম' প্রবন্ধ দ্র.

2 পালিপিটক—সুত্ত, বিনয় ও অভিধম্ম এই ত্রিবিধ মূল বৌদ্ধ গ্রন্থ নিয়ে ত্রিপিটক। পিটক শব্দের সাধারণ অর্থ ভাণ্ড, ভাজন বা ঝুড়ি। বৌদ্ধ পারিভাষিক অর্থে পিটক 'পরিয়ত্তিভাজন' 'পর্যাপ্তিভাজন' বা গ্রন্থাধার'। এতে আধার ও আধেয় উভয় অর্থই সূচিত হয়। কাজেই সুত্ত, বিনয় বা অভিধম্ম পিটক বললে সেই নামের গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থনিবদ্ধ বিষয়গুলিও সূচিত হয়।—বৌদ্ধকোষ, পৃ. ৪

3 Wilson, Horace Hayman (1786-1860)—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। প্রথমে কলকাতার ট্যাঁকশাল 'অ্যাসে মাস্টার' পরে এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী। বহু সংস্কৃত নাটকের ইংরেজি অনুবাদ ও সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান রচনা করেন। গ্রন্থ—Theatre of the Hindus, 2 vols. (1819), Sketches of Religious Sects of the Hindus (1846) ই.।

4 Weber, Albrecht Friedrick (1825-1901)—জর্মান পণ্ডিত। বার্লিন রাজধানীর পুস্তকাগারে যে সমস্ত সংস্কৃত বই আছে তার মূল্যবান তালিকা প্রস্তুত করেন। ভারতবিষয়ক গ্রন্থ, প্রাকৃত ভাষা, জৈনধর্ম সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা। History of Indian Literature (অনু. লণ্ডন, ১৮৮২) প্রভৃতি জর্মান ভাষায় প্রায় ৪০ খানি বই রচনা করেন।

5 হুইটনী (Whitney, William Dwight) (1827-1894)—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইয়েল (Yale) শহরে সংস্কৃত শিক্ষা (১৮৫০)

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক (১৮৫৪), প্রাচ্যবিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা। গ্রন্থ—A Sanskrit Grammar (Leipzig, 1879), The Roots of Sanskrit Language (Washington, 1885), The Life and Growth of Language (Lond. 1875) ই.।

6 ব্লুমফীল্ড (Bloomfield, Maurice) (1855-1928)—জন্ম অষ্ট্রিয়া। আমেরিকান ভারতবিদ্যাবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিক। বেদ সম্বন্ধে তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করেন। গ্রন্থ—The Atharvaveda : Hymns of the Atharvaveda (Trs. 1897), The Atharvaveda (Strassburg, 1899). ই.।

7 ড. রাইডার—পরিশিষ্ট দ্র.

8 ল্যানম্যান (Lanman, Charles R) : গ্রন্থ—Introduction to Whitney's Translation of Atharvaveda.

9 চিন্তামণিবামন বৈদ্য (C. V. Vaidya) : প্রাচ্যতত্ত্ববিদ। গ্রন্থ—Epic India : Or India as described in the Mahabharata and Ramayana (Bombay. 1907) ; History of Mediaeval Hindu India (Poona, 1921), The King of Siam's edition of the Buddhist Scripture and the Harvard copy of the first Sanskrit book ever printed (Cambridge. 1895) অপর গ্রন্থ গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখিত হয়েছে।

10 Macdonell, A. A. (1854—?) : ব্রিটিশ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। অক্সনের বোডেন প্রোফেসর (সংস্কৃত), ব্রিটিশ অ্যাকাডেমির ফেলো। গ্রন্থ—History of Sanskrit Literature (Lond, 1913), India's Past (Oxford, 1927) ; Vedic Mythology (Strassburg, 1897), Sansk.-English Dictionary (1892) ই.। গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত গ্রন্থ দ্র.

11 Kuhn, Adalbert (1812-1881) : জর্মান ভাষাতত্ত্ববিদ। ইণ্ডো-জর্মান ভাষাতত্ত্ব ও ইতিহাস নিয়ে চর্চা। জর্মান ভাষায় কতকগুলি বই আছে।—*En. Brit.*

12 শ্রীতত্ত্বনিধি—পরিশিষ্ট দ্র.

13 রোট (Roth, Rudolf) : 'অদিতির' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

14 Ludwig, Alfred : 'অনার্য' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

15 টুবিনগেন (Tübingen) : জর্মানীর স্টাটগার্টের দক্ষিণে এক শহর। এখানে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি, অবসারভেটরি প্রভৃতি আছে।

16 গটিনগেন (Göttingen)—জর্মানীর এক শহর। বিশ্ববিদ্যালয় প্রসিদ্ধ।

17 ফ্লোরেন্স (Florenz, Karl) : জর্মান পণ্ডিত। গ্রন্থ—Japanische Mythologic Nihongi "Zeitalter der Götter" etc.

18 গ্রিল (Grill) : ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' সম্পাদন করেন (১৮৭১)।

19 শঙ্কর পাণ্ডুরঙ (Pandit Sankar Pandurang, M.A.) : বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি লিপিতত্ত্ব বিষয়েও বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

20 গ্রিফিথ : 'অদিতি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

21 ঔফ্রেক্ট (Aufrecht, Theodor ,—জর্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্। গ্রন্থ—Catalogus Catalogram, 3 pts. (Leipzig, 1891-1903), Hymnen des Rigveda (Bonn, 1877) ই.।

অতিথিগ্ব

ঋগ্বেদোক্ত নৃপতি দিবোদাসের উপনাম অতিথিগ্ব। ইনি উত্তর পঞ্চালের[১] ভরতবংশীয়[২] ছিলেন। ইঁহার নামান্তর ছিল—কশোজু। —VI, 15, 144. উত্তরপঞ্চাল-বংশীয় অতিথিগ্বের বংশতালিকা[৩] এইরূপ—১ নীল, ২ সুশান্তি, ৩ পুরুজানু বা পুরুজাতি, ৪ ঋক্ষ, ৫ ভৃম্যশ্ব, ৬ মুদ্গল, ৭ বধ্যশ্ব, ৮ দিবোদাস, ৯ মিত্রয়ু, ১০ মৈত্রেয় সোম, ১১ সৃঞ্জয়, ১২ চ্যবন পঞ্চজন, ১৩ সুদাস সোমদত্ত, ১৪ সহদেব, ১৫ সোমক, ১৬ জন্তু, ১৭ পৃষ্ণ, ১৮ দ্রুপদ।

ইন্দ্রের কয়েকজন আশ্রিত রাজা বা যোদ্ধবীর ছিলেন। তাঁহাদের জন্য বা তাঁহাদের সহিত তিনি দাস বা অসুরগণকে পরাজিত করিতেন। প্রসিদ্ধ সুদাস রাজার পূর্বপুরুষ দিবোদাস অতিথিগ্বের শত্রু ছিলেন কুলিতরের[৪] পুত্র শম্বর অসুর। ইন্দ্র অতিথিগ্বকে রক্ষা করিবার জন্য শম্বরকে পর্বত হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং ৯০টি পুরী নষ্ট করিয়াছিলেন—ঋ. ১. ১৩০. ৭। একবার অতিথিগ্ব ইন্দ্রের সাহায্যে শম্বরকে জয় করিয়া ধন লাভ করেন।—ঋ. ৬. ৪৭. ২২। পরে ইন্দ্র তাঁহাকে রক্ষা করিয়া সুখী করিবার জন্য দুর্ভেদ্য শম্বরের শিরচ্ছেদন করেন।—ঋ. ১. ৫১. ৬; ৬. ২৬. ৩। অতিথিগ্ব ইন্দ্রের অতি প্রিয় ছিলেন। ইন্দ্র যখন তাঁহাকে যজ্ঞে পালন করিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে বাসের জন্য শততম পুরী প্রদান করিয়াছিলেন।—ঋ. ৪. ২৬. ৩। অতিথিগ্বের পুত্রকে ইন্দ্র গুঙ্গুদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পুত্রও শত্রু-সংহার করিয়া প্রজা পালন করেন।

এইসময় অতিথিগ্বের জন্য ইন্দ্র পর্ণয় ও করঞ্জ নামক অসুরকে নাশ করেন।—ঋ. ১০. ৪৮. ৮; ১. ৫৩. ৮। ইন্দ্র কুৎস, আয়ু ও অতিথিগ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুগণকে বধ করিয়াছিলেন।—ঋ. ২. ১৪. ৭। ইন্দ্র সতত (প্রত্যহ) ইহাদিগকে রক্ষা করিতেন—ঋ. ৮. ৫৩. ২। বৈদিক সাহিত্যে বিভিন্ন স্থানে দিবোদাস ও অতিথিগ্বের নাম একসঙ্গে এমনভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইহাতে উভয়ের অভিন্নত্ব বিষয়ে আদৌ সন্দেহ হইতে পারে না। প্রতীচ্য পণ্ডিত বের্গেন[1] কিন্তু দিবোদাস ও অতিথিগ্বকে একই ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না।[৫] ঋগ্বেদের দানস্তুতিতে এক অতিথিগ্বের উল্লেখ আছে, ইহার পুত্রের নাম ইন্দ্রোত।[৬] এই অতিথিগ্ব দিবোদাস কি না তাহা জোর করিয়া বলিতে পারা যায় না। রোটের[2] মতে অতিথিগ্ব ছিলেন তিনজন। একজন অতিথিগ্ব দিবোদাস, একজন পর্ণয় ও করঞ্জের শত্রু অতিথিগ্ব এবং অপর ব্যক্তি তূর্বযাণের শত্রু অতিথিগ্ব।[৭] ম্যাক্‌ডোনেল[3] বলেন, ইন্দ্র আশ্রিতবৎসল ছিলেন। তিনি আঙ্গিরস কুৎসকেও ভাল বাসিতেন, সাহায্যও করিতেন।—ঋ. ১. ৩৩. ১৪। কিন্তু দেখা যায়, ইন্দ্রের আশ্রিতগণ সময় সময় শত্রু হইয়াও দাঁড়াইতেন। ম্যাকডোনেল ঋ. ২. ১৪. ৭ ঋকের অন্য অর্থ করিয়া বলেন, ইন্দ্র কুৎস, আয়ু ও অতিথিগ্বের বীরগণকে নিহত করেন। তিনি ইহাদিগকে বিশেষরূপ হয়রানও করিয়াছিলেন।[৮] এই তিন জনকে যুবক তূর্বযাণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।—ঋ. ১. ৫৩. ১০ কীথ[4]ও ইহাই অনুমোদন করিয়াছেন। দিবোদাস অতিথিগ্ব ও ত্রসদস্যু সমসাময়িক ছিলেন।—ঋ. ৪. ২৬. ৩; ৪. ৩৮. ১। পার্জিটার[5]ও ইহা মানিয়া লইয়াছেন।[৯]

পুরাণে দিবোদাসের যে বৃত্তান্ত আছে, তাহার সহিত বৈদিক দিবোদাস অতিথিগ্ব ও তদ্‌বংশীয়গণের বেশ ঐক্য আছে। গঙ্গার উত্তরে পঞ্চাল-প্রদেশের অংশবিশেষে উত্তরপঞ্চাল-বংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন।[১০] আটখানি পুরাণে ইহাদের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় (বায়ুপু. ৯৯. ১৯৪-২১১; মৎস্যপু. ৫০. ১-১৬; হরি. হরি. ৩২, ৭৪ই.; ব্রহ্মপু. ১৩. ৯৩-১০১; বিষ্ণু-পু. ৪. ১৯. ১৫-১৮; অগ্নিপু. ২৭৭. ১৮-২৫; গরুড়পু. ১. ১৪০. ১৭-২৪; ভা. ৯. ২১. ৩০ হইতে ৯.২২. ১৩)। আটটি পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মপুরাণের

বিবরণ অসম্পূর্ণ। নতুবা মূল বিষয়ে দিবোদাস-পুত্র (বংশ্য) মৈত্রয়ু পর্যন্ত সকলগুলিরই ঐক্য আছে। মৈত্রয়ুর পুত্র, শৃঞ্জয় ও চ্যবনপঞ্চজন সম্বন্ধে অনৈক্য সূচিত হয়। ব্রহ্মপু., অগ্নিপু. ও হরি. সুদাসের নাম সোমদত্ত বলিয়াছেন। তারপর সকল বিষয়ের মিল আছে। ঋগ্বেদে (১০. ৬৯ ১ই.) বধ্র্যশ্বের উল্লেখ আছে। ঋ. ৬. ৬১. ঋক্ দিবোদাসকে বধ্র্যশ্বের পুত্র বলিয়াছেন। ঋ. ১০, ৬৯. ৪ ঋকে শৃঞ্জয়ের উল্লেখ আছে। ঋ. ১০. ৬৯. ৫, ৬—চ্যবনকেই বুঝায়। ইঁহার অপর নাম পঞ্চজন। ইনি যে পিজবন সে বিষয়ে সন্দেহই নাই। বোধ হয় পাঠ-ভ্রমে পঞ্চজন হইয়াছে।

পাদটীকা

১ Pargiter : *Ancient Indian Hist. Tradition.* ch. x.
২ ঐ
৩ *JRAS*, 1918, 229-48.
৪ Macdonell : *Vedic Mythology*, 161 ; ঋ. ৪. ৩০. ১৪।
৫ *Religion Vedique*, ii. 242f.
৬ ঋ. ৮. ৬৮, ১৬, ১৭।
৭ বো-রো.
৮ Macdonell : *Vedic Mythology*, 147 ; বালখিল্য ৫. ২।
৯ Pargiter : *Ancient Indian Hist. Tradition*, ch. xi. xii.
১০ ঐ

গ্রন্থপঞ্জী

[VI ; বো-রো ; Ludwig : Translation of the Rigved, iii. 123 ; Bloomfield : American Journal of Philosophy, xvi. 426 ; JRAS 1918]

[বঙ্গীয় মহাকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬০]

প্রসঙ্গ-কথা

1 বের্গেন : 'অদিতি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

2 রোট : ঐ

3 ম্যাকডোনেল : 'অথর্ববেদ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

4 কীথ (Keith, Sir Arthur Bradley) (1866— ?) : বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত। বেদ, পুরাতত্ত্ব, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অনেক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ আছে। এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর (১৯৩০—৩৩)। গ্রন্থ—Aitareya Aranyaka (Oxford, 1909), The Veda of the Black Yajus School (1914), Rigveda Brahmanas (Tr, 1920), Religion and Philosophy of the Vedas and Upanishads, 2 vols. (Cambridge, 1925). A History of Sanskrit Literature (Oxford, 1928).

5 পার্জিটার : 'অত্রি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

ভারতে লিপির উৎপত্তি

প্রাচ্য-ভাষাভিজ্ঞ প্রথিতনামা বিদেশীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, লিখন-প্রণালী বিদেশ হইতে ভারতে প্রচলিত হয়। কিন্তু, কেমন করিয়া কোন্ সময়ে এ ব্যাপার সংঘটিত হয়, সে বিষয়ে তাঁহাদের আদৃশ সন্তোষ-জনক কোনরূপ ইঙ্গিত জানিতে পারা যায় না। মহামতি স্যর উইলিয়ম জোন্স[1] (১৮০৬ খ্রী.) সর্বপ্রথম ভারতীয় লেখন-প্রণালীর সেমিটিক উদ্ভবের আভাস দিয়া যান। কিছুকাল পরে সুপণ্ডিত কপ[2] (১৮২১ খ্রী.) সাধারণ্যে দেখাইলেন যে, দেবনাগরী বর্ণমালা বিদেশীয় সেমিটিক বা সাইরোআরেবিয়ান হইতে উদ্ভূত।

পরে, ১৮৩৪ খ্রী. সুলেখক ড. আর. লেপসিয়স[3] এই মতের সমর্থন করেন। তারপর, ১৮৬৫ খ্রী. অধ্যাপক বেবের[4] (Weber) এই পণ্ডিত-দ্বয়ের অভিমত সংরক্ষণের জন্য দৃঢ়তর যুক্তি দেখান। ফলত, এই ব্যক্তিই সর্বপ্রথম এই মত বা theoryর যাথার্থ্য-প্রমাণের জন্য প্রকৃত তর্কজাল বিস্তার করেন। ইনিই এই মতের প্রথম ও প্রধান সমর্থক। অধ্যাপক টমাস[১], বেনফী[১], ম্যাক্‌সমুলর[২] [6] ও হুইটনী[৩] [7] নামক অধ্যাপকত্রয়ও কপ মহাশয়ের মত সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। পট[৪] (Pott), বেস্‌টারগার্ড (Westergard)[9], বুহ্‌লর[10] (Buhler), সেস[11] (Sayce) এবং লেনরমান্ট[12] (Lenormant) প্রভৃতি পণ্ডিতগণও তেমন কোনও যুক্তি দেখান আর না দেখান, ভারতীয় বর্ণমালার জন্মটা যে সেমিটিক তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে, কেহ বা স্পষ্টত, কেহ বা

অস্পষ্টত, এইটুকুই প্রভেদ। ড. ডেকে[13] (Decke) আবার এক অদ্ভুত মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতীয় বর্ণমালা সেমিটিক হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহার নিস্তার নাই। তিনি ইহাকে আর একমাত্রা উপরে তুলিয়াছেন। তিনি বলেন,—দক্ষিণ সেমিটিকের মধ্য দিয়া আসিরীয় কিউনিফরম্ হইতে ভারতীয় লিপির জন্ম। ড. বর্নেল[14] (Burnell) স্থির করিয়াছেন যে, ফিনিসীয় উৎপন্ন পারস্য অথবা বাবিলোনিয়ার আরামীয় হইতে পালি অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা ভারতে লিপির উৎপত্তি-বিষয়ে এই এক প্রকারের মত উল্লেখ করিলাম[৫]।

প্রিন্সেপ[15] (Prinsep) এক অভিনব মত প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে, অশোক-বর্ণমালার যা কিছু বিশেষত্ব সে সমস্ত নাকি গ্রীক-বিজয়ের চিহ্ন। এই মতের পোষকতার জন্য তিনি কয়েকজন পণ্ডিতও পাইয়াছেন। ওটফ্রীড মুলর[16] (Otfried Muller), মুসো সেনার[17] (Senart) এবং মুসো জোসেফ হালেভি[18] (Joseph Halevy)—উক্ত মতাবলম্বীদিগের অগ্রণী। গ্রীক বা ফিনিসীয় আদর্শে যে অশোক-বর্ণমালা গঠিত হইয়াছিল, তাহা ড. উইলসনও দেখাইতে ভোলেন নাই।

এই কয়েকটি মতাবলম্বী এবং স্বনামধন্য ফ্লীট[19] ও টেলর[20] ভিন্ন প্রধানত আর কাহাকেও ভারতীয় লিপিপ্রথা বিষয়ে বড় বেশী কিছু বলিতে শোনা যায় না। তবে ভারতীয় লিপিপ্রথার স্বদেশ-সম্ভবের সম্ভাবনা-বিষয়ে ছয় জন ইউরোপীয় পণ্ডিতের উক্তি জানিতে পারা যায়। সেই ছয় জন কীর্তিমান ব্যক্তির নাম—এডওয়ার্ড টমাস[21], অধ্যাপক ক্রিশ্চিয়ান লাস্‌সেন[22], অধ্যাপক জন ডাউসন[23], অধ্যাপক জেসেনিয়স[24], জেনেরেল কানিংহাম[25], এবং লণ্ডন ইউনিভারসিটির অধ্যাপক গোল্ডস্টুকার[26]।

টমাস মহাশয় (১৮৬৬ খ্রী.) বলিয়াছেন যে, ভারতীয় বর্ণমালার আদি দ্রবিড়ীয় বর্ণমালা। ইনি সেমিটিক-সম্ভূতি-বিপক্ষে বহু যুক্তি দেখাইয়া তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অধ্যাপক লাস্‌সেন ভারতীয় বর্ণমালার বৈদেশিক উৎপত্তি-বিপক্ষে সহস্র যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সাহস সহকারে নির্ভয়ে বলিয়াছেন যে, ভারতীয় বর্ণমালার সৃষ্টি কখনই বিদেশে হইতে পারে না;—ভারতীয় বর্ণমালার জন্ম ভারতে। অধ্যাপক ডাউসন বলেন—

ভারতের বর্ণমালায় এ প্রকারের বিশেষত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে যে, তাহাতে ইহাকে কখনই বিদেশজাত বলা যায় না। ইহার ভারতে সৃষ্টির অনুকূল কারণ যথেষ্ট বর্তমান।

অধ্যাপক জেসেনিয়স্ ও গোল্ডস্ট্কার এই অধ্যাপকদ্বয় তাঁহাদের সুতীক্ষ্ণ যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন যে ভারতের এমন অবস্থা কোন দিন হয় নাই, যেদিন তাহাকে বিদেশ হইতে বর্ণমালা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কানিঙ্হামও এই মতের অন্তবর্তী। এইরূপ ভারতীয় লিপি-বিষয়ে ইউরোপীয়গণ নিজ নিজ যুক্তি ও মত দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, অতি ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয়, দাক্ষিণাত্যের দুই-একটি পণ্ডিত ও বঙ্গের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল[27] এবং বঙ্গের সাহিত্যরথী অক্ষয়কুমার[28] ব্যতীত অধুনাতন কিঞ্চিৎকাল পূর্ববর্তী ভারতের কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুধীব্যক্তি এই ঘোর বিবাদসঙ্কুল জটিল ব্যাপারের স্থিরীকরণে আদৌ তাঁহার সুচতুর মস্তিষ্ক পরিচালন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, এ বিষয়ে তাঁহারা একপ্রকার নীরব। লাস্সেন ও কপ, ডাউসন ও ম্যাক্সমুলরের মতের সঙ্গে স্বদেশীয় পণ্ডিতদিগের মত প্রসঙ্গ না জানি আমাদের কি গৌরবেরই হইত!

আর্যজাতির আদি জ্ঞানেতিহাসে, সংস্কৃত ভাষা, যে কি অত্যুচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, মানবের মানসচরিত্র ও মানসগতিতে সংস্কৃত ভাষা যে আশ্চর্য দৃষ্টান্ত পাইয়াছে—এবং আর্যদিগের অতীত গৌরব কাহিনীর যে কত শত সুন্দর নিদর্শন এই সংস্কৃত ভাষা স্ববক্ষে ধারণ করিয়াছে, তাহা কোন্ ইতিহাসপাঠকের অজ্ঞাত? আর্যগণ সুপ্রাচীন বৈদিককালের মন্ত্রযুগে নানাবিধ স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার এবং বিবিধ বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করিতেন। গজদন্তের বহুবিধ কারুকার্য ও প্রস্তরখচিত সুরম্যগৃহনির্মাণে সবিশেষ নিপুণ ছিলেন—তাঁহারা সূচীকার্য ও ধাতু ব্যবহারে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন—সূক্ষ্ম-বস্ত্র ও মেষলোমের বিবিধ বহুমূল্য বস্ত্র বয়ন করিতেন। এমন কি তখন যুক্তিবিষয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতারা নিরূপিত নিয়মানুসারে চলিত। তাঁহাদের তৎকালে চিকিৎসাবিদ্যা, বিবিধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং সভ্য সমাজের উচ্চ আদর্শও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু, ঈদৃশ মহোচ্চসভ্যতারূঢ় সুতীক্ষ্ণজ্ঞানসম্পন্ন জাতি যে স্বকীয় পুরাবৃত্ত বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও মনোযোগ

দেন নাই—বলিতে কি, অবহেলানিবন্ধন সামান্ত কালনিরূপণ বিষয়েও যে জগতের অন্যান্য কয়েকজাতির নিকট আপনার অজ্ঞতা পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিতান্তই শোচনীয়। কিন্তু, যৎকালে জগতের তাবৎজাতি অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন হইয়া বন্য পশুর ন্যায় অসভ্যাবস্থায় কালযাপন করিতেছিল, যৎকালে বর্ণমালার সৃষ্টি বিষয়ে অন্যান্য জাতি কল্পনাও করেন নাই, তৎকালে আর্যজাতি সুগভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া রাশি রাশি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানগর্ভ দেবভাষার মধুর সৌরভে সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত আমোদিত করিয়াছিলেন। কিন্তু, তথাপি আমাদিগকে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের পূর্বপুরুষদিগের অবহেলানিবন্ধন আজ আমরা ভারতে লিপির কখন ও কোথায় উৎপত্তি হয়, তাহার যথাযথ উত্তরদানে অসমর্থ। তবে, আমরা যথাসাধ্য ভারতীয় লিপির প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, বৌদ্ধসম্রাট্ অশোক বা প্রিয়দর্শীর ঘোষণাপত্রই ভারতে প্রাচীনতম—অন্তত প্রাচীনতম লিপি বলিয়া প্রখ্যাত। তাঁহারা বলেন, অশোকের পূর্বে ভারতে কোন উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু, আমাদের ধারণা, এটি তাঁহাদের ভুল বিশ্বাস। কেন, না, সেদিন পেপী[২৩] কপিলবস্তুর নিকট পিপ্‌রাও নামক স্থানে এক স্তূপ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাতে বুদ্ধের (শাক্যমুনি) দেহাবশেষ ও একরূপ উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। আবার, সাঞ্চী নামক স্থানে এক স্তূপ-মধ্যে দুইটি স্ফটিক পাত্র পাওয়া যায়। সেই দুইটি পাত্রে বুদ্ধের প্রিয়তম শিষ্য সারিপুত্র ও মহামৌদ্‌গল্যায়নের অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার একটি পাত্রের আবরণের উপর 'সারিপুতস' (সারিপুত্রস্য) এবং অন্যটির উপর 'মহামোগলানস' (মহামৌদ্‌গল্যায়নস্য) ক্ষোদিত থাকে। ইহাতেও একরূপ উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে। তথাপি পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহাশয়েরা যে কেন অশোকলিপিকেই ভারতের আদিলিপি বলিয়াছেন, তাহা জানি না। আরও তাঁহারা বলেন যে, অশোকলিপির পূর্বে কোন লিপি উৎকীর্ণ হয় নাই বলিয়াই অশোকলিপিই ভারতের আদিলিপি। তাঁহাদের এ যুক্তি নিতান্তই অসার। কেন না, তাঁহারা কোন উৎকীর্ণ লিপি পান নাই

বলিয়া যে পূর্বতন ভারতবাসী লেখনপ্রণালী জানিতেন না, তাহার প্রমাণ কি?

উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে অশোকের ঘোষণাপত্রসকল দুইটি বিভিন্ন বর্ণমালায় লিখিত। তাঁহারা বলেন, ব্রাহ্মণেরা যে প্রকার লিপি ব্যবহার করিতেন, তাহা দেখিয়া তাঁহাদিগকে কখনই আদিলিপি প্রবর্তক বলিয়া অনুমিত হয় না। তাঁহারা এই সমস্ত লিপির গঠনপ্রণালী দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, অশোকলিপির অর্ধশতাব্দী পূর্বে লিপিপ্রথা যৎসামান্যই উত্তর ভারতে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সুতরাং ২৫০ খ্রী-পূ. অশোকের শিলালিপিকাল বলিয়া স্বীকার করিলে সম্ভবত ৩০৪ খ্রী.-পূর্বাব্দে উত্তরভারতে কিয়ৎপরিমাণে লিপিপ্রথা প্রচারিত ছিল, ইহা বলিতে হয়। কিন্তু আমরা বলি—অশোক যে নানাস্থানে শিলালিপি স্থাপন করিয়াছিলেন; তাহার এক বিশেষ কারণ ছিল। সেটি তাঁহার নিজ শাসন ভারতের অপর সাধারণকে জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্য। কিন্তু, প্রাচীন আর্যযুগে শিক্ষাবিধি স্বতন্ত্র থাকায় শিলালিপি প্রভৃতি দ্বারা উপদেশাদি দানের কোন আবশ্যক হয় নাই। বৌদ্ধেরা যেমন রোগের অবস্থাব্যবস্থা সমস্তই প্রস্তরস্তম্ভাদিতে লিখিয়া রাখিতেন—সেইরূপ তাঁহারাই আবার শিলালিপি স্থাপনের রীতি প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যদি অশোকের পূর্বে শিলালিপি ইত্যাদি নাই পাওয়া যায়, তাহাতে আমাদের লিখনপ্রণালীর অবিদ্যমানতা পক্ষে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

৩০০ খ্রী.-পূর্বে লিখনপ্রণালী বিদ্যমান ছিল না, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, 'Reliqua Arriani et Scriptorum de rebus Alexandri' (Frg. F.D.C. Muller, Paris, 1846. p. 46) অর্থাৎ আর্যদিগের প্রাচীন সম্পত্তি ও আলেকজান্দারের 'লিপি' নামক গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণ-স্মৃতি-ব্যবস্থাসমূহ তৎকালে লিপি আকারে গ্রথিত ছিল না। নেয়ারখুস্[৩০] (Nearchus) রচিত এই পুস্তকখানির রচনাকাল ৩২৫ খ্রী-পূ.। কাজেই, ইউরোপীয় মহাত্মাদিগের উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশের যথেষ্টই সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ নেয়ারখুসই আবার গ্রন্থান্তরে (U. S., p. 64. a) উল্লেখ করিয়াছেন যে,

ভারতবাসীরা কার্পাসবস্ত্র বা কাগজে অক্ষর যোজনা করিত। সুতরাং ইউরোপীয়দিগের দোহাই যে নিতান্ত অযৌক্তিক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে নেয়ারখুসের কিয়ৎকাল পরে ৩০২ খ্রী-পূ. মেগাস্থিনিস[৩১] উল্লেখ করেন যে ভারতবাসীদিগের কোন লিখিত পুস্তক ছিল না। তাহারা অক্ষর ও Grammata জানিত না, Sealও ব্যবহার করিত না। অধিকন্তু, তিনি এরূপও উল্লেখ করেন যে, হিন্দুগণ শাখাপথ (bye-road) ও তদন্তর্বর্তী স্থানবিজ্ঞাপক ১০ স্টেডিয়াম্ (stadium) দূরবর্তী এক-একখানি দূরত্ব-নির্দর্শক প্রস্তর অর্থাৎ mile-stone রাখিতেন[৭]। প্রতিবাদচ্ছলে যদি কেহ মেগাস্থিনিসের উক্তি উদ্ধার করেন, তদুত্তরে আমরা বলি যে, নেয়ারখুস্ ও মেগাস্থিনিস উভয়ের কেহই তাঁহাদের মন্তব্য প্রতিপাদক কোন যুক্তি দেখান নাই। অথচ, উভয়েই প্রায় সমকালবর্তী। সুতরাং আমরা নেয়ারখুসের উক্তির প্রতি অনাস্থা-প্রদর্শনের কোন কারণই দেখি না। আর মেগাস্থিনিস বর্ণিত মাইলস্টোনগুলি যে প্রস্তর নির্মিত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। পরন্তু, সেই প্রস্তরসমূহে দূরত্বজ্ঞাপক কোন চিহ্নাদি ছিল কি না, তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ বিদ্যমান। কেন না, পুরাতত্ত্ব-বিদ্ বর্নেল সাক্ষ্য দিতেছেন যে অদ্যাপি তৎকালীন কোন মাইলস্টোনই পাওয়া যায় নাই (S. I. P., p. 2)। তবে, অশোকের শিলালিপি দ্বারা এইমাত্র প্রমাণিত হইতে পারে যে, ২৫০ খ্রী.-পূর্বাব্দে ভারতে লিপি প্রথা প্রচলিত ছিল এবং ইহা পূর্ববর্তী কোন লিপি প্রথার ক্রমান্বয়। ইহা যে পূর্ববর্তী কোন লিপির ক্রমান্বয় তাহার বিশিষ্ট কারণ এই যে, সেই শিলা-লিপিতে সর্বপ্রকার অনিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। স্পষ্ট বোধের জন্য দু-একটি উদাহরণও দেখান যাইতে পারে।

১। ৩য় শিলালিপিতে দেখা যায় 'অনপিতম্'
৪র্থ " " 'অনপায়িসতি'
৬ষ্ঠ " " 'আনাপিসতি'

২। যে যে স্থলে প্রত্যেক ব্যঞ্জনের পুনরুক্তি হওয়া উচিত, সেই সেই স্থলেই তাহার লোপ হইয়াছে, যথা—'পিয়স', 'জনস', 'আরভিসন্তে', 'দুকরম্', স্বগরম্ ইত্যাদি।

৩। আবার বর্ণ নির্ণয়ও এক প্রকারের নয়। ভারতের দক্ষিণদেশীয় শিলালিপিতে দেখা যায়—'এতারিসম্' অপিচ 'এতাদিসম্'; পুনশ্চ দক্ষিণ শিলালিপিতে 'অনথেসু' এবং কপুর্দগিরির উত্তর শিলালিপিতে 'অণথেসু', অধিকন্তু, দক্ষিণ শিলালিপিতে 'দসন' ও 'দসণ' উভয় প্রয়োগেই দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। ব্যঞ্জনের পূর্বে যদৃচ্ছাক্রমে অনুনাসিক প্রয়োগ দেখা যায়। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ বর্নেলের অনুমান এই যে যখন মিস্ত্রীরা পর্বতে অক্ষর ক্ষোদিত করিয়াছিল, তখন তাহাদের অনবধানতাতেই এরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছে। অধ্যাপক বাসিলজিউ[৩২] (Wassiljew) এই মতের পক্ষপাতী। তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, অনতিকাল বিলম্বে বৌদ্ধগণ তাহাদের ধর্ম-শাস্ত্রগুলি 'লিখিত' বলিয়া ইঙ্গিত করে (Der Budhisimus, p. 30 (28)। এক্ষণে দেখা যাউক, খ্রী.-পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতে ব্যবহৃত দুই প্রকার বর্ণমালা কোথা হইতে আসিল। বর্নেল বলেন, ৩০০ পূর্ব-খ্রীস্টাব্দের কয়েক শতাব্দী পূর্বে পশ্চিমাঞ্চলে ও পারস্যদেশে তৎকাল প্রচলিত কতকগুলি বিভিন্ন প্রকারের লিপি-প্রণালী ভারতবাসীদিগের জানা ছিল। সলোমনের[৩৩] নিমিত্ত ফিনিসীয়গণ সম্ভবত দক্ষিণ ভারতে আসিয়াছিল এবং তথায় 'ময়ূর' লইয়া যায়। এ ঘটনা সত্য হইলে আমরা নিঃসন্দেহে ময়ূরার্থ হীব্রু 'তুকি' (Tuki) শব্দকে তামিল 'তোকাই' শব্দজাত বলিতে পারি (Dr. Caldwell[৩৪] Com. Gram., p. 66)। পারসিকগণ দরায়ুসের[৩৫] অধিকারকালে ৫০০ খ্রী.-পূর্বাব্দে পঞ্জাব ও উত্তরভারত আক্রমণ করে এবং 'পার্সিপলিস্' ও 'নকৃষেরুস্তমের' শিলালিপিতে 'ভারত' ২১শ ও ১৩শ বিভাগ বলিয়া ক্ষোদিত হইয়াছে।

ম্যাক্‌সমূলর উল্লেখ করেন যে, এইরূপে আলেকজান্দার কর্তৃক ভারতাক্রমণের পূর্বে অন্য জাতীয়দিগের নিকট হইতে লিপিপ্রণালী শিক্ষা করিবার পক্ষে অথবা স্বয়ং এই প্রণালী সৃষ্টি করিবার পক্ষে ভারতবাসীদিগের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল। কেন না, ভারতবাসীদিগের এই পদ্ধতির উদ্ভাবন বা পোষণ পক্ষে সামান্য মাত্রও চিহ্নাদি অদ্যাবধি দৃষ্ট হয় না। ইঁহারা যে অন্যকৃত লিপিপদ্ধতির অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই

স্বীকার করিতে হইবে। এদিকে অশোক শিলালিপিতে যে দুই প্রকারের বর্ণমালার পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে উত্তর বর্ণমালার সহিত আরেমেক বর্ণমালার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় এবং দক্ষিণ প্রদেশস্থ বর্ণমালার কতকগুলিও যে সেই একই মূল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই অনুমান করা যায়। ইহাই ম্যাক্সমুলরের মত।

শুধু তাহা নহে,—অধিকদিনের কথা নয়,—বর্নেল সাহেব সংবাদ দিয়াছেন যে দক্ষিণ ভারতে তৃতীয় এক প্রকারের বর্ণমালা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীন তামিল নামে বিখ্যাত, তাহাও সেই একই মূল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই বর্ণমালা যদিও অশোকের বর্ণমালার সহিত কতক সংস্রবযুক্ত, তথাপি অশোকের বর্ণমালা হইতে ইহা স্পষ্টত উৎপন্ন নহে অথবা উক্ত বর্ণমালা এই তামিল বর্ণমালা হইতে সমুৎপন্ন নয়। শেষোক্ত দুইটি বর্ণমালার সেমিটিক বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত হওয়ার পক্ষে তাঁহাদের বিশিষ্ট প্রমাণ বোধহয় এই—

উক্ত শিলালিপিতে শেষোক্ত দুইটি বর্ণমালাতেই স্বরবর্ণ নিরূপণপক্ষে নিয়মের যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। সেমিটিক বর্ণমালার ন্যায় এই দুই বর্ণমালার আদ্যবর্ণ আছে; কিন্তু, শব্দের মধ্যে কোন ব্যঞ্জনবর্ণের পর ইহার উচ্চারণ হইয়া থাকে; প্রাচীন তামিল বর্ণমালায় আদিবর্ণ "ই" ও "উ", ব্যঞ্জনবর্ণ "y" ও "v" হইতে সামান্যই পৃথক্। সমস্তই স্বীকার করিলাম। কিন্তু, কোন্ ইউরোপীয় পণ্ডিত না বলিবেন যে, যে সমস্ত ভাষায় স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনের উপর নির্ভর করে, সেই সমস্ত ভাষার উপযোগিতা নিমিত্ত ফিনিসীয় বর্ণমালার উৎপত্তি? সেমিটিক বা সাইরোআরেবিকে সে নির্ভরতা আছে, তাই তাহা ফিনিসীয় হইতে উদ্ভূত বলিতে পারা যায়। কিন্তু সংস্কৃত বা দ্রবিড়ীয় ভাষায় সে নির্ভরতা আছে কি? তবে ইহাদিগকে কেন সেমিটিক বা ফিনিসীয় হইতে উৎপন্ন বলিতে যাইব? ভারতীয় লিপিপ্রথা কখনই ফিনিসীয়দিগের নিকট হইতে গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, খ্রী.-পূ. চতুর্থ বা তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতে (অবশ্য ইউরোপীয়দের মতে) লিপিপ্রথার আরম্ভ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে খ্রী.-পূ. নবম শতাব্দীর পর, যে ফিনিসীয়গণ ভারতবাসীদিগের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে

পরিহার করে, সেই ফিনিসীয়দিগের নিকট হইতে খ্রী.-পূ. চতুর্থ বা তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবাসীরা কখন লিপিপ্রথার অনুকরণ করিতে পারে না। যদি তাঁহারা অন্য কোন যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মনস্কামনা কতক সিদ্ধ হইতে পারিত। এক্ষণে ফিনিসীয়দিগের বর্ণমালা হইতে ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি কল্পনা না করিলে ম্যাক্সমূলর মহাশয়ের বাক্যের যাথার্থ্য বোধগম্য হয় না। এদিকে আবার কপুর্দগিরিতে অশোকের যে উত্তর-শিলালিপি রক্ষিত আছে, ইউরোপীয়গণ বলেন, তাহা অন্যান্য সেমিটিক বর্ণমালার ন্যায় দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামভাগে সমাপ্ত, (আমরা কিন্তু ইহাকে বাম হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণদিকে পাঠ করিয়াছি)। যাহা হউক, দক্ষিণ-শিলালিপির বর্ণমালা যদিও বিপরীত ভাবাপন্ন, তথাপি শিলালিপি পাঠে, তাঁহারা নাকি স্পষ্ট বুঝিয়াছেন যে একসময় এই বর্ণমালার আরম্ভ দক্ষিণদিকেই ছিল। ইহাই অধিকাংশ পণ্ডিতদিগের মত। তাঁহাদের মত এই যে, এই বর্ণমালার সহিত হিমীরাইটিক বর্ণমালার বিশেষ সাদৃশ্য আছে এবং ইহাও সেই বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত। হিমীরাইটিক্‌দিগের নিকট ভারতীয়দের লিপিপ্রথা শিক্ষা বড় আশ্চর্যের বিষয়। কোন্ যুক্তিবলে ইহা স্থিরীকৃত হইতে পারে যে দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের লোকেরা খ্রী.-পূ. চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতকে বর্ণমালা-শিক্ষায় সহায়তা করিয়াছিল ? বিদ্বন্মণ্ডলীর সকলেই বিদিত আছেন, সেদিন একজন ফরাসী পর্যটক যে বুট্রোফীডন্ হিমীরাইটিক (Boutrophedon Himyaritic) শিলালিপির আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অক্ষর বামদিক্ হইতে দক্ষিণদিকে অবস্থিত (Letter by von Maltzan in the Allg. Zeitung for March 1st 1871, pp. 10-11)। এ ক্ষেত্রে অশোকলিপি যাহা বিপরীত ভাবাপন্ন, তাহা কিরূপে হিমীরাইটিক সম্ভূত হইতে পারে। প্রত্যুত খ্রী.-পূ. চতুর্থ শতাব্দীতে হিমীরাইটিক সভ্যতা সম্পাদিত হইয়াছিল কি না তদ্বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। মুসো হালেভি (Halevy) হিমীরাইটিক সভ্যতার কাল খ্রী.-পূ. চতুর্থ শতাব্দী বলিয়া অনুমান করেন। অধিকন্তু, যে হিমীরাইটিক্‌দিগের স্বরবর্ণের আদৌ প্রয়োগ নাই—তাহারা কেমন করিয়া স্বরবিপুল সংস্কৃত পালি

প্রভৃতি ভাষা-প্রয়োগকারী ভারতীয়দিগকে লিপিমালা যোজনা করিতে শিখাইবে ?

মহারাজ অশোকের লিপি পালিভাষায় লিখিত। ইহা সর্বজনসম্মত। কিন্তু আমরা পালি অক্ষরগুলি বিদেশী অক্ষরসম্ভূত ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। আমাদের স্বপক্ষ সমর্থনের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আমাদের মতে, যদি পালি অক্ষর ফিনিসীয়, আরমীয় অথবা হিমীরাইটিক ইত্যাদি কোন বর্ণমালা হইতে গঠিত হইত, তাহা হইলে ইউরোপীয় পণ্ডিতজন কল্পিত গান্ধার লিপির কোন মূল, পালির আকার ও উচ্চারণগত কিছু না কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু, দুঃখের বিষয় উক্ত ভাষার আকৃতি ও উচ্চারণের তুলনায় আমরা কিছুই সাদৃশ্য দেখিতে পাই না। পালির সহিত তুলনায় আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

১. মিসর দেশের কোন একটি অক্ষর পালির সমোচ্চারণযুক্ত কোন একটি অক্ষরের সদৃশ নয়।

২. ফিনিসীয় বর্ণমালায় ২২টি অক্ষরের মধ্যে কেবল একটি মাত্র 'গিমেল' অক্ষর পালির 'গ'র সহিত কতকটা তুল্যাকারবিশিষ্ট।

৩. হিমীরাইটিক অক্ষরগুলির সহিত পালির কেবল 'দ' ও 'ব' এই দুইটি অক্ষরের কথঞ্চিৎ ঐক্য আছে।

৪. আরমিয়ান অক্ষরগুলির মধ্যে একটি মাত্র অক্ষরও পালির সহিত মিলে না। তবে যদি ইহার 'শ'র স্থানাপন্ন অক্ষরকে উল্টা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে ইহা পালির 'শ'র সহিত কিঞ্চিৎ মিলিলেও মিলিতে পারে।

ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ফিনিসীয় বর্ণমালার সহিত গান্ধার অক্ষরের যতটুকু সাদৃশ্য, পালির সহিত তাহাদের শতাংশের একাংশেরও সাদৃশ্য নাই। পালির সহিত ফিনিসীয় ইত্যাদি বর্ণমালা কণামাত্রও মিলে না। সকলেই জানেন, পালি ও গান্ধার লিপিতে পরস্পর ঐক্য নাই। সুতরাং ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে দুইটি লিপি একটি লিপির শাখা নহে অর্থাৎ গান্ধারলিপি সেমিটিক বর্ণাত্মক এবং পালিলিপি সেমিটিক হইতে পৃথক।

ফিনিসীয় বর্ণমালা হইতে জাতভাষার স্বরবর্ণ পৃথক হয় নাই। ইহাদের অক্ষর দ্বারাই স্বরের কার্য হয়। কিন্তু পালিতে ব্যঞ্জনের সহিত চিহ্নমাত্রই অবস্থিত রহিয়াছে। গ্রীক, ইংরেজি, হিমীরাইটিক, মিডিয়ান, ইথিয়পিক, আরবী, কুকী পহলুই, ইত্যাদি যে সমস্ত লিপি ফিনিসীয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের ক্রম (অ-ব-গ-দ-হ ইত্যাদি) ফিনিসীয় বর্ণমালার সহিত মিলে। কিন্তু, পালির বর্ণমালার ক্রম ঐরূপ নয়।

এই সকল কারণ হইতে প্রতীতি হইতেছে যে পালিলিপি ফিনিসীয় অথবা তজ্জাত কোন লিপি হইতে গঠিত হয় নাই। ইহা ভারতে আর্যগণ কর্তৃক নির্মিত স্বতন্ত্র একটি লিপি। ইহা হইতেই ভারতের বাহিরে সিংহল, যবদ্বীপ প্রভৃতির এবং তিব্বত হইতে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত মধ্য এসিয়ার লিপি-নিচয় গঠিত হইয়াছে; তবে ডাক্তার ওয়েস্টে, মুলর, ডাক্তার স্টিভেন্সন, ডাক্তার গোল্ডস্মিথ, লেনরমাণ্ট, বর্নেল প্রভৃতি পালির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়াছেন—তৎসমুদয় যে অযৌক্তিক, তাহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। পালি অক্ষরের সহিত যে আরমিয়ান অক্ষরের আদৌ মিল নাই, তাহা আইজাক টেলারও দেখাইয়াছেন।

ডাক্তার বুহ্‌লরের মতে প্রাচীন ভারতে দুই প্রকারের অক্ষর ব্যবহৃত হইত। তাহাদের নাম 'খরোষ্ঠী' ও 'ব্রাহ্মী'। খরোষ্ঠী খ্রী-পূ. চতুর্থ শতাব্দী হইতে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ব্যবহৃত হইত। ইহার ব্যবহার পূর্বে অফগানিস্তান এবং উত্তর পঞ্জাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল (৬৯° হইতে ৭৩°৩০′ পূর্বে এবং ৩৩° হইতে ৩৫° উত্তরে) ইহা বাম হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে সমাপ্ত হইত। কিন্তু অপর বর্ণমালা 'ব্রাহ্মী'ই এতদুভয়ের মধ্যে প্রাচীনতর। ইহাই জাতীয় বর্ণমালা। ইহা হইতে অন্যান্য বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথমত ইহা দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামে লিখিত হইত। ডাক্তার বুহ্‌লর বলেন যে ইহা ফিনিসীয় বর্ণমালার প্রাচীনতম কোন লিপি হইতে উৎপন্ন। তিনি এরূপ বলেন যে, বর্ণমালা ভারতীয় বণিক্ সম্প্রদায় কর্তৃক মেসোপটোমিয়া হইতে ৮০০ পূর্ব-খ্রীস্টাব্দে ভারতে আনীত হয়। ৫০০ খ্রী-পূ. হইতে ২০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শিলালিপিগুলি প্রাকৃতে অবস্থিত ছিল। সংস্কৃত শিলালিপির আরম্ভ ২০০ খ্রীস্টাব্দ। সংস্কৃত

ভাষায় যে প্রাচীনতম নাগরী শিলালিপি আছে, সে গুলির সময় ৭৫৪ খ্রীস্টাব্দ। আর, এই বর্ণমালায় যে সমস্ত প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কোনটিই খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে নাগরীর প্রভাব পূর্বদিকে বহুল বিস্তৃত হইয়াছিল এবং কালক্রমে ইহা হইতে বাংলা বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছিল। কতকগুলি খরোষ্ঠী সংখ্যা দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহারা আরামেক সমুৎপন্ন। বহু প্রাচীনকাল হইতে ৬০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি অক্ষরের সাহায্যেই ব্যবহৃত হইত। এইগুলি প্রাচীন মিসর হইতে গৃহীত হইয়াছিল। এই-রূপভাবে বুহ্‌লর নিজমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি এইরূপে বর্ণের উৎপত্তি দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা তাঁহার মতের পক্ষপাতী নহি। ডাক্তার বুহ্‌লরের ন্যায় ডাক্তার টেলর ইত্যাদি পণ্ডিতগণ ভারতীয় লিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তৎসমুদয়ের আলোচনা করিতে গেলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে। কাজেই আমরা এই ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধে বাহুল্য ভয়ে সেগুলির আলোচনায় বিরত রহিলাম।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি—লেখনপ্রণালী যে ভারতের বহিঃপ্রদেশে ব্যবহৃত হইত, হিন্দুরা তাহা জানিতেন। আমাদের এই দৃষ্টান্ত পাণিনির ৪।১।৪৯ সূত্র হইতে বেশ বুঝা যায়। এই সূত্রে তিনি যবনানী—শব্দের ব্যুৎপত্তি শিক্ষা দিয়াছেন। ইউরোপীয়দিগের মতানুসারে খ্রী-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত পতঞ্জলিকৃত পাণিনির মহাভাষ্য অনুসারে, পাণিনি যবনদিগের লিপির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এখন, এই যবন শব্দের অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য। পাণিনির সূত্র ও মহাভাষ্য নিম্নে প্রকটিত হইল। সূত্র যথা—

'ইন্দ্র-বরুণ-ভব-শর্ব-রুদ্র-মৃড়-হিমারণ্য-যব-যবন-মাতুলাসার্যাণাম্ আণুক্'

মহাভাষ্য যথা—

'হিমারণ্যয়োর্ মহত্ত্বে'। 'হিমারণ্যয়োর মহত্ত্ব' ইতি ব্যক্তব্যম্। মহদ্‌ধিমন্ হিমানী। মহদ্ অরণ্যন্ অরণ্যানী। 'যাবদ্ দোষে' 'যাবৎ দোষ' ইতি ব্যক্তব্যম্। দোষো যবো যবানী। যবনাল্লিপ্যাম্। 'যবনাল্ লিপ্যাম্' ইতি ব্যক্তব্যম্। যবনানী লিপিঃ।" ইত্যাদি।

পতঞ্জলির পূর্ববর্তী পাণিনির বার্ত্তিককার কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি উভয়েই যবনানী অর্থে যবনলিপি বুঝিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, যবন শব্দটি যখন জাতিব্যঞ্জক, তখন যে নিশ্চয়ই পাণিনির পূর্বে ভারতে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু পাণিনির পূর্বে বলিলে কোন্ সময় বুঝায় তাহা স্থির করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গোল্ডস্টুকার তাঁহার "Panini's Place" নামক গ্রন্থের ২২৫-২২৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, পাণিনি বুদ্ধদেবের আর্বিভাবের পূর্বে জীবিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রধান যুক্তি এই যে 'নির্বাণো বাতে' এই অষ্টম (২৫০) সূত্র বুদ্ধদেবের নির্বাণার্থ বিজ্ঞাপক বা পোষক নহে। অতএব পাণিনি বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী। এই একই সূত্র আবার শাকটায়নের (৪. ১. ২৪৯) ব্যাকরণে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং ভাষ্যকার যক্ষবর্মন এরূপভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যেন গোল্ডস্টুকারের ব্যাখ্যা নিতান্ত রূঢ় বলিয়া বোধ হয়।—'অবাতে কর্তরি। নির্বাণো মুনিঃ। নির্বাণঃ প্রদীপঃ। অবাত ইতি কিম্। নির্বাতো বাতঃ। নির্বাতেণ বাতে।' আবার অধ্যাপক বেনফী (Geshichte d. Sprachwissenschaft, p. 48 n. 1) পাণিনিকে প্রায় ৩২০ পূর্ব খ্রীস্টাব্দের ব্যক্তি বলেন। অধুনাতন অধ্যাপক ঔফ্রেক্ট (Aufrecht)-এর মতে, পাণিনি খ্রী-পূ. চতুর্থ শতাব্দীর বৈয়াকরণ। লাস্সেনের মতে পাণিনি ৩২০ খ্রী-পূ. জীবিত ছিলেন। কেহ কেহ আবার এমনও বলিয়া থাকেন যে, তিনি খ্রী-পূ. দ্বিতীয় শতাব্দীর ব্যক্তি। কেবল একমাত্র ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র পাণিনিকে খ্রী-পূ. দশম শতাব্দীর বৈয়াকরণ বলিয়াছেন। এক্ষণে পাণিনির আর্বিভাব কাল যাহাই হউক না কেন ইহা স্থির নিশ্চয়, তিনি খ্রী-পূ. দ্বিতীয় শতাব্দীর বৈয়াকরণ নহেন। সে যাহাই হউক, পাণিনি যবন শব্দে এসিয়াটিক বা ইউরোপীয় 'গ্রীক' অর্থে কখনও প্রয়োগ করেন নাই। তিনি এ শব্দ আসিরীয় বা পারস্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যবন শব্দটি গ্রীক Yavan শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত Homerএ Iaoves বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণিনি ব্যাকরণের কাশিকাবৃত্তিতে 'যবনাঃ শয়ানাঃ ভুঞ্জাতে' এই বাক্যটি প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'যবনগণ শয়নাবস্থায় আহার করে' এই পদ্ধতি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এক সময়ে 'যবন' শব্দ

দ্বারা এসিয়াটিক গ্রীকদিগকেই বুঝাইত। পরে ইহা আরব অর্থেও গৃহীত হইয়াছিল। রেনো[৩৬] (Renaud[৩৭]) ও বেবের যবন অর্থে গ্রীকই বুঝেন। এক্ষণে যবনানী অর্থে যে লিপি বুঝায়, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু পাণিনির কাল ৩৫০ খ্রী-পূ. ধরিলে ইহা গোল্ডস্ট্যুকারের পারস্যলিপি বুঝায়, নতুবা বেবেরের মীমাংসা অনুসারে গ্রীক বা কিউনিফরম্ লিপিও বুঝাইতে পারে। যাহা হউক পাণিনি-সূত্র সমুদায়দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তাঁহার সময়ে ভারতে লিপিপ্রথা প্রচলিত ছিল। হোগ[৩৮] বলেন, বিলুপ্ত প্রাচীন আর্য-সাহিত্যের নষ্টাংশে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাতে লিখনার্থ কোন ধাতু বা শব্দের ব্যবহার নাই। কিন্তু যখন লিপিপ্রথার সৃষ্টি হয় নাই, তখন বৃহৎ গদ্য বা বিজ্ঞানসঙ্গত গ্রন্থ কিরূপে রচিত হইত, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন গ্রন্থে লিখন বিষয়ে কোনরূপ ইঙ্গিত না থাকিলেও থাকিতে পারে। বস্তুত আমাদের বিশ্বাস, প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা কোন পবিত্র বিষয় লিপিবদ্ধ করা ভয়ানক পাপ মনে করিতেন। আবার ম্যাক্সমুলারও বলিয়াছেন, 'There are stronger arguments than those to prove that before the time of Panini or before the spread of Buddhism in India writing was absolutely unknown.' তিনি এমনও বলিয়াছেন যে পুস্তক, মসি, কাগজ বা লিপি বুঝায়, এমন কোন শব্দ পাণিনির ব্যাকরণে নাই। তাঁহার এই মত নিতান্তই আশ্চর্য বলিয়া বোধ হয়। কেন না ব্যাকরণের ন্যায় এরূপ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার যে কখন লিপি-প্রথার সাহায্য ব্যতীত রচিত হইতে পারে, ইহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না। আমরা বুঝিতে পারি না, যখন লিপি কাহারও বিদিত ছিল না, তখন তাঁহারা কেমন করিয়া বিশুদ্ধ গদ্যে বৃহৎ বৃহৎ নীতি-গ্রন্থ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃত্তি, ব্যাকরণ, কোষ ও ধর্ম-গ্রন্থাদি রচনা করিতেন, তাহাদিগকে পৌর্বাপর্যানুসারে সজ্জিত করিতেন, এবং কেমন করিয়া তাহাদিগকে অধ্যায়াদিতে বিভক্ত করিয়া তাহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতেন। অক্ষরজ্ঞান ব্যতীত কেমন করিয়া যে ব্যাকরণের সন্ধি-সূত্রাদির বিদ্যমানতা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র-

যুক্তির অগম্য। আজও পর্যন্ত কত জ্যোতিষিক গণনার নিদর্শন রহিয়াছে, যাহাতে খ্রী-পূ. দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দেশান্তর (latitude) ও দ্রাঘিমা রেখার (longitude) অংশ দ্বারা নক্ষত্রের যথার্থ স্থান নির্ণীত হইত। কিন্তু এতৎ সমুদায় কি সংখ্যারাশির জ্ঞান ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে বলিতে হয় যে, যাঁহাদের এরূপ উন্নত লিখিত অঙ্কশাস্ত্র ছিল, তাঁহারা বর্ণমালার জ্ঞানবিরহিত ছিলেন। ম্যাক্সমুলর পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে লিপি বিজ্ঞাপক কোন শব্দের প্রয়োগ নাই বলিয়া নিতান্তই ভ্রান্তির পরিচয় দিয়াছেন। পাণিনির ব্যাকরণে বর্ণ, কার, কাণ্ড, পত্র, সূত্র, অধ্যায়, গ্রন্থ ইত্যাদি সংজ্ঞার প্রকৃত অর্থ বিজ্ঞাত হইলে প্রাচীন ভারতে লিপিপ্রণালী অজ্ঞাত ছিল এ কথা আমরা কখনই বলিতে পারি না। 'গ্রন্থ' শব্দের অর্থ 'একত্র করা'। ইহা তালপত্র সমুদায় বিদ্ধ করিয়া একত্র সমাবেশরূপ প্রাচীন হিন্দুপ্রথার দ্যোতক। তালপত্রের পুঁথি এখনও আমাদের এই অর্থের জাজ্বল্য উদাহরণস্বরূপ বিদ্যমান। বন্ধন করা হয় বলিয়া জর্মান্ ভাষাতে band শব্দের অর্থ গ্রন্থ। বোটলিঙ্গ[৩৪] (Böhtlingk) এবং রোট[৩৯] (Roth) বলেন, গ্রন্থ শব্দের অর্থ লিখিত পুস্তক, ইহাতে অন্য কিছু বুঝায় না'। এইরূপ লাটিন textus বলিলে লিখিত পুস্তক বুঝায়, অন্য কিছু বুঝায় না। 'বর্ণ' শব্দের অর্থ চিহ্ন। 'কার' শব্দে লিখিত ও উচ্চারিত চিহ্ন উভয়ই বুঝায়। 'অক্ষর' ইংরেজি 'syllable'-এর অর্থদ্যোতক। ইহা বর্ণ' ও 'কার' উভয়ের অর্থও বুঝায়। 'অক্ষর' শব্দ সর্ব প্রথম যজুঃসংহিতায় প্রযুক্ত হয়। ঋকের ইহার দুইবার প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—

'গায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে অর্কমর্কেণ সামত্রৈষ্টুভেন বাকং।
বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাণীঃ॥'—

ঋ. ১ম, ১৬৪ সূ. ২৪।

পাণিনি 'লিখন' অর্থব্যঞ্জক 'লিপি' ও 'লিবি' শব্দ তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন (দিবাবিভানিশা-প্রভাভাস্করান্তানন্তাদিবহুনান্দীকিং লিপিলিবিবলি (৩. ২. ২১)। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে পাণিনি 'যবনানী' শব্দও প্রয়োগ করিয়াছেন, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিও অর্থ করিয়াছেন

যে 'যবনানী' শব্দের অর্থ 'যবনদিগের লিপি'। অতএব ইহা হইতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, পাণিনির সময়ে যবনদিগের লিপি একটি স্বতন্ত্রলিপি ছিল। পাণিনি—

'সমুদাঙ্‌ভ্যো যমোঽগ্রন্থে' (১. ৩. ৭৫)

'অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে' (৪. ৩. ৮৭)

'কৃতে গ্রন্থে' (৪. ৩. ১১৬)

'কণ্টকানীকসরকমোদকচষকমস্তকপুস্তকং' (পুল্লিঙ্গ সূত্র ২৯)

'লিখ্‌ অক্ষরবিন্যাসে' (তুদাদিগণ)

'স্বরিতেনাধিকারঃ' (১. ৩. ১১)

এই সূত্রগুলিতে 'গ্রন্থ' ও 'পুস্তক' শব্দ এবং এমনকি 'লিখ্‌' ধাতুও ব্যবহার করিয়াছেন। পতঞ্জলি ও কাত্যায়ন প্রমাণ করিয়াছেন যে পাণিনি যে প্রকারে 'অধিকার' পদের সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা লিপিজ্ঞান স্বীকার ব্যতীত কখনই সম্ভবপর নয়। পাণিনি 'রেফ্‌ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং স্বরিতচিহ্নের উল্লেখ করিয়াছেন। এমনকি কাত্যায়ন 'রেফের' ব্যুৎপত্তি দেখাইতে গিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে 'রেফ্‌' বর্ণভিন্ন আর কিছুই নয়। অষ্টাধ্যায়ীর ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ১১৫ সূত্র পাঠে জানা যায় যে, পাণিনির সময়ে 'স্বস্তিক' আদি চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। উক্ত গ্রন্থের বাসুপ্যাপিশলেঃ' (৬. ১. ৯২), 'অবঙ্স্ফোটায়নস্য' (৬. ১. ১২৩), 'স্ততো গার্গ্যস্য' (৮. ৩. ২০), লোপঃ শাকল্যস্য, (৮. ৩. ১৯), লঙঃ শাকটায়নস্যৈব' (৩. ৪. ১১১. মাদ্রাজ সং), 'ইকোহ্রস্বোঽঙ্যোগালবস্য' (৬. ৩. ৬১), 'ঋতোভারদ্বাজস্য' (৭. ২. ৬৩), 'তৃষিমৃষিকৃশেঃ কাশ্যপস্য' (১. ২. ২৫) ইত্যাদি সূত্র হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে পাণিনি, আপিশলি, স্ফোটায়ন, গার্গ্য, শাকল্য, শাকটায়ন, গালব, ভরদ্বাজ এবং কাশ্যপ-ব্যাকরণ জানিতেন। কেননা, পাণিনি ঐ সমস্ত ব্যাকরণ হইতে নিয়ম উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সমস্ত দেখিয়া কে না বলিবে, পাণিনির সময় যে লিপিপ্রণালী ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণে 'গ্রন্থ' শব্দ চারিবার প্রয়োগ করিয়াছেন। আর তাঁহার ব্যাকরণে 'রেফ' বিদ্যমান থাকায় সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে যে 'গ্রন্থ' শব্দের অর্থ লিখিত পুস্তক ভিন্ন অন্য কিছুই

হইতে পারে না। পাণিনি লোপের সংজ্ঞা দিয়াছেন, 'লোপোঽদর্শনম্'। যদি তাঁহার সময় লিপিপ্রণালী না থাকিবে, তবে 'লোপোঽশ্রবণম্' এ কথা কি তিনি প্রয়োগ করিতে পারিতেন না? আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্র ও ভিন্ন ভিন্ন বেদের প্রাতিশাখ্যে এইরূপ বিষয় সমস্ত উল্লিখিত আছে যে, লিখন-প্রণালীর বিদ্যমানতা অস্বীকার করিলে, সেই সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা আদৌ অসম্ভব হইয়া পড়ে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাণিনির কাল খ্রী-পূ. নবম বা দশম শতাব্দী অনুমান করিয়া বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালের বহু পূর্বে এবং কথিত সংস্কৃত গাথার ভাষায় পরিণত হইবার বহু পূর্বে ত্রয়োদশ পূ-খ্রীস্টাব্দকে ভারতীয় লিপির উৎপত্তিকাল ধরা যাইতে পারে। অপিচ, ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও 'কাণ্ড' ও 'পটল' শব্দ পাওয়া যায়। ইহাদের 'পুস্তক বিভাগ' শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, 'এক বর্ষে যত মুহূর্ত হয় তাহার দ্বিগুণ পঙ্‌ক্তি তিন বেদে আছে।' এক বর্ষে ১০৮০০ (৩৬০ × ৩০) মুহূর্ত দ্বিগুণ আছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যদি তখন তিন বেদের লিখিত পুস্তক ছিল না, তাহা হইলে বেদের পঙ্‌ক্তি-গণনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? পাণিনিও একটি সূত্র দিয়াছেন, 'ছন্দস্যপি দৃশ্যতে' (৭. ১. ৭৬)। এই সূত্র পাণিনি কর্তৃক প্রযুক্ত স্পষ্ট প্রমাণ করা যায় যে পাণিনি যদি লিখিত বেদ না দর্শন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার 'বেদেও দেখা যায়' এ কথা বলিবার তাৎপর্য বা প্রয়োজন কি? যাহা হউক, এইরূপ প্রয়োগাদি দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে এই অমৃতময়ী দেবভাষার লিপি যে কতকাল হইতে রহিয়াছে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। তবে এই পর্যন্ত মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে অন্তত খ্রী-পূ. ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর পরে কখনই লিপির উৎপত্তি হয় নাই। তবে, কেহ যেন না মনে করেন যে আমরা খ্রী-পূ. ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতীয় লিপির সৃষ্টি স্বীকার করিতেছি। পাণিনি এবং তাঁহার পূর্বপুরুষগণ যে লিপি ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা কি প্রকারের লিপি এক্ষণে তাহাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু বিবেচ্য বিষয় হইলে কি হইবে, তাহা আমাদের জানিবার কোনও উপায় নাই। পরন্তু, তাই বলিয়া কি ভারতীয় লিপি বাক্ট্রীয় বা ফিনিসীয়

অথবা হাইরিটিক লিপিসম্ভূত, ইহা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারিব না। আমাদের এ দেবভাষার লিপি দৈবকল্প ঋষিসেবিত ভারতেই সঞ্জাত। অন্য কোন ভূমি ইহার জন্মভূমি হইতে পারে না। কারণ, সেই সুদূর সুপ্রাচীন অতীতে, ভারতবাসীদিগকে লিপি-প্রদান পক্ষে, যদি কোন জাতির কল্পনা করা যায়, তবে সেই জাতি হয় পারস্য, নয় ফিনিসীয় কি গ্রীক্। কিন্তু, যদি কেহ পালি অক্ষরগুলি পাশ্চাত্যলিপির সহিত তুলনা করিয়া দেখেন, তিনি দেখিবেন যে ইহার সংখ্যা কি আকৃতি কিছুতেই পাশ্চাত্য লিপির সাদৃশ্য হইবে না। আমরা পূর্বেই আভাস দিয়াছি যে পালির কি মাত্রা কি লিখিবার ধরণের সহিত পাশ্চাত্য কোন লিপির কণামাত্রও মিল নাই। সুতরাং ভারতীয় লিপির পাশ্চাত্য উদ্ভবের কথা যিনি যতই বলুন না কেন, তাহা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে, তৎকালে চীনদিগেরও ভারতকে লিপিপ্রদান করিবার কিছুই ছিল না এবং সেই সময় ভারতের নিকটবর্তী কোন দেশেই এমন কোন জাতিই ছিল না, যাহারা ভারতকে বর্ণপ্রদানের উপযুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে যে হিন্দুগণ কর্তৃকই পালির আকার ও গঠনপ্রণালী কল্পিত হইয়াছিল। তবে এরূপ হইতে পারে যে তাঁহারা সেই সময় ভারতে প্রচলিত কোন দেশীয় আদর্শে তাহা গঠিত করিয়াছিলেন।

জগতে যাবতীয় বর্ণমালা আছে, তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষার বণমালাই সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক বর্ণমালার নিকটবর্তী। যে ফিনিসীয় বর্ণমালা সমগ্র ইউরোপীয় বর্ণমালার মূল, তাহাতেও তাহার ক্রম, সংখ্যা ও মাত্রাদি বিষয়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বর্ণমালার প্রত্যেক উপাদানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে ফিনিসীয় বর্ণোৎপন্ন সমস্ত সাইরো-আরেবিক ভাষায়, এমন কি গ্রীক্ ও লাটিনে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক বর্ণমালার উপাদানের অভাব রহিয়াছে। সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ঐ সমস্ত বর্ণমালা সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাবিহীন এবং অনাবশ্যক বর্ণের পুনরুল্লেখ দোষে দূষিত। গ্রীক্ ভাষার পূর্বে স্বরচিহ্ন ছিল না। জেসেনিয়স্ (১৮৩৭ খ্রী.) বলেন, অধুনা যে সমস্ত স্বরচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সংযোজিত হইয়াছে। উচ্চারণ-পার্থক্য নাই অথচ 'ক' উচ্চারণের জন্য গ্রীক্ ভাষায় দুইটি অক্ষর

আছে। যথা—'কাপ' এবং 'কপ'; ইহাদিগের মধ্যে একটি নিশ্চয়ই অনাবশ্যক। এইরূপ প্রাচীন গ্রীকে 'কাপ্পা' ও 'কপ্পা' নামে দুইটি বর্ণ দেখা যায়। অন্যান্য বহুবিধ দোষ সত্ত্বেও ইউরোপীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ যে কেন ভারতীয় লিপিকে বাক্ট্রীয় ও ফিনিসীয় বর্ণসম্ভূত বলেন, তাহা বলিতে পারি না। সংস্কৃত বর্ণমালার ন্যায় নৈসর্গিক সৌন্দর্যবিশিষ্ট ক্রম—যতদূর জানি, বলিতে পারি, জগতের কোন বর্ণমালায় নাই! বাগ্‌যন্ত্রের গঠনপ্রণালী অনুসারে সংস্কৃত বর্ণমালার ক্রম স্থিরীকৃত হইয়াছে। আশ্চর্য এই, ভাষার যতগুলি ধ্বনির আবশ্যক, ইহাতে ঠিক ততগুলি অক্ষর সমাবেশিত হইয়াছে। একটি অক্ষর তুলিয়া লইলে ভাষার অঙ্গহানি হইবে, ক্রমের বিপর্যয় ঘটিবে। বাগ্‌যন্ত্রের স্থান বক্রগতি। কণ্ঠনালী ও জিহ্বামূলের সংযোগ স্থান হইতে ওষ্ঠপ্রান্ত পর্যন্ত বাগ্‌যন্ত্রের অধিকার। কণ্ঠনালী হইতে বক্রভাবে কিছু উর্ধ্বে গিয়াছে। উর্ধ্বভাগে যাইতে যাইতে ক্রমশ নিম্নভাগে আসিয়া অর্ধবৃত্তাকার ধারণ করিয়াছে। কণ্ঠনালী হইতে উদানবায়ু চালিত হইয়া যখন এই অর্ধবৃত্তাকারের মধ্য দিয়া বাহির হইতে যায়, তখন নানা 'স্ফুটধ্বনি' উচ্চারিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় এক-একটি অক্ষর এক-একটি ক্রমোপন্ন স্ফুটধ্বনিব্যঞ্জক। কণ্ঠনালী হইতে ওষ্ঠ-প্রান্ত পর্যন্ত স্থানের মধ্য দিয়া উদানবায়ু যখন বহির্গত হইতে যায়, তখন বিভিন্ন স্থানে জিহ্বার সাহায্যে বাধাপ্রাপ্ত হইলে অভিহত হইয়া বিভিন্ন ধ্বনি উৎপাদন করে। এই অভিঘাত স্থান ৫টি। যথা—১ কণ্ঠ, ২ তালু, ৩ মূর্ধা, ৪ দন্ত, ৫ ওষ্ঠ। এই ৫টি অভিঘাত স্থান হইতে ৫ জাতীয় যে স্ফুটধ্বনি, তাহাই আমাদের বর্ণ। আবার অভিঘাত স্থানে উদানবায়ুকে অভিঘাত স্থানসম্ভব মূর্তি দিয়া যে স্বয়ং সিদ্ধধ্বনি উচ্চারণ করা যায়, তাহারই নাম স্বর। আর অন্য এক প্রকার অভিঘাতে যে ধ্বনি সম্ভূত হয়, তাহা স্বরের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হয় না। স্বরসংযোগ করিবামাত্র অভিঘাত স্থানে আবদ্ধ ধ্বনি স্ফুটভাবে শ্রুত হয়। ইহারই নাম ব্যঞ্জন। এই প্রকারে দেখান যাইতে পারে যে নৈসর্গিক ক্রমান্বয়ের অনুসারে প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ স্থানে ক্রমানুযায়ী পৌর্বাপর্য স্থির করা হইয়াছে। ব্যঞ্জন-গুলিকে তাহাদের উচ্চারণানুসারে ও মাত্রা স্পর্শানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে

সংযোজিত করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক বর্গের বর্ণকেও তাহার মাত্রাস্পর্শানুসারে পূর্বে ও পরে স্থাপিত করা হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যেক বর্ণ বিশুদ্ধ উচ্চারিত ধ্বনি প্রকাশ করে। এ বিশুদ্ধ ভাষায় উচ্চারণ অদ্বিতীয় অর্থাৎ এক বর্ণের উচ্চারণ অন্য বর্ণের উচ্চারণের সমতুল্য নয়। ইহাতে একটিও অপ্রয়োজনীয় অক্ষর নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই—যিনি ভারতীয় বিবিধ বর্ণমালা ও বৈদেশিক বর্ণমালা যত্নসহকারে ধীরভাবে আলোচনা করিবেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন যে হিন্দুর বর্ণমালা হিন্দুর নিজ সম্পত্তি। দেখিবেন, হিন্দু যেমন ন্যায় ও দর্শন, শিল্প ও সাহিত্য, কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করেন নাই, সেইরূপ বর্ণমালাও হিন্দু কাহারও নিকট গ্রহণ করেন নাই। তিনি দেখিবেন, এ বিষয়েও হিন্দু সর্বজাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, উড়িষ্যার শিল্প দর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, হিন্দুর বর্ণমালা উদ্ভাবন বিষয়ে পুনরুক্তিস্থলে তাহার আভাসমাত্র দিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব ;—

'তখন তাঁহার হিন্দুকে মনে পড়িবে। তখন মনে পড়িবে, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক,—এসকলই হিন্দুর কীর্তি ;—তখন মনে পড়িবে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।'

পাদটীকা

১ *Orient und Occident*, iii, p. 170

২ *Ancient Sanskrit Literature*, ii, p. 521

৩ *Studies*, p. 85

৪ *Uber den Altesten Zeitreum der Indischen Geschichte*, p. 37

৫ *Etymologische Forschungen, Wurzel*—Worterbuch

৬ *Megesthenes Indica*, Ed. Schwenbeck, Frag xxvii (from Strabo xvi. p. 535)

৭ *Meg. Ind*, Frag xxxiv from the same source, pp. 125-66

[সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩১১ পৃ. ৪৫-৫৮]

প্রসঙ্গ-কথা

1 উইলিয়ম জোনস (Jones, Sir William): 'অনার্য' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.।

2 কপ্ (Kopp): ইনিই প্রথম ১৮২১ সালে এই মত প্রচার করেন। —*ESIP.*

3 আর লেপ্সিয়স (Lepsius, Karl Richard) (1810-1884): ইজিপ্ট-দেশীয় ভাষা ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্। জন্ম—জর্মান দেশে। রাজকীয় সাহায্যে তিনি তিন বছর অনুসন্ধান করে ইজিপ্টে লিপি ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৮৪৬)। ১৮৫৯ সালে প্রত্নতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে ১২ খণ্ডের এক বই রচনা করেন।—*En. Brit.*

4 বেবার (Weber, A. F.): 'অথর্ববেদ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.।

5 অধ্যাপক টমাস (Thomas, Edward) (1813-1886): মুদ্রাতত্ত্ব ও ভারত-প্রত্নতত্ত্ববিদ্। বিচার বিভাগীয় কর্মে নিযুক্ত হয়ে ভারতে আগমন (১৮৩২)। ১৮৫৭ সালে অবসর গ্রহণের পর ভারতের ও প্রাচীন পারস্যের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলে ও নিউমিসম্যাটিক ক্রনিকল ও ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারিতে প্রকাশ করেন।—*BDIB.*

5A বেনফী (Benfey, Theodor) (1809-1881): জর্মান পণ্ডিত ও ভাষাতত্ত্ববিদ্। গটিনগেনে অধ্যাপনা (১৮৬২)। গ্রন্থ—A Sanskr.-Eng. Dictionary with references to the best editions of Sanskrit authors and etymologies and comparisions of cognate words chiefly in Greek, Latin, Gothic and Anglo-Saxon. (Lond. 1866), Chrestomathic aus Sanskrit-Werken (Leipzig 1833) ই.।—*En. Brit.*

6 ম্যাক্স্‌মূলর (Max Muller, F) : 'অনার্য' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

7 হুইট্‌নি (Whitney, W. D.) : 'অথর্ববেদ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

8 Pott : জর্মান লিপিতত্ত্ববিদ। কপের মত সমর্থন করেন। গ্রন্থ—Etymologische Forschungen, Wurzel-Worterbuch, ii, p.2, liii (1870)।—*ESIP*.

9 Westergaard, (Neil Ludwig) (1815-1878) : ডানিস প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌ ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। জেন্দ পুথি অনুসন্ধানের জন্য তিন বছর পূর্বাঞ্চল, পারস্য ও ভারত ভ্রমণ করেন (১৮৪১-৪৩)। গ্রন্থ—Radices Lingue Sanskritae (1841) ই.।—*BDIB*.

10 Bühler, (Johana Georg) (1837-1898) : জর্মান ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও লিপিতত্ত্ববিদ্‌। হ্যানভার ও গটিনগেনে প্রাচ্য ভাষা ও প্রত্নবিদ্যার স্নাতক (১৮৫৮)। পারীতে সংস্কৃত শিক্ষা। বোম্বাইয়ে এলফিনস্টোন কলেজে প্রাচ্য-ভাষায় অধ্যাপক (১৮৬৩), পুনায় Sanskrit Studiesএর সুপারিনটেনডেন্ট (১৮৬৬), বোম্বাই প্রেসিডেন্সির উত্তর বিভাগের শিক্ষা-পরিদর্শক (১৮৬৮, ১৮৭২)। প্রায় পাঁচ হাজার পুথির আবিষ্কারক, যা ভারত সরকারে, ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত আছে। ১৮৮০ খ্রী. ভারত ত্যাগ করে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা ও প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক হন। তিনি বহু লিপির পাঠোদ্ধার করেন। গ্রন্থ—A Glossary of Oldest Prakrit Dictionary. সম্পাদনা—Encyclopaedia of Indo-Aryan Philology, ই.।—*WHIL*. 324-26

11 Sayce, (Rev. Prof. Archibald H) (1846—?) : আসিরীয়-পণ্ডিত : অক্সফোর্ডের কুইন্স কলেজের অধ্যাপক ও ফেলো। The Hittites: The Story of Forgotten Empire (Oxf. 1890), Comparative Philology (1898), Archaeology of Cuneiform Inscriptions (1906) ই. গ্রন্থ রচনা করেন।

12 Lenormant, (Francois) (1837-1883) : ফরাসী আসিরিওলজিস্ট ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌। পারীতে জন্ম। বিবলিওথিক ন্যাশনালের

অধ্যাপক (১৮৭৪)। মেডিটারিনিয়ানে তিনি অনেক পুরাতত্ত্ববিষয়ে অনুসন্ধান করেন। কিউনিফরম লিপিতে অসেমেটিক ভাষার অস্তিত্বের কথা তিনিই প্রথম বলেন। গ্রন্থ—Origines de l'histoire d'apre's la Bible.—*En. Brit.*

13 Dr Decke (Deecke ?): Z.D.D.M.G., XXXIতে এক প্রবন্ধে উক্ত মত প্রকাশ করেন।—*ESIP.*

14 Burnell, (Arthur Coke, Dr.) (1840-1882): সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। জন্ম—গ্লুসেসটারসায়ারে। বেডফোর্ড ও কিংস কলেজে শিক্ষা। ভারতে মাদ্রাজে বিভিন্ন স্থানে জজিয়তী করেন। তিনি বহু পুরাতন সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করেন—তা ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে দান করেন। তিনি তিব্বতী, আরবী, জাপানি প্রভৃতি ভাষাও শেখেন। তাঁর প্রধান বই—Elements of South-Indian Palaeography (1878), The Aidra School of Sanskrit Grammarians, the place in the Sanskrit and Sub-ordinate literatures (Mangalore, 1875)।—*BDIB.*

15 Prinsep. (James) (1799-1840): লিপিবিদ্যা ও পুরাতত্ত্ববিদ্। কলকাতার ট্যাকশালে সহকারী অ্যাসে মাস্টার হয়ে ভারতে আসেন (১৮১৯), এক বছর পরে বেনারস মিণ্টের অ্যাসে মাস্টার (১৮২০-৩০), আবার কলকাতায় উক্তপদে কাজ করেন (১৮৩২-৩৪)। বেনারস থাকাকালীন Views and Illustrations of Beneras (১৮২৫) প্রকাশ করেন এবং কলকাতায় Gleanings of Science পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের সেক্রেটারি (১৮৩২-৩৮) থাকেন। ভারতে তিনি মুদ্রাতত্ত্ব, লিপিতত্ত্বের বিশেষ চর্চা করেন। ভারত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধসমূহ ২ খণ্ডে প্রকাশিত হয় 'Essays on Indian Antiquities' নামে।—*BDIB.*

16 Müller, (Karl Otfried) (1797-1840): জর্মান পণ্ডিত। গটিনগেনে কিছুকাল প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে অধ্যাপনা করেন (১৮১৯)। এথেন্সে কিছুকাল পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে ডেলফী খননকার্য আরম্ভ করেন এবং এথেন্সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি কয়েকটি বই লিখে গেছেন।—*En. Brit.*

17 Senart, (Emile Charles Marie) (1847— ?): প্রাচ্য-বিদ্যাবিদ্। মিউনিক ও গটিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেনফীর কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ভারততত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য তিনি ভারতে আসেন। গ্রন্থ—The Inscriptions of Piyadassi (1881-6), Essays on the Legend of Buddha (1875), The Mahavastu (1882), Notes on Indian Epigraphy: Les Castes dans I'Inde (1896)।—*BDIB*.

18 Halevy, (Joseph): Journal Asiatique, 1885, ii. p 243, Revue Semitique, 1895. p. 375 প্রবন্ধ দ্র.

19. Fleet, (John Faithfull) (1847— ?): ভারত সরকারের লিপিতত্ত্ববিদ্। ভারতে আগমন (১৮৬৭), বোম্বাইয়ের কমিশনর (১৮৮৪), ১৮৯২ খ্রী. গটিনগেন হতে পিএইচ ডি লাভ। গ্রন্থ —Gupta Inscriptions Dynasties of the Kanarese Districts। Indian Antiquary স্থাপনা ও সম্পাদনা (১৮৮৫ —৯১)। তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—Indian Antiquary, Archaeological Reports of West India ও Epigraphia Indicaতে।—*BDIB*

20 টেলর (Taylor, Rev William): গ্রন্থ—Oriental Historical Mss. in the Tamil Language (trans.), 2 vols. (Madras, 1835), Examination and Analysis of the Mackenzie Mss. deposited in the Madras College Library, (Calcutta, 1838), Catalogue raisonnée of the Oriental Mss. in the Library of the College, Fort St. George (Madras, 1851-62), 3 vols.

21 এডওয়ার্ড টমাস—5 অধ্যাপক টমাস দ্র.

22 ক্রিশ্চিয়ান লাস্‌সেন: (Lassen, Christian) (1800-1876): নরউইজিয়ান প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্। বন-এ সংস্কৃত শিক্ষা ও অধ্যাপনা। তিন বছর তিনি পারী ও লণ্ডনে থাকেন হিন্দু নাটক ও দর্শন

অনুসন্ধানে। আরবীতে পি.এইচ ডি হন। প্রাচীন লিপি ও মুদ্রা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রধান বই—Indische Altertumskunde (1847-61), ৪ খণ্ড।—*BDIB.*

23 জন ডাউসন (Dowson, John) (1820-1881): রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজ, স্টাফ কলেজ ও স্যাণ্ডহার্স্ট কলেজে হিন্দুস্তানী ভাষার অধ্যাপক (১৮৫৫-৭৭)। ভারতীয় লিপি ও ভারতীয় অক্ষর প্রবন্ধ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় লেখেন। গ্রন্থ—Hindustani Grammer, Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History of Literature (1879) ই.।—*En. Brit.*

24 জেসেনিয়স : পরিশিষ্ট দ্র.

25 কানিংহাম (Cunningham, Sir Alexander) (1814-1893): ভারতে আগমন (১৮৩৩), বড়লাট অকল্যাণ্ডের শরীর-রক্ষক (১৮৩৬), অযোধ্যা নবাবের ইঞ্জিনিয়ার (১৮৪০), বর্মার প্রধান ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ডিরেকটর-জেনারল, (১৮৭০-৮৫)। গ্রন্থ—Ancient Geography of India (1871), Coins of Medieval India (1894), The Book of Indian Eras, ই.।—জী-কো.

26 গোল্ডস্টুকার (Goldstucker, Theodore) (1821-1872): জর্মানদেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। জন্ম—কনিসবার্গ। লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। গ্রন্থ—Panini—His Place in Sanskrit Literature (1861); Manava-Kalpa-Sutra (1861) ই.। ঐ

27 রাজা রাজেন্দ্রলাল (রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র) (১৮২২-৯১): প্রত্নতত্ত্ববিদ্। ডি এল (কল. ১৮৭৫)। এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের সহ-সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৮৪৬), ও পরে সভাপতি (১৮৮৫)। ইনি সংস্কৃত, ফার্সী, উর্দু, হিন্দী, ইংরেজি, গ্রীক, লাতিন, ফরাসী, জর্মান ভাষায় অভিজ্ঞ; প্রত্নতত্ত্বে অসাধারণ

প্রতিভা ছিল। অনেক গ্রন্থ রচনা—তার মধ্যে—Antiquities of Orissa, ২ খ. (1875-80), Buddha Gaya, The Hermitage of Sakyamuni (1878), The Parsis of Bombay (1880), Indo-Aryans ; 2 vols. (1881) ই।—সা-সে-ম.

28 অক্ষয়কুমার (অক্ষয়কুমার দত্ত) (১৮২০-১৮৮৬): সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও পত্রিকা-সম্পাদক। তিনি 'বিদ্যাদর্পণ' মাসিকপত্র (১২৪১ বঙ্গ) ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩-৫৫) সম্পাদনা করেন। বহু গ্রন্থ রচনা করেন—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (২ খ. ১৮৭০, ১৮৮৩), প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা, ই.।—সা-সে-ম.

29 পেপী: পরিশিষ্ট দ্র.

30 নেয়ারখুস (Nearchus): ক্রেটবাসী নেয়ারখুস ৩২৫ খ্রী-পূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডারের একজন সামরিক অধিকর্তা। পারস্য উপকূলে তাঁর রণপোত বহর পরিচালনার জন্য তিনি আদিষ্ট হন। তিনি তাঁর অভিযানের পূর্ণ বিবরণ লিখে গেছেন।—*En. Brit.* xvi. p. 179.

31 মেগাস্থিনিস (Megasthenes): সেলুসিড-রাজ সেলুকাস নিকাতর কর্তৃক চন্দ্রগুপ্তের সভায় প্রেরিত রাজদূত। তিনি আনুমানিক ৩১৫ খ্রী-পূ. ভারতে আসেন এবং বহুকাল এদেশে থাকেন। সে যুগের ভারত সম্বন্ধে তাঁর বহু তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থের নাম 'ইণ্ডিকা'। সে যুগের ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর একটা ধারণা এই বই থেকে পাওয়া যায়। এছাড়া চন্দ্রগুপ্তের আমলে পাটলিপুত্রের শাসন-ব্যবস্থার খুঁটিনাটিও জানা যায়।—রোমিলা থাপার, পৃ. ৫৩-৫৬, ৫৯, ৭৪।

32 Wassilijew: ঐতিহাসিক। গ্রন্থ—Russian rendering of Taranatha's history of Buddhism (1869).

33 সলোমন (Solomon): বাইবেল বর্ণিত ইহুদীদের রাজা। ৯৭৪ খ্রী-পূ. রাজা হন। মৃত্যু—৯৩৭ খ্রী-পূ.। তিনি সুশাসক, বহু প্রবাদবাক্য ও সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর অনেক বাণিজ্য জাহাজ ছিল—তিনি বহু ঘোড়া, বাঁদর, ময়ূর, সোনা, রূপা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ হতে আমদানী করতেন।—*En. Brit.* xx. p. 952.

34 Dr. Caldwell (Rev. R. Caldwell) (1814-1891): মাদ্রাজ বিশপের সহকারী ও ভাষাতত্ত্ববিদ্। মিশনারি সোসাইটি

হতে মাদ্রাজে আগমন (১৮৩৮)। গ্রন্থ—A Comparative Grammar of the Dravidian or South-Indian Family of Languages (London, 1856).—*BDIB.*

35 দরায়ুস (Darius) : পারস্য সম্রাট। ৩২৭ খ্রী-পূ. আলেকজাণ্ডার এঁর রাজ্য জয় করেন। পারস্যদেশ থেকে এঁর অনেক শিলালিপি পাওয়া গেছে। আধুনিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে সম্রাট অশোকের শিলালিপি উৎকীর্ণ করার পরিকল্পনার পেছনে সম্রাট দরায়ুসের শিলালিপির অবদান আছে।—রোমিলা থাপার পৃ. ৩৮, ৫১।

36 রেনো (Renaud, Paul) : ফরাসী পুরাতত্ত্ববিদ্। গ্রন্থ—Memoirs on India after Arab, Persian and Chinese writers (1849), Materiaux pour servir a l' Histoire de la Philosophie de l' Inde (1876), Memoire Sur l' Inde ই।—WHIL, pp. 318, 320.

37 হোগ (Haug, Dr. Martin) (1827-76) : সংস্কৃত ও জেন্দ ভাষার জর্মানদেশীয় পণ্ডিত। তিনি বহুদিন বেন্দীদাদ বা ইরানীয়-গণের অগ্নি উপাসনার বিষয়ে গবেষণা করেন। পুনা কলেজে সংস্কৃত বিভাগের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট (১৮৫৯)। পরে ১৮৬৬ সালে মিউনিকে সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক হন। গ্রন্থ—Essays on Pahlavi Language (Stuttgart, 1870), Essays on the Sacred Language, Writings, and Religion of the Parsees (Bombay, 1862), Outline of a Grammer of the Zend Language (Bombay 1862)। এ ছাড়া জর্মান ভাষায় কয়েকটি বই লেখেন।—*BDIB.*

38 বোটলিঙ্ক (Böhtlingk, Otto von) (1815-1904) : লেনিনগ্রাডের পিটারসবার্গে জন্ম। জর্মানদেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ভারতীয় এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ পাণিনি এবং প্রধানতম কাজ সংস্কৃত-জর্মান অভিধান। Sanskrit Wörterbuch (1853-75); Indische Sprüche (1870-73) ই।—*En. Brit.*

39 রোট (Roth, Rudolf von) : 'অদিতি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা

ভারতীয় লিপির উৎপত্তি ভারতেই হইয়াছিল। এই বিষয়ে ইতঃপূর্বে ১৩১০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে যখন আলোচনা করি, তখনই ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাইয়াছিলাম। আমার "ভারতে লিপির উৎপত্তি" প্রবন্ধ "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"র ১১শ খণ্ড ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। সে প্রবন্ধে আমি যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলাম, তাহাতে আর এই বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আজ আমি বেদ হইতে মহাভাষ্য পর্যন্ত বহু শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, যতই আমরা "শ্রুতি" ও স্মৃতির দোহাই দিই না কেন, বেদাদি গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম অংশমধ্যে লিপি-প্রণালীর বর্তমানতার কথা পাওয়া যায়। বেদ হইতে মহাভাষ্য পর্যন্ত গ্রন্থগুলিকেই আমি যে এই বিষয়ের প্রমাণের আকর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাহার দুইটি কারণ আছে। প্রথম, সমস্ত বিদ্বৎ-সমাজে বেদ জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া সম্মানিত, আর মহাভাষ্য ব্যাকরণগত শৃঙ্খলা জ্ঞানের সর্বাপেক্ষা সুচিন্তিত গ্রন্থ। দ্বিতীয়ত, ম্যাক্সমূলার প্রমুখ প্রাচ্য মনীষিবৃন্দ জগতের সমক্ষে সপ্রমাণ করিতে চাহেন যে, পাণিনির পূর্বে লিপিজ্ঞান ছিল না; এমন কি, পাণিনি পর্যন্ত লিপিজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। (History of A.S.L p 524—1059)। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, পাণিনি ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম বিস্তৃতির পূর্বে ভারতবর্ষে লিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল না।

"But there are stronger grounds than these to prove that before the time of Panini and before the first spreading of Buddhism in India, writing for literary purposes was absolutely unknown. If writing had been known to Panini some of his grammatical terms would surely point to the graphical appearance of words. I maintain that there is not a single word in Panini's terminology which presupposes the existence of writing."

পাণিনীয় ব্যাকরণ হইতে আমরা এমন কোনও নিদর্শন পাই না, যাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, লিপিজ্ঞান বা লিখনের অস্তিত্ব তাঁহার পূর্বে বিদ্যমান ছিল। ইহা ম্যাক্‌সমুলরের ধারণা। তাঁহার মতে, পাণিনি ৪র্থ খ্রীস্টপূর্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ম্যাক্‌সমুলরের উক্ত প্রমাণবলে প্রতীচ্য পণ্ডিতমণ্ডলী সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন, পাণিনি কিংবা পাণিনির পূর্বে লিখন-প্রণালীর অস্তিত্বই ছিল না। তাঁহাদের এই মত সর্বথা খণ্ডনযোগ্য। পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণের বহু স্থলে 'গ্রন্থ', 'বর্ণ', 'পটল', 'সূত্র', 'লিপি', এমন কি, 'লিখ্' ধাতুও (=লেখা) ব্যবহার করিয়াছেন। একটা কথা এই স্থানে বলিয়া রাখি, 'writing for literary purposes was absolutely unknown' অর্থে ম্যাক্‌সমুলর কি বুঝিয়াছেন ? তবে কি অন্য কোনও কারণের জন্য লিখন-প্রণালীর আবশ্যকতা ছিল ? তাঁহার বোধ হয় সন্দেহ হইয়াছিল যে অন্য কোন কারণের জন্য লিপি বা লিখন প্রচলিত ছিল। আর যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে তিনি আমাদের মতই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার ঐ পুস্তকেই আমরা আবার এমন সমস্ত কথা পাইয়াছি, যাহা দ্বারা পরোক্ষে আমাদেরই মতের তিনি পোষণ করিয়াছেন, বলিতে পারা যায়। তাঁহার ঐ গ্রন্থে দেখিতে পাই, "prayer book of the Hotris" (পৃ. ১৮৭, ৪৭৩), পাণিনির সমসাময়িক কাত্যায়ন সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"Writes in the Bhasya" (পৃ. ১৩৮); অন্যত্র লিখিয়াছেন,—"Wrote the Vartikas" (পৃ. ১৪৮); "writes in prose" (পৃ. ২২৯); সূত্রকারদিগের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"Writers of Sutras." (পৃ. ২১৫)।

আমরা বর্তমান প্রবন্ধে বেদাদি গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। আর পাণিনির নিজের সূত্র উদ্ধৃত করিয়াই আমরা দেখাইব যে, সুপণ্ডিত ম্যাক্‌সমূলর কি ভ্রান্তমত জগতে প্রচার করিয়াছেন। পাণিনির বর্ণমালা-জ্ঞাপক এতগুলি বচন যে তাঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণধীশক্তিসম্পন্ন মনীষীর দৃষ্টি-গোচর হয় নাই, ইহাও বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। হয় তিনি ভাল করিয়া অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি অধ্যয়ন করেন নাই ; না হয়, যখন তিনি History of A.S.L. লেখেন, তখন তাঁহার নিকট পাণিনির ব্যাকরণ ছিল না।

বেদের সময় হইতে মহাভাষ্যের সময় পর্যন্ত অক্ষর-জ্ঞানের—লিপি জ্ঞানের—যে অভিব্যক্তির প্রমাণ তত্তৎগ্রন্থে নিবদ্ধ আছে, তাহাই যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া আজ আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলাম্। আমার ভারতে লিপির উৎপত্তি, প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর অনেক পণ্ডিতই এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, অল্লাধিক প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমি এই প্রবন্ধে যেসকল প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহার কতকগুলি সেইজন্য আপনাদের পূর্ব পঠিত। যাঁহারা আমার পূর্বে গ্রন্থরাশি অধ্যয়ন করিয়া, অনুসন্ধান করিয়া সেইসকল প্রমাণের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র, সন্দেহ নাই। তাঁহারা কি নিয়মে ঐসকল প্রমাণ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। আমি যে কয়েকখানি গ্রন্থের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকখানির আদ্যন্ত নিজে অনুসন্ধান করিয়াছি,—যদৃচ্ছাক্রমে এখানে ওখানে পড়িতে পড়িতে যেটি চোখে পড়িল, সেইটিমাত্র লইয়া তৃপ্ত ও ক্ষান্ত হই নাই, অথবা উদ্দেশ্যমাত্র সফলীকৃত করিবার জন্য শ্লোকাংশমাত্র গ্রহণ করিয়া অপরাংশ বর্জন করি নাই।

ঋগ্বেদের ১ ম, ১৬৪ সূ. ২৪ শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই,—

গায়ত্রেণ প্রতিমিমীতে অর্কমর্কেণ সামত্রৈষ্টুভেনবাকং।
বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণী।

ইহাতে 'গায়ত্রী' 'বাক্' ও 'সপ্তবাণী'র লক্ষণ নির্দেশ করিয়া দীর্ঘতমা

ঔচথ্য ঋষি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, সপ্তবাণী চতুষ্পদ এবং অক্ষরবিশিষ্ট; এখানে অক্ষর ও পদের ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ থাকায় লিপির প্রাচীনতা এই মন্ত্ররাশির পূর্বেও যে বিদিত ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

ইহার পর বিবস্বান্ আদিত্য বলিতেছেন,—অক্ষরেণ প্রতিমিমতে এতামৃতস্য লাভাবধি সংপুনামি।—১০.১৩.৩

অক্ষরের দ্বারা স্ফুরিত হইতেছে বলিলে, আমরা লিপি-প্রণালীর স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। এই স্থলে আর একটি কথা বলিবার আছে,—সমগ্র ঋগ্বেদে বর্ণমালাবোধক 'অক্ষর' শব্দ দুইটি মাত্র মন্ত্রে পাওয়া যায়, তাহাই উল্লিখিত মন্ত্রদ্বয়। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে 'অক্ষর' শব্দের যখন এত অল্প ব্যবহার ঋগ্বেদে দেখা যাইতেছে, তখন লিপি-প্রণালীর বহুল প্রচার ছিল না—তর্কস্থলে তাহাই স্বীকার করিলেও এই দুইটিমাত্র শব্দের বলেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ঋগ্বেদের ঋষিদিগের সময়ে লিপি-প্রণালী সুপ্রচলিত হইয়াছে, তাই তাঁহারা গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য বিষয়ের বর্ণনার সঙ্গে তাঁহারা সপ্তবাণীর স্ফুরণের যে প্রধান উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা মন্ত্রবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত তিনটি স্থান হইতে লিপিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,—

১। উতত্ব পশ্যন্ ন দদর্শবাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাম্। উ তো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥—১০. ৭১. ৪

২। যং বৈ সূর্যং স্বর্ভানুস্তমনাবিধ্যাদাসুরঃ অত্রয়স্ত মন্ববিন্দন্ ন হি অন্যে অশক্নুবন্।—৪. ২. ১২

৩। বেদমাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ। বেদা উপজায়তে॥—১. ২

এই তিনটি ঋকের মধ্যে প্রথমটিতে মূর্খ ও জ্ঞানী লোকের বর্ণনা করা হইয়াছে। ঋকৃটির মর্মার্থ এই যে, কেহ কেহ বাক্যকে দেখে, অথচ দেখে না —কেহ কেহ বাক্যকে শোনে, অথচ শোনার ফল পায় না। অন্য কেহ শুনাইলেও সে তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না। কাময়মানা রমণী যেমন সুবস্ত্র দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া আপনার পতির নিকট দেহ সমর্পণ করে,

সেইরূপ বাক্যসকল এই দুই প্রকার লোক ভিন্ন আর এক প্রকার লোকের নিকট আপনার দেহ ও মূর্তি সমর্পণ করে। এখন দেখা যাইতেছে যে, একই ঋকে একই প্রসঙ্গে 'বাক্যের দর্শন ও শ্রবণ' যখন এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ আছে, তখন দর্শন শব্দে পুস্তক লিপিরূপে দর্শন ভিন্ন অন্য কি অর্থ হইতে পারে?

দ্বিতীয় ঋক্‌টি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে রাহু নিজের ছায়া দ্বারা সূর্যকে বিদ্ধ করিলে যে বেধ হয়, তাহা আত্রেয় ঋষি অবগত ছিলেন। অবশ্য অন্য ঋষিগণ জানিতেন না। অত্রি-গোত্রীয় ঋষিগণ গ্রহ-গণনার আদি-গুরু ছিলেন। যে ঋষিরা গ্রহ-গণনা করিতে পারিতেন, তাঁহারা যে লিখিতে জানিতেন না, একথা কে বিশ্বাস করিবে?

তৃতীয় ঋক্‌টি আর্যদিগের জ্যোতিষ জ্ঞানের একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। যাঁহারা জ্যোতিষ জানিতেন, তাঁহারা যে লিপিজ্ঞ ছিলেন না, ইহা নিতান্ত অসম্ভব।

শুক্লযজুর্বেদেও ভারতীয় আর্যদিগের লিপিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। অশ্বমেধ-যজ্ঞ প্রকরণে প্রশ্ন-মন্ত্র ; যথা,—

১। কত্যস্য বিষ্টাঃ কত্যক্ষরাণি।

উহার অন্নই (বিষ্ট) বা কত, অক্ষরই বা কত? প্রত্যুত্তর মন্ত্র—

২। ষড়স্য বিষ্টাঃ শতমক্ষরাণি।

ছয়টি উহার অন্ন এবং শত সংখ্যক উহার বর্ণ।

৩। অতঃপর বিরাটরূপ ভাবনার বিবরণে—

"এবশ্ছন্দো ভূলোকো বরিবশ্ছন্দোঽন্তরীক্ষ লোকঃ—

.........................ক্ষুরভ্রজশ্ছন্দঃ।

ক্ষুরভ্রজশ্ছন্দ—অর্থাৎ, ক্ষুর বা লৌহশলাকা দ্বারা অঙ্কিত—লিখিত ছন্দ।

৪। তারপর একটি মন্ত্রে আমরা শত সহস্র হইতে পরার্ধ পর্যন্ত গণন-কালের কথা পাই। লিপির সাহায্য ব্যতীত পরার্ধ পর্যন্ত কিরূপে গণনা করা যাইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ঋক্‌টি এই,—

ইমা মেঽগ্নঽইষ্টকাধেনবঃ সন্ত্বেকা চ দশ চ শতঞ্চ সহস্রঞ্চ সহস্রং চাযুতঞ্চাযুতং নিযুতং প্রযুতং চার্বুদঞ্চার্বুদং চ ন্যর্বুদং চ সমুদ্রশ্চ মধ্যঞ্চ অন্তশ্চ পরার্ধশ্চৈতা মেঽ অগ্নঽইষ্টকাধেনবঃ‥ ‥।—১৭.৫০.১৭.২

বাজসনেয়ী সংহিতায় ছন্দের সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে,—

অক্ষরপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ—১৫.৪

এইরূপ তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৪.৩.১২.৩); মৈত্রায়ণী-সংহিতায় (২.৮.৭ ; ১১১.১৫); এবং কাঠক-সংহিতায় (১৭.৬) বর্ণ বা Alphabet অর্থে অক্ষর শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পর আমরা কৃষ্ণ-যজুর্বেদের ১ম কাণ্ড ৬ষ্ঠ প্রপাঠকে বর্ণ (alphabet)-দ্যোতক অক্ষরের ব্যবহার দেখিতে পাই,—

আশ্রাবয় ইতি চতুরক্ষরং অস্তুশ্রৌষ্ট ইতি চতুরক্ষরং যজ ইতি দ্ব্যক্ষরং যে যজামহে ইতি পঞ্চাক্ষরং।

অর্থাৎ—'আশ্রাবয়' ও 'অস্তুশ্রৌষ্ট' প্রত্যেকেই চতুরক্ষর, 'যজ' এই শব্দটি দ্ব্যক্ষর, এবং 'যে যজামহে' এইটি পঞ্চাক্ষরযুক্ত।

তারপর অথর্ববেদে বর্ণদ্যোতক অক্ষরের উল্লেখ এইরূপ,—

অক্ষরেণ প্রতিমিমতে অর্কং। ১৮. ৩. ৪। অন্যত্রও (৯. ১০. ২) একবার অক্ষরের উল্লেখ আছে।

প্রাতিশাখ্যগুলিতে শুধু অক্ষর কেন, অক্ষরগুলির নাম পর্যন্ত আমরা পাইয়াছি। নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করা হইল।—

(ক) ঋগ্বেদ-প্রতিশাখ্য—

১। ক-কার, ইত্যাদি (৪.৬)

২। ই, উ, এ ইত্যাদি (অনুক্রমণিকা)

৩। ক-খৌ ইত্যাদি (অনুক্রমণিকা) দ।

৪। রেফ (১.১০)

৫। শ কার চ কার বর্গগোঃ (৪.৪)

(খ) তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য—

১। অ-কার (১.২১) ই-কার (২.৮);
হ-কার (১.১৩); অ-বর্ণ (৭.৫)
ই-বর্ণ ইত্যাদি (১০.৪)

২। প (৪.৩০); ন (৪.৩২);
ক্ষ (৯.৩);

৩। ত, ট (৭.১৩); থ (৭.১৪); র (১.১৯);

৪। রেফ (১.১৯)

৫। ক-বর্গ (২.৩৫) ; চ-বর্গ (২.৩৬) ; ট-বর্গ (১৪.২০)।

(গ) কাত্যায়নীয় প্রাতিশাখ্য—

১। ঐ-কার, ঔ-কার (১.৭৩), ঌ-কার (১.৮৭); ই-বর্গ (১.১১৬);

২। উবোষ্মাণঃ (১.৭০) ; অ-(১.৭১) ;

৩। র (১.৪০) ; মুঃ (১৩.১৩২) ;

৪। ... ...

৫। ত-বর্গ (৩.৯২)

(ঘ) অথর্ব প্রাতিশাখ্য—

১। অকার (১.৬), ঌ-কার (১.৪); ল-কাব (১.৫) ; ষ-কার (১.২৩) ;

২। ঋ-বর্ণ (১.৩৭)

৩। য, র (১.৬৮) ; শ ষ সেযু (২.৬)

৪। রেফ (২.২৮)

৫। চ-বর্গ (১.৭); উ বর্গ (২.১২) চ ট বর্গ (২.১৪) ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন অথর্ব প্রাতিশাখ্যে তিনটি বৈয়াকরণিক সূত্রও পাওয়া যায়—

১ম। 'লোপঃ উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ সকারস্য' (বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য ৪.৯৫ ; তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ৫.১৪)

২য়। 'অন্তস্থোষ্মসু লোপঃ'—(অথর্ব প্রাঃ ৩.৩২ = ঋক্ প্রাঃ ৪.৫ ; বাজসনেয় প্রাঃ ৪.১, তৈত্তিরীয় প্রাঃ ১৩.২)

৩য়। ঋক্ প্রাঃ ১৫, বাজসনেয় প্রাঃ ১.১০৪, এবং অথর্ব প্রাঃ ১.৫৮-র নির্দেশে রেফের নিয়োগ ও রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ববিধান প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়াও লিখন ব্যাপারের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শতপথ-ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,—

অষ্টশতাধিক-দশ-সহস্র-সংখ্যকানি সংবৎসরস্য মুহূর্তানি তাবন্ত্যেবচ বেদত্রয়স্য পঙ্‌ক্তিযুগ্মম্।

সংবৎসর প্রজাপতিতে অষ্টশতাধিক দশসহস্রমুহূর্ত এবং বেদত্রয়ে তাবৎ সংখ্যক পঙ্‌ক্তি বিদ্যমান আছে।

আর এক স্থানে (১০ম কাণ্ড ৪) উপদেশ করিতেছেন যে, "এক বর্ষে যত মুহূর্ত হয়, তাহার দ্বিগুণ পঙ্‌ক্তি তিন বেদে আছে।"

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ প্রশ্ন-মন্ত্রে নির্দেশ করিতেছেন,—তদাহুর্যদেকাদশক-পালঃ পুরোডাশো দ্বাবগ্নাবিষ্ণুকা এণয়োঃ স্তত্রক্লপ্তিঃ কা বিভক্তি।—১ম পঞ্চিকা—২য় খণ্ড।

প্রত্যুত্তর-মন্ত্র,—

"অষ্টকপাল আগ্নেয়োঽষ্টাক্ষরা বৈগায়ত্রী গায়ত্রমগ্নেশ্ছন্দাঃ ত্রিরীদং বিষ্ণুর্বিচক্রমত সা এণয়োস্তত্রক্লপ্তি সা বিভক্তিঃ।"

গায়ত্রী ত্রিছন্দোময়ী ;—প্রত্যেক ছন্দে ৮টি করিয়া অক্ষর আছে, এবং সমুদয় গায়ত্রী চতুর্বিংশতি অক্ষর যুক্ত।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে সৃষ্টি বর্ণনায় বর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ো বর্ণা অজায়ন্ত অকারঃ ম-কারঃ ইতি কানে-কধা সমভয়ৎ তদেতৎ ওমিতি।

অন্যত্র—

ইত্যেতৈরেব এনং তৎ কামৈঃ সমর্ধয়তীতি নু প্রথমম্ পটলম্।—১ম পঞ্চিকা ২১ খণ্ড।

স্তৌরিত্যেতৈরেবৈনং তৎকামৈঃ সম্বন্ধয়তীতি নু পূর্বং পটলম্।—১ ৪.৪

এখানে পটল=গ্রন্থ।

অনুষ্টুভো স্বর্গ কামঃ কুর্বীত দ্বরোর্বা অনুষ্টুভোশ্চতুঃ ষষ্টিরক্ষাণি।—১ম অধ্যায়—৫ম খণ্ড।

অনুষ্টুভ্ ছন্দঃ চতুঃষষ্টি-অক্ষর সমন্বিতং; অনুষ্টুভ্ ও দ্ব্যক্ষর মন্ত্র স্বর্গকাম।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের এক স্থানে (৩.৩.৪) এরূপভাবে অক্ষরের বর্ণনা আছে যে, ঐ ব্রাহ্মণ রচনার সময় লিপি-প্রণালীর অস্তিত্ব ছিল, তাহা স্বীকার

না করিয়া থাকা যায় না। আমরা সানুবাদ সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

তে বা ইমে ইতরে ছন্দসী গায়ত্রীমত্যবদেতাং বিত্তং নাবক্ষরাণ্যনু-পর্যাগুরিতি নেত্যব্রবীদ্ গায়ত্রী যথা বিত্তমেব ন ইতি তে দেবেষু প্রশ্নমৈতাং তে দেবা অব্রুবন্ যথা বিত্তমেব ন ইতি তস্মাদ্বাপ্যেতর্হি বিত্ত্যাং বাহুর্যথা-বিত্তমেব ন ইতি ততো অষ্টাক্ষরা গায়ত্র্যভবত্র্যক্ষরা ত্রিষ্টুবেকাক্ষরা জগতী সাষ্টাক্ষরা গায়ত্রী প্রাতস্সবনমস্তম্বং তাং গায়ত্র্যব্রবীদায়ম্পি মেহত্রাস্তিতি সা তথেত্যব্রবীৎ ত্রিষ্টুপ্ তাং বৈ মৈ তৈরষ্টাভিরক্ষরৈরুপসন্দেহীতি তথেতি তামুপসমদধাদেতদ্বৈ তদ্ গায়ত্র্যৈ মধ্যন্দিনে যন্মরুত্বতীয়স্যোত্তরে প্রতিপদো যশ্চানুচরঃ সৈকাদশাক্ষরা ভূত্বা মাধ্যন্দিনং সবনমুখ্য যচ্ছন্। ইত্যাদি।

অর্থাৎ, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী নামক অপর দুইটি ছন্দ গায়ত্রীর সমীপবর্তী হইয়া বলিলেন, "তোমরা যাহা পাইয়াছ, তাহা আমাদের; সুতরাং আমরা তাহা পাইব। সেই অক্ষব কয়টি আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করুক।" গায়ত্রী উত্তর করিলেন, "তাহা হইতে পারে না; যে যাহা পাইয়াছে, তাহা নিজের; সুতরাং সে তাহাই পাইবে।" যখন এই কলহ কিছুতেই মিটিল না, তখন তাঁহারা দেবগণকে মধ্যস্থ মানিলেন। দেবগণ গায়ত্রীব মতে মত দিয়া বলিলেন,—"যে যাহা পাইয়াছে, তাহার তাহাই থাকুক।" তখন গায়ত্রীব আট অক্ষর, ত্রিষ্টুভের তিন অক্ষর, এবং জগতীর এক অক্ষর হইল। সেই অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী প্রাতঃসবন করিয়াছিলেন, কিন্তু ত্র্যক্ষরা ত্রিষ্টুপ মাধ্যন্দিন সবন করিতে পাবেন নাই। গায়ত্রী তাহাকে বলিলেন, "আমি আসিতেছি—এখানে আমারও স্থান হউক।" ত্রিষ্টুপ বলিলেন, "তাহাই হউক; তুমি আমাকে অষ্টাক্ষর দিয়া যুক্ত কর।" গায়ত্রী তাহাই করিলেন।

(২)

সামবেদীয় ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণের পঞ্চম প্রপাঠকে দেশভেদে উদরাস্ত-কালের তারতম্যে দিন-পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির গণনা আছে। ইহা কখনই সূক্ষ্ম গণনা ব্যতীত সাধিত হইতে পারে না। আর সূক্ষ্ম গণনাদি অক্ষর-জ্ঞান ব্যতীত কিরূপেই বা সম্পন্ন হইতে পারে? ব্রাহ্মণের বচনটি এই—

"স যদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতাপশ্চাদস্তমেতা
................................"

উপনিষদ্ভাগেও বর্ণ-জ্ঞানের যথেষ্ট উদাহরণ আছে। ছান্দোগ্য-উপনিষদে স্বরবর্ণ, উষ্মবর্ণ ও স্পর্শবর্ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"সর্বেস্বরা ইন্দ্রস্য আত্মানঃ। সর্বে উষ্মাণঃ প্রজাপতে আত্মানঃ। সর্বে স্পর্শা মৃত্যোরাত্মানস্তং যদি স্বরেষুপালভেতেন্দ্রং শরণং প্রপন্নেভূবং...।" —২য় প্রপাঠক। ২২ খণ্ড।

অন্যান্য উপনিষদেও লিপিজ্ঞানসূচক বা লিখনার্থক শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি। নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল ;—

অক্ষর

প্রশ্নোপনিষৎ—৫.৫।

মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ—৬.২ ; ৬.৪ ; ৬.৫ ; ৬.২৩ ; ৭.১১।

অমৃতনাদোপনিষৎ—২৪।

বর্ণ

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—১.২.১।

শ্বেত—৪.১।

পটল

গর্ভ—৫।

লিখ্

রাম—৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৮, ৭২, ৮১।

গ্রন্থ

ব্রহ্ম—১৪, ১৩, ৫।

মৈত্রি—৬.৩৪।

গীতা—১০.২৫ ; ৩৩ ; ৩.১৫।

গোপী—৩।

ছান্দোগ্য ১.১.১, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০ ; ১.৩.৬, ৭ ; ১.৪.১, ৪, ৫ ; ২.১০.৩, ৪ ; ২.২৩.৩ ; ৮.৩.৫।

বৃহ—৫.২.১, ২, ৩ ; ৫,৩.১ ; ৫.৫.১, ৩, ৪ ; ৫.১৪.১, ২, ৩।

কঠ—২.১৬।

মাণ্ডূক্য—১.১।

নৃসিংহতাপনী—২.২ ; ৪.১ ; ৪.২ ; ৫.২।

অমৃত-বিন্দু—২.৬২।

এইবার আমরা স্মৃতিগ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, যৎকালে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ উপদেশ প্রদান করিতেন, তখন লিখন-প্রণালী সুপ্রচলিত ছিল।

মনুর উক্তি যথা,—

"বলাদ্দত্তং বলাদ্ভুক্তং বলাদ্ যচ্চাপি লেখিতম্।
সবান্ বলকৃতার্থান্ অকৃতান্ মনুরব্রবীৎ॥"—৮।১৬৮

"ঋণং দাতুমশক্তো যঃ কর্তুমিচ্ছেৎ পুনঃ ক্রিয়াং।
স দত্বা নির্জিতাং বৃদ্ধিং করণং পরিবর্ত্তয়েৎ॥"—১৫৪

যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিব লেখ্য প্রকরণের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দেখিতে পাই,—

১। প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্তিতম্
এষামন্যতমাভাবে দিব্যান্যতম্ মুচ্যতে॥—২.২২

২। যঃ কশ্চিদর্থনিষ্ণাতঃ স্বরুচ্যা তু পরস্পরং।
লেখ্যন্তু সাক্ষিমৎ কার্যং তস্মিন্ ধনিক পূর্বকম্॥—২.৮৬

৩। সমাপ্তেঽর্থে ঋণীনাম স্বহস্তেন নিবেশয়েৎ।
মতং মেঽমুকপুত্রস্য যদত্রোপরিলেখিতম্।—২.৮৮

৪। সাক্ষিণশ্চ স্বহস্তেন পিতৃনামকপূবকং।
অত্রাহমমুকঃ সাক্ষী লিখেয়ু রিতি তে সমাঃ॥—২.৮৯

৫। উভয়াভ্যর্থিতেনৈতৎ ময়া অমুকসূনুনা।
লিখিতং হ্যমুকেনেতি লেখকোঽন্তে ততো লিখেৎ।—২.৯০

৬। বিনাপি সাক্ষিভির্লেখ্যং
স্বহস্ত লিখিতন্তু যৎ।
তৎপ্রমাণং স্মৃতং লেখ্যং
বলোপাধিকৃতাদৃতে।—২.৯১

৭। ঋণং লেখ্যকৃতং দেয়ং পুরুষৈস্ত্রিভিরেব তু।
অধিস্তু ভুজ্যতে তাবদ্‌যাবত্তন্ন
প্রদীয়তে।—২.৯২

৮। দেশান্তরস্থে দুর্লেখ্যে নষ্টোন্মৃষ্টে
হৃতে তথা।
ভিন্নে দগ্ধেহথাবচ্ছিন্নে লেখ্যমন্যত্তু
কারয়েৎ।—২.৯৩

৯। সন্দিগ্ধ লেখ্যশুদ্ধিঃ স্যাৎ স্বহস্ত লিখিতাদিভিঃ।
যুক্তিপ্রাপ্তিক্রিয়াচিহ্নসম্বন্ধাগমহেতুভিঃ।—২.৯৪

১০। লেখ্যস্য পৃষ্ঠেহভিলিখেদ্দত্বা দত্বা
ধনং ঋণী।
ধনী চোপগতং দদ্যাৎ স্বহস্তপরিচিহ্নিতম্।—২.৯৫

১১। দত্বর্ণং পাটয়েল্লেখ্যং শুদ্ধ্যৈবান্যত্তু
করিয়েৎ।
সাক্ষিমচ্চ ভবেদ্‌যদ্বা তদ্দাতব্যং
সসাক্ষিকং।—২.৯৬

১২। স হ্যাশ্রমৈর্বিজিজ্ঞাস্যঃ সমস্তৈরেব
মেব তু।
দ্রষ্টব্যস্ত্বথ মন্তব্যঃ শ্রোতব্যশ্চ
দ্বিজাতিভিঃ।—৩.১৯১

বাল্মীকি-রামায়ণের একস্থানে দেখিতে পাই যে, হনুমান সীতাদেবীকে রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাও লিপি-বিদ্যমানতার একটি প্রমাণ। শ্লোকটি এই—

বানরোহহং মহাভাগে দূতোরামস্য ধীমতঃ।
রামনামাঙ্কিতঞ্চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুরীয়কম্॥

—সুন্দরকাণ্ড, ৩৬.২

আমরা মহাভারতের মধ্যেও দেখিতে পাই যে, বেদ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইত। শ্লোক, যথা—

যদেতত্ত্বক্তং ভবতা বেদশাস্ত্র নিদর্শনম্।
এবমেতদ্যথা চৈতন্নিগৃহ্নাতি তথা ভবান্॥
ধার্য্যতে হি ত্বয়া গ্রন্থ উভয়োর্বেদশাস্ত্রয়োঃ।
ন চ গ্রন্থস্য তত্ত্বজ্ঞো যথা চ ত্বং নরেশ্বর॥
যো হি বেদে চ শাস্ত্রে চ গ্রন্থধারণতৎপরঃ।
ভারং স বহতে তস্য গ্রন্থব্যর্থং ন বেত্তি যঃ।
যস্তু গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞো নাস্য গ্রন্থাগমো বৃথা॥
গ্রন্থস্যার্থস্য পৃষ্টঃ সন্ তাদৃশো বক্তু্মর্হতি।
যথাতত্ত্বাভিগমনাদর্থং তস্য স বিন্দতি॥
ন যঃ সংসৎসু কথয়েদ্গ্রন্থার্থং স্থূল বুদ্ধিমান্।
স কথং মন্দবিজ্ঞানো গ্রন্থং বক্ষতি নির্ণায়াৎ॥

—শান্তিপর্ব—৩০৭।১১-১৬.

মহাভারতের অন্য যে যে স্থলে লিপিব্যঞ্জক গ্রন্থ শব্দের উল্লেখ আছে, নিম্নে তাহার নির্দেশ করা গেল।

গ্রন্থগ্রন্থিং তদাচক্রে মুনিগূঢ়ং কুতূহলাৎ।
যস্মিন্ প্রতিজ্ঞয়া প্রাহ মুনির্দ্বৈপায়নস্ত্বিদম্।

আদি—১.৮০

(টীকা—"গ্রন্থগ্রন্থিং গ্রন্থে দুর্ভেদ্য স্থানং")

"কৃতং ময়েদং ভগবন্ কাব্যং পরমপূজিতং"—৬১
"পরং ন লেখকঃ কশ্চিৎ এতস্য ভুবি বিদ্যতে।"—৭০
"কাব্যস্য লেখনার্থায় গণেশঃ স্মর্য্যতাং মুনে"—৭৪
"ও মিত্যুক্ত্বা গণেশোঽপি বভূব কিল লেখকঃ"—৭৯
"গ্রন্থার্থসংযুতা (সংহিতা)"—১.১৯
"আশুগ্রন্থার্থবক্তা চ যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে।"—৫.৯৯৮
"ধার্যতে হি ত্বয়া গ্রন্থ উভয়োর্বেদশাস্ত্রয়োঃ।
ন চ গ্রন্থস্য তত্ত্বজ্ঞো যথা চ ত্বম্"—১২.১.৩৪০
"লঘুনা দেশরূপেণ গ্রন্থযোগেন"

—শান্তি—৩৯৬১.

আবাধয়ামাস ভবং মনোযজ্ঞেন কেশব।

তস্তাহ ভগবাংস্তষ্টো গ্রন্থকাবো ভবিষ্যসি।

অনুশাসন—৬৯০

গ্রন্থকৃল্লোকবিখ্যাতো ভবিতাস্যজরামবঃ।

শক্রেণ তু পুরাদেবো বাবাণস্যাং জনার্দন।

অনুশাসন—৬৯৪

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণদ্যোতক অক্ষরের উল্লেখ আছে—"অক্ষরাণাং অকারোঽস্মিঃ"—১১.৩৩

যাস্কের নিরুক্তে "পুস্তক" অর্থে গ্রন্থের উল্লেখ আছে,—

"সাক্ষাৎকৃতধর্মাণ ঋষয়ো বভূবুস্তেঽবরেভোঽসাক্ষাৎকৃত—ধর্মস্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রদুঃ। উপদেশায় গ্লায়ন্তোঽবরে বিল্ম গ্রহণায়েমং গ্রন্থং সমাম্নাসিষু বেদঞ্চ বেদাঙ্গানি"—১.২০

আমরা পরিভাষেন্দুশেখরে বৈয়াকরণিক মাত্রাব কালভেদেব এরূপ উল্লেখ পাইয়াছি যাহাতে ঐ প্রাচীন গ্রন্থরচনাকালে অক্ষবজ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার কবা যায় না।

"অর্ধমাত্রালাঘবেন পুত্রোৎসাহং মন্যন্তে বৈয়াকরণাঃ"—পরিভা—২২

"পর্যায়শব্দানাং লাঘব-গৌরবচর্চানাদ্রিয়তে"—পবিভা—১১৫

উল্লিখিত গ্রন্থেব অব্যবহিত পববর্তী গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিত পুস্তকেব কথা দেখিতে পাই।

"গীতী শীঘ্রী শিরঃ কম্পী তথা লিখিত পাঠকঃ। অনর্থজ্ঞোঽল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ॥"—শিক্ষা-শ্লোক - ৩২

আমরা পাণিনি-রচিত অষ্টাধ্যায়ী খুলিয়া ইহাব প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ৬০ সূত্রে দেখিতে পাই, তিনি লোপেব সংজ্ঞা দিযাছেন,—

"অদর্শনং লোপঃ"

বৃত্তি—"অদর্শনমশ্রবণ মনুচ্চারণ মনুপলব্ধিরভাবো বর্ণবিন্যাস ইত্যনর্থান্তমেতৈঃশব্দৈর্যোঽর্থোভিধীয়তে তস্যলোপ ইতীয়ং সংজ্ঞা ভবতি"—

পূর্বে উচ্চারিত বর্ণ যদি অনুচ্চারিত—অশ্রুত-অলিখিত হয়, তবে তাহার লোপ সংজ্ঞা হইবে। সুতরাং কে না বলিবে, যে অক্ষর বা শব্দ এখন দৃষ্ট

হইতেছে না, অথবা যাহা লুপ্ত হইয়াছে লোপের পূর্বে তাহা নিশ্চয়ই দৃষ্ট বা লিখিত বর্ণ ছিল? যদি তাঁহার লক্ষ্য লিখিত বর্ণ না হইত, তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই এই সূত্রটিকে পরিবর্তন করিয়া বলিতে পারিতেন,

"অশ্রবণং লোপঃ"

পাণিনির এই সূত্রে "দৃশ্" ধাতুর অন্য কোনও অর্থ খাটে না। পাণিনি আরও কয়েকটি সূত্রে দর্শন অর্থে "দৃশ্" ধাতু ব্যবহার করিয়াছেন,—

'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে'—৩.২.১৭৮ ; ৩.৩.১৩৯

'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে'—৩.২.৭৫

'অন্যেষামপি দৃশ্যতে'—৬.৩.১৩৭

'অন্যেম্বপি দৃশ্যতে'—৩.২.১০১

'ইতরাভ্যোপি দৃশ্যন্তে"—৫.৩.১৫

'ছন্দস্যপি দৃশ্যতে'—৬.৪.৭৩ ; ৭.১.৭৬

[বেদেও আডাগম দৃষ্ট হয়, (৬.৪.৭৩) বেদেও 'অন্' আদেশ দেখা যায়।]

পাণিনির সময় যে বেদ লিখিত গ্রন্থ ছিল, তাহা এই দুই সূত্র হইতেই সূচিত হইতেছে। আচার্য পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণে সর্বসমেত চারিবার "গ্রন্থ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

(১) "অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে"—৪.৩.৮৭

কর্তাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু করা হইলে, এবং যাহা করা হয়, তাহা যদি গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়ান্ত পদের উত্তর যথাবিহিত প্রত্যয় হয়। যথা,—সুভদ্রমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ=সৌভদ্রঃ।

(২) "কৃতে গ্রন্থে"—৪.৩.১১৬

কর্তাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু করা হইলে, এবং যাহা কিছু করা যায় তাহা যদি গ্রন্থ হয়,—তাহা হইলে তৃতীয়ান্ত পদের উত্তর যথাবিহিত প্রত্যয় হয়। যথা,—বররুচিনা কৃতাঃ=বাররুচাঃ শ্লোকাঃ।

৩। "গ্রন্থান্তাধিক্যে"—৬.৩.৭৯

'গ্রন্থান্ত পর্যন্ত' বা 'অধিক' অর্থে সহশব্দ স্থানে 'স' আদেশ হয়। যথা—সকলং=কলান্তং জ্যোতিষং অধীতে।

৪। 'সমুদাঙ্‌ভ্যো যমোঽগ্রন্থে'—১. ৩. ৭৫

কর্তাভিপ্রায় ক্রিয়াফল বুঝাইলে, এবং গ্রন্থ বিষয় না বুঝাইলে, সম্, উৎ, আঙ্ পূর্বক যম্ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। এতভিন্ন পাণিনি ৪. ৩. ৮৮ সূত্রে ("শিশুক্রন্দযমসভদ্বন্দ্বেন্দ্র-জননাদিভ্যশ্চ)—"শিশুক্রন্দীয়ঃ" ও "যমসভঃ" নামক দুইখানি গ্রন্থের উদাহরণ দিয়াছেন। "শিশুক্রন্দনীয়ঃ" শব্দের অর্থ কাশিকা বৃত্তিতে এইরূপ আছে,—শিশূনাং ক্রন্দনং শিশুক্রন্দনং তমধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ শিশুক্রন্দনীয়ঃ" গণরত্ন-মহোদধিতে ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ পাওয়া যায়,—

"শিশবোবাল্লাস্তেষাং ক্রন্দস্তমাধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থ শিশুক্রন্দনীয়। বালপুস্তকঃ।"

আচার্য একটি সূত্র করিয়াছেন,—

"দিবা-বিভা-নিশা-প্রভাস্করান্তানন্তানন্তাদি বহুনান্দী কিং লিপিলি-বিবলিভক্তিকর্তৃকচিত্রক্ষেত্রসংখ্যাজঙ্ঘাবাহবহর্যত্তদ্ধনু বরুষ্যু।"

অর্থাৎ—দিবা, বিভা, নিশা, বহু, নান্দী, কিং, লিপি, লিবি প্রভৃতি শব্দের পর 'কৃ' ধাতু থাকিলে তাহার 'ট' প্রত্যয় হয়। এই সূত্রোক্ত 'লিপিকর' ও 'লিবিকরে'র অর্থ লেখক।

এই সূত্রে যখন 'লিপি'-লেখকের অস্তিত্ব পাওয়া যাইতেছে, তখন পাণিনিকে লিপিজ্ঞানবিরহিত কল্পনা করা নিতান্তই হাস্য-রসাত্মক। ইহা ব্যতীত আমরা নিম্নলিখিত দুইটি সূত্র হইতে দেখাইব যে, সে সময় রাজচিহ্নাঙ্কিত মুদ্রারও প্রচলন ছিল।—

১। 'রূপাদাহত প্রশংসয়োর্যপ্'—৫. ২. ১২০

আহত অর্থাৎ মুদ্রণ অর্থে, অথবা প্রশংসা অর্থে রূপ শব্দের উত্তর মতুপ্ অর্থে যপ্ প্রত্যয় হয়। যথা, আহতং রূপমস্য=রূপ্যো দীনারঃ (কোনও রাজচিহ্নাঙ্কিত দীনার)

২। 'শতসহস্রান্তচ্চ নিষ্কাৎ'—৫. ২. ১১৯

অর্থাৎ, নিষ্কশব্দের পরস্থিত শত ও সহস্র শব্দের উত্তর মতুপ্ অর্থে ঠঞ্ প্রত্যয় হয়। যথা, নিষ্কশতং অস্যাস্তি নৈষ্কশাতকম্।

পাণিনি আরও তিনটি সূত্র করিয়াছেন।—

১। "স্বরিতেনাধিকারঃ"—১. ৩. ১১

অর্থাৎ,……কোনও শব্দ স্বরিত চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত হইলে, এইসকল সূত্রে 'অধিকার' বুঝিতে হইবে। লিপির অস্তিত্ব বিষয়ে ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

২। 'কর্ণে বর্ণ লক্ষণাৎ'—৬. ২. ১১২

বর্ণার্থক শব্দের পর কর্ণ শব্দ থাকিলে বহুব্রীহি সমাসে ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইবে। যথা,—শুক্লকর্ণ।

৩। 'কর্ণেলক্ষণস্যাবিষ্ট পঞ্চমণি ভিন্নাচ্ছন্নচ্ছিদ্রস্রুবস্বস্তিকস্য'—৬.৩.১১৫

অর্থাৎ, যখন কর্ণ শব্দে কোনও জন্তুর কর্ণে অধিকারিত্ব ব্যঞ্জক লক্ষণ বা চিহ্ন বুঝায়, তখন কর্ণ শব্দের পূর্ববর্তী বিষ্ট, অষ্টন্, পঞ্চন, মণি, ভিন্ন, ছিন্ন, ছিদ্র, স্রুব ও স্বস্তিক শব্দ ভিন্ন শব্দের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়। যথা,—দ্বিগুণাকর্ণ, ত্রিগুণাকর্ণ।

অধিকন্তু, পাণিনির নিম্নলিখিত ৮টি সূত্র হইতে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, তাঁহার পূর্বে আপিশলি, স্ফোটায়ন, গার্গ্য, শাকল্য, শাকটায়ন, গালব, ভারদ্বাজ ও কাশ্যপ ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল এবং তিনি স্বয়ং ঐগুলি অবগত ছিলেন। সূত্রগুলি এই,—

"লভঃ শাকটায়নস্য, —৩. ৪. ১১১

"বাসুপ্যাপিশলেঃ"—৬.১. ৯২

"অবঙ্ স্ফোটায়নস্য,—৬. ৩. ১২৩

"ওতো গার্গ্যস্য,"—৮. ৩. ২০

"লোপঃ শাকল্যস্য,"—৮. ৩. ১৯

"ইকো হ্রস্বোহঙ্যো গালবস্য"—৬. ৩.৬১

"ঋতো ভারদ্বাজস্য"—৭. ৩. ৬৩

"তৃষিমৃষিকৃশেঃ কাশ্যপস্য"—১. ২. ২৫

উপরিলিখিত ব্যাকরণগুলির নিয়ম উদ্ধৃত করায় আমরা পাণিনিকে লিপিজ্ঞানহীন বলিয়া মনে করিতে পারি না।

পাণিনির 'লিঙ্গানুশাসনে' আমরা 'পুস্তক' শব্দ পর্যন্ত পাইয়াছি,—

"কণ্ঠ কানীক সরক মোদক চষক মস্তক তড়াকনিষ্ক·········পুস্তকং" (পুংলিঙ্গ সূত্র ২৯)

এমনকি তাঁহার 'গণপাঠে' লিখনার্থ—'লিখ্' ধাতুরও প্রয়োগ পাওয়া যায়। কথা—

"লিখ্ অক্ষর বিন্যাসে।"

পতঞ্জলির মহাভাষ্যে লিপিব্যঞ্জক যে সমস্ত কথা পাওয়া যায়, তদ্দ্বারাও আমাদের প্রতিপাদ্য প্রমাণিত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ দুইটি ভাষ্যমূল উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। "দুষ্টঃ শব্দঃ। দুষ্ট শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্ত ন তমর্থমাহ। স বাগ্ বজ্রোষজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোপরাধাৎ দুষ্টান্ শব্দান্ মা প্রযুক্ষ্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।"—১.১.১

"দুষ্ট শব্দঃ। স্বরদ্বারা অথবা বর্ণদ্বারা দোষযুক্ত শব্দ (অর্থাৎ, যে শব্দ-প্রয়োগে স্বরের অথবা বর্ণের দোষ থাকে, সেই শব্দ) মিথ্যাপ্রযুক্ত হইয়া (অর্থাৎ যে প্রকার অর্থ প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রয়োগ করা হয়, স্বরের এবং বর্ণের দোষবশত অপর অর্থ বুঝাইয়া) সেই অর্থ (অর্থাৎ প্রয়োগ কর্তার অভিপ্রেত অর্থ) প্রকাশ করে না। সেই বাক্যরূপ বজ্র যজমানকে বিনষ্ট করে; যেমন স্বরপ্রয়োগের দোষে "ইন্দ্রশত্রু" এই শব্দ যজমানের অনিষ্ট সম্পাদন করিয়াছিল। দোষযুক্ত শব্দ প্রয়োগ না করি, এইজন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত।

২। "সপ্তদ্বীপা বসুমতী ত্রয়ো লোকশ্চত্বারো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সরহস্য বহুধা বিভিন্না একশতমধ্বর্যুশাখাঃ সহস্রবর্ত্মা সামবেদ একবিংশতিধা বাহবৃচ্যং নবধাথর্বণো বেদোবাকোবাক্যমিতিহাসঃ পুরাণং বেদ্যকমিত্যেতা বাঞা শব্দস্যপ্রয়োগবিষয়ঃ"—১.২

[সাহিত্য, ১৩১৮ পৌষ, পৃঃ ৬৪৭-৬৫৩, ফাল্গুন, পৃ. ৮৭৫-৮০]

ভারতীয় অক্ষরের প্রাচীনত্ব

বহুকাল যাবৎ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে, ভারতবাসী খ্রী-পূ. ৪র্থ শতকের পূর্বে অক্ষরবিন্যাস করিতে জানিত না। বিভিন্ন ইউরোপীয় পণ্ডিত ভারতীয় লিপির উৎপত্তিসম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করিতেন। Sir William Jones (১৮০৬ খ্রী.), Kopp (১৮২১ খ্রী.), R. Lepsius (১৮৩৪ খ্রী.), Weber, Thomas Benfey[১], Maxmuller[২], Whitney[৩], Pott, Westergaard[৪], Buhler, Sayce, Lenormant[1] প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সকলেই মনে করিতেন ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপি ফিনিশীয় বর্ণমালা হইতে গৃহীত। ড. Deckeএর, মতে ব্রাহ্মীলিপি আসিরিয়া ও বাবিলোনিয়ার cuneiform বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন। ড. Burnellএর মতে ফিনিশীয়, পারস্য অথবা বাবিলোনিয়ার আরামীয় হইতে ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হইয়াছে। Prinsep, Otfried Muller, M. Senart প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে ব্রাহ্মীলিপি গ্রীক বিজয়ের চিহ্ন। M. Joseph Halevy[2]র মতে ব্রাহ্মী-বর্ণমালার ৮টি ব্যঞ্জনবর্ণ আরামাইক লিপি হইতে, আরিয়ানো-পালি বা খরোষ্ঠী হইতে অবশিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ এবং গ্রীক বর্ণমালা হইতে পাঁচটি বর্ণ লইয়া সৃষ্টি হইয়াছে। ড. Wilson[3] কতকটা ঐরূপ মত পোষণ করেন।

Edward Thomas Lassen, Dowson, Jesenius, Cunningham এবং Goldstucker[4] প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে ব্রাহ্মীলিপির জন্ম-

স্থান ভারতবর্ষ। ইঁহাদের মধ্যে অনেকের ধারণা যে, ইহা দেশজ কোন প্রকার চিত্রলিপি হইতে উদ্ভূত।[৫]

মোহেঞ্জোদড়োর লিপি আবিষ্কারের পর খ্রী-পূ. ৩০০০ বৎসরের পূর্বেও যে ভারতবাসী অক্ষরবিন্যাস করিতে পারিত তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। তবে তাহার সহিত বৈদিক সভ্যতা ও ব্রাহ্মী-লিপির কতদূর সম্বন্ধ তাহাই সমস্যা। Prof. Langdon বলেন[৬] ব্রাহ্মীলিপি মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত প্রাচীন সিন্ধু-চিত্রলিপি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ড. প্রাণনাথের[৭] মতে ব্রাহ্মী-লিপি মোহেঞ্জোদড়ো-লিপি হইতে উদ্ভূত এবং এই মোহেঞ্জোদড়ো-লিপি Proto-Elamite-লিপি হইতে উদ্ভূত ; কিন্তু Prof. Langdon এই এই শেষোক্ত মত স্বীকার করেন না।

আমাদের দেশে কবে অক্ষর-বিন্যাস বা বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কি কি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা নিম্নে আলোচনা করা হইল। প্রমাণগুলি প্রধানত দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—(১) গ্রন্থোক্তি-প্রমাণ, ও (২) উৎকর্ণ লিপি-প্রমাণ।

গ্রন্থোক্তি-প্রমাণ

স্মৃতিশাস্ত্রসকল যখন রচিত হইয়াছিল তখন ভারতবাসী রীতিমত লিখিতে জানিত, কারণ লিখিত দলিলাদির প্রচলন ছিল[৭] এবং মোকদ্দমায় বাদী বা পূর্বপক্ষলিখিত আর্জি বিচারালয়ে দাখিল করিত[৮] এবং প্রতিবাদী লিখিয়া তাহার জবাব দিত[৯]। লিখিত প্রমাণ সকলসময়েই প্রামাণ্য (নারদ. ১ ; বৃহ. ৭৫) ; অধিকন্তু নারদ-স্মৃতি ও বৃহস্পতি-স্মৃতিতে লিখিত আছে, ব্রহ্মা স্বয়ং লিপিবিদ্যা আবিষ্কার করেন।[১০] 'জ্যোতিষতত্ত্ব' নামক একখানি জ্যোতিষ-গ্রন্থেও এই উক্তি সমর্থিত হইয়াছে।[১১] 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে' (২৬ অ.) লিখিত আছে, প্রজাপতির চিন্তাধারা হইতে অক্ষর-সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে বহুস্থানে লিখন-প্রণালীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।[১২] রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে হনুমান্ সীতাদেবীকে রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী প্রদর্শন করিতেছেন ; ইহা লিপি-বিদ্যমানতার একটি প্রমাণ।[১৩] মহাভারতের বহুস্থলে গ্রন্থ-শব্দের ও লিপি-ব্যঞ্জক শব্দের উল্লেখ আছে।[১৪] গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন,

'অক্ষরাণাং অকারোঽস্মি'—(১১.৩৩)। যাস্কের নিরুক্তে 'পুস্তক' অর্থে গ্রন্থের উল্লেখ আছে।[১৫] 'শিক্ষা-শ্লোক' নামক গ্রন্থে স্পষ্টই লিখিত পুস্তকের উল্লেখ আছে।[১৬]

Maxmuller-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, পাণিনির সময়ে লিখন-প্রণালী প্রচলিত ছিল না। কিন্তু পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'র প্রথম অধ্যায়েই লিখিত অক্ষরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ৬০ সূত্রে পাণিনি লোপের সংজ্ঞা দিতেছেন—'অদর্শনং লোপঃ', ইহার বৃত্তি হইতেছে—'অদর্শনমশ্রবণমনুচ্চারণমনুপলব্ধিরভাবো বর্ণ-বিন্যাস ইত্যনর্থান্তমেতৈঃ শব্দৈর্যোঽর্থো ভিধীয়তে তস্য লোপ ইতীয়ং সংজ্ঞা ভবতি', অর্থাৎ পূর্বে উচ্চারিত বর্ণ যদি অনুচ্চারিত, অশ্রুত ও অলিখিত হয় তবে তাহার লোপ-সংজ্ঞা হইবে। পাণিনিতে এই দৃশ্‌ ধাতুর দর্শন ব্যতীত অন্য কোন অর্থ খাটে না; সুতরাং অক্ষর লিখিত না হইলে তাহার অদর্শন হইবে কিরূপে? দর্শন অর্থে পাণিনি এই দৃশ্‌ ধাতুর বহুবার প্রয়োগ করিয়াছেন, সকল ক্ষেত্রেই লিপির অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছে। পাণিনির সময়েও বেদ যে লিখিত গ্রন্থ ছিল তাহার প্রমাণ দুইটি শ্লোকে আছে।[১৭] পাণিনির সময়ে যে গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল তাহার অতি উত্তম প্রমাণ আছে, কারণ পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণে চারি বার 'গ্রন্থ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।[১৮] এতদ্ভিন্ন পাণিনি 'শিশুক্রন্দীয়' ও 'যমসভ' নামক দুইটি লিখিত গ্রন্থের উদাহরণ দিয়াছেন।[১৯]

পাণিনির একটি সূত্রে লিপি, লিবি এবং লিপিকর (অর্থাৎ লেখক) শব্দের উল্লেখ আছে।[২০] ইহা ব্যতীত রাজ-চিহ্নাঙ্কিত মুদ্রারও উল্লেখ আছে।[২১] পাণিনির লিঙ্গানুশাসনে 'পুস্তক' শব্দের উল্লেখ আছে[২২] এবং গণপাঠে লিখনার্থে 'লিখ্‌' ধাতুরও প্রয়োগ পাওয়া যায়।[২৩]

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অক্ষপটল অধিকরণ হইতে জানা যায় যে,—রাজ্যের সামান্য খুঁটিনাটির হিসাব অক্ষপটলে বিভিন্ন পুস্তকে লিখিত হইয়া সুরক্ষিত হইত। 'নিবন্ধ-পুস্তক' এই শব্দ অর্থশাস্ত্রে আছে। অর্থশাস্ত্রে লিখিত আছে, পত্রের জন্য বনাধ্যক্ষ তালি, তাল এবং ভূর্জবৃক্ষ রক্ষা করিবেন।

বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ হইতে সেই সময়ের লিপিজ্ঞানের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। বিনয়পিটকে 'লেখা' ও 'লেখক' অর্থবোধক বহু শব্দের উল্লেখ আছে[২৪] এবং

এই লিপিবিদ্যাকে একটি উচ্চাঙ্গের বিদ্যা বলা হইয়াছে। ভিক্ষুপাচিত্তিয়ে (৬২,১) ছেলেদের তিনটি শিক্ষণীয় বিষয়ের একটি 'লেখা', অপর দুইটি 'গণনা' ও 'রূপ'। মহাবগ্‌গে (১.৪৩.৪৯) 'লিখিতকো চোরো' নামক উপাখ্যানে লিখিত রাজকীয় ঘোষণার উল্লেখ আছে। ধম্মপদ (১.১৮২) এবং পেতবত্থু (১৪৫) নামক অতি পুরাতন গ্রন্থদ্বয়েও নাম লিখিবার নির্দেশ পাওয়া যায়। জাতকে চিঠিপত্রকে 'পণ্ণ', লেখাকে 'লেখ', বর্ণমালাকে 'অক্ষরাণি', দলিলকে 'ইণপণ্ণ', পুস্তককে 'পোত্থক' ও কোন শক্ত জিনিসের উপর খোদাই করাকে 'অছিদ্দি' বলা হইয়াছে। কটাহকজাতকে (১২৫) এক শ্রেষ্ঠীর অপর এক শ্রেষ্ঠীকে পত্র লেখার উল্লেখ আছে। মহাসুত সোমজাতকে (৫৩৭) তক্ষশিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও গুরু তাঁহার শিষ্যকে পত্র লিখিতেছেন। কামজাতকে (৪৬৭) পত্র-ব্যবহারের উদাহরণ আছে। পণ্ণনদীজাতকে (২১৪) রাজমুদ্দিকা দ্বারা শীলমোহর করার উল্লেখ দেখা যায়। হারিতজাতকে (৪৩১) রাজমন্ত্রী রাজাকে পত্র লিখিতেছেন। চুল্লকালিঙ্গজাতকে রাজাকে পত্র পড়িয়া শুনান হইতেছে। রুরু-(৪৮২) এবং কহ্ন-(৪৪০) জাতকে 'সুবণ্ণপট্টে' খোদাই করিয়া দলিল লেখার কথা আছে। খত লিখিয়া টাকা কর্জ লওয়া ও টাকা পরিশোধ করিয়া খত ফেরৎ লইবার কথা খদিরঙ্গারজাতকে (৪০) দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্দালকজাতকে (৪৮৭) অতি সুন্দর একখানি 'পোত্থক' একটি 'আধারকে'র উপর রাখিবার কথা আছে এবং তুণ্ডিলজাতকে (৩৮৮) বুদ্ধের আদেশে ব্যবহার অর্থাৎ আইন-সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি পুস্তকাকারে গ্রথিত হইয়াছিল এবং এই আইন-অনুসারে যে বিচারাদি হইত তাহার উল্লেখ আছে। অসদিসজাতকে (১৮১) উৎকীর্ণ লিপির উল্লেখ পাওয়া যায়। নৈতিক শিক্ষার নিমিত্ত উপদেশবাক্য ধাতু ও প্রস্তরাদির উপর উৎকীর্ণ হইত সে কথা আমরা কুরুধম্ম-(২৭০), তেসকুণ-(৫২১) এবং সম্ভব-(৫১৫) জাতকগুলি হইতে জানিতে পারি। ইহা ব্যতীত বৃক্ষপত্রের উপর শঙ্কুদ্বারা উৎকীর্ণ লিপি পত্ররূপে ব্যবহৃত হইত তাহা পণ্ণনদী-(২১৪) ও মহাউম্মগ্‌গ-(৫৪৬) জাতকে লিখিত আছে। হত্থিপালজাতকে (৫০৯) লিখিত আছে, জাতি হিঙ্গুল দিয়া ভিত্তির উপর অক্ষর লিখিত হইত।

কটাহকজাতক (১২৫) হইতে জানা যায়, বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ কাষ্ঠফলকের উপর লিখিয়া বর্ণমালা ও লিপিবিদ্যা শিখিত।[২৫]

বৈদিক সাহিত্যে বর্ণজ্ঞানের ও লিপিবিদ্যার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ছান্দোগ্য-উপনিষদে স্বরবর্ণ, উষ্মবর্ণ ও স্পর্শবর্ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[২৬] অন্যান্য উপনিষদেও লিপিজ্ঞানসূচক বা লিখনার্থক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।[২৭]

ব্রাহ্মণগুলির মধ্যেও লিখন ব্যাপারের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে—'দশ চ সহস্রাণ্যষ্টৌ চ শতান্যশীতীনামভবন্ত্স মুহূর্তেনাশীতিমাপ্নোন্মুহূর্তেন মুহূর্তেনাশীতিঃ সমপদ্যতে'।[২৮] অর্থাৎ সংবৎসরে অষ্টশতাধিক দশ সহস্র মুহূর্ত এবং বেদত্রয়ে তাবৎ সংখ্যক পঙ্ক্তিযুগ্ম আছে। অন্য এক স্থলে (১০. ৪) লিখিত আছে—এক বর্ষে যত মুহূর্ত হয় তাহার দ্বিগুণ পঙ্ক্তি তিন বেদে আছে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ হইতেও অক্ষরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৯] ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে সৃষ্টিবর্ণনায় বর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।[৩০] এই ব্রাহ্মণে অন্যত্র লিখিত আছে, 'অনুষ্টুভো স্বর্গকামঃ কুর্বীত দ্বয়োর্বা অনুষ্টুভোশ্চতুঃষষ্টিরক্ষরাণি' (১ম অ. ৫ম খ.) অর্থাৎ অনুষ্টুভ্ ছন্দ চতুঃষষ্টি অক্ষর-সমন্বিত ; অনুষ্টুভ্ ও দ্ব্যক্ষর মন্ত্র স্বর্গকাম। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের একস্থানে (৩. ৩. ৪) এরূপ ভাবে অক্ষরের বর্ণনা আছে যে, ঐ ব্রাহ্মণ-রচনার সময় লিপি-প্রণালীর যে অস্তিত্ব ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সানুবাদ সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—'তে বা ইমে ইতরে ছন্দসী গায়ত্রীমত্যবদেতাং বিত্তং নাবক্ষরাণ্যনুপর্যাগুরিতি নেত্যব্রবীদ্গায়ত্রী যথা বিত্তমেব ন ইতি তে দেবেষু প্রশ্নমৈতাং তে দেবা অব্রুবন্ যথা বিত্তমেব ন ইতি তস্মাদ্বাপ্যেতর্হি বিত্ত্যাং ব্যাহুর্যথাবিত্তমেব ন ইতি ততো অষ্টাক্ষরা গায়ত্র্যভবত্র্যক্ষরা ত্রিষ্টুবেকাক্ষরা জগতী সাষ্টাক্ষরা গায়ত্রী প্রাতস্সবনমত্যন্তং তাং গায়ত্র্যব্রবীদন্যপি মেহত্রাস্তিতি সা তথেত্যব্রবীৎ ত্রিষ্টুপ্ তাং বৈ মৈতৈরষ্টাভিরক্ষবৈরুপসন্দেহীতি তথেতি তামুপসমদধাদেতদ্বৈ তদ্ গায়ত্র্যো মাধ্যন্দিনে যন্মরুত্বতীয়স্তোত্তরে প্রতিপদো যশ্চানুচরঃ সৈকাদশক্ষরা ভূত্বা মাধ্যন্দিনং সবনমুত্থ যচ্ছন্' ইত্যাদি।

অর্থাৎ ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী নামক অপর দুইটি ছন্দ গায়ত্রীর সমীপবর্তী হইয়া বলিলেন, 'তোমরা যাহা পাইয়াছ তাহা আমাদের, সুতরাং তাহা আমরা পাইব। সেই অক্ষর কয়টি আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করুক।' গায়ত্রী উত্তর করিলেন, 'তাহা হইতে পারে না। যে যাহা পাইয়াছে তাহা তাহার নিজের, সুতরাং সে তাহাই পাইবে।' যখন এই কলহ কিছুতেই মিটিল না তখন তাঁহারা দেবগণকে মধ্যস্থ মানিলেন। দেবগণ গায়ত্রীর মতে মত দিয়া বলিলেন, 'যে যাহা পাইয়াছে তাহার তাহাই থাকুক।' তখন গায়ত্রীর আট অক্ষর, ত্রিষ্টুভের তিন অক্ষর এবং জগতীর এক অক্ষর হইল। সেই অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী প্রাতঃসবন করিয়াছিলেন, কিন্তু ত্র্যক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ মাধ্যন্দিন সবন করিতে পারেন নাই। গায়ত্রী তাঁহাকে বলিলেন, 'আমি আসিতেছি, এখানে আমারও স্থান হউক'। ত্রিষ্টুপ্ বলিলেন, 'তাহাই হউক, তুমি আমাকে অষ্টাক্ষর দিয়া যুক্ত কর'। গায়ত্রী তাহাই করিলেন।

প্রাতিশাখ্যগুলিতে শুধু অক্ষর কেন, অক্ষরগুলির নাম পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।[৩১] এতদ্ভিন্ন অথর্বপ্রাতিশাখ্যে তিনটি বৈয়াকরণিক সূত্র পাওয়া গিয়াছে।[৩২] ঋগ্বেদ ও অন্যান্য সংহিতাসমূহেও অক্ষর ও লিপিজ্ঞানের যথেষ্ট প্রমাণ বর্তমান। অথর্ববেদে বর্ণদ্যোতক অক্ষরের উল্লেখ আছে, 'অক্ষরেণ প্রতিমিমতে অর্কং' (১৮. ৩. ৪০)। অন্যত্রও (৯. ১০. ২) অক্ষরের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণযজুর্বেদে বর্ণদ্যোতক অক্ষরের ব্যবহার আছে, যথা, 'আশ্রাবর ইতি চতুরক্ষরং অস্তুশ্রৌষ্ট ইতি চতুরক্ষরং যজ ইতি দ্ব্যক্ষরং যে যজামহে ইতি পঞ্চাক্ষরং'—অর্থাৎ 'আশ্রাবর' ও 'অস্তুশ্রৌষ্ট' প্রত্যেকে চতুরক্ষর, 'যজ' এই শব্দটি দ্ব্যক্ষর এবং 'যে যজামহে' এইটি পঞ্চাক্ষরযুক্ত। বাজসনেয়ী সংহিতায় ছন্দের সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে—'অক্ষরপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ' (১৫. ৪)। এইরূপ তৈত্তিরীয়সংহিতায় (৪. ৩. ১২. ৩), মৈত্রায়ণী-সংহিতায় (২. ৮. ৭, ১১১. ১৫) এবং কাঠকসংহিতায় (১৭. ৬) বর্ণ অর্থে অক্ষর শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। শুক্লযজুর্বেদেও ভারতীয় আর্যগণের লিপিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।[৩৩] একটি মন্ত্রে শতসহস্র হইতে পরার্ধ পর্যন্ত গণনা করিবার কথা আছে।[৩৪] লিপির সাহায্য ব্যতীত পরার্ধ পর্যন্ত

কিরূপে গণনা করা যাইতে পারে? সর্বশেষে ঋগ্বেদের বহুস্থান হইতে অক্ষর ও লিপিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দুইটি ঋকে অক্ষরের উল্লেখ আছে, যথা—'গায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে অর্কমর্কেণ সাম ত্রৈষ্টুভেন বাকম্। বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণী॥'—(১. ১৬৪. ২৪) এবং 'অক্ষরেণ প্রতি মিম এতামৃতস্য নাভাবধি সংপৃণামি॥'—(১০. ১৩. ৩)। ঋগ্বেদের তিনটি স্থান হইতে লিপিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—'উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাং। উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥' (১০. ৭১. ৪) অর্থাৎ কেহ কেহ বাক্যকে শোনে, অথচ শোনার ফল পায় না। অন্য কেহ শুনাইলেও সে তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না। কামযমানা রমণী যেমন সুবস্ত্র দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া আপনার পতির নিকট দেহ সমর্পণ করে, সেইরূপ বাক্যসকল এই দুই প্রকার লোক ভিন্ন আর এক প্রকার লোকের নিকট আপনার দেহ ও মূর্তি সমর্পণ করে। অন্য ঋক্ দুইটি এই—'যং বৈ সূর্যং স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ। অত্রয়স্তমন্ববিন্দন্ নহ্যন্যে অশক্নুবন্' (৫. ৪০. ৯) এবং 'বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ। বেদা য উপজায়তে' (১. ২৫. ৮)। এখন দেখা যাইতেছে, ভারতীয় আর্যগণের শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থে অক্ষর ও লিপি-জ্ঞানের প্রমাণ বর্তমান।

উৎকীর্ণলিপি

১। প্রিয়দর্শী অশোকের শিলালিপি সমগ্র ভারতবর্ষে ও ভারতের বাহিরে বহু স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে; অতএব অশোকের সময়ের লিপির নমুনা পাওয়া যাইতেছে।

২। এরান-মুদ্রা (Eran coins) খ্রী-পূ. ৫ম শতাব্দীতে মুদ্রিত বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন।

৩। পারস্যদেশীয় 'সিগ্লোই' নামক মুদ্রা (Persian Sigloi) খ্রী-পূ. চতুর্থ শতাব্দীতে মুদ্রিত, কারণ অশোকের পূর্বেই ইহার প্রচলন বন্ধ হইয়াছিল।

৪। পিপ্রায়া গ্রামে আবিষ্কৃত বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ সংরক্ষিত প্রস্তরাধারের উপর উৎকীর্ণ লিপি পণ্ডিতগণের মতে খ্রী-পূ. ৫ম-৪র্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ।

৫। দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণা জেলায় ভট্টিপ্রলু নামক গ্রামে আবিষ্কৃত দেহাবশেষ-সংরক্ষিত আধারের (relic casket) উপর উৎকীর্ণ লিপি পণ্ডিত Buhler-এর মতে খ্রী-পূ. পঞ্চম শতাব্দীর কিছু পূর্বে উৎকীর্ণ।

৬। স্বামী জ্ঞানানন্দের[6] আবিষ্কৃত বিক্রমখোল-লিপি কতকগুলি চিহ্ন, শ্রীযুক্ত জয়সয়ালের[7] মতে এগুলি খ্রী-পূ. পঞ্চম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ (IA, March 1930, 58-60)।

৭। হরপ্পা ও মোহেঞ্জোদড়োতে প্রায় ৩০০ প্রকার বিবিধ চিহ্ন, ৫৪১টি ক্ষুদ্র শীলমোহরের ছাঁচ এবং ৫১৬টি স্পষ্ট চিহ্নবিশিষ্ট মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; পণ্ডিতগণ মনে করেন, এগুলি খ্রী-পূ. ৩৫০০-২৫০০ মধ্যে উৎকীর্ণ।

অধুনা আর্যাবর্তে যে সমস্ত প্রাদেশিক অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলিই ব্রাহ্মী অক্ষর হইতে উদ্ভূত। ব্রহ্মা অক্ষর সৃষ্টি করিয়াছেন এই ধারণায় ব্রাহ্মী অক্ষরের নামকরণ হইয়াছে। জৈন 'প্রজ্ঞাপনাসূত্র' গ্রন্থে লিখিত আছে—'জৈণং অদ্ধমগহাএ ভাষাএ ভাসেন্তি জস্স যণং বম্ভী বিপবত্তই', অর্থাৎ অর্ধমাগধী ভাষা যে লিপিতে প্রকাশ করা যায় তাহাই ব্রাহ্মীলিপি। প্রিয়দর্শী অশোকের শিলালিপিসমূহে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। খরোষ্ঠী অক্ষর পারস্য হইতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু ব্রাহ্মী-লিপি কালে যেরূপ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে খরোষ্ঠী সেরূপ হয় নাই। যদিও খরোষ্ঠীলিপি খরোষ্ঠ নামক ঋষির আবিষ্কৃত বলিয়া প্রবাদ আছে, তথাপি উহা ভারতের নিজস্ব লিপি নহে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। খরোষ্ঠ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খর অর্থাৎ গর্দভের ওষ্ঠ। ভারতে খরোষ্ঠী-লিপি প্রচলন হয় খ্রী পূ. ৫ম-৪র্থ শতাব্দীতে। পারসীকগণ গান্ধারে রাজ্য-স্থাপন করিয়া শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ব্রাহ্মী অক্ষরের সহিত তাঁহাদের আনীত Aramaic বর্ণমালা চালাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু গান্ধারের

বাহিরে তাঁহাদিগের এ চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ব্রাহ্মী অক্ষর তাঁহারা রাজকার্য হইতে একেবারে বাদ দিতে পারেন নাই। একই মুদ্রার একদিকে ব্রাহ্মী ও অপর দিকে খরোষ্ঠী-লিপিতে লেখা ছিল এইরূপ বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৩৫]

অধিকাংশ ইণ্ডো-গ্রীক নৃপতিগণ খরোষ্ঠীলিপি ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্তু আগাথোক্লেস্[৪] ও পান্টালিয়ন্[৫] এবং পরবর্তী নৃপতিগণ তাঁহাদিগের মুদ্রায় ব্রাহ্মীলিপিই ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, খরোষ্ঠীলিপি কিছুদিনের জন্য ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে গৌণভাবে ব্রাহ্মীর সহিত প্রচলিত ছিল, কিন্তু কোন কালেই প্রতিযোগিতায় ব্রাহ্মী-লিপির সহিত পারিয়া উঠে নাই। এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মীলিপি এদেশেই উদ্ভূত হইয়া ক্রমশ সমগ্র ভারতবর্ষে ও তাহার বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে।

পাণিনি, ললিতবিস্তর, জৈনসমবায়সূত্র (৪র্থ অঙ্গ) প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী ব্যতীত 'পুষ্করসারি' বলিয়া আর একটি প্রধান লিপির নাম পাওয়া যায়। এই তিনটি প্রধান লিপি ব্যতীত আরও অনেক প্রকার অপ্রধান লিপি ও প্রাদেশিক লিপির প্রচলন ছিল।[৩৬] ব্রাহ্মীলিপি মাত্র সমগ্র ভারতবর্ষেই পরিব্যাপ্ত হয় নাই। পশ্চিমে এলাম, মেসোপোটেমিয়া ছাড়াইয়া আফ্রিকার উপকূলে মাদাগাস্কার দ্বীপে, এমন কি ইউরোপের হাঙ্গেরী পর্যন্ত এবং পূর্বে ফিলিপাইন ও ঈসটার দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। খ্রী. ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনীয়গণ ফিলিপিনো দ্বীপপুঞ্জে কতকগুলি লিপি দেখিতে পায়। এই সকল লিপি প্রায় আটশত বৎসর পূর্বে বাংলা দেশ হইতে আসিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে একটা সম্পর্কও ছিল।[৩৭] সেখানে আজ পর্যন্ত দুইটি জাতির[৩৮] লিপির মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃত লিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

মোহেঞ্জোদড়োতে যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই লিপি পশ্চিমে মেসোপোটেমিয়া, টুরকিস্, তেল-অমর, প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গিয়াছে[৩৯] এবং পূর্বে ঈস্টার দ্বীপের লিপির সহিত এই লিপির আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে।[৪০] অধুনা কেহ কেহ মনে করেন, মোহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত

লিপিই ব্রাহ্মীলিপির পূর্ব রূপ, কিন্তু সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কোন সিদ্ধান্তই হয় নাই। প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি হইতে আধুনিক প্রাদেশিক লিপি-সমূহের রূপান্তর হইতে যে কত শতাব্দী লাগিয়াছে তাহা পরবর্তী যুগের বিভিন্ন শতাব্দীর লিপি তুলনা করিলে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে।

ভারতীয় বর্ণমালা আবিষ্কারের প্রথমে সম্ভবত তাহার সংখ্যাধিক্য ছিল, পরে যখন তাহা উচ্চারণভেদে বিভিন্নভাগে বিভক্ত হইল, তাহার কিছু পূর্বে নির্দিষ্ট সংখ্যায় পর্যবসিত হইয়াছিল। তবে প্রাতিশাখ্য রচনা হওয়ার সময় অক্ষরের যে শ্রেণীবিভাগ হইয়া গিয়াছিল তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে।

তন্ত্রে 'অক্ষর' শব্দ 'লিপি' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। লেখনী দ্বারা লিখিত লিপি ব্যতীত তাহাতে আরও চারি প্রকার লিপির উল্লেখ আছে, যথা—মুদ্রালিপি (অর্থাৎ seal) এবং মুদ্রায় উৎকীর্ণ বা লিখিত লিপি ও শিল্পলিপি বা চিত্রাদিতে তুলিকা দ্বারা লিখিত এবং প্রস্তর বা কাষ্ঠশিল্পে লিখিত লিপি, গুণ্ডিকালিপি বা আলিপনা বা তণ্ডুলচূর্ণ প্রভৃতি দ্বারা লিখিত লিপি এবং ঘুণাক্ষর অর্থাৎ কাষ্ঠাদিতে ঘুণ ধরিলে স্বতঃই যদি কোন লিপি সৃষ্টি হয় সেই লিপি।

পাদটীকা

১ Orient und Occident, iii, p. 170.

২ Ancient Sanskrit Literature, 2nd ed, p. 521.

৩ Studies, p. 85.

৪ Uber den Altesten zeitreum - der Indischen Geschichte, p. 37.

৫ Cll, p. 52.

৬ Mohenjodaro and the Indus Civilization, ii, 1931, ch.—xxiii. 423, pp. 426-27.

৭ বশিষ্ঠ-স্মৃতি ১৬.১০—'লেখ্যপ্রত্যয়'।

৮ সুনিশ্চিতবলাধানস্বর্থীস্বার্থপ্রচোদিতঃ।
লেখয়েৎ পূর্বপক্ষং তু কৃতকার্যবিনিশ্চয়ঃ॥—নারদ. ২.১

৯ পূর্বপক্ষশ্রুতার্থস্তু প্রত্যর্থী বদনন্তরম্।
পূর্বপক্ষার্থসম্বন্ধং প্রতিপক্ষং নিবেশয়েৎ॥
শ্বো লেখনং বা স লভেৎ ত্র্যহং সপ্তাহমেব বা।
অর্থী তৃতীয়পাদে তু যুক্তং সম্ভো ধ্রুবং জয়ী॥—নারদ. ২.২-৩

১০ না করিষ্যদ্ যদি স্রষ্টা লিখিতং চক্ষুরুত্তমম্।
তত্রেয়মস্য লোকস্য না ভবিষ্যচ্ছুভা গতিঃ॥—নারদ. ১.৭০

১১ ষান্মাসিকেঽপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টাণি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা॥

১২ বলাদ্দত্তং বলাদ্ভুক্তং বলাদ্যচ্চাপি লেখিতম্। সর্বান্ বলকৃতার্থান্ অকৃতান্ মনুরব্রবীৎ॥ (৮.১৬৮)। ঋণদাতুমশক্তো যঃ কর্তুমিচ্ছেৎ পুনঃ ক্রিয়াং। স দত্বা নির্জিতাং বৃদ্ধিং করণং পরিবর্তয়েৎ॥—মনু. ৮. ১৫৪। যাজ্ঞবল্ক্যের লেখ্য-প্রকরণ ২২. ৬৬, ৮৮-৯৬ এবং ৩. ১৯১ দ্র.।

১৩ বানরোঽহং মহাভাগে দূতো রামস্য ধীমতঃ। রামনামাঙ্কিতঞ্চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুরীয়কম্॥—রা. সুন্দর. ৩৬. ২

১৪ মহাভারতে বেদ যে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইত তাহার প্রমাণ আছে—

যদেতদুক্তং ভবতা বেদশাস্ত্রনিদর্শনং। এবমেতদ্ যথা চৈতন্নিগৃহ্ণাতি তথা ভবান্॥ ধার্যতে হি ত্বয়া গ্রন্থ উভয়োর্বেদশাস্ত্রয়োঃ। ন চ গ্রন্থস্য তত্ত্বজ্ঞো যথা চ ত্বং নরেশ্বর॥ যো হি বেদে শাস্ত্রে গ্রন্থধারণতৎপরঃ। ভারং স বহতে তস্য গ্রন্থস্যার্থং ন বেত্তি যঃ। বস্তুগ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞো৽ নাস্য গ্রন্থাগমো বৃথা॥ গ্রন্থস্যার্থস্য পৃষ্টঃ সন্ তাদৃশো বক্তুমর্হতি। যথা তত্ত্বাভিগমনাদর্থং তস্য স বিন্দতি। ন যঃ সংসৎসু কথয়েদ্ গ্রন্থার্থং স্থূলবুদ্ধিমান্। স কথং মন্দবিজ্ঞানো গ্রন্থং রক্ষতি নির্ণয়াৎ॥—শান্তি. মহা. ৩০৭. ১১-১৬

মহাভারতে বহু স্থলে লিপিব্যঞ্জক গ্রন্থ শব্দের উল্লেখ আছে; যথা—

গ্রন্থগ্রন্থিং তদাচক্রে মুনিগূঢ়ং কুতূহলাৎ।

যস্মিন্ প্রতিজ্ঞয়া প্রাহ মুনি দ্বৈপায়নস্ত্বিদম্।—মহা. আদি. ১. ৮০

১৫ সাক্ষাৎ কৃতধর্মাণ ঋষয়ো বভূবুস্তেঽবরেভোঽসাক্ষাৎকৃতধর্মস্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রদুঃ। উপদেশায় গ্লায়ন্তোঽবরে বিল্ম গ্রহণায়েমং গ্রন্থং সমাম্নাসিষু বেদঞ্চ বেদাঙ্গানি।—১. ২০

১৬ গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ। অনর্থজ্ঞোঽল্পকণ্ঠশ্চ যড়েতে পাঠকাধমাঃ॥—শিক্ষাশ্লোকঃ ৩২

১৭ ছন্দস্যপি দৃশ্যতে—৬ ৪. ৭৩; ৭. ১. ৭৬।

১৮ ৪. ৩. ৮৭; ৪. ৩. ১১৬; ৬. ৩. ৭৯; ১. ৩. ৭৫

১৯ 'শিশুক্রন্দযমসভদ্বন্দ্বেন্দ্র-জননাদিভ্যশ্চ'। 'শিশুক্রন্দীয়' শব্দের অর্থ 'কাশিকাবৃত্তি'তে এইরূপ আছে—'শিশূনাং ক্রন্দনং শিশুক্রন্দনং তমধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ শিশুক্রন্দীয়ঃ'।

২০ দিবা-বিভা-নিশা-প্রভাস্করান্তনন্তানন্তাদিবহুনান্দী কিং লিপিলিবিবলি-ভক্তিকর্তৃচিত্রক্ষেত্রসংখ্যা জঙ্ঘা বাহ্বহর্যত্তদ্ধনুবরুষষু।

২১ 'রূপাদাহত প্রশংসয়োর্যপ্'।—৫. ২. ১২০। যথা—আহতং রূপমস্য =রূপ্যোদীনারঃ। 'শতসহস্রান্তাচ্চ নিষ্কাৎ'—৫. ২. ১১৯।

২২ 'কণ্ঠকানীক সরক মোদক চষক মস্তক তড়াকানিষ্ক···পুস্তকম্' (পুংলিঙ্গ-সূত্র, ২৯)।

২৩ 'লিখ অক্ষর বিন্যাসে'

২৪ ভিক্ষুপাচিত্তিয়, ২. ২; ভিক্ষুণীপাচিত্তিয়, ৪৯. ২। বিনয়পিটক খ্রী-পূ. ৬-৫ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। ইহা বৈশালীর বৌদ্ধমহাসভার (খ্রী-পূ. ৩৮০) পূর্বে রচিত বলিয়া Oldenburg, Maxmuller প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ মনে করিতেন।

২৫ বন্ধনীর মধ্যস্থিত সংখ্যাগুলি Fausboll-এর জাতকসংখ্যা।

২৬ 'সর্বে স্বরা ইন্দ্রস্য আত্মানঃ। সর্বে উষ্মাণঃ প্রজাপতেরাত্মানঃ। সর্বে স্পর্শা মৃত্যোরাত্মানস্তং যদি স্বরেষুপালভেতেন্দ্রং শরণং প্রপন্নোঽভূবং···' —২. ২২. ৩।

২৭ প্রশ্ন-উপ.—৫. ৫। মৈ.—৬. ২, ৪; ৫. ২৩; ৭. ১১। অমৃতনাদ.

—২৪। তৈ-উপ.—১. ২. ১। শ্বেত.—৪. ১। গর্ভ.—৫। রা.—৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৮, ৭২, ৮১। ব্রহ্ম.—১৪, ১৩, ৫। গী.—১০. ২৫, ৩৩ ; ৩. ১৫। গোপী.—৩। ছান্দোগ্য.—১. ১. ১ ; ৫. ৬, ৭, ৯, ১০ ; ১. ৩, ৬, ৭ ; ১. ৪. ১, ৪, ৫ ; ২. ১০. ৩, ৪ ; ২. ২৩. ৩ ; ৮. ৩. ৫। বৃহ.—৫. ২. ১, ২, ৩ ; ৫. ৩. ১ ; ৫. ৫. ১, ৩, ৪ ; ৫. ১৪. ১, ২, ৩। কঠ.—২. ১৬ ; মাণ্ডুক্য.—১। নৃপসিংহতাপনী.—২. ২ ; ৪. ২ ; ৫. ২। অমৃতবিন্দু.—২. ৬২।

২৮ শ-ব্রা.—১০. ৪. ২. ২৫।

২৯ 'তদাহুর্ষদেকাদশকপালঃ পুরোডাশো দ্বাবগ্নাবিষ্ণুকা এনয়োঃ স্তত্রকৢপ্তিঃ কা বিভক্তিঃ'। (১ম পঞ্চিকা, ২য় খণ্ড)। প্রত্যুত্তর-মন্ত্র—অষ্টকপাল—আগ্নেয়োহষ্টাক্ষরা বৈ গায়ত্রী গায়ত্রমগ্নেশ্ছন্দাঃ ত্রিরীদং বিষ্ণুর্বিচক্রমত সা এনয়োস্তত্রকৢপ্তিঃ সা বিভক্তিঃ'।

৩০ 'তেভ্যোহভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ো বর্ণা অজায়ন্ত অকারঃমকারঃ ইতি কানেকধা সমভয়ৎ তদেতৎ ওমিতি'। অন্যত্র—'ইতোতৈরেব এনং তৎ কার্যৈঃ সমর্শয়তীতি নু প্রথমং পটলম্' (১ম পঞ্চিকা, ২১ খণ্ড)। 'স্তোরিত্যে তৈরেবৈনং তৎকামৈঃ সম্বর্দ্ধয়তীতি নু পূর্বং পটলম্ (১. ৪. ৪.)। এখানে পটল = গ্রন্থ।

৩১ (ক) ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য—১। ককার ইত্যাদি, ৪. ৬ ; ২। ই, উ, এ ইত্যাদি, অনুক্রমণিকা ; ৩। ক-খৌ ইত্যাদি, অনুক্রমণিকা—দ ; ৪। রেফ, ১. ১০ ; ৫। শকারচতারবর্গয়োঃ, ৪. ৪ (খ) তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য—১। অকার, ১. ২১ ; ইকার, ২. ২৮ ; ঽকার, ১. ১৩ ; অবর্ণ, ৭. ৫ ; ইবর্ণ, ইত্যাদি, ১০, ৪ ; ২। প, ৪. ৩০ ; ন, ৪. ৩২ ; ক্ষ, ৯. ৩ ; ৩। ত, ট, ৭. ১৩ ; খ, ৭. ১৪ ; র, ১ ১৯ ; ৪। রেফ, ১. ১৯ ; ৫। ক-বর্গ, ২. ৩৫ ; চ-বর্গ, ২. ৩৬ ; ট-বর্গ, ১৪. ২০। (গ) কাত্যায়নীয়-প্রাতিশাখ্য—১। ঐকার, ঔকার, ১. ৭৩, ঌকার, ১. ৮৭ ; ইবর্ণ, ১. ১১৬। ২। উবোষ্মাণঃ—১. ৭০ ; অ, ১. ৭১ ; ৩। র, ১. ৪০ ; নুঃ, ১৩. ১৩২ ; ৪। তবর্গ, ৩. ৯২। (ঘ) অথর্বপ্রাতিশাখ্য—১। অকার, ১. ৬ ; ঌকার, ১. ৪ ; লকার, ১. ৫ ; ষকার, ১. ২৩ ;

২। ঋবর্ণ, ১. ৩৭; ৩। য, র, ১. ৬৮; শষসেষু, ২. ৬; ৪। রেফ, ২. ২৮; ৫। চবর্গ, ১. ৭; উবর্গ, ২. ১২; চ, ট বর্গ, ২. ১৪; ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩২ (১) 'লোপঃ উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ সকারস্য (বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্য ৪. ৯৫; তৈত্তিরীয়-প্রা. ৫. ১৪)। (২) 'অন্তস্থোষ্মসু লোপঃ' (অথর্বপ্রা. ৩. ৩২ = ঋক্-প্রা. ৪. ৫; বাজসনেয়-প্রা. ৪. ১; তৈত্তিরীয়-প্রা. ১৩, ২)। (৩) (ঋক্-প্রা. ১৫; বাজসনেয়-প্রা. ১. ১০৪ এবং অথর্ব-প্রা. ১. ৫৮)।

৩৩ অশ্বমেধপ্রকরণে,—প্রশ্নমন্ত্র—'কত্যস্য বিষ্টাঃ কত্যক্ষরাণি'। অর্থাৎ উহার অন্নই (বিষ্ট) বা কত, অক্ষরই বা কত?

প্রত্যুত্তরমন্ত্র—'ষড়স্য বিষ্টাঃ শতমক্ষরাণি'—ছয়টি উহার অন্ন এবং শত সংখ্যক উহার অক্ষর।

অতঃপর বিরাটরূপ ভাবনার বিবরণে 'এবশ্ছন্দো ভূলোকোবরিবশ্ছন্দোঽন্তরীক্ষ লোকঃ······ক্ষুরভ্রজশ্ছন্দঃ'। ক্ষুরভ্রজশ্ছন্দঃ—অর্থাৎ ক্ষুর বা লৌহ শলাকা দ্বারা লিখিত ছন্দ।

৩৪ ইমা মেঽগ্নঽইষ্টকাধেনবঃ সন্ত্বেকা চ দশচ শতঞ্চ সহস্রঞ্চ সহস্রং চাযুতঞ্চাযুতং নিযুতং প্রযুতং চার্বুদঞ্চার্বুদং চ ন্যর্বুদংশ্চ সমুদ্রশ্চ মধ্যশ্চ অন্তশ্চ পরার্ধশ্চৈতা অক্ষিত মেঽগ্নঽইষ্টকাধেনবঃ'—১৭. ১৭. ২।

৩৫ Sir H. Cunningham's Audambara and Kunìnda Coins, Buhler, 50; also Persian Sigloi with Countermarks in Brahmi and Kharosthi Letters, JRAS. 1895, pp. 866ff.

৩৬ 'অথ বোধিসত্ত্ব উরগসারচন্দনময়ং লিপিফলকমাদায় দিব্যার্ষসুবর্ণতিরকং সমন্তান্মণিরত্নপ্রত্যুপ্তং বিশ্বামিত্রমাচার্যমেবমাহ। কতমাং মে ভো উপাধ্যায় লিপিং শিক্ষাপয়সি। ব্রাহ্মীখরোষ্ঠীপুষ্করসারিং। অঙ্গলিপিং বঙ্গলিপিং মগধলিপিং মঙ্গল্যলিপিং অঙ্গুলীয়লিপিং সকারিলিপিং ব্রহ্মবলিলিপিং পারুষ্যলিপিং দ্রাবিড়লিপিং কিরাতলিপিং দাক্ষিণ্যলিপিং উগ্রলিপিং সংখ্যালিপিং অনুলোমলিপিং অবমূর্ধলিপিং দরদলিপিং খাষ্য-

লিপিং চীনলিপিং লূনলিপিং হুনলিপিং মধ্যাক্ষরবিস্তরলিপিং পুষ্প-লিপিং দেবলিপিং নাগলিপিং যক্ষলিপিং গন্ধর্বলিপিং কিন্নরলিপিং মহোরগলিপিং অসুরলিপিং গরুড়লিপিং মৃগচক্রলিপিং বায়সরুত-লিপিং ভৌমদেবলিপিং অন্তরীক্ষদেবলিপিং উত্তরকুরুদ্বীপলিপিং অপর-গোড়ানীলিপিং পূর্ববিদেহলিপিং উৎক্ষেপলিপিং নিক্ষেপলিপিং বিক্ষেপ-লিপিং প্রক্ষেপলিপিং সাগরলিপিং বজ্রলিপিং লেখপ্রতিলেখলিপিং অনু-দ্রুতলিপিং শাস্ত্রাবর্তাং গণনাবর্তালিপিং উৎক্ষেপাবর্তলিপিং (নিক্ষেপা-বর্তলিপিং) পাদলিখিতলিপিং দ্বিরুত্তরপদসন্ধিলিপিং যাবদ্দশোত্তর-পদসন্ধিলিপিং মধ্যাহারিণীলিপিং সর্বরুতসংগ্রহণীলিপিং বিদ্যানুলোমা-বিমিশ্রিতলিপিং ঋষিতপস্তপাং রোচমানাং ধরণীপ্রেক্ষিণীলিপিং গগন-প্রেক্ষিণীলিপিং সর্বৌষধিনিষ্যন্দাং সর্বসারসংগ্রহণীং সর্বভূতরুতগ্রহণী আসা ভো উপাধ্যায় চতুঃষষ্টি লিপিনাং কতমাং ত্বং শিষ্যীং পয়িষ্যসি ॥'

—ললিতবিস্তর, Lefmann. i. pp. 125-6

৩৭ Kroeber : Anthropology, p. 289,

৩৮ ঐ p. 290.

৩৯ Scale of Ancient Indian style found at Ur-Gadd. Pros. Bom. Arch., xviii, 1233, 22 pages and 3 plates.

৪০ Dr. G. de Hevesy : Sur une ecriture oceanienne. Published in the Bulletin de la Societe Prehistorique Francaise (1933), Nos. 7-8—both the above refer-ences quoted from Dr. Fabri's article 'Latest attempts to read the Indus Script'—Indian Culture, i. 1934, pp.51-6

গ্রন্থপঞ্জী :

[Johann Georg Buhler : Indian Paleography, 1904 ; A. C. Burnell : South Indian Paleography, 1878 ; গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা : প্রাচীন লিপিমালা, ১৯১৮ ; অন্যান্য নির্দেশ পাটটীকায় দ্র.]

[বঙ্গীয় মহাকোষ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১৯—২২৪]

প্রসঙ্গ-কথা

1 William Jones, Kopp, Lepsius, Weber, Benfey, Max Muller, Whitney, Pott, Westergaard, Buhler, Sayce, Lenormant : 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

2 Decke, Burnell, Prinsep, Otfried Muller, Senart, Halevy : 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

3 Dr. Wilson : 'অথর্ববেদ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

4 Lassen, Dowson, Jesenius, Cunningham, Goldstucker : 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

5 ড. প্রাণনাথ : মোহেঞ্জোদড়োর বহু শীলমোহরের পাঠোদ্ধার করেন। তিনি দেখান এই সমস্ত পাঠোদ্ধৃত শব্দের সঙ্গে ভারতীয় বহু দেবদেবীর নামের মিল আছে।—*Ind. Hist. Quaterly*, ii. No. 4 (1931) and XIII. 2, (1932)

6 স্বামী জ্ঞানানন্দ—পরিশিষ্ট দ্র.

7 জয়সয়াল, কাশীপ্রসাদ (১৮৮১-১৯৩৭) : অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন ; পরে ব্যারিস্টার হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান ; পরে পাটনা হাইকোর্টে যোগদান। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস ও শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ ও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অনারারী ডি ফিল, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থ—Imperial History of India in a Sanskrit Text (Lahore), History of India 150-350 A. D (Lahore, 1933) ই.।—ভা-কো.

৪ আগাথোক্লেস : ইণ্ডো-গ্রীক রাজা। ইনি খুব সম্ভব দিমিত্রিয়সের পুত্র। রাজ্য কোথায় ছিল নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। তবে কাবুল উপত্যকা, পশ্চিম পঞ্জাব ও কান্দাহারে নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। আনুমানিক রাজত্বকাল খ্রী-পূ. ১৭০।—*DCI*, p. 14

মহাভারত

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়[1] মহাশয় কাশীরাম দাসের মহাভারতের সচিত্র প্রথম সংস্করণ পাঁচ বৎসর পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজ পাঁচ বৎসরের মাথায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলেন। আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। যে-যুগে রাজনীতি, উদ্ভট সমাজনীতি এবং বর্তমান রীতি ও কালোপযোগী আখ্যান-উপাখ্যানের জয়-জয়কার, সে-যুগে কাশীদাস-কৃত্তিবাস মেড়ো পড়িয়া যাইবার কথা। তাহা না হইয়া আজও কাশীদাস বিকাইতেছে—আজও বঙ্গজনের চিত্ত-বিনোদন করিতেছে। ত্রিশ বৎসর পূর্বে বাংলাদেশে ছেলে-বুড়ো সকলেই কাশীদাসী মহাভারত আর কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িত। আমরাও ছেলেবেলায় এ দু-খানি আদ্যন্ত পড়িয়াছি—এ-দুখানির কথা শুনিয়াছি ও শুনাইয়াছি। বাংলাদেশে জন্মিয়া কাশীদাস, কৃত্তিবাস যে না পড়িল তার জন্ম বৃথাই গেল, ইহাই লোকে ভাবিত। এখন দেশের আবহাওয়া পুরাপুরি রকমে বদলাইয়াছে, তথাপি কাশীরাম-কৃত্তিবাস বাঙালীর শুষ্কপ্রাণে অমৃতবারি সেক করিয়া তাহাকে চিরকাল সরস করিয়া রাখিবে।

একদিকে বেদ, উপনিষদ্, ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্র এবং অপরদিকে দর্শন, ইতিহাস ও পুরাণ—এই সমস্তগুলির সার-সংগ্রহ হইল মহাভারত। তাই বেদব্যাস বলিয়াছেন,—'যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।'—'যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে।' ইহা যুগপৎ অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র—'অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্মশাস্ত্রমিদং মহৎ। কামশাস্ত্রমিদং

প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা ॥'—মহা. ১. ২. ৩৬৯। মহাভারত একখানি অপূর্ব বিশ্বকোষ—ইহার তুলনা হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ মধ্যযুগে—আর সেই মধ্যযুগের মধ্যমণি এই মহাকাব্য।

ইহার এক নাম কার্ষ্ণ (মহা. ১. ১. ২৬৫; ১. ৬২. ১৮) বা পঞ্চম বেদ। আর ইহা যেমন তেমন বেদ নয়; যিনি এই বেদ পড়িয়াছেন তাঁহাকে অন্য বেদ পড়িতে হয় না—

'বিজ্ঞেয়ঃ স চ বেদানাং পারগো ভারতং পঠন্।'—মহা. ১ ৬২. ৩১.

এই মহাভারতের মধ্যেই মহাভারতের স্বরূপ কীর্তিত হইয়াছে। ইহা একদিকে 'শ্রেষ্ঠ ইতিহাস' (আদি, ১. ২৬৩), 'ইতিহাস-মহাপুণ্য' (আদি, ৬২. ১৬), অপরদিকে আবার 'উত্তমং পুরাণম' (আদি, ৬২. ১৬)। দেখা যাইতেছে ইতিহাসের লক্ষণও ইহাতে আছে, পুরাণের লক্ষণও আছে। ইতিহাস ও পুরাণ বলিলে আমরা আজকাল যাহা বুঝি, খুব প্রাচীনকালে ঠিক তাহাই বুঝাইত না। পূর্বকল্পে ঘটিয়াছিল, এইরূপ আখ্যায়িকা বুঝাইতে অথর্ববেদে 'ইতিহাস' শব্দের প্রয়োগ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য-উপনিষদে ইতিহাসের কয়েকবার উল্লেখ আছে। সুদূর অতীতে কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে, সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলা হইত—"ইতি হ আস" অর্থাৎ ইতি=ইহা, হ—নিশ্চয়, আস—হইয়াছিল। ঘটনা সত্য না হইলে কখনই তাহাকে ইতিহাস বলা হইত না। দেড় হাজার বৎসর পূর্বে এই অর্থেরই ইঙ্গিত আমরা বুদ্ধঘোষ[২] প্রণীত 'সুমঙ্গল-বিলাসিনী'র 'অম্বট্ঠ-সুত্ত-বণ্ণনা'য় এরূপ পাই—'ইতিহাস-পঞ্চমং—অথব্বণবেদং। চতুত্থং কত্বা ইতি হ আস ইতি হ আসাতি ঈদিস-বচন পতিসংযুত্তো পুরাণকথাসংখাতো ইতিহাসো পঞ্চমো এতে সন্তি ইতিহাস-পঞ্চমা। তেসং ইতিহাসপঞ্চমানং বেদানং।' কোন প্রাচীন কথার শেষে 'ইতি হ আস' এই কথাটি বলা হইত। ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়, তাহাতে প্রধানত চারিটি প্রণালীতে ঘটনা বিবৃত হইত,—প্রথম ইতিহাস, দ্বিতীয় পুরাণ; তারপর আর দুইটি হইতেছে 'শ্লোকাঃ' ও 'নারাশংসী'। কোন ঘটনা সমাবেশে বড় লোকের কথা বলিয়া বহুবচনান্ত 'শ্লোকাঃ' এইরূপ বলা হইত। অন্য কোন এক প্রকারের আখ্যায়িকার

নাম ছিল 'পুরাণ'। 'ইতিহাস-পুরাণ' একসঙ্গেও কোথাও কোথাও আছে।

একসঙ্গে ইতিহাস-পুরাণের সকলের চেয়ে পুরাতন উল্লেখ আমরা পাই অথর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডের শেষ দিকে (১৫. ৬. ৪)। কোন কোন জায়গায় 'পুরাতন ইতিহাসের'ও উল্লেখ আছে, তবে তাহা বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী গ্রন্থেই পাওয়া যায়। মহাভারতে ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসের উদ্ধৃত হইবার সময় প্রায়ই 'অত্রাপ্যুদাহরন্তীমম্ ইতিহাসং পুরাতনম'। এইরূপ বচন দেখিতে পাওয়া যায়। অনুগীতায় নারদ ও দেবমতের 'পুরাতন ইতিহাস' বিবৃত আছে। দেবমতের নাম বৈদিক সাহিত্যে কোথাও নাই। অনুগীতার সময় বৈদিক সাহিত্য পুরানো হইয়া যাওয়ায় সম্ভবত 'পুরাতন ইতিহাস" নাম হইয়া থাকিবে।

এখনকার এই মহাভারতের কলেবর প্রকাণ্ড। বরাবর মহাভারত কিন্তু এত বড় ছিল না। আর এই মহাভারত একেবারে বর্তমান আকারও প্রাপ্ত হয় নাই। ইহাকে এই আকারে গড়িয়া উঠিতে হইয়াছিল। তাহাতে ইহার অনেক সময়ও লাগিয়াছিল। মহাভারতের আদি পর্বে একটি শ্লোকে পাই—

"আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সংপ্রত্যাচক্ষতে পরে।

আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি॥"—১, ২৬

পূর্বে এই ইতিহাস অনেক কবিই বলিয়াছেন, এখনও অনেকে বলিতেছেন এবং পরেও অনেকে বলিবেন। এটি মহাভারতের শ্লোক ; সকল পুঁথিতে আছে, সকল ছাপা বই-এ আছে। প্রক্ষিপ্তও বলা চলে না। সুতরাং ব্যাসদেবের সঙ্গে আমাদেরও স্বীকার করিতেই হইতেছে যে, মহাভারতের কথা শুধু ব্যাসদেবই লিখিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার পূর্বেও আরও অনেকে মহাভারতের কোন কোন প্রাচীন কথা লিখিয়া গিয়াছেন। খুব আগে একটা রীতি ছিল যাগযজ্ঞে বড় বড় সুদীর্ঘ আখ্যান আবৃত্তি করা। অশ্বমেধের সময় সারা বছর ধরিয়া এই সমস্ত আখ্যানের আবৃত্তি চলিত। অনেক আখ্যান একসঙ্গে করিয়া মিশাইয়া 'আখ্যান-চক্র'ও হইত। আর ঠিক এই রকমই-মহাভারতে ঘটিয়াছে। এক-একটি প্রাচীন বংশ-বিবরণ বা

এক-একটি প্রাচীন লোকের বংশ-বিবরণ বা তাহার গুণকীর্তির গাথা আবৃত্তি করা হইত—তার নাম 'নারাশংসী'। নারাশংসী বৈদিক যুগের আখ্যায়িকা—এটা অনেকটা 'history'র মত। রাজপুতানা ও গুর্জরের চারণদের গানে ইহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।

এক-একটি স্বতন্ত্র আখ্যানও আবৃত্তি করা হইত। যেমন যযাতি-উপাখ্যান। যে যযাতির আখ্যান জানিত তাহাকে তখন 'যযাতিক' বলা হইত। পতঞ্জলি এই 'যযাতিক' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন (মহাভাষ্য, ৪. ২. ৬০)। উপনিষদ্ যুগের মাঝামাঝি আখ্যান-চক্রও ছিল। 'সুপর্ণাখ্যান' এই রকম একটি আখ্যান-চক্র।

ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে কুরুক্ষেত্রের নাম বহুবার আছে। পরীক্ষিৎ, জন্মেজয়াদির কথাও আছে, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের নামগন্ধ কোথাও নাই। অথর্ববেদে পরীক্ষিতের উল্লেখ আছে। শাঙ্খায়ন-শ্রৌত-সূত্রে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কথা প্রথম শুনিতে পাওয়া যায়। সে যুদ্ধে কৌরবদের সর্বনাশ হয়। এই রকম করিয়া বোধ হয় মহাভারতের কথা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এইরূপ একটা পুরানো আখ্যান স্থান পাইয়াছে। সেটি হইতেছে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ। ১৪৮ হইতে ২১৬ শ্লোক। সম্ভবত এটি একটি ballad -পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। মহাভারতের বর্ণিতব্য বিষয়ের মূল কোথায় তাহার নজির বলিয়া এই ballad-টি অনুক্রমণিকার পৌর্বাপর্যের ব্যত্যয় করিয়া সহসা মাঝখানে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতে কি থাকিবে, কি না থাকিবে বলিতে বলিতে হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্র বিলাপের কথা আসিল কেন? আমার মনে হয় মহাভারতকারের বক্তব্যের প্রমাণ ('authority' -স্বরূপ এই ৬৮টি শ্লোক বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক শ্লোকই মহাভারতের বর্ণনীয় বিষয়ের এক-একটি সূচী। এই শ্লোকগুলিতে যে বিষয় নাই তাহা মহাভারতে বলা হইবে না।

কেমন করিয়া ব্যাসের এই গ্রন্থখানি ফাঁপিয়া ফুলিয়া বিপুলকায় হইল সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাক। মহাভারতকার বলিয়াছেন, প্রথমে ইহাতে ৮,৮০০ শ্লোক ছিল—'অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি

অষ্টৌ শ্লোকশতানি চ' (১. ৮১)। তারপর ২৪,০০০ শ্লোকের ভারত-সংহিতা—'চতুর্বিংশতি-সাহস্রীং চক্রে ভারত-সংহিতাম্। উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ' (১. ১০১)। ইহাতে উপাখ্যান ছিল না। শেষে গ্রন্থ আখ্যান-উপাখ্যান-যুক্ত হইয়া লক্ষ শ্লোকে পরিণত হইল—'একং শতসহস্রন্তু মানুষেষু প্রতিষ্ঠিতম্ (১.১০৫)।'

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ব্যাসের এই গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ হইয়াছিল।

প্রত্যেক সংস্কৃত মহাভারতের আরম্ভে এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়—

'নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ।'

টীকাকারদের মতে এটি মঙ্গলাচরণের শ্লোক। নীলকণ্ঠ ইহার আর একটু পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন, এটি 'মন্ত্র' শ্লোক। 'ততো জয়মুদীরয়েৎ' এই চরণের 'জয়' শব্দের বাংলা তর্জমায় মানে গোল হইয়া গিয়াছে। বর্ধমানরাজের অনুবাদ, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ, বিদ্যাসাগরের অনুবাদ, কালীবর বেদান্তবাগীশের অনুবাদ, প্রতাপ রায়ের অনুবাদ, সকল অনুবাদেই 'নারায়ণ ও নরোত্তম, নর এবং দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।' এই রকমই মানে ধরা হইয়াছে। নীলকণ্ঠ ও অর্জুন মিশ্র 'জ' শব্দে 'ইতিহাস' অর্থাৎ ধর্মার্থকামমোক্ষোপদেশক গ্রন্থ বুঝিয়াছেন। এ অর্থও এখানে ঠিক খাটে না। মহাভারতের কবি স্বয়ং এই 'জয়' শব্দের অর্থ বলিয়া দিয়াছেন। আদি পর্বের ৬২ অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে 'জয়' শব্দের অর্থ এইরূপ পাওয়া যায়—

'জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা।'

সুতরাং দেখা যাইতেছে 'জয়' মহাভারতের প্রাচীন নাম। প্রথমে ইহার নাম 'জয়' ছিল। 'জয়' বলিলে ভারত-যুদ্ধে পাণ্ডবদেরই জয় বুঝায়। যে গ্রন্থে পাণ্ডবদের জয়-গান ছিল তাহাই 'জয়' নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। ইহা রাজবংশ-প্রশংসা বা 'শ্লোক' রূপে আবৃত্তি করা হইত। পাণ্ডবদের জয়গান ইহাতে ছিল। ইহারই শ্লোকসংখ্যা ৮,৮০০ ছিল এরূপ মনে করা

যাইতে পারে। কাজেই দেখা যাইতেছে 'নারায়ণং নমস্কৃত্য' ইত্যাদি শ্লোক মহাভারতের মঙ্গলাচরণ শ্লোকরূপে রচিত হয় নাই। এই গ্রন্থ পাঠ করিবার পূর্বে পাঠককে কি পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, এই শ্লোকে তাহারই উপদেশ আছে। ৮,৮০০ শ্লোকের গ্রন্থকে কেহ কেহ 'নিতান্ত ভুয়া' বলিয়াছেন। কিন্তু জয়-গ্রন্থের সন্ধান জানিলে একথা বলিতেন না। তবে 'ব্যাসকূট' বা 'গণেশমহাভারতে'র কথা একেবারে ভুয়ো। অধিকাংশ পুস্তক বা পুথিতেই পাওয়া যায় না। পুনার সংস্করণেও ইহা বাদ গিয়াছে।

এইবার ২৪,০০০ শ্লোকের গ্রন্থের কথা। ব্যাকরণ অনুসারে বলা চলে, রামের কথা আছে বলিয়া যেমন রামায়ণ নাম, ভগবানের কথা আছে বলিয়া যেমন 'ভাগবত' নাম, তেমনই ভরত-বংশীয় রাজাদের বলবিক্রমের বর্ণনা আছে বলিয়া গ্রন্থের নাম হইয়াছিল 'ভারত'। সূত্রসাহিত্যের শেষ গ্রন্থ আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে ঋষি-তর্পণে—

'সুমন্তু-জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈল-সূত্র-ভাষ্য-ভারত-মহাভারত-ধর্মাচার্যাঃ —৩. ৪. ৪

—ভারত ও মহাভারত বলিয়া দুইখানি পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে আছে ব্যাসদেব প্রথমে নিজ পুত্র শুককে, তারপর অন্য শিষ্যদের 'ভারত' পড়াইয়াছিলেন—

'ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্বং পুত্রমধ্যাপয়চ্ছুকম্।
ততোঽন্যেভ্যোঽনুরূপেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ বিভুঃ॥' ১.১০৩

এই ভারতই সম্ভবত ২৪,০০০ শ্লোকের গ্রন্থ।

ইহার পর আখ্যান, উপাখ্যান দিয়া বিস্তার করিয়া যে গ্রন্থ তৈরী হয় তাহাই 'মহাভারত'। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১০০,০০০।

সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শুক ও বৈশম্পায়ন ব্যাসের এই পাঁচজন শিষ্যও পাঁচখানি ভিন্ন ভিন্ন ভারত-সংহিতা, অর্থাৎ মহাভারত রচনা করেন। মহাভারতে ইহারও প্রমাণ আছে। ব্যাস এই পাঁচজনকে প্রথম বেদ পড়াইয়া মহাভারত-পঞ্চম পড়াইয়াছিলেন। তারপর তাঁহারা গ্রন্থ রচনা করেন—

'বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারত-পঞ্চমান্।
সুমন্তুং জৈমিনিং পৈলং শুকঞ্চৈব স্বমাত্মজম্॥ ৮৮
প্রভুর্বরিষ্ঠো বরদো বৈশম্পায়নমেব চ।
সংহিতাস্তৈঃ পৃথক্‌ত্বেন ভারতস্য প্রকাশিতাঃ॥' ৮৯

(আদি, ১. ৮৮-৮৯)

বর্তমান মহাভারতের আরম্ভ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে। আরম্ভ কিন্তু পদ্যে নয়, গদ্যে। গদ্য হইলেও তবু ইহাতে শ্লোকের সংখ্যা দেওয়া আছে '১'। '১' সংখ্যক উক্তি ও দ্বিতীয় শ্লোক একত্র করিলে পাওয়া যায়—সৌতি উগ্রশ্রবা লোমহর্ষণের পুত্র; পুরাণ-পাঠ ও পুরাণ-ব্যাখ্যা তাঁহার পেশা। তিনি নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশ বার্ষিক মহাযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া পুরাণ-সংশ্রিত ভারতেতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। ৩য় শ্লোক হইতে ১৩শ শ্লোক পর্যন্ত ঋষিদের প্রশ্নের উত্তরে সৌতি বলিলেন যে, তিনি পরীক্ষিৎ, জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে গিয়াছিলেন। সেখানে 'বৈশম্পায়নের মুখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রোক্ত মহাভারত-সংশ্রিত কথা' শুনিয়া তিনি বহু তীর্থ ও দেশ ঘুরিয়া সমন্তপঞ্চকে যান। এই স্থানে পুরাকালে কুরু-পাণ্ডবের ও অন্যান্য রাজাদের যুদ্ধ হইয়াছিল। সেখান হইতে একেবারে শৌনকের যজ্ঞ-সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। সৌতি যে বিবরণ দিলেন তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, সৌতি বৈশম্পায়নের মুখে জন্মেজয়ের সর্পসত্রসভায় যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা খাঁটি মহাভারত নহে—তাহা মহাভারত-সংশ্রিত কথা মাত্র। এটুকু আপাতত এক রকম যুক্তিযুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারি, কেন-না, মহাভারত হইল মন্ত্রশ্লোকাদি সোপক্রমণিক এই আলোচ্য গ্রন্থ। আর তাহা তাহার রচনার বহুপূর্বে সর্পসত্রে কথিত ও শ্রুত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আর একটা দিক্‌ও বিবেচনা করিয়া দেখিবার আছে। ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করিতে বসিয়া এই তেরটি শ্লোক লিখিয়াই বলিয়াছেন যে, তাঁহার কাব্যের বক্তা অন্য একস্থানে অন্য এক জনের মুখে 'মহাভারত-সংশ্রিত কথাই শুনিয়া আসিয়াছেন।'—ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়? মহাভারত রচিত হইবার পূর্বে মহাভারত-সংশ্রিত কথার আখ্যাপন ও শ্রবণ সিদ্ধ হয় কি করিয়া? আরও আশ্চর্যের বিষয়

এই যে, সেই মহাভারত-সংশ্রিত কথা কখনও আবার কৃষ্ণদ্বৈপায়নোক্ত। ইহাই বা কিরূপ ব্যাপার? কৃষ্ণদ্বৈপায়নই ত এই বর্তমান মহাভারত লিখিতে বসিয়া সৌতি-শৌনকসংবাদ উপক্রমণিকা রূপে বিবৃত করিতেছেন; তিনি আবার কবে কোথায় মহাভারত-সংশ্রিত কথার প্রচার করিয়াছিলেন? আর তাই বৈশম্পায়ন বলেন ও সৌতি শুনিয়া আসেন? বর্তমান মহাভারত-রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং সর্পসত্রে পঠিত মহাভারত-সংশ্রিত কথার মূলবক্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যদি একই ব্যক্তি হন, তাহা হইলে বলিতে হয় বর্তমান মহাভারতখানি ব্যাসদেবের স্বকৃত পূর্বমহাভারতের উপক্রমণিকায় বর্ধিত সংস্করণ। বেশ, কিন্তু নিজের পূর্বগ্রন্থের বিবরণ সৌতির মুখ দিয়া বলাইলেন কেন? এটি একটি প্রাচীন রীতি বলিয়াই মনে হয়। সংস্কৃত নাটকাদি গ্রন্থে এই নিয়ম অবলম্বন করা হইয়াছে। সেকালের কবিরা নটনটীর মুখ দিয়া নিজের নাম ও রচনার প্রশংসা নিজেই লিখিয়া যাইতেন। অতঃপর সৌতি ঋষিদের জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কি বর্ণনা করিবেন? ঋষিগণ বলিলেন, জন্মেজয়ের সভায় ব্যাস কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বৈশম্পায়ন যে ভারতেতিহাসের বিশিষ্ট উপাখ্যান বলিয়াছিলেন তাঁহারা তাহাই শুনিতে চান।

তখন তিনি রীতিমত মঙ্গলাচরণাদি করিয়া বলিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু নানা কথায় ভূমিকাটি একটু জাঁকাইয়া লইলেন। ২২—২৪ শ্লোকে ভগবানের নাম কীর্তন ও তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। ২৫ শ্লোকে ব্যাসদেব সৌতিকে নাটকের নটরূপ কার্য করাইয়া তাঁহার দ্বারা আত্মপ্রশংসা ও কাব্যপ্রশংসা করাইয়াছেন।

ইহার পর ৫০ শ্লোক পর্যন্ত সৌতির মুখে মহাভারত-প্রশংসা ও সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

৫১ শ্লোকে এক নূতন কথার অবতারণা হইয়াছে—

'বিস্তীর্যৈতন্মহজ্‌জ্ঞানমৃষিঃ সংক্ষিপ্য চাব্রবীৎ।
ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্‌॥'

এই মহা জ্ঞানাত্মক গ্রন্থকে বিদ্বান্‌ লোকে সংক্ষেপে ও বিস্তৃতভাবে ধারণ করিতে ইচ্ছা করায় ঋষি ইহা সংক্ষেপে ও বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন।

বর্তমান মহাভারতের ২২ এবং ৫১ শ্লোক হইতে জানা যায় যে, সৌতির পূর্বে সমসাময়িক কালে মহাভারত-পাঠ বিশেষ প্রচলিত ছিল। আর সেই মহাভারতের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত দুইটি রূপ ছিল। দুইটিই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রচিত। তারপর সেই মহাভারতের কোন একটা পাঠ বৈশম্পায়ন সর্পযজ্ঞসভায় পাঠ করেন; সৌতি আবার তাহা শুনিয়া আসিয়া শৌনকাদি ঋষির নিকট নৈমিষারণ্যে বৈশম্পায়ন-জন্মেজয়-সংবাদ সহ মহাভারত বিবৃত করেন। ইহার পর সৌতি-শৌনক-সংবাদ-সম্বলিত বর্তমান মহাভারত তৈরী হয়। এই রকম করিয়া মহাভারতের কয়টি স্তর গাড়য়া উঠে। সেই সকল স্তর-যুক্ত মহাভারত যখন খুব জাহির হইয়া পাড়ল, তখন ক্রমশ ব্যাসের খাঁটি মহাভারতের আরম্ভ কোন্ স্থান হইতে তাহা ক্রমশ লোকে ভুলিতে থাকে। তখন পণ্ডিতদের মধ্যে যিনি যেখান হইতে আরম্ভ করা ভাল মনে করিতেন তিনি তাহাই করিতেন। আর সেই জায়গা হইতেই ব্যাসোক্ত মহাভারতের আদি গণ্য করা হইত। কালে যে কয়স্থান হইতে ঐরূপ আদি ধরা হইত একটি শ্লোকে কোন উত্তর-কালবর্তী কবি তাহা লিপিবদ্ধ করেন এবং উহাতে লোকের বিশ্বাস আনাইবার জন্য ইহাকে সৌতিবচনের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। শ্লোকটি এই—

'মন্বাদি ভারতং কেচিদাস্তিকাদি তথা পরে।
তথোপরিচরাদন্যে বিপ্রাঃ সম্যগধীয়তে ॥'

—আদি, ১.৫২।

অর্থাৎ বিপ্রগণের কেহ কেহ মন্বশ্লোক হইতে, কেহ কেহ দিবের পুত্র মনু হইতে, কেহ কেহ আস্তিক পর্ব হইতে এবং কেহ কেহ উপরিচরের উপাখ্যান হইতে মহাভারতের আদি ধরিয়া থাকেন।

সংস্কৃত মহাভারত সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলিয়া আমরা বাংলা মহাভারত সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। চারিশত বৎসর পূর্বে বাংলা দেশে অনুবাদের একটা হিড়িক পড়িয়া গিয়াছিল। শ্রীকর নন্দী বাংলায় সর্বপ্রথম মহাভারত রচনা করেন। আদি হইতে আরম্ভ করিয়া অশ্বমেধ-পর্বে ইহার পরিসমাপ্তি। এখানি 'পরাগলী মহাভারত' নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ

ভুল করিয়া ইহাকে 'বিজয়পণ্ডিতের মহাভারত'ও বলিয়াছেন। শ্রীকর নন্দীর উপাধি 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' ছিল। অনেকে ভুল করিয়া শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে দুইজন কবি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা অমূলক। পরাগলী মহাভারতের সকল পর্বের পুষ্পিকায় (colophon) শ্রীকর নন্দী, কবীন্দ্র তথা কবীন্দ্র পরমেশ্বর ভণিতা পাওয়া যায়। সকল পুথিতেই এইরূপ ভণিতা আছে। গ্রন্থখানির সমস্ত পর্বগুলি যে একই কবির লেখা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সম্ভবত বঙ্গাধিপতি নসরৎ শাহর রাজত্ব-কালে (১৫২০-২৫ খ্রী.) এই মহাভারতখানি রচিত হয়। চট্টগ্রামের শাসন-কর্তা পরাগল খাঁর বিশেষ উৎসাহেই প্রথম হইতে সপ্তদশ পর্ব রচিত হয়। অশ্বমেধপর্ব আরম্ভ করিয়া পরীক্ষিতের জন্ম লিখিবার পর পরাগলের মৃত্যু হয়। এরূপ অনুমান করিবার কারণ অশ্বমেধপর্বে কবির নিজের পুষ্পিকায় পরাগলের নাম আছে। কতদূর পর্যন্ত লেখা হয় লিপিকরের পুষ্পিকা হইতে তাহা জানা যায়।

'লস্কর পরাগল ধর্ম অবতার। কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার॥
শ্রীযুত নায়ক লস্কর পরাগল। বিজয় পাণ্ডব স্তনি মনে কুতূহল॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি। স্তনিলে অধর্ম হরে
পরলো[ে]ক তরি।
ইতি শ্রীমহাভারতে পাণ্ডব বিজয়ে পরিক্ষিত জন্ম সমাপ্তঃ।'[১]
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৫ নং পুথি,
অশ্বমেধপর্ব[২] পৃ. ২৪০

অশ্বমেধপর্বের বাকী অংশটুকু পরাগলপুত্র ছুটীখানের সভায় পঠিত হইয়াছিল। পরাগলী মহাভারতের পুথি চট্টগ্রাম হইতে পাওয়া যায়।

বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচারিত একখানি মহাভারত দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয় পণ্ডিত বলিয়া কেহ ছিলেন না। এ মহাভারতখানি পরাগলী মহাভারতেরই সংক্ষিপ্ত সার। আর ইহার ভাষা পরাগলী মহাভারতের ভাষার সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। 'বিজয়-পাণ্ডব' কয়েক স্থানে লিপিকর প্রমাদবশত 'বিজয় পণ্ডিতে'র সৃষ্টি করিয়াছে।

সঞ্জয়ী মহাভারত বলিয়া একখানি মহাভারত প্রচলিত আছে। এখানি

ও পরাগলী মহাভারতে বড় বেশী তফাৎ নাই। ষষ্ঠীবরসুত গঙ্গাদাস সেন অশ্বমেধ-পর্ব রচনা করেন। কেবল এইটুকু ইহাতে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সঞ্জয়ী মহাভারতের সহিত পরাগলীর ভাব ও ভাষা বেশ মিলিয়া যায়, জায়গায় জায়গায় যে অমিল নাই তাহা নয়। বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুপাখ্যানটিতে বেজায় অমিল। অশ্বমেধ-পর্বটি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। শ্রীকর নন্দীর মহাভারতের সঙ্গে অশ্বমেধ-পর্বে আদৌ মিল নাই। তারপর সঞ্জয়ী মহাভারত পরাগলীর বিকাশ বলিয়া সঞ্জয়ী মহাভারতে অনেক কথা বেশী আছে। পরাগলী মহাভারত পড়িয়া 'বিজয়-পাণ্ডব-কথা' হয় আর তাহাই ফাঁপিয়া ফুলিয়া 'সঞ্জয়ী মহাভারত' হইয়াছে। সঞ্জয়ী মহাভারতের পুথি ত্রিপুরা, কুমিল্লা ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে।

কবিচন্দ্র মহাভারতের উদ্যোগপর্ব, বনপর্ব, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য ও গদা পর্ব অনুবাদ করেন। সমগ্র মহাভারত তিনি অনুবাদ করেন নাই। অনুবাদ বলিলে লেখকের মতের অনুবর্তী হইয়া বর্ণনা বুঝায়। কবিচন্দ্র সংস্কৃত মহাভারতের ছায়াবলম্বন করিয়া যথাসম্ভব মহাভারতের ঘটনাবলী বর্ণনা করেন। তাঁহার অনুবাদ আক্ষরিক ভাষান্তর নয়। কবিচন্দ্র মহাভারতের কয়েকটি ঘটনা লইয়া দ্রৌপদীর স্বয়ংবর, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন। কবিচন্দ্রের আসল নাম কি ছিল তাহাও জানা যায় না।

নিত্যানন্দ ঘোষও সমগ্র মহাভারত বাংলা ভাষায় ছন্দে অনুবাদ করেন। সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায় নাই। তবে আদি, সভা, ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য, স্ত্রী ও শান্তিপর্বের পুথি পাওয়া গিয়াছে। এখানিও পরাগলীর অনুকরণ। সমগ্র মহাভারতও বাংলায় আরও একজন অনুবাদ করিয়াছিলেন—তাঁহার নাম ষষ্ঠীবর সেন। কিন্তু তাঁহার স্বর্গারোহণ-পর্ব ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। ষষ্ঠীবর স্বর্গারোহণ-পর্বের শেষে বলিয়াছেন যে, তিনি সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করিয়াছেন। ষষ্ঠীবর ও তাঁহার পুত্র গঙ্গাদাস সেন অনেক স্থলে পরাগলীর অনুসরণ করিয়াছেন। চট্টগ্রামের কোন কোন পরাগলী মহাভারতের পুথিতে উত্তর কালে গঙ্গাদাসের হাত দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,

'গঙ্গাদাস সেন রচিলেন সর্ব। শ্লোক ভাঙ্গি
রচিলেন অষ্টাদশ পর্ব।'

কৃষ্ণানন্দ বসু, নিতাই দাস, বল্লভদেব ও ভৃগুরাম দাস—ইঁহারাও কাশীরাম দাসের পূর্বে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণচন্দ্র বসুর শান্তি পবের ১০৯৯ সালের পুথি ও দ্বিজ কবিচন্দ্রের ভারত-কথা ১০৬৩ সালের পুথি পাওয়া গিয়াছে। এ ছাড়া ভাষায় একটু-আধটু অনুবাদ অনেকেই করিয়াছিলেন। সেগুলি কাশীরামের পূর্বে বা পরে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সকলগুলির আলোচনার স্থানও আমাদের নাই। তবে কয়েকজন রচয়িতার নামমাত্র উল্লেখ করিব। কয়জন কেবল অশ্বমেধ-পর্বই লিখিয়াছেন। ইঁহাদের নাম দ্বিজ অভিরাম (অশ্বমেধপর্ব), দ্বিজ রামচন্দ্র খান (অশ্বমেধপর্ব), দ্বিজ কৃষ্ণরাম (অশ্বমেধপর্ব), দ্বিজ রঘুনাথ, দ্বিজ রামকৃষ্ণ দাস, দ্বিজ ভরত পণ্ডিত। দ্রোণপর্ব লিখিয়াছিলেন গোপীনাথ দত্ত। রাজেন্দ্র দাস আদিপর্ব অনুবাদ করেন। এই মহাভারতগুলির মধ্যে পূর্ববঙ্গে সঞ্জয়ী মহাভারত ও পশ্চিম বঙ্গে নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত বিশেষভাবে আদৃত ছিল। একখানি প্রাচীন কাব্যের মুখবন্ধে পাওয়া যায়-

'অষ্টাদশপর্বে ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্বে ভারত প্রকাশ।'

এগুলির প্রায় দুইশত বৎসরের হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে। হস্তলিপি আবার নকলের। কাজেই অনুবাদের সময়-নিরূপণ একেবারেই অসম্ভব। কাশীরাম দাসের পরবর্তী কয়জন কবির পুথিও পাওয়া যায়, তন্মধ্যে রামেশ্বর নন্দীর 'শকুন্তলা', মধুসূদন নাপিতের 'নলদময়ন্তী' ও লোকনাথ দত্তের 'নৈষধ' উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত কবিদের সকলেই তাঁহাদের অনুবাদে মূল-বহির্ভূত অনেক বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন। কিন্তু মূল সংস্কৃতের ধারাবাহিক কাব্যানুবাদ ধরিলে কাশীরাম দাসের অনুবাদই বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

কাশীরাম দাসও বাংলা ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ করেন। অনুবাদ-কার্যে তিনি পূর্ববর্তিগণের নিকট সাহায্যও লইয়াছেন। কিন্তু অনেক

স্থলে সুন্দর কবিত্বশক্তি ও কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভাষাও বেশ স্পষ্ট—ঝরঝরে। কবির সরল বাংলায় প্রসাদগুণও যেমন আছে, তেমনই সংস্কৃত শব্দপ্রয়োগের দক্ষতায় কবির ভাষা-বৈচিত্র্য এবং সংস্কৃত জ্ঞানেরও পরিচয় আছে। এ পরিচয় ছদ্মবেশী অর্জুন ও দ্রৌপদীর রূপবর্ণনা প্রভৃতিতে বিশেষ করিয়া পাওয়া যায়। তাঁহার সমগ্র গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা অন্যূন ৩৬,০০০। সেগুলি প্রায়ই পয়ারে লেখা। ত্রিপদীর সংখ্যা ৭৬। অন্য ছন্দের সংখ্যা খুবই কম। মিত্রাক্ষরের বিশুদ্ধি অনেক স্থলেই রক্ষিত হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[৪] মহাশয় বলেন, কাশীদাস কয়েকখানি বাংলা মহাভারতের উপর নির্ভর করিয়াই আপনার মহাভারত লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহার প্রমাণ এই যে, কাশীদাস গোড়াতেই লিখিয়াছেন,—

"প্রণমোহ পুস্তক ভারথ নামধর।
যার নাম করিলে নিষ্পাপ হয় নর॥
পরাশর-সুত-মুখে হইল সম্ভব।
অমল কমল দিব্য ত্রৈলোক্য-দুর্লভ॥
গীত-অর্থে কৈল তাহা সুগন্ধি নির্মাণ।
কেশব রচিল তাহে বিবিধ আখ্যান॥
হরি সে উদ্ভব—সেই প্রচণ্ড তপনে।
ভারথ-পঙ্কজ ফুটে যাহার বদনে॥
সুবুদ্ধি সুজন লোক হৈয়া ষট্‌পদী।
ভারথ-পঙ্কজ-মধু পিয় নিরবধি॥"

শাস্ত্রীমহাশয় ৯৮৫ সালের একখানি পুথি পাইয়াছেন। সেখান কাশীরামেরই আদিপর্বের পুথি। ৯৮৫ সালের কাশীরামের পুথি দেখিয়া বিশেষ সন্দেহ হইল। সাহিত্য পরিষদের পুথিশালা হইতে পুথিখানি বাহির করিয়া দেখিলাম। পুষ্পিকার তারিখে কারচুপি হইয়াছে। পুথি-বিক্রেতারই কাজ বলিয়া মনে হইল। পূর্বে পুথিতে ১০৮৫ সাল ছিল। '১০' অঙ্কটিকে ছুরি দিয়া চাঁচিয়া '৯' করা হইয়াছে। পরিবর্তিত অংশের

কালির পার্থক্যও বেশ স্পষ্ট। এই '৯' টি আবার পুথির লিপিকরের অন্যান্য পত্রাঙ্কের কোন '৯' এর সহিতই মিলে না। লিপিকরের '৯' সম্পূর্ণ অন্যরূপ। কয়েক বৎসর পূর্বে 'বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতে'র মুখবন্ধে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছিলেন—'মুদ্রিত কাশীদাসী অপেক্ষা আয়তনে প্রায় দ্বিগুণ। আদিপর্বের একখানি ৯৮৫ সনের (?) হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, কাশীরাম যে সময়ে আদিপর্ব রচনা করেন, এই পুথিখানি সেই সময়ের লেখা।' নগেন্দ্রবাবুরও তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়াছিল। নতুবা তিনি ৯৮৫ সনের পর "(?)" চিহ্ন দিবেন কেন? লিপির অক্ষর দেখিয়াও অত পুরানো বলিয়া মনে হয় না।

এই পুথির আরম্ভে যে কয়টি ছত্র আছে তাহার ব্যাখ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, 'ইহার অর্থ এই যে, সুগন্ধি নামে একজন লোক 'গীত অর্থে' অর্থাৎ বাংলা ছড়ায় মহাভারত নির্মাণ করিল। কেশব নামে আর একজন লোক তাহাতে বিবিধ আখ্যান জুটাইয়া দিল। তাহার পর হরি নামে আর একজন হইলেন, তিনি প্রচণ্ড সূর্যের ন্যায়; তাঁহার মুখে ভারত-পঙ্কজ ফুটিয়া উঠিল। অর্থাৎ তিনি মহাভারতের গল্প ও অন্যান্য গল্প একত্র লইয়া মহাভারতখানিকে ফুটাইয়া তুলিলেন। কাশীরাম দাস এই সকল বই ধরিয়া তাঁহার বই লিখিয়াছেন।' এই অর্থটি বিশেষ কষ্টকল্পনা বলিয়াই মনে হয়। কেন-না, ইহার অর্থ সাধারণভাবে করিতে পারা যায়। আমাদের মনে হয় ইহার অর্থ নিম্নলিখিতরূপ হওয়াই স্বাভাবিক—

"ভারত নামক পুস্তককে প্রণাম করি। ইহার নাম করিলে মানুষ নিষ্পাপ হয়। [এই পুস্তককে পদ্মের সহিত তুলনা করা হইয়াছে] পরাশরসুতের মুখ হইতে [মহাভারত-রূপ] ত্রৈলোক্য-দুর্লভ একটি দিব্য অমল কমল উদ্ভূত হইল। [আমি কাশীরাম] গীত-অর্থে [পয়ারছন্দের গান] তাহাতে (সেই পদ্মে) সুগন্ধি নির্মাণ করিলাম। বিবিধ আখ্যান সেই পদ্মের কেশররূপে রচনা করিলাম। হরি বা কৃষ্ণরূপ সূর্য [তদুপরি] উদিত হইলেন; সেই প্রচণ্ড তপনোদয়ে ভারতরূপ পঙ্কজ যাঁহার (ব্যাসদেবের) বদনে প্রস্ফুটিত হইল। হে সুবুদ্ধি সুজন ব্যক্তি! ভ্রমর-রূপে সর্বদা ভারন-পঙ্কজ-মধু পান কর।"

কাশীদাসের এই কয়ছত্র কবিতা তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানেরই পরিচয় দেয়—সংস্কৃত অনভিজ্ঞতার নয়। একটি সংস্কৃত শ্লোকের ভাবানুবাদ করিয়াই তিনি বাংলা কবিতায় ঐ কয়ছত্র লিখিয়াছেন। সংস্কৃত শ্লোকটি গীতা-ধ্যানের সপ্তম শ্লোক। শ্লোকটি এই—

'পারাশর্যবচঃ-সরোজমমলম্ গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানক-কেশরং হরিকথা-সম্বোধনা-বোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্‌পদৈ রহরহঃ পেপিয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ ভারত-পঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে॥'

এই কবিতাটির 'সরোজমমলম্', 'গীতার্থগন্ধোৎকটম্', 'নানাখ্যানক-কেশরম্', 'সজ্জনষট্‌পদৈঃ', 'ভারত-পঙ্কজম্', প্রভৃতি কাশীদাসের অনুবাদে সমুজ্জ্বলভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। সংস্কৃত মূল ও বাংলা পয়ার পড়িয়া সকলকেই বলিতে হইবে যে, কাশীদাস সংস্কৃত জানিতেন। মূল ও পয়ার তুলনা করিলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।

'সুগন্ধি', 'হরি' ও 'কেশব' এই তিনটি যে কোন লোকের নাম নয় তাহা 'গীতার্থগন্ধোৎকটম্' 'হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্' ও 'নানাখ্যানক-কেশরম্' হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। কাশীদাস তাঁহার অনুবাদে এই তিনটিরই মাত্র 'রকম-ফের' করিয়াছেন। 'কেশব' পাঠ যে লিপিপ্রমাদ তাহা 'নানাখ্যানক-কেশরম্' সপ্রমাণ করিয়া দিবে।

কাশীরাম দাসের সমগ্র মহাভারতখানি ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিয়া রচনা করা হইয়াছে। ইহাতে এই মহাকাব্যখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ভাষা ও ভাব একদিকে যেমন সরল, স্বচ্ছ, অপরদিকে তেমনই মধুর, স্বাভাবিক। সমস্ত গ্রন্থখানি প্রসাদগুণে পরিপূর্ণ। কিন্তু এই পুস্তকের সমস্ত অংশ কাশীরামের স্ব-রচিত বলিয়া মনে হয় না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কাশীরামসুত রচিত স্বর্গারোহণ-পর্বের একখানি ১০৮২ সনে লিখিত পুথি পান, তাহাতে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

'দ্বিজপদরজ লয়্যা কাশীর নন্দন।
জনকের আজ্ঞামত করিল রচন॥'

এই ভণিতা হইতে মনে হয় যে কাশীরাম তাঁহার পুত্র নন্দরামকে মহাভারত

সম্পূর্ণ করিতে আজ্ঞা করিয়া গিয়াছিলেন। নগেন্দ্রবাবু একখানি পুথিতে দেখিয়াছেন, কাশীদাসের পূর্বে নিত্যানন্দ ঘোষ মহাভারত প্রকাশ করেন। তারপর কাশীরাম মহাভারত আরম্ভ করেন। তিনি নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত ও নন্দরামের ভারত মিলাইয়া দেখিয়াছেন যে, দুইখানি পুথির অনেকাংশে মিল নাই। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী হইতে সংগৃহীত ১০৮৩ সালের একখানি দামোদর পদাবলীর উপর লিখিত আছে যে, ঐ বর্ষে ১৮ই ফাল্গুন কৃষ্ণতৃতীয়ার দিন নন্দরাম দাসের মৃত্যু হয়। নগেন্দ্রবাবু এই কথা বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের মুখবন্ধে বলিয়াছেন। পূর্ববর্তী অনুবাদকগণের রচনার তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, স্থানে স্থানে ইঁহাদের রচনা অবিকল এই গ্রন্থের সঙ্গে সংযোজন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোথাও বা একটু-আধটু পরিবর্তন করা হইয়াছে। যুদ্ধপর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অবশিষ্ট অংশগুলিতে এই ব্যাপারের বেজায় বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেই মনে হয় কাশীরাম সমগ্র মহাভারত রচনা করেন নাই।

'আদি সভা বন বিরাটের কতদুর।
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর॥'

সম্ভবত এই প্রবাদবাক্য সত্য। কেন-না, প্রথম চারিটি পর্বে যেখানে তিনি পূর্ববর্তীদিগের নিকট ঋণী সেখানে তিনি ভাষা পরিমার্জন ও পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু শেষের দিকের দু-একটি পর্বে পূর্ববর্তী রচনা হইতে অধিকাংশ অবিকল গৃহীত হইয়াছে। কাশীরাম দাসের পুত্র নন্দরাম ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ পর্ব রচনা করেন। ইহার প্রমাণ নন্দরামের পুথিতেই আছে। কাশীরামের প্রথম চারিটি পর্ব পড়িলে বেশ মনে হয় তিনি পূর্ববর্তী-দিগের অনাড়ম্বর ভাব ও ভাষায় সুস্নাত হইয়া তাহার সমকালবর্তিগণের ভাব ও ভাষার ঔজ্জ্বল্য তাহাতে সংমিশ্রণ করিয়াছেন। প্রথম চারিটি পর্বের সুন্দর ও স্বাভাবিক বর্ণনার অলঙ্কার প্রায়শই সংস্কৃত হইতে গৃহীত। কিন্তু পরবর্তী পর্বে সেরূপ হয় নাই। প্রথম চারি পর্বে তাঁহার সংস্কৃত-জ্ঞানের বিশেষরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা কাশীদাস সংস্কৃত জানিতেন না, কথকদিগের নিকট পুরাণপাঠ শ্রবণ করিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছেন। এ কথার কোন মূল্য নাই। বেদব্যাস-রচিত মূল

সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে তুলনা করিলে কাশীরামের কৃতিত্ব বুঝিতে পারা যায়।

কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদ করিতে প্রয়োজনমত স্বাধীন চিন্তারও পরিচয় দিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে পুরাণ বা অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্যও লইয়াছেন। তবে প্রায়ই মূল সংস্কৃত মহাভারতের অনুবর্তন করিয়াছেন। মূল সংস্কৃত মহাভারত অবলম্বন করিয়া তাহাকে যথাসম্ভব সংক্ষেপ করিয়াছেন। সংস্কৃত না জানিলে এরূপ করিতে পারিতেন না। তিনি যেভাবে সার সঙ্কলন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সঞ্জয় প্রভৃতি পূর্ববর্তিগণের অনুবর্তী হইয়া তাহাদের কল্পনাকে স্বীয় অনুবাদে স্থান দেন নাই। আমাদের এই উক্তি আদি হইতে বিরাট-পর্ব পর্যন্ত বেশ খাটে, পরে উহার যথেষ্ট ব্যত্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানাভাববশত আমরা কাশীদাসী মহাভারত, মূল মহাভারত ও সঞ্জয়ী মহাভারত হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমাদের মতের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব।

আদি পর্বে [অষ্টবসুর জন্মবিবরণে] কাশীরাম লিখিলেন—

গঙ্গা বলে, সেই কথা শুন নরপতি।
বরুণের পুত্র যে বশিষ্ঠ মহামতি॥
হিমালয় পর্বতে মুনির তপোবন।

* * *

দৈবে একদিন তথা বসু অষ্টজন।
ভাযার সহিত সবে করিলে গমন॥'

—বর্তমান সংস্করণ পৃঃ ৭০

মূল সংস্কৃতেও তাই আছে। কেবল বশিষ্ঠের আশ্রম হিমালয়ে না হইয়া সুমেরু পর্বতে। সুমেরুর অপর নাম 'হেমাদ্রি'। কাশীদাস 'হিমাদ্রী'র সহিত গোল করিয়া ফেলিয়া থাকিবেন।

সঞ্জয়ী মহাভারতে আছে—বশিষ্ঠাশ্রম সুমেরু পর্বতের নিকট। এই আশ্রম অষ্টবসু মন্ত্রিগণের সহিত দেখিতে পান।

কাশীদাসের উক্তি,—অষ্টবসুর অন্যতম দিব্যবসুর স্ত্রী বলেন—'নর-লোকে সখী এক আছয়ে আমার। উশীনর-কন্যা জিতবতী নাম তার॥' 'স্ত্রীবশ হইয়া বসু ধরিল গাভীরে॥' 'বশিষ্ঠের কামদুঘা ধেনু লৈয়া নিজঘরে গেল।' (পৃ. ৭০) মূলের সঙ্গে কাশীদাসী মহাভারতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। কেবল 'দিব্যবসু'র স্থানে 'দ্যুবসু'। উভয় শব্দই একার্থক। সঞ্জয়ী মহাভারতে বসুগণ নিজ নিজ পত্নীর জন্য কামধেনুর দুগ্ধপানে রূপ ও যৌবন বৃদ্ধি হইবে বলিয়া বশিষ্ঠের কামদুঘা গাভী হরণ করেন (৫৩/১ পত্র)। কিছু পরে আবার পাওয়া যায়, কামধেনু উশীকে তাঁহারা দান করেন (৫৪/১ পত্র)।

কাশীদাসে আছে—শান্তনু হস্তিনাপুরে রাজা হইলেন। একদিন বনের ভিতর মৃগয়া করিতে গিয়া

'জাহ্নবীর দুই তটে ভ্রমে রাজা একা।
পাইল দৈবাৎ তথা জাহ্নবীর দেখা॥'—পৃ. ৬৯

সঞ্জয় অন্যরূপ ঘটনা দিয়াছেন। শান্তনুর পিতা রাজসভায় আসীন। গঙ্গাদেবী মাত্র একখানি কাপড় পরিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সভাসদেরা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তাঁর নাম অমোঘা এবং তিনি শান্তনুকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছেন। রাজা ও সভাসদেরা সানন্দিত হইয়া শান্তনুর সহিত গঙ্গার বিবাহ দিলেন। (৫৫ পত্র)। কাশীদাস লিখিয়াছেন—

'আশ্চর্য কন্যার রূপ শান্তনু দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল সেই কন্যা নিকটেতে গিয়া॥
* * *
তোমারে করিব বিভা হও মম নারী।
কন্যা বলে, রাজা ভার্যা হইব তোমার।
এক নিবেদন আছে নিয়ম আমার॥'

সংস্কৃত মূল কাশীদাসের অনুরূপ।

কাশীদাস— 'মুনিশাপে বসুগণ জন্ম নিল আসি।
জন্মিল গঙ্গার পুত্র যেন পূর্ণশশী॥'

পুত্র দেখি শান্তনুর আনন্দিত মন।
নানা দান নানা যজ্ঞ করিছে রাজন॥
কদাচিৎ কভু যদি বল কুবচন।
সেই দিনে তুমি আমি নাহি দরশন॥

* * *

রাজার বচনে গঙ্গা স্বীকার করিল।
গঙ্গারে লইয়া রাজা হস্তিনা আইল॥' পৃ. ৬৯

'হেথা পুত্র লয়ে গঙ্গা গেল গঙ্গাজলে।
জলেতে ডুবিয়া মর পুত্র প্রতি বলে॥
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিরস বদন।
ভয়েতে গঙ্গারে কিছু না বলে বচন॥' পৃ. ৬৯

সঞ্জয়—গঙ্গা পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গঙ্গা তাহার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলেন। তারপর মরা ছেলেটিকে শান্তনুর কোলে দিয়া তাহাকে জলে ভাসাইয়া দিতে বলিলেন। রাজা রাত্রিযোগে তাহাই করিলেন (৫৫ পত্র)।

মূলের বর্ণনা কাশীদাসের অনুরূপ।

অতঃপর আমরা দিগ্‌দর্শন হিসাবে কাশীদাস ও বেদব্যাসের মহাভারতের বর্ণনীয় বিষয়গুলির তুলনা করিয়া দেখাইব, উভয় গ্রন্থের তফাৎ কতটুকু মিলই বা কতটুকু।

এইরূপ, অষ্টম পুত্রের জন্ম হইলে গঙ্গার সমুদয় কার্যের সহিত কাশীদাসী মহাভারতের অনৈক্য নাই। সঞ্জয়ী মহাভারতের সঙ্গে কিন্তু মিল নাই। শান্তনুর দাসরাজের নিকট কন্যা প্রার্থনা ব্যাপার মূল মহাভারত ও কাশীদাসে এক। পরিচর রাজার পুত্র-বৃত্তান্ত, বেদব্যাসের জন্ম, পরাশরী কন্যার সহিত বিদুরের বিবাহ, কুন্তীর প্রতি দুর্বাসার মন্ত্র দান; দুর্বাসার মন্ত্র-পরীক্ষার জন্য কুন্তীকর্তৃক সূর্যকে আহ্বান, কর্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত, কাশীদাসেও যেমন, মূল মহাভারতেও তেমনই। এ সমস্ত জায়গায় সঞ্জয়ী

মহাভারতের বর্ণনা অন্যরূপ। সংস্কৃত মহাভারত ও কাশীদাসী মহাভারতের যে কোনও স্থান হইতে দেখান যাইতে পারে উভয়ের সাদৃশ্য কত বেশী।

আদিপর্বে শকুন্তলা-উপাখ্যান

কা ত্বং কল্যাণি সুশ্রোণি কিমর্থাঞ্চাগতা বনম্। ১.৭১.১২

*　　　*　　　*

ইচ্ছামি ত্বামহং জ্ঞাতুং তন্মমাচক্ষ্ব শোভনে॥ ১৩

*　　　*　　　*

কণ্বস্যাহং ভগবতো দুষ্মন্ত দুহিতা মতা। ১৫
ঊর্দ্ধরেতা মহাভাগো ভগবাঁল্লোকপূজিতঃ। ১৬
কথং ত্বং তস্য দুহিতা সম্ভূতা বরবর্ণিনী॥ ১৭
তুমি বা কাহার কন্যা কহ সত্য করি।

*　　　*　　　*

মুনির নন্দিনী আমি শুন নরবর।
এত শুনি নরপতি করিল উত্তর॥

*　　　*　　　*

পরম তপস্বী মুনি ফলমূলাহারী।
দারাত্যাগী জিতেন্দ্রিয় মহা ব্রহ্মচারী॥
তাঁহার তনয়া তুমি হইলে কিমতে।—পৃ, ৪৮

সভাপর্ব

কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য প্রবৃত্তং প্রথমেঽহনি।
অনাহার দিবারাত্রমবিশ্রান্তমবর্ত্তত॥
চতুর্দশ্যাং নিশায়ান্তু নিবৃত্তো মাগধঃ ক্লমাৎ।

কার্ত্তিক-প্রথমে　　　প্রতিপদক্রমে
অহর্নিশি দোঁহে রণে।
হৈল চতুর্দশী　　　কহে দাস কাশী
বিশ্রাম না পায় ক্ষণে।—পৃ. ২৪৭

বনপর্ব

দৃষ্ট্বা তং প্রহরিষ্যন্তং ফাল্গুনং দৃঢ়ধন্বিনং।
কিরাতরূপী সহসা বারয়ামাস শঙ্করঃ॥
ময়ৈব প্রার্থিতঃ পূর্বমিন্দ্র নীলসমপ্রভঃ।
অনাদৃত্য চ তদ্বাক্যং প্রজহারাথ ফাল্গুনঃ।
কিরাতশ্চ সমং তস্মিন্ একলক্ষ্যে মহাদ্যুতিঃ।
প্রমুমোচাশনিপ্রখ্যং শরমগ্নিশিখোপমম্ ইত্যাদি

বরাহ দেখিয়া পার্থ গাণ্ডীব লইয়া।
সন্ধান পূরেন ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া॥
বলিলেন ডাকিয়া কিরাত ভগবান্।
বরাহ তপস্বী তুমি না মারহ বাণ।
আনিলাম দূর হৈতে ডাকিয়া বরাহ।
তুমি কেন বরাহেরে মারিবারে চাহ॥
না শুনিয়া পার্থ তাহা করি অনাদর।
বরাহের উপরে মারিলা তীক্ষ্ণ শর॥
কিরাত যে দিব্য অস্ত্র মারিল শূকরে।

ইত্যাদি পৃ. ৩৬৬-৬৭

বিরাটপর্ব

গজৈশ্চসিংহৈশ্চ সমীয়িবানহং সদা করিষ্যামি তবানঘ প্রিয়ম্।

সিংহ ব্যাঘ্র বৃষ আর মহিষ বারণ।
যাহা সহ যুঝাইবে দিব আমি রণ॥ ইত্যাদি পৃ. ৫২১

কাশীদাসী মহাভারতে সংস্কৃত মূলের বিরোধী কথাও যে নাই তাহা নহে। একটা উদাহরণ ধরা যাউক দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের সময় কর্ণ লক্ষ্যভেদ করিতে গেলেন। দ্রৌপদী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—

দৃষ্ট্বা তং দ্রৌপদী বাক্যমুচ্চৈর্জগাদ
নাহং বরয়ামি সূতম্॥—মহাঃ ১. ১৮৭. ২৩

কাশীদাসের বর্ণনা একেবারে অন্য রূপ। কাশীদাস দেখাইলেন শ্রীকৃষ্ণের চক্রান্তে কর্ণ লক্ষ্যভেদ করিতে পারেন নাই।

সুদর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হয়ে গেল।
তিলবৎ হয়ে বাণ ভূতলে পড়িল॥

কাশীদাস যথাসাধ্য মূলের অনুবর্তী হইয়া মহাভারতের মুখ্য উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া মহাভারত লিখিয়াছেন। স্থানে স্থানে অবিকল তর্জমা থাকিলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে মহাভারতীয় কথার অনুবাদ বা বর্ণনা, ঠিক translation নয়।

কাশীদাস তাঁহার মহাভারতে নিজ পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন—

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে তথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গিগ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠভ্রাতা॥
কাশীদাস কহে সাধুজনের চরণে।
হইবে নি[illegible] গান শুন একমনে॥

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে ইন্দ্রাণী পরগনার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রাম। বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকট ঐ গ্রাম আজও বিদ্যমান. এখানে ভাগীরথী প্রবাহিতা। কাশীরামের অপর সহোদর—জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস, মধ্যম স্বয়ং কাশীদাস, কনিষ্ঠ গদাধর দাস। পিতার নাম কমলাকান্ত. পিতামহ সুধাকর, প্রপিতামহ প্রিয়ঙ্কর।

কনিষ্ঠ গদাধর 'জগৎমঙ্গল' বা 'জগন্নাথমঙ্গল' ১০৫০ বঙ্গাব্দে রচনা করেন। ভণিতায় আছে 'সহস্র পঞ্চাশ সন দেখা লিখা মত।' আর উৎকলরাজ নরসিংহদেবের রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। নরসিংহদেবের রাজ্যারম্ভ ১৬২৮ খ্রীস্টাব্দে; সুতরাং রাজত্বের

পঞ্চদশ বর্ষ ১৬৪৩=১০৫০ বঙ্গাব্দ। এই গ্রন্থে ইহাদের বংশপরিচয় আছে। তদনুসারে বংশতালিকা এইরূপ—

- দৈত্যারি
  - দামোদর
    - ধ্রুবরাজ
      - মীনকেতন
        - ধনঞ্জয়
          - রঘুপতি
            - প্রিয়ঙ্কর
              - যদু
          - ধনপতি
            - সুরেশ্বর
              - সুধাকর
                - কমলাকান্ত
                  - কৃষ্ণদাস
                  - কাশীদাস
                  - গঙ্গাধরদাস
                - শ্রীমন্ত
                - …মন্ত ?
          - নরপতি
            - কেশব
              - মধু
            - রঘুদেব
              - রাম
            - শ্রীধর
              - রাঘব
    - শুভরাজ
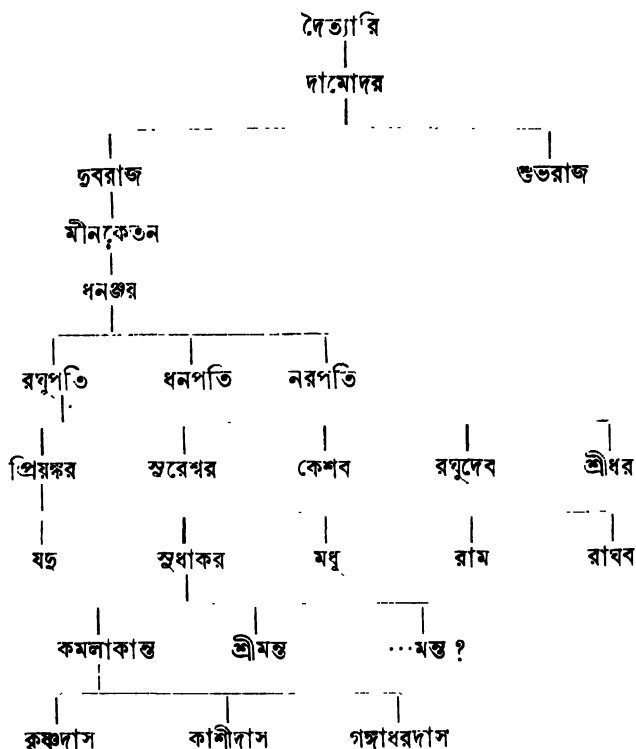
নন্দরাম দাসের পুথি হইতে জানা যায় নন্দরাম কাশীরাম দাসের পুত্র।

কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' নামক শ্রীমদ্‌ভাগবতের মর্মানুবাদ রচনা করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে আমার সম্পাদনে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। কাশীদাসী মহাভারতের বিরাট-পর্বের একখানি অতি প্রাচীন পুথি হইতে পাওয়া যায়—

'যে জন শ্রবণ করে তারে কর দয়া।
উদ্ধার করহ প্রভু দিয়া পদ ছায়া॥
চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥'

বিরাটপর্ব ১৫৩৬ শক অর্থাৎ ১০১১ বঙ্গাব্দে শেষ হয়। এ সময় গদাধর বা কৃষ্ণদাস গ্রন্থ লেখেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে কাশীদাস এখন হইতে ৩২৭ বৎসর পূর্বে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ২০-২২ ধরিলে কাশীদাস ৩৫০ বৎসরের কবি হইয়া পড়েন। কাশীদাসের জন্ম মোটামুটি হিসাবে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি ধরা যাইতে পারে। গদাধরের গ্রন্থ রচনার তারিখও এ বিষয়ে সমর্থন করে। সুতরাং কাশী-দাসের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে গোল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

কাশীদাস সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানিবার উপকরণ পাওয়া যায় নাই। তিন ভ্রাতার লেখা পড়িয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তিন জনেই পরম বৈষ্ণব ও কাব্যামোদী ছিলেন। কাশীদাস তিন ভ্রাতার মধ্যে মধ্যম ছিলেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ গ্রন্থরচনা করিবার পূর্বে তিনি মহাভারত রচনা করেন। কৃষ্ণদাস গোপালদাস নামে এক ব্রহ্মচারীর নিকট দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণকিঙ্কর নামে অভিহিত হন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর কৃপায় 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কাশীদাসের জন্মস্থান লইয়া মধ্যে কিছু গোলযোগ চলিয়াছিল। ভারতী, পরিষৎ-পত্রিকা ও অন্যান্য পত্রে ইহা লইয়া বেশ বাদানুবাদ চলিয়াছিল। তর্কের বিষয় কাশীদাস 'সিদ্ধি'-গ্রামবাসী বা 'সিঙ্গী'-গ্রামবাসী। কাহারও মতে কাটোয়া মহকুমার অধীন ইন্দ্রানী পরগনার অন্তর্গত 'সিদ্ধান্তবাটী' বা 'সিদ্ধি' নামক গ্রামে কাশীদাস জন্মগ্রহণ করেন।...কেহ বলিলেন, উক্ত গ্রামের কিছু দূরে "সিঙ্গি" নামে যে গ্রাম আছে, সেইখানেই কবির স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ 'কেশে পুকুর' ও 'কাশীর ভিট।' শেষে সাব্যস্ত হইল, সিঙ্গি গ্রামেই কাশীদাসের জন্ম। সিঙ্গিগ্রামেই তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা হয়। আমি সাহিত্য-পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী, রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীর পুথি দেখিয়াছি। বিশ্বকোষ-গ্রন্থাগারের

পুথি ও অন্যান্য কয়েক স্থানের পুথি দেখিয়াছি। সকলের চেয়ে পুরানো পুথিতে 'সিঙ্গি' পাঠই আছে। বিশ্বকোষ-কার্যালয়ে ১০১০ সনের পুথিতে 'সিঙ্গি' পাঠ আছে। বিশ্বকোষ-কার্যালয়ের 'জগৎ মঙ্গল' পুথিতেও (১১৬৫ বঙ্গাব্দ) 'সিঙ্গী' পাঠ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়-দৃষ্ট 'জগন্নাথ-মঙ্গলে'র পুথিতেও (১২০৯) 'সিঙ্গী' পাঠ। জেমো (কান্দী) বিশ্বাস-পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের পুথিতেও, 'সিঙ্গী' পাঠ। খুব প্রাচীন পুথি মাত্রেই, 'সিঙ্গী' পাঠ আছে। অপ্রাচীন পুথিতে 'সির্দ্ধি', 'সিদ্ধি', 'সিন্ধু', 'সিংহ', পাঠ। অনেকগুলি পাঠের 'সিদ্ধি'কে 'সিঙ্গি' করিয়াও পড়া যায়। ছাপা বইয়েও এই গোল। কিন্তু প্রাচীনতম প্রামাণ্য পুথিতে 'সিঙ্গী' পাঠই আছে। 'সিদ্ধি' ও 'সিঙ্গী' উভয় স্থানে গিয়া পারিপার্শ্বিক ব্যাপার বিচার করিয়া আমার মনে হয় 'সিঙ্গি' নামই ঠিক। লিপিকরের গড্ডালিকা প্রবাহে অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুথিতে 'সিদ্ধি' প্রভৃতি পাঠ আসিয়াছে। কাশীদাস সিঙ্গীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কাশীরামদাস মহাভারত ছাড়া আরও চারিখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। এই চারিখানি গ্রন্থের পুথি চারিখানির নাম—১। সত্যনারায়ণের পুথি, ২। স্বপ্নপর্ব, ৩। জলপর্ব, ৪। নলোপাখ্যান।

আজকাল কাশীদাসের মহাভারতের অনেকগুলি সংস্করণ বাহির হইয়াছে। সেগুলির পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রথমকার ছাপা বই সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রীরামপুরের পাদ্রি মার্শ-ম্যান[১] সাহেব ১৮০১-০৩ সালে কাশীরামদাসের মহাভারত প্রথম ছাপেন। শুধু আদিপর্বটুকু তিনি ছাপেন। ১৮৩৬ সালে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের[২] সংস্করণ শ্রীরামপুর হইতে বাহির হয়। অনেক পুথি থেকে পাঠ মিলাইয়া সাধারণের উপযোগী করিয়া এই মহাভারত তিনি প্রকাশ করেন। এখানি কাশীদাসের সমগ্র মহাভারত। ২ খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১৮৫২, ১৮৫৫, ১৮৬৮ ও ১৮৮০ সালে ইহার কয়েকটি সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। ইহার পর ১৮৫৪ সালে বটতলার প্রসিদ্ধ পুস্তকবিক্রেতা মধুসূদন শীল এই মহাভারত ছাপেন। ইহাই হইল কাশীদাসী মহাভারতের প্রথম বটতলা সংস্করণ।[৩] ১৮৫৫ সালে সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে ইহার একটি সংস্করণ বাহির

হয়। বৃহৎ মহাভারত নাম দিয়া, ১৮৬০ (শক ১৭৮২) সালে একটি সংস্করণ বাহির হয়। ১৮৬৮ সালে (১২৭৫) ও ১৮৮০ (শক ১৪০২) সালে আরও দুইটি সংস্করণ বাহির হয়। ১৮৬৯ সালে ক্ষেত্রমোহন ধর উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিরাট ও শান্তি পর্ব বাহির করেন। ১৮৭০ সালে সিদ্ধেশ্বর কাশীরামের এক সংস্করণ বাহির করেন। ১৮৭৪ সালে নৃত্যলাল শীল আরও এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। তারপর কাশীরাম দাস মহানুভব— সচিত্র ও সমগ্র মহাভারত—অষ্টাদশ পর্ব ১৯০৩ সালে (১৩১০)।

পাদটীকা

১ মুদ্রিত অশ্বমেধপর্বে 'পরীক্ষিতের জন্ম' উপাখ্যানটি নাই। অশ্বমেধ পর্ব জৈমিনিভারত হইতে গৃহীত।

২ বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের পুথিতেও (২৯১/১ পৃ.) এই পাঠ আছে। তবে লিপিকরের ভণিতা নাই।

৩ 'কলিকাতা নগরীয় শোভাবাজার বটতলা স্থানীয় প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রয়কারী শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন শীল কাশীদাসি মহাভারত মুদ্রিত করিয়াছেন। শ্রীরামপুরীয় পাদরি শ্রীযুক্ত মাস্যমেন সাহেবের মহাভারত ছাপার পরে এই ছাপা হইল।'—ভাস্কর, ১৮৫৪ খ্রী., ৭ জানুয়ারি : ১২৬০, ৬ পৌষ, শনিবার।

[রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কাশীরাম দাসের মহাভারতের ভূমিকা, পৃ. /০—৮৵০]

প্রসঙ্গ-কথা

1 রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩): শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিক। অধ্যাপক সিটি কলেজ (১৮৯৩-৯৫), কায়স্থ পাঠশালা (এলাহাবাদ, ১৮৯৫), পরে অধ্যক্ষ (১৯০৫), শান্তিনিকেতনের অবৈতনিক অধ্যক্ষ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক (১৯১০), সভাপতি (১৯২২)। প্রতিষ্ঠাতা: বিশালভারত (মা. হিন্দী)। সম্পাদক: ধর্মবন্ধু (মা. ১৩০৪), দাসী (মা. ১২৯৯), প্রদীপ (মা. ১৩০৪), প্রবাসী (মা. ১৩০৮), Modern Review (১৯০৭)। সম্পাদিত গ্রন্থ: কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত।—সা-সে-ম.

2 বুদ্ধঘোষ: প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ লেখক। ৩৯০ খ্রী. বোধগয়ায় ব্রাহ্মণবংশে জন্ম। তাঁর গুরু রেবতের আদেশে সিংহলে গিয়ে অনুরাধপুরে সংঘপালের অধানে সিংহলী ভাষায় বই থেকে পালি ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর অনূদিত প্রথম গ্রন্থ 'বিশুদ্ধি মগ্‌গ' (the Path of Purity)। কাজ শেষ করে বোধগয়ায় ফিরে আসেন। সিংহলে যাবার পূর্বে তিনি 'নামোদয়' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন।—*Law, B. C.: Life and Work of Buddhaghosa* (1923)।

3 হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১): বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ও শিক্ষাব্রতী। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, ভাষাবিদ; জাতিতত্ত্ব ও বৌদ্ধ ইতিহাসে সুপণ্ডিত। অধ্যাপক—লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ (১৮৭৯), কল. সংস্কৃত কলেজ (১৮৮৩). প্রেসিডেন্সি কলেজ (১৮৯৪), সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (১৯০০-০৮), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলার প্রধান অধ্যাপক (১৯২১-২৪), বঙ্গীয় রাজ সরকারের সহকারী অনুবাদক (১৮৮৩), বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৮৮৬-৯৪)। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা।—সা-সে-ম.

4 মার্শম্যান (Marsman, John Clarke) (1794-1877): শ্রীরামপুরের মিশনারি ও সংবাদপত্রসেবী। শ্রীরামপুরে আগমন (১৭৯৯)। বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য অসাধারণ পরিশ্রম করেন। তাঁর গ্রন্থ—পুরাবৃত্ত সংক্ষেপ (১৮৫০), বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত (১৮৫০)। তিনি দিগ্‌দর্শন (প্রথম বাংলা মাসিক, ১৮১৮, এপ্রিল), সমাচার দর্পণ (প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক, ১৮১৮ মে), ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া (১৮৩৪), গভর্নমেন্ট গেজেট (১৮৪০) সম্পাদনা করেন।—ঐ

5 জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (১৭৭৫-১৮৪৬): পণ্ডিত ও সুকবি। কেরি সাহেবের অধীনে শ্রীরামপুরে কর্ম (১৮০৫), সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক (১৮১৩-২৯), সুপ্রীম কোর্টের জজ-পণ্ডিত ই.। কয়েকটি গ্রন্থ—শিক্ষাসার (২ সং ১৮১৮), চণ্ডী (১৮১৯), বাল্মীকি রামায়ণ (১৮৩০-৩৪), মহাভারত (১৮৩৬ , পারসিক অভিধান (১৮৩৮), বঙ্গাভিধান (১৮৩৮)। সম্পাদক: সমাচার দর্পণ ই.।—ঐ

চন্দ্র ও সূর্যবংশ

প্রাচীন ভারতের রাজবংশের বংশবল্লী রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল নৃপতি উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নাম এই সকল গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। অবশ্য সকল রাজার নামই যে বিবৃত হইয়াছে তাহা নহে; যাঁহারা ভারত-বিশ্রুত—যাঁহারা স্মরণীয় কার্য করিয়া বরেণ্য হইয়াছিলেন—যাঁহাদের স্মৃতি সংরক্ষিত হওয়া উচিত—যাঁহাদের যশঃসৌরভ দিঙ্মণ্ডল প্রসারিত—প্রধানত তাঁহাদেরই নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সকল নৃপতি যে কারণেই হউক দুইটি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশ সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। একটি সূর্যবংশ, অপরটি চন্দ্রবংশ। বৈবস্বত মনুর বংশধরেরা সূর্যবংশ নামে এবং সোমের বংশধরেরা ইলা বা চন্দ্রবংশ নামে প্রসিদ্ধ। সূর্যবংশ অযোধ্যা, বিদেহ ও বৈশালীতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। অযোধ্যার নরপতিগণ প্রভূত শক্তিশালী ছিলেন বলিয়া প্রধানত তাঁহারাই সূর্যবংশ নামে খ্যাত। চন্দ্রবংশ পুরূরবা ইলা হইতে উদ্ভূত। অল্পকালের মধ্যেই এই বংশ পৌরব, যাদব, আনব, দ্রুহ্যু ও তুর্বসু এই পঞ্চশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। পৌরবেরা উত্তর ভারতের মধ্যবর্তী স্থানে, যাদবেরা পশ্চিম ভারতে ও দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পূর্বাংশে আনবগণ পঞ্জাব ও পূর্বরাজ্যে এবং দ্রুহ্যুগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই চন্দ্রবংশোদ্ভূত হইলেও চন্দ্রবংশাবলীতে পৌরবদিগকে এবং প্রধানত পৌরবদিগের যে শাখা হস্তিনায় রাজত্ব করিতেন তাঁহাদিগকে

বুঝাইত। বংশাবলীতে এই সকল বংশের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই বংশাবলীর উপর আস্থাস্থাপন করা যাইতে পারে কি না ?

প্রাচীন বংশাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইতেছে রাজন্যবর্গের নামের বিস্তৃত তালিকা। আর প্রত্যেক বংশের প্রাচীন রাজগণ প্রকৃতপক্ষে জীবিত ছিলেন কি না তাহা জানিবার উপায় নাই; অধিকন্তু অলৌকিক ঘটনাসমন্বিত তাঁহাদের জীবনও রহস্যময়। এরূপ হওয়াও কিন্তু বিচিত্র নয়; কারণ, ভারতে তৎকালে ঘটনাগুলি সংরক্ষণ করিবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। বংশ-পরম্পরার ইতিকথা মুখে মুখে ব্যক্ত হইলে, তাহার মধ্যে যে কতকটা ভুলভ্রান্তি থাকিয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? অধিকন্তু ইহাও ধরিয়া লইতে হইবে যে, ভ্রান্তি মানবের মজ্জাগত এবং মানব অতীতকে গৌরবময় করিয়া জগতের সমক্ষে ধরিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারে না এবং সে পুরাকাহিনীকে কল্পনার রেখাপাতে মধুময়ী করিয়া চিত্তাকর্ষক গল্পে পরিণত করিতে সতত চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও বংশাবলীকে অবিশ্বাস করিবার কোনরূপ বৈধ কারণই আমরা দেখিতে পাই না।

অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে লোকে প্রাচীন প্রবাদের উপর আস্থা স্থাপন করিত না। সেগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিত না। তাহাদের নিকট সেগুলি 'সম্ভবপর' মত (theory) বলিয়াই আখ্যাত হইত। সকল দেশের সকল অবস্থাতেই কর্মময় জীবনযাপন ও দেশ জয়লাভের ইচ্ছা মানবমনে বলবতী থাকে। সেই সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য যাহারা দেশ ও রাজ্য জয় করিয়া অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেন ও শান্তিতে প্রজাপালন করেন, তাঁহাদের বিশ্রুত কীর্তি-কাহিনী গীতি ও গাথায় চিরদিন ঝঙ্কৃত হইয়া থাকে। অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্য সঙ্কলনের অজুহাতে সেগুলি চিরনির্বাসিত হইতেছিল। পরে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা যত্ন ও চেষ্টায় যখন ভূগর্ভ হইতে প্রস্তর বা ধাতব প্রমাণ দ্বারা ঐসকল প্রাচীন কাহিনীর বিবরণ সত্য বলিয়া নির্দেশ করিতে লাগিলেন, তখন হইতে সুর একটু বদলাইল। এখন কেহ প্রাচীন প্রবাদের উপর আস্থা স্থাপন করিবেন

না বলিলে, তাহাকেই কারণ নির্দেশ করিতে হইবে কেন তিনি এগুলিকে বিশ্বাস করেন না। এরূপ করাও যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত, কারণ পুরাকালে মানব যে মিথ্যাবাদী ছিল, সে সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ করিতে পারিত না, মিথ্যা রচনা করিয়া গর্ব অনুভব করিত, এরূপ প্রমাণ কোথায়? মানবের নৈতিক অবনতি এতদূর কবে হইয়াছিল—ইতিহাস ত তাহার সাক্ষ্য দেয় না।। বরং সুপ্রাচীন সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই—সত্যের জয় ঘোষণা—সত্যের প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা।

ভারতের সভ্যতা যে সুপ্রাচীন কাল বিদ্যমান, একথা একরূপ সর্ববাদি-সম্মত, এবং প্রাচীনকালে এখানে যে বহু রাজ্য ছিল তাহার বহু প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। সভ্য দেশের বা জনপদের রাজগণের নাম যে তৎকালীন ব্যক্তিগণ স্মরণ করিয়া রাখিত তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কোনো কারণই নাই। অবশ্য ঘটনাবহুল পাশ্চাত্ত্য জাতিগণের কর্মজীবনের কাহিনী স্মৃতি-সাহায্যে ধারণ করিয়া রাখা সহজ নয়; কিন্তু ভারতে যেখানের আদর্শ 'কীর্তির্যস্য স জীবতি', কীর্তিমান্ পুরুষই জীবিত থাকেন—আর কীর্তি রক্ষার জন্য যে দেশের লোক লালায়িত এবং যে দেশের লোক বংশপরম্পরার ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সতত ব্যগ্র, সে দেশের লোক কীর্তিমান্ নরপতির নাম স্মরণ করিয়া রাখিবে না কেন? পুত্রপৌত্রদিগের নিকট কীর্তিমান্ প্রাতঃস্মরণীয় নরপতিদের পুণ্যকাহিনী বিবৃত করিবে না কেন? তাই বলিতেছিলাম, এদেশে পুণ্যাত্মা নরপতিদের নাম বিস্মৃত হইবার কোন কারণই নাই। ভারতের রাজন্যবর্গের বংশলতা সম্পূর্ণ অলীক নহে—মূলত সত্য। তবে একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে—স্মৃতির সাহায্যে ধৃত যুগে যুগে পরিচালিত নামগুলির মধ্যে স্মৃতিশক্তির অল্পতাবশতই হউক অথবা ভ্রমবশতই হউক দুই-একটি ভুল থাকিতে পারে। তারপর প্রাচীন বংশলতাকে যথার্থ বলিয়া ধরিয়া লইলেও কি একথা বলা যাইতে পারে না যে, তাহাদের মধ্যে কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত। অতীতকালে ব্যক্তি-বিশেষের বা রাজন্যবর্গের যে জাল বংশলতাও প্রচারিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোন ভুলই নাই। তবে এ-কথাও সত্য, মিথ্যা প্রচার করিবার পূর্বে কোন সত্য যে ছিল তৎসম্বন্ধে কোন সংশয়ই নাই; আর সত্যের মর্যাদা

এতদূর ছিল যে, মিথ্যাকে তাহার স্থানে চালাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। মিথ্যা বংশলতা, প্রকৃত বংশলতার অনুকরণ করিয়া থাকে। একথা কিন্তু বিশ্বাস করা যায় না যে, সত্য বংশলতার আদৌ অস্তিত্ব না থাকিলে মানুষে একটা কাল্পনিক বংশলতার সৃষ্টি করিয়া থাকে। ব্যক্তিবিশেষের যথার্থ বংশলতা তখনই সাধারণের নিকট প্রচারিত হয়, যখনই সেই ব্যক্তি আপনার দলের ভিতর দলপতি হইয়া রাষ্ট্র অথবা জাতি গঠনে ও সংরক্ষণে সহায়তা করেন। আবার কালক্রমে যখন উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে প্রধান, দলপতি বা নৃপতির পদ অন্যে পাইয়া থাকেন, তখন তাহার নাম বংশ-তালিকায় সংযোজিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সভ্যতার সৃষ্টি হইতে বংশলতা রক্ষারও প্রচলন হইয়াছে। অবশ্য যিনি প্রথমে রাজা বা নগর বা জনপদ স্থাপন করেন, তাঁহার জীবনের সহিত মানব অলৌকিক ঘটনা সংযুক্ত করিয়া কখনও তাঁহাকে চন্দ্রদেব বা সূর্যদেবের পুত্র বলিয়া কখনও বা অতিপ্রাকৃতজীবের সন্তান বলিয়া কীর্তিত করিয়া থাকে; এবং তখন হইতে কেবল তাঁহার নয়, তাঁহার পূর্ব-পুরুষগণের নাম তাঁহার নামের সহিত সংযোজিত হইয়া থাকে। এইরূপে তাহার দেহান্তে তাঁহার বংশধরের নামও ঐ তালিকায় সংযুক্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে বংশলতা প্রায়শ সত্য।

সভ্যতার আদিমযুগ হইতে প্রকৃত বংশলতা যে বিদ্যমান ছিল তাহাতে আর কোনরূপ সন্দেহ নাই। জাল কৃত্রিম বংশলতা উদ্ভাবন করিবার পূর্বে এবং তাহাকে সত্য বলিয়া চালাইবার পূর্বে যে যথার্থ বংশলতা ছিল তাহাও ঠিক। জাল বংশলতা প্রচারের আবশ্যকতা তখনই হয়, যখন কোন নূতন দলপতি প্রাধান্যলাভ করেন; কারণ তিনি যে সদ্বংশজাত ও তাঁহার বংশ-গৌরব উজ্জ্বল তাহা সাধারণের নিকট প্রচার করিবার জন্য কৃত্রিম বংশলতার আবশ্যকতা হইয়া থাকে। এইরূপ প্রাধান্য-প্রাপ্ত নিম্নজাতীয় ব্যক্তির জন্যই কৃত্রিম বংশলতার সৃষ্টি হয়। মধ্যযুগের এবং অর্বাচীন কালের ভারতে যে কৃত্রিম বংশলতা চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন পুরাণে এইরূপ কৃত্রিম বংশলতা পরিদৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সেই-সকল পুরাণ প্রাচীন নহে—অর্বাচীন কালের রচনা।

ভারতবাসী বংশগৌরবে গৌরবান্বিত থাকিতে যত্নবান্। পূর্বপুরুষদিগের মহিমা কীর্তন করিতে ভারতবাসী ভালবাসেন এবং তাঁহাদের কীর্তি-কাহিনী সংরক্ষণ করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টাও করিয়া থাকেন। কবি ও চারণদিগের গানে ও গাথায়, পুরোহিত ও ভাটদিগের কুলপঞ্জিকায় সেই সকল কাহিনী কীর্তিত হইয়া থাকে। যে সকল নরপতির যশোগৌরবে বংশ সমুজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহাদের বংশলতায় কৃত্রিম কোন কিছু প্রবেশ করিতে পারে না। যখন সেই সকল নরপতি জীবিত থাকেন, তখন জাল করিবার কোন প্রয়োজন হয় না, আর তাঁহার অন্তর্ধানের পর ত কোনরূপ আবশ্যক হইবে না।

দীর্ঘকালব্যাপী বংশপত্রের দু-একস্থলে ভুলভ্রান্তি হইতে পারে। পার্জিটার[1] সাহেব এইরূপ ভ্রমের দু-একটি নিদর্শন দিয়াছেন। তিনি বলেন, বিশ্বামিত্র হইতে কান্যকুব্জ-বংশের আরম্ভ হইয়াছে। কাশীবংশ ভ্রমক্রমে পৌরবশ্রেষ্ঠ ভারতনৃপতি বংশধরের বলিয়া কোন কোন পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে। রামায়ণ বর্ণিত অযোধ্যার সূর্য-বংশীয় নরপতিগণের নামও ঠিক নয়। ঐতিহাসিক তথ্য যথাযথভাবে বর্ণনা-বিষয়ে তাদৃশ সাবধানতার অভাবে মাঝে মাঝে অনেক নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যপ্রাধান্য রক্ষণ বিষয়ে চেষ্টাও ইহার অন্যতম কারণ। কিন্তু কান্য-কুব্জ ও কাশীবংশের যে ভুল তাহা ঐ কারণে নয়। সে ভুল ইচ্ছাকৃত, কৃত্রিম ব্যাপারকে চালাইবার চেষ্টায় ঘটিয়াছে। কিন্তু এ চেষ্টা কি কখনও ফলবতী হইতে পারিয়াছে? না কখনও পারিত? এ চেষ্টা যে কৃতকার্য হইতে পারে নাই, তাহার কারণ অন্যান্য পুরাণে প্রকৃত বংশলতা ও বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং শেষোক্ত প্রমাণগুলি যে বিশ্বাসযোগ্য তাহা পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। উত্তরভারতে চিরাচরিত অবদান-সাহায্যে প্রকৃত বংশলতা জানিতে পারা যায়। সেখানে কৃত্রিম বংশলতা চালাইবার চেষ্টা বিফল। তথাকার রাজসভায় যে চারণ ও কবি থাকিত তাহা নহে— অন্যত্রও থাকিত। একস্থানে ভুল থাকিতে পারে; কিন্তু সকল স্থানেই যে এক ভুল হইবে এইরূপ মনে করা যাইতে পারে না। পূর্বে যে ভ্রমের নিদর্শন দেখান হইয়াছে, এটিও তাহার অপর একটি কারণ। কান্যকুব্জবংশ ও

ভারতবংশ যে অভিন্ন এরূপ স্থির করিবার একটা বিশেষ কারণও আছে; কারণটি এই:—অনেক ব্রাহ্মণবংশ এই বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; এবং এইরূপে এই বংশোদ্ভব দেখাইতে পারিলে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বে সমাজে কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইবে না। অধিকাংশ পুরাণে কিন্তু এই দুই বংশকে এক বংশের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বর্ণনা করা হয় নাই। দুইখানি পুরাণে ভুল বংশলতা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই দুইখানি পুরাণের অন্যত্র যথার্থ বংশলতাও প্রদত্ত হইয়াছে। দুই সহস্র বৎসরের বহু পূর্ব হইতে রামায়ণ যে ভারতের একখানি প্রসিদ্ধ মহাকাব্য তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু সূর্যবংশের মিথ্যা তালিকা রামায়ণে প্রকাশিত হইয়াও আদৃত হয় নাই; কারণ অন্যান্য পুরাণের তালিকার সহিত ঐ তালিকার ঐক্য নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রামায়ণের ন্যায় মহাগ্রন্থ-বর্ণিত একটা ভ্রমাত্মক বংশতালিকা যখন সাধারণ কর্তৃক গৃহীত হইল না, তখন অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারা যায় যে, ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ কৃত্রিম একটা বংশতালিকা ভারতে চলিতে পারে না।

অন্যান্য সংস্কৃত পুস্তকেও কখনও কখনও জাল বংশলতা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু রাজন্যবর্গের বংশলতার সহিত এগুলির পার্থক্য স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সৃষ্টি বিষয়ে দক্ষের বৃত্তান্ত, পিতৃগণের বংশলতা, অগ্নির উৎপত্তি ও বিভিন্ন প্রকারের অগ্নির বিবর্তন ইত্যাদি ব্যাপার কৃত্রিম। পূর্বোক্তরূপ বংশলতার অনুকরণে এগুলি যে গ্রথিত তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে এগুলি কৃত্রিম বলিয়া অনুমিত হইবে। অপর্যাপ্ত উপাদান হইতেও কখনও কখনও বংশলতার সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষেত্রেও সে চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে নাই। তথাকথিত ভার্গব, আত্রেয়, বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণবংশের পরিচয় যাহা ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু, মৎস্য ও লিঙ্গপুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাও প্রকৃত নহে। এগুলিতে বংশের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়; কয়েক পুরুষের যথাযথ বিবরণ পাওয়া যায়; তদ্ভিন্ন এগুলিতে কেবল ঋষি ও গোত্রের নাম নিতান্ত বিশৃঙ্খলভাবেই পাওয়া যায়। এই বংশলতাগুলি মৌলিক নহে। অন্যান্য গ্রন্থ-প্রদত্ত তালিকার সংগ্রহ মাত্র। এই বংশলতা

রাজন্যবর্গের বংশলতার অনুকরণে অর্বাচীন কালে রচিত হইয়াছে। এগুলির সংগ্রহকারক সাধ্যমত কতকগুলি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। যদি প্রকৃত বংশলতার অস্তিত্ব না থাকিত এবং বংশগুলির খ্যাতি-প্রতিপত্তি না থাকিত, তাহা হইলে কৃত্রিম বংশলতা এবং ব্রাহ্মণবংশ কখনই রচিত হইতে পারিত না। রাজন্যবর্গের প্রকৃত বংশলতা ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন বংশের প্রকৃত তালিকা পাওয়া যায় না। এই রাজগণের সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই ক্ষত্রিয়দিগের বংশলতার অনুকরণে অপর কয়েকটি বংশতালিকা সৃষ্ট হইয়াছিল। কোন্ বংশতালিকা কৃত্রিম এবং উভয় তালিকার মধ্যে কি পার্থক্য তাহা উভয় বংশলতা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

রাজন্যবর্গের বংশলতা ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহারা ইহা ইচ্ছা করিয়া রক্ষা করেন নাই বা ব্রাহ্মণের কর্তব্য বলিয়াও এ কাজ করেন নাই। এগুলি রাজসভার কর্মচারী দ্বারাই রক্ষিত হইয়াছে। রাজার উত্তরাধিকারীর নামাদি অত্যাবশ্যক বলিয়া এগুলি রক্ষিত হইত। ইহাদিগের রক্ষার ভার রাজচারণদিগের উপরই ন্যস্ত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ ছিলেন সত্য, কিন্তু তাহারা যে সযত্নে এগুলির রক্ষাকার্যে সহায়তা করিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মণ বলিয়া নহে—রাজ-কর্মচারিরূপে তাঁহারা এগুলির রক্ষক ছিলেন। পুরাকালের ঋষিরা অথবা প্রকৃত ব্রাহ্মণেরা এই সকল সাংসারিক ব্যাপারে বেশী মনোনিবেশ করিতেন না—জগতের স্থায়ী উপকার সাধন করাই তাহাদের কর্তব্য কর্মরূপে পরিগণিত ছিল। তাহারা আপন বংশলতা রক্ষণ করিতে কখনই প্রয়াসী হন নাই। যদি এরূপ বংশলতা বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে যে ব্রাহ্মণেরা দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত শিক্ষার অধিকাংশ উপাদান সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তবে কি তাঁহারা তাঁহাদের বংশলতা রক্ষা করিতেন না? তাঁহারা কেবল প্রাচীন কবিগণের বংশলতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আর যখন দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণেরা সমগ্র বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র যাহা মুখে মুখে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার প্রতি অক্ষর স্মৃতির সাহায্যে সংরক্ষণ করিয়াছেন, তখন কি বিশ্বাস করিতে পারা যায় না যে, ব্রাহ্মণ, ভাট ও

চারণদিগের রক্ষিত বংশলতা সত্য? সুপণ্ডিত পার্জিটার সাহেব বহু গবেষণা করিয়া ভারতীয় প্রাচীন বংশাবলীর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি এইগুলি বিশ্বাস্য কি না তদ্বিষয়ে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিসমুদয় দিয়াছেন তৎসমুদয়ের অনুসরণ করিয়া আমরা বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছি। সকল দিক্ বিচার করিয়া বলিতে হয় যে, প্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশের তালিকাগুলি সত্য এবং উহা আমাদের নিকট সত্য বলিয়া গ্রহণীয় হওয়া উচিত। আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম তাহা যে সত্য তাহার অন্য একটি প্রমাণ এই যে, এইগুলির সাহায্যে সংস্কৃত সাহিত্য, আর্যদিগের ভারত-অধিকার এবং উত্তরভারত, পূর্বভারত ও দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে চন্দ্রবংশের বিস্তৃতি বেশ বুঝিতে পারা যায়।

[কায়স্থ-পত্রিকা, ১৩২৬ শ্রাবণ, পৃ. ১৩১-৩৯]

প্রসঙ্গ-কথা

1 পার্জিটার : 'অত্রি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

প্রাচীন সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ

বেদে কৃষ্ণ শব্দের উল্লেখ কয়েকবার আছে বটে, কিন্তু কৃষ্ণ শব্দে বেদে কোন্ পদার্থকে কোথায় লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা বিচার করিতে হইবে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৪ সূক্তের ৫ম ঋকে এক কৃষ্ণের কথা আছে—কিন্তু সেখানে শিকারী পক্ষী অর্থে কৃষ্ণ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

সুপর্ণা বাচমক্রতোপ দ্যব্যাখরে কৃষ্ণা
ইষিরা অনর্তিষুঃ।
ন্যঙ্নি যংত্যুপরস্য নিষ্কৃতং পুরূ রেতো
দধিরে সূর্যশ্বিতঃ॥

অথর্ববেদের (১১.২.২) এবং শাঙ্খায়ন আরণ্যকের (১২.২৭) দুই স্থানে এই অর্থেই কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। এইরূপ তৈত্তিরীয়-সংহিতা (৫.২ ৬.৫, ৬.১.৩.১) ও শতপথব্রাহ্মণে (১ ১.৪.১ ; ও ৩.২.১.২৮) মৃগ অর্থে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন কোন মহাত্মা তাঁহাদের উর্বর মস্তিষ্ক হইতে এই সমস্ত স্থানের কৃষ্ণকে ঋষি করিয়া তুলিয়াছেন। ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের ঋষি কৃষ্ণ। ইনি ৩য় ও ৪র্থ ঋকে আপনাকে কৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

'অয়ং বাং কৃষ্ণো অশ্বিনা হবতে
বাজিনীবসূ মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে।
শৃণুতং জরিতুর্হবং কৃষ্ণস্য স্তুবতো নরাঃ।
মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে।'

অনুক্রমণীকার বলেন, এই কৃষ্ণ আঙ্গিরস অর্থাৎ অঙ্গিরার বংশ্য। ৮ম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তের রচয়িতা কৃষ্ণের পুত্র 'কাষ্ণি' বা বিশ্বক। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋকে কৃষ্ণ শব্দ হইতে বৈদিক ব্যাকরণ অনুসারে 'কৃষ্ণিয়' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ মণ্ডলের ১১৭ সূক্তের ৭ ঋকে কৃষ্ণিয় আছে। ঋক্ দুইটি এই—

'অবস্যতে স্তবতে কৃষ্ণিয়ায় ঋজুয়তে নাসত্যা শচীভিঃ।

পশুং ন নষ্টমিব দর্শনায় বিষ্ণাপ্বং দদথুর্বিশ্বকায়॥'

'যুবং নরা স্তুবতে কৃষ্ণিয়ায় বিষ্ণাপ্বং দদথুর্বিশ্বকায়।

ঘোষায়ৈ চিৎ পিতৃষদে দুরোণে পতিং জুর্যন্ত্যা

অশ্বিনাবদত্তং।'

এই দুই ঋকে অশ্বিদ্বয় বিষ্ণাপুকে বিশ্বক কৃষ্ণিয়ের নিকট অর্পণ করিতেছেন। সুতরাং কৃষ্ণ বিষ্ণাপুর পিতামহ হইতেছেন। এই কৃষ্ণ এবং কৌষিতকী-ব্রাহ্মণোক্ত কৃষ্ণ অভিন্ন। কৌষিতকী-ব্রাহ্মণের কৃষ্ণ আঙ্গিরস - তবে ইনি আঙ্গিরস ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ঋত্বিক সম্পর্কে ইনি সাহ্মা হোম দর্শন করিয়াছিলেন। ইনি ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য।

ছান্দোগ্য-উপনিষৎ উপদেশ করিয়াছেন—

"তদ্ হ এতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা উবাচ আপিপাস এব স বভূব। সোঽন্তবেলায়ামেতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি।"

অতঃপর আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আর তিনিও পিপাসা-শূন্য হইলেন। "তুমি মরণকালে এই তিনটি মন্ত্রের আশ্রয় লইবে—এই তিনটি হইতেছে তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত।" ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—স এবং যথোক্তযজ্ঞবিদ্ অন্তবেলায়াং মরণকালে এতন্মন্ত্রত্রয়ং প্রতিপদ্যেত জপেদিত্যর্থঃ। প্রাণসংশিতং প্রাণস্য সংশিতং সম্যক্ তনুকৃতঞ্চ সূক্ষ্মং তত্ত্বং অসি।

কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয়-আরণ্যকেও কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে কৃষ্ণকে পুরুষমন্ত্রের শাস্তা উপদেষ্টারূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। কোথায় বা তিনি পুরুষযজ্ঞের যজ্ঞপুরুষ, এরূপ আভাস পাওয়া যায়।

পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলি আলোচনা করিয়া কৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহা এই—

বেদবর্ণিত কৃষ্ণ বলিলে, তাঁহার অধিক কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। বেদে যে কয় বার কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তাহাতে কৃষ্ণ বলিতে ঋষি মাত্র বুঝায়। দু-তিন স্থান ছাড়া সর্বত্র কৃষ্ণ ঋষি বলিয়াই পরিচিত। ঋগ্বেদের খিলসূক্তে কৃষ্ণ পরম পুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন বলিয়া খিলসূক্তের ভাষ্যকারগণ মনে করিয়া থাকেন। খিলসূক্ত (১০.১) বলিতেছেন—"কৃষ্ণ বিষ্ণো বাসুদেব হৃষীকেশ নমস্তু তে"। ঋগ্বেদ, কৌষিতকী-ব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্য-উপনিষদ কৃষ্ণকে আঙ্গিরস আখ্যা দিয়াছেন। পাণিনির ৪.১.৯৬ সূত্রে গণসম্পর্কে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ৪.১.৯৯ সূত্রে গণসম্পর্কে কার্ষ্ণায়ণ ও রাণায়ণ গোত্র নিষ্পত্তিকালে কৃষ্ণ ও রণ পদ দেওয়া হইয়াছে। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার মহাশয় বিশেষ যুক্তিদ্বারা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই—কার্ষ্ণায়ণ ও রাণায়ণ, এ দুইটি বশিষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ গোত্রমাত্র। এই গোত্রের কিংবদন্তী কিঞ্চিৎ পরবর্তিকালে বৌদ্ধদিগের মধ্যেও অপরিজ্ঞাত ছিল না। কেন না, বৌদ্ধগণ হিন্দুদিগের আখ্যায়িকার অনেক স্থলেই অদ্ভুত বিবৃতি প্রদান করিলেও কিংবদন্তী হিসাবে তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতেও কখন কখন দু-একটা তথ্যের কথা বলিয়াছেন। বৌদ্ধগ্রন্থে 'কৃষ্ণ' এই নামটি "কণ্‌হে" পরিণত হইয়াছে। শব্দশাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণ ও কণ্‌হ অভিন্ন। দীঘনিকায়[1] নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে (৩.১.২৩) কণ্হায়ন গোত্র ও কণ্‌হ ঋষির নাম আছে। "উড়ারো সো কণ্‌হো ইসি অহোসি" দীঘনিকায়ের এই কণ্‌হ ঋগ্বেদের ঋষি হইতেও পারেন। তবে তিনি আমাদের কৃষ্ণ কি না, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। ঘটজাতকে কৃষ্ণের যে কাহিনী আছে, তাহা যে বিকৃত আকারে আমাদের কৃষ্ণেরই, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। জৈন প্রবাদেও দেখা যায়, এই গল্পগুলি সাধারণের খুব প্রিয় ছিল। ইঁহাদের প্রাচীন গোষ্ঠীপতিদের মধ্যে বাসুদেব ও বলদেবের নাম আছে। কৃষ্ণ বাসুদেবদের মধ্যে কৃষ্ণ নবম ছিলেন [হেমচন্দ্রের[2] অভিধানচিন্তামণি, পৃ. ১২৪, অন্তগদ দসাও, পৃ. ১৩-১৫, ৬৭-৮২]। আর এই কৃষ্ণের দ্বারাবতী বা দ্বারকার সহিত সম্বন্ধও

নিরূপিত হইয়াছে। পরবর্তী কল্পে তিনি দ্বাদশ তীর্থঙ্কর হইবেন এবং তাঁহার বংশের দেবকী, রোহিণী, বলদেব ও জরকুমার পূর্বের ন্যায় অবস্থাপন্ন হইবেন। দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের বাহিরেও কৃষ্ণ-কথা অতি প্রিয় ছিল।

এই গোত্রের কথাই জাতকের ভাষ্যকার নির্দেশ করিয়া কৃষ্ণকে গোত্রনাম বলিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কার্ষ্ণায়ণ গোত্র ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়াছে। তারপর ছান্দোগ্য-উপনিষদের দেবকী-পুত্র কৃষ্ণ এই নাম। ইনি আঙ্গিরস যে ঘোর, তাঁর শিষ্য। যদি কৃষ্ণও আঙ্গিরস হন, আর এইরূপ হওয়াও অসম্ভব নয়, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, কৃষ্ণ যে ঋষি ছিলেন, তৎসম্বন্ধীয় প্রবাদ বা কিংবদন্তী ঋগ্বেদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ছান্দোগ্য-উপনিষদের সময় পর্যন্ত চলিয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গে কার্ষ্ণায়ণ নামে গোত্রও জনশ্রুতিমূলক ছিল। কৃষ্ণসমূহকে লইয়া কার্ষ্ণায়ণ—এই সমস্ত কৃষ্ণের মধ্যে যিনি আদিম কৃষ্ণ, তিনিই কৃষ্ণ গোত্রের স্থাপয়িতা বা প্রবর্তক। যখন বাসুদেব পরমপুরুষ পদবাচ্য হইয়া উঠিলেন, তখন হইতেই এই কিংবদন্তী ঋষি কৃষ্ণের সহিত বাসুদেবের অভিন্নত্ব স্থাপন করিয়াছে। কৃষ্ণ ও বাসুদেব যখন অভিন্নই হইয়া গেল, তখন শূর ও বাসুদেবের ভিতর দিয়া বৃষ্ণিবংশে তাঁহারও স্থান হইয়া গেল। জাতকের কৃষ্ণগোত্রদ্বারাই কৃষ্ণ নামের কারণ কেহ কেহ নির্দেশ করিয়া থাকেন। কার্ষ্ণায়ণ গোত্র যে কেবল বশিষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ গোত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা নয়, মৎস্যপুরাণে ২০০ অধ্যায়ে ইহা পারাশর পর্যায়েও ধৃত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি কার্ষ্ণায়ণ গোত্র ব্রাহ্মণ গোত্রই হইল, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ে বর্তাইল কি করিয়া? আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রের (১২.১৫) মতে ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞ কারণ এইরূপ গোত্র ক্ষত্রিয় গ্রহণ করিতে পারে।

স্যর ভাণ্ডারকার[3] আরও একটি নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, ক্ষত্রিয়ের গোত্র এবং স্মৃত পূর্বপুরুষদিগের গোত্রে তাঁহাদিগের সন্ধান পাওয়া যায়। ঘটজাতক (৪৫৪ সংখ্যক জাতক) ও মহাউম্মগ্গ-জাতক খ্রীস্টজন্মের বহু পূর্বের রচনা, ঐতিহাসিকগণ তাহা সপ্রমাণ করিয়া

দিয়াছেন। ঘটজাতকে একটি উপাখ্যান আছে। উপাখ্যানটিতে পাওয়া যায় যে, কংসের একজন ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম দেবগভ্ভা। সম্ভবত কেন, নিশ্চয়ই দেবকীর নামের এই দুর্দশা ঘটিয়া থাকিবে। ইঁহার স্বামীর নাম ছিল উপসাগর। বসুদেব কিরূপে উপসাগরে পরিণত হইলেন, তাহা বুঝা গেল না। যাহাই হউক, ইঁহাদের দুই পুত্রের নাম বাসুদেব ও বলদেব। এই দুই পুত্রকে অন্ধকবেণ্হু ও তদীয় পত্নী নন্দগোপার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। নন্দগোপা দেবগভ্ভার সখী ছিলেন। নন্দগোপা নিশ্চয়ই নন্দগেহিনী যশোদা। অন্ধকবেণ্হু দুইটি শব্দের সংযোগে নিষ্পন্ন --অন্ধক ও বৃষ্ণি—বৃষ্ণি অপভ্রংশ বেন্‌হু। এই দুইটি শব্দ দুইটি পৃথক্ জাতিকে বুঝায়। বলিতে পারি না, নন্দ কেমন করিয়া এই নাম পাইলেন। যাহা হউক, এই জাতকের কাব্যাংশে বাসুদেবের আরও দুইটি নাম আছে—কণ্‌হ ও কেশব। এই জাতকের ভাষ্যকারও খ্রীস্ট-পূর্বাব্দের ব্যক্তি। তিনি বলেন—প্রথম কবিতায় বাসুদেব তাঁহার গোত্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। কারণ, বাসুদেব কণ্‌হায়ণ গোত্রগত ছিলেন। সুতরাং এ হিসাবে বাসুদেবই কৃষ্ণের প্রকৃত নাম—তাঁহার গোত্রনাম কার্ষ্ণায়ণ গোত্রের বলিয়া তিনি কৃষ্ণ। মহাউম্মগ্‌গজাতকের ভাষ্যেও এই কথার পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে বাসুদেব কণ্‌হের পত্নীর নাম জম্বাবতী বলিয়াছেন। স্বয়ং বাসুদেব কণ্‌হ কণ্‌হায়ণ গোত্রীয়। বাসুদেবস্‌স কণ্‌স্‌স অর্থে তিনি বাসুদেবই প্রকৃত নাম বলিয়া কণ্‌হকে গোত্রনাম বলিয়াছেন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি পাণিনির উল্লিখিত কার্ষ্ণায়ণ গোত্রের ঋত্বিক্ বা পুরোহিতের গোত্রই হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়দিগের এইরূপ ঋষি পূর্বপুরুষগণ হয় মানব, না হয় ঐল বা পৌরুরবস হইবেন। ইঁহাদিগের নাম এক ক্ষত্রিয় বংশ হইতে অন্য ক্ষত্রিয় বংশের পার্থক্য সূচিত করিয়া দেয় না, তবে ঋত্বিক্‌দিগের গোত্র ও পূর্বপুরুষগণের নামের দ্বারা এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। যদি কৃষ্ণকে গোত্র নাম বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, বাসুদেব কার্ষ্ণায়ণ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যদিও এটি ব্রাহ্মণ ও পারাশর গোত্র। স্যর ভাণ্ডারকারের কৃষ্ণ নামের এই প্রমাণগুলি প্রণিধানযোগ্য বলিয়া সেইগুলির

উল্লেখ করিলাম। এই কৃষ্ণ নামে বরাবর পরিচিত হইয়া আসিয়া প্রাচীন কৃষ্ণের বিদ্যাবত্তা ও অধ্যাত্মধীষণাও তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে দেবকীপুত্র হওয়াতেও কিংবদন্তী সহায়তা করিয়াছে। কৃষ্ণের নামের কারণ যাহাই হউক, পরযুগে বাসুদেবই কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগ্রন্থাদির পর আমরা রামায়ণে কৃষ্ণকে দেখিতে পাই। রামায়ণের সময়ে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন নাই। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ বাল্মীকি কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিতেছেন। বাল্মীকি যখন রাম না হইতে রামায়ণ লিখিতে পারিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণ না হইতেও কৃষ্ণ নাম যে তিনি করিতে পারিবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ১১৯ অধ্যায়ে বেদবিদ ব্রহ্মা কাকুৎস্থ রামকে বলিতেছেন—

লোকানাং ত্বম্ পরো ধর্মো বিশ্বক্সেনশ্চতুর্ভুজঃ।
শার্ঙ্গধন্বা হৃষীকেশঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ।
অজিতঃ খড়্গাধৃগ্ বিষ্ণুঃ কৃষ্ণশ্চৈব বৃহদ্বলঃ॥

লোকসমূহের তুমি পরধর্ম। চতুর্ভুজ বিশ্বক্সেন; তুমিই শার্ঙ্গধন্বা, হৃষীকেশ, পুরুষ, পুরুষোত্তম, অজিত, খড়্গাধৃক্, বিষ্ণু—বৃহদ্বল কৃষ্ণ। রামায়ণের যিনি ভাষ্যকার, তিনি কৃষ্ণ শব্দে সর্বত্র "কৃষ্ণস্তুবর্ণ" বুঝিয়াছেন। সিদ্ধান্তীরা বলেন, ইহা ভবিষ্যদ্বাণী। ভগবান্ কৃষ্ণই জানেন ইহা কি? রামায়ণ আবার বলিতেছেন—

"সীতালক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।
বধার্থং রাবণস্য ত্বং প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্॥

সীতাদেবী লক্ষ্মী, তুমি বিষ্ণু, তুমিই প্রজাপতি, দেব কৃষ্ণ। রাবণের বধের জন্য তুমি মানুষী তনুতে প্রবিষ্ট হইয়াছ।

রামায়ণে সর্বত্র রামকে বিষ্ণুর সহিত এক, তাঁহা হইতে অভিন্ন করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপে মহাভারতেও কৃষ্ণকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। বিষ্ণু ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং পরবর্তী কালের বৈষ্ণব গ্রন্থেও কৃষ্ণ ও বিষ্ণু এক বলা হইয়াছে। দুই এক স্থলে কৃষ্ণকে বিষ্ণু হইতে সামান্য তত্ত্বত পৃথক্ করা হইয়াছে। যদিও বিষ্ণু ও ভাগবত-পুরাণে কৃষ্ণ দুই-একবার

বিষ্ণুর অংশাবতার বলিয়া বিবৃত হইয়াছেন, তথাপি তিনি সাধারণত বিষ্ণুর সম্পূর্ণ অবতার ও পরব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ভাগবতপুরাণ বলিতেছেন—

সংস্থাপনার্থায় ধর্মস্য প্রশমায়েতস্য চ
অবতীর্ণো হি ভগবান্ অংশেন জগদীশ্বরঃ।

মহাভারত বলেন—

যস্ত নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো মানুষেস্বাসীদ্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥

এইরূপ বিষ্ণুপুরাণও তাঁহাকে দুই-এক স্থলে অংশাবতার বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। ভাগবতের শ্লোকে 'অংশেন' তৃতীয়ান্ত পাঠ পাইয়া টীকাকার অংশের সহিত অর্থাৎ অন্যান্য অংশাবতারের সহিত এরূপ অর্থও করিয়াছেন। যাহা হউক, মহাভারতের কৃষ্ণ কিন্তু বড়ই জটিল। মহাভারতের নানা স্থানে কৃষ্ণ নানাভাবে চিত্রিত হইয়াছেন। ভগবদ্গীতার দার্শনিক অংশে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার স্বরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতের অন্যান্য স্থানে কোথাও বা তাঁহার ভগবত্তাকে ন্যূনীকৃত করা হইয়াছে, কোথাও বা ভগবত্তা সন্দিগ্ধ বা একেবারে অস্বীকৃত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে কৃষ্ণকে যোদ্ধা প্রভৃতি রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—ভগবত্ত্ব যেন তাঁহাতে আদৌ আরোপিত হয় নাই। এইজন্যই Wilson[4], Lassen[5], Schrader[6], প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন, যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি কর্মক্ষেত্রে তিনি সর্বত্র মানুষের ভূমিকাই অভিনয় করিয়াছেন —কোথাও দেবভাবের পরিচয় দেন নাই। তাঁহারা বলেন, বন্ধুর সাহায্যে বা শত্রুবিনাশে—তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় কোথাও নাই।

মহাভারতের বহু স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ মহাদেবকে পূজার্চনা করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতেছেন। তাঁহার নিকট হইতে বিবিধ বর লাভ করিতেছেন। মহাদেবের নিকট হইতে বহু অস্ত্রও প্রাপ্ত হইতেছেন।

অনেক স্থলেই কৃষ্ণ ও ঋষি নারায়ণ এক বলা হইয়াছে। কাহারও কাহারও অনুমান, বেদের ঋষি কৃষ্ণের ঋষিত্বের স্মৃতি—মহাভারত যুগেও

লুপ্ত হয় নাই। কারণ, মহাভারতের কৃষ্ণ ঋষি নারায়ণরূপেও পূজিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে, সম্ভবত ঋগ্বেদের এই স্মৃতি হইতেই মহাভারতের এই কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাকে ঋষি নারায়ণ বলিলেও কোথাও তিনি মহাভারতে সাধারণ মানুষরূপে অঙ্কিত হন নাই। যখন তিনি ঋষি নারায়ণ, তখন তিনি যুগের পর যুগ ধরিয়া জীবিত থাকিয়া অতিমানবতার পরিচয় দিয়াছেন। যখন তিনি পাণ্ডবের সখা ছিলেন, তখন তিনি ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিশুপাল, দুর্যোধন, কর্ণ ও শল্য কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নাই। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য মহাভারত কোন রূপে ক্ষুণ্ণ করে নাই।

মহাভারতের নারায়ণীয় পর্বে বাসুদেব-কৃষ্ণের কথা আছে, কিন্তু গোপাল-কৃষ্ণের কথা কিছুই নাই। কেবল এই মাত্র লিখিত আছে যে, কংস-নিসূদনের জন্য কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোকুলে তাঁহার অন্য বাল্যলীলার কথা কিছুই নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হরিবংশে (শ্লোক ৫৮৭৬–৫৮৭৮), বায়ুপুরাণ (৯৮ অঃ—১০০-১০২ শ্লোক, ও ভাগবতপুরাণে (২.৭) লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ গোকুলে যে সমস্ত অসুর আসিয়াছিল, তাহাদের বধের জন্য এবং কংস ধ্বংসের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মহাভারতের সভাপর্বে (৪১ অঃ) শিশুপাল কৃষ্ণের প্রতাপের কথা বলিতে বলিতে পূতনাদি বধের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু ভীষ্ম যখন কৃষ্ণের প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন (৩৮ অঃ), তখন একবারও পূতনাদি বধের কথা বলেন নাই।

পূর্বে আমরা স্যর ভাণ্ডারকারের দুইটি নূতন আবিষ্কারের পরিচয় দিয়াছি। তিনি 'গোবিন্দ' নামের হেতু নির্দেশ করিয়া কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা সেইগুলির সারনিষ্কর্ষ করিয়া দিতেছি।

ভগবদ্গীতায় ও মহাভারতের অন্যান্য অংশে "গোবিন্দ" নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এটি খুব প্রাচীন নাম। পাণিনির ৩.১.১৩৮ সূত্রের বার্ত্তিক দ্বারা ইহা নিষ্পাদিত হয়। যদি কৃষ্ণের গোকুলদিগের সহিত সম্পর্ক থাকার

জন্য তাঁহার গোবিন্দ নাম হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার গোবিন্দ নামের ব্যুৎপত্তিগত সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতের আদি-পর্বে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ বরাহ আকারে জল আন্দোলন করিয়া জলে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম গোবিন্দ হইয়াছে (অঃ ২১.১২)। আবার শান্তিপর্বে দেখা যায় (৩৪২ অঃ ৭০)—বাসুদেব বলিতেছেন—দেবগণ আমাকে গোবিন্দ বলে, যেহেতু আমি পূর্বে নষ্ট পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং গুহাবাসী ছিলাম। এই ব্যাপারও গোবিন্দ নামের কারণ হইতে পারে। কিন্তু সম্ভবত "গোবিন্দ" খাতা ঋগ্বেদে গোসমূহের উদ্ধারকর্তা-রূপে ইন্দ্রকে বলা হইয়াছে, পরে বাসুদেব-কৃষ্ণ দেবাদিদেব বলিয়া পূজিত হইলে তিনি 'গোবিন্দ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। কেশিনিসূদন ইন্দ্রের অপর একটি নাম ছিল—ইহাও পরে বাসুদেব-কৃষ্ণের উপর আসিয়া পড়ে।

কবি ভাস[9] চাণক্যের[8] প্রায় সমকালবর্তী। শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল[9], শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায়[10] প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্তৃক তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইঁহার রচিত নাটকে শ্রীকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ, নন্দ, যশোদা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ভাসও গোপাল-কৃষ্ণের বন্দনা করিয়াছেন। ভাসের কাব্য হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, গোপালকৃষ্ণ খ্রী-পূ. পঞ্চম শতাব্দীতে পূজিত হইতেন। ইহার পর পতঞ্জলির[11] মহাভাষ্যে বাসুদেব কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই। পাণিনির ৩.১.২৬ সূত্রের কাত্যায়ন[12] বার্ত্তিক করিয়াছেন, "আখ্যানাৎ কৃতস্তদাচষ্টে কৃল্লুক্প্রকৃতিপ্রত্যাপত্তিঃ প্রকৃতিবচ্চ কারকম্।" ইহারই মহাভাষ্য করিয়া পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"ভবেদিহ বর্তমানকালতা যুক্তা স্যাদুজ্জয়িন্যাঃ প্রস্থিতো মাহিষ্মত্যাং সূর্যোদ্গমনং সাংভাবয়তে সূর্যমুদ্গময়তীতি। তত্রস্থস্য হি তস্যাদিত্য উদেতি। ইহ তু কথম্ বর্তমানকালতা কংসং ঘাতয়তি বলিং বন্ধয়তীতি চির হতে চ কংসে চিরবদ্ধে চ বলৌ। অত্রাপি যুক্তা কথম্। যে তাবদত্র শৌভিকা নামৈতে প্রত্যক্ষং কংসং ঘাতয়ন্তি প্রত্যক্ষং চ বলিং বন্ধয়ন্তীতি। চিত্রেষু কথম্। চিত্রেষু অপ্যুদ্গূর্ণা নিপতিতাশ্চ প্রহারা দৃশ্যন্তে কংসস্য চ কৃষ্ণস্য চ। গ্রন্থিকেষু কথং যত্র শব্দগ্রথনমাত্রং লক্ষ্যতে।

তেপি হি তেষাম উৎপত্তিপ্রভৃত্যাবিনাশাদৃদ্ধীর্যচক্ষাণাঃ সতো বুদ্ধিবিষয়ান্ প্রকাশয়ন্তি। আতশ্চ সতঃ। ব্যামিশ্রা দৃশ্যন্তে। কেচিৎ কংসভক্তা ভবন্তি কেচিদ বাসুদেবভক্তাঃ। বর্ণান্যত্বং খল্বপি পুষ্যন্তি। কেচিৎ কালমুখা ভবন্তি কেচিৎ রক্তমুখাঃ। ত্রৈকাল্যং খল্বপি লোকে লক্ষ্যতে। গচ্ছ হন্যন্তে কংসঃ। গচ্ছ ঘানিষ্যতে কংসঃ। কিং গতেন হতঃ কংস ইতি।

মহাভাষ্যের এই উক্তি হইতে চারিটি বিষয় প্রমাণিত হইতেছে।

১। কংসের মৃত্যুর কথা এবং বলির বদ্ধতার কথা পতঞ্জলির সময়ে জনসাধারণ সকলেই জানিত। ইহাদের কাহিনী পতঞ্জলির সময়ে প্রচলিত ছিল।

২। এই আখ্যায়িকায় কৃষ্ণ বা বাসুদেবকে কংসহত্যাকারী বলিয়া উক্ত আছে।

৩। পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে যেমন অভিনয় হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সমস্ত আখ্যায়িকা লইয়া নাটকাভিনয় হইত।

৪। কৃষ্ণের হস্তে কংসের হত্যা পতঞ্জলির সময়ে বহু প্রাচীন ঘটনা বলিয়া বিদিত ছিল।

৩. ২. ১১১ সূত্রের মহাভাষ্যে একটি প্রত্যুদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে—"জঘান কংসং কিল বাসুদেবঃ" পূর্ব সূত্রের অনুবৃত্তি হইতে বুঝা যায় যে, এই ঘটনা পতঞ্জলির সময়ে সাধারণে জানিত, ইহা অতি প্রাচীন। বক্তার সময়ে কখনও এ ঘটনা ঘটে নাই।

২. ৩. ৩৬ সূত্রের ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাতুল কংসের সহিত কৃষ্ণের সদ্ভাব ছিল না। "অসাধুর্মাতুলে কৃষ্ণঃ।"

২. ২. ২৩ সূত্রভাষ্য বলিতেছে, সঙ্কর্ষণের সাহায্যে কৃষ্ণের বল বৃদ্ধি পাইতে থাকুক।—"সঙ্কর্ষণদ্বিতীয়স্য বলং কৃষ্ণস্য বর্ধতাম্।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সঙ্কর্ষণ তাঁহার নিত্য সহচর ছিল।

অক্রূর যে কৃষ্ণ আখ্যায়িকায় একজন বিশিষ্ট নায়ক ছিলেন, তাহাও —(৪. ৩. ৬৪) অক্রূরবর্গ্য, অক্রূরবর্গিনঃ, বাসুদেববর্গ্য, বাসুদেববর্গিনঃ —হইতে বেশ বোঝা যায়।

৪. ৩. ৯৮ সূত্রভাষ্যে পতঞ্জলি দেখাইয়াছেন যে বাসুদেব যে শুধু ক্ষত্রিয় ছিলেন, তা নয়; তিনি দেবতারূপে পূজিত হইতেন। সূত্রনিটক[১৩] বৌদ্ধদিগের অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে কৃষ্ণের কথা আছে। সেই কৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ তথা বাসুদেবকৃষ্ণ। এই গ্রন্থখানি যে খ্রীস্ট জন্মিবার পূর্বের গ্রন্থ তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। ললিতবিস্তারের[১৪] ১১ অঃ কৃষ্ণের কথা আছে। গাথা সপ্তশতী খ্রীস্টীয় ১ম শতকের গ্রন্থ। ইহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে।[১]

পাদটীকা

(১) এটি একটি সংগ্রহ প্রবন্ধ। কয়েকটি স্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ইহা লিখিত। এ সম্বন্ধে আমি বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি, স্থানাভাবে সেগুলি ইহাতে সন্নিবেশিত হইল না। ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।—লেখক।

['যমুনা' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ পৃ. ৫ : —৬৩]

প্রসঙ্গ-কথা

1 দীঘনিকায় : বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ। বুদ্ধবচনের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ, তার মধ্যে নিকায় বা আগম একটি। এই নিকায় বা আগম অনুসারে পাঁচটি—দীঘনিকায় বা দীঘাগম অন্যতম গ্রন্থ। ইহা পালি ত্রিপিটকভুক্ত।—বৌদ্ধকোষ।

2 হেমচন্দ্র (সূরি) (১০৮৮—১১৭৪ খ্রী.) : বিখ্যাত পণ্ডিত। গুজরাতের অর্ধষ্টম প্রদেশের (আধুনিক আমেদাবাদ) অন্তর্গত ধন্ধুক (ধুঁধুকা) গ্রামে বৈশ্যবংশে জন্ম। পিতা—চাচিঙ্গ, মাতা—পাহিনী। শৈশবে নাম চংদেব। ৮ বছর বয়সে জৈনাচার্য দেবচন্দ্র সূরি ১০৯৬ খ্রী. এঁকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। চংদেব উদয়নের তত্ত্বাবধানে বিদ্যাশিক্ষা করেন। একুশ বছর বয়সে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে জৈনাচার্য তাঁকে হেমচন্দ্র অর্থাৎ 'সোনার চাঁদ' বলে সূরি উপাধি দেন। চালুক্যরাজা কুমারপালের গুরু ও তাঁর প্রধান সভাপণ্ডিত হন। বাহ্যত জৈনধর্মাবলম্বী হলেও তিনি অন্তরে হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থাপরায়ণ ছিলেন। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ও ধুরন্দর বিদ্বান হওয়ার জন্য এঁকে কলিকালসর্বজ্ঞ বলা হয়। কুমারপালের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ—প্রাকৃত ব্যাকরণ, সিদ্ধবাক্যানুশাসন, অভিধানচিন্তামণি (অভিধান), কাব্যানুশাসন, অনেকার্থসংগ্রহ, দেশীনামমালা, ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষ-চরিত, সিদ্ধহেম, শব্দানুশাসন, ছন্দানুশাসন, প্রমাণ-মীমাংসা, পরিশিষ্টপর্বণ, যোগশাস্ত্র ই.।—রামদাস সেন : ঐতিহাসিক রহস্য (১৯০২)।

3 ভাণ্ডারকার, স্যর রামকৃষ্ণ গোপাল (1837—?) : 'পাণিনি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.।

4 Wilson : 'অথর্ববেদ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

5 Lassen, Christian : 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

6 Schrader, Otto : 'অনার্য' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

7 কবি ভাস (২-৩য় শতাব্দী) ঃ প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাট্যকার। কালিদাসের পূর্ববর্তী, সম্ভবত দাক্ষিণাত্যে জন্ম। ইনি দশ খানি নাটক প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে স্বপ্নবাসবদত্তা (কাব্য-নাটক), প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ প্রসিদ্ধ।—সনৎস্থ.

8 চাণক্য (কৌটিল্য) ঃ 'বৌদ্ধ-যুগে শিল্পশিক্ষা' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

9 কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল ঃ 'ভারতীয় অক্ষরের প্রাচীনত্ব' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

10 সারদারঞ্জন রায় (১৮৫৭—১৯২৫) ঃ শিক্ষাব্রতী ও টীকাকার। মৈমনসিংহে জন্ম। অধ্যাপক—আলিগড় এম এ ও কলেজ, হেতমপুর কলেজ, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ ও অধ্যক্ষ, মেট্রোপলিটন কলেজ (১৯০৯)। টীকা সহ গ্রন্থ প্রণয়ন—কিরাতার্জুন, শকুন্তলা, ভট্টি, উত্তর রামচরিত ই.। —সা.-স.-ম.

11 পতঞ্জলি (৩—২য় খ্রী-পূ.) ঃ মহাভাষ্যকার। গোণ্ডানগরে জন্ম। শুঙ্গবংশীয় রাজা পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক। অনুমান ১০৫ খ্রী-পূ. তিনি বিদ্যমান ছিলেন। পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে পৌরোহিত্য করে-ছিলেন।—সনৎস্থ.

12 কাত্যায়ন (বররুচি) ঃ বার্তিককার। ৫—৪র্থ খ্রী-পূ. কাত্যায়ন বররুচি দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু উত্তর-ভারতে ভগবান্ উপবর্ষের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি পাণিনির সূত্রের বার্তিক প্রণয়ন করেন। সম্ভবত তিনি মহানন্দের মন্ত্রী ছিলেন।—সনৎস্থ.

13 সূত্রপিটক ঃ ত্রিপিটকের প্রথম ভাগ। এই সূত্রপিটকে বুদ্ধদেবের বাক্য বা কার্যাবলী বর্ণিত আছে।

14 ললিতবিস্তর ঃ বৌদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ মহাযান সম্প্রদায়ের অবশ্য-পাঠ্য। বিশেষভাবে পবিত্র বুদ্ধের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে।

মহাকাব্যযুগে শিক্ষার ধারা

বৈদিকযুগে যে ধারায় শিক্ষা চলিয়াছিল তাহাই নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়া সূত্রযুগে পৌছিয়াছিল। সূত্রযুগের শিক্ষা-পদ্ধতি রামায়ণ ও মহাভারতকালে একরূপ অক্ষুণ্ণই ছিল। গৃহ্যসূত্রগুলিতে ছাত্র-জীবনের চিত্র বেশ উজ্জ্বল, সম্যক্ পরিস্ফুট। এই সূত্রগুলিতে চতুরাশ্রমের প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক সময়ের কার্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে ধারাবাহিক উপদেশ আছে। ছাত্রজীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটির একটুও বাদ পড়ে নাই।

সন্তান-জন্মের পর দেড়মাসকাল মাতা অশুচি থাকেন। এ সময়ে তাহার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। শিশুকে এই সময়ে অতি সাবধানে রাখা প্রয়োজন। জাতকর্মের পর মাতা ও শিশু শুদ্ধ হন। নিষ্ক্রমণের সময় শিশুকে উন্মুক্ত স্থানে আনিয়া বিশ্বপ্রকৃতির সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া হয়। একবর্ষ পূর্ণ হইলে উন্মুক্ত স্থানে চাঁদের আলোতে শিশুর অন্নপ্রাশন হয়। তিন বা পাঁচ বৎসর বয়সে তাহার চূড়াকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। তারপর বিদ্যালয়ের সহিত তাহার পরিচয়। এই বিদ্যালয় হইতেই তাহার খুব বাধাধরা জীবনের আরম্ভ হয়। ভোর হইতে না হইতেই তাহাকে শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে হয়। তারপর সকল কাজ একটা বাঁধাধরা নিয়মের উপর করিতে হয়। দাঁতমাজা নিয়মিত হওয়া চাই—আহার, শয়ন, সবই নিয়মিত হওয়া চাই। এখন হইতে ধর্মকথা উপকথাচ্ছলে তাহার মনে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। আর এই সময় হইতেই সহজ ধর্মভাব তাহার মন অধিকার করে। ইহার মূল্য যে কত আজিকার দিনে তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি হইতেছে।

গৃহে এই প্রথম জীবনে শিশু মাতার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করে যে, প্রকৃতির সকল কিছুর সহিত তাহার আন্তরিক ঐক্য আছে। প্রকৃতির

সহিত তাই সহজ মিলের জন্যই তাহার জীবনও সহজ হয়। ক্রমশ সে গৃহপালিত সকল জীবের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করে, গল্পচ্ছলে গাছ-পাতা জীবজন্তু তাহার মনের কোণে বাসা বাঁধে—এগুলিও তাহার জীবনের একটি অংশ হইয়া ওঠে। সে নিজের মনে বুঝিয়া ফেলে—ইহাদেরও প্রাণ আছে, সুখ-দুঃখ আছে ; ইহারা তাহারই মত বাঁচিয়া আছে। প্রকৃতির অন্তরে যে দেবতা আছে সেই ভগবান্‌কে—নদী, পর্বত, ঝটিকা-ঝঞ্ঝার কাহিনী ধীরে ধীরে তাহার সহিত পরিচয় করাইয়া দেয়। সন্তানপালনে পিতামাতার দায়িত্ব যে কত তাহার সীমা নাই। এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, শৈশব হইতে শিশুকে ঘর-সংসারের পক্ষে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইত না। তাই তাহাকে তেমন কোন শিল্প-শিক্ষা দেওয়া হইত না। তাহাকে শুধু মানুষ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইত।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার তালিকা ছিল এইরূপ—লিপি, স্মৃতি, শব্দার্থ ও শব্দের পরস্পরের সম্বন্ধ (নিঘণ্টু), ব্যাকরণের মোটা মোটা কথা ইত্যাদি।

বর্ণানুসারে দীক্ষার বয়স নিরূপিত হইত। ব্রাহ্মণ-সন্তান ৮ হইতে ১৬, ক্ষত্রিয় ১১ হইতে ২২ এবং বৈশ্য ১২ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে দীক্ষা গ্রহণ করিত। আশ্বলায়ন, সাঙ্খ্যায়ন, পারস্কর ও গোভিল-গৃহ্যসূত্রে দীক্ষাগ্রহণের বয়সের নিয়ম আছে। বৎসর-বিশেষে দীক্ষা-গ্রহণের একটা ব্যাখ্যাও ছিল। আপস্তম্ব বলেন ৭ বৎসরে দীক্ষায় বিদ্যোন্নতি হয়, ৮ বৎসরে দীর্ঘ জীবন, আর ৯ বৎসরে দীক্ষা হইলে প্রচুর বল ইত্যাদি লাভ হয়।

দীক্ষার সময় হইতে নব-জীবনের আরম্ভ। তখন আর পিতা-মাতা পুত্রের পাপের শাস্তি বা প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিবেন না। অবশ্য এমন নির্দেশও আছে যে, ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত দীক্ষিত নিজ প্রায়শ্চিত্তের অর্ধ পরিমাণমাত্র পালন করিবে এবং তারপর হইতে পূর্ণ মাত্রায় পালন করিবে। এরূপও দেখা যায় যে ১১ বৎসর বয়স হইতেই তাহার সত্তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইয়াছে।

দীক্ষার সময় বালকটিকে লইয়া একটি সামাজিক ভোজ হইত। বালকটির ক্ষৌরকার্য হইত এবং তারপর তাহাকে স্নান করাইয়া দিয়া একখানি নূতন বস্ত্র পরাইয়া দেওয়া হইত। এই বস্ত্রখানি কিন্তু যে-সে বস্ত্র হইলে চলিত না। একদিনের মধ্যে তুলা ধুনিয়া তাহা হইতে সূতা কাটিয়া

এবং সেই দিনের মধ্যেই বস্ত্রবয়ন সমাপ্ত করা হইত। এইরূপ কাপড়ই তাহার পরিধেয় হইত। এই যুগে বস্ত্রবয়ন সর্বসাধারণ গৃহ-শিল্প ছিল, আর গৃহবাসী সকলের বস্ত্রের ভার রমণীদের উপর ছিল। তখন সঙ্গীত সকলেই শিক্ষা করিত। সঙ্গীতের আনন্দধ্বনিতে সকল গৃহই মুখরিত থাকিত। তরুণ ব্রহ্মচারীকে একটি কটি-বেষ্টনী দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণ হইলে সেটি হইত পবিত্র তৃণের, ক্ষত্রিয় হইলে জ্যারজ্জুর এবং বৈশ্য হইলে সেটি পশমের হইত। তাহাকে একটি দণ্ডও দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণ হইলে সেই দণ্ডের দৈর্ঘ্য হইত নাসিকা পর্যন্ত, ক্ষত্রিয় হইলে কপাল পর্যন্ত এবং বৈশ্য হইলে মস্তক পর্যন্ত। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ হইলে দণ্ডটি হইত বিল্ব কিংবা পলাশ বৃক্ষের, যদি সে ক্ষত্রিয় হইত, তাহা হইলে দণ্ডটি হইত ন্যগ্রোধের, আর বৈশ্যের ব্যবহার্য ছিল উদম্বর বা অশ্বত্থের দণ্ড। বস্ত্র-সম্বন্ধেও এইরূপ বিচার ছিল। দীক্ষার সময় বালকের নূতন নামকরণ হইত। ধর্মশাস্ত্রগুলিতে বালকের জন্য এই সময় বহু উপদেশ পাওয়া যায়। সকল উপদেশের সার কথা ছিল দেহ ও মনের উন্নতি। ধর্মশাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, 'দিবসে ঘুমাইও না, মানসিক উন্নতির জন্য দৃঢ়মন হও।' এই ব্রহ্মচারি-জীবনের সকল খুঁটিনাটি বিষয়ে উপদেশ আছে। যথা—দিনে ৫ বার মুখ ধুইতে হইবে, শয়নের পূর্বে বস্ত্র পরিবর্তন করিতে হইবে, মাংস খাইতে পারিবে না, সন্ধ্যায় নিদ্রায় আয়ু হানি করে, ব্রহ্মচর্য অবশ্য পালনীয়, জিহ্বা কখন যেন মিথ্যা উচ্চারণ না করে। ব্রহ্মচারীর কঠিন জীবনে প্রয়োজনীয় সকল উপদেশই দেওয়া হইত। দারিদ্র্য, ব্রহ্মচর্য, দয়া ও নম্রতার ব্রত গ্রহণের জন্যই এই ব্রহ্মচারীর জীবন। সবিতার নিকট প্রার্থনা করা হইত, জীবন যেন সার্থক হয়। এই সবিতৃ-উপাসনা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বর্ণানুসারে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দে গাহিয়া গাহিয়া করিতে হইত।

এই দীক্ষার নাম ছিল উপনয়ন। বৈদিকযুগে ইহার অস্তিত্ব থাকিলেও ব্রাহ্মণে উপনয়নের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এইরকম আচারের ব্যবস্থা অবেস্তায়ও আছে। তবে অবেস্তায় দীক্ষার বয়স কিছু বেশী এবং গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ ১৮ মাস হইতে ৩ বৎসর পর্যন্ত।

শিষ্যকে ভিক্ষা করিতে হইত। গুরুর প্রয়োজনীয় সকল জিনিসও

সংগ্রহ করিতে হইত। তাহাকে এমনিভাবে জীবনযাপন করিতে হইত যাহাতে তাহার জিহ্বা, হস্ত এবং উদর তাহার বশে থাকে। তাহাকে সতত সাবধানে থাকিতে হইত। বেশী কথা, পরনিন্দা, দ্যূত, নিষিদ্ধ খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে সে সকল সময় অবহিত থাকিত। নৃত্য, উৎসব, জনতা ইত্যাদি তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ স্থান ছিল। কিন্তু সকলে সকল সময় এত খুঁটিনাটির ব্যাপারে নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিত না। ত্রুটি হইয়া পড়িত। সেগুলি ক্ষন্তব্য ছিল। কিন্তু ব্রহ্মচর্যের চ্যুতি ঘটিলে তাহার নিস্তার ছিল না। একটি গর্দভ বলি দিয়া তাহাকে ঐ গর্দভের চর্ম পরিধান করিতে হইত। তাহার উপর লেজটি ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া পূর্ণ এক বৎসর তাহাকে নিজ পাপ-ঘোষণা করিয়া ভিক্ষা করিতে হইত। এই সময় ব্রহ্মচর্যই শিক্ষার ভিত্তি ছিল। বেদের ন্যায় বেদান্ত ও সকল গৃহ্য-সূত্রই ব্রহ্মচর্যকে শিক্ষার ভিত্তি বলিয়াছে। বেদাধ্যয়নের কালও নিরূপিত ছিল। মনের উৎকর্ষ যেমন লক্ষ্য ছিল, দৈহিক ব্যায়াম-প্রাচুর্যও তখন শিক্ষাজীবনে দেখা যাইত। শিক্ষার নীতি এই ছিল যে কামোত্তেজক বিলাসিতার নামগন্ধ শিক্ষা-জীবনে থাকিবে না।

প্রচুর অনধ্যায় দিবসের পরিচয় পাওয়া যায়। আরম্ভে ও শেষে তিন রাত্রি, অষ্টকে ও ঋতুশেষে এক দিন ও এক রাত্রি অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। প্রতিপদ, চতুর্দশী ও পূর্ণিমায় অধ্যয়ন হইবে না। মেঘাকুল আকাশ ও বজ্রগর্জনে দেড় দিন পাঠ বন্ধ। শিষ্যের অপবিত্রতার কারণ, স্থানীয় রোগ বা মৃত্যু ঘটিলে অনধ্যয়ন।

বহু প্রকারের শিক্ষকের পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষকের গুণ-নির্দেশক বচনও অনেক পাওয়া যায়। গুরুর দায়িত্ব যে কত বেশী বারবার তাহা বলা হইয়াছে। আচার্যই সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তিনি শিক্ষার জন্য কোন বেতন বা অর্থ গ্রহণ করিবেন না। ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে বিদ্যা-দানের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ-রূপ নিয়মের পরিচয় কোথাও আছে বলিয়া আমার জানা নাই; গুরু আচার্যের সমান বিদ্বান্—তিনি শিষ্যের নৈতিক উন্নতির জন্য বিশেষ মনোযোগী। উপাধ্যায়কে কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানের জন্য হয়তো সামান্য অর্থ গ্রহণ করিতে হইত। আর

যাহার নাম শিক্ষক তিনি নৃত্যাদি শিক্ষা দিতেন। শিক্ষা-বিষয়ে যে কোন গোঁড়ামি ছিল না তাহা বেশ বুঝা যায়। পাণিনি গুরুর যে শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন তাহাতে আস্তিক, নাস্তিক ও দৈশিক সকলেই গুরু হইতে পারিতেন। বিদ্যার জন্য নাস্তিক গুরুকরণে কোন বাধা ছিল না। সন্দেহবাদী, বিদ্বান্ দৈশিক গুরুরও শিক্ষাদানে অধিকার ছিল। গুরুও শিষ্যগ্রহণ করিতেন পরীক্ষা করিয়া। সকল শিক্ষা যে সকলে গ্রহণ করিতে পারিবে এমন বিশ্বাস তাঁহাদের ছিল না। পাত্র-ভেদে যে শিক্ষার বিভিন্নতা হইবে, এ বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান ও ধারণা ছিল। উচ্চ শিক্ষা যে সকলে গ্রহণ করিবার যোগ্য নয় তাহা তাঁহারা ভাল করিয়াই জানিতেন। কাহাকে কাহাকে উচ্চ শিক্ষা দিতে হইবে মনুতেও তাহার ব্যবস্থা আছে। নারী এবং শূদ্রের সাধারণত উচ্চ শিক্ষার যোগ্য নয় বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। নারীর মস্তিষ্ক নরের অপেক্ষা সাধারণত আধ পোয়া কম। তাহার বুদ্ধিবিষয়ক শিক্ষা পুরুষের সঙ্গে এক হইতে পারে না। তাহাদের জীবনও তাহাতে বিশেষ বাধা দিবে। সেকালের শূদ্রের সংস্কৃতির অভাব স্বীকার করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু তখনও বিদুষী নারী ও জ্ঞানী শূদ্রের মাঝে মাঝে পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধসাহিত্যে তাহাদের বিশেষ পরিচয় ঘটে। হিন্দুশাস্ত্রেও আছে নীচ কুলের ব্যক্তির নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিতে পারা যায়। বিদুরকে গুণিজনশ্রদ্ধেয় বলিয়া মহাভারত পরিচয় দিয়াছেন।

গুরু শিষ্যের পিতৃস্থানীয়। তাহারা পরস্পরকে রক্ষা করিবে, তাই শিষ্যকে বলা হইয়াছে ছাত্র।

অশ্রদ্ধেয় লোকে জীবিকা-নির্বাহার্থ গুরু হইয়াছেন এরূপ উদাহরণও পাওয়া যায়। আবার সাংসারিক কোন সুবিধার জন্য অথবা বিশেষ কোন লাভের জন্য ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে এমন লোকেদেরও কথা শোনা যায়। তীর্থকরেরা[১] বারংবার গুরু বদল করিত। ওদনপাণিনীয়রা[২] পাণিনি পাঠ করিত শুধু জীবিকার জন্য। ঘৃত-রূঢ়ি এবং কম্বলচারায়ণীয়রা ঘৃত বা কম্বল লাভের জন্য ছাত্র হইত। কেহ কেহ আবার ছাত্রজীবন পূর্ণ হইবার পূর্বেই শিক্ষা ত্যাগ করিত। যাহারা এরূপ করিত, তাহাদের বলা হইত খট্বারূঢ়।

অযোগ্য গুরুত্যাগে কোন বাধাও ছিল না। গুরুর বিদ্যার অভাব বা তাঁহার অনাচারে তাঁহাকে ত্যাগ করা হইত। শিষ্যকে মাত্র নিজের সুবিধার জন্য যদি গুরু অবজ্ঞা করেন এবং তজ্জন্য শিক্ষাদানে ত্রুটি ঘটে, তিনি যদি শাস্ত্রানুসারে বিদ্যানুশীলনে অবহেলা করেন, যাগযজ্ঞ-বিষয়ে অমনোযোগী বা কোন ঘোর পাপ করেন, তাঁহাকে ত্যাগ করিতে বাধা নাই। বিশেষ বিষয়ে বিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ পৃথক পৃথক গুরুর নিকট শিক্ষা-গ্রহণেও বাধা ছিল না।

বহু শিষ্য গুরুর গৌরবের কারণ বলিয়া গণ্য হইত। উপনিষদের যুগ হইতেই বহু শিষ্যের জন্য প্রার্থনার দৃষ্টান্ত বহুবার পাওয়া গিয়াছে। রাজা, ধনী ও সর্বসাধারণ সকল সময়েই শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন, আর এই জন্যই বোধ হয় এদেশে চিরকাল অবৈতনিকভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইত. কিন্তু শিক্ষানীতি সম্বন্ধে পৃষ্ঠপোষকদের কোনই হাত ছিল না। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'। এই ব্যাপারটা আমরা বেশ বুঝি, যখন দেখি ভারতবর্ষে রাজা মাত্র একজন বিচারক। স্মৃতি বা আইন তিনি গড়েনও না ভাঙ্গেনও না। রাজা তুলাদণ্ডে বিচার-ব্যবস্থা করেন মাত্র। শ্রুতি ও স্মৃতির তিনি পালকমাত্র, স্রষ্টা নহেন। পশ্চিমের সকল দেশে রাজা বিধি-সৃষ্টি করেন; সেই বিধিকে রাজার বিধি বলা হয়। রাজাকে বিধির উপরে জ্ঞান করা হয়। তিনি ইচ্ছামত বিধি ভাঙ্গিতেও পারেন, নববিধি সৃষ্টি করিতেও পারেন।

সাধারণের শিক্ষা হইতে রাজার ছেলেদের শিক্ষায় কিছু পার্থক্য ছিল। সেরূপ থাকাও স্বাভাবিক। রাজার জীবনের উপযুক্ত হইবার বিশেষ শিক্ষাই রাজপুত্রদের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য।

কৌটিল্য একটি পাঠ্য-তালিকা দিয়াছেন; তাহা প্রধানত রাজপুত্রদের জন্য। উপনয়নের পরেই, ত্রিবেদ-শিক্ষার আরম্ভ হইত। এখানে বেদ বলিলে বেদের ব্যাখ্যা এবং বেদ-সংযুক্ত অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বুঝাইত। এইরূপ শিক্ষাকেই দিব্যাবদানে[3] নিঘণ্টু ও কেটুভ বলা হইয়াছে। তারপর শিষ্ট ব্যক্তির অধীনে আন্বীক্ষিকী পাঠাভ্যাস। আন্বীক্ষিকী বলিলে সাংখ্য, যোগ, লোকায়ত এবং সাধারণ দর্শন-শাস্ত্র, মনঃসংযম ও পৃথিবীর উৎপত্তি

সম্বন্ধে মত প্রভৃতি বুঝাইত। কৌটিল্য এই শিক্ষার উপর জোর দিয়াছেন। ইহাতে সর্ববিষয়ে ধারণাশক্তি বাড়ে এবং এই শিক্ষার পর, পরে অন্য কোন বিশেষ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করা কঠিন হয় না। অতঃপর রাজপুত্রদের বিশেষ করিয়া শিক্ষার বিষয় ছিল বার্ত্তা এবং দণ্ডনীতি। বার্ত্তার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—কৃষিজ্ঞান, গৃহপালিত পশু-তত্ত্ব, (বিশেষত কি প্রকারে উত্তম-উত্তম শাবক সৃষ্টি করা যায়) এবং পণ্য-দ্রব্য-তথ্য। এইসকল বিষয়ের সেই সময়কার কোন বই আজকাল পাওয়া যায় না। কিন্তু কৌটিল্য অন্যের মতবাদের সহিত নিজের মতবাদের বারবার তুলনা করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় এইসকল বিষয়ে তখন শাস্ত্র ছিল। দণ্ড-নীতি বলিলে সম্পূর্ণ রাষ্ট্র-নীতিই বুঝাইত। ইহার তত্ত্ব বা নীতি শিক্ষা দিতেন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ; আর বড় বড় রাজপুরুষদের নিকট ইহার ব্যবহারিক শিক্ষা পাওয়া যাইত। রাজ্যের বড় বড় অধ্যক্ষেরা রাজপুত্রদের শিক্ষক হইতেন।

চূড়াকরণের পরই অক্ষর পরিচয় (লিপি) এবং অঙ্ক (সংখ্যান) শিক্ষার আরম্ভ হইত। ৩ বৎসর হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে ইহার উপযুক্ত কাল ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা উপনয়নের পূর্বেই শেষ হইত। উপনয়নের বয়স ছিল ৫ হইতে ৮। পাত্রবিশেষে শিক্ষা অসমাপ্ত থাকিলে উপনয়ন ১০ হইতে ১২ বৎসরেও হইতে পারিত।

১৬ বৎসরের পর বিবাহ হইত। তারপর দৈনন্দিন কার্য-সূচি এইরূপ ছিল—সকালের দিকে যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষা এবং বিকালে ইতিহাস-শিক্ষা। ইতিহাস অর্থে বুঝাইত—পুরাণ (পুরুষ-পরম্পরাগত শ্রুতি), ইতিবৃত্ত (অবদান আকারে ইতিহাস), ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র (নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি এবং আন্তর্জাতিকনীতি)।

বার্ত্তা-জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বহু স্থানে পাওয়া যায়। কৌটিল্য পূর্বশাস্ত্রকারদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্র কার্যত বার্ত্তার অন্তর্গত ছিল। অর্থনীতি সংক্রান্ত সমুদয় শাসনবিভাগ ইহার অধীন ছিল। মাত্র উৎপাদন নয়, সুসঙ্গত বণ্টন, স্থানান্তরিত করিবার সুব্যবস্থা, কৃষি-সংক্রান্ত যন্ত্র, পালিত পশু-চিকিৎসা। মোটা শিল্প, কামারের কাজ, ছুতারের কাজ,

দড়ি তৈরী করার কাজ, উৎপন্ন দ্রব্যের সংরক্ষণ, কেবল দুর্ভিক্ষ সময়ের ব্যবহারের জন্য সঞ্চয়, বাটকারা, ওজন, মাপের ব্যবস্থা, মূল্য, বেতন বা পরিশ্রম, মুদ্রানির্মাণ, টোল-শুল্ক, ছাড়পত্র ইত্যাদি সমস্তই ইতিহাসের মধ্যে ধরা হইত।

রাজপুত্রের ১৬ বৎসর বয়সের পর দূর দেশে প্রখ্যাত গুরুদেবের নিকট পাঠ লইতে যাইতেন। রাজপুত্রদের বিদেশে গিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিবার বহু উদাহরণ পালি জাতকে পাওয়া যায়। সাধারণ শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্যও বিদেশ-যাত্রার পরিচয় আছে। এইরকম করিয়া তাঁহাদের ঔদ্ধত্য নষ্ট হইয়া সংযম-শিক্ষা হইত, শীতাতপ সহ্য করিবার শক্তি-লাভ হইত এবং দেশ-বিদেশের রীতি-নীতির পরিচয়-লাভ ঘটিত। শিক্ষান্তে তাঁহারা নগর, গ্রাম এবং দেশ ভ্রমণ করিতেন। রামায়ণে রাজপুত্রদের শিক্ষার উপযুক্ত বিষয় দেওয়া হইয়াছে—ধনুর্বেদ, নীতিশাস্ত্র, হস্তী ও রথতত্ত্ব আলেখ্য ও লেখ্য, লঙ্ঘন (উল্লম্ফন ও অন্য ব্যায়ামাদি) এবং প্লবন (সন্তরণ)।

রাজা যে যথেচ্ছাচারী হইতে পারেন না তাহার পরিচয় কৌটিল্যে আছে। পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, রাজা সেইরূপ আর্তজনকে রক্ষা করিবেন। রাজা যে পারিষদ ভিন্ন চলিতে পারেন না, তাহারও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু রাজা বাস্তবিক কিরূপ হইবেন এবং সত্যই কেমন ছিলেন তাহার পরিচয় বৌদ্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায়। জাতকের গল্পে ও বিভিন্ন রাজাদের কথায় বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, রাজা রামচন্দ্রের ইতিহাস অস্বাভাবিক কাহিনীতে পূর্ণ নয়। অথর্ববেদে রাজকর্তা বা রাজনির্বাচন-কারীদের উল্লেখ আছে। মহাভারতে উল্লেখ আছে পুরু, দেবাপি প্রভৃতি নির্বাচিত রাজা ছিলেন। গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রও যে বহু ছিল তাহারও উল্লেখ অথর্ববেদ (৫. ২০. ৯) ও বৌদ্ধ গ্রন্থে আছে। দ্বৈরাজ্যের উদাহরণও বিরল নয়। অর্থশাস্ত্রেও (৮. ২. ১২৮) আছে। জৈন আয়ারাঙ্গসুত্তেও[4] আছে। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের এক সঙ্গে শাসনের উল্লেখ আছে। মহাবস্তুতে[5] রাজা মহেন্দ্রের[6] তিন পুত্রের একসঙ্গে রাজত্ব করার কথা আছে। চষ্টন[7] ও রুদ্রদামা[8] একত্র রাজত্ব করিতেন পণ্ডিতেরা এরূপ কথাও বলিয়াছেন। জৈনসাহিত্যে গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রের অতি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া

যায়। রাষ্ট্রের বড় বড় লোককেই রাজা বলা হইয়াছে। বৈশালী-গণতন্ত্রে রাজপদবীর সংখ্যার অবধি ছিল না। ভদ্দিয় বুদ্ধের সম্পর্কে ভাই। তাঁহাকে কখন রাজাও বলা হইয়াছে। রাজা শুদ্ধোধনকে মাত্র শাক্য শুদ্ধোধন বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গণতন্ত্রের গৌরব বড় কম ছিল না। বহুকাল পরেও সমুদ্রগুপ্ত নিজেকে লিচ্ছবী-দৌহিত্র বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করিতেন। আমার মনে হয় অশোক অনুশাসনের সতিয়পুত্ত, কেরলপুত্ত প্রভৃতি গণতন্ত্র-মূলক জাতিরই উল্লেখ। এরূপ হইলে সমগ্র ভারতবর্ষে, উত্তরে ও দক্ষিণে গণতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-সাহিত্যের চক্রবর্তী সম্রাট্ নিয়মতন্ত্রানুগ বলিয়া মনে হয়। ইঁহার মহত্ত্ব ও উদারতা অবিসংবাদী। এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সেকালের রাজারা যথেচ্ছাচারী ছিলেন এরূপ ভ্রান্ত ধারণা না হয়। রাজপুত্রদের শিক্ষাবিষয়ে এরূপ চেষ্টা করা হইত যাহাতে তাহারা উপযুক্ত রাজা হইতে পারে। রাজার সঙ্গে প্রজাদের হৃদয়ের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত ছিল, তাই এদেশের প্রজাদের বিদ্রোহের ইতিহাস নগণ্য অথবা নাই বলিলেই চলে। অযোগ্য রাজা যে রাজ্যচ্যুত হন নাই তাহা নহে, তবে তাহার স্থানে নূতন রাজাকেই বসান হইয়াছে। প্রজাতন্ত্রের আবশ্যক হয় নাই।

বুদ্ধের জীবনে বুদ্ধের শিক্ষার যে বর্ণনা আছে তাহাতেই সেই সময়কার রাজপুত্রদের শিক্ষার চিত্র বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষার বিষয়গুলির নাম করিতেছি—লিপি, পুঁথি-প্রস্তুতকরণ, আখ্যায়িকা-কথন, কাব্য, ব্যাকরণ, অঙ্ক, নিঘণ্টু, নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, বেদ, নিরুক্ত শিক্ষা, ছন্দ, যজ্ঞবিধি ও প্রকরণ। সাঙ্খ্য, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, অর্থনীতি, নীতিশাস্ত্র, ভৈষজ্য, শল্য, দেহতত্ত্ব, স্ত্রী-পুরুষ, অশ্ব ও অন্যান্য জীবগণের লক্ষণবিদ্যা, পশুপক্ষীর রবের অর্থ, অপরের চিন্তা অনুমান, প্রহেলিকা সমাধান, স্বপ্নতত্ত্ব, সঙ্গীত, নাট্যবিদ্যা, আবৃত্তি, ঐকতান, লাক্ষাকর্ম, সূচিশিল্প, মোমকর্ম, বৃক্ষপত্রের শিল্পকর্ম, রঞ্জনশিল্প, বিভূষণকর্ম, মূক অভিনয়, মুখোস পরিয়া অভিনয় ইত্যাদি। গৌতমকে মল্লযুদ্ধ ও মুষ্টিযুদ্ধ, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, ধনুর্বিদ্যা ইত্যাদি শিখিতে হইয়াছে।

[বিচিত্রা ১৩৪৫ শ্রাবণ, পৃ. ২-৬]

প্রসঙ্গ-কথা

1 তীর্থকর : জৈন অর্হৎ। নামান্তর তীর্থঙ্কর। 'অতিথি-সংবিভাগ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

2 ওদনপাণিনীয় : ওদন অর্থ অন্ন। যে সকল ছাত্র আহারের জন্য গুরুর কাছে পাণিনি অধ্যয়ন করে, তাদের ওদনপাণিনীয় বলে।

3 দিব্যাবদান : সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ। 'সব্বত্থিবাদ' বা সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।—বৌদ্ধ-কো৹ পৃ. ৬

4 আয়ারাঙ্গসুত্ত : জৈনগণ ৪৫ খানি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে ১১শ বা ১২শ অঙ্গ, এই দ্বাদশ অঙ্গের মধ্যে আয়ারাঙ্গ (আচারাঙ্গ) একটি। 'জৈনধর্ম' প্রবন্ধ দ্র.

5 মহাবস্থ : বৌদ্ধসাহিত্যে মহাবস্থ বৌদ্ধ উপাখ্যান ও বাণীসমূহের এক গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি গদ্যাংশ ও পদ্যাংশে রচিত। মূলত গ্রন্থখানি সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষায় মিশ্রিত। সেনার সম্পাদিত মহাবস্তুর বর্ণনানুসারে মহাবস্তু মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের লোকোত্তরবাদ শাখার বিনয়পিটকের আদি বা প্রথম গ্রন্থ।—বৌদ্ধ-কো. পৃ. ৯

6 রাজা মহেন্দ্র : মহাবস্থ গ্রন্থে উল্লিখিত রাজা মহেন্দ্র হস্তিনাপুরের রাজা।

7 চষ্টন (১৩০ খ্রী.) : উজ্জয়িনীর একজন শক জাতীয় ক্ষত্রপ। পিতা— যশামোতিক। পুত্র জয়দামন, পৌত্র রুদ্রদামন।—জী-কো.

8 রুদ্রদামা (রুদ্রদামন) : 'ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি বলিলে আমরা বুঝি প্রাচীন ভারতে আর্য ও আর্যেতর জাতির অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য। যে শিক্ষা-দীক্ষা, বিদ্যা-বুদ্ধি, সভ্যতা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পসাহিত্যের ধারা এবং ধর্ম, আচার ও অনুষ্ঠানের অবদান তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে তাহাই তাহাদের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি আছে বলিয়াই আর্য যাহা ভাবিয়াছে, আর্যেতর কোন জাতিও হয়তো সেই একই ভাবনা করিয়াছে, আর্যের সমস্যা হয়তো আর্যেতরের সমস্যার সঙ্গে অনেকাংশে মিলিতে পারে, তাহার সমাধানেও হয়তো অদ্বিতীয়ত্ব না থাকিতে পারে, কিন্তু উভয়ের চিন্তার ধারা এবং সমাধানের ধারায় অপূর্বত্ব থাকিবেই। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি বুঝিতে হইলে পুরাতন ভারতের প্রকৃতির সন্ধান প্রথমেই লইতে হইবে।

আর্য ও আর্যেতর জাতি লইয়াই প্রাচীন ভারত। ভারতবর্ষে আর্যদের কেমন করিয়া প্রথমে দেখা পাওয়া গেল সে সমস্যার সমাধান আজও ভাল করিয়া হয় নাই। ভাষাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ প্রভৃতির সাহায্যে অনেক দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত বিপুল পরিশ্রম করিয়া আর্যদের আদিনিবাস স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ওটো শ্রাডের (Otto Schrader) স্থির করিলেন দক্ষিণ রাশিয়া, জেয়াঁ দে মরগ্যান (J. de Morgan) দেখাইলেন সাইবেরিয়া, ড. গাইল্‌স্ (Dr. Giles) প্রমাণ করিলেন আর্যদের আদি নিবাসের পূর্বসীমান্ত কার্পেথিয়ান, দক্ষিণ সীমা

বলকান, পশ্চিম সীমা অস্ট্রিয়ান আল্‌প্‌স্‌ এবং উত্তর সীমা Erzgebirge। এইরূপ কেহ দেখাইলেন এশিয়া মাইনর, কেহ বা বলিলেন ভারতবর্ষ। আর্যরা যে বাহির হইতে আসিয়াছেন এই মত প্রায় সকলেই একরূপ নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছেন। মানিয়া লইবার পক্ষে বা বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি আছে, সেগুলি বড়ই ফাঁকা—চূড়ান্ত তো নয়ই।

ঋগ্বেদের প্রাচীন সূক্তগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যে যথেষ্ট তাহা অস্বীকার করা চলে না। আর্যদের যে একটা প্রাচীন আবাসস্থল ছিল ইহারই দু-এক জায়গায় তাহার একটু ইঙ্গিত আছে। তাঁহাদের সেই প্রাচীন নিবাসভূমি —বেদের 'প্রত্ন ওকঃ' ভারতের ভিতরে কি বাহিরে তাহা বুঝিবার কোনই উপায় নাই। তাঁহারা যে বাহির হইতে আসিয়াছিলেন তাহার একটিও প্রমাণ বেদে নাই। বরং কতিপয় আর্যেতর জাতিকে তাঁহারা ভারতের বাহিরে পশ্চিমদিকে বিদূরিত করিয়া দিয়াছিলেন তাহারই প্রমাণ ঋগ্বেদে আছে (৭. ৫. ৬)। যাহা হউক, আর্যরা ভারতবাসী হউন অথবা বাহির হইতেই আসুন তাঁহাদের সংস্কৃতি বা culture সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঋগ্বেদ যে শুধু আর্য-সংস্কৃতির ক্রমপরিণতির ইতিবৃত্ত নির্ণয়ে সহায়তা করে তাহা নহে, এগুলি থেকে আমরা সেই সময়ের আর্য-অধ্যুষিত স্থানাদি সম্বন্ধেও অনেক সন্ধান পাইতে পারি। ইহাতে কতকগুলি স্থানের ভৌগোলিক বর্ণনাও পাওয়া যায়। এই সকল বর্ণনা রাবি নদের তীর-প্রদেশকে নির্দেশ করে। রাবির তীর হইতে পঞ্জাব, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে কেন্দ্র করিয়া যে আর্য সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। কয়েকবর্ষ পূর্বে সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে "মোহেঞ্জোদড়ো"কে কেন্দ্র করিয়া ধ্বংসস্তূপ হইতে যে সমগ্র প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার হইয়াছে সেগুলি ঋগ্বেদের সূক্তসকলের উক্তিরই প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই প্রাচীন সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি অন্তত খ্রী-পূ. ৩০০০ বর্ষ পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার সাক্ষ্য দেয়। এই আবিষ্কারগুলি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন পরিচয় কিনা সে সম্বন্ধেও কথা উঠিয়াছে। মোহেঞ্জোদড়ো প্রভৃতি স্থানে ভূগর্ভ খননে যে সমস্ত মন্দির ও অট্টালিকার উদ্ধার হইয়াছে বিশেষজ্ঞদের মতে সেগুলি শুধু একটি যুগের সাক্ষ্য দেয় না, ভূগর্ভের

বিভিন্ন স্তরে সঞ্চিত বিভিন্ন যুগের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের পরিচয় দিয়া থাকে। বিশেষত এইগুলি যে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিরই পরিচায়ক সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ একমত প্রকাশ করিয়াছেন। মোহেঞ্জোদড়োর মন্দিরগুলির সঙ্গে পরবর্তিকালের দ্রবিড়পদ্ধতির মন্দিরগুলির সাদৃশ্য আছে। স্মল্ব ও বৈখানসসূত্রানুযায়ী যজ্ঞবেদীর আদর্শে কল্পিত মন্দিরের অনুরূপ হরপ্পার একটি মন্দিরও রহিয়াছে। এছাড়া ধ্বংসস্তূপ হইতে আবিষ্কৃত বিভিন্ন দ্রব্যগুলি ভারতীয় ইতিবৃত্তের অনেক উপকরণ যোগাইয়াছে।

আবিষ্কৃত মন্দিরগুলি হইতে অনেকগুলি চক্রাকার প্রস্তর, বিভিন্ন প্রকার দাবার গুঁটি, বিভিন্ন জন্তুর মূর্তিক্ষোদিত ফলকাদি, আসবাবপত্র, অলঙ্কার, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্রপাত্রাদিও পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির সঙ্গে ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদবর্ণিত দ্রব্যাদির সাদৃশ্য আছে। ঐতিহাসিকগণ ইহাকে তাম্রযুগের নিদর্শন বলিয়া নির্দেশ করেন। মন্দিরগুলিতে কূপ ও স্নানাগার প্রভৃতির সুন্দর বন্দোবস্ত রহিয়াছে। আবিষ্কৃত এই মন্দিরগুলি তৎকালের সভ্যতার সুন্দর চিত্র। ঋগ্বেদে আর্য ও দস্যুগণের প্রাসাদগুলির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহার সঙ্গে মোহেঞ্জোদড়োর মন্দিরগুলির সাদৃশ্য বড় কম নয়।

এই সকল স্থানে অনেকগুলি প্রতিমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি আর্য ও দ্রবিড়সভ্যতার নিদর্শন। ড. হলের ধারণা সুমেরীয়-পূর্ব (pre-sumerian) প্রভাব ভারতীয় মৃৎশিল্পে পড়িয়াছিল। কিন্তু এ ধারণা অমূলক। আবিষ্কৃত মৃৎশিল্পের নিদর্শন ও মূর্তিক্ষোদিত ফলকগুলিতে আর্য ও দ্রবিড়চিহ্নই বর্তমান।

তদানীন্তন প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বাবিলন ও ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরস্থ অনেক প্রদেশের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের মধ্যেও আর্য-দ্রাবিড় সম্বন্ধও রহিয়াছে।

আর্য ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে দ্রবিড় জাতির দান বড় কম নয়। প্রাচীন দ্রবিড়-সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে আর্যভাবশূন্য। আর্যদের সঙ্গে ইহাদের সমাজ গঠনেরও পার্থক্য রহিয়াছে। দ্রবিড়-সমাজে মাতৃপক্ষ হইতে পরিবার গঠিত, আর্যসমাজে কিন্তু পিতৃপক্ষ হইতে পরিবার গঠন। তথাকথিত 'অসুর'-সমাজের সঙ্গে দ্রবিড়-সমাজ গঠনের অনেকটা মিল

আছে। আর্যগণ যাহাকে ময়-অসুর বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন সেই ময়ই দ্রবিড়-সভ্যতার বিজ্ঞান-সাধনার চরম সাক্ষ্যদান করিতেছে। পূর্ত ও স্থপতি বিদ্যার আর্য-আদর্শ বিশ্বকর্মা—দ্রবিড়-আদর্শ ময়দানব।

সুমেরীয়, কাল্ডীয়, ঈজীয় ও মিশরীয় জাতির সভ্যতার উপরও দ্রবিড়-সভ্যতার প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয়। দ্রবিড়-জাতি নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। দ্রবিড়-ভাষায় তাহার পরিচয় রহিয়াছে। সংস্কৃত নৌসম্বন্ধীয় শব্দাবলী দ্রবিড়-ভাষা হইতেই গৃহীত। এই দ্রবিড়-জাতি যে বাহির হইতে ভারতে আসিয়াছিল এরূপ কোন প্রমাণও নাই। অতি প্রাচীনকালে যে ভারতবর্ষ ও মেসোপটেমিয়ার যোগাযোগ ছিল ২১০০ খ্রী-পূ.-র একখানি ফলক ও অন্যান্য নিদর্শন হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। কয়েক বৎসর হইল প্রত্নানুসন্ধানে বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ছয়জনকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে ভারতের বাহিরে অতি দূরদেশে। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, নাসত্য, সূর্য ও মরুৎ—এই ছয়জন দেবতার উল্লেখ আছে বোগাস কুই-শিলালেখে, তেল-এল-অমরনার পত্রাবলীতে এবং বাবিলনের 'কাসাইটদের রেকর্ডসে'। মিটানি রাজ্যের সহিত আসিরীয় রাজ্যের যে যুদ্ধ-ব্যাপার তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। Tel-el-Amarna হইতে Tusratta যে পত্রগুলি মিসরের তৃতীয় Amenhotopকে লিখিয়াছিলেন সেগুলি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে এগুলির সময় Boghas Kui লিপির সময়ের অনুরূপ। এই পত্রগুলিতে উত্তর-পশ্চিম মেসোপোটেমিয়ার মিটানি জাতির উল্লেখ আছে। এখানে যে সকল রাজা রাজত্ব করিতেন তাঁহাদের কাহারও কাহারও নামও পাওয়া যায়। এই রাজাদের মধ্যে তুসরত্ত, অর্তত্তম, সুত্তর্ণ, অর্তসুমর প্রভৃতি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও নাসত্যের পূজা করিতেন। এগুলি যে আর্যনাম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তারপর পাঁচশত বৎসর কাশীয় জাতি (১৭৪৬—১১৮০ খ্রী-পূ.) মিডিয়া হইতে গিয়া সমগ্র বাবিলন অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরও রাজাদের এবং দেবতাদের নাম আর্য-নাম। ইঁহাদের Shurias ও Marytas সূর্য ও মরুৎ। Simalia আর্যদের হিমালয়। দেখা যাইতেছে কাসাইটরা হিমালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং মিটানির সহিত

আর্যদের সম্পর্ক ভারতবর্ষে পৌঁছিবার পূর্বে এই পুরাতন ভ্রান্ত ধারণা আর টিকিতে পারে না। আর্যদের ধর্ম পারস্যের মধ্য দিয়া এসিয়া-মাইনরে যায় নাই। ভারত হইতেই আর্যধর্ম বরাবর এসিয়া-মাইনরে গিয়াছে। এই অভিগমনে পারস্যের মধ্যস্থতার কোন প্রয়োজনও হয় নাই। যদি হইত, তাহা হইলে এই দেবতাদের নামগুলিতে পারস্যদের ভাষার অন্তত একটু ছিটেফোঁটাও থাকিত। পক্ষান্তরে দেখা যাইতেছে অমরনার পত্রাবলীতে দেবতাদের নামগুলি আদৌ ম্লেচ্ছিত হয় নাই। সেগুলিতে ভারতীয় রূপ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পারস্য মধ্যস্থ থাকিলে খ্রী-পূ. ১৪শ শতকে এমন কি ১৭৬০ খ্রী-পূর্বাব্দেও Tusratta ও Suttarna প্রভৃতি শব্দগুলিকে অম্লেচ্ছিতরূপে দেখিতে পাইতাম না। বোগাস কুই-লিপিতে যে সমস্ত সংখ্যাবাচক নামের উল্লেখ আছে তাহাদের সহিত বৈদিক সংখ্যানামের সাক্ষাৎ সাদৃশ্য আছে। এ ছাড়া বৈদিক শব্দের সহিত কয়েকটি শব্দেরও বেশ মিল আছে। এই সুদূর প্রদেশে আর্যদেবতারা শান্তির ভাবই প্রকটিত করিয়াছেন। আর শান্তির এই বাণী লইয়াই ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক পরিচয়।

ইরানী জাতিও সম্ভবত ভারত হইতে পশ্চিমে অগ্রসর হইয়াছিল। ইহারাও বেদবর্ণিত অসুরজাতির সমপর্যায়। বেদ ও অবেস্তার আলোচনায় ঋগ্বেদকেই প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। বেদের অনেক আখ্যানের সঙ্গে অবেস্তার আখ্যানের সাদৃশ্য আছে। তাহাদের ক্ষৌর-কর্মের প্রণালী, পরিধেয়ের পদ্ধতি, তাহাদের জয়ধ্বনিসূচক শব্দের সঙ্গে আর্যদের অনেক মিল আছে। যণ্ড, মর্ক, বেরেত্রয়, ত্রেতন-অথেব্য বেদের ষণ্ড, মর্ক, বৃত্রঘ্ন, ত্রিত-আপ্ত। বেদপন্থী ও অবেস্তাপন্থীদের পূর্ব-পুরুষগণ পূর্বে একস্থানে একসঙ্গে বাস করিতেন। তাঁহারা যেখানে থাকিতেন, তাহাকে তাঁহারা 'স্বর্গ' বলিতেন। বেদপন্থীদের পূর্বপুরুষগণ আপনাদিগকে 'দেব' বলিতেন ও অন্য দলকে 'অসুর' নামে পরিচিত করিতেন। তখন দেব ও অসুর 'ঈশ্বর' (Lord) অর্থেই প্রযুক্ত হইত। দেব ও অসুরদের পরস্পর বেশ মিল ছিল। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃব্য বলিয়া বুঝিতেন। সহোদর ভ্রাতা না হইলে তখন 'ভ্রাতৃব্য'

বলিয়া পরিচয় দিবার প্রথা ছিল। এখন যেমন পিতৃব্য বলিলে বাপ না বুঝাইয়া খুড়া, জেঠা বুঝায়, তখন তেমনই, ভ্রাতৃব্য বলিলে সহোদর ভ্রাতা না বুঝাইয়া অপর সকলকে বুঝাইত। ক্রমে উভয় দলের ধর্মমতের পার্থক্য ঘটিল। ভৃগু অগ্নিপূজার প্রবর্তন করিলেন। দেবগণ যজ্ঞ করিতে সুরু করিলেন। প্রথম প্রথম অসুররাও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন. পরে তাঁহারা যজ্ঞে রাজি হইলেন না। শেষে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে. দেব বলিলে যজ্ঞকারী মাত্রই বুঝাইত। শতপথ-ব্রাহ্মণ তাই দেবের সংজ্ঞা দিয়াছেন—'যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ' (১.৫ ৫.২৬)। অসুররা সারা বৈদিক সাহিত্যে স্বর্গবাসী। প্রথম প্রথম 'অসুর' শব্দ বৈদিকযুগে দেবতাদের নিকট খুব শ্রদ্ধাবাচক, মর্যাদাব্যঞ্জক ছিল। বৈদিকযুগের গোড়ার দিকে যাহারা খুব বড় হইতেন. তাঁহারা 'অসুর' উপাধিতে ভূষিত হইতেন। মরুৎ, দ্যৌঃ, বরুণ, ত্বষ্টা, অগ্নি, বায়ু, পূষা, সবিতা, পর্জন্য—ইঁহারা সকলেই বেদে সম্মানসূচক 'অসুর' পদবাচ্য ছিলেন। ইঁহাদের অলৌকিক শক্তি ছিল বলিয়া ইঁহাদিগকে বৈদিক ঋষিরা অসুর বলিতেন।

বেদে ১০৫ বার অসুর শব্দ আছে, সবই ভাল অর্থে প্রযুক্ত, কেবল ১৫ বার দুষ্ট অর্থে প্রযুক্ত। যতদিন দেব ও অসুরে মিল ছিল, ততদিন 'অসুর' বলিলে মর্যাদা, প্রভাব বুঝাইত। কিন্তু যখন মনের অমিল হইতে লাগিল, তখন উভয়ে উভয়ের প্রতি আকর্ষণ ভুলিয়া গেলেন। উভয় দলে বেশ শত্রুতাও চলিতে লাগিল। প্রথম প্রথম এক-একজন অসুরের সঙ্গে এক-একজন দেবতার যুদ্ধ হইত। শেষে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে একদল অপর দলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে গোড়ায় অসুররা দেবতাদের জ্বালাইয়া মারিত। শেষে দেবতারা বহু কষ্টে ছলে কৌশলে জয়ী হইলেন। এ সম্পর্কে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমের উদাহরণ খুব প্রসিদ্ধ। যুদ্ধের সময় দেব ও অসুর উভয়েই ইন্দ্রকে পাইবার জন্য, তাঁহার সাহায্যের জন্য চেষ্টিত ছিলেন। ঋগ্বেদে ইন্দ্র সম্পর্কে (১. ৭. ১০) দেবতারা বলিয়াছেন—'অস্মাকংস্তু কেবলঃ'। অসুরদের বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবার জন্য ইন্দ্রকে তাঁহারা বারবার ডাকিয়াছেন (৮. ৮৫. ৯)।

অগ্নি তাঁহাদের ভরসা দিয়াছিলেন যে, অসুরদের বিধ্বস্ত করিবার জন্য

তিনি মন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিবেন (১০. ৫৩. ৪)। অসুরদের বড় বড় বীর ছিল। পিপ্রু অসুরের, শম্বর অসুরের অনেকগুলি দুর্গ ছিল। শম্বরের ছিল অন্তত ৯০টি (১. ১৩০. ৭) কিংবা ৯৯টি (২. ১৯. ৬)। বর্চী অসুরের লক্ষ-লক্ষ যোদ্ধা ছিল। নিজেও খুব তিনি দুর্দান্ত। দেবতাদের অনেক সময় এইসব দুর্দান্ত অসুরদের উপর নির্ভর করিতে হইত (১০. ১৫১. ৩)। যখন যুদ্ধ বাধিত ইন্দ্র, বিষ্ণু, অগ্নি, সূর্য দেবতার হইয়া যুদ্ধ করিতেন। ইন্দ্র অসুর পিপ্রুর কেল্লা নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন (১০. ১৩৮. ৩)। ইন্দ্র-বিষ্ণু অসুর বর্চীর লক্ষ বীরকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন (৭. ৯৯. ৫)। অসুরদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইন্দ্র (৬. ২২. ৪), অগ্নি (৭. ১৩. ১) ও সূর্যের (১০. ১৭০. ২) নাম হইয়াছিল—'অসুরহা'। রুদ্র ছিলেন নিজে মহা অসুর (৫. ৪২. ১১)। অসুররা তাঁহার ভক্ত ছিল। দেবাসুরের যুদ্ধের পর হইতে যখন দেবতারা অসুরদের একেবারে হারাইয়া দিলেন (১০. ১৫৭. ৪), তখন দেবতারা অসুরদের শত্রু বলিয়া উল্লেখ করিতেন, তাঁহাদের 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেন। [অনার্য দ্র.]

মানুষের পারিবারিক জীবনকে অবলম্বন করিয়া এবং তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া মানুষের জীবন গড়িয়া উঠে। বৈদিকযুগেও তাহাই ঘটিয়াছে। বৈদিকযুগে বানপ্রস্থীরাও ছিলেন। তাঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গৃহীদিগের পারিবারিক জীবনে পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা করা। তাঁহারা কঠোরতা-দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রামকে পেষণ করিতে চাহিতেন না। পবিত্রতা দ্বারা ইন্দ্রিয়-নিচয়কে জয় করা তাঁহারা ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। সমাজ-জীবনের ধারা রুদ্ধ করা ভারতীয় সন্ন্যাসের আদর্শ ছিল না। স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ককে পবিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া ভারতীয় সমাজ অগ্রসর হইয়াছে। বৈদিক সমাজে পারিবারিক জীবনের প্রথমেই ব্যক্তিত্বকে সমষ্টির মধ্যে সমর্পণ করিতে হয়। বৈদিক সমাজে স্বগোত্র ও অসবর্ণ বিবাহের পদ্ধতি এমনভাবে নির্দিষ্ট ছিল যাহাতে শারীরিক অস্বাস্থ্যের পথও রুদ্ধ হইয়াছিল, অথচ তাহাতে স্বাজাত্য সংস্কৃতির কোন হানির সম্ভাবনা ছিল না। নিয়োগ-পদ্ধতি (hypergamy) দ্বারাও নীচবর্ণে

আর্য-সংস্কৃতির প্রসার সহজসাধ্য হইয়াছিল। এই নীচবর্ণের রক্তধারাও পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল।

পারিবারিক জীবনের উচ্চ আদর্শ ধারাবাহিকভাবে বংশপরম্পরায় প্রভাব বিস্তার করিত। ভারতীয় পরিবার-জীবন প্রথম হইতে আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বৈদিক রাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণভাবে পরিবার-জীবন হইতে স্বতন্ত্র ছিল। অথচ আবার পরিবার-জীবনই রাষ্ট্রের ভিত্তি। কুলধর্ম রক্ষাই ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম। তাই রাষ্ট্রধর্ম অপেক্ষা কুলধর্মের স্থান ছিল উচ্চে। কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম বলিয়া কোন নাম বা সংজ্ঞা ছিল না। এক-একটি বংশ যেমন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, অমনি বিপুলভাবে বর্ধমান সেই সেই বংশের শাসন-ভার সেই তাবদ্ বিস্তৃত বংশ নিজেই গ্রহণ করিল। ইহা হইতে ক্রমশ স্ব-শাসক (self-governing) জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। তাই মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ কুলধর্মের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। এই প্রথা সম্পূর্ণ ভারতীয়। দক্ষিণ ভারতে তামিল প্রদেশে এইরূপ নীতি বর্তমান থাকায় কেহ কেহ ইহা দ্রবিড়-প্রভাববশতই মনে করিয়া থাকেন।

বৈদিক সমাজের সুদৃঢ় নীতি ছিল—সত্য ও ঋত। ধর্মে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ বদ্ধ অথচ স্বধর্মে প্রত্যেকে স্বাধীন। সমাজের সমষ্টিগত ধর্ম —সনাতন ধর্ম। ইহার ব্যক্তিগত ধর্মই স্বধর্ম। বর্ণাশ্রমধর্মে এই উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয় সমাজের মূলভিত্তির অনুসন্ধান করিতে হইলে বৈদিকযুগের সমাজের সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন।

এই সমাজ-গঠনে আর্য বা দ্রবিড় বলিয়া কোন কথা নাই। আর্য-সভ্যতা বিস্তারে আর্য ও অনার্য সংমিশ্রণে আর্যজাতির নিকট এক সমস্যা উপস্থিত হয়। সেই সমস্যার সমাধানে আর্যগণকে স্বীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। ফলে তখনকার বিভিন্ন জাতি-সমষ্টির উপর আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব বা ধারা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এইরূপ সমাজ সংগঠিত হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম—বৈদিক আর্য জীবনের ছিল আদর্শ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বিভাগে পরস্পর উচ্চ নীচ ভেদ ছিল না, ইহা শুধু বর্ণানুযায়ী বিভাগ। উচ্চ তিন বর্ণের কর্ম পরিচালনার জন্য নিয়ম

প্রণয়নও ধীরে ধীরে হইয়াছিল। আর্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য এইসকল নিয়মে কঠোরতাও যথেষ্ট ছিল। কেহ কর্তব্যে অবহেলা করিলে তাঁহাকে স্বধর্মত্যাগী বলিয়া নিন্দনীয় হইতে হইত।

পরবর্তিকালে বর্ণ-বিভাগ জাতিবিভাগে রূপান্তরিত হয়। ধর্মরক্ষাই ছিল রাজধর্ম। বর্ণ ও আশ্রমের রক্ষার ভার ছিল রাজার উপর। ইউরোপে রাজ্য (state) রক্ষা রাজধর্ম ; ভারতে ধর্মরক্ষাই রাজধর্ম। রাজাও ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে পূজিত হইতেন। ধর্মত্যাগী রাজার সিংহাসনচ্যুতিরও সম্ভাবনা ছিল। আবার বর্ণ প্রতিনিধিবর্গের সহায়তায়ও কর্তব্য-নির্ণয়েরও দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ সমষ্টিগত স্বাতন্ত্র্য-রক্ষণ। রাষ্ট্রক্ষেত্রেও তাহা দেখা যায়। ভারতে অসংখ্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজ্য থাকিলেও পরস্পর সংস্কৃতিগত যোগ ছিল। সাম্রাজ্য স্থাপনেও সেই আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। পরবর্তিকালে অশোক, হর্ষ প্রভৃতির সময়েও প্রত্যেক রাষ্ট্র স্ব-স্ব অধীন ছিল।

এইটুকু মুখবন্ধ করিয়া সংস্কৃতির বাহন যে শিক্ষা তৎসম্বন্ধে আপনাদের নিকট কিছু বলিব। যাহা কিছু বলিব দিগ্‌দর্শন হিসাবেই বলিব। আমার এই বিবৃতিতে বৈদিকযুগের শিক্ষা ও শিক্ষায়তনের সাধারণভাবে বিবৃতি থাকিবে।

বৈদিকযুগে শিক্ষার সূচনা হইত ঋষিদের তপোবনে এবং তাঁহারাই ছিলেন আদিগুরু। তপোবন বলিলে বুঝিবেন না যে তাহা শুধু ধ্যান-ধারণার স্থান ছিল। এখানে ঋষিরা বাস করিতেন, তাঁহাদের স্ত্রীপুত্র থাকিত। গৃহস্থের যাহা কিছু কৃত্য সবই এই তপোবনে করিবার ব্যবস্থা ছিল। বৈদিকযুগে শিশুরা নিজেদের গৃহের মধ্যে যাহা কিছু শিক্ষালাভ করিত, তারপর তাহাদিগকে এই তপোবনে গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইত। তখনকার দিনে সকল পরিবারেই কতরকম ধর্মানুষ্ঠান হইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। গর্ভে সন্তানধারণের সঙ্গে সঙ্গে সেই সন্তানকে উপলক্ষ করিয়া বিবিধ অনুষ্ঠান হইত। তারপর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জাতকর্মাদির অনুষ্ঠান হইত। মাতাপিতা ও পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া শৈশবের শিক্ষা শেষ হইত। অতঃপর বাল্যের সঙ্গে সঙ্গে সে এক বৃহত্তর পরিবারে গুরু-

কুলে আশ্রয় লইত। সে যুগে প্রাচীর দিয়া ঘেরা ছোট ছোট নগরের সংখ্যা বড় কম ছিল না, কিন্তু নগর লেখাপড়া শিখিবার যোগ্য স্থান ছিল না। চারিটি আশ্রম-জীবনের মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গেই নগরের বেশী সম্বন্ধ ছিল? তার আগে জীবনের ভিত্তি গড়িতে হইত ঋষিদের তপোবনে। ব্রহ্মচর্যই ছিল সেই ভিত্তির উপকরণ। আর ছাত্রজীবন বলিলে ব্রহ্মচর্য কালই বুঝাইত। গুরুগৃহে এরূপভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত যাহাতে জীবন একটি সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জীবনের স্তরে স্তরে আধ্যাত্মিকতা ফুটাইয়া তুলিবার ব্যবস্থা ছিল। এই শিক্ষার ফলেই তাহার মনে জীবনসায়াহ্নে পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাব বিকশিত হইয়া উঠিত। গুরুদের মধ্যে আচার্যই প্রধান ছিলেন। গুরুগৃহে বাসকালে গুরু শিষ্যের ভরণপোষণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেন। গুরু নানাশ্রেণীর হইতেন—আচার্য, শ্রোত্রিয়, মহাশ্রোত্রিয়, কুলগুরু, শ্রমণ, তাপস এবং বাতরশন। আচার্য ও কুলগুরুর তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি ছাত্র থাকিত। এই ছাত্রেরা সাধারণত আশপাশ হইতে আসিত। কেহ কেহ দূর হইতেও যে না আসিত তাহাও নয়। পুরুষানুক্রমে বেদচর্চায় এবং ধ্যানে রাগাদি বৃত্তি বিদূরিত হইলে তিনি শ্রোত্রিয় নামে অভিহিত হইতেন। তাপসগণ কৃচ্ছ্রসাধন করিতেন এবং যাহারা তাঁহাদের নিকট যাইত তাহাদের শিক্ষা দিতেন। ঋগ্বেদে বাতরশনদের যোগি-সম্প্রদায়ভুক্ত করা হইয়াছে। ইঁহারা কিরূপভাবে শিক্ষা দিতেন তাহা তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে উল্লিখিত আছে। ব্রাহ্মণরাই ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। ক্ষত্রিয়দের কদাচ শিক্ষা দিতে দেখা যায়। ঋগ্বেদে, অথর্ববেদে, শতপথ ও পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয়-আরণ্যক উপনিষদে কয়েকজন ব্রাহ্মণেতর গুরুর সন্ধান পাওয়া যায়। জনক, অজাতশত্রু, জৈবলি, শালক, দাল্‌ভ্য এবং কৈকেয় ইঁহারা প্রসিদ্ধ গুরু বলিয় খ্যাত। পরিব্রাজকদের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা নিজেদের মতবাদ প্রচারের জন্য সমস্ত দেশ ভ্রমণ করিতেন। প্রকাশ্যে সকলের সমক্ষে অন্যের সহিত দার্শনিক মতবিচার করিতেন। পরাজিতকে জেতার মত গ্রহণ করিতে হইত। জেতাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃতও করা হইত। যাহারা বিখ্যাত বিজেতা

হইতেন তাঁহাদিগকে কবি বা বিপ্র উপাধি দেওয়া হইত। এই রকম বিচারের উল্লেখ অথর্ববেদে আছে। সেখানে একজন হইতেন পার্শ্ব আর একজন হইতেন প্রতিপার্শ্ব; প্রতিপার্শ্ব—প্রতিপক্ষ। শতপথ, তৈত্তিরীয় ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণেও এইরূপ বিচারের কথা আছে। 'বৃহদারণ্যক-উপনিষদে দুইবার এইরকম বিচারের উল্লেখ হইয়াছে। বৈদিকযুগে স্থবির, শ্রমণ ও চরকদের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মণ শ্রেণীর গুরু ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, তাঁহারা সকলেই বেদপন্থী ছিলেন। কৌষিতকী-ব্রাহ্মণে ধর্মগুরু অর্থে স্থবির শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। প্রাতিশাখ্যে সাকল্য পিতাকে স্থবির নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। ইনি ঋগ্বেদের একটি শাখার প্রতিষ্ঠাতা। শতপথ-ব্রাহ্মণে গুরু হিসাবে চরকদের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে দেখা যায়, ইঁহারা বড় ভাল লোক ছিলেন না—পাপকার্যে রত থাকিতেন। ইঁহারা ধড়িবাজ। সত্যসত্যই দড়ির উপরে আশ্চর্য রকমের নাচ ইঁহারা দেখাইতেন। তবে ইঁহাদের মধ্যেও ভাল লোক ছিলেন, পড়ান-শোনানতে পটুও বেশ ছিলেন। পাণিনি তাঁহার সূত্রে (৪.৩.১০৭) বৈদিক গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকে দেখা যায়, ক্রমে বহু শঠ ও বঞ্চকেরা নিজেদের সকল জায়গায় গুরু বলিয়া জাহির করিতেছে।

প্রকৃত গুরুর গুণের কথা বহুস্থানে মেলে। তিনি ধীর, শান্ত, দান্ত। শিষ্য তাঁহার পুত্রতুল্য। শিষ্যের প্রতি তাঁহার স্নেহ যথেষ্ট। কিন্তু শিষ্য তাঁহাকে সব সময় ভক্তি করিবে এটুকু তিনি কখনও ভোলেন না। শিষ্যকে বুঝিতে হইবে, গুরুর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। তাঁহার প্রদত্ত সকল শিক্ষার, সকল উপদেশের তিনি জীবন্ত উদাহরণ। যিনি গুরু হইবেন তিনি যে কেবল শিষ্যকেই উপদেশ দিবেন তাহা নহে, তিনি জনসাধারণকেও শিক্ষা দিবেন—জ্ঞানের বাণী শুনাইবেন। ভিক্ষাই গুরুর জীবিকা ছিল। এক-একজন গুরুর খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িত। শিষ্যের নিয়ম ছিল সে গুরুর নিকট কোন জিনিস গোপন রাখিবে না। গুরুর পক্ষে নিয়ম ছিল শিক্ষার সমস্ত বিষয় তাঁহার সম্পূর্ণ অধিগত থাকিবে। শিষ্য যখন গুরুর নিকট বিদায় লয় তখন গুরুর উক্তির এক অংশে দেখিতে পাওয়া

যায়—গুরু অপেক্ষা মহৎ ব্যক্তির উপদেশ যেন শিষ্য গ্রহণ করে। গুরুর উদাহরণ শিষ্য মাত্র সেইটুকু গ্রহণ করিবে যাহা অনিন্দনীয়। শিষ্যকে উপদেশ গ্রহণের উপযুক্ত হইতে হইবে। মুণ্ডকোপনিষদে মাত্র 'শিরোব্রত' নামক বিধির (discipline) পালনকারীকে শিক্ষা দেওয়া হইবে, অন্য কাহাকে নয়। প্রশ্নোপনিষদে পাওয়া যায়—ছাত্র যখন প্রথম গুরুর নিকট গিয়া দাঁড়ায় তখন গুরু তাঁহাকে আদেশ দেন যে তাহাকে একবৎসর শিক্ষা পাইবার জন্য **শিক্ষানবিসী** করিতে হইবে। সে একবৎসর তাহার কাজ হইবে সম্পূর্ণরূপে আত্মসংযম লাভের চেষ্টা। এই সারা বৎসর তাহাকে গভীর চিন্তায় কাটাইতে হইবে। কখনও কখনও শিক্ষানবিসীর কাল বাড়াইয়া দেওয়া হইত; উদ্দেশ্য—যে শিষ্য হইতে চায় সে শিষ্য হইবার উপযুক্ত কি না ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা, কেন না ক্ষেত্র প্রস্তুত না হইলে বীজবপন বৃথা।

শিক্ষাপ্রার্থী হইতে হইলে তাহাকে অনেক বিষয় ওয়াকিফহাল হইতে হইত। গুরুর নিকট শিক্ষাপ্রার্থনা করিতে হইলে প্রথমেই তাহার হওয়া দরকার হইত—সুচরিত। ছাত্রের চরিত্রের দিকে দৃষ্টি পুরা মাত্রায় দরকার। তারপর তাহাকে শান্ত ও সুসমাহিত হইতে হইত।

শিষ্য সহিষ্ণু হইবে। তাহাকে অপ্রমাদরত ও তপোজ্ঞানশীল হইতে হইবে। শিষ্যের ব্রহ্মচর্যহানি হওয়া গুরুতর অপরাধ মধ্যে গণ্য। অজ্ঞাত শুক্রহানিরও প্রায়শ্চিত্ত ছিল।

শিষ্যের গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি থাকা চাই। গুরু কিন্তু তাহার চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করেন না। শিষ্য তাঁহাকে সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারিত। গুরুও প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিতেন। তখনকার শিক্ষায় চিত্তের উন্মেষ হইত, উদ্ভিন্ন চিত্তকে সঙ্কুচিত করিবার জন্য শিক্ষা ছিল না।

গুরুগৃহে বাস সাধারণত দ্বাদশ বর্ষের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। প্রয়োজন হইলে তাহা দ্বাত্রিংশ বা জীবনব্যাপীও হইতে পারিত। সাধারণ নিয়ম এই ছিল যে শিক্ষার্থী দ্বাদশবর্ষে গুরুগৃহে আসিত এবং ৩৬ বৎসর বয়সে স্নাতক হইত। বর্ণানুসারে শিক্ষারম্ভের বয়সের তারতম্য ছিল। ব্রাহ্মণ সন্তানের শিক্ষা আরম্ভ হইত আট হইতে ষোল বৎসরের মধ্যে। ক্ষত্রিয়ের

এগার হইতে বাইশের মধ্যে। আর বৈশ্যের ছিল দ্বাদশ হইতে চতুর্বিংশতির মধ্যে। বৃদ্ধ বয়সেও কেহ কেহ ছাত্র বা শিষ্যজীবন গ্রহণ করিতেন। আরুণি প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। শিক্ষায়তনে বৎসর আরম্ভ হইত বর্ষাকালে শ্রাবণী পূর্ণিমায়। শিষ্যের দেহ অশুচি বা অসুস্থ না হইলে, অথবা স্থান অশুচি না হইলে নিত্যই পাঠ হইত। প্রাকৃতিক কারণ ঘটিলেও অনধ্যায় দিবস হইত। প্রতিপদ তখন অনধ্যায় দিবস ছিল না। দৈনন্দিন পাঠ চলিত। এই পাঠের নাম ছিল স্বাধ্যায়। এছাড়া আবৃত্তি ছিল তখনকার দিনে একটা অপরিহার্য ব্যাপার। আবৃত্তিকে 'প্রবচন' বলা হইত। স্বাধ্যায় ও প্রবচনকে তপ বলিয়া মনে করা হইত।

শিষ্যকে সাধারণত সাতটি নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত। লঙ্ঘন করিলে তাহাকে পাপী বলিয়া মনে করা হইত। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে এই নিয়মগুলি সবিস্তারে বলা হইয়াছে। শিষ্য মাংস খাইবে না, বিশেষ করিয়া জলচরের। সে আত্মসংযম ব্রত গ্রহণ করিবে। উচ্চাসনে বসিবে না। কখনও মিথ্যা বলিবে না। স্নানের জল সকল সময় ভাল হওয়া চাই। তাহাতে থুথু ফেলিবে না বা প্রস্রাব করিবে না। ধর্মের নিয়ম তাহাকে মানিয়া চলিতে হইবে। ধর্মানুশাসন অনুসারে তাহাকে ভোরে উঠিয়া দাঁত, নখ পরিষ্কার করিতে হইবে। সন্ধ্যার ত্রুটি অমার্জনীয়। অপরিচ্ছন্ন লোকের সংসর্গ বর্জনীয়—তাহাদের কাছ থেকে সে কোন কিছু লইতে পারিবে না। বৈদিক যুগে discipline-এর স্থান শিক্ষারও উপরে ছিল। তখন জ্ঞানই চরম বস্তু বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই—জ্ঞানের সাহায্যে যাহাতে পৌঁছিতে পারা যায় তাহাই ছিল লক্ষ্য—আর তজ্জন্য জ্ঞান উপলক্ষ্য। disciplineকে বাদ দিয়া জ্ঞান সম্পূর্ণ নিরর্থক। তাই চরিত্রগঠন জ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে শিক্ষার একটি বিশেষ অংশ অধিকার করিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ অকপটভাবে সত্যপ্রতিষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ সে পরম সত্যের আরাধনার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না।

নিত্য সাবিত্রী উপাসনা, সন্ধ্যা প্রভৃতি অবশ্য কর্তব্য ছিল। সাবিত্রী উপাসনার সন্ধ্যা বন্দনায় একটি কথা তরুণ শিষ্যের মনের দ্বারে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইত—গায়ত্রী মন্ত্রে তাহা বেশ পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দেবী সাবিত্রীর মহাজ্যোতির ধ্যান করি—সেই ধ্যান হইতেই আমাদের মনের ও দেহের সকল ক্রিয়ায় শক্তিসঞ্চয় করি। এই স্তুতি এই কথাই বলিতেছে যে বিশ্বের হৃৎপিণ্ডে যে শক্তির আশ্রয়, মানুষের সহিত তাহার অচ্ছেদ্য বন্ধন। যে অদ্বৈতবাদ ভাব ভারতের সর্বত্র ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত আছে এখানে তাহারই স্ফূর্তি। আহারের সময়ে যে স্তুতি তাহাও ঐ একই ছন্দের দ্যোতনা—অন্নশক্তি বিশ্বশক্তির দ্যোতক, অন্নের জীবন সেই অক্ষয় জীবনের সূত্রে বাঁধা থাক্। তৈত্তিরীয়-উপনিষদে আছে—এই পৃথিবীর সকল পদার্থই হয় খাদ্য নয় খাদক। উদক্ খাদ্য,—অগ্নি খাদক; আয়ু বা জীবন এই দেহের খাদ্য। পৃথিবী খাদ্য—আকাশ খাদক। ঐ উপনিষদেই আছে খাদ্য ও খাদক এক অপূর্ব বন্ধনে বদ্ধ। যাহার এই জ্ঞান লাভ হয় সে খাদ্য ও খাদকের সহিত এক হইয়া যায়। সে তখন মুক্ত। স্নানের মন্ত্রেও ঐ আশ্চর্য একত্ব। সমস্তই অদ্বৈতবাদের সুরে বাঁধা।

বৈদিকযুগের ধর্ম লইয়াই ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য। এ যুগের ধর্ম বলিলে প্রধানত যজ্ঞমূলক ধর্মই বুঝাইত। তাই এ যুগের সাহিত্যের সঙ্গে যজ্ঞের এত সম্পর্ক। বৈদিকযুগে যজ্ঞে তিনটি জিনিস না করিলে চলিত না। প্রথম আবৃত্তি, তারপর গান, অতঃপর যজ্ঞানুষ্ঠান কিভাবে হইবে তাহার পদ্ধতি। এই তিনটি বিষয়েরই চরম উৎকর্ষ এই সময়ে হইয়াছিল।

আর্যরা স্পষ্ট প্রকাশ-ভঙ্গী ও যথাযথ উচ্চারণের জন্য সর্বদা সতর্ক থাকিত। দস্যুদের বাক্‌যন্ত্রের দোষ ছিল বলিয়া আর্যরা তাহাদের 'অনার্য আর মৃধ্রবাক্' বলিত। আর্যদের উচ্চারণের সাত রকম রূপ ছিল। আর বাক্যের চারিটি পরিমিত পদ ছিল। কোন গ্রন্থ আবৃত্তি করিবার সময় তাহারা নানাপ্রকার স্বরের ইতর-বিশেষ করিত। একটা গোটা সূত্রই তৈরী হইয়াছিল বিশ্বামিত্রের আবৃত্তি-নৈপুণ্যের বর্ণনা করিবার জন্য।

উচ্চারণের ক্রমোন্নতির বেশ সুস্পষ্ট ধারা বাহির করিতে পারা যায়। যজ্ঞে উচ্চারণ করিবার কাটাছাঁটা পদ্ধতির সুন্দর আভাস আছে। তিন রকম উপায়ে উচ্চারণ করা হইত।

ধর্মকর্মও তিন রকম উপায়ে অনুষ্ঠিত হইত। আর এই তিন রকম উপায় তিনটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাতে ছিল—অর্কিগণ, হোতৃগণ ও

ঋত্বিক্‌গণ এই তিন সম্প্রদায়। ঋগ্বেদ যখন বর্তমান আকারে আসে নাই, তখন অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ইঁহাদের হাতে ছিল। ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের গোড়ার পাঠে এই তিন রীতির উল্লেখ আছে। বর্তমান সঙ্কলিত পাঠে কিন্তু নাই।

যজুর্বেদে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—যজ্ঞে যখন সাম ও যজু প্রযুক্ত হয় তখন তাহার ফল হয় সাময়িক, কিন্তু ঋকের ফল স্থায়ী। এই ঋক্, যজু ও সাম নিশ্চয়ই বৈদিক সঙ্কলনকে বুঝায় নাই। যজ্ঞে যে ঋক্-সূক্ত আওড়ান হইত তাহাকেই বুঝাইয়াছে। অনুষ্ঠান-পদ্ধতির মন্ত্রকেই বুঝাইয়াছে। তারপর সামের কথা। সাম গীত হইত।

ব্রাহ্মণযুগে বাগ্-বিশুদ্ধি সংস্কৃতি ও সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইত। কুরু-পাঞ্চালের ভাষা পরিশুদ্ধ ভাষার আদর্শ হইয়াছিল, উত্তরাঞ্চলের ভাষাকে লোকে ভাল বলিত—আর বৈদিকযুগে ছাত্রেরা দলে দলে উত্তরে যাইত। বাহিরের লোকেদের ভাষা আর্যরা ব্যবহার করিত না—তাহাদের ভাষা বলা নিষিদ্ধই ছিল। অপূত অপবিত্র ভাষা বলার জন্য কোন একটি আর্য পরিবারকে পৌরোহিত্য হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছিল। খুব সংস্কৃত এমন লোকের পক্ষেও আর্যজুষ্ট উচ্চারণ ধরা কঠিন হইত। তাঁহারাও সহজে পারিতেন না। শিক্ষা-দীক্ষাওয়ালা লোকেদের ভাষা ব্রাত্যরা বলিত। ইহা তাহাদের পক্ষে ছিল—দীক্ষিতবাক্ কিন্তু খুব সোজা সোজা (অ-দুরুক্ত) উচ্চারণ করিতেও তাহাদের বেগ পাইতে হইত। তাই, সেগুলি তাহাদের নিকট দুরুক্ত ছিল। এমন কি আর্য-ছাত্রদেরও ছেলেবেলার আবৃত্তি অভ্যাস করার প্রয়োজন হইত, ঠিক উচ্চারণ হইতেছে এইটিই তাহারা চাহিত। খুব ভোরে কাক-পাখী ডাকিবার আগেই তাহারা পুথি আওড়াইতে সুরু করিত। যাহারা চাষ-বাস করিত তাহাদের উচ্চারণ বড় পাকা রকমের ছিল না। উচ্চারণ দোষাবহদুষ্ট হওয়ার জন্য ঋগ্বেদে তাহাদের ভাষাকে পাপপ্রসূ বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণযুগে ইহাদের যোদ্ধজাতি হইতে আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহার কারণ, যোদ্ধজাতি লেখাপড়া করিত—একমাত্র অধ্যয়নেই তাহাদের জীবন কাটিয়া যাইত। তাহাদের বাগ্-ভঙ্গীর উৎকর্ষ তাহাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। বেদ-সংহিতার মধ্যে স্বরতত্ত্বের ক্রম-

বিবর্তনেব একটা ইতিহাস বেশ ধরা যায়। সার্থক স্বরের বিবর্তনের উপর একটি ঋক্ আছে। ঐতরেয় ও শতপথ আরণ্যক স্বরকে ঘোষ, উষ্ম ও ব্যঞ্জনে বিভক্ত করিয়াছে—দন্ত্য 'ন' ও মূর্ধন্য 'ণ'র ভেদ রহিয়াছে—'শ, ষ, স'র পার্থক্য নিরূপণ করিয়াছে। সন্ধির নিয়মাবলীও বিচার করিয়াছে। উপনিষদে মাত্রা (quantity), বল (accent), শাম (euphony) ও সন্তানের (relation of words) প্রয়োগ নির্ধারণ করিয়াছে।

বৈদিকযুগে আবৃত্তির ধারা অনেক রকম ছিল। ঐতরেয় আরণ্যক আবৃত্তির মাণ্ডূকা-ধারার (ভেকানুকারী ধারার) কথা বলিয়াছেন। উপনিষদ্-যুগে পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা মাণ্ডূক্যধারা মানিয়া চলিত। পরবর্তী সময়ে একটি ঋগ্বেদী সম্প্রদায় ছিল তাহাদের নাম মাণ্ডূক্যায়ণ। পাণিনি ইহাকে মণ্ডূক থেকে ব্যুৎপন্ন করিয়াছেন। আরণ্যকে ঋগ্বেদ আবৃত্তি করিবার তিনটি পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে—সে তিনটির নাম প্রতৃন্ন, নির্ভুজ ও উভয়মন্তরেণ। এই রকম উচ্চারণ, আবৃত্তি সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে।

[উদ্বোধন, ১৩৪২ ফাল্গুন, পৃ. ১৬৬—১৭৫]

প্রাচীন ভারতে গ্রাম্য-সমিতি

প্রাচীন ভারতে রাজশক্তি যথেচ্ছাচারের পোষণ করিতে পারিত না। রাজশক্তির পার্শ্বে জনসাধারণের মতের একটা প্রতিষ্ঠা ছিল। তাহার নাম ছিল 'সভা' ও 'সমিতি'। সভা ছিল সামাজিকভাবে মেলা-মেশার কেন্দ্র—আর সমিতি ছিল সমগ্র জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ বাণী। সমিতিতে রাজাকে উপস্থিত হইতে হইত। প্রয়োজন হইলে সমিতি রাজা নির্বাচন করিয়াও দিত। পরবর্তিকালে রাজশক্তি সঙ্কুচিত করিবার জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমরা মহাভারতে (শান্তিপর্ব, ৮৫ অধ্যায়, ৭-১২ শ্লোক) পাই। রাজকার্য-পরিচালনের জন্য অমাত্য-সভা ছিল। এই অমাত্যদিগের পরামর্শ না লইয়া রাজার কোন কিছু করিবার অধিকার ছিল না। অবশ্য এই সভায় রাজা নেতৃত্ব করিতেন। এই সভায় থাকিত চারিজন ব্রাহ্মণ, আটজন ক্ষত্রিয়, একুশজন বৈশ্য, তিনজন শূদ্র ও একজন সূত। এই সাঁইত্রিশ জনের মধ্যে আটজন আইনকানুন গঠনে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত থাকিত। যাহা হউক, ইহার পূর্বে বৈদিকযুগে রাজশক্তি যে যদৃচ্ছাক্রমে কার্য করিতে পারিত না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পরবর্তী সংহিতা, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সময়েও সভা, সমিতির প্রতাপ প্রবল ছিল। প্রয়োজন হইলে ইহারাই রাজাদিগকে পদচ্যুত পর্যন্ত করিতে পারিত। আপস্তম্বে লিখিত আছে রাজা 'পুর' (নগর) নির্মাণ করিবেন, পুরের অভ্যন্তরে তাঁহার 'বেশ্ম' (প্রাসাদ) থাকিবে। বেশ্মের দ্বার হইবে পূর্বমুখ। পুরের দক্ষিণে 'সভা' সংস্থিত

থাকিবে। সভার ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল। মহাভারত যুগে কিন্তু এই সভা মাত্র যোদ্ধ-সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে রাজা ও তাঁহার অন্তরঙ্গ মিত্রগণ কর্তব্য মীমাংসা করিয়া লইতেন। কেবল পরামর্শ হিসাবে সভার মত লইতেন।

একই বংশের বিভিন্ন শাখার পাশাপাশি ছোট ছোট অনেকগুলি বাড়ী লইয়া 'গ্রাম' তৈয়ারী হইত। গ্রামের চারিদিকে বেষ্টনী দিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে শত্রু বা বন্য জন্তুর আক্রমণ হইতে গ্রামকে সুরক্ষিত রাখা হইত। পুর্ ছিল গ্রামের একটি অংশ। মাটির গড় দিয়া পুর্ ঘেরা থাকিত। পুরের চারিদিকে বৃত্তাকারে এক বা ততোধিক প্রস্তরাদি নির্মিত দুর্গও থাকিত। গ্রামের চেয়ে বড় ছিল 'বিশ্'। কয়েকটি 'বিশ্' একত্র করিলে যাহা হইত তাহার নাম ছিল 'জন'। জনকেও কখন কখন গ্রামও বলা হইত। 'ভরত'রা কোথাও 'জন' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, কোথাও আবার 'গ্রাম' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। 'বিশ্' আকারে গ্রামের চেয়ে বড় ছিল বটে, কিন্তু গ্রাম যে বিশের অধীন ছিল, একথা বলা যায় না। গ্রাম বলিলে যে সম্পূর্ণ বিশ্ বা কতকগুলি বিশের অংশ বুঝাইত, ইহাও বলা যায় না।

প্রাচীন ভারতে গ্রামের চারিটি বিভাগ ছিল বলিয়া বোধ হয়। মানসার নির্দেশ করিয়াছে যে, গ্রামের ব্রাহ্ম্য, দিব্য, মনুষ্য ও পৈশাচ এই চারিটি বিভাগ। ব্রাহ্ম্য বিভাগে ১/১৬ ব্রাহ্মণ, দিব্য বিভাগে ৩/১৬ ক্ষত্রিয়, মনুষ্য বিভাগে ৫/১৬ বৈশ্য ও পৈশাচ বিভাগে ৭/১৬ শূদ্র থাকিবে। যে গ্রাম বা পুর্ সম্পূর্ণ ছিল না, তাহার এইরূপ বিভাগও থাকিত না। শুক্রনীতির (১ম অধ্যায়, ৫৬, ৫৭ শ্লোক) নির্দেশ আছে যে, গ্রামে বা নগরে এক-এক জাতির বাড়ী শ্রেণীবদ্ধ আকারে থাকিবে আর সে পঙ্ক্তির নাম হইবে 'সমুদায়'। বাজারে এক-এক রকমের দোকান (আপনি) পৃথক্ পৃথক্ পঙ্ক্তিতে সাজান থাকিবে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও (২.৪) নির্দেশ আছে যে, পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায় পৃথক্ পৃথক্ স্থানে থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ব্যবসায়ীরা স্বতন্ত্র স্থানে থাকিবে। কেবল চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নতম জাতিরা তাহাদের কৃত ঘৃণ্য কর্মের জন্য গ্রামের বাহিরে থাকিবে (অর্থশাস্ত্র

৪.২)। বৌদ্ধযুগে গ্রামগুলি ধান ক্ষেতের ধারে ধারে কতকগুলি কুটীর লইয়া সংস্থিত থাকিত। দুইখানি গ্রামের মধ্যে একটি মহাবনের ব্যবধান থাকিত।

গ্রামে ছোট ছোট মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে 'গ্রাম্যবাদী'রা বিচার করিয়া দণ্ডবিধান করিতেন। গ্রামে একজন যোদ্ধকর্মাধ্যক্ষ ও কিছু সেনা থাকিত। ইহাদের কাজ ছিল গ্রাম রক্ষা করা। প্রত্যেক গ্রামের একজন অধিপতি থাকিত। অধিপতিকে 'গ্রামণী' বলিত। গ্রামণীর military ও civil উভয় ক্ষমতাই ছিল। এছাড়া একটি গ্রামের যিনি অধ্যক্ষ তাঁহার নাম হইত 'গ্রামিক'। দশটি গ্রামের অধ্যক্ষ 'দশপ' নামে পরিচিত হইত। একটি পরিবারের উপযোগী শস্য গ্রামিক ভোগ করিত। 'গ্রামভোজক', শস্যের কর নির্ধারণ করিয়া দিত।

গ্রামের সমুদায়গুলি পাড়া বা মহল্লার অনুরূপ। এক-একটি সমুদায়ে যতগুলি পরিবার বাস করিত তাহাদের সামাজিক ও ব্যবসায়িক ঐক্য ছিল। সমস্ত সমুদায় বা পাড়া একটি পরিবারের মত ছিল। সমস্ত পাড়া যেন একটি পরিবার। পাড়ার লোকেরা সারাদিনের কাজের শেষে এক জায়গায় মিলিত হইত। তাহাদের সামাজিক ও ব্যবসায়িক জীবন কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হইত। আর সেই নিয়মগুলি সকলেই ধর্মজ্ঞানে পালন করিত। পাড়ায় সকলে পরস্পর বিবাহ, পান, ভোজন প্রভৃতি বন্ধনে আবদ্ধ থাকিত। সামাজিক আইন-কানুন সকলেই শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া চলিত। কাহারও অবস্থা হীন হইলে সাহায্য পাইত। পরস্পরের সাহায্য ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাহারা বার্ত্তিক নিয়ম মানিয়া চলিত। এ সকলের জন্য সমিতি বসিত। মন্দির, পুণ্যশালা, ধর্মশালা, হাসপাতাল প্রভৃতি পরিচালনের জন্য তাহাদের সভা, সমিতিতে রীতিমত বৈঠক চলিত।

তখন গ্রাম ও নগর একই নিয়মে চলিত। গ্রামের লোক শহরে আসিয়া ফাঁপরে পড়িত না। সেখানে সে নিজের জাতির, সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ের লোক পাইত। সেখানে সে দেখিত, নাগরিক জীবন তার গ্রাম্য জীবনেরই অনুরূপ। এখন লোক নাগরিক জীবনে সামাজিক নিয়ম,

সম্পর্ক ও দায়িত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত মনে করে; কিন্তু পূর্বে তাহা করিত না। সমাজের প্রতি কর্তব্য সকল সময় তার মনে উদ্বুদ্ধ থাকিত। সমাজ তাহাকে ভুলিত না, সেও সমাজকে ভুলিতে পারিত না। যদিও জাতি ও ব্যবসায়ের ভিত্তির উপর গ্রাম ও নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রত্যেক গ্রাম নিজের নিজের বন্দোবস্ত করিত; নিজেদের পরিচালন-ভার নিজেদের উপর রাখিত। গ্রামগুলি পরস্পরের প্রতি অথবা নগরের প্রতি কর্তব্য কখনও ভুলিত না।

প্রাচীন ভারতে রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম ও বিধিব্যবস্থার মধ্য দিয়া ব্যক্তিত্বকেই বাড়াইয়া তোলা হইত না। পূর্বে বলিয়াছি রাজা শাসন করিতেন, ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থার বিধিসঙ্গত গণ্ডির মধ্যে যাহাতে প্রজা সকল আবদ্ধ থাকে তাহার বন্দোবস্ত করিতেন, কিন্তু সেগুলি কেবল তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছার উপরই নির্ভর করিত না। সে সকল বিধি-ব্যবস্থার যথার্থ নিয়ন্তা ছিল শাস্ত্র, আর সে সকল শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিয়মের বিনিয়োগ বা প্রবর্তন ব্যাপারের কর্তা ছিল এক-একটি সঙ্ঘ। রাজা তাহার প্রধান ব্যক্তি হইলেও তিনি সে সকল বিষয়ে স্বেচ্ছাচার করিতে পারিতেন না; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতির মধ্য হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া যে একটি সঙ্ঘ বা মন্ত্রণা সভা থাকিত, রাজা তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া সমবেতভাবে রাজকার্য পরিচালন করিতে বাধ্য থাকিতেন। রাজা রাজকীয় কার্যে যে কেবল মন্ত্রণা-সভারই নির্দেশ মানিতেন তাহা নয়, কোথাও কোথাও দেখা যায় রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে অতি গুরুতর বিষয়েও তিনি সাধারণ প্রজাবর্গেরও মতামতের 'অপেক্ষা' করিতেন; রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যাভিষেকের সময়ে রাজা দশরথের সে বিষয়ে প্রজাবর্গের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তাহাদের আহ্বানই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর প্রাচীন বিধি-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া যে কোনও একটি বিশেষ জাতি বা কোনও একটি বিশেষ ব্যক্তিকে বাড়াইয়া তোলা হইত না, ইহা আবার একটি প্রণিধানযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ভারতে ব্যবস্থাপকেরা মানিতেন—সমগ্র সমাজ একটি অখণ্ড বস্তু। সমাজের প্রত্যেক জাতি বা প্রত্যেক ব্যক্তি তাহারই এক-একটি অঙ্গস্বরূপ। বাড়াইতে হইলে সমগ্র সমাজকেই বাড়াইতে হইবে। তাহা না করিয়া

যদি সমাজের কোনও একটি অঙ্গ, কোন বিশেষ জাতি বা ব্যক্তিকে বাড়ান যায়, আর সমাজের অন্য অংশ পূর্ববৎ অবর্ধিতই থাকে, তাহা হইলে সে সমাজে তাহার স্থান নাই। তাহার বর্ধিতায়ন রক্ষা করিতে হইলে তাহার যতটুকু অবকাশের প্রয়োজন অপর অংশ হইতে তাহা লাভ করা তাহার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়, সমাজের অন্যান্য অংশ বা অঙ্গের সহিত তাহার দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ অপরিহার্য। তাহার ফলে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট এমন কি অবস্থা-বিশেষে সত্তালোপ পর্যন্ত অসম্ভব নয়। এই জন্যই প্রাচীন ভারতের ব্যবস্থাপকেরা সর্বদাই এ বিষয়ে সাবধান থাকিতেন; যাহাতে সমাজে ব্যক্তি অসম্ভবরূপে আস্পদ লাভ করিয়া স্ফীত হইয়া না ওঠে তাহার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের বিধিব্যবস্থার ফলে সমগ্র সমাজটিই বাড়িয়া ওঠা উচিত। সমগ্র সমাজ বাড়িয়া ওঠার অর্থ সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই বাড়িয়া ওঠা। সমাজ ব্যক্তিরই সমষ্টিরূপ। এইরূপে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যথানিয়মে থাকিলে সমগ্র সমাজের আয়তন বৃদ্ধি পাইত। তাহার ফলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় স্বীয় বর্ধিতায়ন রক্ষা করিতে যথাযোগ্য অবকাশ লাভ করিত। কাহার সহিত কাহারও বিরোধ বাঁধিত না। সমাজের সর্বত্রই একটা নিয়ম বা শৃঙ্খলা বিরাজ করিত; সমাজের সর্বত্র একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হইত। প্রাচীন ভারতের গ্রাম্যসমিতি হইতেই সমাজ তথা দেশ শাসিত হইত।

প্রাচীন ভারতে নগর সম্পূর্ণরূপে গ্রামের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিল। গ্রামের শ্রীবৃদ্ধিতে নগরের শ্রীবৃদ্ধি ও নগরের শ্রীবৃদ্ধিতে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হইত। গ্রামগুলি বাহির হইতে দেখিতে যেন স্বতন্ত্র ছিল, যেন গ্রাম গ্রামেরই কার্য করিত। আচার, ব্যবহার, সামাজিকতায় গ্রামগুলি নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যও রক্ষা করিয়া চলিত। কিন্তু নগর ছিল কেন্দ্রস্বরূপ; এই কেন্দ্র হইতে সকল সরলরেখারই সাম্রাজ্যরূপ বৃত্তরেখার সকল অংশের সহিত সমান সম্বন্ধ ছিল। গ্রামসকলের সমষ্টিভূত শক্তি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ নগরে সঞ্চিত হইয়া সেই সঞ্চিত শক্তি সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত। সুতরাং গ্রামের ধ্বংসের সহিত নগরের এবং সেই অনুপাতে সাম্রাজ্যের ক্ষতি হইত। এক অতি বিচিত্র কৌশলে সেকালে সাম্রাজ্য একতাবন্ধনে আবদ্ধ

থাকিত। তখন নগরবাসী আপনাকে নিজ গ্রাম ও সমাজের অধীন বলিয়াই জানিত—নগরের সহিত কর্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সমাজকে দূরে ঠেলিতে পারিত না। নগরেও সে তাহার সামাজিকতা রক্ষা করিতে বাধ্য হইত। এখন আমরা নগরে থাকিয়া স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলি। তখন কিন্তু এত সহজে স্বাতন্ত্র্য হারাইতে পারিত না। ইহার ফলে তখন একতার বন্ধন দৃঢ় ছিল এবং সকল গ্রামকে প্রত্যক্ষভাবে নগরের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে গিয়া গৌণভাবে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইত। সুপ্রাচীন কালের না হইলেও দৃষ্টান্তস্বরূপ পাটলিপুত্র নগরের কথা বলা যাইতে পারে। আমরা মেগাস্থিনিসের বিবরণ অবলম্বনে বলিতে পারি যে, উক্ত নগরের ত্রিশজন মিউনিসিপ্যাল কমিশনর সকল গ্রাম হইতেই নির্বাচিত হইতেন। গ্রামের যাঁহারা মণ্ডল তাঁহারা ঐ পদে অভিষিক্ত হইতেন। কমিশনরেরা বিভিন্ন গ্রাম ও বিভিন্ন সমাজের নেতা হইলেও নগরের কার্য পরিচালন করিতে গিয়া সাধারণভাবে ও সাম্রাজ্যের সাধারণ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশের শ্রমশিল্প, বাণিজ্য ও কর সংগ্রহ প্রভৃতি সাধারণ কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। একদিকে তাঁহাদের যেমন স্বগ্রাম ও স্বসমাজের প্রতি লক্ষ্য ছিল, অপরদিকে তেমনই তাঁহাদের জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিও লক্ষ্য ছিল। এত বড় বড় কার্যের খুঁটিনাটি সভা, সমিতির ভিতর দিয়াই সূচিত হইত। সভা, সমিতি প্রজার কল্যাণপ্রদ বলিয়া সর্ব-মঙ্গলনিদান প্রজাপতির কন্যা বলিয়া অথর্ববেদে (৭. ১২. ১) বর্ণিত হইয়াছে।

"সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং প্রজাপতের্দুহিতরৌ সংবিদানে।"

প্রাচীন ভারতের সকলকেই প্রত্যহ অপরাহ্নে সভা-সমিতিতে যাইতে হইত। সেখানে সাধারণত আমোদ, প্রমোদ, ক্রীড়া, তর্ক, সাহিত্যা-লোচনা প্রভৃতি হইত। এ ছিল নিত্য ব্যাপার। ইহার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে নৈমিত্তিক ব্যাপারও হইত। এই নৈমিত্তিক ব্যাপারে ধর্ম, সমাজ বা রাজনীতি সম্বন্ধীয় গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হইত। এই নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের নাম ছিল "সমিতি-সমবায়"। পরে ইহা "গোষ্ঠী-সমবায়" নামে অভিহিতও হইয়াছিল। শাসন ব্যাপারেও সভা, সমিতি যথেষ্ট কার্য

করিত। তখনকার নিয়ম ছিল যে, নগর বা গ্রামের মধ্যভাগ দিয়া একটি উত্তর-দক্ষিণ ও আর একটি পূর্ব-পশ্চিম মুখে দুইটি বড় রাস্তা যাইবে। দুই রাস্তায় যেখানে সংঘর্ষ সেইখানে ব্রহ্মার মন্দির বা সাধারণ মিলনের স্থান 'মণ্ডপ' তৈয়ারী করা হইবে। এই মণ্ডপে সভার অধিবেশন হইত। শুক্রনীতি বলে নগরের মধ্যভাগে 'সভা' সংস্থিত থাকিবে। বস্তুত গ্রামে ও নগরে সভার স্থান। সভা, সমিতির মঙ্গলপ্রদ কেন্দ্র যে প্রাচীন ভারতে দেশের ও দশের ক্ষেমাস্পদ হইয়া প্রভূত উপকার করিয়াছিল, তাহা কে না স্বীকার করিবে?

[নব্যভারত, ফাল্গুন, ১৩২৯, পৃ. ৫৫৮-৫৬২]

অতিথিসংবিভাগ

জৈন ব্রত-বিশেষ। নামান্তর—বৈয়াবৃত্ত্য। এই ব্রত অতি সাবধানে পালন করিতে হয়। অতিথিসংবিভাগে ব্রত গ্রহণ করিবার সময় ব্রতীকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হয়—'আমি অতিথিসংবিভাগ নামক ১২শ ব্রত অঙ্গীকার করিতেছি; ইহা দ্বারা আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, শ্রমণ বা নির্গ্রন্থ যে চতুর্দশ দ্রব্য নির্দোষে গ্রহণ করিতে পারেন তৎসমুদয়ের যে কোন একটি আমি তাহাকে প্রদান করিব।'[১] করণ্ডশ্রাবকাচারে অতিথিসংবিভাগ-সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইহাতে পাওয়া যায়—সংযমীদের দুঃখাপনোদন, তাঁহাদের পাদসংবাহন এবং তাঁহাদের গুণের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্যান্য প্রকারে তাঁহাদের সেবার নাম বৈয়াবৃত্ত্য।

ব্যাপত্তিব্যাপনোদঃ পদয়োঃ সংবাহনং চ গুণরাগাৎ।
বৈয়াবৃত্ত্যং যাবানুপগ্রহোঽন্যোঽপি সংযমিনাম॥

অতিথিসংবিভাগ বা বৈয়াবৃত্ত্য পালন করিতে হইলে নিম্নলিখিত দানাদি ব্যাপারে অবহিত হইতে হইবে।

নবপুণ্যৈঃ প্রতিপত্তিঃ সপ্তগুণসমাহিতেন শুদ্ধেন।
অপসূনারম্ভাণামার্যাণামিষ্যতে দানম্॥'

পবিত্র সাধুগণ গৃহস্থদের ন্যায় ভোজ্যদ্রব্যাদি পেষণাদি করেন না, অগ্নি প্রজ্বালিত করান না। এইরূপ সাধুগণকে নয় প্রকার পুণ্যসংকারের দ্বারা অভ্যর্থিত করিতে হইবে। শুদ্ধ প্রসিদ্ধ সপ্তগুণ-সমাহিত ইঁহাদের

ভোজ্যাদি প্রদান করিতে হইবে। গৃহস্থের এই কার্য 'দান' নামে অভিহিত।

সাধুর প্রতি গৃহস্থের নবপুণ্যসৎকার বলিলে নিম্নলিখিত নয়টি কর্তব্য বুঝিতে হইবে, যথা—(১) সাধুর চরণে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার; (২) তাঁহাকে উচ্চাসন প্রদান; (৩) তাঁহার পাদধৌতকরণ ও শ্রদ্ধার চিহ্নস্বরূপ সেই ধৌতজল নিজ কপালে প্রদান; (৪) তাঁহার পূজন; (৫) তাঁহার প্রতি প্রণতি; (৬-৮) স্বীয় কায়, মন ও বাক্যকে পবিত্রভাবে রাখা; (৯) তাঁহাকে বিশুদ্ধ উপযুক্ত খাদ্য প্রদান।

গৃহস্থের সপ্তগুণ—যথা: (১) শ্রদ্ধা; (২) সন্তোষ; (৩) ভক্তি; (৪) জ্ঞান; (৫) সংযম; (৬) ক্ষমা; (৭) শক্তি (energy of assiduity)।

জৈনগণের শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, জল যেমন রক্তকে ধুইয়া ফেলে সেইরূপ শ্রদ্ধাপূর্বক অতিথিকে আহার্য দান করিলে গৃহীর সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। গৃহীর কর্মের দাগ আত্মা হইতে ধুইয়া যায়।

'গৃহকর্মণাপি নিচিতং কর্ম বিমার্ষ্টি খলু গৃহবিমুক্তানাম্।
অতিথীনাং প্রতিপূজা রুধিরমলং ধাবতে বারি॥'

অতিথিকে প্রণাম করিলে উচ্চ গোত্রে জন্ম হয়, অতিথিকে দান দিবার ফলে প্রচুর সৌভাগ্য ভোগ হইয়া থাকে। তাঁহাকে সেবা করিলে রাজসম্মানের ন্যায় পূজা লাভ হয়; তাঁহাকে ভক্তি করিলে সুন্দর রূপ লাভ হয় এবং তাঁহার গুণাবলীর স্তুতি করিলে কীর্তি লাভ হয়।

'উচ্চৈর্গোত্রং প্রণতের্ভোগো দানাদুপাসনাৎ পূজা।
ভক্তেঃ সুন্দররূপং স্তবনাৎ কীর্তিস্তপোনিধিষু॥'

এমন কি সৎপাত্রে অল্পদান করিলেও বহু ইষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। জৈনগণ বলেন—

'ক্ষিতিগতমিব বটবীজং পাত্রগতং দানমল্পমপি কালে।
ফলতিচ্ছায়াবিভং বহুফলমিষ্টং শরীরভৃতাম্॥'

যাঁহারা মতি, শ্রুত, অবধি ও মনঃপর্যায় এই চারিপ্রকার জ্ঞান আস্বাদন করিয়া থাকেন, তাঁহারা আহার, ঔষধ, জ্ঞানের উপকরণ অর্থাৎ পুস্তকাদি

এবং আশ্রয়াবাস প্রদানকে চতুর্বিধ অতিথিসংবিভাগ বা বৈয়াবৃত্ত্য বলিয়া থাকেন।

'আহারৌষধয়োরপ্যুপকরণাবাসয়োশ্চ দানেন।
বৈয়াবৃত্ত্যং ব্রুবতে চতুরাত্মত্বেন চতুরস্রাঃ॥'

জৈনশাস্ত্রে চতুর্বৈয়াবৃত্ত্য-ব্যাপারে চারিজন আদর্শ পুরুষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহাদের নাম—শ্রীষেণ[1], বৃষভসেন[2], কোণ্ডেশ[3], ও শূকর[4]

'শ্রীষেণবৃষভসেনে কোণ্ডেশঃ শূকরশ্চ দৃষ্টান্তাঃ।
বৈয়াবৃত্ত্যস্যৈতে চতুর্বিকল্পস্য মন্তব্যাঃ॥'

অতিথিসংবিভাগব্রতীকে প্রত্যহ ইষ্টপ্রদাতা কামদুগ্ধিদাহক দেবাধিদেবের অর্থাৎ তীর্থঙ্করের[5] চরণ পূজা করিতে হইবে। তাহা হইলে সকল দুঃখ দূর হইবে।

'দেবাধিদেবচরণে পরিচরণং সর্বদুঃখনির্হরণম্।
কামদুহি কামদাহিনি পরিচিনুয়াদাদৃতো নিত্যম্॥'

অতিথিসংবিভাগ বা বৈয়াবৃত্ত্যের পাঁচটি ব্যতিক্রম বা অবিচার আছে।

'হরিতপিধাননিধানে হ্যনাদরাস্মরণমৎসরত্বানি।
বৈয়াবৃত্ত্যস্যৈতে ব্যতিক্রমাঃ পঞ্চ কথ্যন্তে॥

(১) দাতব্য পদার্থ হরিৎপত্রে স্থাপন, (২) দাতব্য পদার্থ পদ্মপত্রদ্বারা আবৃতকরণ, (৩) দানকালে অতিথির প্রতি অসম্মান বা অনাদর প্রদর্শন, (৪) দানকালে দানের নিরূপিত পদ্ধতির বিস্মরণ ও (৫) অপর দাতার প্রতি মৎসরবুদ্ধিজনিত ভাব পোষণ—এই পাঁচটি অতিথিসংবিভাগের অতিচার।

মতান্তরে পঞ্চ অতিচার—(১) সচিত্ত অর্থাৎ জীবযুক্ত পাত্রে ভোজ্যদান (সচিত্তনিক্ষেপণয়া); (২) জীবযুক্ত পাত্রে আবৃত করিয়া দান (সচিত্ত-পেক্ষণয়া); (৩) সন্ন্যাসীদের নিরূপিত ভোজনকালে উল্লঙ্ঘনপূর্বক দান (কালাকমদানে); (৪) নিজে দান না করিয়া অপরের দ্বারা দান (পরবেদসে); (৫) অপরের দান দেখিয়া ঈর্ষাবুদ্ধিজনিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্বক দান (মাচ্ছরয়া)।

দ্বাদশ শীলব্রতের মধ্যে ৩টি গুণব্রত ও ৪টি শিক্ষাব্রতের সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জৈনগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকুন্দকুন্দনাচার্যের[6] (চারিত্রপহুদ) মতে দিগ্, অনর্থদণ্ড এবং ভোগোপভোগ পরিমাণ এই তিনটি গুণব্রত এবং সাময়িক, প্রোষধোপবাস, অতিথিপূজন ও সল্লেখনা—এই চারিটি শিক্ষাব্রত। শ্রীদেবসেনাচার্য[7] (ভাবসংগ্রহ) ও শিবকোটি আচার্য[8] (রত্নমালা) এই মত পোষণ করেন। তত্ত্বার্থাধিগম-সূত্রকার উমাস্বতি[9] বলেন—দিগ্ দেশ ও অনর্থদণ্ড লইয়া গুণব্রত এবং সাময়িক, প্রোষধোপবাস, ভোগোপভোগ পরিমাণ ও অতিথিসংবিভাগ শিক্ষাব্রতের অন্তর্গত। সর্বার্থসিদ্ধিগ্রন্থে শ্রীপূজ্যপাদ[10], যশস্তিলকচম্পূতে সোমদেব[11], চারিত্রসারে চামুণ্ডরায়[12], সুভাষিত রত্নসন্দোহ ও ধর্মপরীক্ষায় অমিতগতি[13] ও ধর্মসুর্ধাভ্যুদয়ে শ্রীহরিশ্চন্দ্র[14] এই একই মতবাদ সমর্থন করেন। ইঁহারা সল্লেখনাকে গৃহীর ব্রত বলেন নাই।

স্বামী সামন্তভদ্রাচার্য[15] এবং সাগরধর্মামৃতকার আশাধরজি[16] শ্রীকুন্দ-কুন্দনাচার্যস্বীকৃত গুণব্রতের নামগুলি স্বীকার করেন। কিন্তু শিক্ষাব্রত বলিতে তাঁহারা বুঝেন—দেশাবকাশিক, সাময়িক প্রোষধোপবাস ও বৈয়াবৃত্ত্য। অনুপ্রেক্ষগ্রন্থে স্বামী কার্ত্তিকেয়[17] দেশাবকাশিকব্রতকে শিক্ষা-ব্রতের চতুর্থ স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। আদিপুরাণ-কার শ্রীজিনসেনা-চার্যের[18] মতে গুণব্রত তিনটি—দিগ্, দেশাবকাশিক ও অনর্থদণ্ড। ভোগোপভোগ পরিমাণও গুণব্রত। শিক্ষাব্রত চারিটি—সাময়িক, প্রোষ-ধোপবাস, অতিথিপূজন ও সন্ন্যাস। বসুনন্দি[19] তাঁহার শ্রাবকাচার গ্রন্থে শীলব্রত হইতে সাময়িক ও প্রোষধোপবাসকে বাদ দিয়াছেন। তাঁহার মতে দিগ্, দেশাবকাশিক ও অনর্থদণ্ড গুণব্রত এবং ভোগবিরতি, পরিভোগ নিবৃত্তি, অতিথিসংবিভাগ ও সল্লেখনা শিক্ষাব্রত। ইহাতেও শীলব্রতের সংখ্যা সাতই পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ভোগবিরতি ও পরিভোগনিবৃত্তি প্রাচীন ভোগোপভোগ পরিমাণে ব্রতের দুইটি অংশমাত্র। শ্বেতাম্বর জৈন-দিগের মতে সপ্তশিক্ষাব্রত—দিগ্, উপভোগপরিমাণ, অনর্থদণ্ড, সাময়িক, দেশাবকাশিক, প্রোষধোপবাস ও অতিথিসংবিভাগ। উপাসকদসে এইরূপ বিবৃতি পাওয়া যায়। হেমচন্দ্রাচার্য[20] (যোগশাস্ত্র), সিদ্ধসেন[21] ও

যশোভদ্রা[২২] প্রথম তিনটিকে গুণব্রত ও অবশিষ্ট চারিটাকে শিক্ষাব্রত বলিয়াছেন।

পাদটীকা

১ C. J. Shah: Jainism in North India, 1932, 142; Mrs. Sinclair Stevenson: The Heart of Jainism. Oxf. 1915, 218.

[বঙ্গীয় মহাকোষ দ্বিতীয় খণ্ড ৬০-৬২]

প্রসঙ্গ-কথা

1—4 শ্রীষেণ, বৃষভসেন, কোণ্ডেশ, শূকর : আহারদানের জন্য শ্রীষেণ প্রসিদ্ধ হন। ওষধিদানের জন্য বৃষভসেন-কন্যা প্রসিদ্ধা হন। শাস্ত্রদানের জন্য গোপ কোণ্ডেশ পরজন্মে কেবলী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বাসস্থান-দানের জন্য শূকর স্বর্গলোকে মহা ঋদ্ধিসম্পন্ন দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও মুনিদের দানের জন্য আরও অনেকে স্বর্গাদি উচ্চ লোক প্রাপ্ত হয়েছেন তবুও আগম প্রসিদ্ধ বলে এঁদের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।—রত্নকরণ্ডশ্রাবকাচার

5 তীর্থঙ্কর : তীর্থ শব্দটি জৈন পরিভাষায় বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত। সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক (গৃহী উপাসক), শ্রাবিকা (গৃহী উপাসিকা) রূপ চতুর্বিধ সংঘকে তীর্থ বলা হয়। যিনি এই তীর্থ প্রতিষ্ঠা করে মোক্ষ লাভের পথ নির্দেশ করেন তাঁকে তীর্থঙ্কর বলা হয়। জৈনরা মুখ্যত কালকে দুভাগে বিভাজিত করেন—উৎসর্পিণী (ক্রমিক অভ্যুদয়ের কাল), অবসর্পিণী (ক্রমিক অবনতির কাল)। উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী এই ক্রমে কালচক্র প্রবর্তিত হয়। উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণীর আবার ছটি করে ভাগ বা 'অর' আছে। জৈনদের বিশ্বাস উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণীর তৃতীয় ও চতুর্থ অরে চব্বিশজন করে তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। জৈন সাহিত্যে বর্তমান অবসর্পিণীর ২৪ জন অতীত ও ভবিষ্যৎ উৎসর্পিণীর তীর্থঙ্করদের নাম পাওয়া যায়। জৈনরা তীর্থঙ্করদের দেবাধিদেব বলেন কারণ তীর্থঙ্করেরা দেবতাদেরও পূজ্য। জৈন মান্যতায় দেবতারাও জন্মমরণশীল। একমাত্র তীর্থঙ্কর বা মুক্তপুরুষ পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন না। জৈনরা তীর্থঙ্করদের এইজন্য পূজা করেন যে তাঁরা তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। বীতরাগ হবার জন্য তাঁদেরও সে ক্ষমতা নেই। পূজার উদ্দেশ্য ভক্ত সে ভাবে ভাবিত হয়ে কালে সেই অবস্থা লাভে সমর্থ হবে।

6 শ্রীকুন্দকুন্দনাচার্য (কুন্দকুন্দাচার্য) (খ্রী. ২য় শতক): দিগম্বর সম্প্রদায়ে অসাধারণরূপে সম্মানিত আচার্য কুন্দকুন্দের মূল নাম পদ্মনন্দি। কোণ্ডকুন্দ তাঁর মূল স্থান হওয়ায় তিনি ঐ নামে প্রসিদ্ধ হন। সংস্কৃতে কোণ্ডকুন্দ কুন্দকুন্দরূপ লাভ করে। বলা হয় ইনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। ইন্দ্রনন্দি-কৃত শ্রুতাবতারে বলা হয়েছে যে কুন্দকুন্দাচার্য ষট্খণ্ডাগমের প্রথম তিন খণ্ডের ওপর পরিকর্ম নামে ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তা এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ইনি ৮৪টি পাহুড় রচনা করেন বলেও জানা যায়। কিন্তু তার মধ্যেও সময়সার, প্রবচনসার, নিয়মসার, অষ্টপাহুড়, পঞ্চাস্তিকায়, রয়নসার, নিয়মসার, মূলাচার, দশভক্তি আদি ১২টি পাহুড় মাত্র পাওয়া যায়। অনেকে এঁকে এলাচার্য বলে অভিহিত করেন। তামিল বেদ কুরল নাকি এঁরই রচনা।

7 শ্রীদেবসেনাচার্য (খ্রী. ৯ম-১০ম শতাব্দী): পঞ্চস্তূপ সংঘের গুর্বাবলী অনুসারে ইনি ধবলাকার বীরসেনের শিষ্য। প্রাকৃত ও সংস্কৃতে ইনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। যথা—দর্শনসার, ভাবসংগ্রহ, আরাধনা-সার, তত্ত্বসার, জ্ঞানসার, আলাপপদ্ধতি, ধর্মসংগ্রহ ইত্যাদি।

8 শিবকোটি আচার্য: প্রাচীন আচার্য কিন্তু কোন গুর্বাবলীতে এঁর নাম পাওয়া যায় না। এঁর রচনা ভগবতী আরাধনা পাঠ করলে মনে হয় ইনি সেই সময় বর্তমান ছিলেন যখন সংঘ শিথিলাচারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তাই মনে হয় ইনি কুন্দকুন্দ বা উমাস্বাতির পূর্ববর্তী ছিলেন। সমন্তভদ্রকেও অনেকে শিবকোটির গুরু বলে অভিহিত করেন, কিন্তু তা সর্বমান্য নয়।

9 উমাস্বাতি (উমাস্বতি) (খ্রী. ১ম ২য় শতক): নন্দী সংঘের বলাৎকারগণের গুর্বাবলী অনুসারে ইনি কুন্দকুন্দাচার্যের শিষ্য ছিলেন, ভিন্নমতে যাপনীয় সংঘের কোন আচার্য। এঁর প্রসিদ্ধ রচনা—তত্ত্বার্থসূত্র, সভাষ্য তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের সমান মান্য।

10 শ্রীপূজ্যপাদ: কর্ণাটক দেশের কোন গ্রামের মাধবভট্টের পুত্র। এঁর অলৌকিক সিদ্ধি সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। অপর নাম

—জিনেন্দ্রবুদ্ধি, দেবনন্দি, দেবেন্দ্রকীর্তি। ইনি জৈনেন্দ্রব্যাকরণ, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, শব্দাবতার, ছন্দঃশাস্ত্র, বৈদ্যসার, সর্বার্থসিদ্ধি, ইষ্টোপদেশ, সমাধিশতক সারসংগ্রহ, জৈনাভিষেক, সিদ্ধভক্তি, শান্ত্যষ্টক ইত্যাদি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সময় খ্রী. ৬ষ্ঠ শতক, ভিন্নমতে ৪র্থ-৫ম শতক।

11 সোমদেব (খ্রী. ১০ম শতক): মহাকবি নেমিদেবের শিষ্য ও যশোদেবের প্রশিষ্য। যদিও দিগম্বরাচার্য তবুও শিথিলাচারের জন্য এঁর রচনাকে দিগম্বর সমাজ প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেন না। যশস্তিলকচম্পূ ও নীতিবাক্যামৃত এঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। স্যাদ্বাদোপনিষদ্, ষণ্ণবতিপ্রকরণ প্রভৃতি আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

12 চামুণ্ডরায় (খ্রী. ১০ম শতক): গঙ্গাবংশীয় রাজা রাজমল্লের মন্ত্রী ও সেনাপতি। সঙ্গে সঙ্গে কবি ও গ্রন্থকার। ইনি প্রথমে আচার্য অজিত সেন পরে নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্ত চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন। রচনা—চামুণ্ডরায় পুরাণ ও চরিত্রসার। শ্রবণবেলগোলে ৫৭ ফুট দীর্ঘ একটি প্রস্তরনির্মিত দণ্ডায়মান বিশালকায় গোমতেশ্বর মূর্তি এঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

13 অমিতগতি (খ্রী. ৯ম-১০ম শতাব্দী): মাথুর সংঘের গুর্বাবলী অনুসারে অমিতগতি ১ম-এর শিষ্য। রচনা—পঞ্চসংগ্রহ, জম্বুদ্বীপ-প্রজ্ঞপ্তি, সুভাষিতরত্নসন্দোহ, উপাসকাচার ই.।

14 শ্রীহরিশ্চন্দ্র (খ্রী. ১১শ শতক): নোমকবংশীয় অদ্রদেব শ্রেষ্ঠীর পুত্র। রচনা—ধর্মশর্মাভ্যুদয়, জীবন্ধরচম্পূ ই.।

15 স্বামী সমন্তভদ্রাচার্য (সামন্তভদ্রাচার্য) (খ্রী. ২য় শতকের শেষভাগ): মূল সংঘবিভাজন অনুসারে উমাস্বাতির শিষ্য বা তাঁর সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী কোন আচার্য। উরগপুরের ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত রাজপুত্র বলে বলা হয়। নাম শান্তিবর্মা। প্রভাচন্দ্রের নেমিদত্ত কথা অনুসারে কোন সময় এঁর ভস্মক ব্যাধি হয়। ফলে মুনিবেশ ত্যাগ করে ইনি রাজা শিবকোটির শিবালয়ের পূজারী হন। ব্যাধিমুক্তির জন্য ইনি স্বয়ম্ভূস্তোত্র রচনা করে পাঠ করতে আরম্ভ করলে শিবলিঙ্গ ভেদ করে

ভগবান্ চন্দ্রপ্রভর মূর্তি প্রকটিত হয় ও ইনি রোগমুক্ত হন। এতে প্রভাবিত হয়ে রাজা শিবকোটি কেবল জৈনধর্মই গ্রহণ করেন নি, দিগম্বরী দীক্ষাও গ্রহণ করেন। ইনি ষট্‌সভাগমের প্রথম পাঁচ খণ্ডের ওপর টীকা রচনা করেন। অন্যান্য রচনা—আপ্তমীমাংসা, রত্নকরণ্ডশ্রাবকাচার, মুক্ত্যানুশাসন, স্বয়ম্ভূস্তোত্র ই.।

16 আশাধর (খ্রী. ১১শ-১২শ শতক) : নাগোরের কাছে সপাদলক্ষ দেশের মঙ্গলগড়ে জন্ম। বাদশাহ শহাবুদ্দিনের ভয়ে মালবের ধারায় গিয়ে বসবাস করেন। রচনা—ক্রিয়াকলাপ (অমরকোষের টীকা), ব্যাকরণ, ব্যাখ্যালঙ্কারটীকা (রুদ্রট-কৃত কাব্যালঙ্কারের), প্রমেয়-রত্নাকর, বাগ্‌ভট-সংহিতা, ভব্যকুমুদচন্দ্রিকা, অধ্যাত্মরহস্য, ইষ্টোপদেশটীকা, জ্ঞানদীপিকা, ই.।

17 স্বামী কার্ত্তিকেয় : কার্ত্তিকেয়ানুপ্রেক্ষার রচয়িতা। কিন্তু গ্রন্থের কোথাও গ্রন্থকর্তার স্বামী কার্ত্তিকেয় এই নাম বলা হয় নি। সম্ভবত কুমার অবস্থায় দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য এঁর নাম স্বামী কুমার বা কার্ত্তিকেয় হয়। বলা হয়েছে রোহেড় নগরের ক্রৌঞ্চরাজ কর্তৃক সৃষ্ট উপসর্গে ইনি অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে মৃত্যুবরণ করেন। এঁর সময় ভগবতী আরাধনার আগে বা কুন্দকুন্দাচার্যেরও আগে বলা হয়েছে। কিন্তু তা সর্বমান্য নয়।

18 জিন সেনাচার্য (খ্রী. ৮ম শতক) : পুন্নাট-সংঘের আচার্য কীর্তিসেনের শিষ্য। ৭৮৩ খ্রী. গুজরাতের বর্ধমানপুরে (বঢ়বাণ) হরিবংশপুরাণ রচনা করেন।

19 বসুনন্দি (খ্রী. ১১শ শতক) : মাঘনন্দির গুর্বাবলী অনুসারে নেমিচন্দ্রের শিষ্য। অপর নাম—জয়সেন। রচনা—আপ্তমীমাংসা-বৃত্তি, বস্তুবিদ্যা, মূলাচারবৃত্তি, জিনশতক, প্রতিষ্ঠাপাঠ, শ্রাবকাচার।

20 হেমচন্দ্রাচার্য (হেমচন্দ্র সূরি) : 'জৈন সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

21 সিদ্ধসেন (খ্রী. ৪র্থ-৫ম শতক) : যদিও শ্বেতাম্বরাচার্য তবুও মাধ্যস্থ ভাবনার জন্য দিগম্বর আম্নায়েও এঁর গ্রন্থ থেকে উদ্ধরণ দেওয়া হয়।

তর্কপূর্ণ পাণ্ডিত্যের জন্য এঁকে দিবাকর বলা হয়েছে। সমন্তভদ্রের অনুরূপ কিম্বদন্তী এঁর সম্বন্ধেও পড়ে যায়। এঁর রচিত দ্বাত্রিংশিকা-গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্মতিতর্ক ও ন্যায়াবতার এঁরই রচিত এরূপ বলা হয়।

22 যশোভদ্র: তার্কিক ও বাদী বিজেতা ছিলেন। সময় পূজ্যপাদের পূর্ববর্তী।

অণুব্রত

জৈনদিগের লঘু ব্রতবিশেষ। এই সকল ব্রতে মহাব্রত অপেক্ষা অল্প বিষয় থাকে বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। প্রসিদ্ধি আছে—'সব্বগয়ং সম্মত্তং, সুএ চরিত্তেন পজ্জবা সব্বে। দেসবিরইং পড়ুচ্চ, দোহ্ন বি পড়িসেবণং কুজ্জা।' অথবা 'সর্ববিরতাহপেক্ষয়াহণোর্লঘোগুণিনো ব্রতানি অণুব্রতানি।'—স্থানাঙ্গসূ. বাণা ৫, উদ্দেশ. ১। যাঁহার হৃদয় মোহরূপ তিমিরাচ্ছন্ন তিনি সম্যগ্দর্শন লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু সম্যগ্-দর্শনের পরিপন্থী এই মোহ-তিমির অপগত হইয়া যাঁহার সম্যগ্দর্শন প্রাপ্তি হইয়াছে তিনিই সম্যগ্জ্ঞানলাভের অধিকারী। এইরূপ সাধুপুরুষ রাগদ্বেষ নিবৃত্তির জন্য ব্রতানুষ্ঠানাদি করিয়া থাকেন। শ্রীসামন্তভদ্র[1]-কৃত 'রত্নকরণ্ড-শ্রাবকাচার' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে অণুব্রত-সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা আছে। ইহার ৩য় খণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে—

"মোহতিমিরাপহরণে দর্শনলাভাদবাপ্তসংজ্ঞানঃ।
রাগদ্বেষনিবৃত্ত্যৈ চরণং প্রতিপদ্যতে সাধুঃ।" ৪৭

জৈনশাস্ত্রে আছে, যে ব্যক্তি আত্মপ্রবৃত্তির মূল বিষয়গুলি সংযম করিয়া পাপকার্য হইতে বিরত এবং স্বীয় অর্থবৃত্তি বিষয়ে অনপেক্ষিত অর্থাৎ জীবিকোপায়ের চেষ্টা যাঁহার নাই, তিনি নৃপতিরও সেবায় প্রবৃত্ত হন না। যে প্রবৃত্তি হইতে রাগ ও দ্বেষের উদ্ভব হয় তাহা হিংসা ও অন্যান্য পঞ্চবিধ পাপের কারণ; সুতরাং রাগ ও দ্বেষের নিবৃত্তি হইতে পঞ্চবিধ পাপ, হিংসা প্রভৃতির নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সেই জন্য রাগদ্বেষ-নিবৃত্তির উদ্দেশ্য ব্রতানুষ্ঠান কর্তব্য।

"রাগদ্বেষনিবৃত্তের্হিংসাদিনিবর্তনা কৃতা ভবতি।
অনপেক্ষিতার্থবৃত্তিঃ কঃ পুরুষঃ সেবতে নৃপতীন্॥" ৪৮

যিনি সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, হিংসা, মিথ্যা, চৌর্য, মৈথুনসেবা ও রাগ এই পঞ্চবিধ পাপের নিবৃত্তি করা তাঁহারই চরিত্রের উপযোগী।

"হিংসানৃতচৌর্যেভ্যো মৈথুনসেবাপরিগ্রহাভ্যাং চ।
পাপপ্রণালিকাভ্যো বিরতিঃ সংজ্ঞস্য চারিত্রম্॥" ৪৯

সম্যক্ চারিত্র্য দুই প্রকারের—'সকল' অর্থাৎ নির্দোষ বা নির্গুণ এবং 'বিকল' অর্থাৎ দোষযুক্ত ও সগুণ; ইহাদের মধ্যে যে সন্ন্যাসী বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন তিনি নির্গুণ এবং যে সমুদয় সাধারণ ব্যক্তি অর্থাৎ গৃহী এখনও সংসারে লিপ্ত আছেন তাঁহারা সগুণ লাভ করেন।

"সকলং বিকলং চরণং তৎসকলং সর্বসঙ্গবিরতানাম্।
অনগারাণাং বিকলং সাগরাণাং সসঙ্গানাম্॥" ৫০

গৃহীর ব্রত ত্রিবিধ। তিনি অণু, গুণ ও শিক্ষাব্রতসমূহের (প্রতি জ্ঞান ব্যাপারের) অধিকারী। এই অণু, গুণ ও শিক্ষাব্রতসমূহও যথাক্রমে পঞ্চবিধ, ত্রিবিধ, ও চতুর্বিধ।

"গৃহিণাং ত্রেধা তিষ্ঠত্যণুগুণশিক্ষাব্রতাত্মকং চরণম্।
পঞ্চ-ত্রি-চতুর্ভেদং ত্রয়ং যথাসঙ্খ্যমাখ্যাতম্॥" ৫১

হিংসা, মিথ্যাচার, চৌর্য, মৈথুনসেবা ও রাগ এই স্থূল পাপসমূহের উপকরণকে অণু (অপ্রধান) ব্রত নামে আখ্যাত করা হয়।

"প্রাণাতিপাতবিতথব্যাহারস্তেয়কামমূর্ছেভ্যঃ।
স্থূলেভ্যঃ পাপেভ্যো ব্যুপরমণমণুব্রতং ভবতি॥" ৫২

বিচারপূর্বক চিন্তায়, ভাষায় ও দেহে 'কৃত', 'কারিত' ও 'মনন' এই তিনটির যে কোন একটি উপায়ে প্রাণাতিপাত হইতে নিবৃত্ত হওয়াকে এবং দুই বা ততোধিক বোধশক্তির অধিকারী হওয়াকে জ্ঞানিগণ 'অহিংসা অণুব্রত' বলিয়া থাকেন।

"সঙ্কল্পাৎকৃতকারিতমননাদ্যোগত্রয়স্য চরস্ত্বান্।
ন হিনস্তি যত্তদাহুঃ স্থূলবধাদ্বিরমণং নিপুণাঃ॥" ৫৩

ছেদন ও বন্ধন করা, বেদনা দেওয়া, অতিভার অর্পণ করা, উপবাস

করান বা যথাসময়ে আহার না দেওয়া এই পাঁচটি দোষ অহিংসা অণুব্রতের অতিচার।

"ছেদন-বন্ধন-পীড়নমতিভারারোপণং ব্যতীচারাঃ।
আহারবারণাপি চ স্থূলবধাদ্‌ব্যুপরতেঃ পঞ্চ॥" ৫৪

আপনার বাক্ সংযত করিয়া অপরের বাক্‌স্ফূর্তিতে সুযোগ দেওয়া এবং স্থূল মিথ্যাচার ও যে সত্যে অপরের মনোবেদনার উদ্রেক করে তাহার সুবিধা দেওয়াকে সাধুগণ 'সত্যাণুব্রত' বলিয়া থাকেন:

"স্থূলমলীকং ন বদতি ন পরান্ বাদয়তি সত্যমপি বিপদে।
যত্তদ্বদন্তিসন্তঃ স্থূলমৃষাবাদবৈরমণম্॥৫৫

পরিবাদ বা নিন্দা প্রচার করা, অপরের গোপনীয় ব্যাপার ও বৈকল্য প্রকাশ করা, পরোক্ষে পরদোষ কীর্তন করা, মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করা এবং ন্যাস অর্থাৎ অপরের নিকট হইতে গৃহীত সমুদয় বস্তু প্রত্যর্পণ না করা এই পাঁচটি গৃহীর সত্যাণুব্রতের আচরণের ৫টি অন্তরায়।

"পরিবাদরহোভ্যাখ্যা পৈশুন্যং কূটলেখকরণং চ।
ন্যাসাপহারিতাপি চ ব্যতিক্রমাঃ পঞ্চ সত্যস্য॥" ৫৬

যে ব্যক্তি অপরের নিহিত, পতিত বা সুবিস্তৃত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন না বা অপরকে প্রদান করেন না, তাঁহার এই কার্যকে অচৌর্যবৃত্তিব্রত বলে।

"নিহিতং বা পতিতং বা সুবিস্তৃতং বা পরস্বমবিসৃষ্টম্।
ন হরতি যন্ন চ দত্তে তদকৃশচৌর্যাদুপাহরণম্॥" ৫৭

অপহরণ করিবার উপায় ব্যাপারে অপরকে উপদেশ দেওয়া, অপহৃত দ্রব্য গ্রহণ করা, আইনের আদেশ কৌশলপূর্বক পরিহার করা, অপদ্রব্য মিশ্রণ করা এবং মিথ্যা মান ও পরিমাপক রক্ষা করা গৃহীর অচৌর্যবৃত্তির এই পাঁচটি অতিচার।

"চৌরপ্রয়োগচৌরার্থাদানবিলোপসদৃশ সন্মিশ্রাঃ।
হীনাধিকবিনিমানং পঞ্চাস্তেয়ে ব্যতীপাতাঃ॥" ৫৮

পাপের ভয়ে যে ব্যক্তি পরদারে গমন করেন না বা অপরকে পরদারের প্রতি আসক্ত হইবার জন্য প্ররোচিত করেন না, তিনিই অণুব্রত অবলম্বন

করিয়াছেন বলিয়া কথিত হন—তিনি পরস্ত্রীতে অনাসক্ত এবং আপন স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট।

"ন তু পরদারান্ গচ্ছতি ন পরান্ গময়তি চ পাপভীতের্যৎ।
স পরদারনিবৃত্তিঃ স্বদারসন্তোষনামপি॥" ৫৯

অন্যবিবাহকরণ (ঘটকালি), অনঙ্গক্রীড়া, বিটত্ব বিপুলকামতৃষ্ণা, ইত্বরিকাগমন এই পাঁচটি গৃহীর ব্যতীচার।

"অন্যবিবাহকরণানঙ্গক্রীড়াবিটত্ববিপুলতৃষঃ।
ইত্বরিকাগমনং চাস্মরস্য পঞ্চ ব্যতীচারাঃ॥" ৬০

ধনধান্যাদি পার্থিব সম্পদের যিনি যথাযথ নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির করিয়া তদোধিক কিছু কামনা করেন না, তাঁহার এই ব্রতের নাম পরিগ্রহ-পরিমাণ (possessions limiting) বা ইচ্ছা-পরিমাণ (desire limiting)।

'ধনধান্যাদিগ্রন্থং পরিমায় ততোহধিকেষু নিস্পৃহতা।
পরিমিত পরিগ্রহঃ স্যাদিচ্ছাপরিমাণনামপি॥' ৬১

পার্থিব সম্পত্তি, অর্থাৎ ধন, ধান্য প্রভৃতির নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির করিয়া অধিক আকাঙ্খা না করার নাম 'পরিগ্রহ-পরিমাণ' ব্রত; ইহার অপর নাম 'ইচ্ছা-পরিমাণ'॥ ৬১॥

প্রয়োজনাতিরিক্ত বাহন সংগ্রহ, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ প্রচুর পরিমাণে সংরক্ষণ, অপরের জাঁক-জমক ও সমৃদ্ধিতে বিস্ময়প্রকাশ এবং অতিলোভ ও পশুর উপর অত্যধিক ভারার্পণ—এই পাঁচটি পরিগ্রহ-পরিমাণ ব্রতের ব্যতিক্রম॥ ৬২॥

"অতিবাহনাতিসংগ্রহবিস্ময় লোভাতিভারবহনানি।
পরিমিতপরিগ্রহস্য চ বিক্ষেপাঃ পঞ্চ লক্ষ্যন্তে॥" ৬২

কোন ব্যতিক্রম না করিয়া গৃহীর অপ্রধান ব্রতসমূহের সমাচারণ করিলে সুরলোকে জন্মগ্রহণের ফললাভ করা যায়—তথায় আত্মার অবধিজ্ঞান বা দিব্যদর্শন, বিস্ময়কর শক্তি ও দিব্যশরীর লাভ হয়॥ ৬৩॥

"পঞ্চাণুব্রতনিধয়ো নিরতিক্রমণাঃ ফলন্তি সুরলোকম্।
যত্রাবধিরষ্টগুণাঃ দিব্যশরীরং চ লভ্যন্তে॥" ৬৩

নিম্নজাতীয় যমপাল,[2] ধনদেব,[3] বারিষেণ,[4] নীলী[5] ও জয়কুমার[6] যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম ব্রতানুষ্ঠান করিয়া সকলের শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥

"মাতঙ্গো ধনদেবশ্চ বারিষেণস্ততঃ পরঃ।

নীলী জয়শ্চ সংপ্রাপ্তাঃ পূজাতিশয়মুত্তমম্ ॥" ৬৪

ধনশ্রী,[7] সত্যঘোষ[8] ও যমদণ্ড[9] (police officer), তাপসী[10] এবং তাঁহাদের মত একই উপায়ে শ্মশ্রুনবনীত যথাক্রমে অখ্যাতিলাভ করিয়াছেন ॥ ৬৫ ॥

"ধনশ্রীসত্যঘোষৌ চ তাপসারক্ষকাবপি।

উপাখ্যেয়াস্তথা শ্মশ্রুনবনীতো যথাক্রমম্ ॥" ৬৫

পাঁচটি অণুব্রতের সমাচরণ এবং মদ্য মাংস ও মধুতে বিরাগ—এইগুলি শ্রেষ্ঠ সাধুগণ কর্তৃক গৃহীর অষ্টবিধ গুণ বলিয়া অভিহিত।

"মদ্যমাংসমধুত্যাগৈঃ সহাণুব্রতপঞ্চকম্।

অষ্টৌ মূলগুণানাহুর্গৃহিণাং শ্রমণোত্তমাঃ ॥" ৬৬

শ্রীঅমৃতচন্দ্র সূরি[11] তাঁহার 'পুরুষার্থ-সিদ্ধোপায়ে' কোথাও পৃথগ্ রূপে মূলগুণগুলির উল্লেখ করেন নাই। তিনি প্রথম ব্রত অর্থাৎ অহিংসা অণুব্রতের অন্তর্গত করিয়া মূলগুণ গুলির উল্লেখ করিয়াছেন। সোমদেব সূরি[12] তাঁহার 'যশস্তিলকচম্পূ'তে এবং শ্রীদেবসেনাচার্য[13] তাঁহার 'ভাব-সংগ্রহে', পঞ্চপ্রকার উদম্বর ও ত্রিবিধ মকার (মদ্য, মাংস ও মধু) পরিবর্জন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। ইঁহারা এই আটটিকে অষ্টমূলগুণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন। কবি রাজমল্লও[14] তাঁহার 'পঞ্চাধ্যায়ী' ও 'লতিসংগ্রহ' নামক পুস্তকদ্বয়ে এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীঅমিতগতি আচার্য[15] তাঁহার 'উপাসকাচার'—গ্রন্থে ত্রিমকার ও পঞ্চ উদম্বরের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অধিকন্তু বলিয়াছেন যে রাত্রিকালে আহার বিরমণ মূলগুণ বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার বিবৃতিতে আটের পরিবর্তে নয় সংখ্যা পাওয়া যাইতেছে। পণ্ডিত আশাধরজি[16] তাঁহার গ্রন্থের একস্থানে (১) পর্যুসিত (বাসি) নবনীত, (২) রাত্রি-ভোজন, চুয়ান জল, (৪.৮) পঞ্চ উদম্বর এবং (৯.১১) ত্রিমকারকে মূলগুণের অন্তর্গত করিয়াছেন, অন্যত্র (সাগরধর্মা-

মৃত) আবার এইগুলির পরিবর্তে (১.৫) পঞ্চ উদম্বর, (৬) স্তুতি (প্রাত্যহিক পূজা), (৭) অহিংসা (mercy), (৮) চুয়ান জল এবং (৯.১১) ত্রিমকার-বিরমণের উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চকরণ্ড-শ্রাবকাচার-রচয়িতা শ্রীসামন্তভদ্রাচার্য এবং রত্নমালা-কার শ্রীশিবোক্তি আচার্য[17] ইঁহারা দুই জনেই অষ্ট মূলগুণ বলিতে পঞ্চ-অণুব্রত ও ত্রিমকার বুঝিয়াছেন। আদিপুরাণ-প্রণেতা শ্রীজিনসেনাচার্যও[18] মূলগুণসম্বন্ধে এই মত পোষণ করেন। তবে তিনি মধুকে বাদ দিয়া তাহার স্থানে জুয়া (gambling) ধরিয়াছেন। দেশকালপাত্রানুসারেই তিনি এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্বেতাম্বর[19] জৈনগণের গ্রন্থে মূলগুণ সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া যায় না। ভোগোপভোগ পরিমাণ ব্রত নামক দ্বিতীয় গুণব্রতের বর্ণনায় দিগম্বরগণের[20] পরিজ্ঞাত মূলগুণের বিবৃতি তাঁহারা প্রদান করিয়াছেন। উমাস্বতি আচার্য-কৃত[21] শ্রাবকপ্রজ্ঞপ্তিতে মূলগুণের কোন ইঙ্গিত নাই। তবে হরিভদ্রসূরি[22] তাঁহার টীকায় সেগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। যোগসার-প্রণেতা হেমচন্দ্রাচার্যের[23] মতে প্রত্যেক ধার্মিক গৃহস্থের ত্রিমকার, পর্যুসিত নবনীত, পঞ্চ উদম্বর, যে দ্রব্যে একাধিক জীব থাকে তাহা, রাত্রিভোজন, দুগ্ধজাত দ্রব্যমিশ্রণে প্রস্তুত ডাল, ভোজ্য পুষ্প, পর্যুসিত দধি ও দূষিত শস্য পরিত্যাগ করা উচিত।

শ্রাবকাচার-প্রণেতা শ্রীবসুনন্দির[24] মতে, যতদিন না প্রথম প্রতিমার অধিকার পাওয়া যায় ততদিন রাত্রি-ভোজন পরিত্যাগ করা কর্তব্য। ভাবসংগ্রহ-কার বামদেবও[25] এই মত সমর্থন করেন। পণ্ডিত আশাধরজি বলেন, প্রথমে গোধূমাদি ত্যাগ করিতে হইবে এবং তাহার অনুষ্ঠানের ক্রমোন্নতি অনুসারে অন্যান্য ভোজনসামগ্রী ত্যাগ করা বিধেয়। তবে দ্বিতীয় প্রতিমার অধিকার লাভ হইলে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে এ সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে। এই কারণে তিনি রাত্রিভোজন বিরমণকে গৃহীর ষষ্ঠ অণুব্রত বলেন। চরিত্রসার-রচয়িতা চামুণ্ডরায়[26] দ্বিতীয় প্রতিমায় এই অভ্যাস ত্যাগের বিধি নিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনিও ইহাকে ষষ্ঠ অণুব্রত নামে অভিহিত করেন। শ্রীবীরনন্দি আচার্যও[27] এই বিধি

দিয়াছেন, তবে তিনি ইহাকে শ্রাবকাচার বলিয়াছেন, গৃহস্থাচার বলেন নাই। ইঁহার মতে রাত্রিভোজন-বিরমণ শ্রাবকদিগের ষষ্ঠ অণুব্রত।

সকল গ্রন্থকারই ষষ্ঠ প্রতিমায় দিবাবিহার নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। স্বামী সামন্তভদ্রাচার্য, ধর্মোপদেশপীযূষবর্ষ-রচয়িতা এবং কবি রাজমল্ল মূলগুণ বা ষষ্ঠ অণুব্রতে রাত্রিভোজনের ব্যবস্থা নিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে সপ্তম প্রতিমার পূর্বে রাত্রি বিহার কর্তব্য এবং রাত্রিভোজন নিষিদ্ধ এরূপ বাঁধাবাঁধি কোন নিয়ম নাই। বীরনন্দি আচার্যের মতে ষষ্ঠ অণুব্রতের গোধূমাদি হইতে প্রস্তুত খাদ্য নিষিদ্ধ, ষষ্ঠ প্রতিমায় রাত্রি-ভোজন সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। নেমিদত্তের[২৪] মতে ষষ্ঠ প্রতিমা পর্যন্ত রাত্রিকালে ঔষুধ, জল ও পান সেবন করা যাইতে পারে। তবে ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়।

[বঙ্গীয় মহাকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৩৬-৩৯]

প্রসঙ্গ-কথা

1 সমন্তভদ্র (সামন্তভদ্রাচার্য) : 'অতিথিসংবিভাগ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

2—6 যমপাল (মাতঙ্গ), ধনদেব, বারিষেণ, নীলী, জয়কুমার : অহিংসা ব্রতধারণকারী চণ্ডাল মাতঙ্গ, সত্যব্রতধারণকারী বণিকপুত্র ধনদেব, অচৌর্যব্রতধারণকারী রাজপুত্র বারিষেণ, ব্রহ্মচর্যব্রতধারিণী শ্রেষ্ঠীকন্যা নীলী ও পরিগ্রহ-পরিমাণ ব্রতধারী জয়কুমার ইহলোকে পূজ্য ও পরলোকে দেবত্বপ্রাপ্ত হয়। অনুরূপ ব্রতধারী/ধারিণী স্বর্গে গেছেন কিন্তু এঁদের নাম আগমসিদ্ধ বলে এখানে উল্লেখ করা হল।—রত্নকরণ্ডশ্রাবকাচার।

7—10 ধনশ্রী, সত্যঘোষ, তাপসী, যমদণ্ড, শ্মশ্রুনবনীত : হিংসার জন্য ধনশ্রী, অসত্যভাষণের জন্য সত্যঘোষ, চুরি করবার জন্য তাপসী, দুঃশীলের জন্য কোটাল যমদণ্ড ও পরিগ্রহকারী শ্মশ্রুনবনীত ইহলোকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে পরলোকে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।—ঐ

11 অমৃতচন্দ্র সূরি (খ্রী. ৯ম-১০ম শতক) : প্রসিদ্ধ দিগম্বরাচার্য সময়-সারের ওপর আত্মখ্যাতি টীকা, প্রবচনসারের ওপর তত্ত্বপ্রদীপ টীকা, পঞ্চাস্তিকায়ের ওপর তত্ত্বপ্রদীপিকা টীকা, পরমধ্যাত্মতরঙ্গিণী, পুরুষার্থ-সিদ্ধ্যুপায়, তত্ত্বার্থসার প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

12 সোমদেব : 'অতিথিসংবিভাগ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

13 দেবসেন : ঐ

14 রাজমল্ল (খ্রী. ১০ম শতক) : কাষ্ঠাসংঘী ভট্টারক সম্প্রদায়ের পণ্ডিত। রচনা—লাটীসংহিতা, সময়সারের অমৃতচন্দ্রাচার্য কৃত টীকার ওপর সুগম হিন্দী বাচনিকা, পঞ্চাস্তিকায়টীকা, পঞ্চাধ্যায়ী ইত্যাদি।

15 অমিতগতি : 'অতিথিসংবিভাগ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

16 আশাধর : ঐ

17 শিবোক্তি (সম্ভবত খ্রী. ১০ম শতক) : জনৈক দিগম্বর সাধু তত্ত্বার্থ-সূত্রের ওপর রত্নমালা নামে টীকা রচনা করেন। শিথিলাচার পোষক গ্রন্থ।

18 জিনসেন : 'অতিথিসংবিভাগ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

19—20 শ্বেতাম্বর, দিগম্বর : জৈন সম্প্রদায় প্রধানত দুভাগে বিভক্ত—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। যাঁদের সাধুসম্প্রদায় শ্বেতবস্ত্র ধারণ করেন তাঁরা শ্বেতাম্বর ও যাঁদের সাধুরা নগ্ন থাকেন তাঁরা দিগম্বর। উভয় সম্প্রদায়ই প্রাচীন জৈন সম্প্রদায়ের বংশধর বলে দাবী করেন ও একে অন্যকে অর্বাচীন বলেন। ভগবান মহাবীরের সময়ে আমরা সচেলক (বস্ত্রসহিত), অচেলক (বস্ত্ররহিত), জিনকল্পী (নগ্ন), স্থবিরকল্পী (বস্ত্র পরিহিত) সাধুর অস্তিত্ব দেখতে পাই। কিন্তু তখন নগ্নত্ব নিয়ে সংঘবিচ্ছেদ ঘটেনি। এই সংঘবিচ্ছেদ ঘটে দ্বিতীয় ভদ্রবাহু দাক্ষিণাত্য গমনের এক শ বছরের মধ্যে অর্থাৎ খ্রী. ১ম শতকে। ভদ্রবাহুর শিষ্য-প্রশিষ্যরা যখন আবার উত্তর ভারতে ফিরে আসেন তখন প্রত্যেক সাধুকে নগ্ন থাকতে হবে বলে মূল সংঘ থেকে পৃথক হয়ে যান ও নিজেদের শ্বেতাম্বর ও এর বিপরীত মূল সংঘ দিগম্বর বলে পরিচিত হয়।

21 উমাস্বতি (উমাস্বাতি) : 'অতিথিসংবিভাগ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

22 হরিভদ্রসূরি (খ্রী. ৪র্থ—৫ম শতক) প্রখ্যাত তার্কিক ও দার্শনিক শ্বেতাম্বরাচার্য। চিত্রকূটরাজের রাজ পুরোহিত ছিলেন। পরে জৈনধর্মে দীক্ষিত হন। রচনা—কৃতি-ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়, লীলা-বিস্তারটীকা, জম্বুদ্বীপসংঘায়নী, অনুযোগদ্বারবৃত্তি, যোগদৃষ্টিসমুচ্চয়, ধর্মসংগ্রহিণী ইত্যাদি।

23 হেমচন্দ্র : 'প্রাচীন সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র

24 বসুনন্দি : 'অতিথিসংবিভাগ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

25 বামদেব : জৈন গ্রন্থকার।

26 চামুণ্ডরায় : 'অতিথিসংবিভাগ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

27 বীরনন্দি আচার্য (খ্রী. ১০ম-১১শ শতক): প্রথমে মেঘচন্দ্র ত্রৈবিদ্যদেবের শিষ্য ছিলেন। পরে বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য অভয়নন্দি আচার্যের শরণে আসেন। রচনা—চন্দ্রপ্রভচরিতকাব্য, শিল্পীসংহিতা, আচারসার ই.।

28 নেমিদত্ত (খ্রী. ১৬শ শতক): নন্দিসংঘের বলাৎকারগণের গুর্বাবলী অনুসারে মল্লিভূষণের শিষ্য। রচনা—প্রভাচন্দ্রের কথাকোশের ভাষানুবাদ, আরাধনাকোশ, নেমিপুরাণ ই.।

বৌদ্ধযুগে শিল্প-শিক্ষা

ভারতে শিক্ষা-প্রচারে বৌদ্ধদের হাত খুব বেশী। বৌদ্ধযুগে দেখিতে পাওয়া যায় হীনযান[1] বৌদ্ধধর্মের সহিত গৃহস্থদের তত বেশী সম্বন্ধ ছিল না, কিন্তু কিছু পরেই অশোকের সময়েই দেখা যায় বৌদ্ধধর্মকে গৃহস্থের ধর্ম করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রচণ্ড চেষ্টা হইতেছে। অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম মগধের একটি স্থানীয় ধর্ম-সম্প্রদায় ছিল, মহাযান[2] কিন্তু সকলকেই আপন করিয়াছিল. সেখানে ভিক্ষুক গৃহস্থের পার্থক্য ছিল না, সব মনুষ্যই বোধিসত্ত্ব। মুক্তির দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। বৌদ্ধশাস্ত্র ও ইতিহাস আলোচনা করিয়া বলিতে পারা যায় যে, প্রথম হইতেই বৌদ্ধবিহার শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। এক-একটি বৌদ্ধবিহারই ছিল এদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। বুদ্ধের সময় হইতে দীর্ঘকাল পর পর্যন্ত জেতবনবিহার[3] বৌদ্ধদর্শনের কেন্দ্র ছিল। ফা-হিয়েন[4]ও তাঁহার সময়ে জেতবনের এই গৌরবের উল্লেখ করিয়াছেন। পাটলীপুত্রের কুক্কুটারাম[5]বিহার অশোকের সময়ে এবং তাঁহার পরেও খুব বিখ্যাত ছিল। এই সকল বিহার বড় বড় ভিক্ষু, পণ্ডিত ও বহু শিষ্যের সঙ্ঘ ছিল। সকল রকম জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এখানে হইত; এই চর্চায় জাতিভেদের কোন বাধা ছিল না; অবশ্য ব্যবহারিক শিল্পের এখানে স্থান ছিল না। আয়ুর্বেদ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত, ইহা সেখানে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই রকম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ঐতিহাসিক চিহ্ন বোধ হয় পাওয়া যায় সারনাথের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। এক নম্বর বিহারটিকে বিহার বলিয়া মনে হয় না; বিহারগুলি চতুঃশালা

হইত। এটি ঠিক তেমন নয়। ভিক্ষুদের অবস্থান স্থানও নিতান্ত অপ্রচুর; ইহার সম্মুখে বড় বড় চত্বর ছিল; বড় বড় দরজা ছিল। ইহা বিদ্যালয়-রূপেই ব্যবহার হইত বলিয়া মনে হয়।

বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করিবার সময় প্রথমেই নালন্দার[6] নাম করিতে হয়। সমগ্র বৌদ্ধ জগতে নালন্দার তুলনা ছিল না। সে সময় এ রকম বিদ্যালয় আর কোথাও ছিল না। যুয়ন-চয়ঙ[7] বলেন শক্রাদিত্য[8] এখানে বিহার নির্মাণ করেন। অতঃপর বুধগুপ্ত[9] ও পরে তথাগতগুপ্ত[10], বালাদিত্য[11] এবং বালাদিত্য-পুত্র প্রভৃতি বহু রাজা এখানে বিহারাদি নির্মাণ করেন। নালন্দার বিরাট্ প্রাসাদগুলির বর্ণনায় চৈনিক পরিব্রাজকরা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিখিয়াছিলেন সপ্ততল প্রাসাদের চূড়া মেঘ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। প্রাসাদের কারুকার্য দেখিয়াও বিস্মিত হইতে হয়।

দূর দেশ-বিদেশ হইতে সকল ধর্মের ছাত্রেরা এখানে আসিত।

বিভিন্ন শিল্পের পরিচয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে যথেষ্ট পাওয়া যায়—সে সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিব। বর্তমান প্রবন্ধে বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যে নানাবিধ শিল্প, শিল্পিগণ ও শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়; ইহাদের অবলম্বন করিয়াই কলা-শিক্ষার ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে।

সংস্কৃত-সাহিত্যে বিশেষত বাৎসায়ন[12]-কামসূত্রে সমুদয় জ্ঞানবিজ্ঞানের নাম দেওয়া হইয়াছে 'চতুঃষষ্টি যোগ'। রামায়ণে শিল্পাদির উদাহরণ আছে—যেমন, "গীতবাদিত্রকুশলা নৃত্যেষু কুশলাস্তথা। উপায়জ্ঞাঃ কলাজ্ঞাশ্চ বৈদিকে পরিনিষ্ঠিতাঃ॥" বাজসনেয়ি-সংহিতা, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ, হরিবংশ, ভবিষ্যপুরাণ এবং কথাসরিৎসাগরে শিল্প বুঝিতে প্রধানত সূক্ষ্ম কলা বা চারু শিল্পই বুঝায়। শিল্পের আবার দুই প্রকার ভাগও দেখা যায় —চৌষটি বাহ্য কলা ও চৌষটি আভ্যন্তর কলা। বাহ্য কলার উদাহরণ, ভাস্কর্য, নৃত্য, গীতাদি, ছুতোরের কাজ, কামারের কাজ ইত্যাদি। আভ্যন্তর কলার উদাহরণ,—চুম্বন, আলিঙ্গনাদি। এই কলার শ্রেণী-বিভাগ শাঙ্খায়ন-ব্রাহ্মণে, মহাভারত ও মনুতে আছে। মহাভারতে সাধারণ অর্থেও শিল্পকলার প্রয়োগ আছে। শৈবতন্ত্রে চতুঃষষ্টি কলার প্রত্যেকটির নাম

পাওয়া যায়। কামসূত্রে যে চতুঃষষ্টি যোগ আছে তাহা ও চতুঃষষ্টি কলা একই। বাৎস্যায়ন ঐ যোগ নারীদের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন; সে সকল নারী রাজগৃহে স্থান পাইবে অথবা শ্রেষ্ঠা গণিকা ইত্যাদি হইবে। ললিত-বিস্তরে[13] বুদ্ধদেব ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে নারী লিপিতে, কাব্য-রচনায়, সূত্র প্রভৃতিতে শিক্ষিতা হইবেন তাহাকেই তিনি গ্রহণ করিবেন। জৈন কল্পসূত্রে মহিলাদের জন্য চৌষট্টি গুণ-চর্চার বিবরণ আছে। শ্রীধর স্বামী[14] ভাগবত-পুরাণের ভাষ্যে বলিয়াছেন, যাদব রাজকুমাররা চৌষট্টি কলায় শিক্ষালাভ করিতেছেন। ঐ সকল কলা নারী বা পুরুষ কাহারও জন্য বিশেষ করিয়া নির্দিষ্ট হয় নাই; গুণ হিসাবে সকলেই উহাদের আহরণ করিতে পারিত। যে কোন জ্ঞান দ্বারা কাহারও মনোরঞ্জন করিতে পারা যায় তাহাই শিল্প কলা—এইরূপ কথাই শুক্রনীতিতে বলা হইয়াছে। বিভিন্ন কলাসমষ্টির নাম 'বেদ', এরূপও কয়েকটি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। 'গন্ধর্ববেদে' নৃত্য, গীত, শয্যাশিল্প ইত্যাদি সপ্তকলা আলোচিত হইত।

খারবেল[15] গান্ধর্ব বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের[16]ও এই বিদ্যায় বেশ দাবী ছিল। আয়ুর্বেদে দশকলার সন্ধান পাওয়া যায়; রন্ধন, উদ্যানতত্ত্ব, পুষ্পসারবিদ্যা প্রভৃতি এইরূপ দশকলা। ধনুর্বেদে যুদ্ধের অস্ত্র, বাহন, ব্যূহ-রচনা প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া পঞ্চকলার ব্যাখ্যা আছে।

আমাদের প্রাচীন ভারতে অনেক বিদ্যাপীঠের নাম পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিদ্যাপীঠে বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন প্রভৃতি আলোচিত হইত। সেগুলি কিন্তু শিল্পকলা-শিক্ষার স্থান ছিল না। সাংসারিক বিদ্যা বা শিল্প গণতন্ত্রীদের সভাতে আলোচিত হইত—কৌটিল্য[17] এইরূপই নির্দেশ করিয়াছেন। বৌদ্ধ-সাহিত্যের জাতকগুলিতেই সর্বপ্রথম পাওয়া যায় যে, বহু লোক শিল্প-শিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় যাইত। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লেখা আছে যে, ব্যবহারশাস্ত্রের জন্য তক্ষশিলা বিখ্যাত ছিল। মহাভারতের আদি পর্বে আছে, তক্ষশিলার লোকেরা বিদ্যায় অদ্বিতীয়। রাজপুত্রেরাও শিল্প-শিক্ষার জন্য সুদূর তক্ষশিলায় গমন করিত। ভীমসেন-জাতকে পাওয়া যায় যে, ধনুর্বিদ্যা শিখিতে লোকে তক্ষশিলায় গমন করিত। তক্ষশিলা আয়ুর্বেদের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইহা খ্রী-পূ. ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে যে উত্তর-ভারতে

সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ছিল তাহা নিঃসন্দেহ ; মাত্র শিল্পশিক্ষার কেন্দ্র নয় সর্ব-শাস্ত্রের শিক্ষাপীঠ বলিয়াই ইহার প্রসিদ্ধি ছিল। খ্রীস্ট-পূর্ব ৪র্থ শতকে গান্ধার-মধ্যবর্তী তক্ষশিলা ব্রাহ্মণ্য-শিক্ষার ও অন্যান্য শিক্ষার প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। ইহা বর্তমান রাওলপিণ্ডি হইতে ৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে। ব্রাহ্মণ ও বড় বড় লোকের ছেলেরা শিক্ষার জন্য এখানে আসিত। তক্ষশিলার ছাত্ররাও বারাণসী ও পাটলিপুত্রে পড়িতে যাইত। তক্ষশিলার তীক্ষ্ণধী ছাত্রেরা কখন কখন বারাণসীতে গিয়া শিক্ষকতাও করিত। যখন শিক্ষকেরা ছাত্র পড়াইতেন বা কাহারও সঙ্গে কোন বিশেষ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন, তখন তাঁহাদের হাতে বেশ সুন্দরভাবে বাঁধান বই থাকিত। বর্ষ[18], উপবর্ষ[19] ও পাণিনি[20] প্রথমে তক্ষশিলার ছাত্র ছিলেন। পরে তাঁহারা তক্ষশিলা ত্যাগ করিয়া পাটলিপুত্রে গমন করেন। রাজশেখরের[21] কাব্য-মীমাংসায় একথা লেখা আছে।

শিল্পশিক্ষার একটা বিশেষ ধারা এই ছিল যে ইহার শিক্ষা পুরুষানুক্রমে চলিত। বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিপুত্র হইয়া ব্যবসায় করিতেন, চিকিৎসকের পুত্র হইয়া ব্যবসায় করিতেন—ইহাতে যে বিদ্যার একটা উৎকর্ষ নিতান্ত সম্ভব তাহা না বলিলেও চলে। বিদ্যায় যে গতানুগতিক ভাবও আসিতে পারে তাহাও অসম্ভব নয়। কামারের ছেলে শিশুকাল হইতেই কামারের কাজ দেখিতে দেখিতে একটা সহজ শিক্ষা লাভ করে ; সে শিক্ষা নবাগতের পাইতে অনেক সময় কাটিয়া যাইত। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জাতিগত শিক্ষা অপেক্ষা ভাল উপায় পাওয়া যাইত না। প্রত্যেকের একটা পথ নির্দিষ্ট আছে ; তাহার অন্নের ব্যবস্থা জন্ম হইতেই হইয়া আছে। তবে জাত ব্যবসায় বদল করাও কিছু কঠিন ছিল না। উচ্চবর্ণের লোকেদেরও ব্যবসায় হিসাবে সাধারণ শিল্পকর্ম শিক্ষা করিতে দেখা যায়। জাতকে আছে, একজন ক্ষত্রিয় প্রথমে কুম্ভকারের কাজ করে, ঝুড়ি তৈয়ারীর কাজ করে, মালাকারের কাজ করে, শেষে সে পাচকেরও কাজ করিয়াছিল। তাহাতে কোন দোষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। জাতকে এমনও পাওয়া যায় যে, কোন ব্রাহ্মণ একজন তীরন্দাজের সহকারী হইয়াছে, সেই তীরন্দাজ আবার পূর্বে বয়ন করিত। একটি আখ্যায়িকায়

পাওয়া যায় যে, এক ব্রাহ্মণ শিকার করিয়া অন্ন সংস্থান করিত। আর একটি আখ্যানে আছে, ব্রাহ্মণেরা রাখালের কাজ করিতেছে, আরও দেখা যায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সহিত আহার করিতেছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ত্যক্ত স্ত্রীকে গ্রহণ করিতেছে।

দেখিতে পাই, বিশেষজ্ঞের নিকটও শিক্ষা লওয়া হইত। জীবক কুমারভৃত্য[22] সাত বৎসর শিক্ষানবীস থাকিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা করেন। জীবকের বিবরণে পাওয়া যায় যে, কোন শিল্প-বিদ্যা জানা না থাকিলে জীবন ধারণ করা কঠিন হইত। তবে রাজার গৃহেও লোককে শিল্পের কাজ শিখিতে হইত।

কারিগরের কারখানাই শিল্প-বিদ্যালয় ছিল। কারিগর যদি উত্তম শিল্পীকে রাজসমীপে আনিতে পারিত তাহা হইলে সে বিশেষ পুরস্কার পাইত।

শহরের এক-একটা অংশে বিশেষ শ্রেণীর শিল্পী বা কারিগরেরা থাকিত। বিশেষ-বিশেষ শহর বিশেষ শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। দূর দেশ হইতে লোকে সেখানে সেই শিল্প শিখিতে আসিত। বারাণসীর হস্তিদন্ত-কর্মের বোধ হয় বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। হস্তিদন্ত-শিল্পীরা নগরের একটা বিশেষ অংশে থাকিত। রঞ্জনকারীরা, গন্ধবণিকেরা শহরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বাস করিত। শ্রাবস্তীর[23] তন্তুবায়দের একটা বিশেষ স্থান ছিল। কখনও কখনও শিল্পীরা শহরের প্রান্তে বাস করিত। জাতকে এই সকলের ভূয়োভূয় দৃষ্টান্ত আছে। কুম্ভকার, ছুতোর, কামার ও নাবিকেরা নগরের প্রান্তদেশে বিভিন্ন অংশে বাস করিত। কৌটিল্য এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। স্ট্রাবো[24] বলেন, জাহাজ-নির্মাণ এবং বর্ম-নির্মাণ মাত্র রাজার জন্য হইত। বাহিরের লোকের এ সকল শিক্ষা করার সম্ভাবনা ছিল না। কথাটি ঠিক বিশ্বাস করিতে পারি না। শ্রেষ্ঠীরা দেশ-দেশান্তরে ব্যবসায় করিত। ছয় মাসের জন্য সমুদ্র-যাত্রা করিত; তাহাদের জন্য জাহাজ-নির্মাণ না হইলে চলিত কি করিয়া? ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধের পরিচয় প্রচুর পাওয়া যায়; তাহাদের বর্মই বা মিলিত কোথা হইতে। শিল্পীদের যাহাতে কোন ক্ষতি না হয়, রাজাকে তাহা দেখিতে

হইত। যদি কেহ তাহাদের ব্যবসায় কোনপ্রকার হানির চেষ্টা করিত, তাহাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হইত।

বিনয়ের[২৫] উপালির গল্পে, উপালিকে শিল্পবিদ্যা শিখাইবার কথা হইতেছিল। রূপ, লেখ, গণনা এই সকল শিখাইবার কথা হয়। রাজপুত্রদের শিক্ষা উপলক্ষ্যে বলিয়াছি রূপ শব্দের অর্থ মুদ্রাতত্ত্ব; ইহা ভাস্কর্য, চিত্রণ বা অভিনয়ও বুঝাইতে পারে। শিল্প-শিক্ষার্থীদের বাস হইত গুরুগৃহে; শিক্ষা হইত কারখানায়। কারখানা কিন্তু খুব বড় ছিল না; শিক্ষানবীসদের সংখ্যাও খুব বেশী হইত না। সে যুগে সহস্র-সহস্র ছাত্র-সমন্বিত আচার্য বা কুলপতিদের কথা শোনা যায় না; তবে এক-একজন গুরুর অধীনে ছাত্রের সংখ্যা নিতান্ত কমও ছিল না। কখনও কখনও গুরুও একাকী তাহাদের দেখিয়া উঠিতে পারিতেন না। পুরাতন ছাত্রেরা 'পিট্‌ঠি আচরিয়' বা ছোট ছোট শিক্ষক হইয়া নবাগতদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিত। অন্তত এইরূপ ব্যবস্থার কথা ভিক্ষুদের বিষয়ে শোনা যায়। মনে হয় শিল্প-শিক্ষারও এইরূপ ব্যবস্থা ছিল।

তক্ষশীলার পরেই বারাণসীর খ্যাতি। আধ্যাত্মিক বিদ্যাচর্চার স্থান বলিয়া বারাণসী বিশেষ করিয়া বিখ্যাত। জাতকের যুগে কাশী প্রবল প্রতাপশালী রাজ্য ছিল। বুদ্ধের জন্মের সময় হইতেই কাশীর নাম পড়িয়া যায়।

বোধ হয় উজ্জয়িনীর খ্যাতি ছিল বিদ্যাপীঠ বলিয়াই। জ্যোতিষচর্চার ইহা কেন্দ্র ছিল। উজ্জয়িনীর উল্লেখ বিশেষ করিয়া পাওয়া যায় জৈনসূত্রে।

অর্থশাস্ত্রের অধ্যায়ের পর অধ্যায় চলিয়াছে শ্রেণী, গণ ও সঙ্ঘের ব্যবস্থা লইয়া। শ্রেণীগুলি যে বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। তাহাদের আভ্যন্তরিক বিধি-ব্যবস্থা তাহারা নিজেরাই করিত। উহাদের শিক্ষানবীসী করিতে হইলে বা ছাত্র হইতে হইলে উহার অনুমোদন ভিন্ন সম্ভব হইত না। ছাত্রদের বিষয়ে নানারূপ নিয়মও ছিল।

কত প্রকার গণ বা শ্রেণী ছিল ঠিক বোঝা যায় না; তবে বৌদ্ধ-সাহিত্যে উহাদের সংখ্যা সকল সময়েই অষ্টাদশ বলা হইয়াছে; কিন্তু অষ্টাদশের অধিক সংখ্যক ব্যবসার সন্ধান উহাতেই পাওয়া যায়।

সংগ্রহ করিলে নানাস্থান হইতে বহুপ্রকার শিল্পের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। রপ্তানীতে তুলার বস্ত্র, রেশমের কাপড়, কম্বল, লোমের সুন্দর সুন্দর পোষাক ইত্যাদি যাইত। এগুলি রং করিবার জন্যও শিল্পী ছিল। শ্রেষ্ঠীরা সুদক্ষ নাবিক ভিন্ন চলিত না। জাহাজের কাজে কাষ্ঠশিল্পীদের পরিচয় পাওয়া যায়। জিনিসপত্র বহন করিতে গাড়ী, যানকার, রথকার প্রভৃতির কথা বহুবার পাওয়া যায়। চিত্রণ-বিদ্যার কথাও গ্রন্থে বারবার মিলে। চিত্র-শিল্পীরও অভাব ছিল না। বিনয়ে fresco-চিত্রণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। হস্তিদন্তের কারুকার্য ও শিল্পের কথায় বৌদ্ধশাস্ত্র পরিপূর্ণ।

মেগাস্থিনিস[26] মগধের রাজপ্রাসাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। ফা-হিয়েন প্রায় সহস্র বৎসর পরেও যেসকল প্রাসাদ দেখেন, তিনি বলেন, তাহাদের তুলনা কাহারও সহিত হইতে পারে না। এ সমস্তই ছিল কাষ্ঠ-শিল্পীর কাজ। ভাস্করের কাজের কথাও শোনা যায়। স্তম্ভ-নির্মাণ, চৈত্যের অপূর্ব কারু-কার্যময় রেলিং প্রভৃতি রচনা এবং সাধারণ গৃহনির্মাণেও শিল্পীদের নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহগুলি সাধারণত কাষ্ঠেরই হইত। সৈন্য ও ক্ষত্রিয়দের জন্য অস্ত্রের প্রয়োজন হইত এবং অন্য বহু কার্যে কামারের দরকার হইত।

অলঙ্কার-শিল্পের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের বিশেষ পরিচয় bas-relief-এ[27] মেলে। সাহিত্যেও নারী ও পুরুষের অলঙ্কার-প্রিয়তার পরিচয় আছে। চর্মশিল্পের উল্লেখও বহু স্থানে আছে। পাদুকা ব্যবহার খুবই সাধারণ ছিল। ধনীরা স্বর্ণ পাদুকা ব্যবহার করিত। পাচক, মোদক, রজক, নাপিত এবং অঙ্গসেবাকারীরও সংখ্যা বড় কম ছিল না। ঝুড়ি বোনা, এবং মাদুর বোনাও অনেকের কার্য ছিল। পুষ্প-শিল্প অনেকেরই অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিত। একটি বিশেষ শ্রেণীর লোক মাহুত ছিল। লেখক বা কেরানীর কাজও বেশ কদরের কাজ ছিল। হিসাব-লেখকদেরও পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধগ্রন্থ পড়িয়া মনে হয় গণিকাকেও শিল্পী বলিয়া সে যুগে লোকে স্বীকার করিত। এইরূপ সর্ববিধ শিল্পীরা অষ্টাদশ গণে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক গণের বিশেষ প্রতিপত্তিও ছিল, প্রত্যেক দলপতির রাজসভাতে বিশেষ স্থান ছিল। শ্রেণীদের এমন সুনাম

ছিল যে, তাহারা নিজে মুদ্রা চালাইতে পারিত; তাহাদের হুণ্ডি বা নোট সর্বত্র গ্রাহ্য হইত। শ্রেণীর ইতিহাস ও অবস্থা-ব্যবস্থার কথা বলিবার অনেক আছে, কিন্তু এখানে সেগুলি আলোচ্য নয়। আমি শুধু বলিতে চাই এইরূপ শ্রেণী বা গণ বা সঙ্ঘ থাকায় ব্যবহারিক শিল্প-শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হইয়া যাইত।

এই সমস্ত যুগে বর্তমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্যালয় ছিল বলিয়া মনে হয় না। কৌটিল্যের কথায় মনে হইতে পারে রাজকীয় সাহায্যে ছোট ছোট বিদ্যালয় চলিত; সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের সহিত বর্তমান শিল্প-শিক্ষায়তনের বা সাধারণ বিদ্যালয়ের তুলনা চলে। আমরা যেমন মিথিলার খ্যাতি, নবদ্বীপের খ্যাতি শুনিয়া আসিতেছি, ঐরূপ ঐ সময়েও বিশেষ বিশেষ স্থানের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তখন সেখানে ঐ সকল বিশেষ বিষয়ে বড় বড় গুরু থাকিত; কিন্তু গুরুরা প্রত্যেকে পৃথক্। সকল গুরুর এবং সকল ছাত্রের কোন সমবায় বা সঙ্ঘ হয় নাই। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা এক গুরুর নিকটে হওয়াও সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে হইলে বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার আবশ্যক হইত।

[বিচিত্রা, ১৩৪৫ আশ্বিন, পৃ. ২৮৫—২৮৮]

প্রসঙ্গ-কথা

1 হীনযান : বৌদ্ধধর্মের শাখাবিশেষ। বৌদ্ধধর্মের এটিই আদিম শাখা, বুদ্ধদেব প্রবর্তন করেন ও অশোক ইহা প্রচার করেন।—বৌদ্ধকো.

2 মহাযান : বৌদ্ধধর্মের আর একটি শাখা। ইহা হীনযান ধর্মের বিপরীত। অশোকের সময়ের তিন-চার শ বছর পরে এটি প্রবর্তিত হয়। রাজা কনিষ্কের সময় প্রচারিত হয়।—বৌদ্ধকো.

3 জেতবনবিহার : শ্রাবস্তী নগরের দক্ষিণে এক মাইল দূরে জেতবন অবস্থিত। বর্তমান নাম—সাহেট্‌-মাহেট। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সংঘকে এই জেতবন আরাম দান করেন। এক সময়ে বুদ্ধদেব এখানে বাস করেছিলেন।—বৌদ্ধযুগের ভূগোল

4 ফা-হিয়েন (Fa Hien) : চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক। ৩৯৯-৪১৫ খ্রী. পর্যন্ত ভারত পর্যটন করেন। ৪০৫-৪১০ খ্রী. পর্যন্ত ২য় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সময় তাঁর রাজ্যে বাস করেন। Fo-kuoki নামে একখানি ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে রাখেন।—*VSEHI*, 29

5 কুক্কুটারাম : পাটলিপুত্রে অবস্থিত।

6 নালন্দা : পাটনা শহরের রাজগীরের ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বর্তমান বড়গাঁও-এ নালন্দা। প্রাচীনকালে গুপ্তরাজাদের সময়ে এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় বা বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। Beal's Life of Hswan Chuang গ্রন্থে (পৃ. ১১১) দেখা যায় নালন্দা খ্রী-পূ. ১ম শতাব্দীতে স্থাপিত হয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসিয়ার বিভিন্ন স্থানের প্রায় দশ সহস্র ছাত্র-ছাত্রীদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি সুবৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ পুথিশালা ছিল। নাগার্জুন, শীলভদ্র, ভববিবেক, বোধিসত্ত্ব ধর্মপুত্র প্রভৃতি

মহাস্থবির বা অধ্যক্ষ, দিবাকর, জিন, স্থিরমতি প্রভৃতি আচার্য ছিলেন। চৈনিক প্রভৃতি বহু বিদেশী পর্যটক এখানে শিক্ষালাভ করেছেন। খ্রীস্টীয় ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে পালবংশের শেষরাজা গোবিন্দপালের রাজত্বের সময়ে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজির আক্রমণ গোপালদেবপাল নিহত হন ও বক্তিয়ারের অনুচরবর্গ নালন্দাস্থিত বহু মূল্যবান পুস্তক পুড়িয়ে নালন্দা মহাবিহার ধ্বংস করে (১১৯৬ খ্রী.)। সেই সময় থেকে নালন্দার গৌরব-রবি অস্তমিত হয়। —*VSEHI*, 312, 333ff.

7 য়ুয়ন-চয়ঙ: 'পাণিনি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

8 শক্রাদিত্য: মহারাজ শক্রাদিত্য গুপ্তবংশীয় রাজা। এর পুত্র বুধগুপ্ত। বুদ্ধদেবের নির্বাণের পর ইনি নালন্দায় একটি সঙ্ঘারাম নির্মাণ করান।

9 বুধগুপ্ত (৪৭৭-৪৯৫ খ্রী.): গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্যতম গুপ্ত রাজা। এঁর সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্য বঙ্গদেশ হতে মালব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

10 তথাগতগুপ্ত: বুধগুপ্ত-পুত্র। বুদ্ধদেবের নির্বাণের পর শক্রাদিত্য, বুধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্য ও বজ্র নামে পাঁচজন রাজা নালন্দার পাঁচটি সঙ্ঘারাম বা মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

11 বালাদিত্য (নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য, ৫৭৭ খ্রী.): গুপ্তরাজা। ইনি উত্তর-পূর্ব দিকে আর একটি বিহার নির্মাণ করেন।

12 বাৎসায়ন: চাণক্যেরই অপর নাম। চাণক্য কৌটিল্য নামে অর্থশাস্ত্র ও বাৎসায়ন নামে কামশাস্ত্র ও ন্যায়ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

13 ললিতবিস্তর: বৌদ্ধগ্রন্থবিশেষ। মহাযান-সম্প্রদায়ের অবশ্যপাঠ্য বুদ্ধজীবনী।

14 শ্রীধর স্বামী: টীকাকার। ইনি গুজরাতের মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ১৩শ খ্রী. কিঞ্চিৎ পরবর্তী। ভাগবতভাবার্থদীপিকা নামে ভাগবতের টীকা এবং গীতা ও বিষ্ণুপুরাণের টীকাও রচনা করেন।—সনৎসু.

15 খারবেল: কলিঙ্গদেশের (উড়িষ্যা) রাজা ২৭ খ্রী-পূর্বাব্দে। এঁর সময়ে কলিঙ্গের সামরিক শক্তি অত্যন্ত বর্ধিত হয়।

16 সমুদ্রগুপ্ত (৩৩০-৩৭৫ ? খ্রী.) : গুপ্তবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি, প্রাচীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বীর ও সুকবি এবং সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগী।

17 কৌটিল্য (খ্রী-পূ. ৩য় শতাব্দী) : মৌর্যবংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী। ইনি চাণক্য, বিষ্ণুগুপ্ত, বাৎসায়ন নামেও পরিচিত। ইনি ব্রাহ্মণ। অর্থশাস্ত্র নামে এঁর রচিত বই থেকে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবরণ পাওয়া যায়। ইনি কূটনৈতিকও ছিলেন।

18 বর্ষ : 'পাণিনি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

19 উপবর্ষ (৫-৪র্থ খ্রী-পূ.) : মীমাংসাকার। ইনি বার্ত্তিককার কাত্যায়ন মুনির গুরু। ইনি বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রতিবাদকারী।

20 পাণিনি : 'পাণিনি' প্রবন্ধ দ্র.

21 রাজশেখর : 'পাণিনি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

22 জীবক কুমারভৃত্য : বুদ্ধদেবের জীবিতকালে একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক ছিলেন। তক্ষশিলায় আয়ুর্বেদাচার্য আত্রেয়ের কাছে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মগধরাজ বিম্বিসার, অজাতশত্রু প্রভৃতির চিকিৎসা করেছেন। তিনি শিশু চিকিৎসায় বিশেষ নাম করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল কুমারভৃত্য, কেউ বলেন বিম্বিসারের পুত্র অভয় তাঁর পালক পিতা ছিলেন বলে তাঁর নাম হয় কুমারভৃত্য।—জী-কো.

23 শ্রাবস্তী : যুক্তপ্রদেশের গণ্ডাজেলার অন্তর্গত প্রাচীন নগরী। আধুনিক নাম সাহেট্-মাহেট। এই নগরী বুদ্ধদেবের সময় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। তখন ইহা উত্তর কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল। বুদ্ধদেবের জন্য রাজা কর্তৃক এখানে একটি বিহার স্থাপিত হয়।

24 স্ট্রাবো (Strabo) (৬৩—২৫ খ্রী-পূ.) : প্রাচীন ভৌগোলিক। আমাসিয়ায় জন্ম ও রোমে মৃত্যু।

25 বিনয় (পিটক): বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের অন্যতম বিনয়পিটক। বিনয় গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের আচার ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপায় নির্দেশিত আছে।

26 মেগাস্থিনিস: 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

27 bas-relief: যে মূর্তিশিল্পের কাজে মূর্তির অর্ধেকের কম অংশ উদ্গত করা হয় তাকেই bas-relief বা অল্প উদ্গত ভাস্করকার্য বলা হয়।

আপিশলী শিক্ষা

ভূমিকা

বেদাঙ্গের সাহায্যেই বেদের অর্থ সুগম হয়। এইগুলি অপৌরুষেয় নহে। সাধারণত ব্রাহ্মণকে প্রবচন আখ্যা দেওয়া হয়—কিন্তু মনু, বেদাঙ্গকে প্রবচন[১] নাম দিয়াছেন। ষড়্‌বেদাঙ্গের সর্বপ্রথম উল্লেখ সামবেদের ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে[২] দেখিতে পাওয়া যায়। যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে[৩] বেদাঙ্গের বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বেদাঙ্গের কোন নাম দেন নাই। চরণব্যূহ,[১] মনু,[৪] মুণ্ডক ও ছান্দোগ্যোপনিষদে ছয়টি বেদাঙ্গের উল্লেখ আছে[৫]। কিন্তু, বেদাঙ্গের অন্তর্গত বিষয়সকলের যথাযথ বিবরণ বৃহদারণ্যক ও তদ্‌ভাষ্যেই দেখা যায়। এই বেদাঙ্গ কোন ব্যক্তিবিশেষের গ্রন্থকে লক্ষ্য করিত না; ইহা ব্যাকরণ-শাস্ত্রকেই বুঝাইত। ঋগ্বেদের ভাষ্যে[৬] সায়ণাচার্য[২] যেরূপভাবে বেদাঙ্গ-ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যাকরণকে লক্ষ্য করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। আর দুর্গাচার্যের[৭] বচন[৭] হইতেও তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। ঋক্, যজু ও অথর্ববেদের প্রাতিশাখ্যগুলি যে ভাবে গ্রথিত, তাহাতে তাহাদিগকে এক-একখানি বেদাঙ্গ ব্যাকরণ উপাধি দেওয়া নিতান্ত অযুক্ত নহে। বস্তুত পাণিনির পূর্ব হইতে যে ব্যাকরণ বেদাঙ্গ নামে অভিহিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য শব্দিক রোট,[৪] বর্নেল[৫] প্রভৃতি পণ্ডিতও এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে একমাত্র অধ্যাপক গোল্ড-

স্টুকর[৩] বেদাঙ্গ বলিতে কেন যে পাণিনীয় ব্যাকরণকেই বুঝিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না।[৮] যাহা হউক্ তাঁহার এই মত যে নিতান্ত অযৌক্তিক তাহাতে সন্দেহ নাই।

পাণিনির বহু পূর্বে যে ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দের অস্তিত্ব ছিল বৈদিক গ্রন্থ হইতে তাহার যথেষ্ট উদাহরণ দেখান যাইতে পারে। বৈদিক সাহিত্য কোন্ সময় বিদ্যমান ছিল তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিলেও, একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে সেগুলি পাণিনির বহু পূর্বের। আর বৈদিক সাহিত্যে পরিভাষাগুলি যে পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এরূপ কল্পনা করিবার কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথম উদাহরণ তৈত্তিরীয় বা তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম উপনিষদে পাওয়া যায়। যথা, "শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণাঃ স্বরাঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শিক্ষাধ্যায়ঃ"—(৭. ১, ২)[৯]। অতএব বর্ণ, স্বর ও মাত্রা এই তিনটি পারিভাষিক শব্দ পাওয়া গেল। ছান্দোগ্য-উপনিষদে[১০] স্পর্শ, স্বর ও উষ্মবর্ণের উল্লেখ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণের[১১] 'নেহদ্ একবচনেন বহুবচনম্ ব্যবয়ামেহতি" এই বাক্যে বৈয়াকরণিক একবচন ও বহুবচনের কথা দেখা যায়। অধ্যাপক বেবের[৭] শতপথ-ব্রাহ্মণের ১০১৮ পৃষ্ঠার টীকায় প্রমাণ করিয়াছেন যে, যে সময় এই ব্রাহ্মণ লিখিত হইয়াছিল সেই সময় ব্যাকরণ এতদূর উন্নত হইয়াছিল যে ভূ, অস্ প্রভৃতি ধাতুর ব্যাখ্যাও ইহাতে আলোচিত হইয়াছিল। এ উক্তির সমর্থনের জন্য ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের 'মদ্' ধাতু (১. ১০ ; ২. ৩ ; ৩. ২, ২৯), 'সুধা'—সুহিত (৩. ৩৯, ১৭) জনুংষি—জাত-বৎ (৪. ৬, ২৯, ৩২ ; ৫. ৫) প্রভৃতি উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে[১২] অক্ষর, অক্ষরপংক্তি চতুরক্ষর, বর্ণ, কার, পদ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। গোপথ-ব্রাহ্মণ যদিও পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণগুলির তুলনায় পরবর্তী, তথাপি ইহাতে অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ আছে। ইহার ১. ২৪ সূত্রে আছে—'ওঙ্কারং পৃচ্ছামঃ কো ধাতুঃ কিং প্রাতিপদিকম্ কিম্ নামাখ্যাতম্ কিং লিঙ্গং কিং বচনং কা বিভক্তিঃ কঃ প্রত্যয়ঃ কঃ স্বরঃ উপসর্গো নিপাতঃ কিং বৈ ব্যাকরণম্ কো বিকারঃ কো বিকারী কতিমাত্রঃ কতিবর্ণঃ কত্যক্ষরঃ কতি পদঃ কঃ সংযোগঃ কিং স্থানা-

নানুপ্রদানকরণং শিক্ষুকাঃ কিম্ উচ্চারয়ন্তি কিং ছন্দঃ কো বর্ণ ইতি পূর্বে প্রশ্নাঃ।” অতএব ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ওঙ্কারের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহাতে প্রধান প্রধান পরিভাষার নামোল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সামবেদের তাণ্ড্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ হইতেও বৈয়াকরণিক অর্থদ্যোতক বহু পরিভাষার নাম পাওয়া যায়, এখানে সেগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শিক্ষা—প্রাতিশাখ্য। শিক্ষা বৈদিক-সূত্রের প্রকৃত উচ্চারণ ও যথাযথ আবৃত্তি বিষয়ে শিক্ষা দেয়। অধ্যাপক হৌগ[৪] (Haug) বলেন, শিক্ষা প্রাতিশাখ্য অপেক্ষা প্রাচীন এবং ইহার বিধিব্যবস্থা পরে প্রাতিশাখ্যের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। ড. বর্নেলও তাহাই বলেন। কেহ কেহ এই শিক্ষা-গ্রন্থের এতাদৃশ প্রাচীনত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিয়া থাকেন। সকল শিক্ষা-গ্রন্থই যে অতি প্রাচীন তাহা নহে। সমুদয় শিক্ষাগ্রন্থ এপর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে সম্প্রতি অধিকাংশ গ্রন্থই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৎসমুদয়ের মধ্যে অমোঘনন্দিনী শিক্ষা[১৩] কেশবী শিক্ষা[১৪] শিক্ষাসমুচ্চয় ও শ্রীনিবাসকৃত সিদ্ধান্তশিক্ষা[১৫] যে নিতান্ত অর্বাচীন তাহা পণ্ডিতমণ্ডলী স্বীকার করেন। তবে গৌতমী[১৬] নারদ[১৭] মণ্ডূকী[১৮] ও লোমশীশিক্ষা[১৯] যে অতি প্রাচীন তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। যাহা হউক্ এই শিক্ষাগুলি ব্যাকরণ শ্রেণীর অন্তর্গত নহে—তবে ইহাতে ব্যাকরণের উচ্চারণ ও আবৃত্তি-বিষয় আলোচিত হইয়াছে মাত্র। অতঃপর, প্রাতিশাখ্যেই ব্যাকরণের অনেক কথার আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দসকলের উচ্চারণ, উচ্চারণাদির লঘুগুরুভেদ, প্রত্যেক অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিধি, প্রকৃতি, কার্যকারিতা, দুই বা ততোধিক শব্দের সন্ধিবিধি প্রভৃতি এই প্রাতি-শাখ্যগুলির আলোচ্য বিষয়। বৈদিক ভাষায় ব্যাকরণ বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য এই প্রাতিশাখ্যগুলি রচিত হয় নাই। এগুলিতে শব্দ বা ধাতুর প্রাকৃত্যাদির আলোচনাও নাই। তবে এগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে কথিতভাষা ও সঙ্গীতে কিরূপ উচ্চারণ পার্থক্য ঘটে তাহাই দেখিবার জন্য অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণাদির বিস্তৃত বিধিব্যবস্থা দিবার জন্যই এইগুলি রচিত হইয়াছিল। ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব এই চারিটি বেদের চারিটি প্রতিশাখা আছে। ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্যই সর্বাপেক্ষা

প্রাচীন। শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয় প্রাতিশাখ্যও বেদাধ্যয়ন বিষয়ে অনেক আনুকূল্য করিয়াছে। ইহার অন্য নাম কাত্যায়ন-প্রাতিশাখ্য। এখানি অতি প্রাচীন কালের রচনা। তবে ইহাতে যে পরবর্তী কালে বিশেষ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইয়াছিল তাহা সহজেই বলিতে পারা যায়। সংজ্ঞা, পরিভাষা, শব্দের উচ্চারণের নিয়ম, সান্ধি-ক্রিয়ার উপর যতিপাতের নিয়ম ও উচ্চারণের নিয়ম, স্বরব্যঞ্জনের তালিকা, গ্রন্থপাঠের নিয়ম প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।[২০]

বেদাঙ্গের মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। অনেকগুলি শিক্ষাগ্রন্থ আছে; এই শিক্ষাগ্রন্থগুলি কত প্রাচীন তাহা স্থির করা কঠিন। প্রথমত প্রাতিশাখ্যগুলির কাল-নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার। শিক্ষাগুলির কাল-নির্ণয় আরও জটিল; তাহার প্রধান কারণ এই যে খুব কম শিক্ষাগ্রন্থেই প্রমাণ বা নজিরের উল্লেখ থাকে। স্থানাদির তো আদৌ উল্লেখ পাওয়া যায় না; যদি বা কোন কোন শিক্ষা-গ্রন্থে এক আধটুকু মেলে, সেগুলি আবার অনেকগুলি শিক্ষাতে অনুসৃত দেখা যায়। সুতরাং এ অবস্থায় শিক্ষাগ্রন্থগুলির কাল-নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। টীকা বা ব্যাখ্যা অতি অল্প কয়েকখানি শিক্ষায় পাওয়া যায়; তারপর টীকাগুলি এত অনবল্লসংকারে ও অস্পষ্টভাবে লিখিত যে, সেগুলি হইতে নিশ্চিতভাবে কিছু নিষ্কর্ষ করা সহজসাধ্য নয়। আবার একই বিষয়ে একই শ্লোক অনেকগুলি শিক্ষাগ্রন্থে পাওয়া যায়; এগুলি কোন বিশেষপদ্ধতিক্রমে লিখিত নয়। অযথা যথেষ্ট পুনরুক্তি এই শিক্ষাগুলিতে আছে। এই গ্রন্থগুলি নকল করিবার সময় বহু অনর্থও ঘটিয়াছে; অযথা যথেষ্ট পুনরুক্তি এগুলিতে আছে। বর্তমান যে অবস্থায় এই শিক্ষাগ্রন্থগুলি পাওয়া যাইতেছে, তৎসমুদয় হইতে শিক্ষার মূল পাঠ নির্ণয় করা অতি কঠিন। তৈত্তিরীয় সম্প্রদায়ের কয়েকখানি শিক্ষা কতকটা সঙ্গত প্রণালীতে লিপিবদ্ধ। এইগুলি হইতে মূল রচনাপদ্ধতির কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

আমরা সম্পূর্ণ ব্যাকরণ হিসাবে পাণিনির ব্যাকরণ প্রাপ্ত হই। পাণিনির পূর্বে কয়েকখানি ছিল। সম্ভবত পাণিনির ব্যাকরণ তৎপূর্ববর্তী শাব্দিক-গণের সূত্রাদির সংস্কার করিয়া অধিকতর উন্নত প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল। পাণিনির পূর্বগামিগণের মধ্যে কেহ কেহ বৈদিক ব্যাকরণ,

কেহ বা বেদপরবর্তী ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। কোন কোন শাব্দিক উভয়বিধ ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সম্ভবত প্রচলিত ভাষার প্রতি যত্নবান্ ছিলেন না। যাস্ক যে বেদাঙ্গের কথা বলিয়াছেন, বোধ হয় এইরূপ গ্রন্থাদিকে লক্ষ্য করিয়াই বেদাঙ্গ শব্দ তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন। পাণিনির পূর্বে কয়েকজন শাব্দিক ছিলেন; ইঁহাদের মধ্যে আপিশলী ও কাশকৃৎস্ন প্রধান।—তু. পা. ৬. ১. ৯২।

৭. ৩. ৯৫ পাণিনিসূত্রের কাশিকাবৃত্তিতে আপিশলীর একটি সূত্র প্রদত্ত হইয়াছে। কাশিকা উপদেশ করিয়াছেন—'আপিশলাস্তরুস্তুশম্যমঃ সার্বধাতুকাসু ছন্দসীতি পঠন্তি।'

'অস্তি সকারমাতিষ্ঠতে'—১. ৩. ২২ পতঞ্জলির মহাভাষ্যের এই সূত্র হইতে পাওয়া যায় যে, আপিশলী 'অস্' ধাতুকে 'সকারে' পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। জিনেন্দ্র-বুদ্ধি ও শাকটায়ন (১. ৪. ৩৮) বলিয়াছেন যে, উক্ত সূত্রের 'আতিষ্ঠতে' ক্রিয়ার কর্তা আপিশলী।

পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীতে নিম্নলিখিত শাব্দিকগণের উল্লেখ করিয়াছেন—

অত্রি, আঙ্গিরস, আপিশলী, কট, কলাপী, কাশ্যপ, কুসে, কৌণ্ডিন্য, কৌরব্য, কৌশিক, গালব, চরক, চাক্রবর্ম, ছাগলি, জাবাল, তিত্তিরি, পারাশর্য, পীলা, বভ্রু, ভারদ্বাজ, ভৃগু, মণ্ডূক, যাস্ক, বড়বা, বরতন্তু, বসিষ্ঠ, বৈশম্পায়ন, শাকটায়ন, শাকল্য, শিলালি, শৌনক ও স্ফোটায়ন। অষ্টাধ্যায়ীর 'যস্কাদিভ্যো গোত্রে' (২. ৪. ৬৩) 'বা সুপ্যাপিশলেঃ' (৬. ১. ৯২) 'অবঙ্ স্ফোটায়নস্য' (৬. ১. ১২৩) 'ততো গার্গ্যস্য' (৮. ৩. ২০), 'লোপঃ শাকল্যস্য' (৮. ৩. ১৯); 'ঋতো ভারদ্বাজস্য' (৭. ২. ৬৩), 'তৃষিমৃষিকৃশেঃ কাশ্যপস্য' (১. ২. ২৫) ইত্যাদি সূত্র হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে পাণিনি উল্লিখিত ঋষিদিগের ব্যাকরণ অবগত ছিলেন। কেননা পাণিনি ঐ সমস্ত ব্যাকরণ হইতে নিয়ম উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পাণিনি তাঁহার সূত্রে দুইটি শাব্দিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন—একটি উদীচ্য; এবং একটি প্রাচ্য। এছাড়া তিনি দশজন বৈয়াকরণের নাম ব্যক্তিগতভাবে করিয়াছেন যথা—আপিশলী, কাশ্যপ, গার্গ্য, গালব,

চাকবর্মণ, ভারদ্বাজ, শাকটায়ন, শাকল্য, সেনক ও স্ফোটায়ন। কৈয়ট আপিশলী ও কাশকৃৎস্নের মূল অংশত প্রদান করিয়াছেন—'আপিশলকাশকৃৎস্নয়োস্তুগ্রন্থ ইতি বচনাদন্যত্র প্রতিষেধাভাবঃ।'

পরবর্তী লেখকদের মধ্যে বোপদেবকে আপিশলীর নাম উল্লেখ করিতে দেখা যায়। বোপদেব আপিশলীর কোন সূত্রের উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

'ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ॥'

আপিশলী শিক্ষা বেশীর ভাগ শব্দোচ্চারণ (articulation) লইয়াই যাহা কিছু করিয়াছে। বর্নেল তাঁহার Aindra School of Grammariansএ (পৃ. ১, ৩৬) দেখাইয়াছেন যে বৈয়াকরণ আপিশলী পাণিনীর পূর্ববর্তী। বৈদিকাভরণে (তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য, ২.৪৭) 'শেষাঃ স্থানকরণা ইত্যাপিশল-শিক্ষা বচনাৎ' এই উক্তিতে আপিশলীর নাম পাওয়া যায়। সিদ্ধান্তশিক্ষায় বৈদিকাভরণের উল্লেখ আছে। বৈদিকাভরণে আপিশলীর উল্লেখ আছে। সুতরাং আপিশলী শিক্ষা সিদ্ধান্তশিক্ষার পূর্ববর্তী। কৈয়ট একাদশ প্রকার 'বাহ্য প্রযত্ন' আপিশলী হইতেই পাইয়া থাকিবেন। কেননা, অন্য কোন শিক্ষায় এই সমস্ত 'বাহ্য প্রযত্নের' উল্লেখ নাই। কৈয়টের সময় ১১শ শতাব্দী। রাজশেখর (অন্যূন ৯৩৭-৯০) তাঁহার কাব্য-মীমাংসায় আপিশলী শিক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবদ্দত্ত তাহা দেখাইয়াছেন। —মাণ্ডূকশিক্ষা,

'তস্মাৎ তৎ-তৎ সমাম্নায়ে প্রাতিশাখ্যাবিরোধতঃ,
কার্যং সর্বং ব্যবস্থাপ্য শিক্ষা-ব্যাকরণোদিতম্।'

এতদ্দ্বারা আপিশলী প্রাতিশাখ্যের অবিরোধে শিক্ষা ও ব্যাকরণ মতানুসারে বৈদিক মূল সম্বন্ধে বিধিনির্ণয় করিয়াছেন।

পাদটীকা

১ মনু.১—৩.১৮৪

২ ৪৪.৭

৩ নিরুক্ত ১.২০

৪ মনু. ৩.১৮৫

৫ ষড়্ বেদাঙ্গ যথা—শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দ সঞ্চয়ঃ।
জ্যোতিষাময়নঞ্চৈব বেদাঙ্গানি ষড়েব তু॥

৬ Sayana's com. on the R. V. I., p. 34 (Muller's Ed.)

৭ ব্যাকরণম্ অষ্টধা নিরুক্ত চতুর্দশধা ইত্যাদি।

৮ Academy, July 1870

৯ Bibl. Indica Edition (By Rajendralal Mitra), p. 725

১০ ছান্দোগ্য-উপনিষদ, ২.২২ ৩, ৫

১১ D. A. Weber's Edition, p 990

১২ ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ, অধ্যায় ১.২,৫

১৩ Rajendralal Mitra, "Notices" I, p. 72

১৪ Rajendralal Mitra, "Report" p. 18

১৫ Mysore Cat. No. 51 p. 8

১৬ Haug. "Ueber das Wesen" U. S. W. P. N. I. ইহা তামিল দেশে রক্ষিত।

১৭ A. C. Burnell's "Notices" I, p 73. অধ্যাপক হোগ বলেন ইহার দুই প্রকার মূল বিদ্যমান আছে।

১৮ Haug U, S p. 55. Weber, "Pratijna Sutra" pp. 106 ffg "Notices" I, p 73

১৯ "Report" p. 18. Haug U. S. p. 61 "Notices," I. p. 71

২০ যথা—ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য—১। ক-কার ইত্যাদি (৪.৬); ২। ই, উ, এ ইত্যাদি (অনুক্রমণিকা); ৩। কথৌ ইত্যাদি (অনুক্রমণিকা) দ; ৪। রেফ (১.১০); ৫। শকারচকারবর্গয়োঃ (৪.৪)।

তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য—১। অকার (১.২১), ইকার (২.২৮), হকার (১.১৩), অবর্ণ (২.৫), ই-বর্ণ, ইত্যাদি (১০.৪); ২।

প (৪.৩০), ন (৪.৩২) ক্ষ (৯.৩); ৩। ত, ট (৭.১৩), ১, থ (৭.১৪), র (১.১৯); ৪। রেফ (১.১৯); ৫। ক-বর্গ (২.৩৫), চ-বর্গ (২.৩৬), ট-বর্গ (১৪.২০)।

কাত্যায়নীয়-প্রাতিশাখ্য—১। ঐ-কার, ঔ-কার (১.৭৩), ঌ-কার (১.৮৭), ই-বর্ণ (১.১১৬); ২। উবোষ্পণঃ' (১.৭০), অ (১.৭১); ৩। র (১.৪০), নুঃ (১৩.১৩২) [ইহা ন স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে]; ৪। ত-বর্গ (৩.৯২)।

এই প্রাতিশাখ্যে—পাণিনির 'এং' প্রভৃতির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি যে পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার যথেষ্ট কারণও আছে।

অথর্ব-প্রাতিশাখ্য—১। অ-কার (১.০৬), ঌ-কার (১.৪), ল-কার (১.৫), ম-কার (১.২৩); ২। শ্ন-বর্ণ (১.৩৭); ৩। র, র (১.৬৮), শ যসেষু (২.৬); ৪। রেফ (১.২৮); ৫। চ-বর্গ (১.৭), উবর্গীয়ে (২.১২), চট বর্গয়র (২.১৪) ইত্যাদি ইত্যাদি।

মূল•

ওঁ যঃ স শব্দঃ তমক্ষং ব গুহাশায়ং সম্যগুষাম্মঃ বিপ্রাঃ
শ্রেয়সি চাভুদয়ে নচৈনং সম্যকৃপ্রযুক্তঃ পুরুষং যুনক্তি ॥
স্থানমিদং করণমিদং যত্ন এষ দ্বিধা অনিল-
স্থানং পিগুয়তি কৃত্তিকারঃ ক্রম এব আধানাভিঙলাৎ।
স্থান করণ প্রযত্ন পরেভ্যো বর্ণাঃ ॥
ত্রিষষ্টিঃ চতুঃষষ্টি রিত্যেকে তত্র বর্ণানাং কেষাং কিং স্থানং কিং করণং
প্রযত্নশ্চ তে দ্বিধা বিভজতে (?) তত্র স্থানং তাবৎ শ্রকুহবিস-
র্জনীয়াঃ কণ্ঠ্যাঃ হ বিসর্জনং।

ঋটুরস্থ বৈ কেশাং জিহ্বামূলীয়া জিহ্বায়াঃ ॥ ১ ॥
বিভজতে তত্র স্থানং তাবৎ অকুহবিসর্জনীয়াঃ কণ্ঠ্যাঃ।
হবিসর্জন। ঋটুরস্থ বৈ কেষা জিহ্বামূলীয়া জিহ্ব্যাঃ।
বা (?) বর্গ বর্ণান্তুবার জিহ্বামূলীয়া জিহ্বাঃ।
একেষাং সংমুগস্থানবর্ণ ইত্যেকে ইচু যশাস্তালব্যাঃ ॥
উপধ্মানীয়া উষ্মাঃ। একেষাং সংমুগস্থানবর্ণ ইত্যেকে।
ইচু যশাস্তালব্যাঃ। উপধ্মানীয়া উষ্মাঃ। বকারো দন্ত্যোষ্ঠ্যঃ
সংবিধনী (?) স্থানমেকেষাং। যমশ্চ নাসিক্যাঃ। জিহ্বামূলীয়া
জিহ্বা একেষাং ॥

এ ঐ কণ্ঠতালব্যৌ। ওঔ চৈব দন্তৌষ্ঠয়ৌ। উঞণনম নাসিক্যা স্থানাঃ।
দ্বিবর্ণানি সন্ধ্যক্ষরাণি সংযুক্তবর্ণাঃ। এবমেতানি স্থানানি।
করণমপি জিহ্বামূলেন জিহ্ব্যানাং জিহ্বামূলে মধ্যেন (?) তালব্যানাং।
জিহ্বাগ্রেণ মূর্ধন্যানাং। জিহ্বাগ্রাপঃ করণং বা।
জিহ্বাগ্রেণ দন্ত্যানাং শেষঃ স্বস্থানকরণা ইত্যেতাবৎকরণং
প্রযত্নোপি দ্বিবিধঃ।

আ নশে বা স্বস্থানেভ্যঃ তরশ্চবং ॥ স্পৃষ্টকরণাঃ স্পর্শাঃ ॥
ঈষৎস্পৃষ্টকরণানংতঃস্থাঃ। ঈষদ্বিবৃতকরণা উষ্মাণোবিবৃতকরণা বা
বিবৃতকরণাঃ স্বরাঃ। তেভ্যঃ এউ বিবৃতস্বরৌ। তাভ্যামৈ অনাভ্যামাকারঃ।

সংবৃতশ্চকারঃ এষোক্তঃ প্রযত্নঃ। অথ বাহ্যপ্রযত্না বর্গানাং প্রথমদ্বিতীয়াঃ। শষসবিসর্জনী জিহ্বামূলীয়ৌ উপধ্মানীয়া যমৌ চ প্রথমদ্বিতীয়ৌ বিবৃতকণ্ঠ্যাঃ শ্বাসানুপ্রদানা অঘোষাঃ। বর্গয়মানাং প্রথমা অল্পপ্রাণাঃ। ইতরে সর্বে মহাপ্রাণাঃ। বর্গাণাং তৃতীয় চতুর্থী অন্তঃস্থাঃ। অনুস্বারো যমৌ হ তৃতীয়চতুর্থো নাসিক্যাশ্চ সংবৃতকণ্ঠ্যাঃ। শ্বাসানুপ্রদা অঘোষবন্তশ্চ বর্গয়মানাং তৃতীয়ানুপ্রদানা ঘোষবদল্পপ্রাণাঃ। ইতরে সর্বে মহাপ্রাণাঃ। যথা তৃতীয় স্তথা পঞ্চমাঃ। অনুনাসিক্যমেষামধিকো গুণঃ। কাদয়ো মাবসানাঃ স্পর্শাঃ॥ যাদয়ো অন্তঃস্থাঃ। শাদয় উষ্মাণঃ। তৃতীয়া ইকারেণ চতুর্থাঃ। ইত্যেষ বাহ্যঃ॥ প্রযত্নস্তত্র স্পর্শ যম বর্ণাকারা বায়ুরাঃ পিণ্ডবং স্থানভাজিদারুপিণ্ডবৎ উষ্ম স্বরবর্ণকরো বায়ুরূর্ণাপিণ্ডবং ব্যারুয়াতে বৃত্তিস্বরাঃ পদমিতি তক্রথমুক্তং॥ হ্রস্বদীর্ঘং প্লুতস্বাচ্ছত্রৈস্বর্গোভ্যুন্নয়নে চ আং এনাসিকাভেদাচ্চ সংখ্যাতোয়ো দশাত্মক ইতি। এবমেব বর্ণাদয়ঃ। উবর্ণস্তথা ঋবর্ণঃ ত্রিবর্ণস্বরাঃ দীর্ঘা ন সন্তি দ্বাদশ প্রভেদ মা চত্তুতো (?) যদৃচ্ছা শক্তিজানুকরণাদ্বা যদাপ্লু দীর্ঘাস্তদা অষ্টাদশ ভেদানি ব্রুবংতি। সন্ধ্যক্ষরাণাং হ্রস্বা ন ভবংতি তান্যপি দ্বাদশ প্রভেদানি। ছন্দোগানাং ভাত্য স্বশ্রীধরাণায়নীয়া (?)। অর্ধ মেকাক্ষরমর্ধমোকারং পঠংতি তেষামষ্টাদশ ভেদানি। অনস্থাদ্বিপ্রভেদা রেফবর্জিতাঃ। সানুনাসিকানিরনুনাসিকাশ্চেতি রেফোষ্মণাং সবর্ণো ন সন্তি। বর্গো বর্গেণ সবর্ণঃ এষ ক্রমো বর্ণানাং। তত্রৈষাং স্থানকরণ প্রযত্নাকথং প্রসিদ্ধিরিত্যুচ্যতে। ইহ যত্র স্থানবর্ণা উপলভ্যন্তে তৎস্থানানি বর্তন্তে।

তৎকরণং। প্রণতনং প্রযত্নঃ। উৎসাদঃ প্রযত্নঃ। স্পষ্টতাদি বর্ণা গুণঃ। তত্র নাভিপ্রদেশাৎপ্রযত্নঃ প্রেরিতঃ প্রাণো নাভিবায়ুরুদ্ধয়া ক্রমান্নুর মাদীনাং।

স্থানানামন্যতমস্মিন্ স্থানে প্রযত্নেন বিধার্যতে বিধার্যমাণস্যাপি, তৎস্থানানি বিঘ্নন্তে দ্বে নিরূপপদ্যেতে আকাশো সা বর্ণশ্রুতিঃ। সবর্ণস্যাত্মলাভঃ। তত্র বর্ণানামুৎপদ্যমানে তত্রযদা স্থানকরণপ্রযত্ন

পর্যন্তং পরস্পরং স্পৃশতি সা স্পৃষ্টতা। সা ঈষৎ স্পৃষ্টানাং
যদা দূরেণ স্পৃশতি সা বিবৃতা যদা সামীপ্যেন স্পৃশতি তদা সা বিবৃতা।
এযোতঃ প্রযত্নঃ। অথবাহ্যপ্রযত্নঃ। স এবেদানীং প্রাণোনাভিবায়ু-
রূর্ধ্বমনুক্রাম্য মূর্ধ্নি প্রতিহতে নিবৃত্তা ভবতি তদা কণ্ঠসংহন্যমানে
গলবিলস্য সংবৃতস্বাত্ সংবারো নাম বর্ণধর্মা জায়তে। বিবৃতস্বাদ্বিবারঃ।
তৌ যদা স চ। যদা কণ্ঠবিল সংবৃতত্বং তদা নাদো জায়তে।
বিবৃতে তু কণ্ঠবিলে শ্বাসোঽনুপ্রজায়তে। তৌ শ্বাসনাদাবনুপ্রদানা-
বিত্যাচক্ষতে। অন্যে শ্বাসনাদাবনুপ্রদানাং ব্যঞ্জনে নাদবৎ।
তত্র যদা নাভিস্থলজধ্বনৌ নাদোঽনুপ্রজায়তে
তদা নাদধ্বনিসংযোগাদ ঘোষো জায়তে যদা শ্বাসোঽনুপ্রদীয়তে তদা
শ্বাসসংসর্গাদ ঘোষো জায়তে। সা ঘোষবদঘোষিতা।
মহতি বায়ৌ মহাপ্রাণঃ। অল্পবায়ৌ অল্পপ্রাণঃ। সাল্পপ্রাণ
মহাপ্রাণেন মহাপ্রাণস্বম উষ্মাণস্তে। তত্র যদানুসারি প্রযত্নস্তীব্রো
ভবতি তদা মাত্রাণাংনিকণ্ঠবিলস্য বালাস্বরস্য চ বায়োস্তীব্র
গতিত্বাদ্রৌক্ষ্যং ভবতি। তমুদাত্তমাচক্ষতে। যদা মন্দঃ প্রযত্নো ভবতি
তদা মাত্রাণাং প্রসন্নত্বং কণ্ঠবিলস্য চ বহুত্বং স্বরস্য চ।
বায়ুমন্দগতিস্বাৎ স্নিগ্ধতা ভবতি। তমুদাত্তমাচক্ষতে।
উদাত্তানুদাত্তসন্নিকর্ষাৎ স্বরিত ইতি। স এব প্রযত্নোর্ভিনিবৃত্তঃ।
কৃৎস্নপ্রযত্নো ভবতি স এবমাপিশলেঃ পঞ্চদশভেদাখ্যা কধির্মা ভবন্তি।
তদ্ যথা স্পৃতা ঈষৎ স্পৃষ্টতা বিবৃতা সংবিবৃতা চ
সংবারবিবারৌ শ্বাসনাদৌ ঘোষবদঘোষতা অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণতা
সাল্পতা চ উদাত্তানুদাত্তসন্নিকর্ষাৎ স্বরিত ইতি ইদানীং শিক্ষাগ্রন্থঃ।
শ্লোকৈরূপসংহ্রিয়তে। অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠশিরস্তথা।
জিহ্বামূলং চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠৌ চ তালু চ। স্পৃষ্টত্বমীষৎ
স্পৃষ্টত্বং সংবৃতত্বং তথৈব চ বর্ণানামন্তঃ করণমুচ্যতে। বাহ্য
সঞ্চারনিশ্বাসনাদ্ঘোষতা ঘোষোল্পপ্রাণতা চৈব মহাপ্রাণ স্বরাস্ত্রয়ঃ॥

॥ ইত্যাপিশলী শিক্ষা সমাপ্তা॥

বঙ্গানুবাদ

ওঁ এই (অর্থাৎ ওঁ এই স্বরূপ) তাহাই শব্দ ; উহা দুই প্রকার—ব্যক্ত ও অব্যক্ত ; আমরা সিদ্ধজন ইহার উপাসনা করিয়া থাকি। সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে ইহা উপাসক পুরুষকে ঐহিক ও আমুষ্মিক মঙ্গলের সহিত যুক্ত করিয়া থাকে।

স্থান ও করণের মধ্যে স্থানকে বৃত্তিকার পবনের গতি অনুসারে সংক্ষেপে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। নাভিতল হইতে ক্রম ধরা হয়। বর্ণসকল স্থান, করণ ও প্রযত্নভেদে বিভক্ত হইয়া থাকে। কাহারও মতে বর্ণত্রিষষ্টি এবং কাহারও বা মতে চতুঃষষ্টি। কোন্ বর্ণের কোন্ স্থান কোন্ করণ এবং কোন্ প্রযত্ন ? প্রযত্নগুলি দুই ভাগে বিভক্ত।

স্থানের কথা বলা হইতেছে—

অ, কবর্গ ও বিসর্জনীয় কণ্ঠ হইতে উৎপন্ন হয়। ঋ ও ট বর্গের মূর্ধা। জিহ্বামূলীয় কোন্গুলি ? জিহ্বা হইতে যাহাদের উচ্চারণ হয়। অনেকের মতে বর্গীয় বর্ণ, অনুস্বার ও জিহ্বামূলীয় জিহ্বা হইতে উচ্চারিত হয়। কেহ বা বলেন আস্য হইতে উচ্চার্যমাণ বর্ণসমূহেরই জিহ্বামূলীয় সংজ্ঞা। ই, চবর্গ, য ও শ তালব্যবর্ণ। উ, পবর্গ ও উপধ্মানীয়ের ওষ্ঠ্যবর্ণ। বকার দন্তৌষ্ঠ্য। কেহ কেহ বর্ণের স্থানে বিহিত বর্ণেরও স্থানত্ব স্বীকার করেন। যম বর্ণ[১] অনুনাসিক। কাহারও মতে শুধু জিহ্বা হইতে উচ্চার্য বর্ণই জিহ্বামূলীয়। এ ও ঐ কণ্ঠতালব্য, ও এবং ঔ কণ্ঠৌষ্ঠ্য। ঙ, ঞ, ণ, ন ও ম অনুনাসিক বর্ণের দ্বিত্ব ও সন্ধ্যক্ষর বর্ণ সংযুক্ত বর্ণ। এইরূপে স্থান কথিত হইল। করণ ও জিহ্বার মূলের দ্বারা জিহ্বামূলীয়ের, জিহ্বার মূল ও মধ্যের দ্বারা তালব্যের এবং জিহ্বার অগ্রের দ্বারা মূর্ধন্যের উচ্চারণ হইয়া জিহ্বাগ্রের অধঃ হইতেও করণ হয়। জিহ্বার অগ্রের দ্বারা দন্ত্যবর্ণের অন্য বর্ণগুলি নিজ নিজ স্থান হইতেই উচ্চারিত হয়।

প্রযত্নও দুই প্রকার। ব্যাপ্তিতে বা স্বস্থানে অভ্যন্তর প্রযত্নের ন্যায় হয়। স্পৃষ্ট করণকে স্পর্শ বলে। ঈষৎ স্পৃষ্ট করণের অন্তঃস্থা সংজ্ঞা। উষ্মবর্ণের ঈষৎ বিবৃত করণ বা অবিবৃত করণ। স্বরের বিবৃত করণ। স্বরের মধ্যে

একার ও উকারের বিবৃত স্বর। তাহাদের সহিত ঐকার এবং তাহাদিগ হইতে পৃথক আকার। অকারের সংবৃত সংজ্ঞা। এই পর্যন্ত অন্তঃপ্রযত্ন কথিত হইল। এখন বাহ্যপ্রযত্ন কথিত হইতেছে—

বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ শ, ষ, স ও বিসর্জনীয়, জিহ্বামূলীয়, উপধ্মানীয়, প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের যম বিবৃতকণ্ঠ্য। ইহাদের বিবার, শ্বাস ও অঘোষ সংজ্ঞাও হইয়া থাকে। বর্গের প্রথম বর্ণের যম অল্পপ্রাণ; অন্য সমুদয় মহাপ্রাণ। বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ অন্তঃস্থ বর্ণ। অনুস্বার তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের যম এবং অনুনাসিক বর্ণের সংবৃতকণ্ঠ্য সংজ্ঞা। শ্বাস, সংবার, অঘোষ বর্গের যম এবং ঘোষবৎ[২] বর্ণ অল্পপ্রাণ। অন্যসমুদয় মহাপ্রাণ। তৃতীয় ও পঞ্চমের উচ্চারণ একরূপই হইয়া থাকে। আনুনাসিকাই ইহাদের বিলক্ষণ গুণ। ককার হইতে মকার পর্যন্ত স্পর্শবর্ণ। যকার হইতে অন্তঃস্থ বর্ণ। শকার হইতে উষ্মবর্ণ ইকারের সহিত তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণও উষ্ম। এ স্থানে বাহ্যপ্রযত্ন কথিত হইল।

স্পর্শ ও যম ও অকারের বায়ু লৌহপিণ্ডের ন্যায়, স্থানের বায়ু দারু-পিণ্ডের ন্যায় এবং উষ্ম ও স্বরবর্ণের বায়ু উর্ণাপিণ্ডের ন্যায় বলিয়া বৃত্তিকারগণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। পদ কিরূপ তাহাই কথিত হইতেছে। হ্রস্বদীর্ঘপ্লুত এবং ছত্র ও ঐশ্বর্যের অভ্যুন্নয়ন এই পাঁচ। ইহারা অনুনাসিক ও নিরনু-নাসিক ভেদে দুই প্রকার, অতএব মোট দশপ্রকার, এইরূপে বর্ণ কথিত হইল। উবর্ণ, ঋবর্ণ ও ত্রিবর্ণস্বরের দীর্ঘ হয় না, তাহাদের দ্বাদশভেদ। এই সকল ভেদ শক্তিজ ও অনুকরণজ, দীর্ঘ থাকিলে অষ্টাদশ ভেদের কল্পনা করা হয়। সন্ধ্যক্ষরের হ্রাস নাই, সুতরাং তাহাদেরও দ্বাদশভেদ। ছন্দোগগণের······। অর্ধ একাক্ষর ওঁকার পাঠ করা হয়, তাহারও অষ্টাদশ ভেদ। রেফবর্জিত ব্যঞ্জনবর্ণের অনুনাসিক ও নিরনুনাসিক ভেদে দুই প্রকার ভেদ। রেফ ও উষ্মবর্ণের সবর্ণতা নাই। বর্গের সহিত বর্গের সবর্ণ, বর্ণের এই প্রকার ক্রম। এখন স্থানকরণ ও সবর্ণের প্রসিদ্ধি কিরূপে, তাহাই বলা হইতেছে। যে স্থান হইতে বর্ণের উৎপত্তি হয় তাহাই স্থান। চেষ্টার নাম প্রযত্ন এবং করণ। উৎসাদ প্রযত্ন এবং স্পষ্টতা প্রভৃতি বর্ণগুণ। নাভি প্রদেশ হইতে প্রযত্ন প্রেরিত হইয়া প্রাণবায়ুতে নাভি বায়ুদ্বারা রুদ্ধ

হইয়া ক্রমে বক্ষ প্রভৃতি কোন এক স্থানে প্রযত্ন দ্বারা বিস্তারিত হইয়া থাকে। বিধার্যমাণ সেই প্রযত্নের ত্রুটি করিয়া স্থান উপপন্ন হয়। ইহাই আকাশ বা বর্ণশ্রুতি। এইরূপে সবর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্ণের উৎপত্তির সময়ে যখন স্থান, করণ ও প্রযত্ন পর্যন্ত পরস্পর স্পর্শ করে তাহাইস্পর্শ বর্ণ। যখন দূর হইতে স্পর্শ করে তখন ঈষৎ স্পৃষ্ট, যখন সমীপে স্পর্শ করে তখন বিবৃত। এই পর্যন্ত অন্তঃপ্রযত্ন। অনন্তর বাহ্য প্রযত্নের কথা বলা হইতেছে। সেই প্রযত্নই প্রাণ ও নাভিবায়ুর ঊর্ধ্বে উৎক্রমণ করিয়া মূর্ধায় প্রতিহত হইয়া নিবৃত্ত হইলে কণ্ঠে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া গলবিলের সংবৃতত্ব হেতু সংবার নামক বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিবৃত হইলে বিবার উৎপন্ন হয়।

কণ্ঠবিলের সংবৃতত্ব হইলে নাদ উৎপন্ন হয়। কণ্ঠবিল বিবৃত হইলে শ্বাস উৎপাদিত হয়। এই শ্বাস ও নাদকে অনুপ্রদান বলা হয়। শ্বাসনাদ ও অনুপ্রদান ভিন্ন অন্য ব্যঞ্জন নাদবৎ উচ্চারিত হয়।

যখন নাভিস্থলজাত ধ্বনিতে নাদ উৎপন্ন হয়, নাদ ধ্বনিসংযোগ হইতে ঘোষ উৎপন্ন হয়, এবং যখন শ্বাস অনুপ্রদত্ত হয়, তখন শ্বাস সংসর্গ হইতে ঘোষ উৎপন্ন হয়। তাহাই ঘোষবৎ বলিয়া অঘোষতা। বায়ু মহান্ হইলে মহাপ্রাণ হয়। অল্প বায়ুতে অল্পপ্রাণ। অল্প প্রাণযুক্ত মহাপ্রাণ নিবন্ধন মহাপ্রাণত্ব। ইহারা উষ্ম বর্ণ। তারপর যখন অনুসরণকারী প্রযত্ন তীব্র হয়, যখন মাত্রাগুলির নিকণ্ঠবিলের এবং বাল্যস্বরের বায়ুর তীব্র গতিহেতু রুক্ষতা হইয়া থাকে তখন তাহাকে উদাত্ত বলা হইয়া থাকে। যখন প্রযত্ন মন্দ-ভাবাপন্ন হয় তখন মাত্রা সকলের প্রসন্নতা হয় এবং কণ্ঠবিলের ও স্বরের বহুত্ব হইয়া থাকে। বায়ুর মন্দগতিবশত স্নিগ্ধতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাহাকেই উদাত্ত বলা হয়। উদাত্ত ও অনুদাত্তের সন্নিকর্ষহেতু স্বরিত উৎপন্ন হয়। ইহা প্রত্যুত অভিনিবৃত্ত প্রযত্ন। কৃৎস্নপ্রযত্ন হইয়া থাকে—সেই কৃৎস্ন প্রযত্নই আপিশলীর পঞ্চদশভেদ বর্ণধর্ম। সেই বর্ণধর্ম ঈষৎস্পৃষ্টতা, বিবৃতা সংবিবৃতা। শ্বাস ও নাদ সংবার ও বিবার। ইহাই ঘোষবৎ অঘোষতা। অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণতা। উদাত্ত ও অনুদাত্তের সন্নিকর্ষ হেতু যে অল্পতা তাহা স্বরিত নামে অভিহিত। ইদানীং ইহাই শিক্ষাগ্রন্থ। শ্লোকের

দ্বারা উপসংহার করা যাইতেছে। বর্ণের অষ্টস্থান—হৃদয়, কণ্ঠ, শিরঃ, জিহ্বা-মূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ এবং তালু। স্পৃষ্টত্ব, ঈষৎ স্পৃশত্ব, সংবৃতত্ব, অসংবৃতত্ব—ইহাদিগকে বর্ণসকলের অন্তঃকরণ বলা হইয়া থাকে। বাহ্য-সঞ্চার, নিঃশ্বাস ও নাদ—ঘোষতা, ঘোষ—অল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণস্বর নামে অভিহিত।

॥ ইতি আপিশলী শিক্ষা সমাপ্তা ॥

পাদটীকা

১ বর্গের, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণস্থানে বর্গের পঞ্চম বর্ণ পরে থাকিলে যে তৎসদৃশ বর্ণ উৎপন্ন হয় তাহাকে যম বলে। যথা ফলিক্ক্নী চখ্ খ্নতু ইত্যাদি। +এ. ঐ, ও, ঔ প্রভৃতি সন্ধিজাত বর্ণকে সন্ধ্যক্ষর বর্ণ বলে।

২ বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ শ, ষ, স ঘোষবর্ণ।

["শ্রীভারতী" ১৩৪৫ চৈত্র ও ১৩৪৬ বৈশাখ : ক্রোড়পত্র পৃ. ১-১৩]

প্রসঙ্গ-কথা

1 চরণব্যূহ : শৌনক ঋষি কর্তৃক রচিত। শৌনক ঋষি জনমেজয়ের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। ইনি শাব্দিক আচার্য এবং সূত্রকার আশ্বলায়নের গুরু। পাণিনির পূর্বে ছিলেন। —সনৎস্ন. ২.৭৩২

2 সায়ণাচার্য : বেদভাষ্যকার। 'অনার্য' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

3 দুর্গাচার্য : জম্বুমার্গাশ্রমবাসী। গ্রন্থ—নিরুক্তবৃত্তিঃ। —সনৎস্ন.

4 রোট্ (Roth, Rudolf) : 'অদিতি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

5 বর্নেল (Burnell, Arthur Coke) : 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

6 গোল্ডস্টুকর (Goldstucker, Theodore) : 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

7 বেবের (Weber, A F.) : 'অথর্ববেদ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

8 হৌগ (Haug, Dr. Martin) : 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র

পাণিনি

সংস্কৃত ব্যাকরণের উৎপত্তি

সুদূর অতীতের কোন শুভমুহূর্তে অশেষ কল্যাণদায়িণী সংস্কৃত-ভাষার উৎপত্তি বা প্রচার হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা বোধ হয় এক অসম্ভব। তবে এই বর্ষীয়সী ভাষা 'সংস্কৃত' নামে অভিহিত হইবার পূর্বে যে ইহার একটি রূপ বা আকৃতি ছিল তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। কোন প্রাচীন ব্যাকরণে 'সংস্কৃত' এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না; সম্ভবত রামায়ণেই ইহার প্রথম ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। অনুমান হয়, যে সময়ে সংস্কৃতের এই ভূতপূর্ব মূর্তির নানারূপ বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইতে থাকে, যে সময় তদানীন্তন সমাজবিশেষে প্রচলিত শব্দসমূহের অনুশাসনের আবশ্যকতা মানবের চিন্তারাজ্য অধিকার করিতে থাকে, যে সময় যদৃচ্ছ ব্যবহৃত শব্দসমন্বিত ভাষার সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে কথিত ও লিখিত ভাষা—এতদুভয়ের পার্থক্য ভারতীয়গণ [পূর্বাচার্যগণ] ভাবিতে থাকেন, মনে হয় সেই সময়েই এই ভাষা 'সংস্কৃত' নামে আখ্যাত হয় এবং এই অবসরে ভারতবাসীদিগের প্রথম ব্যাকরণের জন্মলাভ হয়। ক্রমশ কালসহকারে ইহার যথাসম্ভব সুসংস্কার ও উন্নতি সাধিত হইতে থাকে। এই ব্যাপারে আর্যদিগের কত বৎসরই না অতীত হইয়াছিল। এই আর্য মহাত্মাদিগের মধ্যে কয়েক জন ভাষা-সংস্কারক বা শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদকের নাম প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, তাঁহারা

কোন্ সময় জীবিত ছিলেন তাহা স্থির করিবার কোনও উপায় নাই। অধ্যাপক রোটুই[1] (Roth) ১৮৪৬ খ্রী. সর্বপ্রথম ব্যাকরণের উৎপত্তি ও সংস্কৃত ব্যাকরণের ইতিবৃত্তের বিষয় আলোচনা করেন। ইনি পথ প্রদর্শন করিবার পর বেবের[2] (Weber), বেন্‌ফী[3] (Benfey), ম্যাক্‌সমুলর[4] (Maxmuller), হুইট্‌নী[5] (Whitney), রেনিয়ের[6] (Regnier), গোল্ডস্টুকর[7] (Goldstucker), কীলহর্ন[8] (Kielhorn), এগলিঙ[9] (Eggeling), বর্নেল[10] (Burnell) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এ-বিষয়ে বহু গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন।

ব্যাকরণ ও বেদাঙ্গ

আর্যদিগের প্রাচীনতম কালের প্রায় সমুদয় গ্রন্থই ছন্দোগ্রথিত। বেদের ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে সংস্কৃত-ভাষা-বিষয়ে ছন্দঃশাস্ত্র যে আবশ্যক তাহা উক্ত হইয়াছে। এই সময়ে শব্দশাস্ত্রেরও যে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল ঐ সকল গ্রন্থে তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এদিকে বৈদিক সূত্রসমূহ এতই জটিল ও সূক্ষ্মাকারবিশিষ্ট যে, 'পরিভাষা' নামক পৃথক্ সূত্র ব্যতীত কেহই ইহার সম্যক্ অর্থগ্রহণে সক্ষম [সমর্থ] হন না। বিশেষত ইহাদের ব্যাখ্যায় 'অনুবৃত্তি' ও 'নিবৃত্তি' সূত্রেরও সাহায্য যথেষ্ট আবশ্যক। বোধ হয়, বিভিন্ন পথাবলম্বনবশত বৈদিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যায় ধাতুপ্রত্যয়াদি-বিষয়ে ইতঃপূর্বেই শব্দের অর্থ লইয়া বেদশাস্ত্রকারদিগের মধ্যে নানা মত উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যে কয় জন স্বীয় মত প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রকৃষ্ট পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেই শব্দশাস্ত্রের আবিষ্কর্তা [আবিষ্কারক] বলা যাইতে পারে। বোধ হয়, এইরূপে শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। আবার, অন্য দিকে ঐ সমস্ত বৈদিক গ্রন্থে পদসাধন ও শব্দের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহা হইতে নিরুক্তের[১] উৎপত্তি কল্পনা করা যাইতে পারে। ক্রমশ পদযোজনা-সম্বন্ধে বাদানুবাদের সূত্রপাত হয়। এইরূপে যখন ঋষিগণ দেখিলেন যে, বৈদিক সূত্রসমূহ [গ্রন্থসমূহ] ক্রমেই পরিবর্তিত হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা সূত্রসকলের রক্ষার জন্য নিতান্ত সচেষ্ট হইলেন। বৈদিক সূত্রের প্রকৃত

অর্থ নির্ণয়ের জন্য এক দিকে তাঁহারা শব্দবিশ্লেষণ-ব্যাপারে নিরত হইলেন। পক্ষান্তরে বোধ হয়, তাঁহাদের শব্দসকলের বিশুদ্ধ উচ্চারণের কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম হইয়া থাকিবে; তজ্জন্য তাঁহারা কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি উচ্চারণস্থানের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়াছেন। তাঁহাদের এই সমস্ত চেষ্টার ফলে বোধ হয় 'ব্যাকরণ' নামক 'বেদাঙ্গে'র উৎপত্তি হইয়াছিল। ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্যের চতুর্দশ অধ্যায় পাঠ করিলে এ বিষয়টি স্পষ্টই জানিতে [বুঝিতে] পারা যায়। শব্দতত্ত্ববিৎ ড. বর্নেল এই মতের পক্ষপাতী।[২]

[বেদাঙ্গ বেদের অংশ নহে—বেদের পরিশিষ্ট।] এই বেদাঙ্গের সাহায্যেই বেদের অর্থ সুগম হয়। এইগুলি অপৌরুষেয় নহে। সাধারণত ব্রাহ্মণকে। 'প্রবচন' আখ্যা দেওয়া হয়—কিন্তু মনু বেদাঙ্গকে 'প্রবচন'[৩] নাম দিয়াছেন। ষড়্‌বেদাঙ্গের সর্বপ্রথম উল্লেখ সামবেদের ষড়্‌বিংশ-ব্রাহ্মণে[৪] দেখিতে পাওয়া যায়। যাস্তবল্ক [যাস্ক] তাঁহার নিরুক্তে[৫] বেদাঙ্গের বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বেদাঙ্গের কোন নাম দেন নাই। চরণব্যূহ, মনু[৬], মুণ্ডক ও ছান্দোগ্যোপনিষদে ছয়টি বেদাঙ্গের উল্লেখ আছে।[৭] কিন্তু বেদাঙ্গের অন্তর্গত বিষয়সকলের যথাযথ বিবরণ বৃহদারণ্যক ও তদ্‌ভাষ্যেই পাওয়া যায়। এই বেদাঙ্গ কোন ব্যক্তিবিশেষের গ্রন্থকে লক্ষ্য করিত না, ইহা ব্যাকরণ-শাস্ত্রকেই বুঝাইত। ঋগ্বেদের ভাষ্যে[৮] সায়ণাচার্য যেরূপে বেদাঙ্গ-ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যাকরণকে লক্ষ্য করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। আর দুর্গাচার্যের বচন[৯] হইতেও তাহা প্রমাণিত হইতে পারে। ঋক্, যজু ও অথর্ব-বেদের প্রাতিশাখ্যগুলি যেভাবে গ্রথিত, তাহাতে তাহাদিগকে এক একখানি বেদাঙ্গ-ব্যাকরণ উপাধি দেওয়া নিতান্ত অযুক্ত [যুক্তিহীন] নহে।

বস্তুত, পাণিনির পূর্ব হইতেই যে ব্যাকরণ বেদাঙ্গ নামে অভিহিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য শাব্দিক রোট্, বর্নেল প্রভৃতি পণ্ডিতও এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে, একমাত্র অধ্যাপক গোল্ডস্টুকর বেদাঙ্গ বলিতে কেন যে পাণিনীয় [পাণিনির] ব্যাকরণই বুঝিয়াছেন[১০] তাহা বুঝিতে পারিলাম [পারা যায়] না। যাহা হউক, তাঁহার এই মত যে নিতান্ত অযৌক্তিক তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরিভাষা

পাণিনির বহু পূর্বে যে ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দের অস্তিত্ব ছিল বৈদিক গ্রন্থ হইতে তাহার যথেষ্ট উদাহরণ দেখান যাইতে পারে। বৈদিক সাহিত্য কোন্ সময় বিদ্যমান ছিল তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিলেও একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে, সেগুলি পাণিনির বহু পূর্বের। আর বৈদিক সাহিত্যে পরিভাষাগুলি যে পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল এরূপ কল্পনা করিবার কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথম প্রথম উদাহরণ তৈত্তিরীয় বা তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, "শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণাঃ স্বরাঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ।"—৭. ১. ২।[১১] অতএব বর্ণ, স্বর ও মাত্রা এই তিনটি পারিভাষিক শব্দ পাওয়া গেল। ছান্দোগ্য-উপনিষদে[১২] স্পর্শস্বর ও উষ্মবর্ণের উল্লেখ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণের,[১৩] "নেহদ্ [নহদ] একবচনেন বহুবচনং ব্যবয়ামেহতি", এই বাক্যে বৈয়াকরণিক একবচন ও বহুবচনের কথা দেখা যায়। অধ্যাপক বেবের শতপথ-ব্রাহ্মণের ১০১৮ পৃষ্ঠার টীকায় প্রমাণ করিয়াছেন যে, যে সময় এই ব্রাহ্মণ লিখিত হইয়াছিল সেই সময় ব্যাকরণ এতদূর উন্নত হইয়াছিল যে, ভূ অস্ প্রভৃতি ধাতুর ব্যাখ্যাও ইহাতে আলোচিত হইয়াছিল।

এই উক্তির সমর্থনের জন্য ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের 'মদ্' ধাতু (১. ১০; ২. ৩; ৩. ২. ২৯), 'সুধা'—সুহিত (৩ ৩৯. ১৭), জনুষি—জাতবৎ (৪. ৬. ২৯, ৩২; ৫. ৫) প্রভৃতি উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে[১৪] অক্ষর, অক্ষরপংক্তি, চতুরক্ষর, বর্ণ, কার [বর্ণকার] পদ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। গোপথব্রাহ্মণ যদিও পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণগুলির তুলনায় পরবর্তী, তথাপি উল্লেখ আছে। ইহার ১. ২৪ সূত্রে আছে—"ওঙ্কারং পৃচ্ছামঃ কো ধাতুঃ কিং প্রাতিপদিকং কিং নামাখ্যাতং কিং লিঙ্গং কিং বচনং কা বিভক্তিঃ কঃ প্রত্যয়ঃ কঃ স্বরঃ উপসর্গো নিপাতঃ কিং বৈ ব্যাকরণং কো বিকারঃ কো বিকারী কতিমাত্রঃ কতিবর্ণঃ কত্যক্ষরঃ কতি পদঃ কঃ সংযোগঃ কিং স্থানানাম্নুপ্রদানকরণং [স্থানানুপ্রদানকরণং]

শিক্ষুকাঃ কিম্ উচ্চারয়ন্তি কিং ছন্দঃ কো বর্ণঃ ইতি পূর্বে প্রশ্নাঃ।" অতএব, ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ওঙ্কারের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ইহাতে প্রধান প্রধান পরিভাষার নামোল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সামবেদের তাণ্ড্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ হইতেও বৈয়াকরণিক অর্থদ্যোতক বহু পরিভাষার নাম পাওয়া যায়; এখানে সেগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শিক্ষা—প্রাতিশাখ্য

'শিক্ষা'—বৈদিক-সূক্তের প্রকৃত উচ্চারণ ও যথাযথ আবৃত্তি-বিষয়ে শিক্ষা দেয়। অধ্যাপক হোগ[11] (Haug) বলেন, শিক্ষা প্রাতিশাখ্য অপেক্ষা প্রাচীন এবং ইহার বিধিব্যবস্থা পরে প্রাতিশাখ্যের নিয়মাদির সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। ড. বর্নেলও তাহাই বলেন। কেহ কেহ এই শিক্ষাগ্রন্থের এতাদৃশ প্রাচীনত্ব-বিষয়ে সন্দেহ করিয়া থাকেন। সকল শিক্ষা-গ্রন্থই যে অতি প্রাচীন তাহা নহে। সমুদয় শিক্ষা-গ্রন্থ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই; তবে, সম্প্রতি অধিকাংশ গ্রন্থই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৎসমুদয়ের মধ্যে 'অমোঘনন্দিনী শিক্ষা'[১৫] 'কেশবী শিক্ষা'[১৬] 'শিক্ষা-সমুচ্চয়'[১৭] ও শ্রীনিবাস-কৃত 'সিদ্ধান্ত-শিক্ষা'[১৮] যে নিতান্ত অর্বাচীন তাহা পণ্ডিতমণ্ডলী স্বীকার করেন। তবে, 'গৌতমী'[১৯] 'নারদ'[২০] 'মণ্ডুকী'[২১] ও 'লোমশন্য' ['লোমশনী'] শিক্ষা[২২] যে অতি প্রাচীন সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, এই শিক্ষাগুলি ব্যাকরণ শ্রেণীর অন্তর্গত নহে—তবে ইহাতে ব্যাকরণের উচ্চারণ ও আবৃত্তি বিষয় [উচ্চারণ ও আবৃত্তি, ব্যাকরণের এই দুইটি বিষয়] আলোচিত হইয়াছে মাত্র। শব্দ সকলের উচ্চারণ, উচ্চারণাদির লঘু-গুরু-ভেদ, প্রত্যেক অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণ-সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিধি, প্রকৃতি, কার্যকারিতা, দুই বা ততোধিক শব্দের সন্ধিবিধি প্রভৃতি [সন্ধিবিধি, কারক, তদ্ধিত, সমাস প্রভৃতি] এই প্রাতিশাখ্যগুলির আলোচ্য বিষয়। বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ-বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য এই প্রাতিশাখ্যগুলি রচিত হয় নাই। এই গুলিতে শব্দ বা ধাতুর প্রকৃত্যাদির আলোচনাও নাই। তবে, এগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে

কথিত ভাষা ও সঙ্গীতে কিরূপ উচ্চারণপার্থক্য ঘটে তাহাই দেখাইবার জন্য অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণাদির বিস্তৃত বিধিব্যবস্থা দিবার জন্যই এইগুলি রচিত হইয়াছিল। ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব—এই চারি বেদের চারিটি প্রাতিশাখ্য আছে। ইহাদিগের মধ্যে ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্যই[২৩] সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। [তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে বর্ণ, উচ্চারণ, প্রযত্ন প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। যথা—"অথ বর্ণ সমাম্নায়ঃ"।……"দ্বে দ্বে সবর্ণে হ্রস্বদীর্ঘে।" "নপ্লুতপূর্বম্।" "ষোড়শাদিতঃ স্বরাঃ।" "শেষা ব্যঞ্জনানি।"] শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য ও বেদাধ্যয়ন-বিষয়ে অনেক আনুকূল্য করিয়াছে। ইহার অপর নাম কাত্যায়ন প্রাতিশাখ্য।[২৪] এখানি অতি প্রাচীনকালের রচনা। তবে ইহার যে পরবর্তী কালে বিশেষ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইয়াছিল তাহা সহজেই বলিতে পারা যায়। সংজ্ঞা, পরিভাষা, শব্দের উচ্চারণের নিয়ম, সন্ধি, ক্রিয়ার উপর যতিপাতের নিয়ম ও উচ্চারণের নিয়ম, স্বর-ব্যঞ্জনের তালিকা, গ্রন্থপাঠের নিয়ম প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।[২৫]

পাণিনির পূর্ববর্তী বৈয়াকরণগণ

সাধারণত আটজন মাত্র বৈয়াকরণের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যান্তর্গত [দাক্ষিণাত্যের] দেবগিরি-নিবাসী বোপদেব তাঁহার 'ধাতুপাঠে'র উপক্রমণিকার দ্বিতীয় শ্লোকে এই আটজন শাব্দিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলিঃ শাকটায়নঃ। পাণিন্যমর-জৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ।" দুর্গাচার্যও তাঁহার যাস্কের টীকায় বলিয়াছেন, 'ব্যাকরণং অষ্টধা' (১.২)। এই আটজন শাব্দিকের মধ্যে পাণিনির ব্যাকরণই সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। শাকটায়ন ও জিনেন্দ্রের ব্যাকরণের হস্তলিখিত [জিনেন্দ্রের হস্তলিখিত] পুথি আজও বর্তমান আছে। তিব্বতীয় ভাষায় 'চন্দ্রব্যাকরণ' অদ্যাপি সুরক্ষিত আছে।[২৬] ইন্দ্র কাশকৃৎস্ন আপিশলী ও অমরের নাম কেবল সূত্রাদির উদ্ধৃত বচনে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রণীত ব্যাকরণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহা হউক, ইন্দ্রই [দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রই] আদি ব্যাকরণ-প্রণেতা ছিলেন, এই মতই বিশেষ প্রচলিত। সারস্বত

ব্যাকরণের ভাষ্যে ইন্দ্র আদি বৈয়াকরণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। "ইন্দ্রা-দয়োঽপি যস্যান্তং ন যযুঃ শব্দবারিধেঃ। প্রক্রিয়াস্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমো বক্তুং নরঃ কথম্॥" (বোম্বাই-সংস্করণ, শ্লোক-২)। উত্তর বৌদ্ধ [উত্তর দেশীয় বৌদ্ধ] গ্রন্থাদিতেও ইন্দ্র-ব্যাকরণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অবদান-শতকে লিখিত আছে, সারিপুত্ত বাল্যকালে ইন্দ্রব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন।[২৭] তিব্বতীয় সাহিত্যে ইন্দ্রব্যাকরণের উল্লেখ বহুবার দৃষ্ট হয়। বু-স্তন[১৭] (Bu-ston) বলেন, [কেহ কেহ বলেন], সর্বজ্ঞ (শিব-) কর্তৃক প্রথম ব্যাকরণ প্রণীত হয়। কিন্তু এই ব্যাকরণ তিনি কখনও জম্বুদ্বীপে প্রেরণ করেন নাই। তৎপরে ইন্দ্র ইন্দ্রব্যাকরণ প্রণয়ন করেন ও বৃহস্পতি তাহা অধ্যয়ন করেন। ইহা জম্বুদ্বীপে প্রচলিত ছিল। অতঃপর পাণিনি-ব্যাকরণ এইস্থানে সবিশেষ প্রচলিত হয়।[২৮] 'বৃহৎকথামঞ্জরী' ও 'কথাসরিৎসাগরে' লিখিত আছে যে, পাণিনি-ব্যাকরণের আবির্ভাবের পর হইতেই ইন্দ্রব্যাকরণের চর্চা লোপ পাইতে থাকে।

১৬০৮ খ্রী.[২৯] তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারনাথ একখানি ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ইহাতে লিখিত আছে সপ্তবর্মা[৩০] (সর্ববর্মা ?) [তারনাথের মতে, সপ্তবর্মা] ষণ্মুখকে (কার্তিকেয়কে) ইন্দ্র-ব্যাকরণ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে বলেন। তৎশ্রবণে কার্ত্তিকেয়দেব বলেন—"সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ।" এইটুকু শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ তিনি ব্যাকরণের অবশিষ্ট অংশ বুঝিয়া ফেলিলেন। উদ্ধৃত সূত্রটি প্রকৃতই কাতন্ত্র বা কলাপ-ব্যাকরণের প্রথম সূত্র। আর ইহা ইন্দ্রব্যাকরণের অন্তর্গত। তারনাথ সপ্তবর্মাকে কালিদাস ও নাগার্জুনের সমকালিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি বলেন, পাণিনিব্যাকরণের সহিত ইন্দ্রব্যাকরণের, কলাপ-ব্যাকরণের সহিত চন্দ্রব্যাকরণের[৩১] ঐক্য আছে। যক্ষবর্মা শাকটায়ন-ব্যাকরণের টীকায় ইন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সায়ণাচার্য ঋগ্বেদের ভাষ্যে যে প্রকারে উল্লেখ [ভাষ্যে যেরূপ উল্লেখ] করিয়াছেন তাহাতে ইন্দ্রকে আদি বৈয়াকরণ বলা যাইতে পারে। এইরূপে ইন্দ্রব্যাকরণের উল্লেখ বহু গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও অধুনা ইন্দ্রব্যাকরণের কোন অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, পাণিনির

পূর্বে পাণিনি-ব্যাকরণের ন্যায় ইন্দ্র-ব্যাকরণের [ন্যায় এই ব্যাকরণের] সুবিস্তৃত প্রচলন ছিল। পাণিনির পূর্বের দু-চারখানি ব্যতীত প্রায় সমস্ত ব্যাকরণই ইন্দ্রব্যাকরণ নামে অভিহিত হইত। তিব্বতে কলাপ-ব্যাকরণকে ইন্দ্রব্যাকরণ বলিত। বোধ হয়, পাণিনির পূর্বে ইন্দ্রব্যাকরণ অনুযায়ী যিনি যে ব্যাকরণ রচনা করিতেন তাহারই নাম তাঁহারা 'ঐন্দ্র' রাখিতেন।

ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যে শাকটায়ন, শাকল্য, যাস্ক ও গার্গ্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয় ও অথর্ব প্রাতিশাখ্যে শাকটায়ন শাকল্য, গার্গ্য, কাশ্যপ, দাল্‌ভ্য, জাতুকর্ণ্য, শৌনক, ঔপশিবি, কাণ্ব প্রভৃতির নাম উল্লিখিত আছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সূত্র হইতে আমরা পাণিনির পূর্বতন যে কয়জন শাব্দিক ও আচার্যের নাম পাইয়াছি তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল।

অত্রি, আঙ্গিরস, আপিশলী, কঠ, কলাপী, কাশ্যপ, কুসে, কৌণ্ডিন্য, কৌরব্য, কৌশিক, গালব, চরক, চাক্রবর্ম, ছাগলি, জাবাল, তিত্তিরি, পারাশর্য, পীলা, বভ্রু, ভারদ্বাজ, ভৃগু, মণ্ডূক, যস্ক, বড়বা, বরতন্তু, বসিষ্ঠ বৈশম্পায়ন, শাকটায়ন, শাকল্য, শিলালি, শৌনক ও স্ফোটায়ন। অষ্টাধ্যায়ীর "যস্কাদিভ্যো গোত্রে" (২, ৪. ৬৩), "বা সুপ্যাপিশলেঃ" (৬. ১. ৯২), "অবঙ্ স্ফোটায়নস্য" (৬. ১. ১২৩), "ততো গার্গস্য" (৮. ৩. ২০), "লোপঃ শাকল্যস্য" (৮. ৩, ১৯), "ঋতো ভারদ্বাজস্য" (৭. ২. ৬৩), "তৃষিমৃষিকৃশেঃ কাশ্যপস্য" (১. ২. ২৫) ইত্যাদি সূত্র হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে পাণিনি উল্লিখিত ঋষিদিগের ব্যাকরণ অবগত ছিলেন। কেননা, পাণিনি ঐ সমস্ত ব্যাকরণ হইতে নিয়ম উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পাণিনির ব্যাকরণ

ভাগুরি, ঔপমন্যব, যস্ক, গালব, শাকল্য জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ সংস্কৃত ভাষাকে দেবভাষা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহারা কিয়দ্দিন সংস্কৃতের সহিত ক্রীড়া করিলে পর, ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলী, স্ফোটায়ন, শাকটায়ন, পাণিনি, ব্যাড়ি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি প্রভৃতি আচার্যগণ এই ভাষাদেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথাসাধ্য পরিমার্জনা করিয়া যান। এই

আচার্যকুলের মধ্যে দু-একজন ব্যতীত, প্রায় একমাত্র পাণিনির গ্রন্থ ও মতের যথেষ্ট প্রচলন ও প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পাণিনির ব্যাকরণ গ্রন্থাবলম্বন করিয়াই পুরুষোত্তমদেব[13]-কৃত ভাষাবৃত্তি, ভট্টোজি-দীক্ষিত[14]-কৃত শব্দ-কৌস্তুভ, রামচন্দ্র আচার্য[5]-কৃত প্রক্রিয়া-কৌমুদী, ভট্টোজি দীক্ষিত-কৃত সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, বরদরাজ[16]-কৃত লঘুকৌমুদী ও মধ্য-কৌমুদী, নাগেশ ভট্ট[17]-কৃত পরিভাষা-সংগ্রহ, পরিভাষা বৃত্তি, ও পরিভাষেন্দু-শেখর প্রভৃতি বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ-রত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পাণিনি যে ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন তাহার নাম "অষ্টাধ্যায়ী"। সময়ে সময়ে উহাকে "অষ্টকম্ পাণিনীয়ম্"ও বলা হয়। এই ব্যাকরণে আটটি অধ্যায় আছে, প্রতি অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ এবং সমগ্র ব্যাকরণে ৩৮৬৩টি সূত্র আছে। সুপ্রসিদ্ধ জর্মন শাব্দিক বোট্‌লিঙ্ক[18] (Bothlingk) বলেন যে অষ্টাধ্যায়ীর ৪. ১. ১৬৬, ৪. ১. ১৬৭, ৪. ৩. ১৩২, ৫. ১. ৩৬, ৬. ১. ৬২, ৬. ১. ১০০, এবং ৬. ১. ১৩৭ এই সাতটি সূত্র পাণিনি-বিরচিত নহে; এইগুলি বার্ত্তিক মধ্যে গণ্য, কালক্রমে এগুলি সূত্র মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু, অধ্যাপক অল্‌ব্রেখ্‌ট্ গোল্‌ডস্টুকর এই মতের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে উক্ত সাতটি সূত্রের মধ্যে ৪. ৩. ১৩২, ৫. ১. ৩৬, ৬. ১. ৬২ এই সূত্রত্রয় সম্বন্ধে সন্দেহ করা যাইতে পারে, কিন্তু, এই তিনটি পূর্ববর্তী সূত্রের বার্ত্তিক বলিয়াই মহাভাষ্যে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীর ৮টি অধ্যায়ে সন্ধি, সুবন্ত, কৃদন্ত, উণাদি, আখ্যাত, নিপাত, উপসংখ্যান, স্বরবিধি শিক্ষা, তদ্ধিত প্রভৃতি ব্যাকরণে যা কিছু আলোচ্য বিষয় সমস্ত প্রকাশিত হইয়াছে। এই সূত্রগুলি সর্বতোমুখ হওয়ায় জন-সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে পাণিনি-ব্যাকরণকে সংস্কৃত ভাষার প্রাকৃত ইতিহাস বলা যাইতে পারে।

অষ্টাধ্যায়ীর বিশেষত্ব

অষ্টাধ্যায়ীর পারিভাষিক শব্দের মধ্যে কতকগুলি তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত এবং কতকগুলি পূর্ববর্তী শাব্দিকগণের নিকট হইতে গৃহীত। যেগুলি স্বোদ্ভাবিত সেগুলির তিনি ব্যাখ্যা দিয়াছেন আর যেগুলি তাঁহার

পূর্ববর্তিগণের উদ্ভাবিত তন্মধ্যে যেগুলি সম্পূর্ণ সেগুলির তিনি পুনরায় নূতন-রূপে ব্যাখ্যা করিয়া উৎকর্ষ বিধান করিয়াছেন। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অনুস্বার, অন্ত, একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, উপসর্গ, নিপাত, ধাতু, প্রত্যয়, প্রদান, প্রযত্ন, ভবিষ্যৎ (কাল), বর্তমান (কাল) এই কয়টি শব্দের তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। এদিকে আবার অনুনাসিক, আত্মনেপদ, আমন্ত্রিত, উপধা, গুণ, দীর্ঘ, পদ, পরস্মৈপদ, বিভক্তি, বৃদ্ধি, সংযোগ, সবর্ণ, হ্রস্ব এই ত্রয়োদশটি ঐন্দ্র শব্দের তিনি নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্যে এইগুলি "প্রাঞ্চ" বৈয়াকরণদিগের শব্দ বলিয়া বহুবার কথিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পাণিনি নিজেও ২. ৩. ১৩ সূত্রের "চতুর্থী" এই শব্দের ব্যাখ্যাকালে "চতুর্থীতি সংজ্ঞা প্রাচাম্" স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে ইহা পূর্ববর্তী বৈয়াকরণের নিকট হইতে গৃহীত। এইরূপ, তিনি ২. ৩. ৪৬ ইত্যাদি প্রথমাদির ব্যাখ্যায় ইহাই স্বীকার করিয়াছেন। অতঃপর, পাণিনি কিরূপে অনুনাসিক ইত্যাদি শব্দ ব্যাখ্যায় প্রকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। প্রাতিশাখ্যে অনুনাসিক বলিলে কেবল মাত্র ঞ, ণ, ং প্রভৃতি কয়েকটি অক্ষরদ্যোতক হইবে ইহাই বলা হইয়াছে, কিন্তু পাণিনি উচ্চারণ-স্থানের দিকে লক্ষ্য করিয়া সূত্র করিলেন "মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ" (১.১.৮)। পাণিনির পূর্ববর্তী কাত্যায়ন-প্রাতিশাখ্যে ১.৩৫ সূত্রে, অথর্ব-প্রাতিশাখ্যে ১.৯২ সূত্রে "উপধা"র উল্লেখ আছে। অন্ত্যাৎ কাত্যায়নে (২ ১. ১০) "অন্ত্যাৎ পূর্ব উপধা" উপধার এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন, "অলোঽন্ত্যাৎ পূর্ব উপধা" (১. ১. ৬৫)। পূর্ব সূত্র হইতে এই সূত্রের অল্পই পার্থক্য, কিন্তু এই অল্প পরিবর্তন হইতেই পাণিনিপ্রবর্তিত পদ্ধতি ও পূর্বপ্রচলিত প্রণালীর মধ্যে কি প্রভেদ বিদ্যমান তাহা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। পাণিনিতে "অলঃ" এই কথাটি যুক্ত হইয়াছে মাত্র। মহাভাষ্যে ইহার এইরূপ কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—

"কিম্ ইদম্ অল্‌গ্রহণম্ অন্ত্যবিশেষণম্? এবং ভবিতুম্ অর্হতি। উপধা সংজ্ঞায়াম্ অন্ত্যনির্দেশশ্চেৎ সংঘাত প্রতিষেধঃ।" ইত্যাদি (মহাভাষ্য, বেনারস সংস্করণ ১। Fol. 160, 6)। অর্থাৎ সংঘাত প্রতিষেধের

নিমিত্তই "অল্" গৃহীত হইয়াছে। পূর্ববর্ত্তীদিগের গ্রন্থে এ সতর্কতার কোন আবশ্যকতা ছিল না, কেননা তাহারা এরূপ চিহ্ন কখনও ব্যবহার করিত না। এইরূপে সর্ববিষয়ে তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য ও দূরদর্শিতার প্রমাণ দেখাইতে পারা যায়। পাণিনি পূর্বপ্রচলিত পদ্ধতিগুলি যেরূপে সংস্কৃত করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে চারিটি বিষয়ের আবিষ্কর্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। (১) পাণিনিকর্তৃক শিবসূত্রের সর্বপ্রথম আবিষ্কার ও প্রত্যাহারদ্বারা তাহাদিগের প্রয়োগ, (২) পাণিনি উদ্ভাবিত অনুবন্ধসমূহ। (৩) কৃৎ, নদী, স্ত্রী, সংখ্যা, ঘ (=-তর, -তম); ঘি (= + -ই ও -উ), ঘু (= দা, ধা ইত্যাদি), টি, ভ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের উদ্ভাবন। (৪) প্রকৃত প্রস্তাবে গণসমূহের উদ্ভাবন। এই চারিটি বিষয়ে পাণিনির প্রতিভার যথেষ্টই পরিচয় পাওয়া যায়।

পাণিনির কাল-নির্ণয়

পাণিনি সংস্কৃত ভাষায় সর্বপ্রধান বৈয়াকরণ। তাঁহার কৃতিত্বের আলোচনা করিলে তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষার "মেরুদণ্ড" না বলিয়া থাকা যায় না। শব্দবিদ্যার অপূর্ব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থপ্রণেতা পাণিনির নাম কি ভারতে কি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট সর্বত্রই বিঘোষিত—সুপ্রচারিত। কিন্তু, তিনি কোন দেশের লোক, কোন সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি কাহার পুত্র ইত্যাদি বিষয়ে ইউরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিতগণ নানা মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের বিভিন্নমত সমালোচনা করিয়া পাণিনির কাল-নিরূপণ করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক।

পাণিনি কোথাও বলেন নাই যে তিনি তাঁহার ব্যাকরণের রচয়িতা। কিন্তু, তাঁহার বৈয়াকরণসূত্রে স্বীয় নাম ও নিবাস-গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কাত্যায়নের[১৭] শেষ বার্ত্তিকে[৩২] তাঁহার নামের সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; ইনি যে ব্যাকরণ-প্রণেতা ইহাতে তাহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে। "শব্দানুশাসন" আলোচনা করিয়া তিনি কোন্ সময়ের লোক বা কোন্ দেশে বাস করিতেন এতদ্বিষয়ক কোন নির্দিষ্ট সংবাদ পাওয়া যায় না। পাণিনি যে সময়ে জীবিত ছিলেন সেই সময়ের আলোচনা

করিলে, বোধহয়, তাঁহার সময়ে দুই শ্রেণীর বৈয়াকরণ বিদ্যমান ছিল। এক শ্রেণীর বৈয়াকরণ পূর্বাঞ্চলবাসী—অপর শ্রেণীর বৈয়াকরণ উত্তর প্রদেশ-নিবাসী। পাণিনি তদীয় গ্রন্থে "বণু" (৪. ২. ১০৩ ; ৪. ৩. ৯৩) অর্থাৎ "বণু" নদ ও দেশ, "কাপিশী" (৪. ২ ৯৯), "ফলনু" অর্থাৎ অফগানিস্তানের "ওয়ান" বা "বানু" নগর, "সুবাস্তু" (৪ ২. ৭৭) অর্থাৎ কাবুল নদীর শাখা "সোয়াট্", "বরণ" (৪. ২ ৮২) অর্থাৎ সিন্ধুনদীর দক্ষিণ তীরস্থ "বরণস্", "পশু" (৫. ৩. ১১৭), বাহীক (৪. ২. ১১৭ ; ৫. ৩. ১১৪) অর্থাৎ "পঞ্জাব", "সঙ্কল" (৪. ২. ৭৫), "শাকল", "পর্বত" (৪. ২. ১৪৩), "মালব্য" ও "ক্ষৌদ্রক্য" (৫. ৩. ১১৪) এই কয়েকটি স্থান ও জাতির নাম করিয়াছেন। এতৎসমুদায় বর্তমান পঞ্জাবের পশ্চিমে ও পশ্চিমোত্তরাংশে এবং অফ্গানিস্তানের পূর্বসীমা মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ উত্তর ভারতে অবস্থিত। "মালব্য" ও "ক্ষৌদ্রক্য" ব্যতীত সকল স্থানগুলিই ঋগ্বেদাদি বৈদিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে তিনি উত্তর ভারতের বৈয়াকরণ শ্রেণীর অন্তর্গত।

পাণিনি কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন তৎসম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পাণিনির সময় নিরূপণের পৌর্বপর্যানুসারে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতগুলি একে একে উল্লেখ করিব।

সুপণ্ডিত কোলব্রুক[২০] (Colebrooke) পাণিনির যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তবে তিনি শক, সংবৎ দিয়া পাণিনির সময়-সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। তিনি এইমাত্র বলিয়াছেন যে পুরাণবর্ণিত ঋষ্যাদি যেরূপ প্রাচীন পাণিনিও সেইরূপ পুরাতন ব্যক্তি।

প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ বোট্লিঙ্কই (Bohtlingk) সর্বপ্রথম পাণিনির কাল-নিরূপণে প্রকৃতরূপে প্রবৃত্ত হন। তিনি তাঁহার 'পাণিনি' নামক পুস্তকে[৩৩] সোমদেব ভট্টের[২১] কথাসরিৎসাগর হইতে একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন। তদনুসারে পাণিনি 'বর্ষ' নামক ব্রাহ্মণের শিষ্য। এই গ্রন্থেই লিখিত আছে যে চন্দ্রগুপ্তের পূর্ববর্তী রাজা নন্দের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে বর্ষ[২২] বাস করিতেন। গ্রীকগ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায় যে

আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত ভারতবাসীদিগকে গ্রীকশাসন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন ও ৩১৫ পূর্বগ্রীস্টাব্দে সিংহাসনাধিরোহণ করেন। এই কথাগুলি শিরোধার্য করিয়া লইবার পূর্বে আমাদিগকে একটু বিচার করিতে হইবে। সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন কাত্যায়ন পাণিনির বহুপরে জীবিত ছিলেন। অথচ কথাসরিৎসাগরে পাণিনি ও কাত্যায়ন উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রবিষয়ক একটি বিবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকে আবার স্বয়ং সোমদেব ভট্ট গ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে অনন্ত পত্নী সূর্যবতীর[23] চিত্ত বিনোদনার্থ কথাসরিৎসাগর প্রচার করেন। অধ্যাপক বোট্‌লিঙ্ক যে সময়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সহিত পাণিনির পূর্ববর্তীদিগের তুলনায় যে কোন অনৈক্য নাই তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি সবিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। সে অদ্ভুত যুক্তির পুনরুক্তি অনাবশ্যক। তিনি প্রায় ৩৫০ পূর্বগ্রীস্টাব্দকে পাণিনির সময় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। বোট্‌লিঙ্ক-প্রদত্ত এই সময়টি অভ্রান্ত বিবেচনা করিয়া তৎপরবর্তী অনেক পণ্ডিতই তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য আরও কিঞ্চিৎদূর অগ্রসর হইয়াছেন। অধ্যাপক রোটের (Roth) নাম দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাইতে পারে। তিনি বলেন যে ৩৫০ পূর্বগ্রীস্টাব্দকে পাণিনির কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হউক।[৩৪]

লাস্‌সেন[24] (Lassen) বোট্‌লিঙ্কের মতের পুনরুক্তি করিয়াই পাণিনির কাল-নির্ণয় করিয়াছেন।[৩৫]

১৮৪৯ গ্রীস্টাব্দে রেনোর[25] (Renaud) "Memoirs on India after Arab, Persian and Chinese Writers" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি চৈনিক পরিব্রাজক অন্-য়ুয়ন্ চোয়াঙের[26] (য়ুয়ন্-চয়ঙ) (৬২৯-৬৪৫) গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে উক্ত চীন-পরিব্রাজক পাণিনির দুটি অস্তিত্ব স্থির করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রথম পাণিনি এরূপ সময়ে জীবিত ছিলেন যে সময় মানব-পরমায়ু বর্তমান কাল হইতে দীর্ঘতর কাল-স্থায়ী। দ্বিতীয় পাণিনি বুদ্ধের প্রায় ৫০০ বৎসর পরে জীবিত ছিলেন অর্থাৎ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সময়—কনিষ্কের ১০০ বৎসর পরে জীবিত ছিলেন। পূর্বোক্ত এই উক্তির বলে এবং পাণিনি যে যবনানী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার অর্থ 'গ্রীকলিপি' এইরূপ ধারণার

বশবর্তী হইয়া অল্‌ব্রেখ্‌ট্‌ বেবের্‌ বোট্‌লিঙ্কের মত স্বীকার করেন নাই। ইহার জন্য তিনি কতকগুলি যুক্তিরও অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন, পাণিনি যে শুধু বুদ্ধের পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি আলেক্‌জাণ্ডারের ভারতাক্রমণেরও পরে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি ইহা নাকি পাণিনিসূত্রে পাইয়াছেন। বেবের বলিয়াছেন য়ুয়ন্‌-চয়ঙের মতে পাণিনি বুদ্ধদেবের ৫০০ বৎসর পরে এবং কাত্যায়ন বুদ্ধের ৩০০ বৎসর পরে জীবিত ছিলেন। বেবের এই মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, কাত্যায়ন কাত্য-বংশীয় কোন ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব—ভাষ্যকার না হইলেও হইতে পারে। হিন্দুদিগের চতুর্থ আশ্রম যে ভিক্ষু আশ্রম ও তাহাদের পরিধেয় ও যে কাষায়বসন তাহা তিনি সেণ্ট্‌পিটার্সবর্গ সংস্কৃত অভিধান ও ও উইলসনের[27] অভিধানে পাইয়াছেন। তথাপি তিনি বলিয়াছেন যে পাণিনি-সূত্রে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পরিধেয়কে লক্ষ্য করিয়াই ভিক্ষু, ভিক্ষা, কাষায় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগের কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, অধিকন্তু তিনি স্থির করিয়াছেন যে পাণিনি খ্রীস্টীয় ১৪০ অব্দে অর্থাৎ কনিষ্কের ১০০ বৎসর পরে জীবিত ছিলেন[৩৬]। বেবের পাণিনীয় সূত্রে প্রযুক্ত "যবন" ও "যবনানী"শব্দে 'গ্রীকলিপি' বুঝিয়াছেন। 'যবনানী' সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। পতঞ্জলির পূর্ববর্তী পাণিনির বার্ত্তিককার কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি উভয়েই যবনানী অর্থে যবনলিপি বুঝিয়াছেন। যবনী শব্দের অর্থ যবন-স্ত্রী। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, যবন শব্দটি যখন জাতিব্যঞ্জক, তখন যে নিশ্চয়ই পাণিনির পূর্বে ভারতে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। পাণিনি যবনশব্দ এসিয়াটিক বা ইউরোপীয় "গ্রীক" অর্থে কখনই প্রয়োগ করেন নাই। তিনি এ শব্দ আসিরীয় বা পারস্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যবন শব্দটি হীব্রু Yavan শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত। হোমারে[28] ইহা Jaoves বলিয়া-ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণিনি ব্যাকরণের কাশিকাবৃত্তিতে "যবনাঃ শয়ানাঃ ভুঞ্জাতে" এই বাক্যটি প্রাপ্ত হওয়া যায়। "যবনগণ শয়নাবস্থায় আহার করে" এই পদ্ধতি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এক সময়ে যবন শব্দ দ্বারা পারসীকদিগকেই বুঝাইত। আবেস্তায়[29] স্পষ্টই লিখিত আছে যে আবেস্তার সময়ে হিন্দুদিগের সহিত

পারসীকদিগের মিলন হইত। কালিদাস[30] রঘুবংশে পারসীক অর্থে যবন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অমর সিংহ[31]ও পারসীক জাতিকে যবন বলিয়াছেন। গোল্ডস্টুকর 'যবনানী' অর্থে বলিয়াছেন যে পারস্যদেশে প্রচলিত কীলকলিপি বা cuneiform writing ; ইহা কথনই সেমিটিক লিপি নহে। ইহার অন্য প্রমাণ-স্বরূপ মহাভারতের সভাপর্বে নকুলের দিগ্বিজয়-বিষয়ক শ্লোক, গার্গীসংহিতার শ্লোক, লটাচার্য,[32] সিংহাচার্য,[33] উৎপল[34] ও বরাহ-মিহিরের[35] জ্যোতিষ গ্রন্থের শ্লোক প্রভৃতি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। পরে ইহা আরব অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ততঃ সাগরকুক্ষিস্থান্ ম্লেচ্ছান্ পরমদারুণান্।
পহ্লবান্বর্বরাংশ্চৈব কিরাতান্ যবনান্ শকান্॥
ততো রত্নান্যুপদায় বশে কৃত্বা চ পার্থিবান্।
ন্যবর্তত কুরুশ্রেষ্ঠো নকুলশ্চিত্রমার্গবিৎ॥
শিবীংস্ত্রিগর্তানম্বষ্ঠান্ মালবান্ পঞ্চকর্পটান্।
তথা মাধ্যমকেরাংশ্চ রাধোনান্ দ্বিজানথ॥
পুনশ্চ পরিবৃত্যাথ পুষ্করারণ্যবাসিনঃ।
গণানুৎসবসংকেতান্ ব্যজয়ৎ পুরুষর্ষভঃ॥—মহাভারত, সভাপর্ব নকুল-দিগ্বিজয়

ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতং।
ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে॥—গার্গীসংহিতা

রব্যুদয়ে লঙ্কায়াং সিংহাচার্যেণ দিনগণোঽভিহিতঃ।
যবনানাং নিশি দশভির্মুহূর্তৈশ্চ তদগ্রহণাৎ॥—সিংহাচার্য

উদয়ো যো লঙ্কায়াং সোঽস্তময়ঃ সবিতুরেব সিদ্ধপুরে।
মধ্যাহ্নো যমকোট্যাং রোমকবিষয়ে অর্ধরাত্রঃ স্যাৎ॥—বরাহমিহির

ততঃ সাকেতমাক্রম্য পাঞ্চালান্ মথুরাংস্তথা।
যবনা দুষ্টবিক্রান্তা প্রাপ্যন্তি কুসুমধ্বজং॥
ততঃ পুষ্পপুরে প্রাপ্তে—গার্গীসংহিতা

সাকেতং স্যাদযোধ্যায়াং কোশলানন্দিনী চসা।
মধ্যদেশে ন স্থাস্যন্তি যবনা যুদ্ধদুর্মদাঃ।

তেষামন্যোন্য সংভেদা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥
আত্মচক্রোত্থিতং ঘোরং যুদ্ধং পরম্ দারুণং ।—যাদবকোষ
ভদ্রারিমেদমাণ্ডব্যমাম্বনীপোজ্জীহানসংখ্যাতাঃ।
মরুবদ্‌ঘোষ যামুন সারস্বতমৎস্যমাধ্যমিকাঃ ॥—বৃহৎসংহিতা

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে স্ট্যানিস্‌লেয়স্ জুলিয়েন[36] (Stanislaus Julien) সম্পাদিত যুয়ন্ চয়ঙের ফরাসী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। জুলিয়েন যে কেবল রেনোর মত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন তাহা নয়, এই চীন পরিব্রাজকপ্রদত্ত আরও কয়েকটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জুলিয়েনের মতে কনিষ্কের রাজত্বকালে পাণিনির গ্রন্থ প্রভূত খ্যাতিলাভ করিয়াছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন তাঁহার জন্মভূমিতে তদীয় স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। অবশ্য পাণিনি কনিষ্কের কত পূর্বে বর্তমান ছিলেন তাহা জুলিয়েনের লেখনী হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় না। এই সমস্ত বিবরণ দেখিয়াই বোধ হয় ম্যাক্সমুলর মহোদয় তাঁহার ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকায় (১৮৫৭) বেবের প্রদত্ত পাণিনির কাল বর্জনপূর্বক পুনরায় বোট্‌লিঙ্ক-স্বীকৃত পাণিনিকালই যথার্থ বলিয়া লিখিয়া থাকিবেন। ম্যাক্সমুলর পাণিনির কালনিরূপণ সম্পর্কে খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর কাশ্মীরের সোমদেব ভট্টের কথাসরিৎসাগর হইতে একটি গল্প উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মর্ম এই—"পুষ্পদন্ত নামক মহাদেবের এক অনুচর গৌরীর শাপে বৎসদেশের রাজধানী কৌশাম্বী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার নাম হইল—কাত্যায়ন-বররুচি। জন্মের কিছু পরেই আকাশবাণী হইল যে এই শিশু শ্রুতিধর হইবে এবং বর্ষ পণ্ডিতের নিকট সর্ববিদ্যা শিক্ষা করিবে। ইহার নাম বররুচি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠবিষয়ে রুচি হইবে। বাল্য হইতেই তিনি অসীম বুদ্ধিমান ছিলেন ও তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসীম ছিল। একদিন তিনি এক নাটকের অভিনয় দেখিয়া মাতার নিকট আদ্যন্ত আবৃত্তি করিয়াছিলেন। উপনয়নের পূর্বে ব্যাড়ির[37] মুখে প্রাতিশাখ্য শুনিয়া সমস্তই কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। পরে তিনি বর্ষমুনির শিষ্য হন ও পাণিনিকে পরাভূত করেন। শেষে পাণিনি মহাদেবের আশীর্বাদে পুনরায় জয়লাভ করেন। কাত্যায়ন মহাদেবের ক্রোধনিবৃত্তির জন্য পাণিনির শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া

সমগ্র পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, ও পরে তাহা সংশোধন ও সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। শেষে তিনি মগধরাজ নন্দের মন্ত্রী হন। এই গল্পানুসারে ম্যাক্সমূলর পাণিনিকে নন্দের সময়ে অর্থাৎ খ্রী-পূ. ৪র্থ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কাজেই এই উপাখ্যান-মাত্রে কথা-সরিৎসাগর হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে কাত্যায়ন-বররুচি ও পাণিনি খ্রী-পূ. চতুর্থ শতাব্দীর লোক। কিন্তু ম্যাক্সমূলর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে "ষড়্‌দর্শনের ইতিবৃত্ত" নামক গ্রন্থে খ্রী-পূ. ৬ষ্ঠ শতাব্দী পাণিনির কাল বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তিনি বড় বেশী কিছু যুক্তি দেখান নাই। বেস্টের্গার্ডও[৩৪] (Westergaard) বোট্‌লিঙ্ক নিরূপিত কালের কাছাকাছি সময়ে পাণিনির বিদ্যমানতা স্থির করিয়াছেন। তবে তিনি বিভিন্ন রূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহার মতে, অশোকের রাজত্বকালে সাধারণ লোকে যে ভাষায় কথা কহিতেন, তাহা অশোকের উৎকীর্ণ শিলা-লিপির ভাষা। উক্ত ভাষা-সম্বন্ধে বিচারকালে এই ডেনিস পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে ভাষার পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিলে বলিতে হইবে যে পাণিনি নিশ্চয়ই অশোকের বহুপূর্বে অন্তত ২৫০ পূ-খ্রী. বর্তমান ছিলেন। আবার বেবের প্রদর্শিত-যুক্তি অনুসারে বলিতে হয় যে পাণিনি প্রাচীন ও অর্বাচীন ব্রাহ্মণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করিয়াছেন।[৩৭] ইহা হইতে বেস্টের্গার্ড[৩৮] এইরূপ টিপ্পনী করিয়াছেন যে পাণিনি[৩৯] প্রাচীন ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং অর্বাচীন ব্রাহ্মণের উল্লেখের নিমিত্ত যাজ্ঞবল্ক্যোদ্ধৃত উদাহরণনিচয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাত্যায়ন এই স্থলে বলিয়াছেন—"তুল্যকালত্বাৎ"। ইহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যে পাণিনি ও যাজ্ঞবল্ক্য সমসাময়িক, অথবা পাণিনি যাজ্ঞবল্ক্যের কিঞ্চিৎ পরবর্তী। এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্য বুদ্ধদেবের জন্মভূমি বিদেহরাজ জনকের সভায় থাকিতেন। কিন্তু, যাজ্ঞবল্ক্য, বুদ্ধ বা তাঁহার উপদেশের নামগন্ধও তাঁহার গ্রন্থের কোথাও করেন নাই। অথবা বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে যাজ্ঞবল্ক্য বা জনক—উভয়ের কাহারও নাম নাই। সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে যাজ্ঞবল্ক্য বুদ্ধদেবের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন—পরন্তু তিনি নব-ব্রাহ্মণ-প্রণেতা বলিয়া প্রোথিত থাকায় তাঁহার বুদ্ধের অল্পকাল পূর্বেই জীবিত থাকা যুক্তিসঙ্গত।

কাজেই প্রমাণ হইতেছে পাণিনি বুদ্ধদেবের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু, বেস্টের্গার্ড বুদ্ধদেবের নির্বাণ কাল ৩৭০ পূ-খ্রী. স্থির করায় বোধ হইতেছে যে পাণিনি অবশ্যই প্রায় ৪০০ পূ-খ্রীস্টাব্দে জীবিত ছিলেন। পাণিনির সময় নিরূপণের ইহাই প্রকৃত-প্রস্তাবে তৃতীয় চেষ্টা। যদিও গোল্ডস্টুকরের পাণিনি-সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্যে পাণিনির আসন বিষয়েই প্রধানত আলোচিত হইয়াছে, তথাপি পাণিনি ও বুদ্ধদেব সম্বন্ধে পৌর্বাপর্য বিষয়ে পাণিনির কাল একেবারেই স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন।[৪০] "নির্বাণো বাতে"[৪১] এই সূত্র হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বৌদ্ধমত প্রবর্তিত হইবার বহু পূর্বে সম্ভবত খ্রী-পূ. সপ্তম শতাব্দীতে পাণিনি জীবিত ছিলেন[৪২]। এই স্থির করিবার কারণ এই যে লাস্‌সেনের মতানুসারে তিনি ৫৪৩ পূ-খ্রী.কে বুদ্ধদেবের নির্বাণ কাল স্থির করেন।

আচার্য গোল্ডস্টুকর (১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে) "পাণিনি" নামক যে অপূর্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা তাঁহার কীর্তিস্তম্ভ ও সাহিত্যের উজ্জ্বল-রত্ন। কিন্তু, তিনি কেবলমাত্র কতকগুলি বৈয়াকরণিক সূত্র-সাহায্যে পাণিনির কাল, দেশ, তৎকালীন গ্রন্থসমূহের অস্তিত্ব স্থির করিয়াছেন তাহা আমরা কখনই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি না। আচার্য গোল্ডস্টুকর কয়েকটি যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বাজসনেয়ি-সংহিতা, তৈত্তিরীয়-সংহিতা, শতপথব্রাহ্মণ, উপনিষদ্‌সকল, অথর্ববেদ প্রভৃতি পাণিনির সময়ে পরিজ্ঞাত ছিল না। পাণিনির একমাত্র অপরাধ তিনি সূত্রে ও গণে এই শব্দ বা শব্দাংশগুলি ব্যবহার করিলেও ইহাদের তিনি ব্যাখ্যা দেন নাই। গোল্ডস্টুকর বলেন যে পাণিনি-সূত্র-মধ্যে অথর্ববেদের উল্লেখ নাই। সুতরাং তিনি একেবারেই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন যে পাণিনি অথর্ববেদ জানিতেন না। অথর্ববেদ পাণিনির পরে রচিত হইয়াছে। ইহা নিতান্ত ভুল। পাণিনি-সূত্রে আমরা "আথর্বনিকস্যেকলোপশ্চ" (৪.৩), "কপিবোধাদাঙ্গিরসে" "দাণ্ডিনায়নাহাস্তিনায়নাথর্বণিক" (৬.৪)—এই সমস্ত সূত্রে "অথর্ব ও আঙ্গিরস" শব্দ দেখিতে পাই। পাণিনি ছাড়িয়া দিয়া ঋগ্বেদেও অথর্বশব্দের উল্লেখ দেখা যায়। গোল্ডস্টুকর বলিয়াছেন

পাণিনি অথর্ব শব্দে অথর্ববেদ বা আঙ্গিরস্ শব্দে অথর্বাঙ্গিরস বুঝাইবে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। আমরা বলি, পাণিনি কোথাও ঋক্, যজু, সাম শব্দে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ বুঝাইবে তাহাও তো স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, তবে এই তিন বেদ পাণিনি বিদিত ছিলেন তাহা তিনি কিরূপে স্বীকার করিতেছেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত, মীমাংসা, উপনিষদ্, আরণ্যক, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পাণিনির পরে রচিত বলিয়া গোল্ডস্টুকর নিতান্তই ভ্রমের পরিচয় দিয়াছেন। পাণিনির সূত্রপাঠে জানা যায় যে তিনি ব্যাস ও তাঁহার নিম্নতন পাঁচজন শিষ্য-প্রশিষ্যকে জানিতেন, যুধিষ্ঠিরাদির নামও তাঁহার অবিদিত ছিল না। ব্যাসাদি ন্যায়, সাংখ্য, আরণ্যক ইত্যাদি অবগত ছিলেন, সকল দেশের গ্রন্থেই তাহার উল্লেখ আছে, অথচ পাণিনির তাহা অবিদিত ছিল, ইহা কিরূপ কথা! "নির্বাণোঽবাতে" এই সূত্রটি পাণিনি-ব্যাকরণে পাওয়া যায়। গোল্ডস্টুকর কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন, অভিধান, মহাকোষ বা ইতিহাস প্রণয়ন করেন নাই? নির্বাণ-শব্দের "মোক্ষ" অর্থ বুদ্ধের শিষ্যগণ স্বীকার করিবেন, ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া বৈয়াকরণ তাহা স্বীকার করিবেন কেন? নির্বাণের ব্যাখ্যা নাই বলিয়া তিনি বুদ্ধদেবের পূর্বে এরূপ বলা নিতান্তই অসঙ্গত। আর একটি কথা। যদি গোল্ডস্টুকরের মতে পাণিনি উপনিষদ্, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক যুগের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি লৌকিক ভাষার ব্যাকরণ লিখিতে গেলেন কেন? তাহা হইলে কি সে সময় লৌকিক ভাষার গ্রন্থাদি বিদ্যমান ছিল? এদিকে আবার পাণিনির সূত্রোল্লিখিত শৌনকাদি শাব্দিক ও আচার্যদিগকে প্রক্ষিপ্ত না বলিলে তাঁহারা যে পাণিনির পূর্বে আসিয়া পড়েন। এই পাশ্চাত্ত্যাচার্য বলেন যে ঋকপ্রাতিশাখ্য পাণিনির পরে রচিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যের বর্ণনীয় বিষয়গুলি পাণিনীয় সূত্রাপেক্ষা বিস্তৃতি ও সম্পূর্ণতালাভ করিয়াছে, ইহাই গোল্ডস্টুকরের মত। ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্য ঋগ্বেদের শাকল শাখার সহিত সম্পর্কিত। পাণিনি-ব্যাকরণ বেদের শাখাবিশেষ বা কেবলমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যের জন্য লিখিত হয় নাই। সর্বাঙ্গসৌষ্ঠব-সম্পন্ন লৌকিক সংস্কৃতের ব্যাকরণ রচনা করাই

তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই বৈদিক ব্যাকরণ তিনি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। এই কারণে ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যকে কখনই পাণিনির পরবর্তী বলা যাইতে পারে না। বিশেষত উভয় গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের সাদৃশ্য বড়ই অল্প। পাণিনিতে একটি সূত্র আছে, "অরণ্যান্মনুষ্যে" অর্থাৎ মনুষ্য অভিধেয়ে "আরণ্যকঃ" পদ-নিষ্পন্ন হইবে। যথা—"আরণ্যকো মনুষ্যাঃ"—অরণ্যবাসী মনুষ্য। ইহা হইতেই গোল্ড্‌স্টুকর স্থির করিলেন যে পাণিনির সময়ে বা তৎপূর্বে আরণ্যক নামক বেদাংশ ছিল না। কিন্তু মনু প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিদের সময়ে ছিল, অথচ পাণিনির সময়ে আরণ্যকের অস্তিত্ব অসম্ভব। আশ্চর্য যুক্তি।

"On the Question of Panini's Date" নামক প্রবন্ধে[৪৩] Albrecht Weber দেখাইয়াছেন যে Goldstucker "নির্বাণোঽবাতে" এই সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা ভুল। আর এই সূত্রের প্রকৃত অর্থ যাহা তদ্দ্বারা পাণিনি যে বুদ্ধদেবের পূর্বে জীবিত ছিলেন কি না তাহা স্থিরীকৃত হয় না। বরং Weber পাণিনির গ্রন্থ হইতে এমন কয়টি শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহা হইতে বিপরীত অর্থই প্রমাণিত হয়[৪৪]। Goldstucker বা Weber উভয়েরই যুক্তি তাদৃশ সন্তোষজনক নয়। Lassen (Indische Alterthum Skunde—1867) Weberএরই বিবরণের পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র। পার্থক্যের মধ্যে এইটুকু দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার অনুমিতকাল ৩৫০ না হইয়া ৩৬০ পূ-খ্রী.। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে Benfey এক অদ্ভুত মতের প্রস্তাবনা তাঁহার ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে প্রকাশ করিলেন। তিনি নন্দের রাজত্বকালে বর্তমান পাণিনির গুরু বর্ষ বিষয়ে সোমদত্তের যাহা উক্তি তাহার সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই, তাঁহারই রাজত্বকালে পাণিনির লেখা বর্তমান ছিল বোট্‌লিঙ্কের এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া—এবং তাঁহার গ্রন্থমধ্যে—'যবনানী' শব্দটি উদাহরণস্বরূপ দেখাইবার জন্য তিনি বলিয়াছেন যে পাণিনি প্রায় ৩২০ পূ-খ্রীস্টাব্দে তাঁহার ব্যাকরণ শেষ করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার Greek লিপি অনায়াসে ও কাহারও সাহায্য-ব্যতীত শিখিবার ৬ বর্ষ সময় ছিল। এরূপভাবে কোন গ্রন্থকারের সময় নিরূপণ নিতান্তই হাস্যরসাত্মক। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে[৪৫]

Bhandarkar[৩৫], Indian Antiquaryতে উল্লেখ করিয়াছেন যে চতুর্থ ধর্মাশোক যিনি ৬৩০-৬৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন তাঁহার একটি তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে তিনি শালাতুরীয়া বা পাণিনির গ্রন্থে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। Burnell[৪৬] পাণিনিকে ২৫০ পূর্ব-খ্রীস্টাব্দে ফেলিয়াছেন। ইঁহার প্রধান যুক্তি এই যে পাণিনির কাল সম্বন্ধে অন্যান্য মতে যাথার্থ্য বড়ই কম। কাজেই তিনি নিজে একটা সময় খাড়া করিয়া তাহার সামঞ্জস্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। বর্নেলের স্বীয় উক্তি এই—"The result as now accepted, is that he lived in the 4th century B. C. I, cannot see there is any reason why he should not be placed nearly a century later, which would remove some difficulties that the earlier date presents."

ইহার পর ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে অধ্যাপক পিশেল[40] (Prof. Pischell) পাণিনির সময় সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করেন। গোল্ডস্টুকর পাণিনির যে সময় স্থির করিয়াছেন তাহার সহিত পিশেল প্রদত্ত সময়ের ১০০ বৎসর ব্যবধান। বৈয়াকরণ পাণিনির ন্যায় একজন কবি পাণিনির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। তবে ভারতীয় প্রবাদানুসারে এতদুভয়ের কোন পার্থক্য নাই। ১৫ বৎসর পূর্বে কবি পাণিনির অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল।[৪৭] ঔফ্রেক্‌ট[41] ও পিটারসনের[42] যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে বৈয়াকরণ ও কবি পাণিনি একই ব্যক্তি। পিশেল কবি-পাণিনি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা সংগ্রহ করিয়াছেন।[৪৮] তিনি কবি পাণিনির গ্রন্থের ভগ্নাবশিষ্টের যথোচিত আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, যে সময় ভারতে artificial poetryর প্রচলন হয় সেই সময় বৈয়াকরণ ও কবি পাণিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, তিনি বহু কারণে উভয় পাণিনি যে এক ব্যক্তি তাহা প্রতিপাদনেরও যথেষ্ট কারণ দেখাইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে পাণিনি খ্রীস্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্বে ও ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে কখনই বর্তমান ছিলেন না। সুখের বিষয়, এখন তিনি আর সে মতের পক্ষপাতী নহেন। অধ্যাপক পিশেলের ধারণার বিপক্ষে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে "Detailed Report" নামক প্রবন্ধে, এবং ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ক্ষেমেন্দ্রের[43] ঔচিত্যালঙ্কার

বিষয়ক প্রবন্ধে, পিটারসন সাহেব বহুতর যুক্তিদ্বারা তাঁহার মত খণ্ডন করেন।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে সিলভেন লেভি[44] (Sylvain Levi) দেখাইয়াছেন যে আম্ভি, সৌভূতা ও ভগতা এই তিনটি নাম গণপাঠে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, এই নামত্রয় গ্রীক Omphis, Sophytes ও Phegelas এই তিনটি শব্দ হইতে অভিন্ন এবং পাণিনিও সম্ভবত, তাঁহার পূর্ববর্তীদিগের নিকট হইতে লইয়া থাকিবেন। এই কয়টি শব্দ আমরা বর্তমান গণপাঠে দেখিতে পাই বটে, কিন্তু, পাণিনির সময়ে গণপাঠে ইহাদের অস্তিত্ব না থাকিলেও না থাকিতে পারে, পরে প্রক্ষিপ্ত হওয়াও কি সম্ভব নয় ?

ড. লিবিখের[45] (Liebich) মতে পাণিনি সম্ভবত খ্রী-পূ. ৩০০ অব্দে জীবিত ছিলেন। গৃহ্যসূত্র যে সময়ে রচিত হয়, পাণিনি প্রায় সেই সময়ের লোক। ইনি ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ যে পাণিনির পূর্ববর্তী তাহা স্বীকার করেন। ইঁহার মতে ভগবদ্গীতা পাণিনির পরে বিরচিত হইয়াছে।[৪৯]

আমরা দেখিলাম যে গোল্ডস্টুকরের মতে পাণিনি ৬০০ খ্রীস্টাব্দে জীবিত ছিলেন। অধ্যাপক বেন্‌ফী পাণিনিকে ৩২০ পূ-খ্রীস্টাব্দের ব্যক্তি বলেন। ওক্রেক্‌টের মতে পাণিনি খ্রী-পূ. চতুর্থ শতাব্দীর বৈয়াকরণ। লাস্‌সেনের মতে পাণিনি ৩২০ খ্রী-পূ. জীবিত ছিলেন। অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে তিনি খ্রী-পূ. ৪র্থ শতাব্দীর ব্যক্তি। এক্ষণে আমরা অন্যান্য মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

চীন পরিব্রাজকদিগের মধ্যে যুয়ন্-চয়ঙ্‌কেই পাণিনির বিবরণ লিখিতে দেখা যায়। ইত্‌সিঙ্[46] কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন যে, তিনি দুই বৎসর পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যুয়ন্-চয়ঙ্ শালাতুর নগরে গমন করিয়াছিলেন। ইনি পাণিনি-সংক্রান্ত একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তদুক্ত বিবরণের প্রথমাংশটি নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। তবে শেষাংশের মধ্যে কিছু সত্য নিহিত থাকিলে থাকিতে পারে। 'সি-য়ু-চি'তে[47] তিনি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার মর্ম এই— মনুষ্যের আয়ু যখন ১০০ বৎসর ছিল পণ্ডিতবর পাণিনি তখন আবির্ভূত

হন। জন্মলাভ করিয়াই ইনি সকল বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। কালে তিনি বর্ণমালা ভুলিতে লাগিলেন। এই সময় ঋষি পাণিনি শব্দবিদ্যালাভে অভিলাষী হইয়া সমাধিস্থ হইলে ঈশ্বর (মহেশ্বর) দেব তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং তাঁহার প্রার্থনার অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। অবশেষে ঋষি পাণিনি বহুসংখ্যক শব্দ সংগ্রহ করিয়া একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন। ইহার নাম স্বেঙ্-মিঙ্-লুন অর্থাৎ শব্দতত্ত্বমূলক ব্যাকরণ। ইহা তিনি দেশের মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজা তাহা সানন্দে গ্রহণ করিলেন এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে কেহ এই সমগ্র গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিতে পারিবে সে সহস্র সুবর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইবে। অতঃপর চীন পর্যটক পাণিনির পূর্বজন্ম বর্ণনা করিয়া বৌদ্ধধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটি তিনি শালাতুরে শ্রবণ করেন। 'পো-লো-তু-লো' অর্থাৎ শালাতুর নগরে একটি স্তূপ আছে। এই স্থানে এক অর্হৎ কোন পাণিনি মতাবলম্বীকে দীক্ষিত করেন। তথাগত দেহত্যাগ করিলে ৫০০ বর্ষ পরে এক মহা অর্হৎ কাশ্মীরবাসীদিগকে দীক্ষিত করিয়া এই স্থানে আগমন করেন। আসিয়া দেখিলেন এক ব্রহ্মচারী একটি বালককে প্রহার করিতেছে। অর্হৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ইহাকে প্রহার করিতেছ কেন ?' ব্রাহ্মণ বলিলেন,– আমি ইহাকে এত করিয়া শিখাইতেছি, কিন্তু এই বালক কিছুতেই পারিতেছে না। অর্হৎ তখন বলিলেন—তুমি শব্দবিদ্যাপ্রণেতা পাণিনির নাম শুনিয়াছ ? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"তিনি এই দেশবাসী, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করে। তাঁহার মূর্তি এখানে বর্তমান।" ইহা শুনিয়া অর্হৎ বলিলেন—"এই বালকই সেই ঋষি। লৌকিক শব্দবিদ্যা-প্রকাশের জন্য বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছে সেইজন্য ইহাকে পুনঃপুনঃ জন্ম লইতে হইয়াছে। অতঃপর, অর্হৎ বালককে দীক্ষিত করিলেন। ব্রাহ্মণও মুগ্ধ হইয়া দীক্ষিত হইলেন।"

এই আখ্যায়িকার মধ্যে যদি কিছু সারবত্তা থাকে—তবে তাহা পাণিনির নিবাস স্থান শালাতুর। পাণিনির সহিত শালাতুর যে সম্বন্ধযুক্ত তাহা এই আখ্যায়িকা হইতে বুঝা যায়। য়ুয়ন্-চয়ঙ্, বুদ্ধনির্বাণের ৫০০ বৎসর পরে কনিষ্কের কাল উল্লেখ করিয়াছেন। চীনদিগের সাধারণ্যে প্রচলিত

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের মতে বুদ্ধের মৃত্যু খ্রী-পূ. ৯ম শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল। এই পরিব্রাজকের জীবনচরিতে চীন 'হেওলি' ও 'য়েন-চঙ্' বলেন যে য়ুয়ন্-চয়ঙ্ খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে আসিয়া পাণিনি ব্যাকরণের মূল-সূত্র ও তাহার সংশোধিত সূত্র দর্শন করিয়াছিলেন। বর্নেলও এই কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্য হইলে সায়ণাচার্য, ভট্টভাস্করাদির গ্রন্থে এই পরিবর্তসূত্রের উল্লেখ থাকিত।

তিব্বতীয় মত

তিব্বতীয় লামা তারনাথ[48] তাঁহার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে[৫০] পাণিনি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে তিনি নন্দের অধীনে বাস করিতেন। এই ইতিহাসের একস্থলে শেষনাগের পাণিনি ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটি কৌতূহলোদ্দীপক গল্প আছে। উক্ত গল্পটি দক্ষিণ ভারতেও খুব প্রচলিত। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে তারনাথের মতে পাণিনি শেষনন্দের সময়ে জীবিত থাকিলে খ্রী-পূ. ৫০০ অব্দে বর্তমান ছিলেন। আর দ্বিতীয় তৃতীয় নন্দ আরও কিছু পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন বলিতে হয়।

বঙ্গীয় মত

তর্কবাচস্পতি তারানাথ[49] তাঁহার "পাণিনীয়াগমকালাদি" শীর্ষক প্রস্তাবে বলিয়াছেন যে ব্যাড়ি, পাণিনি ও কাত্যায়ন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন। ইনি খ্রী-পূ. ৫০০ অব্দকে পাণিনির কাল বিবেচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত[50] মহাশয় তাঁহার "প্রাচীন ভারতে সভ্যতা" নামক গ্রন্থে[51] গোল্ডস্টুকরের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন যে গোল্ডস্টুকর পাণিনিকে যে বুদ্ধের পূর্ববর্তী বলিয়াছেন তাহা অতি সমীচীন। ড. রামদাস সেন[51] মহাশয়ের মতে[৫২] পাণিনি ৩৫০ খ্রী-পূর্বের ব্যক্তি। সুপণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্তের[52] মতে[৫৩] পাণিনি খ্রী-পূ. ৮০০ ও ৭০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে বর্তমান ছিলেন। কেবল একমাত্র ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র[53] পাণিনিকে খ্রী-পূ. দশম শতাব্দীর বৈয়াকরণ বলিয়াছেন।[৫৪]

সংস্কৃত সাহিত্যে পাণিনির কাল-নির্ণয়

কহ্লণ[54] পণ্ডিত তাঁহার রাজতরঙ্গিনীর ৪র্থ অধ্যায়ের ৬৩৫ ও ৬৩৭ শ্লোকে পাণিনির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কহ্লণ পণ্ডিত খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি। সুতরাং ৭০০ বৎসর পূর্বে পাণিনির বিদ্যমানতার পরিচয় পাওয়া গেল।

জৈনাচার্য হেমচন্দ্র সূরির[55] অভিধানচিন্তামণির মর্ত্যকাণ্ডে পাণিনির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।—

যাজ্ঞবল্ক্যব্রহ্মরাত্রির্যোগেশোহপ্যথ পাণিনৌ।

শালাতুরীয়দাক্ষেয়ৌ, গোনর্দীয়ে পতঞ্জলিঃ॥—৩ ৫.১৫

শালাতুরীয় ও দাক্ষেয়[56] শব্দে পাণিনি নামক মুনিকেই বুঝায়। হেমচন্দ্র অন্তত ৭৫০ বৎসর পূর্বের লোক। সুতরাং এই প্রমাণে স্থির হইল পাণিনি অন্তত ৭৫০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। ইঁহার পূর্বে শঙ্করাচার্য খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পাণিনির নামোল্লেখ করিয়াছেন।

অতএব প্রমাণিত হইল, শঙ্করাচার্যের পূর্বে পাণিনি বিদ্যমান ছিলেন। এক্ষণে শঙ্করাচার্য কোন্ সময়ের তৎসম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ আছে। শঙ্করাচার্য যে সময়েরই লোক হউক না কেন ইহা স্থির যে তিনি খ্রীস্টীয় ৮ম শতাব্দীর পরে কখনই জীবিত ছিলেন না। অতএব, অন্তত ১০০০ বর্ষ পূর্বে পাণিনি জীবিত ছিলেন তাহা দেখা গেল। জৈমিনিভাষ্যকার দীপ্ত স্বামীর পুত্র শবরস্বামী[57] কুমারিল শঙ্করের বহু পূর্বে জীবিত ছিলেন। ইনি অন্তত ন্যূনকল্পে ১২।১৩ শত বর্ষ পূর্বের লোক। এই জন্য পাণিনি ঐ পরিমিত কালের পূর্ববর্তী তাহা স্থিরীকৃত হইল। ইঁহার পূর্বে অমরসিংহ পাণিনির মতানুবর্তী। ইনি খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। মগধরাজ শেষনন্দ[58] ও চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক পক্ষিল স্বামীকে[59] (চাণক্যকে) "অস্তেভূঃ" "ব্রুবো বচিঃ" ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্র উল্লেখ করিতে দেখা যায়। ইহার দ্বারা নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পাণিনি অন্তত ২৩ শত বৎসরের পূর্ববর্তী। যেহেতু, চাণক্য ঐ সময়ের লোক। সুতরাং পাণিনি শেষনন্দেরও পূর্ববর্তী। পাণিনি চাণক্য পণ্ডিতেরও পূর্ববর্তী।

ইহাদ্বারা সহজেই প্রমাণিত হইল যে—পাণিনি খ্রী-পূ. ৪০০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে এমন কয়েকটি সূত্র পাওয়া যায় যাহা দ্বারা পাণিনিকে বহু পূর্বের বৈয়াকরণ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। পাণিনি "গবিযুধিভ্যাম্ স্থিরঃ" (৮. ৩. ৯৫), "বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্" (৪ ৩. ৯৮) প্রভৃতি সূত্রে যুধিষ্ঠির, বাসুদেব, অর্জুনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি "মহান্ ব্রীহ্যপরাহ্ণগৃষ্টীষ্বাস জাবালভারভারতহৈলিহিলরৌরবপ্রবৃদ্ধেষু" (৬. ২. ৩৮) এই সূত্রে মহাভারতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি "এজেঃ খশ্" (৩. ২. ২৮) এই সূত্র রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি জনমেজয়ের নাম উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন তাঁহার জনমেজয়ের নাম জানা ছিল না। তিনি "পারাশর্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ" (৪. ৩. ১১০) প্রভৃতি সূত্রে পারাশর্য ব্যাসের নাম করিয়াও তাঁহার পুত্র বৈয়াসকি শুকদেবের নামোল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে পাণিনি ব্যাস ও যুধিষ্ঠিরের পরবর্তী শুকদেবের সমসাময়িক এবং পরীক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয়ের পূর্ববর্তী। আমরা পূর্বোক্ত বিভিন্ন মত ও বিবিধ যুক্তি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

পাণিনির কাল-নির্ণয় করিবার পক্ষে কোন অব্দের নির্দেশ করা যায় না। তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে পাণিনি নিশ্চয়ই খ্রীস্ট জন্মের পরে বর্তমান ছিলেন না এবং তিনি সম্ভবত বুদ্ধদেবের জন্মের দু-এক শতাব্দী পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। তাহার একটি কারণ এই যে পাণিনিগ্রন্থে বৌদ্ধ-মত ও ধর্মাদিবিষয়ক কোন শব্দই পাওয়া যায় নাই। বিশেষত কথিত সংস্কৃত যেরূপে গাথার ভাষায় পরিণত হইয়াছে তাহায় আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পাণিনীয় সংস্কৃতের তুলনা করিলে সহজেই নির্দেশ করিতে পারা যায় যে পাণিনি নিশ্চয়ই বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী। জর্মন পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক গোল্ডস্টুকর ও ড. লিবিথ্ পাণিনি ও কাত্যায়নের সময়ের ভাষার পার্থক্য বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই—

(১) পাণিনির সময়ে যে সকল বৈয়াকরণিক নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা ক্যাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত ও অশুদ্ধ হইয়াছিল (Goldstucker's Panini, p. 123.)। (২) পাণিনির সময়ে ব্যবহৃত অনেক শব্দের অর্থ কাত্যায়নের সময়ে প্রচলিত ছিল না (ঐ, পৃ. ১২৫)। (৩) পাণিনির সময়ে যে শব্দের যে অর্থ প্রচলিত ছিল, কাত্যায়নের সময়ে তাহার অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছিল (ঐ, পৃ. ১২৮)। (৪) কাত্যায়নের সময়ে যে শব্দ-শাস্ত্র পঠিত হইত তাহা পাণিনির সময়ে অপরিজ্ঞাত ছিল।

পাণিনি যে সময়ের লোক তিনি সেই সময়ের পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত ভাষাই ব্যবহৃত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্য কাত্যায়নের সময়ে দুর্বোধ্য হওয়ায় কাত্যায়ন তৎকাল প্রচলিত ভাষারই উপযোগী করিয়া বার্ত্তিক প্রণয়ন করেন। ভাষার এইরূপ পরিবর্তন সাধিত হইতে বহুকাল লাগিয়াছিল তাহা নিশ্চিত। পাণিনি যে কাত্যায়নের বহুপূর্ববর্তী তাহা অন্য যুক্তি ছাড়িয়া দিয়া উভয়ের ভাষালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। কাত্যায়নের বার্ত্তিক আলোচনা করিয়া ইহাই অনুমান হয় যে, যখন বহু প্রকার উপভাষা ও বিজাতীয় ভাষা সংস্কৃত ভাষাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল সেই সময়েই কাত্যায়ন-বার্ত্তিক রচিত হইয়াছিল। এই সময় বৌদ্ধধর্ম প্রচার অতি প্রবল হইতেছিল, পারসীকদিগের সহিত গ্রীকদিগের সংঘর্ষের সূত্রপাত হইয়াছিল। কেহ কেহ এই সময়কে খ্রী-পূ. ৪র্থ শতাব্দী স্থির করিয়াছেন। সুতরাং পাণিনি খ্রী-পূ. চতুর্থ শতাব্দীর বহু পূর্বে বর্তমান ছিলেন, এরূপ কল্পনা করা নিতান্ত অসঙ্গত নয়।

এক্ষণে আমরা পাণিনি কোন্ দেশের লোক তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইব। পাণিনির দুইটি নাম শালাতুরীয় ও দাক্ষেয়। শালাতুর গ্রাম গান্ধার বা কান্দাহার প্রদেশের অন্তর্গত, বর্তমান আটকের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। এই শালাতুর গ্রাম তাঁহার বাসভূমি বা জন্মভূমি নয়। তাহার প্রকৃষ্ট কারণ এই যে পাণিনি "অভিজনশ্চ" (৪. ৯০) সূত্রদ্বারা এই গ্রাম তাঁহার বাসভূমি বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার পূর্ব-পুরুষদিগের জন্মভূমি ও বাসভূমি। "অভিজনশ্চ" সূত্রের পূর্বে তিনি আর একটি সূত্র করিয়াছেন—"তদস্য নিবাসঃ"। এক্ষণে দেখা আবশ্যক অভিজন

ও নিবাস এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? "যত্র সম্প্রত্যুষ্যতে স নিবাসঃ, যত্র পূর্বপুরুষৈরুষিতং সোঽভিজনঃ।" অর্থাৎ যেখানে পূর্বপুরুষদিগের বাস তাহা অভিজন, এবং যেখানে বর্তমান বাস তাহা নিবাস। পাণিনি, "অভিজনশ্চ" সূত্রের পরে "শালাতুরবর্থতীকুচবারাড্ঢক্" এই সূত্রদ্বারা শালাতুর শব্দের উত্তর অভিজনার্থে ঢক্‌প্রত্যয় করিয়া "শালাতুরীয়" নিষ্পন্ন করিবার আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, ইউরোপীয়গণ যে তাঁহাকে শালাতুরবাসী বলিয়া থাকেন, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক। এদিকে বৃহৎ কথায় পাণিনিকে মগধবাসী বলা হইয়াছে; সুতরাং আমরা তাঁহাকে মগধবাসী বলিতে পারি। পাণিনি যে মগধবাসী তাহা "দাক্ষেয়" এই নামদ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে। পতঞ্জলি, ব্যাড়ি-কৃত লক্ষ শ্লোকাত্মক গ্রন্থ "সংগ্রহ" দাক্ষায়ণ কৃত সংগ্রহ অতি সুন্দর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এতদ্বারা নিরূপিত হইতেছে ব্যাড়ি ও দাক্ষায়ণ একই ব্যক্তি। দক্ষের অপত্য দাক্ষি। দক্ষবংশোদ্ভব হইলেই "দাক্ষায়ণ" বলিয়া অভিহিত হয় না, দাক্ষিগোত্রজও দাক্ষায়ণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পাণিনিসূত্রানুসারে প্রপৌত্রাদি দূরতর বংশীয়গণ "যুবন্" সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবে। টীকাকারগণ "দাক্ষি" নামক ব্যক্তির জীবিতকালের মধ্যে "যুবন্" অর্থে তৎপ্রপৌত্রকে "দাক্ষায়ণ" নাম দিয়াছেন। অতএব, দাক্ষায়ণ, দাক্ষির অন্তত প্রপৌত্র বা অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। আবার পতঞ্জলি পাণিনির মাতার নাম দাক্ষী নির্দেশ করিয়াছেন। "দক্ষস্যাপত্যং পুমান্ দাক্ষিঃ, দক্ষস্যাপত্যং স্ত্রী দাক্ষী।" ব্যাড়ি বা দাক্ষায়ণের প্রপিতামহের নাম দাক্ষি, এই দাক্ষির জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম দাক্ষী। এক্ষণে, দেখা যাইতেছে দাক্ষায়ণ বা ব্যাড়ির প্রপিতামহের সহিত দাক্ষের বা পাণিনির মাতুল ভাগিনেয় সম্বন্ধ। এই ব্যাড়ি অপেক্ষা পাণিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাহা সহজে প্রমাণিত হইতে পারে। পাণিনি দক্ষগোত্রীয় এবং পণিন্ উপাধিযুক্ত কোন বংশের সন্তান। তিনি দাক্ষিণাত্যবাসী ব্যাড়ির আত্মীয়।

"অথ ব্যাড়িৰ্বিন্ধ্যবাসী, নন্দিনীতনয়শ্চ সঃ॥"—অভিধানচিন্তামণি।

পাণিনির জীবনী সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। তাঁহার পিতামহের নাম দেবল এবং তাঁহার মাতার নাম দাক্ষী ছিল এইমাত্র বলা যাইতে

পারে, লামা তারনাথ ও কথাসরিৎসাগরের উক্তি গ্রহণ করিলে বলা যাইতে পারে যে তাঁহার জন্মভূমি 'মগধ দেশ'। প্রবাদ আছে তিনি সিংহের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। এই কয়েকটি কথা ব্যতীত পাণিনি-সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারা যায় নাই।

পাণিনি "জাম্বুবতী-বিজয়" ও "পাতাল-বিজয়" নামক দুইখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। পাণিনি বিষয়ে জৈন-কবি রাজশেখর[৬০] নিম্নলিখিত শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন।

"স্বস্তি পাণিনয়ে তস্মৈ যস্য রুদ্রপ্রসাদতঃ।
আদৌ ব্যাকরণং কাব্যমনুজাম্বুবতীজয়ম্॥"

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক শ্রীধরদাস[৬১] ও তাঁহার সদুক্তি কর্ণামৃতে "দাক্ষীপুত্র" নাম দিয়া একটি শ্লোক দিয়াছেন।

বৈয়াকরণ পাণিনি কবি ছিলেন, ইহা নিতান্তই কৌতূহলোদ্দীপক। বল্লভদেবের[৬২] সুভাষিতাবলীর উপক্রমণিকায় কবি পাণিনি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। কবি পাণিনি ও বৈয়াকরণ পাণিনি এক ব্যক্তি কি না এ প্রবন্ধে আমরা সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। তবে এখানে পাণিনির দু-একটি কবিতা উদ্ধৃত করিলে কাহারও বোধ হয় আপত্তি হইবে না। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে ঔফ্রেখ্ট্ শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি হইতে 'পাণিনি'র দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। সে দুইটি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১। উপোঢ়রাগেণ বিলোলতারকং তথাগৃহীতং
শশিনা নিশামুখং।
যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া পুরোপি
রাগাদ [ণ ?] গলিতং ন লক্ষিতম্॥

২। ক্ষপাঃ ক্ষামীকৃত্য প্রসভমপহৃত্যাম্বুসরিতাং
প্রতাপ্যোর্ব্বীং কৃৎস্নাং তরুগহনমুচ্ছোষ্য [ষ্য ?] সফলম্
ক্ব সংপ্রত্যুষাংস্তর্গত ইতি তদন্বেষণপর।—
স্তড়িদ্দীপালীকা দিশিদিশি চরন্তীব জলদাঃ॥

"নিরঙ্কুশা হি কবয়"—এই উক্তির সার্থকতা প্রদর্শন করিবার জন্য নমিসাধু বলিয়াছেন যে মহার্কাবগণ বৈয়াকরণ সূত্র অবহেলা করিলেও তাঁহারা

"নিরঙ্কুশ"। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি পাণিনির পাতাল বিজয় হইতে একটি কবিতার "সন্ধ্যাবধূং গৃহ্য করেণ" এই এক চরণ উদ্ধার করিয়াছেন। অতঃপর, পাণিনির ব্যাকরণদুষ্ট আর একটি শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গতেঽর্ধরাত্রে পরিমন্দমন্দং গর্জন্তি যৎপ্রাবৃষি কালমেঘাঃ।
অপশ্যতী বৎসমিবেন্দুবিম্বং তচ্ছর্বরী গৌরী হুঁকরোতি॥

"গৃহ্য" ও "অপশ্যতী" পদ ব্যাকরণ-দোষযুক্ত হইলেও মহাকবি প্রযোগ হেতু কবিতার কোন সৌন্দর্য হানি হয় নাই।

পাদটীকা

১ নিরুক্ত—১.১৭—দুর্গাচরণের টীকা।

২ *On the Hindu School of Sanskrit Grammarians*—Burnell.

৩ "অগ্র্যাঃ সর্বেষু বেদেষু সর্বপ্রবচনেষু চ। শ্রোত্রিয়ান্বয়জাশ্চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ॥"—৩ ১৮৪।

৪ ৪.৭।

৫ নিরুক্ত—১.২০।

৬ মনু—৩.১৮৫।

৭ ষড়্‌বেদাঙ্গ যথা—"শিক্ষা কল্পে ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসঞ্চয়ঃ।
জ্যোতিষামযনঞ্চৈব বেদঙ্গানি ষড়েব তু॥"

৮ Sayana's *Com. on the R. V. I.*, p. 34 (Muller's Ed)

৯ "ব্যাকরণং অষ্টধা নিরুক্ত চতুর্দশধা" ইত্যাদি।

১০ Academy, July 1870.

১১ *Bibl. Indica Edition,* by Rajendralal Mitra, p. 725.

১২ ছান্দোগ্য-উপনিষদ্—২.২২. ৩, ৫।

১৩ D. A. Weber's Edition, p. 990.

১৪ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, অধ্যায়—১.২.৫।

১৫ Rajendralal Mitra : *Notices,* i. p. 72.

১৬ Rajendralal Mitra : *Report*, p. 18.

১৭ *Mysore Cat.* No. 57.

১৮ *Mysore Cat.* No. 51. p. 8.

১৯ Haug : *Ueber das Wesen* U. S. W. P. N. P. [k]—ইহা তামিলদেশে রক্ষিত।

২০ A. C. Burnell's, *Notices* i. p. 73 ; অধ্যাপক হৌগ বলেন [হৌগের মতে] ইহার দুই প্রকার মূল বিদ্যমান আছে।

২১ Haug : *U. S.* p. 55 [*U. S. W. P. N. K.*, p. 52] ; Weber : *Pratijna-Sutra*, p. 106ff ["Pratijna-Sutra" p. 106]. *Notices*, i. p. 73.

২২ *Report*, p. 18. Haug : *U. S.* P. p. 61 ; [U. W. S. N. K. P. p. 61] ; *Notices*, i p. 71.

২৩ ভোজদেবের সমসাময়িক বজ্রাতের পুত্র উদয়ভট্ট 'পার্ষদ ব্যাখ্যা' নামে ইহার টীকা রচনা করেন।

২৪ উদয়ভট্ট ইহার টীকা করিয়াছিলেন। 'জ্যোৎস্না' নামক রামচন্দ্র-কৃত আর একটি টীকাও বর্তমান আছে, তবে সেটি আধুনিক।

২৫ যথা—ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য—১। ক-কার, ইত্যাদি (৪.৬)। ২। ই, উ, এ ইত্যাদি (অনুক্রমণিকা)। ৩। কথৌ ইত্যাদি (অনুক্রমণিকা) দ। ৪। রেফ (১.১০)। ৫। শ-কারচ-কারবর্গয়োঃ (৪.৪)।

তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য—১। অ-কার (১.২১); ই-কার (২.২৮); হ-কার (১.১৩); অ-বর্ণ (৭.৫); ই-বর্ণ ইত্যাদি (১০.৪)। ২। প (৪.৩০); ন (৪.৩২); ক্ষ (৯.৩)। ৩। ত, ট (৭.১৩); ১, খ (৭.১৪); ৭ (১.১৯)। ৪। রেফ (১.১৯)। ৫। ক-বর্গ (২.৩৫); চ-বর্গ (২.৩৬); ট-বর্গ (১৪.২০)।

কাত্যায়নীয় প্রাতিশাখ্য—১। ঐ-কার, ও-কার (১.৭৩); ৯-কার (১.৮৭) [১.৭৩]; ই-বর্ণ (১.১১৬)। ২। উবোপ্পর্ণঃ (১.৭০); অ (১.৭১)। ৩। র (১.৪০)। ৪। নুঃ (১৩.১৩২)। [ইহা 'ন' স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে]। ৫। ত-বর্গ (৩.৯২)।

এই প্রাতিশাখ্যে পাণিনির 'এং' প্রভৃতির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি যে পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার যথেষ্ট কারণও আছে।

অথর্ব-প্রাতিশাখ্য—১। অ-কার (১.৬), ৯-কার (১.৪), ল-

কার (১.৫), ষ-কার (১.২৩)। ২। ঋ-বর্ণ (১.৩৭)। ৩। য, র (১.৬৮), শ-ষসেষু (২.৬)। ৪। রেফ (১.২৮)। ৫। চ-বর্গ (১.৭), উ বর্গীয়ে [উ বর্গীয়ে] (২.১২), চটবর্গয়র (২.১৪) ইত্যাদি ইত্যাদি।

২৬ Schiefner : *Neber die logischen und graminatischen Werke in Tandjur.*

২৭ Burnouf : *Introduction,* i. p. 456. "á seize ansil avait lu la grammaire d' Indra et vaineau tods ceuse [cense] quindisputaient avec lui" ; Also Wassiljew's, [Wassilyeurs], *Der Buddismus,* p. 332.

২৮ Wassiljew in Schiefner's translation of Taranatha's *Tibetan History of Indian Buddhism*, p. 294.

২৯ Do. German translation, p. 54.

৩০ সংস্কৃত পুথিতে 'সর্ববর্মা' দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তারনাথ স্পষ্ট বলিয়াছেন 'সর্ববর্মা' ও 'ঈশ্বরবর্মা' এই দুইটিই ভুল।

৩১ চন্দ্রাচার্যের অপর নাম চন্দ্রগোমি। ইনি মহারাজ কনিষ্কের পরে পূর্বাঞ্চলে 'বরেন্দ্র'-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবত বাংলা এই স্থানটি—বাকলা। ভর্তৃহরি-কর্তৃক 'চন্দ্র-ব্যাকরণে'র নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতের কোথাও চন্দ্রব্যাকরণের সম্পূর্ণ প্রতিলিপি পাওয়া যায় না। কাশ্মীর প্রদেশে ডক্টর বুলার চন্দ্রব্যাকরণের 'বর্ণসূত্র' (শিক্ষা) ও পরিভাষাসূত্র ১৮৭৬ খ্রী. প্রাপ্ত হন। তিব্বতীয় ভাষায় চন্দ্র-ব্যাকরণের উণাদি-বৃত্তি ও উপসর্গ-বৃত্তি সংরক্ষিত আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থকার ভিক্ষু স্থিরমতি নেপালের মধ্যবর্তী পটেন নগরে অবস্থানকালে (৯৫০-১০০০ খ্রী.) চন্দ্রব্যাকরণের অন্তর্গত 'ধাতুপাঠ' ও 'অধিকার-সংগ্রহ' তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এতদ্ভিন্ন ধর্মদাসের 'সূত্রবৃত্তি' ও 'গণপাঠ', আনন্দ দত্তের 'সূত্রপদ্ধতি', পূর্ণচন্দ্রের 'ধাতুপরায়ণ' এবং কায়স্থ চঙ্গদাসের 'সমন্ত-উদ্দেশ'ও (চঙ্গবৃত্তি) আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত চন্দ্রব্যাকরণের সম্পূর্ণ 'সূত্রপাঠ' পাওয়া গিয়াছে। পূর্বে সিংহলে চন্দ্রব্যাকরণ পঠিত হইত। কিন্তু খ্রীস্টীয় প্রায় ১২০০ অব্দে সিংহলের বৌদ্ধ যতি 'কাশ্যপ' সংস্কৃত শিক্ষা-সৌকর্যার্থ 'বালাবোধন' নামক সরল ব্যাকরণ রচনা করেন। সিংহলের সর্বত্র ইহার প্রচার হওয়াতে চন্দ্রব্যাকরণের অধ্যয়ন সিংহলে বন্ধ হইয়া যায়।

কাশ্যপের ব্যাকরণ অনেকটা 'লঘুকৌমুদী'র মত। জয়াদিত্য ও বামনের 'কাশিকাবৃত্তি'তে চন্দ্রব্যাকরণের মত সমালোচিত হইয়াছে।

৩২ *Mahabhashya*, III. p. 467. Kielhorn's edition.

৩৩ ***Panini***, 2nd Vol, 1st ed, 1840, p. XIII.

৩৪ "Let us take as a fairly well-established fact B. C. 350. as the date of Panini"—*Literature & History of the Veda*, 1840, p. 16.

৩৫ ***Indian Antiquities***, p, 737, 1847.

৩৬ Weber : *History of Indian Literature*, p. 199.

৩৭ *Indische Studien*, pp. 1, 57, 146, 1559.

৩৮ *On the Oldest Period of Indian History*, p. 76.

৩৯ ৪.৩.১০৫—অষ্টাধ্যায়ী।

৪০ Goldstucker's *Panini*, pp. 225, 227.

৪১ ৮.২.৫০।

৪২ Goldstucker's *Panini's Place*, p. 231.

৪৩ *Indische Studien*, V 1862.

৪৪ Weber's *Indische Studien*, p. 137

৪৫ *Aindra School*, p 44, 1875.

৪৬ *Ind. Antiquery*, V. 1, p 16.

৪৭ J. R. A. S. 1891.

৪৮ Z. M. D. G. 39. p. 95.

৪৯ *Panini,* Ein Beitrag Zur Keuntniss der Indischen Literatar und Grammatik von der Dr. Liebich.

৫০ Taranath's *History of Indian Buddhism,* p. 43. (Tibetian text) and p. 54 (of Schiefner's *German* translation.)

৫১ R. C. Dutt : *Civilisation in Ancient India,* Vol. 1 p. 207.

৫২ রামদাস গ্রন্থাবলী—পৃ. ৪১৪।

৫৩ পাণিনি, পৃ. ৯১।

৫৪ *Proceeding of the Bethune Society,* 1859. 69.

[মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ীর 'মহাভাষ্যে'র ভূমিকা, ২।৶০—২।০]

প্রসঙ্গ-কথা

1 Roth, Rudolf : 'অথর্ববেদ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

2 বেবের (Weber, A. F) : 'অথর্ববেদ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

3 বেন্‌ফী (Benfey, Theodor) : 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

4 ম্যাক্সমূলর (Max Muller, F) : 'অনার্য' প্রসঙ্গ-কথা দ্র

5 হুইট্‌নী (Whitney, William Dwight) : 'অথর্ববেদ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

6 রেনিয়ের (Regnier, A) : ফরাসী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। গ্রন্থ— 'E´tude sur l'idiome des Védas et les Origines de la langue sanscrite (Paris. 1855), E´tudes sur la grammaire Vedique Prātiçkhya du Rig-Véda (Paris 1857)

7 গোল্ডস্টুকর (Goldstucker, Theodore) : 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

8 কীলহর্ন (Kielhorn. Franz) : 'অসুরজাতি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

9 এগলিঙ (Eggeling, Julius) : ব্রিটিশ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the India Office, 7 pts. (London, 1887-1904) প্রস্তুত করেন এবং The Satapatha Brahmana (1882) ইংরেজি অনুবাদ করেন।

10 বর্নেল (Burnell, Arthur Coke) : 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

11 হোগ (Haug, Martin) : ঐ.

12 বু-স্তন (Bu-Ston—বু-তোঁ) : তিব্বতী ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থ।

13 পুরুষোত্তমদেব (মহারাজা) (১২-১৩শ খ্রী-শতাব্দী) : বঙ্গদেশীয় রাজা ও বৃত্তিকার। ইনি ত্রিকাণ্ডশেষ ও হারাবলী প্রণয়ন করেন।

14 ভট্টোজি দীক্ষিত (১৬-১৭ খ্রী-শতাব্দী) : পিতা লক্ষ্মীধর সূরি। কাশীবাসী। শেষ শ্রীকৃষ্ণের কাছে ব্যাকরণশাস্ত্র ও অপ্পয় দীক্ষিতের কাছে বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। গ্রন্থ—সিদ্ধান্তকৌমুদী, প্রৌঢ়-মনোরমা, মহাভাষ্যের ওপর শব্দকৌস্তুভ, শাঙ্করভাষ্যের ওপর তত্ত্বকৌস্তুভ রচনা করেন।—সনৎস্থ.

15 রামচন্দ্র আচার্য (১৫-১৬ খ্রী শতক) : দাক্ষিণাত্যে প্রক্রিয়াকৌমুদী রচনা করেন।—ঐ.

16 বরদরাজ (১১-১২ খ্রী-শতাব্দী) : ইনি বামদেব মিত্রের পুত্র। ন্যায়কুসুমাঞ্জলির টীকা বোধিনী, তার্কিকরক্ষা, ন্যায়দীপিকা, লঘু-দীপিকা ই. রচনা করেন।—ঐ.

17 নাগেশভট্ট (১৭ খ্রী-শতাব্দী) : পিতা শিবভট্ট, মাতা—সতীদেবী। জন্ম—মহারাষ্ট্রদেশে। ভট্টোজি দীক্ষিতের পৌত্র হরিদীক্ষিতের কাছে শিক্ষা। প্রয়াগের কাছে শৃঙ্গবেরের রাজা রামদেবের সভা-পণ্ডিত। রচনা—পরিভাষেন্দুশেখর, প্রদীপোদ্দ্যোত, বৈয়াকরণ-ভূষণ, বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তমঞ্জুষাদি ইত্যাদি।—ঐ.

18 বোট্‌লিঙ্ক (Bothlingk) : 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

19 কাত্যায়ন (৫-৪র্থ খ্রী-পূ.) : দাক্ষিণাত্যে জন্ম। উপবর্ষের কাছে শিক্ষিত এবং সম্ভবত মহানন্দের মন্ত্রী। তিনি পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিক প্রণয়ন করে বার্ত্তিকার নামে অভিহিত হন। বৌদ্ধগণ বেদাদি শাস্ত্রের উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হলে তিনি গুরুর আদর্শে উভয়মীমাংসার বৃত্তি প্রচার করে হিন্দুধর্মের দৃঢ়তা সম্পাদন করেন।—সনৎস্থ.

20 কোলব্রুক (Colebrooke, Henry Thomas) (১৭৬৫-১৮৩৭) : সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিত। কোম্পানীর চাকরি নিয়ে ১৭৮৩ খ্রী. ভারতে আসেন। প্রথমে পূর্ণিয়া ও ত্রিহুতের সহ-কালেক্টর, সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারক (১৮০১), সংস্কৃত শিক্ষা। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সংস্কৃত ও হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রের অধ্যাপক, সুপ্রীম

কাউনসিলের সদস্য। ইত্যাদি। এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের সভাপতি (১৮০৭-১৪), ইংলণ্ডে গমন, সেখানে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম স্থাপয়িতা ও প্রথম সভাপতি (১৮২৩)। নানা প্রবন্ধ রচনা করেন এবং অমরকোষ গ্রন্থের সম্পাদনা করেন।—*BDIB*.

21 সোমদেব ভট্ট (১০-১১ খ্রী-শতাব্দী): কাশ্মীরে রামচন্দ্র নামে এক ব্রাহ্মণের পুত্র। সোমদেব জলন্ধরের শোকসন্তপ্তা রানী সূর্যবতীর সন্তোষার্থে কথাসরিৎসাগর রচনা করেন।—সনংস্ম.

22 বর্ষ: বিখ্যাত বৈয়াকরণ আচার্য। পাণিনির শিক্ষাগুরু।

23 রানী সূর্যবতী: সোমদেবভট্ট দ্র.

24 লাস্‌সেন (Lassen, Ch.): 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' প্রসঙ্গ কথা দ্র.

25 রেনো (Renaud): ঐ

26 য়ুয়ন্ চয়ং (হিউয়েন সাঙ, য়ুয়ং চয়ং): চৈনিক পরিব্রাজক ও পণ্ডিত। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য উত্তরাঞ্চলের স্থলপথে হর্ষবর্ধনের রাজত্বের সময় ভারতে আসেন। তাঁর ভ্রমণকাল ৬২৯-৬৪৫ খ্রী.। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্রের কাছে বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করেন। তিনি যে সময়ে তাঁর যে ভ্রমণকাহিনী লিখে গেছেন তার অসাধারণ ঐতিহাসিক মূল্য আছে।—*VSEIIJ*, 14, 20, 343 ff.

27 উইলসন: 'অথর্ববেদ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

28 হোমার (Homer): সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন গ্রীক কবি। ইনি দুই মহাকাব্য রচনা করেন—ইলিয়াড ও অডিসি। এই কাব্য দুখানিই তাঁকে অমর করে রেখেছে।

29 আবেস্তা: ইরানে জোরোস্ট্রিয়ানদের পবিত্র গ্রন্থ।

30 কালিদাস (৫-৬ খ্রী-শতাব্দী): সংস্কৃত মহাকবি। খ্রী. ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে যশোধর্মদেব নামে যে মালবের অধিপতি ছিলেন, কালিদাস সম্ভবত তাঁর নবরত্ন সভার অন্যতম। কালিদাস রচিত গ্রন্থ—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, বিক্রোমোর্বশী, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ই —জী-কো.

31 অমরসিংহ (৫-৬ খ্রী-শতাব্দী) : কোষকার। অমরসিংহ বৌদ্ধ পণ্ডিত। উরুবিল্বাগ্রামে একটি বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর কোষগ্রন্থ অমরকোষ নামে বিখ্যাত। অমরসিংহ কালিদাসের সম-সমসাময়িক বলে প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু কালিদাস অমরসিংহের পূর্ববর্তী।—সনৎস্ব.

32 লটাচার্য : প্রাচীন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত।

33 সিংহাচার্য : আনন্দ সূরির অপর নাম। জৈন নৈয়ায়িক পণ্ডিত।

34 উৎপলদেব বা উৎপলাচার্য (৯-১০ খ্রী-শতাব্দী) : কাশ্মীরবাসী টীকাকার। গ্রন্থ—স্পন্দপ্রদীপিকা (টীকা কাশ্মীরে রচনা), ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞাসূত্র।—সনৎস্ব.

35 বরাহমিহির (৬ষ্ঠ শতাব্দী) : সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ। উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম রত্ন। অবন্তীনগরবাসী। মালবদেশে বৃহৎসংহিতার পুনঃসংস্করণ ও পঞ্চসিদ্ধান্তিকা রচনা করেন। কথিত আছে ৫৭৮ খ্রী. লোকান্তরিত হন।—ঐ

36 স্ট্যানিসলেয়স জুলিয়েন (Stanislaus Julien) : প্রাচ্যবিদ্যাবিদ। গ্রন্থ—The Translation of the Biography and Memoirs of Hiuan Thsang, 3 vols. (1857ff), Les Avadānas, Contes et Apologues Indiens (1859).

37 ব্যাড়ি (সময় পাণিনি ও কাত্যায়ন উভয়েরই পরবর্তী) : প্রাচীন কোষ-গ্রন্থকার ও শব্দাচার্য। ইনি একখানি কোষগ্রন্থ এবং সংগ্রহ নামে লক্ষ শ্লোক যুক্ত একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন।—সনৎস্ব.

38 বেস্টের্গার্ড (Westergaard) : 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

39 ভাণ্ডারকার (Bhandarkar, Sir Ramkrishna Gopal) (1837—?) : বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ। দাক্ষিণাত্যে জন্ম। সংস্কৃত ও প্রাচ্যভাষার অধ্যাপক বোম্বের এলফিনস্টোন কলেজে। ভাইস চ্যান্সেলর, বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৯৩—৯৫)। ইনি বহু গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ—Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems (Strassburg, 1913)—*D. R. Bhandarkar Vol.* (1940).

40 পিশেল (Prof. Pischel) : 'অদিতি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

41 ঔফ্রেক্ট (Aufrecht, T) : 'অথর্ববেদ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

42 পিটারসন (Peterson, Peter) (1847-1899) : ভারতে আগমন (১৮৭৩)। এলফিনস্টোন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক। বহু অমূল্য পুথি সংগ্রহ করেন। কয়েকটি সংস্কৃত ও জৈন গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ও পরে সভাপতি হন। সোসাইটির জর্নালে সংস্কৃত বিষয়ক বহু প্রবন্ধ লেখেন।—*BDIB.*

43 ক্ষেমেন্দ্র (ব্যাসদেব) (১০-১১শ খ্রী-শতাব্দী) : ইনি কাশ্মীরে বৃহৎ-কথামঞ্জরী রচনা করেন। ইনি সোমদেবের সমসাময়িক।—সনংস্থ.

44 সিলভাঁা লেভি (Sylvain Levi) (1863-1935) : ফরাসীদেশীয় সুবিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ। ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক (১৮৯০) এবং ফ্রান্স-কলেজে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও ইতিহাসের অধ্যাপক (১৮৯৪)। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, ধর্ম, বেদ, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। ইনি তিনবার ভারতে আসেন। বিশ্বভারতীর সর্বপ্রথম আমন্ত্রিত অধ্যাপক হন। গ্রন্থ—Le Theatre Indien (Paris 1890), L'Inde et le Monde (Paris 1926). La Doctrine dusa-crifice dans les Brahmanas (Paris 1898) ই.—*BDIB.*

45 লিবিখ (Liebich) : জর্মন পণ্ডিত। গ্রন্থ—Materalien zum Dhatupatha (Heidelburg 1921) ই.

46 ইৎ-সিঙ (ই-সিঙ-সিঙ, I-tsing) : চৈনিক পরিব্রাজক। ভারতে স্থিতি (৬৭১-৬৯২ খ্রী.)। নালন্দায় জ্ঞানচন্দ্র ও রত্নসিংহের ছাত্র ছিলেন। 'মূল সর্বাস্তিবাদনিকায়বিনয়সংগ্রহ' নামে বৌদ্ধগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। এঁর সময়ে রাহুল মিশ্র নালন্দার মহাস্থবির ছিলেন।—*DCI,* 49, 56।

47 সি-য়ু-চি (Hsi-yu-chi) : চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ন্-চয়ঙ লিখিত বিবরণ গ্রন্থ। এতে তৎকালিক অবস্থার অনেক প্রয়োজনীয় বিবরণ পাওয়া যায়।

48 তারনাথ (১৬শ শতাব্দী) : জন্ম. ১৫৭৩ খ্রী.। পিতা Nam-gyab Pei'h-ts'ongs। তারনাথের পূর্ব নাম—Kun-dgah SNyin

(=আনন্দগর্ভ)। জোনফু. মঠে তারনাথ নাম নিয়ে অধ্যয়ন এবং ৪১ বছর বয়সে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা। এই মঠে তিনি বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করেন ও বহু মূর্তি ও চৈত্য স্থাপন করেন। তিব্বতে ৩৪ বছর বয়সে তাঁর বিখ্যাত বই 'ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' সমাপ্ত করেন। শেষ বয়সে মঙ্গোলিয়ায় মৃত্যু।—ভা-কো.

49 তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি (১৮০৬—১৮৮৫): প্রসিদ্ধ আভিধানিক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। পিতা কালিদাস ভট্টাচার্য সার্বভৌম। কাশীধাম ও সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা। তর্কবাচস্পতি উপাধি লাভ (১৮৩৫)। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক (১৮৪৫-১৮৭৩)। এছাড়া তিনি কাপড়, স্বর্ণালঙ্কার, শাল প্রভৃতির ব্যবসা করেন। গ্রন্থ—বাচস্পত্যাভিধান (১৮৭৩-৭৪), শব্দস্তোম. মহানিধি, বিধবাবিবাহখণ্ডন ইত্যাদি। —সা-সে-ম.

50 রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮—১৯০৯): ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ। পিতা—ঈশানচন্দ্র দত্ত। সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় ৩য় স্থান (১৮৬৯) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। বরোদার প্রধানমন্ত্রী (১৯০৯)। আজীবন সাহিত্য সাধনা। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি (১৮৯৯), সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি ইত্যাদি। বহু বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ রচনা তন্মধ্যে বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ, জীবনপ্রভাত, জীবনসন্ধ্যা ঐতিহাসিক উপন্যাস, হিন্দুশাস্ত্র, ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, A History of Civilisation in Ancient India (১৮৮৮-৯০), A Brief History of Ancient and Modern India (১৮৯১) ই.— ঐ.

51 রামদাস সেন, ড. (১৮৪৫—১৮৮৭): কবি ও পুরাতত্ত্ববিদ। ১৩ বছর বয়স হতে কাব্যচর্চা ও পরে পুরাতত্ত্বচর্চা ও সংস্কৃত অধ্যয়ন। ডক্টর (ইতালি ফ্লোরেন্টিনো একাডেমি) উপাধি লাভ। রচনা—ঐতিহাসিক রহস্য, ৩ খ. (১২৮১-৮ ব.), রত্নরহস্য (১২৯০ ব), ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচনা (১৮৭২), মহাকবি কালিদাস (১৮৭২) ই.—ঐ.

52 রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯—১৯০০) : ঐতিহাসিক ও গ্রন্থকার। পিতা

—কমলাকান্ত গুপ্ত। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন। রচনা—সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস, অর্থনীতি, নবভারত, ভারতপ্রসঙ্গ ই. —সা-সে-ম.

53 রাজেন্দ্রলাল মিত্র : 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

54 কহ্লণ পণ্ডিত (১২শ শতাব্দী) : প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। প্রকৃত নাম কল্যাণ মিশ্র। পিতা—চম্পক মিশ্র। কাশ্মীররাজ জয়সিংহদেবের সময় তাঁর প্রামাণিক ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিনী' রচিত হয়।—সনৎস্ম.

55 হেমচন্দ্র সূরি : 'প্রাচীন সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

56 দাক্ষের : বা দক্ষসুত, পাণিনির অপর নাম।

57 শবরস্বামী : ইনি পাণিনীয় লিঙ্গানুশাসনের টীকা করেন।

58 শেষনন্দ : নন্দবংশের শেষ সম্রাট ধননন্দ। চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে পরাজিত করে মগধের সিংহাসনে বসেন।

59 পক্ষিল স্বামী (৪র্থ খ্রী-পূ.) : অপর নাম বাৎস্যায়ন। হেমচন্দ্র ও পুরুষোত্তমদেব চাণক্যকেই ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন।—সনৎস্ম.

60 রাজশেখর : প্রাচীনকালের কবি ও নাট্যকার। আনু. ৮-৯ম খ্রী. শতাব্দীতে মধ্যভাগে মহারাষ্ট্রে জন্ম। গ্রন্থ—কর্পূরমঞ্জরী, বালভারত ই.—ঐ.

অঙ্গ (বৈদিক)

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—বেদের এই ছয় অবয়ব বেদাঙ্গ নামে অভিহিত।—

"ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাদ্ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"—

এই ষড়ঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।—

'আসন্নং ব্রহ্মণস্তস্য তপসামুত্তমং তপঃ।
প্রথমং ছন্দসামঙ্গমহর্ব্যাকরণং বুধঃ॥'—

বাক্যপদীয় ১.১১

বেদাঙ্গ বেদের অংশ নহে, উহা বেদের পরিশিষ্ট। বেদাঙ্গের সাহায্যেই বেদের অর্থ সুগম হয়। এইগুলি অপৌরুষেয় নহে। সাধারণত ব্রাহ্মণকে প্রবচন আখ্যা দেওয়া হয়, কিন্তু মনু বেদাঙ্গকে প্রবচন নাম দিয়াছেন (মনু. ৩.১৮৪)। ষড়্বেদাঙ্গের সর্বপ্রথম উল্লেখ সামবেদের ষড়্বিংশ-ব্রাহ্মণে (৪৪.৭) দেখিতে পাওয়া যায়। যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে (১.২০) বেদাঙ্গের বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বেদাঙ্গের কোন নাম দেন নাই। চরণব্যূহ, মনু-সংহিতা (৩.১৮৫), ও মুণ্ডকোপনিষদে (১.৫) ছয়টি বেদাঙ্গের উল্লেখ আছে।[১] বেদাঙ্গের অন্তর্গত বিষয়সমূহের যথাযথ বিবরণ

কিন্তু বৃহদারণ্যক ও উহার ভাষ্যেই পাওয়া যায়। এই বেদাঙ্গ কোন ব্যক্তি-বিশেষের গ্রন্থকে লক্ষ্য করিত না—ইহা ব্যাকরণশাস্ত্রকে বুঝাইত। ঋগ্বেদের ভাষ্যে[২] সায়ণাচার্য[1] যেভাবে বেদাঙ্গ-ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যাকরণকে লক্ষ্য করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। দুর্গাচার্যের বচন ('ব্যাকরণং অষ্টধা নিরুক্ত চতুর্দশধা…' ইত্যাদি) হইতেও তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। ঋক্, যজু ও অথর্ববেদের প্রাতিশাখ্যগুলি যেভাবে গ্রথিত তাহাতে সেগুলিকে এক-একটি বেদাঙ্গ ব্যাকরণ উপাধি দেওয়া নিতান্ত অযুক্ত নহে। বস্তুত পাণিনির[2] পূর্ব হইতেই যে ব্যাকরণ বেদাঙ্গ নামে অভিহিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পাশ্চাত্ত্য শাব্দিক রোট্[3], বর্নেল[4] প্রভৃতি পণ্ডিতগণও এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। তবে একমাত্র অধ্যাপক গোল্ডস্টুকর[5] বেদাঙ্গ বলিতে পাণিনির ব্যাকরণকেই বুঝিয়াছেন।[৩] [পাণিনি দ্র.]

পাদটীকা

১ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি—মুণ্ড. ১.৫

২ Sayana's Com. on the Rigveda, i. p. 34 (Muller's ed.)

৩ Academy, July, 1870.

[বঙ্গীয় মহাকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১১-৫১২]

প্রসঙ্গ-কথা

1 সায়ণাচার্য : 'অনার্য' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

2 পাণিনি : 'পাণিনি' প্রবন্ধ দ্র.

3 রোট (Roth, R.) : 'অদিতি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

4 বর্নেল (Burnell, A.C) : 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

5 অধ্যাপক গোল্ডস্টুকর (Goldstucker, Theodore) : ঐ

অগ্রহার

অগ্রহার বৃত্তিবিশেষ। 'কস্মিংশ্চিদগ্রহারে কালীংনাম'—দশকু. ৮.৯। মহাভারতে 'অগ্রহার' শব্দের উল্লেখ আছে। অগ্রহার শব্দ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ[1] বলিয়াছেন—'অগ্রং ব্রাহ্মণভোজনং তদর্থং হ্রিয়ন্তে রাজধনাৎ পৃথক্ ক্রিয়ন্তে তেহগ্রহারাঃ ক্ষেত্রাদয়ঃ'। চতুর্ভুজ নামক মহাভারতের অন্য একজন টীকাকার অগ্রহার 'শাসনে'র প্রতিশব্দ বলিয়া ধরিয়াছেন।[2] কামিকাগমেও অগ্রহারের ব্যাখ্যা আছে। অগ্রহার সম্বন্ধে কামিকাগমের উক্তি এইরূপ—

'বিপ্রৈর্বিদ্বদ্ভিরাকোগ্যং মঙ্গলং চেতি কীর্তিতম্।
অগ্রহারস্তদেবামুক্তং বিপ্রেন্দ্রাঃ কামিকাগমে॥'—২০.৩।
'অগ্রহারং বিনান্যেষু স্থানীয়াদিষু বাস্তষু।
প্রাগাদিষু চতুর্দিক্ষু বায়ৌ ঈশে শিবালয়ঃ॥'—২৬.৩২।

প্রাচীন ভারতে নৃপতি বা রাজন্যগণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পুরোহিত, অধ্যাপক, শাস্ত্রাদি-ব্যাখ্যাতা, বৈদ্য, সাধু, অমাত্য প্রভৃতিকে অগ্রহার-বৃত্তি প্রদান করিতেন। এই বৃত্তি খুবই সম্মানজনক। বৃত্তিভোগীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি বা গ্রাম দান করা হইত এবং এই বৃত্তির দ্বারা তাঁহার জীবন-ধারণের ব্যাপার চলিত। প্রধানত ব্রাহ্মণই অগ্রহারবৃত্তির অধিকারী হইতেন। এক বা একাধিক ব্রাহ্মণকে এই অগ্রহারবৃত্তি লাভ করিতে দেখা যায়; উহাতে বৃত্তিভোগীদের বৈশিষ্ট্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অংশ দিবার ব্যবস্থা

ছিল। এই প্রকারে ইহাদের লইয়া অগ্রহার ব্রাহ্মণ-পল্লীতে পরিণত হইত। কোন উৎসব-উপলক্ষ্যে বা বিশেষ কোন কারণে অথবা রাজকীয় কার্যে নিয়োজিত হইবার জন্য বিশেষত অগ্রহারদানের নিয়ম ছিল। এই অগ্রহারভুক্ত ব্যক্তি বা অগ্রহারের অধিবাসী 'অগ্রহারিক' নামে পরিচিত হইতেন। কেবলমাত্র পুরুষই যে অগ্রহার-বৃত্তি পাইতেন তাহা নহে, অনেক স্থানে রমণীকেও এই বৃত্তি পাইতে দেখা যায়। ১৫২০ শক. (১৫৯৮ খ্রী.) বেঙ্কটের বেল্লঙ্গুড়ি-অনুশাসনে কয়েকজন রমণীকে অগ্রহার-বৃত্তি-দানের পরিচয় আছে (*EI*, xvi. 300-2, 307-12)।

আবিষ্কৃত তাম্রশাসন ও অন্যান্য লিপিমালার অনুশীলন করিলে নানাবিধ অগ্রহার দানের রীতি পরিলক্ষিত হয়। কোন ব্রাহ্মণকে অগ্রহার দান করিলে তিনি আবার উহা হইতে অনেক অংশ বহু ব্রাহ্মণকে দান করিতে পারিতেন; অনেক স্থলে আবার তাঁহাকে মূল দাতার অনুমতি লইতে হইত। সাধারণত চিরকাল বংশানুক্রমে অগ্রহার ভোগ করিবার অধিকার দেওয়া হইত। কোথাও কোথাও পূর্বপ্রদত্ত অগ্রহার-বৃত্তির সংশোধন করিয়া নূতনভাবে উহা দান করিতে দেখা যায়। ১০০ হর্ষ-সং মহোদয়ের ১ম ভোজদেবের দৌলতপুরলিপিতে এইরূপ 'শিবা' নামক অগ্রহার বৃত্তির সংশোধন করিয়া নূতন বৃত্তির প্রচলন করা হইয়াছিল (*EI*, v. 212-3)।

সর্বস্ব দিয়া 'সর্বসিদ্ধি' অর্থাৎ নিষ্কর অগ্রহার-দানের যেমন নিয়ম ছিল, তেমনই আবার অনেক অগ্রহার হইতে কর আদায় করা হইত। যে অগ্রহার হইতে কর আদায় করা হইত তাহা মাত্র সেই অগ্রহারের ব্যয়-নির্বাহার্থ নির্দিষ্ট হইতে দেখা যায়। কোথাও কোথাও আবার অগ্রহারের কর্মচারীদেরও অগ্রহারবৃত্তি দিয়া তাহাদের দ্বারা কাজ চালাইবার রীতি ছিল। ১৩৫২ শক. (১৪৩১ খ্রী.) অল্লয়-দোড্ডের কোঙ্কুরুলিপিতে এইরূপ 'অল্লাড়রেড্ডিদোড্ডবরম্' অগ্রহারদানের সময় 'গ্রামগ্রাসার্থে'র জন্য 'অন্নবরম্' নামক গ্রাম (*EI*, v. 57-9) এবং বীড়-চোড়ের ২৩ রাজ্যাঙ্কে পীঠপুরম্-লিপিতে 'বীড়চোড়চতুর্বেদিমঙ্গল' অগ্রহারে উহার পরিদর্শনের জন্য নিয়োজিত কর্মচারীদিগকে ভূমিদানের পরিচয় আছে (*EI*. v. 96-9)।

প্রায় প্রত্যেক অগ্রহারেই একটি মন্দির থাকিত এবং ঐ মন্দিরের পূজার্চনার জন্য স্বতন্ত্র অগ্রহার-বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। মন্দিরের নামে যে অগ্রহার দান করা হইত তাহাতেই মন্দিরের খরচ-খরচা চলিত। অনেক স্থলে শিক্ষা-ব্যপদেশে কোন শিক্ষাকেন্দ্র-স্থাপনের জন্য অগ্রহার-বৃত্তি দেওয়া হইত। খ্রী. ১১শ শতকের প্রথম ভাগে এইরূপ অগ্রহার-দানের ফলে 'উম্মচিগে' অগ্রহার একটি বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিগণিত হইয়াছিল (*EI*, xx. 69)। শিক্ষার জন্য প্রদত্ত অগ্রহার হইতে অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েই বৃত্তি পাইতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উম্মচিগে হইতে 'অক্করিগ' ও 'ভট্টরিগ' বৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। ধর্মবিষয়ে প্রচারকার্যের জন্য বা ধর্মোন্নয়নের জন্যও অগ্রহার দেওয়া হইত। ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য এবং বেদ-উপনিষদাদি শাস্ত্রে অধ্যাপনা ও উপদেশাদি দিবার জন্যও অগ্রহারদানের ব্যবস্থা ছিল।

বিভিন্ন সময়ের তাম্রশাসন, শিলালেখ প্রভৃতিতে অগ্রহারের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কয়েকটি অগ্রহারের পরিচয় এখানে সন্নিবিষ্ট হইল :

বি-স. ৪৯৩ ভোজদেবের বরহ তাম্রলেখে বাজসনেয় শাখার ভারদ্বাজ-গোত্রীয় ভট্ট কাচরস্বামীর পরিবারস্থ ব্রাহ্মণদিগকে কান্যকুব্জভুক্তির কালডহর-মণ্ডলের অন্তর্গত উদুম্বর-বিষয়ে 'বলাকাগ্রহার' নামক অগ্রহার দানের উল্লেখ আছে।—*EI*, xix. 15-9.

১৯৯ গুপ্ত. (৫১৮-৯ খ্রী.) সংক্ষোভের বেতুল-তাম্রলিপিতে মাধ্যন্দিন-বাজসনেয় শাখার ভারদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ভানুস্বামীকে ত্রিপুরী-বিষয়ের অন্তর্গত প্রস্তরবাটক গ্রামের অর্ধাংশ এবং দ্বারবটিকা গ্রামের এক-চতুর্থাংশ সর্বস্বত্ব দিয়া অগ্রহাররূপে দানের উল্লেখ আছে।—ঐ, viii, 288.

২য় ভীমসেনের ৩৮২ গুপ্ত. (৬০১ খ্রী.) আরঙ-তাম্রশাসনে দোণ্ডা-বিষয়ের অন্তর্গত 'বটপল্লিকা' অগ্রহার ভীমসেন-কর্তৃক তাঁহার পিতামাতার পুণ্যের জন্য ঋগ্বেদ-শাখার অন্তর্ভুক্ত ভারদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ হরিস্বামী ও বপ্পস্বামীকে প্রদানের পরিচয় পাওয়া যায়।—ঐ, ix. 345.

পূর্ব-চালুক্য নৃপতি ১ম জয়সিংহের (৬৩২—৭৩ খ্রী.) পুলীবৃম্র-অনুশাসনে লিখিত আছে, জয়সিংহ অসনপুরের অধিবাসী পূর্বাগ্রহারিক

(অর্থাৎ পূর্বেও ইনি অগ্রহার-বৃত্তি পাইয়াছেন) তৈত্তিরীয় শাখার গোতম-গোত্রীয় রুদ্রশর্মাকে 'সর্বসিদ্ধি' দান-অনুযায়ী শুদ্দবাডি বিষয়ের অন্তর্গত 'পুলীবূম্র' অগ্রহার দান করেন। 'সর্বসিদ্ধি'-দান অর্থে সর্ববিধ কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া।—ঐ, xix. 255, 258. এই জয়সিংহেরই পেদ্দ-বেগি-লিপিতে দেখা যায়, তিনি তৈত্তিরীয় শাখার গার্গ্যগোত্রীয় সোমশর্মাকেও 'সর্বসিদ্ধি'-দানের দ্বারা 'কোম্বরু' অগ্রহার দান করিয়াছিলেন।—ঐ, 259, 260.

রাষ্ট্রকূট-নৃপতি ৩য় ইন্দ্ররাজের ৮৩৬ শক. অনুশাসনে দেখা যায়, ইন্দ্ররাজ পাটলিপুত্র হইতে আগত বাজি-মাধ্যন্দিন-শাখার অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্মণ-গোত্রীয় ও শ্রীবেন্নপভট্টপুত্র সিদ্ধপভট্টকে বলি, চরু, বৈশ্বদেব, অগ্নিহোত্র ও অতিথি-সন্তর্পণের উদ্দেশ্যে লাটদেশের অন্তর্গত ও কম্মণিজ্জের নিকটবর্তী 'তেন্ন' অগ্রহার প্রদান করিয়াছিলেন।—ঐ, ix. 40-1.

রাষ্ট্রকূট-নৃপতি ৪র্থ গোবিন্দের ৮৫২ শক (৯৩০ খ্রী.) কলস-লিপিতে সোমযাজী রেব্দাসকে এরেয়ন-কাড়িয়ূর্ নামক স্থান অগ্রহাররূপে দান করিতে দেখা যায়।—ঐ, xiii. 330, 335.

৮৫২ শক (৯৩০ খ্রী.) এই গোবিন্দের কাম্বে-লিপিতে দেখা যায় যে, তিনি বাজিকাণ্বশাখার অন্তর্ভুক্ত মাঠর-গোত্রীয় মহাদেবয্যপুত্র ব্রাহ্মণ নাগমার্যকে লাট-প্রদেশে খেটকের অন্তর্গত ও পবিত্র কাবিকা নামক স্থানের নিকটবর্তী 'কেবজ্জা' নামক গ্রাম অগ্রহারস্বরূপ অর্পণ করেন।—ঐ, vii. 27-28.

এই বর্ষেই গোবিন্দের আরও একটি কাম্বে-লিপিতে দেখা যায় যে, তিনি গোদাবরীতীরে কপিথক নামক গ্রামে তুলাপুরুষের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ছয় শত অগ্রহার দান করিয়াছিলেন।—ঐ, 45.

৯৩৪ শক. (১০১২ খ্রী.) ৫ম বিক্রমাদিত্যের কোটবুমচ্গি-লিপিতে আছে, বিক্রমাদিত্যের সামন্ত শাসনকর্তা কেশবয্য নরেয়ঙ্গলের অন্তর্গত 'উম্মচিগে' (বর্তমান কোটবুমচ্গি গ্রাম) অগ্রহার মৌনর শ্রীধরভট্টকে দান করিয়াছিলেন। অতঃপর এই উম্মচিগে একটি বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। খ্রী. ১১শ শতকের প্রথম ভাগেই উহা বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

শ্রীধরভট্ট এই অগ্রহার পাইবার পর উহার ভার ১০৪ জন স্থানীয় মহাজনের উপর অর্পণ করেন এবং ৬ মত্তর পরিমাণ ভূমি সোমেশ্বর দেবতার জন্য, ১২ মত্তর ভূমি ভাগিয়ব্বেশ্বর মন্দিরে, এল্‌কোটি-সন্ন্যাসিগণের জন্য ১২ মত্তর, ৫ মত্তর ও একটি গৃহনির্মাণের ভূমি আয়চগাবুণ্ড-মন্দিরে, ৫ মত্তর ও একটি গৃহনির্মাণের ভূমি আদিত্যদেবের জন্য, ৫ মত্তর ও একটি গৃহনির্মাণের ভূমি দেবী বট্টদভগবতীর জন্য এবং ৫ মত্তর ও একটি গৃহনির্মাণের ভূমি নারায়ণের জন্য উৎসর্গ করেন। উক্ত ৫০ মত্তর-পরিমিত ভূমি ও উহার সন্নিবেশিত গৃহাদি বেন্দেয়ভটারের বংশীয় অকৃতদার পুরুষেরা নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসীর আচার পালন করিয়া ভোগ করিতে পারিবে এইরূপ আজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।—ঐ. xx. 69.

১০৫২ খ্রী. নীরল্‌গি-(কাদম্ব-) অনুশাসনে নীরিলি (নীরল্‌গি) অগ্রহারের উল্লেখ আছে।—ঐ, xvi. 67.

১ম রাজরাজের ৩২শ রাজ্যাঙ্কে (১০৫৩ খ্রী.) নন্দমপুণ্ডি-প্রশস্তিতে নন্দমপুণ্ডি অগ্রহার প্রদানের উল্লেখ দেখা যায়।—*IA*, iv 303.

মাদ্রাজ মিউজিয়মে রক্ষিত ৯৮৪ শক ৩য় বজ্রহস্তের অনুশাসনে তৎ-কর্তৃক বরাহবর্তনীর অন্তর্গত 'তামরচেরু' অগ্রহার 'চিকলী' বাটক-সহ সর্বস্বত্ব দিয়া ৫০০ সুধী ব্রাহ্মণকে প্রদানের পরিচয় আছে। ইহার সহিত তিনি কোটীশ্বরের পূজার জন্য এবং তাঁহার বলি, চরু, নৈবেদ্য, দীপপূজা প্রভৃতির জন্য ২০০ 'মুরক' শস্য-উৎপাদনের উপযোগী ভূমি দান করেন। কোটীশ্বরের মন্দিরের কোনরূপ সংস্কার করিতে হইলে অগ্রহারিক ব্রাহ্মণদের উপর উহার ভার অর্পণ করা হয়।—*EI*, ix. 95.

১০৯১ খ্রী. স্থানকুণ্ডূর- (তালগুন্দ-) লিপিতে একটি অগ্রহারের কথা আছে। এই অগ্রহারে ৩২টি ব্রাহ্মণ-পরিবার অহিচ্ছত্র হইতে আগমন করিয়া অগ্রহারবৃত্তি লাভ করিয়াছিল। উহাদের ১৪৪টি নিষ্কর গ্রাম দান করা হয়। লিপিতে এই গ্রামগুলিতে তিন সহস্র ব্রাহ্মণের বাসের কথা আছে।—*EC*. vii, 178.

গোবিন্দচন্দ্রের ১১৭৬ বি-স. (১১১০-২০ খ্রী.) দোন্‌-বুজুর্গ-তাম্রলেখে দেখা যায়, গোবিন্দচন্দ্র ছান্দোগ-শাখার বৎস-গোত্রীয় বিশিষ্ট পণ্ডিত

টুল্‌টাইচ-শর্মাকে অলাপপট্টলার (জেলার) অন্তর্গত বডগ্রামের মধ্যবর্তী একটি অগ্রহার ('কোণাবড' গ্রাম ?) দান করিয়াছিলেন।—*EI,* xviii. 219, 223-4.

Sewell[2] সাহেব আবিষ্কৃত ১০৫৬ শক. একটি তাম্রশাসন হইতে বলিয়াছেন, সরসীপুররাজ কোলনি কোটপ্প-নায়ক কয়েকজন ব্রাহ্মণকে 'পাণ্ডুব' নামক একটি অগ্রহার দান করিয়াছিলেন।—*List. Ant. Remains of Madras*, i. 39.

১১৪৩ খ্রী. চেল্লুর-লিপিতে দেখা যায়, সেনাধিনায়ক কাট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে অত্তিলি জেলার অন্তর্গত 'মণ্ডদরু' (বর্তমান মমড়রু—অত্তিলির ৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ও কুন্‌সমুরুর ২ মাইল পূর্বে অবস্থিত) এবং 'পোন্দুব' অগ্রহার দান করিয়াছিলেন।—*EI,* vii. 180.

১০৮৪ শক. (১১৬৪ খ্রী.) মনগোল্লিলিপিতে উল্লিখিত আছে, চালুক্য-নৃপতি ২য় জগদেকমল্লদেব 'মনিঙ্গবল্লি'র দক্ষিণে ৫০ মত্তর 'মুলস্থান' দেবতার অঙ্গভোগ ও চৈত্রমাসের ক্রিয়াকর্মের জন্য, ৮ মত্তর দেবী সারদার অঙ্গভোগের ও সন্ন্যাসীদের আহারের জন্য, ৫ মত্তর মন্দিরে কৌমার-ব্যাখ্যাতাদিগকে, ৮ মত্তর দেবতার সেবাকার্যের জন্য নির্দিষ্ট চারি জন ব্রাহ্মণকে এবং অবশিষ্ট ৪ মত্তর সর্বস্বত্ব দিয়া অমৃতরাশি পণ্ডিতকে দান করেন।—ঐ, v. 22. কলচুর্য নৃপতি সঙ্কমের সময়ের ১১৮৮ খ্রী. মনগোল্লি লিপিতেও 'মনিঙ্গবল্লি' অগ্রহারের উল্লেখ আছে।—ঐ, 28.

১০৮৪ শক. অগস্ত্যেশ্বর-মন্দিরে প্রা . হুলি-লিপিতে ভারদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ দাসিরাজকর্তৃক নাগর-ভাবীর সংরক্ষণার্থ, স্থানীয় ব্যয় ও অগস্ত্যেশ্বর-মন্দিরে পূজার জন্য 'পূলি' অগ্রহার প্রদানের পরিচয় আছে।—ঐ, xviii. 213, 218.

১১০২ শক. (১১৭৯ খ্রী.) সঙ্কম ৭ সিন্দ বিক্রমাদিত্যের রোন-লিপিতে 'রোণ' অগ্রহারের উল্লেখ আছে। উহাতে দেখা যায়, বিক্রমাদিত্য 'রোণ' অগ্রহারে কল্ল-মঠের আচার্য গুরুভক্তদেবের নিকট কল্ল-মঠের চামেশ্বর দেবতার পূজার্চনার জন্য ১২ মত্তর ভূমি ও স্থানীয় মালেশ্বর দেবতার পূজার জন্য ২ মত্তর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন।—ঐ, xix 227, 235-6.

১১৮৯ খ্রী. কলচূর্য ভিল্লমের মুৎগি-লিপিতে 'মুত্তগে' (বর্তমান মুৎগি) নামক সুবৃহৎ অগ্রহারের পরিচয় পাওয়া যায়। এই অগ্রহার কুণ্ডলদেশে তদ্দবাডিনাডের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইহা পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।—ঐ, xv. 33; *Dynasties of the Kanarese Districts,* 518, 520.

১১১৪ শক. (১১৯৪ খ্রী.) ২য় ভোজরাজের কোলহাপুর-শিলালেখে দেখা যায়, নায়ক লোকণের পুত্র নায়ক কালিয়ণ চারি জন ব্রাহ্মণকে তালুরগেখোল্লের অন্তর্গত 'পৌব' অগ্রহার হইতে কিছু সম্পত্তি ও অন্যত্র কিছু ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন।—*EI,* iii. 215.

মল্লিদেবের বা মল্লপদেবের ১১১৭ শক. (১১৯৪-৫ খ্রী.) ও ১১২৪ শক. (১২০২ খ্রী.) পীঠপুরম্-লিপিতে 'মুডিবেমু' অগ্রহারের উল্লেখ আছে। ইহা বিষ্ণুভট্ট সোমযাজীর অধিকারভুক্ত ছিল। মল্লিদেবের পূর্ব-পুরুষ বিজয়াদিত্য যখন দাক্ষিণাত্যে ত্রিলোচন-পল্লবের সহিত যুদ্ধে নিহত হন তখন তাঁহার প্রধানা মহিষী ছয় মাস গর্ভবতী ছিলেন, তিনি এই অগ্রহারে আগমন করেন এবং এখানে তাঁহার বিষ্ণুবর্ধন নামক পুত্র জন্ম-গ্রহণ করেন।—ঐ, iv. 145, 239.

১১৭২ শক (১২৪৯-৫০ খ্রী.) গণপাম্বার (কাকতীয় নৃপতি গণপতির কন্যা) মোনমদললিপিতে লিখিত আছে যে, তাঁহার স্বামী বেতরাজের পিতামহ কেতরাজ বের্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে ৭০টি অগ্রহার দান করিয়াছিলেন।—ঐ, iii. 94, 102.

১১৯১ শক. মৎস্যবংশীয় অর্জুনের দিব্বিদ-তাম্রলেখে তৎপিতা জয়ন্তের পুণ্যার্থ ও পিতার নামানুসারে 'জন্বিবদি' অগ্রহার ব্রাহ্মণদিগকে দানের বিষয় আছে। দুইটি অংশ শিব ও বিষ্ণু দেবতার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া বাকী অংশ তিনি রাজপুরোহিত ও অন্য ১৯ জন ব্রাহ্মণকে দান করেন। তবে এই গ্রামের ব্যয়াদি-নির্বাহের জন্য অগ্রহারিকদের উপর কর ধার্য করা হইয়াছিল, কিন্তু মন্ত্রী পেদ্দনকে পূর্ব প্রদত্ত ৮ দ্রোণ পরিমাণ ভূমির (শস্য-ক্ষেত্রের) কর হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়।—ঐ, v. 107, 109.

১২৫৯ শক. নাময়-নায়কের দোনেপুণ্ডি-তাম্রলেখে তৎকর্তৃক বেদ ও

শাস্ত্রবিদ্ ভারদ্বাজ-গোত্রীয় গণপতিকে অষ্টভোগ ঐশ্বর্যের অধিকারসহ 'দোনেপূণ্ডি' অগ্রহার প্রদত্ত হয়।—ঐ, iv. 357.

১৩৪৫ খ্রী. মাদ্রাজ-মিউজিয়মে রক্ষিত বেম-প্রদত্ত লিপিতে মুসলমান-অধিকৃত ব্রাহ্মণ অগ্রহারসমূহের পুনরুদ্ধারের বিষয় লিখিত আছে।—ঐ, viii. 9, 10, 11.

১২৭৮ শক. ২য় সঙ্গমের বিট্রগুণ্টশাসনে দেখা যায়, সঙ্গম পূর্বসমুদ্র-তীরবর্তী পাকবিষয়ের ৩ যোজন দক্ষিণে বিট্রগুণ্ট (বা বিট্রকুণ্ট) গ্রাম 'শ্রীকণ্ঠিপুর' নামে ও মুলিকিদেশের অন্তর্গত পেন্নানদীর তীরবর্তী 'সিঙ্কেসরি' অগ্রহার ২৮ জন ব্রাহ্মণকে দান করেন। সিঙ্কেসরি অগ্রহারে পুররিপু শিবের পুষ্পাচল-মন্দির অবস্থিত ছিল।—ঐ, iii. 33-4.

১২৯৬ শক. (১৩৭২ খ্রী.) অন্ন-বেমের নড়ুপূরু-অনুশাসনে দেখা যায়, অন্নবেম তদীয় ভগিনী বেমসানীর পুণ্যার্থ কোনস্থালবিষয়ে নড়ুপূরু গ্রাম 'বেমপুর' নামে ২০ ভাগে অগ্রহার দান করেন।—ঐ, 291-2.

১৩০০ শক. (১৩৮০ খ্রী.) এই অন্ন-বেমের বনপল্লি-লিপিতে লোহিত-গোত্রীয় অমাত্য মল্লয়ের পুত্র ইম্মডিকে গৌতমীর পূর্বতীরে অগ্রহার প্রদানের পরিচয় আছে। এই অগ্রহারের নাম 'ইম্মডিলক' বা 'অন্নবেমপুর' (বর্তমান গোদাবরী নদীর শাখা গৌতমীর দক্ষিণতীরবর্তী বনপথের উত্তরে ইম্মডিবারিলঙ্ক গ্রাম) রাখা হয়। ইম্মডিও মন্ত্রী হইয়াছিলেন।—ঐ, 60, 64-5.

১৩০৮ শক. (১৩৮৭ খ্রী.) বিরুপাক্ষের সোরেক্কবুর-তাম্রলিপিতে সোরেক্কবুরের অন্তর্গত একটি গ্রাম ও ৫ বেলি ভূমি অগ্রহাররূপে ১৪ জন ব্রাহ্মণকে দানের বিষয় লিখিত আছে।—ঐ, viii. 305-6

১৩২৫ শক. ৩য় চোড়ের পঞ্চবীরলস্তম্ভলিপিতে দেখা যায়, রাজা উপেন্দ্র 'চোড়মল্ল' নামক অগ্রহার প্রদান করিয়াছিলেন।—ঐ, xix 172.

১৩২৬ শক. বিজয়নগরাধিপতি ২য় [illegible] ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রহার দান করিয়াছিলেন। ইহার এক পক্ষকাল পূর্বে তাঁহাকে মন্দিরের জন্য ভূমিদান করিতে দেখা যায়।—No 11, Tirthahalli Tk., Shimoga. Dt. EC; No. 25, Koppa Tk., Kadur Dt., EC.

১৩২৭ শক. বিজয়নগরাধিপতি বিরূপাক্ষও একটি অগ্রহার দান করেন। —No. 196, Tirthahalli Tk., Shimoga Dt., EC.

১৩৩৩ শক. (১৪১১-২ খ্রী.) রাজা কুমারগিরির মন্ত্রী কাটয় বেমের তোত্তরমুড়িতাম্রলেখে লিখিত আছে, কাটয়-বেম তাঁহার পত্নী ও কুমারগিরির ভগিনী মল্লাম্বা বা মল্লাম্বিকার নামানুসারে কোন দেশের অন্তর্গত মুক্তীশ্বরের নিকটবর্তী বৃদ্ধ-গৌতমীর তীরে 'মল্লবরম্' অগ্রহার কাণ্ব-শাখার কাশ্যপ-গোত্রীয় অপ্পয়ার্যের পৌত্র ও অহোবলের পুত্র নৃসিংহকে দান করিয়াছিলেন।—*EI*, iv. 320.

মাদ্রাজ-মিউজিয়মে রক্ষিত শ্রীগিরিভূপালের ১৩৪৬ শক. তাম্রলিপিতে দেখা যায়, কাশ্যপগোত্রীয় গোবিন্দ পণ্ডিতের পুত্র আয়ুর্বেদ ও বেদাঙ্গবিদ বৈদ্য ও রম্ভামযূর নামক নগরের অধিবাসী ব্রাহ্মণ সম্পৎকুমার রাজা বিজয়ভুজের নিকট হইতে কাবেরীপাক নদীর শাখা নাগকুল্যার তীরবর্তী অগ্রহাররূপে প্রাপ্ত শস্যশালী 'নীপতটাক' গ্রাম অন্যান্য বহু ব্রাহ্মণদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। এই গ্রাম বিজয়রাটপুর বা বিজয়রায়পুর নামেও অভিহিত। তিনি ইহাকে ৫২টি অংশে বিভক্ত করেন; তন্মধ্যে দুইটি অংশ শিব ও বিষ্ণুর মন্দিরের জন্য ও একটি 'কামাক্ষী-ধর্মমণ্ডপে' বাৎসরিক ভোজনের জন্য নির্দিষ্ট করেন; অবশিষ্টগুলির মধ্যে ২২টি অংশ নিজের ছয় পুত্রের জন্য রাখিয়া বাকী অংশ নিজ ভ্রাতা, আত্মীয় ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করেন। সকলকেই এই অংশসমূহ অগ্রহারের সর্বস্বত্বদ্বারা ভোগ করিবার অধিকার দেওয়া হয়।—ঐ, viii. 315-7.

বিজয়নগরাধিপতি ২য় দেবরায়ের ১৩৪৬ শক. (১৪২৪ খ্রী.) সত্যমঙ্গলম্-অনুশাসনে দেখা যায়, দেবরায় মরতকপ্রান্ত-দেশের অন্তর্গত আন্দ-নাড়ু-(বা আন্তু-নাড়ু-) বিষয়ে ও তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে 'চিটেয়াট্যুরু' অগ্রহার ৮ জন ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন।—ঐ, iii. 33, 45 ; *IA*. xiii. 132.

১৩৪৯ শক. বিরূপাক্ষের সোমলাপুরম্ তাম্রশাসনে দেখা যায়, বিরূপাক্ষ হগরী নদীর পশ্চিমতীরে মুডা-নাড়ুর অন্তর্গত 'যম্মেগেনূরু' অগ্রহার নিট্টূরের অধিবাসী সারঙ্গার্যপুত্র বেদ, সাঙ্খ্য ও মীমাংসা-দর্শনে পণ্ডিত ও 'ভাষ্যভূষা'-রচয়িতা জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি রসেশ্বর-

পুত্র ব্রাহ্মণ বৈশু বিরূপাক্ষার্যকে 'কৃষ্ণ-তটাক', 'করিয়কেরে' ও 'চিটুকনাহালু' অগ্রহার প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি সোমলাপুরম্ গ্রাম 'বিরূপাক্ষপুরম্' নামে বীরনার্য নামক একজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। বীরনার্য আবার তাঁহার অগ্রহার ৬০টি-বৃত্তিতে বিভক্ত করিয়া অন্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দান করিয়াছিলেন। তিনি যাঁহাদের বৃত্তি দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ৪ জনের নাম পাওয়া যায়।—*EI*, xvii. 197, 204.

১৩৫২ শক. (১৪৩১ খ্রী.) অল্লয়দোড্ডের কোন্ধুরু-লিপিতে তৎকর্তৃক 'অল্লাড়রেড্ডিদোড্ডবরম্' অগ্রহার ব্রাহ্মণদিগকে দানের উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত অল্লয়দোড্ড 'প্রসন্নবল্লভ' নামক বিষ্ণুমন্দির এবং 'ব্রহ্মনাগেশ্বর' নামক শিবমন্দিরের জন্য অগ্রহার উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অতঃপর গ্রাম-গ্রাসার্থ' তিনি 'অন্নবরম্' নামক গ্রাম দান করেন, তবে উহা হইতে ৪॥ খারি ভূমি তিনি উড়লামাতাপুত্র নারনমন্ত্রীকে অর্পণ করেন।—ঐ, x. 67-9.

১৪৩৭ শক. বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণ রায়ের অমরাবতী-লিপিতে কৃষ্ণবেণী (কৃষ্ণা) নদীতীরে অমরাবতীর অমরেশ-মন্দিরে শূলপাণি বিগ্রহের সমক্ষে 'তুলাপুরুষ' দানের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বহু অগ্রহারদানের পরিচয় আছে।—ঐ, vii. 20.

বিজয়নগররাজ কৃষ্ণরায়ের ১৪৪৬ শক. পেয়লবণ্ড-তাম্রলেখে সর্বশাস্ত্রবিদ্ জিতেন্দ্রিয় বোধায়ন-সূত্রের অগস্ত্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ নৃসিংহাদ্বরিকে 'পেয়ল-বণ্ড' গ্রাম 'কৃষ্ণরায়পুরম্' অগ্রহার নামে দানের পরিচয় পাওয়া যায়।—ঐ, xix. 132-4.

১৫২০ শক. (১৫৯৮ খ্রী.) ১ম বেঙ্কটের পদ্মনেরী-তাম্রলেখে দেখা যায়, নাগ-পুত্র বিশ্বনাথ তিরুবদি-রাজ ও পাণ্ড্য বাণদরায়কে পরাজিত করিয়া মাদুরা অধিকার করিবার পর রাজা কৃষ্ণনায়ক মাদুরায় বহুবিধ দানের অনুষ্ঠান করেন। উহার সহিত তিনি ৪৩ জন শাস্ত্রবিদ্ বিভিন্ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণকে পদ্মনেরী গ্রাম 'তিরুমলাম্বাপুরম্' নামে অগ্রহার দান করেন। এই সমুদয় ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই দূরবর্তী স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন।—ঐ, xvi. 288-91.

১৫২০ শক. (১৫৯৮ খ্রী.) এই বেঙ্কটের বেল্লঙ্গুড়ি-অনুশাসনে দেখা

যায়, নায়ক কৃষ্ণ-মহীপতির অনুরোধে বেঙ্কটপতিদেবমহারায় 'বীরভূপ-সমুদ্রম্' অগ্রহার দান করেন। এই অগ্রহারবৃত্তি বহু ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়; কয়েক-জন ব্রাহ্মণ রমণীও ইহাতে অগ্রহার-বৃত্তি পাইয়াছিলেন। অনুশাসনে লিখিত আছে যে, ঐ অগ্রহার ২৬১টি বৃত্তিতে বিভক্ত করা হয়, এবং সেই বৃত্তিগুলি আবার ৫টি স্বতন্ত্র অংশ-ভুক্ত করিয়া ১৩০৫টি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছিল। এইরূপে অংশানুযায়ী অগ্রহার দান করা হয়। প্রত্যেকের বৃত্তিই প্রত্যেকের জীবন-ধারণের পক্ষে যথেষ্ট। আবিষ্কৃত অনুশাসনের মধ্যে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মাত্র ১৮২টি বৃত্তি ও ১টি অংশের পরিচয় পাওয়া যায়।—ঐ, 300-2, 307-12.

২৯২ [কলচুরি] সং সংঘ-সিংহের সুনাওকল-লিপিতে ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রহার-প্রদানের পরিচয় আছে।—ঐ, x. 76.

হর্ষবর্ধনের[৩] ২৫শ রাজ্যাঙ্কে মধুবন-তাম্রলিপিতে দেখা যায় যে, তিনি ব্রাহ্মণ বামরথ্যের অধিকারভুক্ত সোমকুণ্ডকা নামক গ্রাম হস্তগত করিয়া উহা সাবর্ণিগোত্রীয় সামবেদী (ছান্দোগ্য) ব্রাহ্মণ ভট্ট বাতস্বামী এবং বিষ্ণুবৃদ্ধ-গোত্রীয় বহ্বৃচী (ঋগ্বেদীয়) ব্রাহ্মণ ভট্ট শিবদেব-স্বামীকে প্রদান করেন।—ঐ, vii. 159-60.

বীর-চোড়ের ২৩ রাজ্যাঙ্কে পীঠপুরম্-লিপিতে উত্তরাবক্স জেলার অন্তর্গত মালবেল্লি, পোম্নতোর্‌র ও আলমি নামক তিনটি গ্রাম 'বীর-চোড়চতুর্বেদিমঙ্গল' নাম দিয়া ৫৩৬ ভাগে অগ্রহাররূপে দানের কথা আছে। তন্মধ্যে বৈয়াকরণ, মীমাংসাকার, বেদান্তব্যাখ্যাতা, ঋগ্বেদ-অধ্যাপক, যজুর্বেদ-অধ্যাপক, সামবেদ-অধ্যাপক, রূপাবতার-(?) অধ্যাপক, পুরাণ-ব্যাখ্যাতা, বৈদ্য, পরামাণিক, বিষ-বৈদ্য ও জ্যোতিষী—প্রত্যেককে একটি করিয়া অংশ দেওয়া হয়। এছাড়া ১২টি অংশ কার্যালয়-পরিচালকদিগকে, ২টি অংশ গ্রামমধ্যবর্তী বিষ্ণুমন্দিরে, গ্রামের পশ্চিম দিকের বিষ্ণুমন্দিরে ২টি, ২টি অংশ শ্রীকৈলাসদেবমন্দিরে এবং ১টি অংশ স্থানীয় অন্যান্য দেবতার জন্য প্রদান করা হয়।—ঐ, v. 96-9.

১০০ হর্ষ-সং মহোদয়ের ১ম ভোজদেবের দৌলতপুর-লিপিতে দেখা যায়, ভোজদেবের প্রপিতামহ বৎসরাজদেব ভট্ট হর্ষুকের পিতামহ আশ্বলায়ন-

শাখার অন্তর্ভুক্ত কাশ্যপ-গোত্রীয় ভট্ট বাসুদেবকে গুর্জরত্রা দেশের ঢেণ্ড্‌বানক বিষয়ে 'শিবা' অগ্রহার দান করিয়াছিলেন। এই ভট্ট বাসুদেবই আবার বাসুদেবের পিতামহ নাগভট্টদেবের অনুমতি লইয়া আশ্বলায়ন-শাখার অন্তর্ভুক্ত কাত্যায়ন-গোত্রীয় ভট্ট বিষ্ণুকে উহার একষষ্ঠাংশ প্রদান করেন। কিন্তু বাসুদেব পূর্ব অধিকার নাকচ করিয়া বর্তমান আজ্ঞপ্তি-অনুসারে উহা ভট্ট বাসুদেব ও ভট্ট বিষ্ণুর বংশধরদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন।—ঐ, 212-13.

শালোট্‌গি-স্তম্ভলিপির শাসনে দেখা যায়, শিলহার-নৃপতি গোবুণরস 'পাবিট্টগে' (বর্তমান শালোট্‌গি) অগ্রহার দান করিয়াছিলেন।—ঐ, iv 59, 66 ; *IA*, i 206.

কলিঙ্গাধিপতি চন্দ্রবর্মার ৬ষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে কোমর্তি-শাসনে তৎকর্তৃক 'কোহেতুর' নামক গ্রাম বাজসনেয়-শাখার ভারদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ দেবশর্মাকে অগ্রহার দান করার উল্লেখ আছে।—*EI*, iv. 145.

চালুক্যরাজ ২য় অম্মরাজের বন্দ্রম্‌-তাম্রলেখ (কাল অজ্ঞাত) কুপ্পনামাত্যকে তৎকর্তৃক প্রান্দরুর নিকটবর্তী তাণ্ডেরু গ্রাম 'বেটিপুণ্ডি' নামে নিষ্কর অগ্রহার-প্রদানের পরিচয় আছে। উহার সহিত তাঁহাকে সুবর্ণও দান করা হইয়াছিল। কুপ্পনায্য অম্মরাজের অমাত্য ও সামন্ত ছিলেন। তিনি বিপ্রনারায়ণ নাম ব্যবহার করিতেন এবং দ্রাক্ষারামে শিবমন্দির নির্মাণ করিয়া তথায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।—ঐ, ix 132-3.

মাদ্রাজ-মিউজিয়মে রক্ষিত গঙ্গ-নৃপতি দেবেন্দ্রবর্মার গঙ্গরাজ্যের ১৮৩ বর্ষে চিকাকোল-তাম্রলেখে দেখা যায়, তিনি কলিঙ্গনগরবাসী ছান্দোগ-শাখার ৬ ভ্রাতাকে (ইঁহারা ব্রাহ্মণ) ক্রোষ্টুকবর্তনীর অন্তর্গত সরোমটম্বে 'পোপ্পঙ্গিক' অগ্রহার দিয়াছিলেন।—ঐ, iii. 131.

রাষ্ট্রকূট-নৃপতি ২য় অম্মরাজের বেমলূর্পাডু-তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে, অম্মরাজ তদীয় সামন্ত বা রাজ-বিষয়ের পারদর্শক দুর্গরাজের অনুরোধে দুর্গরাজের মন্ত্রী ভারদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ মুসিয়নশর্মাকে কর্মরাষ্ট্রের অন্তর্গত অণ্‌মণঙ্গুরু ও অণ্ডেকি গ্রামদ্বয়ের কিয়দংশ লইয়া 'কারংচেডু' ও 'বঙ্গিপরু' নামে অগ্রহার দান করেন।—ঐ, xvii. 228, 234-5.

হস্তিবর্ম্মার ৮০শ রাজ্যাঙ্ক উর্লম্ব-তাম্রলেখে উরামল্লের অধিবাসী জয়-শর্ম্মাকে তৎকর্তৃক ক্রোষ্টুক-বর্তনীর অন্তর্গত 'হোণ্ডেবক' অগ্রহারদানের পরিচয় পাওয়া যায়।—ঐ, xvii. 331, 334.

শুভাকরের ৮ম রাজ্যাঙ্কে নেউলপুর-তাম্রলেখে দেখা যায়, তিনি পাঞ্চাল ও বুভ্যুদয়-বিষয়ের অন্তর্গত কোম্পবাক ও দণ্ডাঙ্কিয়োক নামক গ্রামদ্বয়কে 'সলোণপুরাধিবাস' অগ্রহাররূপে নামাঙ্কিত করিয়া বহু ব্রাহ্মণকে দান করেন। ঐ ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন গোত্রীয় এবং তাঁহাদের 'চরণ'ও বিভিন্ন—তাঁহারা সকলেই চতুর্বেদে পারদর্শী। তাঁহাদের সর্বপ্রকার কর হইতে অব্যাহতি ('অকরত্বেন') দেওয়া হইয়াছিল।—ঐ, xv. 5-8.

সুন্দর-চোলের ৪র্থ রাজ্যাঙ্কে অণবিল-তাম্রশাসনে জৈমিনি-সূত্রের আবেণিকগোত্রীয় মন্ত্রী অনিরুদ্ধকে অলন্দুরপ্রদেশে নল্‌খিলাঙ্কুডির অন্তর্গত 'করুণাকর-মঙ্গলম্' অগ্রহার দানের বিষয় লিখিত আছে। এই গ্রামে ১০ বেলি পরিমাণ ভূমি ছিল। এই গ্রাম 'প্রেম' নামক অগ্রহাররূপেও কথিত হয়। সুন্দর-চোল অনিরুদ্ধকে অগ্রহারদানের সহিত 'ব্রহ্মাধিরাজ' উপাধি দান করেন।—ঐ, 69-70.

লোকনাথের ৪৪শ রাজ্যাঙ্কে ত্রিপুরা-তাম্রলেখে ব্রাহ্মণ প্রদোষশর্ম্মাকে লোকনাথের পিতামাতার ও নিজের পুণ্যকার্যে সহায়তা করার জন্য এবং স্থানীয় ভগবান্ অনন্তনারায়ণ দেবতার পূজার জন্য 'পঙ্গ' ও 'বাপিকা' নামক দুইটি অগ্রহারদানের উল্লেখ আছে। এই দানের সাহায্য করার জন্য এতৎসহ আরও অনেককে অগ্রহার-বৃত্তির অংশ দেওয়া হয়। —ঐ, 311-5.

ভাস্করবর্ম্মার নিধনপুর-তাম্রশাসনে (কাল অজ্ঞাত) ভূতিবর্ম্মা-কর্তৃক বিভিন্ন গোত্রীয় বহু ব্রাহ্মণকে চন্দ্রপুরী-দেশে 'ময়ূরশালমল' অগ্রহারদানের পরিচয় আছে। সম্ভবত ইহা কর্ণ-সুবর্ণের নিকটবর্তী ছিল।—ঐ, xix. 115-7, 121-5, 246.

কহ্লণ[4]কৃত 'রাজতরঙ্গিণী'তে বহু অগ্রহারদানের (বিশেষত ব্রাহ্মণ-দিগকে) পরিচয় আছে। উহাদের কয়েকটির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

দাতা	অগ্রহার	শ্লোক
রাজা মহাবাহু	লেবার[২]	১.৮৭
" কুশ	কুরুহার	১.৮৮
" খগেন্দ্র	খাগি, খোনমূষ	১.৯০
" গোধর	হস্তিশালা	১.৯৬
" জনক	...	১.৯৮
" শচীনর	শমাঙ্গ, আসশনার	১.১০০
" অশোক	বারবাল ই.	১.১২১
" অভিমন্যু	কণ্টকোৎস	১.১৭৫
" মিহিরকুল	...	১.৩০৭
" গোপাদিত্য	খোল, খাগিকা. হাড়িগ্রাম[৩], স্কন্দপুর শমাঙ্গ, অসমুগ, গোপ[৪], বশিচক ই	১.৩৪০-১ ৩৪৩
রানী বাক্‌পুষ্টা	কতীমুষা, রামুষা	২,৫৫
রাজা জয়ন্ত[৫]	...	৩.৩৭৬
" রণাদিত্য[৬]	...	৩,৪৮১
মন্ত্রী হনুমান্	...	৪.৯
যুবরাজ শূরবর্মা	খাধুয়া, হস্তিকর্ণ, পঞ্চহস্তা	৫.২৩-৪
রাজা চক্রবর্মা	হেলু[৭]	৫.৩৯৭
" যশস্কর	৫৫টি অগ্রহার[৮]	৬.৮৯
" অনন্তদেব[৯]	...	৭.১৪২
রানী সূর্যমতী	১০৮টি অগ্রহার[১০]	৭.১৮৪-৫
রাজা মহীপতি	...	৭.৬০৮

এতদ্ব্যতীত ৪.৬৩৯ শ্লোকে দেখা যায়, রাজা জয়াপীড় 'তুলমুল্য' অগ্রহার বাজেয়াপ্ত করিয়া অপর কয়েকজন ব্রাহ্মণকে ভোগ করিবার অধিকার দেন।

৫.১৭০ শ্লোকে আছে, রাজা শঙ্করবর্মা দেবপূজার জন্য প্রদত্ত অগ্রহার-সমূহ হইতে বলপূর্বক কর আদায় করিয়াছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অগ্রহার সাধারণত ব্রাহ্মণপল্লীতেই পরিণত হইত। এখনও দাক্ষিণাত্যে অনেক ব্রাহ্মণপল্লী দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদের 'গ্রামম্' বা 'অগ্রহারম্' বলা হয়। উহাদের উৎপত্তির মূলে অগ্রহারদানের আভাস পাওয়া যায় না। ইহাতে মনে হয়, উত্তরকালে দাক্ষিণাত্যের কয়েকস্থানে অগ্রহার ব্রাহ্মণপল্লীরই নামান্তরে পরিণত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে কোচিনরাজ্যের অন্তর্গত চিত্তুর তালুকে যে গ্রামে তামিল ব্রাহ্মণগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করে তাহাকে 'অগ্রহার' বলিতে দেখা যায়। এই অগ্রহারপল্লীর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। উহাতে একটি অথবা সমপর্যায় দুইটি বা ততোধিক শ্রেণীর গৃহ থাকে; উহাদের এইসকল গৃহের সহিত একটি মন্দির ও একটি পুষ্করিণীও থাকে। পল্লীসাধারণের ব্যবহারার্থ পথিমধ্যে অনেক কূপও দেখা যায়। এই পল্লীর চতুর্দিক ব্রাহ্মণেতর জাতি-সমূহের পল্লী দ্বারা বেষ্টিত। এই সীমান্তবর্তী পল্লীবেষ্টনীকে 'তরাই' বলা হয়। তরাইএ সর্বাধিক ধনী হইতে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র সকলেই একত্র বাস করে। এই পল্লীরও একটি স্বতন্ত্র মন্দির থাকে—উহার নাম 'কবু'। কবুতে সকলেরই সমভাবে পূজার অধিকার আছে। তরাইবেষ্টিত অগ্রহারপল্লী বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে উচ্চ ভূমিতে নিকটস্থ কোন গিরির ঢালুস্থানে থাকিতে দেখা যায়। ইহাতে শস্যক্ষেত্রে জল নামিতে পারে এবং চাষের সুবিধা হয়। অগ্রহারপল্লীর গৃহগুলি সমস্তই এক প্রকারের। পথ হইতে গৃহে আসিলে প্রথমেই বারান্দা পড়ে—বারান্দা গৃহের প্রস্থের মাপের মত করিয়া নির্মিত হয়। বারন্দার পরে একটি ছোট ঘর পাওয়া যায়—উহার নাম 'নেলি'। নেলির দক্ষিণ দিকে একটি ধানের মরাই থাকে। নেলির মধ্য দিয়া একটি ছোট উন্মুক্ত উঠানে পড়া যায়। এই উঠানের চতুর্দিকেই গৃহ। ইহার দক্ষিণে আর একটি বড় ঘর আছে। উহার পূর্বের ঘর হইতে একটি দীর্ঘ জানালায় বেড়া দিয়া বিভক্ত। রন্ধনগৃহের সম্মুখে একটি বাগান। বাগানের অপর পার্শ্বে গোয়াল ঘর। সাধারণত এইরূপ গৃহ একতলাই হয়।[১১]

উত্তর আর্কটপ্রদেশে একটি অগ্রহার ব্রাহ্মণপল্লী দেখিতে পাওয়া যায়;

গ্রামটির আয়তন প্রায় ২৮ একর। ব্রাহ্মণগণ পল্লীর মধ্যেই বাস করে এবং ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহ পল্লীর বাহিরে পূর্ব, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমসীমায় অর্ধ-বৃত্তাকার পল্লী রচনা করিয়া একত্র বাস করিয়া থাকে।[১২]

পূর্বকালে এইরূপ কয়েকটি অগ্রহারপল্লীতে গ্রামবৃদ্ধগণ সমবেত হইয়া বিধিব্যবস্থার প্রচলন করিতেন। মন্দির ও পল্লীসংক্রান্ত সমুদয় সাধারণ ব্যাপার প্রধান ব্যক্তিগণের নিকট উপস্থাপিত করা হইত; তাঁহারা সম্মিলিত হইয়া উহার বিচার করিতেন এবং সাধারণত এই বিচার চরম বলিয়া বিবেচিত হইত। যদি কোন ব্যক্তি অসৎ আচরণ বা কোন অসৎ কার্যের জন্য অভিযুক্ত হইত, তাহা হইলে তাহাকে প্রধান ব্যক্তিদের সম্মিলনে বিচারের জন্য উপস্থিত হইবার নিয়ম ছিল। তথায় দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহাকে যথোপযুক্ত জরিমানা দিতে হইত। দোষ জটিল বা গুরুতর হইলে তাহাকে রাজার নিকট লইয়া যাওয়া হইত এবং রাজাই তাহার চরম বিচার করিতেন। কেহ ব্যভিচার করিলে তাহার উপর নানারূপ সামাজিক বিধি-নিষেধ চালাইয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইত এবং সময় সময় তাহাকে সমাজ হইতেও বিতাড়িত করা হইত। বর্তমানকালে অগ্রহারপল্লীর এই প্রাচীন ব্যবস্থা প্রায় লোপ পাইয়াছে এবং আজকাল কেহই এই বিচারকে গ্রাহ্য করে না।[১৩]

পাদটীকা

১ বো-রো.—অগ্রহার শব্দ দ্র.। P. K. Acharya: Dictionary of Hindu Architecture.

২ লেদরী নদীর তীরবর্তী।

৩ বর্তমান আরিগোম।

৪ এই অগ্রহার গোপ পর্বতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। গোপাদিত্য এখানে 'জ্যেষ্ঠেশ্বর' দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন।

৫ রাজা জয়ন্ত স্বনামাঙ্কিত অগ্রহার দান করেন।

৬ মাধবার্য ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত।

৭ নীচজাতীয়া পত্নী হংসীর পিতা রঙ্গকে প্রদত্ত।

৮ এই অগ্রহারগুলি বিতস্তা নদীর তীরে অবস্থিত।

৯ অনন্তদেবের পত্নী রানী সূর্যমতীর অনুজ কল্লনকে প্রদত্ত।

১০ বিজয়েশ্বরের মঠে সুধী ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত। সূর্যমতী অমরেশ মন্দিরেও পতির নামে অগ্রহার স্থাপন করেন।

১১ Gillbert Slater (ed.): *Some South-Indian Villages*, i. 123.

১২ ঐ, i. 88.

১৩ *Cochin Tribes & Castes*, ii. 316.

প্রসঙ্গ-কথা

1 নীলকণ্ঠ (সূরী) (১৬শ .খ্রী. শতাব্দী) : মহাভারতের টীকাকার। দাক্ষিণাত্যে জন্ম। ইনি গোবিন্দ সূরীর পুত্র। দাক্ষিণাত্যে মহাভারতের ওপর 'ভারতভাবদীপ' নামে টীকা প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ এঁকে শৈব বলে থাকেন।—সনৎসু.

2 Sewell, Robert (1845—?) : প্রাচ্যতত্ত্ববিদ। মাদ্রাজে সিবিল সার্ভিসে যোগদান (১৮৬৮—৯৪), বেলারীর জজ ও কালেকটর। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার অন্যতম প্রবর্তক (১৮৮১—০১)। বহু গ্রন্থ লেখেন—Analytical History of India (1870), The Amravati Tope and Excavations on its site in 1877, Antiquities Remains in Presidency of Madras (1882) ই.।—*BDIB*.

3 হর্ষবর্ধন (মহারাজ হর্ষবর্ধন) (৬০৬—৬৪৮ খ্রী.) : দিগ্বিজয়ী সম্রাট্। স্থানেশ্বরাধিপতি প্রভাকরবর্ধনের পুত্র। রাজ্যসীমা পূর্ব-পঞ্জাব হতে বিহার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত। ইনি প্রথমে শিব ও সূর্যের উপাসক পরে বৌদ্ধধর্মে অনুরাগী। নিজে সুকবি ও সুপণ্ডিত। গ্রন্থ-রত্নাবলী, নাগানন্দ, প্রিয়দর্শিকা।

4 কহ্লণ (১২ শতাব্দী) : কল্হণের প্রকৃত নাম কল্যাণ মিশ্র। পিতা—চম্পক (কাশ্মীরপতি হর্ষের অমাত্য)। 'জন্ম—কাশ্মীরের পরিহাসপুরে। ইনি ১০৭৪ শক অর্থাৎ ১১৪৮ খ্রী. বর্তমান ছিলেন। কাশ্মীররাজ হর্ষের কাছে ও পরে জয়সিংহ দেবের আশ্রিত ছিলেন। রাজা জয়সিংহের সময়ে এঁর প্রসিদ্ধ প্রামাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'রাজতরঙ্গিণী' রচিত হয়।—জী-কো.

সভাসমিতির কথা

আজ দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য দেশের যুবকবৃন্দ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। এখন আর বক্তৃতার যুগ নাই, অনুষ্ঠানের যুগ আসিয়াছে। যুবকগণ লাগিয়া পড়িয়া কর্মে উদ্যুক্ত হইয়াছে। সকল দেশের যুবকেরাই দেশের মেরুদণ্ড, দেশের আশা-ভরসা ; দেশের সর্ববিধ উন্নতির অপরিসীম শক্তি যুবকের স্বাস্থ্যে যুবকের প্রাণেই রহিয়াছে। যৌবনের অপরিমেয় শক্তি না হইলে বিশ্বের গঠন হয় না। সেইজন্য যুবকদের কাছে আমরা প্রত্যাশা করি না, এমন কোনও কাজ নাই। কি করিয়া যে সকল কাজে সকল দিকে যুবকদিগের চিন্তাশক্তি, কর্মশক্তি ও সংহতিশক্তি সম্মিলিত করিতে পারা যায়, দেশের নানা অবস্থার ভিতর দিয়া তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। এখন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার দিন। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত চিন্তাশক্তি এবং কর্মশক্তির শোচনীয় পরিণাম কি তাহা আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতে নবীন ও প্রাচীন ইতিহাসে সংহতিশক্তির জয়ই আমরা দেখিতে পাই। ধর্ম-প্রচারে, সমাজ-সংস্থাপনে, রাজনৈতিক অভ্যুদয়ে, কৃষি, শিল্পে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে ও বিজ্ঞানের আলোচনায় এই সংহতি-শক্তির দিব্য বিকাশ যে কোনো উন্নতিশীল জাতির মধ্যে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

খুব পুরাণ যুগের কথা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাক। তখন বৈদিক যুগ। আর্যরা কাবুল নদের উপত্যকা দখল করিয়াছেন। শতদ্রু

ও পঞ্জাবের ঈশান কোণ পর্যন্ত তাঁহাদের অধিকারে আসিয়াছে। তখনও তাঁহারা যমুনা ও গঙ্গানদীর কথা জানিতেন না ; যদি বা কিছু জানিতেন, তাহা জনশ্রুতিমূলক। কিছুকাল পরে তাঁহারা পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; সরস্বতী নদীর দুই দিকে বাসস্থান নির্মাণ করিলেন এবং ক্রমে গাঙ্গেয় ভূমির শীর্ষদেশ পর্যন্ত অধিকার করিলেন। তারপর তাঁহারা কুরু-পাঞ্চাল অধিকার করেন। আরও কিছু পরে তাঁহারা পূর্ব পথ ধরিয়া গণ্ডকের[1] দুই দিকে কোশল ও বিদেহ দুইটি ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করেন। পঞ্জাব, কুরুপাঞ্চাল এবং কোশল-বিদেহ—এই তিনটি আর্যভূমি হইয়া দাঁড়াইল। আর এই তিনটি স্থান হইতে সমগ্র উত্তর-ভারত আর্যভাবাপন্ন হইতে পারিয়াছিল। তখন আর্যদের সামাজিক গঠন এক নূতন জিনিস ছিল। আর্যদের এক-একটি বংশ স্বতন্ত্র থাকিত ; বংশগুলির লোকেরা এক অন্যে এক সঙ্গে থাকিত এবং তাহাদের পুরানো প্রথা বজায় রাখিয়া চলিত। কয়েক পুরুষ ধরিয়াই এই রকম চলিত। সকলেই অগ্নির পূজা করিত। এই সমস্ত বংশ বড় হইয়া জাতে পরিণত হইত। প্রথম প্রথম এই সমস্ত জাতেরা প্রায়ই পরস্পরে বিবাদ করিত। ক্রমে যখন বিবাদ থামিয়া সদ্ভাব আসিল দেশের লোকেরা শান্তি—আরাম পাইবার উপায় খুঁজিতে লাগিল।

এই সময় দেশ উন্নতিশীল হইয়া উঠিল, নানা বিষয়ে আদর্শ গড়িয়া তুলিল ; আর নানা দিক দিয়া সংহতিশক্তির নানাভাবে পরিচয় দিতে লাগিল। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে আমরা গোষ্ঠীবিহারের নাম শুনিতে পাই। প্রাচীন ভারতে লোকে গোষ্ঠীবিহার করিত ; নগরবাসীদের সকল কাজের মধ্যে গোষ্ঠীতে যাওয়া একটি কাজ ছিল, তা আবার যখন তখন নয়—প্রত্যহ। শহরের লোকের দেখাদেখি গ্রামের লোকেরাও গোষ্ঠী তৈরী করিতে ছাড়ে নাই। এই সমস্ত গোষ্ঠীর উপর নজর রাখিতেন ঋষিরা। দরকার মত দু'-চারটি কঠোর নীতিও তাঁহারা চালাইতেন। ঋগ্বেদের যুগে এই রকমই একটা অনুষ্ঠান ছিল ; তবে তাকে গোষ্ঠী না বলিয়া 'সভা', 'সমিতি' বলা হইত। সভাসমিতি দু'রকমের ছিল। রাজা, রাজ্য, রাজনীতি সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া যে সভ্য কাজ করিত তাহাকেও 'সভা', 'সমিতি' বলা হইত। আমরা আজ যে সভা-সমিতির কথা বলিতে

যাইতেছি, ইহা তাহারই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। কিন্তু সে সম্বন্ধে এখানে কোন কথা আজ বলিব না। সভা-সমিতির অপর একটি দিক্ ছিল আর তাহা সমাজ লইয়া। তাহারই কথা কিছু বলিব। এই সভা-সমিতি জিনিসটা এখনকার 'ক্লাবে'র মত কতকটা ছিল।

সভায় অনেক কাজের কথা হইত। গোরু ও চাষের উন্নতির জন্য আলোচনা হইত। আমোদ-প্রমোদের জন্য এখানে গান হইত, নাচ হইত, খেলাধূলা, গল্পগুজব হইত। 'মিউনিসিপ্যাল বোর্ড' 'লোক্যাল বোর্ড'এর কাজও সভা-সমিতি হইতে চলিত। ক্রমে এখানে অন্যান্য আমোদ-আহ্লাদেরও ব্যবস্থা থাকিত। তর্কযুদ্ধের বন্দোবস্ত থাকিত। তর্কে যিনি জিতিতেন তিনি পুরস্কার পাইতেন। তারপর সভাসমিতিতে ক্রমশ পুস্তক-বাচনেরও সূচনা হইল। পুস্তকের অংশবিশেষ লোকেরা মুখস্থ করিয়া সভাসমিতিতে আনন্দ-বিতরণ করিত। আমরা দেখিতে পাই, পরে বাৎস্যায়ন তাহার কামসূত্রে সন্ধ্যায় পুস্তকবাচনের কথা নির্দেশ করিয়াছেন। এই সময় নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে. পল্লীতে পল্লীতে সভা-সমিতি থাকিত। লোকেরা প্রতি সন্ধ্যায় আসিয়া আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিত। আমোদের মধ্যে পুস্তকবাচন পুথি মুখস্থ করিয়া আওড়ান একটি নিত্যকর্ম ছিল। তখন গ্রন্থশালাও থাকা সম্ভব; কারণ তখন গ্রন্থ ছিল, গ্রন্থের আলোচনাও ছিল। সভায় তর্কযুদ্ধ হইত, কবির লড়াই হইত। মাঝে মাঝে কাব্যকলার আলোচনার জন্য অধিবেশনও হইত। রচনাকুশল, তর্কনিপুণ ব্যক্তিদিগকে পুরস্কারও দেওয়া হইত। ইহাদেরই নাম হইত 'সভ্য'। সভার একদিকে রাজনৈতিক ব্যাপার ও অপর দিকে সামাজিক অনুশীলন হইত। এই সভায় একদল লোক সকল সময়েই থাকিত। ইহাদের কাজ ছিল বসিয়া বসিয়া পাশা খেলা। বাজি রাখিয়াও খেলা চলিত। সভার খেলোয়াড়দের মধ্যে পাশা খেলিয়া অনেকে ফতুরও হইত; তবে যারা পাশা খেলিত তাহাদের উপর লোকে সন্তুষ্ট থাকিত না। ইহারা সকল সময় সভায় থাকিত বলিয়া ইহাদের নাম হইয়া গিয়াছিল 'সভাস্থাণু'।

এই সভাগুলি দেশেরও অনেক কাজ করিত। এখান থেকে সময়ে সময়ে বিচারালয়ের কাজও হইত। ধর্ম, নীতি ও সমাজরক্ষার কাজও

হইত। রাস্তাঘাট তৈরী করা, এগুলি যাহাতে খারাপ না হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা এই সভার কর্তব্যের মধ্যেও গণ্য ছিল। নগরবাসীর স্বাস্থ্য-রক্ষার ও অসুবিধা নিবারণের জন্য সভার চেষ্টা বড় কম ছিল না। নগরে বা গ্রামে খানা-ডোবা যাহাতে অস্বাস্থ্যকর না হয় তাহার জন্য এই সকল সভায় আলোচনা হইত। নগরের জলনিকাশের পথ যাহাতে বন্ধ না হইয়া যায় তজ্জন্য সভা হইতে ব্যবস্থাও হইত। এই সভাই পরযুগে 'সমাজে' পরিণত হয়। নাম পৃথক্ হইলেও ইহার কাজও সভার অনুরূপ ছিল। 'সমাজ'ও এইরূপ দেশের উন্নতিবিষয়ক ছিল।

['প্রবুদ্ধ ভারত', আষাঢ়—? পৃ ২৯-৩০]

প্রসঙ্গ-কথা

1 গণ্ডক ঃ নদী। নেপাল থেকে উৎপন্ন হয়ে গোরক্ষপুর মধ্যে প্রবাহিত হয়ে বিহার প্রদেশের সারন জেলায় ঘর্ঘরা নদীর সহিত মিলিত হয়েছে।

সংস্কৃতি ও সাহিত্য

সাহিত্য সংস্কৃতির বাহন। যুগে যুগে দেশ-কাল-পাত্রভেদে যে সকল সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে সাহিত্যে তাহাদেরই নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায়। মানুষের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার মৃত্যু পর্যন্ত কত সমস্যাই তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, চিন্তাশীল মনীষিগণ সেই সকল সমস্যাসিদ্ধান্তের যে-ভাবে সমাধান করিয়াছেন, সকল সময়ের মধ্য দিয়া সাহিত্য সেগুলি বহন করিয়া আনিয়াছে। জগতে পরিবর্তনকে কেহ বাধা দিয়া রাখিতে পারে না। অবশ্যম্ভাবী এই পরিবর্তনের ভূয়িষ্ঠ চিত্র সাহিত্যে স্বতঃপ্রকটিত।

সকল ধর্ম ও সংস্কৃতি বাগর্থের ন্যায় নিত্য-সম্বন্ধ। তাই আমাদের দেশে সংস্কৃতির বাহন সাহিত্য ধর্মকে লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই গঠনযুগে ধর্মই সাহিত্যের প্রাণ ছিল। এইরূপ হইবার কয়েকটি কারণের মধ্যে প্রধান একটি কারণ ছিল এই যে, প্রাচীন ভারতে লেখাপড়া ও সংস্কৃতি কোনদিন এক বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; নিরক্ষরতাও তাচ্ছিল্যের সূচনা করে নাই; সংস্কৃতি ছিল একটি অন্তরের বস্তু এবং অক্ষরপরিচয় তাহার জ্ঞাপক মাত্র ছিল। মহত্তমদিগের সাধনার আলোক জনসাধারণের মনে প্রবেশ করিত। অক্ষরজ্ঞান পুস্তক অবলম্বন করিয়া সে আলোক বিস্তার করে নাই। ব্রহ্মচারী দীর্ঘকাল যাপন করিয়া তাহার মস্তিষ্কে সংগ্রহ করিয়াছে গুরুর সাধনার ফল। তাই প্রাচীন ভারতে এক অপূর্ব সূত্র-সাহিত্যের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্ততম আকারে শ্রেষ্ঠতম

সাধনার ফল ইহাতে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ভারতীয় সর্বশাস্ত্রেরই এই রীতি। সভ্যতার ধারা ছিল স্মৃতি ও শ্রুতি। ভারতবর্ষে বিদ্যা কখনও মাত্র একাডেমিক ব্যাপার হয় নাই।

বিদ্যা হইয়াছে অন্তরের বস্তু। দর্শন কখনও বুদ্ধির পরিচয়-জ্ঞাপক মাত্র হয় নাই—তাহা মানুষের প্রাণস্বরূপ হইয়াছে। আবার দর্শন ও ধর্ম কখনও এইদেশে দুইটি পৃথক বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; ধর্মের গোড়ার কথা হইয়াছে সর্বস্বর মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ, আর সর্বস্ব এক অখণ্ড পূর্ণের প্রকাশ মাত্র। আবার সর্ববিদ্যাই ধর্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। চতুঃষষ্টি শিল্পকলাও ধর্মের বাহন হইয়াছে; তাই শিল্পকলার পুস্তকের নামও শাস্ত্র। ধর্মের ন্যায় ব্যাপক শব্দও ভারতীয় ভাষায় আর নাই। ধর্ম সকলকে অঙ্গাঙ্গিভাবে ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া এদেশে কোন বিদ্যা water-tight compartment-এর মত হয় নাই; তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধও ঘটে নাই। সর্ববিদ্যার শেষ কথা হইয়াছে ধর্ম। সে যুগে তাই ধর্ম ভিন্ন এদেশে কোন কাব্য হয় নাই, স্থাপত্য হয় নাই, শিল্প-সৃষ্টি হয় নাই। আমাদের শিল্পে বিদেশীরা তাই বস্তুতন্ত্রের অভাববোধ করেন; বাস্তবের সঙ্গে আমাদের শিল্পের সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। তাহার কারণ—প্রাচীন ভারতের সাধনা concrete-এর মধ্য দিয়া abstract-এর, রূপের মধ্য দিয়া অরূপের। লিঙ্গপূজায় আমরা ইহারই সাক্ষ্য পাই। মূর্তিপূজায় যে অবিকল মনুষ্যমূর্তি দেখি না, তাহারও ব্যাখ্যা এই। এখানে abstract-কে মূর্তি দিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে—তাহা concrete-এর হুবহু নকল হইতে পারে না। এই ত গেল একদিকের কথা। ধর্ম সম্বন্ধেও কিছু বলিবার আছে। যাহা সত্য—তাহাই ধর্ম। জীবনযাপনের স্থায়ী অনুশাসনই ধর্ম। ইহকালে পরকালে সুখ শান্তি আনন্দ লাভ করিবার জন্য, শান্ত ও নির্ভীক চিত্তে দেহত্যাগ করিবার শক্তি লাভ করিবার জন্য মানুষ ধর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। এইরূপ করিতে গিয়া মানুষ দার্শনিক তত্ত্বসমূহকে জীবনে চালাইতে চায়। জীবনে সেগুলিকে চালাইবার dynamic করিবার যে প্রযত্ন বা প্রচেষ্টা তাহাই ধর্ম।

এত বড় পৃথিবীতে ধর্মের সংখ্যা বড় কম নয়। কত জাতির সহিত

কত ধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে, আবার কালে লোপ পাইয়াছে। একজাতি অন্য জাতির সংঘর্ষে আসিয়া যখনই সে আপনার হীনতা বা ভ্রম উপলব্ধি করিয়াছে, তখনই সে অপর জাতির মহত্ত্ব বরণ করিয়া লইয়াছে। মানুষের ন্যায় ধর্মেরও শত্রু আছে। সাধারণত আমরা ধর্মবিশেষের, ধর্মমাত্রেরই দুইটি শত্রু দেখিতে পাই। একটি—কোন প্রবল বিরোধী ধর্ম, আর একটি জ্ঞানবৃদ্ধি এবং জ্ঞানবিস্তার। বিরোধী প্রবল ধর্মের নিকট হীনবল কতবার যে মাথা নত করিয়াছে ইতিহাস তাহার সাক্ষী। আবার পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া এরূপও দেখা গিয়াছে যে যখনই যেদেশে জ্ঞানের সঞ্চয় ও জ্ঞানের প্রচার বিস্তৃতভাবে হইয়াছে তখনই সে দেশে কোন না কোন আকারে ধর্মবিপ্লব ঘটিয়াছে—ধর্মসম্বন্ধীয় প্রচলিত মত ও বিশ্বাস কোথাও অল্পাধিক পরিবর্তিত, কোথাও বা একেবারে ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। জ্ঞানপ্রচার চিরকালই মিথ্যার শত্রু। যেখানে জ্ঞানের বিস্তৃতি সেখানে মিথ্যা টিকিতে পারে না। কাজেই জ্ঞানপ্রচার ভ্রমপূর্ণ অপধর্ম মাত্রেরই চক্ষুঃশূল। এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই যাঁহারা অপধর্ম যাজন করেন, তাঁহারা চিরকাল জ্ঞানবৃদ্ধি ও জ্ঞান-প্রচারের প্রতিকূল। প্রতিকূল জ্ঞানপ্রচারে যাহাদের আতঙ্ক হয় তাহাদের ধর্ম বিজ্ঞানসম্মত নয়—সে ধর্ম উপধর্ম বা অপধর্ম। মানুষকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে কতদিন বঞ্চিত রাখা যায়? একদিন তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে। সে যে স্বাধীন চিন্তাকে ভয় করিত আস্তে আস্তে তাহাই তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিবে, সে দিন সে আর অপধর্মে বিশ্বাস রাখিতে পারিবে না।

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কিন্তু এ সকল কথা খাটে না। বেদানুসারী এই ধর্মের দুই প্রকার শত্রুরই অভাব। এমন ধর্ম পৃথিবীতে প্রচলিত নাই, যাহা হিন্দুধর্মের যথাযোগ্য ও প্রবল শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। বৈদিকধারানুবর্তী এই ধর্ম শত সংস্কারে সংস্কৃত, শতসংঘর্ষে দৃঢ়ীকৃত, শতবিচারে পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং শতপরীক্ষায় পরীক্ষিত। জগতের কোন ধর্মই এমন ধ্যানপ্রসূত, শতধৌত, মার্জিত নয়।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে, কালগত প্রয়োজনের সঙ্গে পরপর যুগে এই

ধর্মে বহু পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু আশ্চর্য, সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে প্রাচীন বৈদিক ধারা অক্ষুণ্ণই রহিয়া গিয়াছে। বেদসম্মত ক্রমের অনুকূলে ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত থাকায় বৈদিক ধর্ম হইতে পরবর্তী ধর্মের বিচ্ছেদ ঘটিবার অবকাশ হয় নাই। পরবর্তী যুগের ধর্ম—শৈব, শক্তি, তান্ত্রিক, জৈন, বৌদ্ধ বজ্রযানী, সহজ, নাথপন্থী প্রভৃতি বহুমতের সংস্পর্শে আসিয়াও বৈদিকধারা সতত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল এবং অনবরত তাহাতে সুস্নাত হইয়া 'সনাতন ধর্ম' নামে পরিচিত হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের দেশের তান্ত্রিক ধর্মও এই ধর্মানুষ্ঠানের পরিণতিবিশেষ। তন্ত্রমত নানাভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ইহার উৎপত্তিকাল নির্ণয় করিবার মত উপাদান আমাদের নাই। তার তত্ত্ব অতি গুহ্য। নিতান্ত গুহ্যভাবে ইহার তত্ত্বগুলি দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকারে গুরুপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল। এমনই করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রে আদান-প্রদানও ঘটিয়াছিল।

বৌদ্ধগণের মতে বসুবন্ধুর[1] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসঙ্গ বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক ক্রিয়া প্রবর্তন করেন। বসুবন্ধুর সময় ২৮০-৩৬০ খ্রী.। সুতরাং বলিতে হয় অসঙ্গ চতুর্থ শতকের প্রথমপাদে বর্তমান ছিলেন। তিব্বতের ঐতিহাসিক তারনাথ[2]ও বলিয়াছেন, অসঙ্গ[3] হইতে ধর্মকীর্তি[4] পর্যন্ত গুরুপরম্পরায় আমরা 'চক্রসম্বর-তন্ত্র' নামক সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থে গুরুপর্যায়ে যাঁহাকে প্রথমেই পাই তাঁহার নাম—'সরহ'। তারনাথ এবং Pag-Sam-Jon-Zan-এর লেখক উভয়েই এই সরহকে তন্ত্রের সর্বপ্রাচীন প্রচারকগণের অন্যতম বলিয়াছেন। তারনাথ বলেন, 'সরহ' বুদ্ধকপালতন্ত্র প্রবর্তন করেন। তারনাথের গুরুপরম্পরার তালিকায় গুরুপর্যায়ে প্রথমে সরহ, ক্রমে লুইপা, পদ্মবজ্র ও কৃষ্ণাচার্যের নাম আছে। সরহ যে বাঙালী ছিলেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তারনাথ ও Pag-Sam-Jon-Zan-এর লেখক উভয়েই যে বিবরণ দিয়াছেন তদনুসারে সরহের পূর্বনাম ছিল রাহুলভদ্র। এ ছাড়া তিনি আচার্য, মহাচার্য, সিদ্ধ, যোগী, মহাযোগী, যোগীশ্বর, মহাব্রাহ্মণ, মহেশ্বর প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। পূর্বদেশে

রাজ্ঞী নগরীতে এক ব্রাহ্মণ ও এক ডাকিনী হইতে ইঁহার জন্ম। প্রাচ্যরাজ চন্দনপালের সময়ে ইনি আবির্ভূত হন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে ইনি পারদর্শী ছিলেন। রাহুলভদ্র রাজা রত্নফল ও তাঁহার মন্ত্রীকে অলৌকিক দক্ষতা দেখাইয়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। তারপর তিনি নালন্দার প্রধান আচার্য হন। উড়িষ্যার কোবেস কাহ্ন নামক এক যোগীর নিকট তিনি মন্ত্রযান শিক্ষা করেন। অতঃপর মহারাষ্ট্রে গিয়া একজন সন্ন্যাসিনীর যোগে মহামুদ্রা সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। সিদ্ধ অবস্থার তাঁহার নাম হয়—'সরহ'। সংস্কৃতে রচিত তাঁহার বহু গ্রন্থ তিব্বতীয় Tangyur-এ রক্ষিত আছে। এই সরহ ছিলেন ধর্মকীর্তির সমসাময়িক—৬০০-৬৫০ খ্রী.।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সরহ রচিত চারটি চর্যাগীতি পাইয়াছেন। সেই চারটি গীতিতে ২৪টি সংস্কৃত শব্দ আছে তাহাদের সকলগুলিই আজও বাংলায় চলিতেছে। সংস্কৃত হইতে ব্যুৎপন্ন ৩৫টি শব্দ আছে—এগুলির একটু-আধটু বানান বদলাইলে সংস্কৃত হইয়া যায়। ৯৫টি পুরানো বাংলা কথা আছে এবং ২৮টি চলিত বাংলা শব্দ আছে।

সরহের একটি পদ—

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা॥
অম্হে ন জাণহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥
জইসো জাম মরণ বি তই সো।
জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেসো॥
জাএথু জাম মরণ বিসঙ্কা।
সো করউ রস রসানেরে কংখা॥

নেপালে প্রাপ্ত উপাদান হইতে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, সরহ অন্যূন ৬৩৩ খ্রী. বিদ্যমান ছিলেন। সরহ শুধু পদরচনা করেন নাই, তিনি ছিলেন বজ্রযান-তন্ত্রের প্রধান সাধক ও একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক। একথাও বলিতে পারা যায় যে তাঁহার সময় হইতেই বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনা সমগ্র ভারতে বিস্তৃতি

লাভ করে। তিব্বতীয় Tangyur হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ২১ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সরহই প্রথম বাংলা পদরচয়িতা বা বাংলা-সাহিত্যে পদাবলীরচনার প্রথা প্রবর্তক।

ইহার পর আমরা পাই শবরীপাদের বাংলা পদ—ইনি সরহশিষ্য নাগার্জুনের শিষ্য। শবরীর সময় ৬৫৭ খ্রী.। Pag-Sam-Jon-Zan-এ ইঁহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। শবরীর পদও বজ্রযানের ব্যাখ্যায় আছে।

এখন দেখা যাইতেছে, আমরা খ্রীস্টের সপ্তম শতকে প্রারম্ভ হইতেই অর্থাৎ প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে বাংলা-সাহিত্যের তথা ভাষার নিদর্শন পাইতেছি।

এই পদগুলি বজ্রযানীদের প্রহেলিকাপূর্ণ তান্ত্রিক গান। ইহাদের সাধারণ অর্থ খুব সরল, কিন্তু আধ্যাত্মিক অর্থ অতি গূঢ়।

ইহার পরবর্তী সাহিত্যের নিদর্শনও আমাদের আছে।

সে সকলের কথা আমি বলিব না। ১৪০০ সালের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনাদিতে ভাষায় পরিণতির পরিচয় আছে। তারপর শ্রীচৈতন্যের সময় হইতে রীতিমত বাংলা-সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু ১৪০০ সালের পূর্ববর্তী বাংলা-সাহিত্যের কথা শুনাইবার উপকরণের আমাদের নিতান্ত অভাব। তবে সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা হইতে যাহা কিছু নির্ণয় করা যায়।

সেই সময়ে অথবা তৎপূর্বে যে বাংলা-সাহিত্যে অন্য কিছু বা কোন কিছু রচনা হয় নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত আমরা করিতে পারি না। ইহার পূর্বেকার নিদর্শনের অভাবের দুইটি কারণ থাকিতে পারে—প্রথমত তেরেট, তালপাতা প্রভৃতির পুথিতে অথবা গাছের ছালে বা অনুরূপ পদার্থে প্রাচীন পুথি লেখা হইত। সেইগুলি অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে দেবভাষা বলিয়া অধিকাংশ রচনাই সংস্কৃত ভাষায় হইত এবং সেই ভাষাই আদৃত হইত। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব হিসাবেও রচনা রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন যুগে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই সংস্কৃতে রচিত হইত। ইহাতে ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব বাড়িত।

প্রাচীনকালে ভারতীয় সকল জাতির লক্ষ্যই এই সংস্কৃতের উপর পড়িয়াছিল। ইতিহাসের দিক দিয়া বলিতে গেলে—বুদ্ধদেবই লৌকিক ভাষার গুরুত্ব দান করেন। ঠিক সেইরূপ বাঙালী বজ্রাচার্যগণ বাংলায় বা তাঁহাদের মাতৃ-ভাষায় পদ রচনা করিয়া বাংলাভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন; তাই তাঁহাদের পদগুলি আজিও সাদরে রক্ষিত হইয়াছে। ইহার পর তাঁহাদের বা বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব হ্রাস পায়, ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে সংস্কৃতেরই জয় হয়। সুতরাং বাংলা-সাহিত্য ভাণ্ডারে ১৪০০ সালের পূর্বে কিছুই সঞ্চিত হয় নাই বা রক্ষিত হয় নাই। এই যুগ বাংলার একটা বিরাট্ বিপ্লবের—রাজনৈতিক পরিবর্তনের যুগ। মুসলমান-বিজয়ের কিছুকাল পরে বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়, আর সেই যুগের নিদর্শন পাই—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রেমলীলা-বিষয়ক গানে, রামায়ণ মহাভারতাদি অনুবাদে, শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বা তদানীন্তন কালীন রচনায়,—গোপীচাঁদের[6] গানে, পদ্মাপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণবিজয়[7] প্রভৃতিতে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন রূপ পাই—সরহের পদে। ইহার ভাষা-বিচারে ইহাতে মাগধী-প্রাকৃত ও মাগধী-অপভ্রংশের রূপান্তরিত একটি রূপ পাওয়া যায়। ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে বলা যায়, খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে মৌর্যবিজয়ের সময় হইতে বাংলায় আর্য-ভাষার প্রভাব ও প্রসার হয়। সেই মাগধী-প্রাকৃতের বিকারে বা ক্রমবিকাশেই বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের গোড়া পত্তন। কিন্তু কিরূপে মাগধী-প্রাকৃত মাগধী-অপভ্রংশের ক্রমপরিবর্তনে বাংলাভাষার উৎপত্তি হইল, তাহা বলা অসম্ভব। ভাষার উৎপত্তিকে কোন সংজ্ঞার মধ্যে ফেলা যায় না। আদিম বাঙালী-জাতির ভাষা যে কিরূপ ছিল, আর মাগধী-প্রাকৃতের সহিত তাহার কিরূপ পার্থক্য ছিল—পরে উভয়ে মিশ্রিত হইয়া কিরূপে বর্তমান পরিণতিতে আসিয়াছে, তাহার ধারাবাহিক আলোচনা ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে অসম্ভব। তবে আর্য-প্রভাব-বিস্তৃতির কয়েক শত বর্ষ পরেকার নিদর্শন পাই—এই সমস্ত বজ্রযানীদের পদে।

[সাহানা, পৌষালী সংখ্যা ১৩৪৪, পৃ. ৯-১১]

প্রসঙ্গ-কথা

1 বসুবন্ধু (৪-৫ শতাব্দী) : বৌদ্ধ গ্রন্থকার। মধ্যভারতে জন্ম। আচার্য অসঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও শিষ্য। ইনি মহাযান মতে দীক্ষিত হন এবং আচার্য অসঙ্গের পরামর্শে মহাযান মত প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। অভিধর্মকোষ, বোধিচিত্তোৎপাদন, গাথা-সংগ্রহ প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।—সনৎসু.

2 তারনাথ (১৭ শতাব্দী) : 'পাণিনি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

3 অসঙ্গ (৪-৫ শতাব্দী) : প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ স্থবির ও ধর্মাচার্য। পুরুষপুরে (পেশোয়ারে) জন্ম। তাঁর গুরু বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়নাথ (নামান্তর অজিতনাথ)। কেহ কেহ বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় ও অসঙ্গ অভিন্ন ব্যক্তি বলেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। কতকগুলি গ্রন্থ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশে নীত হয় ও কতকগুলি চীন ও তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। কয়েকটি গ্রন্থ : যোগাচার্য ভূমী, মহাযান-সম্পরিগ্রহ, প্রজ্ঞাপারমিতা সাধনা, বজ্রচ্ছেদিকারটীকা ই.।—জী-কো.

4 ধর্মকীর্তি (৭-৮ শতাব্দী) : ভূটানে প্রমাণবার্ত্তিক নামে বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করেন।—সনৎসু.

5 শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : পদাবলী গ্রন্থ। সুবিখ্যাত ও প্রাচীন পদকর্তা চণ্ডী-দাস রচিত। নামান্তর—বড়ু চণ্ডীদাস (১৪১৭-১৪৭৭) বীরভূম, নান্নুরে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশে জন্ম। বাসুলি দেবীর পূজক।—জী-কো.

6 গোপীচাঁদ : উত্তরবঙ্গের এক ক্ষত্রিয় রাজা। মাতা—ময়নামতী। গোপীচাঁদ ধার্মিক ও সংসার পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি বহু গান রচনা করেছেন। উক্ত অঞ্চলে 'রাজা গোপীচাঁদের ত্যাগের গান' বিখ্যাত।—জী-কো.

7 শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় : ১৬শ শতকে মালাধর বসু রচিত। মালাধর বসু ছিলেন হুসেন শাহের মন্ত্রী এবং তিনি গুণরাজ খাঁ উপাধি লাভ করেন।—সা-সে-ম.

অতিকৃচ্ছ্র

প্রায়শ্চিত্তাঙ্গভূত দ্বাদশদিনসাধ্য শরীরশোধক ব্রতবিশেষ। অত্রি (অত্রি-স. ১.২২০) বলেন, কাষ্ঠ, লোষ্ট্র বা শিলাদ্বারা গোহত্যা করিলে 'সান্তপন' ব্রত, মৃত্তিকা দ্বারা করিলে 'প্রাজাপত্য' এবং লৌহদণ্ড দ্বারা করিলে 'অতিকৃচ্ছ্র' হয়। 'কাষ্ঠলোষ্ট্রশিলাগোঘ্নঃ কৃচ্ছ্রং সান্তপনঞ্চরেৎ। প্রাজাপত্যং চরেণ্‌মৃৎসা অতিকৃচ্ছ্রন্তু আয়সৈঃ॥' অত্রি (ঐ, ১.২৬১) আরও বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ পতিতের নিকট প্রতিগ্রহ বা তাহার অন্ন ভোজন করিলে, প্রতিগৃহীত ধন পরিত্যাগ ও ভুক্ত অন্ন উদ্গীর্ণ করিলে অতিকৃচ্ছ্র করিবে।

'পতিতাচ্চান্নমাদায় ভুক্ত্বা বা ব্রাহ্মণো যদি। কৃত্বা তস্য সমুৎসর্গমতি-কৃচ্ছ্রং বিনির্দিশেৎ॥' যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায়[১] (৩.২৯২) উপদিষ্ট হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণকে প্রহার করিবার জন্য দণ্ড উদ্যত করিলে—প্রাজাপত্যব্রত, আঘাত করিলে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত, আঘাতদ্বারা রক্তপাত করিলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র এবং যে আঘাতদ্বারা রক্ত বিকৃতভাবে ত্বকের অভ্যন্তরেই থাকে অর্থাৎ কালশিরা পড়ে তাহাতে প্রাজাপত্য-ব্রত করিতে হইবে। এই শেষোক্ত বিষয়ের তাৎপর্য এই যে আঘাত করিলে যে অতিকৃচ্ছ্র করিতে হয়, তাহা তো করিতেই হইবে, অধিকন্তু পূর্বোক্ত বিশেষ আঘাতের জন্য আরও একটি প্রাজাপত্য করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একটি অতিকৃচ্ছ্র ও প্রাজাপত্য এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। বৃহস্পতিবচনের সহিত এই বিধির সামঞ্জস্যবিধান করিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ব্রাহ্মণকে

আঘাত করিতে দণ্ড উদ্যত করিলে, উদ্যতদণ্ড পুরুষ যেরূপ আঘাত করিতে সঙ্কল্প করিবে তদনুসারে ব্রাহ্মণোপদিষ্ট গুরু লঘু যৎকিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতে হইবে। আঘাতে অস্থিভেদ করিলে অতিকৃচ্ছ্র, অঙ্গচ্ছেদ করিয়া যদি রক্তপাত হয় তাহা হইলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, আর ত্বগ্ভেদ হইলেও যদি রক্তপাত না হয় তাহা হইলে প্রাজাপত্য করিতে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য (৩.৩১৯) ইহার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বলেন[২], তিন দিন এক-ভুক্ত, তিন দিন নক্ত, তিন দিন অযাচিত ভোজন এবং তিন দিন উপবাস কিংবা এক এক দিন করিয়া চার দিনে উপবাসান্ত কার্য করিয়া পুনরায় এক-এক দিন করিয়া ঐরূপ কার্য, এইরূপে দ্বাদশ দিন অতিবাহিত করিতে হইবে। এই ব্রতানুষ্ঠান যে কোনরূপে তিন গুণ হইলে প্রাজাপত্য নামে অভিহিত হয়। এই প্রাজাপত্য ব্রতই 'অতিকৃচ্ছ্র' পদবাচ্য হইবে। তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, যে কয়দিন আহার করা নিয়ম, সেই কয়দিন পাণিপূরণমাত্র অর্থাৎ যতগুলি অন্নে দক্ষিণ করতল পূর্ণ হয়, মাত্র ততগুলি অন্ন আহার করিতে পারা যাইবে। মনু প্রাজাপত্যে দ্বাবিংশত্যাদি গ্রাস আহার করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। একবিংশ দিন দুগ্ধমাত্র পান করিয়া থাকিলে 'কৃচ্ছ্রাতি-কৃচ্ছ্র' ব্রত হয়।

অত্রিসংহিতা[৩] (১১৮-১৯) বলেন যে, তিন দিন সায়ংকালে, তিন দিন প্রাতঃকালে এবং তিনদিন অযাচিত ভোজন করিবার পর আবার তিন দিন উপবাস করিতে হইবে। এই দ্বাদশদিনসাধ্য ব্রতের নাম 'প্রাজাপত্য'। এই ব্রতে সায়ংকালে দ্বাদশ গ্রাস, প্রাতঃকালে পঞ্চদশ গ্রাস এবং অযাচিত তিন দিবসে চতুর্বিংশতি গ্রাস খাওয়া বিধি। পরের তিন দিন উপবাস। প্রাজাপত্য ব্রতের ন্যায় তিন দিন রাত্রিতে, তিন দিন দিবসে এবং তিন দিন অযাচিত দ্রব্য ভোজন বিধি—কিন্তু এই নয় দিনে এক-এক গ্রাস মাত্র ভোজন ও পরে তিন দিন উপবাস। ইহার নাম 'অতিকৃচ্ছ্র'। এই প্রায়শ্চিত্তাঙ্গভূত ভোজনগ্রাস শরীরশোধক। ইহা কুক্কুটাণ্ড পরিমিত হইবে—কিংবা যাহার মুখে স্বচ্ছন্দে যেরূপ গ্রাস প্রবিষ্ট হয় তাহার পক্ষে সেরূপ গ্রাস বিধেয়।

পাদটীকা

১ 'বিপ্রদণ্ডোদ্যমে কৃচ্ছ্রস্ত্বতিকৃচ্ছ্রো নিপাতনে।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রোঽসৃক্‌পাতে কৃচ্ছ্রোঽভ্যন্তরশোণিতে ॥'

—যাজ্ঞ-স. ৩.২৯২

২ যথাকথঞ্চিৎ ত্রিগুণঃ প্রাজাপত্যোঽয়মুচ্যতে।
অয়মেবাতিকৃচ্ছ্রঃ স্যাৎ পাণিপূরান্নভোজনঃ ॥

—যাজ্ঞ-স. ৩.৩১৯

৩ ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং ভুঙ্‌ক্তে ত্বযাচিতম্।
ত্র্যহং পরঞ্চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যোবিধিঃ স্মৃতঃ ॥
সায়ং তু দ্বাদশ গ্রাসাঃ প্রাতঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ।
অযাচিতে চতুর্বিংশঃ পরেঽপ্যনশনং স্মৃতম্'

—অত্রি-স. ১১৮-১৯

[বঙ্গীয় মহাকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৮-২৯]

অনশন

অনশন সাধারণত উদ্দেশ্যমূলক ; ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে, মন্ত্রতন্ত্রের পদ্ধতি প্রকরণে বা সামাজিক প্রথানুসারে অনশন পালন করা হইয়া থাকে। কুকর্মের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে এবং দেবতাদিগের সন্তোষবিধানের জন্য অথবা শোকসূচক বাহ্য অনুষ্ঠানরূপেও অনেকে এই অনশনধর্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন। সংস্কার-সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠানের পূর্বেও অনেকে এই অনশন-ব্রত পালন করেন। স্বপ্ন অথবা অলৌকিক দর্শন-বিষয়ে ইহার প্রভাব যথেষ্ট। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অবস্থায় উপরি-উক্ত কোন কোন কারণে অনশনের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐগুলি ব্যতীত আরও অন্যান্য কারণও ইহার উৎপত্তির অন্তরালে থাকিতে পারে। অতি প্রাচীন কালে খাদ্যাভাবে বাধ্য হইয়া মানুষকে কখনও কখনও অনশনে থাকিতে হইত ; এইরূপে অনশনে থাকার জন্য মানুষের মনে কিংবা স্বাস্থ্যে সময়ে সময়ে যে সুফল ফলিত তাহাই বিচার করিয়া পরে স্বেচ্ছাকৃত অনশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—ইহাকেই অনশনের মূল কারণ বলিয়া উল্লেখ করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

অনশন দুই প্রকার—পূর্ণ ও আংশিক। নিরম্বু উপবাসকেই পূর্ণ অনশন বলা যাইতে পারে এবং সময়বিশেষে ও জাতিবিশেষে ভোজ্য দ্রব্য-বিশেষের অনশনকে আংশিক অনশন বলা যাইতে পারে। কখনও কখনও লোকে আহারের পরিমাণ খুব কমাইয়া দিয়া স্বল্পাহারী হইয়া থাকেন। এই রূপ স্বল্পাহারকেও আংশিক অনশন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। বর্তমান

যুগে অস্ত্রোপচারের (surgical operation) পূর্বে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পূর্ণ অনশনের বিধি পালন করিতে হয়। স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে চিকিৎসকেরা অনেক সময়ে আংশিক অনশনের ব্যবস্থা করেন এবং স্বেচ্ছায়ও লোকে অনেক সময় আংশিক অনশন করিয়া থাকেন। অসাধারণ প্রাণশক্তির প্রমাণস্বরূপ বহুদিন ধরিয়া পূর্ণ অনশন করিতেও অনেককে দেখা গিয়াছে। অবিচারের প্রতিবাদস্বরূপ বর্তমানে লোকে প্রায়ই অনশন করিয়া থাকেন। এইরূপ ধর্মঘটের ফলে কখনও কখনও অবিচারের প্রতিকারও হইয়াছে—কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবাদকারীকে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিতে হইয়াছে। রাজবন্দিগণ অনেক সময়েই অনশন-ধর্মঘট করিয়া থাকেন। প্রাচীনকালেও এইরূপ অনশন দেখা যাইত। Celt[1] দিগের মধ্যে, আইনসঙ্গত অনুরোধ রক্ষিত না হইলে, অনশনের প্রচলন প্রচুর ছিল। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে লোকে নিজের অথবা স্বজাতির অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ চরিতার্থ না হওয়া পর্যন্ত অনশন করার শপথ গ্রহণ করিত।

অসভ্যজাতিগণের মধ্যেও অনশনের নিয়ম দেখা যায়। সাধারণত দীক্ষার পূর্বে প্রায় সমস্ত অসভ্যজাতির মধ্যেই স্ত্রীলোক এবং যুবকদিগের নির্দিষ্ট ভোজ্য হইতে বিরত থাকিতে হয়।

অসভ্য এবং সভ্য জাতিসমূহের দেশ ও কাল ভেদে যে সমস্ত বিভিন্ন কারণে অনশন পালন করা হইয়া থাকে তাহা বিচার করিলে অনশনের প্রকৃত উৎপত্তি কি তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। তবে কোন ক্ষেত্রেই যথার্থ ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারই ইহার উৎপত্তির প্রকৃত কারণ হইতে পারে না। সম্ভবত ইহার উৎপত্তির কোন নির্দিষ্ট একটি মাত্র কারণ নাই।

মানুষের জীবনে খাদ্যের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। খাদ্যের গুণাগুণ অনুসারে আমাদের শরীরের ও মনের নানা পরিবর্তন হইতে পারে। সেই জন্যই বিভিন্ন দেশে জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে খাদ্য-গ্রহণে বিচার করিয়া চলিতে হয়। বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ খাদ্য নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রায় সমস্ত দেশেই দেখা যায় যে সন্তানের জন্মের পূর্বে অথবা পরে মাতা এবং সময়ে সময়ে পিতাও কোন কোন খাদ্য গ্রহণ

করিতে পারেন না। এই প্রথাটি সম্ভবত খুব প্রাচীন নয়; মানুষের জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রসার হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই প্রথা অনুসারে অনেক সময় অতি প্রিয় ও রুচিকর খাদ্য পর্যন্ত বর্জিত হইয়া থাকে। নিউ গিনি দেশের কোইটা (Koita) জাতির গর্ভবতী নারীগণ বৃহৎকায় মূষিক, একিড্না (echidna), কোন কোন জাতীয় মাছ প্রভৃতি প্রাণী খাইতে পায় না। তাহাদের স্বামিগণকেও এই সমস্ত বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। অজাত পুত্রগণ পাছে আঘাত প্রাপ্ত হয় এই আশঙ্কায় আসামের নারীগণ অনেক প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে না। অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে দেখা যায় যে নারীগণকে প্রথম ঋতুকালে নানাপ্রকার খাদ্য গ্রহণে বিধিনিষেধ মানিতে হয়। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার কোন নারী এই অবস্থায় চারিদিন অনশনে থাকে; দীর্ঘ নিভৃতবাসের সময়ে তাহার পক্ষে মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ, কারণ, ইহাতে তাহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। দক্ষিণ মাসিমবাসিনী (Southern Massim) নারীগণকে প্রথম ঋতুকালে নিভৃতবাস করিতে হয় এবং সবপ্রকার মাংস বর্জন করিতে হয়। শরীর অসুস্থ হইলে এমন অনেক খাদ্য আছে যেগুলির ভোজন হইতে মানুষকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঞ্চিত থাকিতে হয়।

অনেক দেশে নির্দিষ্ট ঋতুতে বা নির্দিষ্ট অল্প কয়েক দিনের জন্য বিশেষ বিশেষ খাদ্যের ভোজনের উপরে বিধি-নিষেধ দেখা যায়। কোন কোন জাতির প্রধানের নির্দেশেও সাধারণভাবে কোন কোন খাদ্য বর্জন করিতে হয়। আন্দামান দ্বীপে ধর্মের দোহাই দিয়া এই প্রয়োজন সিদ্ধ করা হয়।

শোকানুষ্ঠানে অনশন ও সমবেদনাসূচক অনশন

কাহারও মৃত্যু সম্পর্কে যে অনশন পালন করিবার নিয়ম দেখা যায় তাহার উৎপত্তি ও সার্থকতা কি তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। এইরূপ অনশনের উৎপত্তিসংক্রান্ত বিষয়ে অনেক কারণ উপস্থিত করা হইয়াছে যেমন, মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মার সন্তোষবিধান, খাদ্যের সহিত মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মার প্রবেশ-নিবারণ, মৃতের সংস্পর্শ-হেতু খাদ্য দূষিত হইবার ভয়, শুদ্ধীকরণ

ইত্যাদি। উল্লিখিত কারণগুলি মৃত্যু ব্যাপারে অনশনপ্রথাগুলির স্থায়িত্বের জন্য অনেকাংশে দায়ী হইলেও শোক-হেতু আহারে অনাসক্তি মূলত এই সমস্ত প্রথার জন্য দায়ী বলা যাইতে পারে। এইরূপ শোকসূচক অনশনের প্রথা সাধু অথবা বিশেষ দেশহিতৈষী শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির মৃত্যুতে প্রচলিত হইতে দেখা যায়। Mater Magna[2] বা মহামাতার অনুষ্ঠানে Attis[3]এর মাতার শোকের স্মৃতিস্বরূপ ২৪এ মার্চ অনশন এবং শোকদিবস বলিয়া গণ্য হইত। সীয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ আলি[4] ও তাঁহার পুত্রদ্বয় হাসান ও হুসেনের[5] মৃত্যুর স্মৃতিরক্ষার্থ অনুরূপ অনশন পালন করিয়া থাকেন। প্রায় প্রত্যেক দেশেই মৃত্যুসম্পর্কিত অনশন-প্রথা বর্তমান। কোথাও অনশন কয়েকদিনের জন্য করিতে হয়, আবার কোথাও বা অল্প সময়ের জন্য করিতে হয়; কোথাও পূর্ণ অনশন করিতে হয় এবং কোথাও আংশিক অনশন করিতে হয়। নিউ গিনির কোন কোন জাতির মধ্যে মৃতের স্মৃতি-স্বরূপ কিছুকালের নিমিত্ত আত্মীয়-স্বজন স্বেচ্ছায় কোন প্রিয় খাদ্য বর্জন করিয়া থাকে। প্রাচীন মিশরে রাজার মৃত্যুতে প্রজাদের উপবাস করিবার রীতি ছিল; তাহারা এই সময়ে মাংস, রুটি, মদ প্রভৃতি আহার করিত না এবং বিলাসিতা করা, স্নান করা, নরম বিছানায় শয়ন করা প্রভৃতি তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। প্রাচীন জাপানে মৃতের পুত্রকন্যা ৫০ দিন সামান্য নিরামিষ আহার করিত। গ্রীকদিগের মধ্যেও অনশনপ্রথা বর্তমান ছিল; সন্তানের মৃত্যুর পর পিতামাতা দুই-তিন দিন পর্যন্ত অনশন করিতেন। হিব্রুজাতিরাও মৃত্যু উপলক্ষ্যে অনশন অবলম্বন করিত। আন্দামান-দ্বীপপুঞ্জে শোকার্ত নরনারীগণ শূকর-মাংস, কচ্ছপের মাংস প্রভৃতি আহার করে না। জীবনের শেষ রোগে স্বামী যে সমস্ত খাদ্য গ্রহণ করিতেন, স্ত্রীর পক্ষে শ্রাদ্ধ দিবস পর্যন্ত সেই সমস্ত খাদ্য বর্জন করিবার বিধি দক্ষিণ মাসিমে (Massim) প্রচলিত আছে।

মৃত্যু সম্পর্কিত অনশনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়ের অবতারণা করা যাইতে পারে। অনেক দেশে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার পর হননকর্তাকে অন্যান্য শুদ্ধীকরণ ব্যতীত অনশনও করিতে হয়।

শুদ্ধীকরণে অনশন

অসভ্যদিগের মধ্যে এইরূপ একটি বিশ্বাস আছে যে, পাপ, অপবিত্রতা প্রভৃতি শরীরে প্রবেশ করে খাদ্যের মধ্য দিয়া; সুতরাং অনশন করিলে শরীর অপবিত্রতা হইতে নিষ্কৃতি পায়। সেইজন্যই ধর্ম-কার্যে এবং শুদ্ধীকরণে অনশনের অবলম্বন প্রচুর দেখা যায়। অনশনের পরে সাধারণত দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। অনেক সময় শরীরকে পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করিবার উপযোগী করিবার নিমিত্ত অনশন করা হইয়া থাকে। প্রেতের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের প্রাথমিক অনুষ্ঠান হিসাবে অনশনের প্রচলন আছে।

Cherokee[6]-দিগের মধ্যে পেশাদার ঈগল-পক্ষী হত্যাকারীকে হত্যার পূর্বে প্রার্থনা ও এক রাত্রি ধরিয়া অনশন করিতে হইত। ইহার কারণ ঈগল পক্ষী একটি পবিত্র পক্ষী বলিয়া গণ্য হইত। Tlingit-দিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি মৃত হইলে তাহার আত্মার প্রভাব লাভ করিবার জন্য যে কোন কুমারীকে আট দিন অনশন করিতে হইত। তাহার স্বাস্থ্য দুর্বল হইলে প্রথমে চারি দিন অনশন করিয়া তাহার পর দুই দিন বাদ দিয়া আবার চারি দিন অনশন করিতে হইত। মিশরদেশীয়গণ মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে স্নান ও অনশন করিত। বলিদানের পূর্বে অনশন করিবার প্রথা Isis-দিগের ধর্মের অঙ্গ ছিল। সাধারণত কোন নূতন খাদ্য, নূতন শস্য এবং কোন পবিত্র খাদ্য খাইবার পূর্বে অনশন করিতে দেখা যায়। Yam ভোজন-উৎসবের পূর্বে নিউ গিনির কোন-কোন জাতির প্রধানকে কয়েক দিন ধরিয়া অনশন করিতে হয়। এই সমস্ত পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করিবার পূর্বে যে অনশন অবলম্বন, শরীরকে পবিত্র করাই তাহার উদ্দেশ্য। বর্তমান যুগের ইহুদীগণ Passover ভক্ষণ করিবার পূর্বে সকাল ১০ ঘটিকা হইতে অনশন অবলম্বন করিয়া থাকেন।

উৎসবে, কামনা-বাসনা-পূরণে ও দীক্ষায় অনশন

বালক এবং বালিকারা পূর্ণ বয়স্কতা প্রাপ্ত হইলে, গোপন সমাজে যোগদান কালে এবং বিবাহের পূর্বে অনেক দেশে অনশন করিবার নিয়ম আছে। বোরা উৎসবে উত্তর ও দক্ষিণ ওয়েলসের বালকেরা ই দিন

অনশন করিয়া থাকে। এই দুই দিন তাহারা সামান্য পরিমাণে জল পান করিতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার অনেক জাতির মধ্যে দীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত অনেক খাদ্যই নিষিদ্ধ থাকে। এই প্রথার উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, ইহার ফলে বয়স্ক ব্যক্তিরাই উত্তম খাদ্য ভক্ষণের অধিকারী হইয়াছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে দীক্ষার পর এবং কুমারীদিগের পক্ষে বিবাহের পর কয়েক মাস—কোথাও কোথাও কয়েক বৎসর—কতকগুলি অতি প্রিয় খাদ্য বর্জন করিতে হয়। ব্যাঙ্ক্‌স (Banks) দ্বীপে গোপন সমাজ প্রভৃতিতে যোগদানের পূর্বে অনশন করিতে হয়। যৌবনাগমে নিভৃত বাসকালে আমেরিকার ইণ্ডিয়ান যুবক বহু দিন উপবাস এবং নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া থাকে।

প্রাচীন যুগেও দেখা যায় যে অনশন দীক্ষার একটি অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। Isis-দিগের মধ্যে এইরূপ প্রথা বর্তমান ছিল। কোন কোন দেশে চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইলে মধ্যে মধ্যে অনশন করিবার নিয়ম আছে। বিশেষ বিশেষ দৈব ঔষধ স্বপ্নে প্রাপ্ত হইবার আশায় অনেকে অনশন অবলম্বন করে। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে দেখা যায় যে শিকারী তাহার শিকারে সমর্থ হইবে কি না স্বপ্নে তাহা জানিবার জন্য অনশন অবলম্বন করে। গৃহস্বামিগণ সন্তান হইবে কি না তাহা স্বপ্নে জানিবার জন্য অনশন করিয়া থাকে। দিব্যদর্শনের আকাঙ্খায় জুলু[7] (Zulu) দেশীয়েরা অনেক সময় অনশন করিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে সাঁওতালদিগের মধ্যেও অনশন দেখা যায়।

কোন বিশেষ ইচ্ছাপূরণকল্পে অনশনের দ্বারা স্বপ্নদর্শন অথবা দিব্য-দর্শনের বিষয় হিব্রুদিগের ধর্মগ্রন্থেও দেখা যায়। মোজেস[৮] (Moses) ঈশ্বরের নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইবার পূর্বে চল্লিশ দিন অনশন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইবার পূর্বে ডেনিয়েলও[৯] (Daniel) তিন মাস মদ্য ও মাংস ত্যাগ করিয়াছিলেন।

যাদুবিদ্যায় অনশন

যাদুবিদ্যালাভের আশায় অনেকক্ষেত্রে অনশন অবলম্বন করিতে দেখা যায়। ব্যাঙ্ক্‌স দ্বীপের লোকেদের বিশ্বাস যে অনশন করিলে শত্রু বিনাশ

করিবার মন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই উদ্দেশ্যে ইহারা অনেক সময় এইরূপ কঠোর অনশন অবলম্বন করে যে চলিবার শক্তি পর্যন্ত হারাইয়া ফেলে। নিউ গিনির যাদুকরেরা বিশেষ যাদু-ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে দুই সপ্তাহ মাত্র কয়েকটি কলা ভাজা খাইয়া থাকে। যবদ্বীপে বারিপাতের জন্য পুরোহিত একদিন উপবাস করিয়া থাকে। বৃষ্টির জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে যাইবার পূর্বে অনশন করিবার প্রথা সাঁওতালজাতিদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়। জুনিস (Zunis) দিগের মধ্যেও এই প্রথা দেখা যায়। হাইডা (Haida) ইণ্ডিয়ানেরা বায়ুর উপর প্রভুত্ব-বিস্তারের জন্য অনশন করিয়া থাকে।

প্রায়শ্চিত্তে অনশন

অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে অনশনের প্রচলন দেখা যায়। পাপকর্ম করিয়া মনে অনুতাপ উপস্থিত হইলে অনশনের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান অনেক ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়। অনশনের দ্বারা পাপকর্মের শাস্তির মাত্রা হ্রাস প্রাপ্ত হয় অথবা ক্রুদ্ধ দেবতাদের ক্রোধের উপশম হয় এমন ধারণার বশবর্তী হইয়াও লোকে অনশন করে। এইরূপ অনশনের ক্ষেত্রে প্রার্থনা ও নানাবিধ ধর্মানুষ্ঠান করিতে প্রায়ই দেখা যায়। ইহুদী ও খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে এইরূপ প্রথার বহুল প্রচলন আছে।

প্রাচীন মেক্সিকোবাসীদিগের মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অনশন করিবার নিয়ম ছিল। পাপকর্মে দুষ্ট আত্মার শোধনকল্পে এই অনশন একদিন হইতে মাসাধিককাল পর্যন্ত পালন করা হইত। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে জাতিগতভাবেও অনশন পালিত হইত। আসিরিয়ায় এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। প্রায়শ্চিত্তরূপে অনশন গ্রহণ করিলে সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখ বর্জন করিবার নির্দেশ ইজিপ্টে ছিল। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তে অনশন-ব্যবস্থা স্বীকার করা হইয়াছে। মহম্মদ নিজে প্রায়শ্চিত্তে অনশনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক সমর্থ ব্যক্তিকেই রমজানে প্রথম ত্রিশ দিন সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিরম্বু উপবাস করিতে হয়। গোঁড়া মুসলমানেরা প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার

অনশন করিয়া থাকেন। অতীত পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্যই এই সমস্ত অনশন অবলম্বন করিবার নিয়ম আছে। হিব্রুরাও প্রায়শ্চিত্তে অনশন অবলম্বন করিত।

সন্ন্যাসজীবনে অনশন

সন্ন্যাসজীবনে অনশন-প্রথার প্রচলন অনেক দেশেই দেখা যায়। সম্ভবত ভারতবর্ষ হইতেই জগতের বিভিন্ন দেশে ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বে মিশরে ভারতীয় প্রভাবে যে সন্ন্যাসীর দল গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারা সূর্যাস্তের পূবে কিছুই আহার করিত না; অনেকে আবার তিন দিন বা ছয় দিন অন্তর আহার করিত। ইহুদীদিগের মধ্যেও সন্ন্যাসীদিগকে অনশন পালন করিতে দেখা গিয়াছে। আলেক্জাণ্ড্রিয়ার (Alexandria) ইহুদীদিগের মতই ছিল যে দৈহিক কামনা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথের অন্তরায়; সুতরাং সন্ন্যাস-জীবনে অনশন অপরিত্যাজ্য। মুসলিম-ধর্মের অন্তর্গত সুফীসম্প্রদায় অনশনকে ধর্মের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণও অনশনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন।

অনশন-সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মবিধি

জগতের প্রায় সমস্ত ধর্মেই অনশনকে সমর্থন করা হইয়াছে। প্রাচীন Celtদিগের ধর্মে অনশন প্রথার উপর গুরুত্ব আরোপিত হইত। প্রাচীন মেক্সিকো, পেরুভিয়া, বাবিলোনিয়া ও আসিরিয়ায় প্রায়শ্চিত্তে ও বলিদানে অনশন করিবার নিয়ম ছিল। প্রাচীন মিশরে ও রোমে অল্পাধিক ধর্ম-কার্যে অনশন প্রচলিত ছিল। গ্রীক দার্শনিকগণ অনশনের উপর বিশেষ জোর দিতেন। হিন্দু ও জৈনদিগের মধ্যে দেখা যায় যে তাহাদের নিকট অনশন প্রায় প্রত্যেক ধর্মকার্যের অঙ্গস্বরূপ। বুদ্ধদেব নিজে অনশনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিলেও বৌদ্ধগণ ধর্মকার্যে অনেক সময়ে কঠোর অনশন অবলম্বন করিয়া থাকেন; মহাযান বৌদ্ধেরা অনশনের পক্ষপাতী ছিলেন। চীনের তাও-ধর্মে[10] (Taoism) অনশনকে ইহার অঙ্গস্বরূপ বলিয়া গণ্য করে। ইহুদীগণও ধর্মকার্যোপলক্ষ্যে অনশন করিয়া

থাকেন। বাৎসরিক Day of Atonement[11]এ তাঁহারা অনশন করিয়া থাকেন। কোর-আনে অনশন অবলম্বনের নির্দেশ প্রচুর দেখা যায়। প্রতি বৎসরের নবম মাসে (রমজান-উপলক্ষ্যে) প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দিবাভাগে অনশন করিতে হয়। অসমর্থ ব্যক্তিগণ বৎসরের অন্য মাসে উপবাস করিয়া থাকেন। খ্রীস্ট-ধর্মাবলম্বিগণ যদিও বর্তমানে অনশনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না, তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্রে অনশন অবলম্বনের নানাবিধ নির্দেশ দেখা যায়। যীশু খ্রীস্ট স্বয়ং অনশন করিয়াছিলেন (L.c. iv 2); অনশনকে ধর্মের অঙ্গহিসাবে গ্রহণ করিতে তাঁহার অনুগামীদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলেন (Mk. ii. 19 seq); এবং তাঁহার মতে প্রার্থনা ও দানের ন্যায় অনশনও আড়ম্বরশূন্য হওয়া উচিত (Mt. vi. 16 seq.)।

জোরোয়স্ত্রীয় ধর্মে অনশন বা উপবাস নিতান্ত পাপ বলিয়া গণ্য। এই ধর্মের অনুশাসন এই যে পাপ না করাই প্রকৃত অনশন বা উপবাস। এ সত্ত্বেও জোরোয়স্ত্রীয়রা কেহ মরিয়া গেলে তিনরাত্রি অনশন করিয়া থাকে।

ভারতীয় মত

মৃত্যুসঙ্কল্প করিয়া এক, দুই, তিন, সাত, নয় দিন-ব্যাপী অথবা একমাস ব্যাপী উপবাস। শাস্ত্রে নির্দেশ আছে যে এইরূপ অনশন করিলে বহু পুণ্য লাভ হয়। গরুড়পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের প্রতি উপদেশ করিয়াছেন যে, যে কোন ব্যক্তি অনশন করিয়া প্রাণত্যাগ করে, সে মানুষী তনু পরিত্যাগ করিয়া আমার তুল্য হইয়া বিরাজ করিতে পারে। অনশনব্রত করিয়া যতদিন জীবিত থাকিবে, সে সমস্ত দিনগুলি তাহার পক্ষে এক একটি সদক্ষিণ ক্রতুদিবস তুল্য হইয়া থাকে।

'কৃত্বা নিরশনং যো বৈ মৃত্যুমাপ্নোতি
কোঽপি চেৎ।
মানুষীং তনুমুৎসৃজ্য মম তুল্যো
বিরাজতে।

যাবন্ত্যহানি জীবেত ব্রতে নিরশনে কৃতে।

ক্রতুভিস্তানি তুল্যানি সমপ্রবরদক্ষিণৈঃ ॥—উ. ৩৬. ৫-৬।

মহারোগ উপস্থিত হইলেও যদি কেহ অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া প্রাণত্যাগ করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তির পুনর্জ্জন্ম হয় না; সে দেবগণের ন্যায় স্বর্গে বিরাজ করিয়া থাকে।

'মহারোগোপপন্তৌ চ গৃহীতেঽনশনে কৃতে।

পুনর্ন জায়তে রোগো দেববদ্ধি বিরাজতে ॥—ঐ, ৮।

অনশনব্রত মনুষ্যকে বৈকুণ্ঠপদ প্রদান করে। সুস্থ শরীরে অনশন ব্রত করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

'তস্মাৎ স্বস্থে চোত্তরে বা সাধয়েন্মোক্ষলক্ষণম্।—ঐ, ১২।

যে ব্যক্তি তীর্থবাসী হইয়া অনশনব্রত দ্বারা প্রাণত্যাগ করে সে সপ্তর্ষিমণ্ডলে বাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অনশনব্রত আচরণ দ্বারা স্বগৃহে দেহত্যাগ করে, সে আপনার কুল পরিত্যাগ করিয়া একাকী স্বর্গে বিচরণ করে। যে ব্যক্তি অন্ন ও জল পরিত্যাগ করিয়া আমার পাদোদক পানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে, সে কখনও পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করে না। অনশনপরায়ণ তীর্থস্থ ব্যক্তিকে কুলদেবতারা রক্ষা করেন, যমদূতগণ তাহাকে কোনরূপ যাতনা দিতে পারে না।

'যস্তীর্থ সম্মুখো ভূত্বা ব্রতে হ্যনশনে কৃতে।

চেন্ম্রিয়েঽতান্তরালেপি ঋষীণাং মণ্ডলেঽধসৎ ॥

ব্রতং নিরশং কৃত্বা স্বগৃহেঽপি মৃতো যদি।

স্বকুলানি পরিত্যজ্য একাকী বিচরেদ্দিবি ॥

অন্নঞ্চৈব তথা তোয়ং পরিত্যজ্য নরো যদি।

পীতমৎপাদতোয়শ্চ ন পুনর্জায়তে ক্ষিতৌ ॥

সত্যাসীনং তীর্থগতং রক্ষন্তি কুলদেবতাঃ।

যমদূতা বিশেষেণ ন ধর্ম্যাস্তস্য পার্শ্বগাঃ।

—ঐ, ১৪-১৭।

অনশনব্রত করিয়াও যদি কেহ জীবিত থাকে, তবে সে ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া সর্ব্বস্ব দান করিবে এবং সেই সকল ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনুগত

হইয়া চান্দ্রায়ণব্রত আচরণ করিবে; কখনও মিথ্যা বাক্য বলিবে না, সর্বদা ধর্মাচরণ করিবে।

'কৃত্বা নিরশনং তার্ক্ষ্য পুনর্জীবতি মানবঃ।
ব্রাহ্মণান্ স সমাহূয় সর্বস্বং যৎ পরিত্যজেৎ॥
চান্দ্রায়ণং চরেৎ কৃৎস্নমনুজ্ঞাতশ্চ তৈ দ্বিজৈঃ।
অনৃতং ন বদেৎ পশ্চাদ্ধর্মমেব সমাচরেৎ॥'

—ঐ, ২০-২১।

অনশন বলিলে মৃত্যু সঙ্কল্পপূর্বক উপবাস বুঝায়। সাধারণ উপবাসকে অনশন বলে না। উপবাসের অভ্যাস পরিণত স্তর প্রাপ্ত হইলে তাহা অনশন নামে অভিহিত হয়। অনশন সাধারণত ত্রিবিধ—স্বল্পানশন, অর্ধানশন ও পূর্ণানশন।

অগ্নিপুরাণে (২০৪ অধ্যায়) কৃচ্ছ্রাদি দ্বারা মাসোপবাসব্রতের বিধান আছে। এই ব্রতে প্রথমে বৈষ্ণবযজ্ঞ করিয়া গুরুর অনুমতি লইয়া আপনার শক্তি বুঝিয়া কার্য করিতে হয়। বানপ্রস্থ, যতি অথবা বিধবা স্ত্রীর পক্ষে আশ্বিন মাসের অমল পক্ষের একাদশীতে উপবাস আরম্ভ করিয়া ত্রিশ দিন পর্যন্ত উপবাসব্রত পালনবিধি। উপবাস আরম্ভের পূর্বে ব্রতীকে বলিতে হয়—

'অদ্যপ্রভৃত্যহং বিষ্ণো যাবদুত্থানকং তব।
অর্চয়েত্বামনশ্নন্ হি যাবৎ ত্রিংশদ্দিনানি তু॥
কার্ত্তিকাশ্বিনয়োর্বিষ্ণোযাবদুত্থানকং তব।
ম্রিয়ে যদ্যন্তরালেঽহং ব্রত ভঙ্গো ন মে ভবেৎ।'

—২০৪, ৪-৫।

ব্রতীকে বৃথাবাদ পরিত্যাগ করিতে হইবে, অর্থাকাঙ্খা বিসর্জন দিতে হইবে, দেবায়তনে অবস্থান করিতে হইবে। ব্রতী একমাস ক্রমান্বয়ে দেবকথাকীর্তন করিবে, সাধুসঙ্গ আশ্রয় করিবে এবং ব্রতহীন ব্যক্তির স্পর্শত্যাগ করিবে এবং বিকর্মস্থদিগের সহিত আলাপ বর্জন করিবে। মাসোপবাস ব্রতের পক্ষে বহু অনুষ্ঠানের উপদেশ এই অধ্যায়ে আছে। ব্রতী বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রাচীন ভারতে অনশন সম্বন্ধে বহু তথ্য জানিতে পারা যায়। শ্বেতকেতু ১৫ দিন অনশনের পর সমগ্র বেদ ভুলিয়া গিয়াছিলেন (১.৯৭)। কার্ত্তিকমাসে প্রত্যহ একবার মাত্র হুতোপযোগী খাদ্য গ্রহণ করিলে পাপশূন্য হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব পাওয়া যায়। বিষ্ণুর পূজায় অনশনের ব্যবস্থা আছে। ঋষিদের পক্ষেও অনশনের ব্যবস্থা আছে। কোন কোন সম্প্রদায় অনশনের পক্ষপাতী হইয়া তাহা অনুমোদন করেন। আবার কোন সম্প্রদায় অনশন একেবারে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তির তুলনায় মূঢ় ব্যক্তি অনশন করিলে ধর্মজ্ঞের ষোড়শাংশের সে যোগ্য নয়, ইহা বুদ্ধদেব ধর্মপদে উপদেশ দিয়াছেন। বৌদ্ধদের সুত্তনিপাতে[১২] পাওয়া যায় যে, অনশন মানুষকে পরিশুদ্ধ করে না; তবে একথা বলা হইয়াছে যে, মুনি অল্প আহার করিবেন। অগ্ন্যাধেয় অনুষ্ঠানের পূর্বে উপবসথ অর্থাৎ অনশন দিবস। আর্য-শাস্ত্রে এরূপও পাওয়া যায় যে উপবাস করা অপেক্ষা ভিক্ষা বৃত্তি শ্রেয়। গৃহস্থ ও ছাত্রদের পক্ষে অনশন নিষিদ্ধ। তবে সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ করিলে অনশন বিধেয়।

উপনিষদ উপদেশ করিয়াছে অনশনের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ আত্মাকে অবগত হইতে চেষ্টা করেন। অনশন কৃচ্ছ্রসাধন বা তাহার অংশ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্রতে অনশনের বিধান আছে। শবদাহের পর অনশনে থাকিতে হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন ব্যবস্থা নাই। মনু স্বয়ং বলিয়াছেন—

'নাস্তি স্ত্রীনাং পৃথগ্ যজ্ঞে ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্

পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥'—মনু. ৫.২৫৫।

মনু বলেন,—উত্তমর্ণগণ প্রাপ্য অর্থ আদায় করিবার জন্য অধমর্ণের দ্বারে অনশন করিয়া হত্যা দিয়া থাকে। যজমানের দীক্ষার সময় দুগ্ধপান অনশন-রূপে কল্পিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী দৈনন্দিন বেদপাঠের শেষে উপবাস করিবে, কিন্তু যখন সে কোন স্থানে যাত্রা করিবে, সে যাত্রাকালে অনশন করিবে না। অমঙ্গল যাহাতে না হয় তজ্জন্য অমঙ্গলসূচক কোন চিহ্ন দেখিলে অনশন করিতে হয়। কোন শুভ অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে উপবাসের ব্যবস্থা আছে। পর্ব উপলক্ষ্যে বিশেষ বিশেষ বাসনাপূরণের জন্য

উপবাসের বিধি আছে। যখন কোন ব্যক্তিকে কাহারও জমির সীমানা স্থির করিয়া দিতে হয়, তৎপূর্বে তাহাকে উপবাস করিতে হয়। যজমানকে উপবাসকালে নিজেকে দেবতাদের নিকট নিবেদন করিতে হয়। সৌত্রামণী-যাগে অনশন অবশ্য কর্তব্য। প্রত্যেক যজ্ঞের শীর্ষস্থান অনশন এবং দীক্ষা তাহার শরীর।

মৎস্যপুরাণে (১০৮. ৩-৫) দেখা যায় যে মার্কণ্ডেয় ঋষি যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন যে, প্রয়াগে অনশন করিলে পদে পদে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। অনশনকারী অহীনাঙ্গ, নীরোগ ও পঞ্চেন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি দশ ঊর্ধ্ব ও দশ অধস্তন কূল উদ্ধার করে, সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রে (১.৯.২৫) অনশন সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ আছে। কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া অথবা দৈনন্দিন আহারের অংশ হ্রাস করিয়া জীবনত্যাগের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যদি কেহ নিষিদ্ধ দ্রব্য আহার করে তাহা হইলে যে পর্যন্ত না তাহার অন্ত্রগুলি বেশ পরিষ্কৃত হইয়া খালি হইয়া যায় তদবধি তাহাকে অনশন করিতে হইবে। সাধারণত সাতদিন পরে অন্ত্রের এই অবস্থা প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।—১.৯.২৭.৩-৪। এই আপস্তম্বে দ্বাদশাহ কৃচ্ছ্রের (penance) বিধি এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—তিনদিন সায়ংকালে কিছু খাইতে পারিবে না। তারপর তিনদিন প্রাতঃকালে ভোজন নিষিদ্ধ। তিনদিন অযাচিতভাবে যাহা পাইবে তাহাই খাইতে হইবে এবং তিনদিন সম্পূর্ণ অনশনে থাকিবে।—মনুসংহিতা (১১ ২১২) এবং যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা (৩.৩২০) প্রাজাপত্য কৃচ্ছ্র সম্বন্ধে এই একই কথা বলিয়াছে।

আপস্তম্বে আরও এইরূপ নির্দেশ আছে যে, যদি কাহারও কোন সময়ে আহার কালে মনে পড়ে যে, সে অতিথিকে ফিরাইয়া দিয়াছে তাহা হইলে তাহাকে তখনই আহার ত্যাগ করিতে হইবে ও সেইদিন অনশনে থাকিতে হইবে।—আপ-শ্রৌ. ২.৪ ৯.১৪। বশিষ্ঠসংহিতায় নির্দেশ আছে যে, যদি কেহ চান্দ্রায়ণ দ্বারা নিজ হস্তে মরিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে তিনদিন অনশন থাকিতে হইবে।—বশিষ্ঠ-স. ২৩.১৮। যদি কেহ

আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়া না মরিয়া জীবিত থাকে তাহা হইলে তাহাকে বারদিন কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হইবে। অতঃপর সে ত্রি-অহোরাত্র অনশনে থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে সে ঘৃতম্রক্ষিত পরিচ্ছদে আবৃত থাকিবে এবং শ্বাসরোধ করিয়া তিনবার অঘমর্ষণ উচ্চারণ করিবে।—বশিষ্ঠ-স. ২৩ ১৯।

যদি কেহ বেদোচ্চারণকারী ব্যক্তিদিগের মধ্য দিয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে অহোরাত্র অনশন করিতে হইবে।

যদি কেহ দৈবাৎ কুকুর, মোরগ, গ্রাম্য-শূকর, গৃধ্র, ভাস, পাবারত, মানুষ, কাক বা পেচকের মাংস গলাধঃকরণ করিয়া থাকে তাহা হইলে প্রথমে তাহাকে সাতদিন অনশন করিতে হইবে। এইরূপে অন্ত্র খালি হইলে সে ঘৃত সেবন করিবে এবং পুনরায় দীক্ষিত হইবে। বিষ্ণুসংহিতায় অনুরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ৫১ অধ্যায়ে (৩-৪) লশুন, পলাণ্ডু, গৃঞ্জন, এতদ্‌গন্ধী (অর্থাৎ লশুনাদি গন্ধযুক্ত দ্রব্য) বিড়্‌বরাহ, গ্রাম্য-কুক্কুট, বানর এবং গো (এতদন্যতমের) মাংস ভোজনে সর্বকর্মবর্জিত হইয়া এক বর্ষ কণা মাত্র ভোজনবিধি এবং পুনঃসংস্কারও কর্তব্য। এতদ্ভিন্ন ষষ্ঠ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে শশক, শল্লক, গোধা, গণ্ডার এবং কূর্ম ব্যতীত অপর পঞ্চনখ জন্তুর মাংসাশনে সাতদিন অনশন করিবে। আপস্তম্ব (২.৪.৯.৩১) বেদপাঠের সময় যদি কেহ চণ্ডাল প্রভৃতি নীচজাতির গোলমাল শ্রবণ করে তাহা হইলে তাহাকে পাঠ বন্ধ করিয়া বসিতে হইবে এবং তিনদিন অনশন করিতে হইবে। যদি কেহ জ্ঞানী ব্রাহ্মণ হত্যা অপরাধদুষ্ট হয় তাহা হইলে তাহাকে মাত্র জলপান করিয়া দ্বাদশ দিন থাকিতে হইবে এবং তৎপরেও দ্বাদশ দিন সম্পূর্ণ অনশন করিতে হইবে।—ঐ. ২.৪.৯ ৩৮।

ব্রহ্মচারী, ব্রত সমাপনের পূর্বে যদি প্রেত-শ্রাদ্ধের অন্নভোজন করে তবে তিনদিন উপবাস করিবে ও একদিন জলে দণ্ডায়মান থাকিবে।—মনু. ১১. ১৫৭। বিষ্ণু-সংহিতায় (৫৪. ২৯) উক্ত হইয়াছে যে, বেদোক্ত নিত্যকর্মলঙ্ঘন ও স্নাতকব্রত লোপে অনশনই প্রায়শ্চিত্ত। মেধাতিথি, কুল্লুক ও নারায়ণ এই শ্লোকের কথা বলেন যে, এই অপরাধে একদিন অনশন প্রায়শ্চিত্ত। অত্রি নানা কারণে অনশন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। চান্দ্রায়ণ-ব্রত সম্বন্ধে তিনি বলেন, শুক্ল প্রতিপদে একগ্রাস মাত্র খাইবে, ঐ

দিন হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতিদিন এক-এক গ্রাস আহার বাড়াইবে অর্থাৎ পূর্ণিমা পর্যন্ত তিথি সংখ্যানুসারে গ্রাস সংখ্যা হইবে; এবং কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে প্রতিদিন এক গ্রাস কমাইবে ও অমাবস্যাতে উপবাস করিবে।—অত্রি-স. ১১১-১১২। তিনি সান্তপন-ব্রত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে. গব্য দুগ্ধ, গব্য দধি, গোমূত্র, গোময় এবং গব্য ঘৃত এই পঞ্চগব্য পান করিয়া পরদিন নিরম্বু উপবাস করিবে।—ঐ, ১১৬। অতঃপর মহাসান্তপন-ব্রত করিতে হইলে পঞ্চ গব্যের এক-একটি এক-একদিন, (কোন দিন দুগ্ধ মাত্র, কোন দিন দধি মাত্র, ইত্যাদি) এই রূপ পাঁচদিন, এবং একদিন মিশ্রিত সকল পঞ্চগব্য পান করিবে; এই ছয়দিনের পর সপ্তম দিনে উপবাস করিবে —ঐ, ১১৭। প্রাজাপত্য-ব্রত সায়ংকালে দ্বাদশ গ্রাস, প্রাতঃকালে পঞ্চদশ গ্রাস, অযাচিত তিন দিবসে চতুর্বিংশতি গ্রাস খাইতে হইবে, পরের তিন দিন উপবাস করিতে হইবে। অতিকৃচ্ছ্র-ব্রতে প্রাজাপত্য-ব্রতের মত তিন দিন রাত্রিতে, তিনদিন দিবসে ও তিনদিন অযাচিত দ্রব্য ভোজন করিতে হইবে কিন্তু এই নয়দিনে এক-এক গ্রাস মাত্র ভোজন করিতে হইবে; পরে তিনদিন অনশনে থাকিতে হইবে।—ঐ, ১১৯-১২০। তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত করিতে হইলে তিনদিন ছয় পল পরিমিত উষ্ণজল, তিনদিন ত্রিপল পরিমিত উষ্ণদুগ্ধ এবং তিনদিন একপল পরিমিত উষ্ণঘৃত পান করিয়া, তিন দিন বায়ুভুক হইয়া থাকিতে হইবে। বৈদিক কৃচ্ছ্রব্রতেও তিনদিন ত্রিপল দধি, তিনদিন ত্রিপল ক্ষীর এবং তিনদিন এক পল পরিমিত ঘৃত পান করিতে হয়, আর তিনদিন বায়ুভুক হইয়া থাকিতে হয়।—ঐ, ১২২-১২৫। পাদকৃচ্ছ্রব্রতে একদিন এক বার মাত্র ভোজন; একদিন রাত্রিতে অযাচিত ভোজন এবং একদিন উপবাস করিতে হয়।—ঐ, ১২৬। একবিংশতি দিন দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া থাকাকে "কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র-ব্রত এবং দ্বাদশ দিন উপবাস করাকে "পরাক"-ব্রত কহে।—ঐ, ১২৭। সৌম্যকৃচ্ছ্র-ব্রতে চারদিন প্রত্যহ পিণ্যাক্ (তিলের খোল), দধি, শক্তু (ছাতু) এই কয় দ্রব্যের এক-এক গ্রাস ভোজন ও একদিন উপবাস করিতে হয়।—ঐ, ১২৮। এইরূপ নানা কারণে অনশন করিবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন সংহিতাকারগণ প্রদান করিয়াছেন। অনাবশ্যক বিবেচনায় সেগুলি উল্লিখিত হইল না।

জৈন মত

জৈনগণের মতে অনশন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—

বিচার=সচল ও অবিচার=নিশ্চল। অনশনের অনুরূপ বিভাগও আছে—সপরিকর্ম ও অপরিকর্ম। অথবা ইহা অন্য দুই শ্রেণীতেও বিভক্ত হইতে পারে—নির্হার ও অনির্হার। এই সকল শ্রেণী ব্যতীত জৈনদিগের অনশন ত্রিবিধ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। ১ ভক্ত-প্রত্যাখ্যান, ২ ইঙ্গিনী ও ৩ পাদোপোপগমন।

ভক্তপ্রত্যাখ্যান বলিলে বুঝিতে হইবে যে কোন জৈন গুরুতর অপরাধ করিয়া স্বীয়গুরু ও সজ্জনগণের নিকট নিজ অপরাধ স্বীকার করিবেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সর্বপ্রকার ভোজন ত্যাগ করিয়া অনশন-ব্রতী হইবেন। তবে তিনি ইচ্ছা করিলে জলপান করিতে পারিবেন। যদি স্বয়ং চলিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে অপরের সাহায্য লইয়া চলিতে পারেন। ইঙ্গিনী অনশনে পূর্ববৎ অপরাধ স্বীকার্য; কিন্তু তাঁহার জলগ্রহণ নিষিদ্ধ। ইঙ্গিনী-ব্রতী বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে কাহারও সাহায্য না লইয়া চলিতে পারেন। পাদপোপগমন নামক অনশনেও অপরাধ পূর্ববৎ স্বীকার্য; কিন্তু ব্রতী নিশ্চল হইয়া বিশেষ নির্জন স্থানে মৃত্যু পর্যন্ত একাসনে থাকিবেন। ইঁহার পক্ষে আসন ত্যাগ নিষিদ্ধ। জৈন গৃহস্থেরা অনশন ব্রত-রূপে পালন করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। জৈনকল্পসূত্রে বিভিন্ন প্রকারের অনশন ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। অনশনবশতঃ যে মানসিক দৌর্বল্য হয় ইহারও উল্লেখ জৈনগণ করিয়াছেন। বর্ষাকালে একত্র বাস করিয়া ব্রতপালন করার নাম পর্যুষণা। ভাদ্র মাসের পর্ববিশেষকেও পর্যুষণা বলে। এই পর্যুষণার সময়ে যতিগণ নানাভাবে অনশন করিয়া থাকেন। পর্যুষণার সময়ে যে সকল যতি দিনে একবার মাত্র আহার করেন তাঁহারা একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভিক্ষা-সংগ্রহের নিমিত্ত বাহির হইয়া থাকেন। যাঁহারা একদিন অন্তর মাত্র একবার আহার করেন তাঁহারা প্রাতঃকালে বাহির হইয়া প্রাতরাশ করেন এবং তাহার পর ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কার করেন। যদি তাঁহাদের আহার অল্প বলিয়া বোধ হয় তাহা লইলে তাঁহারা আর একবার ভিক্ষা সংগ্রহে বাহির হইতে পারেন। এই পর্যুষণার সময়ে যে যতি দুই দিন অন্তর

আহার করেন তিনি দুই বার ভিক্ষা করিতে পারেন ; কিন্তু যিনি প্রত্যেক চতুর্থ দিনে আহার করেন তাঁহার তিনবার ভিক্ষায় বাহির হইবার অধিকার আছে। যে যতি আরও অধিক দিন অনশনব্রত পালন করেন তিনি যে কোন সময়ে ভিক্ষায় বাহির হইতে পারেন। যে যতি দিনে একবার মাত্র আহার করেন, তিনি সর্বপ্রকার পানীয় গ্রহণ করিতে পারেন। যে যতি একদিন অন্তর আহার করেন তিনি তিন প্রকার পানীয় গ্রহণ করিতে পারেন—যেমন ময়দা মাখিবার জল, তিল পরিষ্কার করিবার জল এবং চাউল ধুইবার জল। যে যতি দুই দিন অন্তর আহার করেন তিনি তুষ, তিল ও যব পরিষ্কার করিবার জল—এই তিন প্রকার পানীয় গ্রহণ করেন। যে যতি প্রত্যেক চতুর্থ দিনে একবার আহার করেন তিনি গরম জল, কাঁজি ও বৃষ্টির জল—এই তিন প্রকার পানীয় গ্রহণ করেন। যে যতি ইহারও অধিক দিন ব্যাপী অনশন করেন তাঁহার মাত্র পবিত্র গরম জল পান করিবার অধিকার আছে ; কিন্তু সেই জলে সিদ্ধ চাউল থাকিবে না। যে যতি একেবারেই আহার করেন না, তিনি মাত্র এক প্রকার পানীয় গ্রহণ করিতে পারেন—তাহা পবিত্র গরম জল—ইহাতেও সিদ্ধ চাউল থাকিবে না।—কল্পসূত্র. ২৯৮-৩০০।

[বঙ্গীয় মহাকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৯১-৩৯৭]

প্রসঙ্গ-কথা

1 Celt : পশ্চিম ইউরোপে বসবাসকারী একটি প্রাচীন জাতি।

2 Mater Magna : গ্রীসের পৌরাণিক দেবী রিয়ার নামান্তর।

3 Attis : পৌরাণিক ফ্রিজিয়ান দেবী সিবেলা-অ্যাগডিসটিসের বীর পুত্র।

4 আলি (হজরত) : হজরত মহম্মদের শিষ্য ও জামাতা। মহম্মদের পিতৃব্য আবুতালেবের পুত্র। ৩য় খলিফা ওসমানের মৃত্যুর পর ৬৫৬ খ্রী. ইনি খলিফা পদ লাভ করেন ও ৬৬০ খ্রী. গুপ্তঘাতক কর্তৃক আহত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।—কাজী আবদুল ওদুদ : হজরত মোহম্মদ ও ইসলাম, পৃ. ২৮৭-৮.

5 হাসান ও হুসেন : এঁরা দুই ভাই হাসান (আ. ৬২৫-৬৬৯) ও হুসেন (৬২৯-৬৮০)। হজরত মহম্মদের কন্যা ফতেমা বিবির পুত্র। পিতা আলির মৃত্যুর পর হাসান খলিফা পদের জন্য চেষ্টা করলে এঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এঁর মৃত্যু ঘটায়। হাসানের হত্যার পর হোসেন হত্যা-কারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান, কিন্তু তিনিও কারবালা প্রান্তরে শত্রু হস্তে অন্যায়ভাবে নিহত হন। এঁর মৃত্যুদিবস শিয়া সম্প্রদায়ের মুশলমানদের অত্যন্ত শোকের দিন।—মীর মশাররফ হোসেন : বিষাদসিন্ধু

6 Cherokee : জাতিবিশেষ। ইউনাইটেড স্টেটের ইরোকুইঅন-বংশীয়। দক্ষিণ অ্যালিঘানিতে বাস। প্রাচীনকালে এদের গুহা-মানব বলত। ১৭শ শতাব্দীতে এরা ব্রিটিশের পক্ষে আমেরিকার বিপক্ষে যুদ্ধ করে। ১৮৩৮ সাল থেকে ওকলাহোমায় বাস করে এবং ১৯০৬ সালে চিরোকীরা আমেরিকার নাগরিক হয়। —*En. Brit.*

7 জুলু : জুলুগণ দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার জুলুল্যাণ্ডের অধিবাসী। এই প্রদেশ অধুনা নেটা উপনিবেশের অন্তর্গত।

8 মোজেস (মুসা। খ্রী-পূ. ১৫৭১-১৪৫১): ইহুদীদের ধর্মবিধি প্রণেতা। মিশরে জন্ম। বাল্যকালে মেষপালক। কথিত ইহুদীদের মিশর থেকে প্যালেস্টাইনে নিয়ে যেতে ঈশ্বর আদেশ দেন। মোজেস (মুসা) সেই আদেশ পালন করেন। মোজেস ভগবানের আদেশে ১০টি আজ্ঞা দেন—তা লঙ্ঘন করলে পাপের ভাগী হতে হয়। ইহাই বাইবেলের দশ আজ্ঞা নামে খ্যাত।—*En. Brit.*

9 ডেনিয়েল (Daniel): ইহুদীদের ধর্মগুরু।

10 Taoism : চীনজাতির প্রাচীনকালের অতি প্রচলিত ধর্ম। চৈনিক লাও-ৎসু (৬০৪ খ্রী-পূ.) এই ধর্ম প্রবর্তন করেন।—*ERE*

11 Day of Atonement : যীশুখ্রীস্টের নরকলেবর ধারণ ও মৃত্যুর ফলে ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের পুনর্মিলন দিবস।

12 সুত্তনিপাত : বৌদ্ধ গ্রন্থবিশেষ। ইহা ক্ষুদ্দকনিকায়ের অন্তর্ভুক্ত।

অলঙ্কার

"নাভি কা সুগন্ধ মৃগ নহী জানত
ঢুঁড়ত ব্যাকুল হোই॥"

হরিণ দেখে তাহার চারিদিক সুগন্ধে আমোদিত, সারা বন গন্ধে ভরিয়া গিয়াছে। হরিণ গন্ধে মাতোয়ারা হইয়া বনের চারিদিক, ঝোপের এদিক-ওদিক অন্বেষণ করে; বুঝিতে পারে না সে—এ মধুর প্রাণমাতানো গন্ধ কোথা হইতে আসিল। গন্ধের আকর যে তাহারই মধ্যে বিরাজ করিতেছে, তাহারই অভ্যন্তরস্থ কস্তুরীর গন্ধ যে তাহারই আশপাশ সৌরভে মাতাইয়া তুলিয়াছে—অজ্ঞান হরিণ বেচারা তাহা বোঝে নাই; তাই সে চারিদিকে এমন ব্যাকুল হইয়া ঢুঁড়িয়া বেড়াইতেছে।

সকল যুগে সকল অবস্থায় মানুষ সৌন্দর্যের উপাসক। সে সৌন্দর্যের অন্বেষণে চিরজীবন ঘুরিয়া বেড়ায়। মানুষ পৃথিবীতে জন্মায়, সেখানে সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য কিছুদিন সুখ-দুঃখ ভোগ করে, হাসে-কাঁদে, এই করিয়া মৃত্যুকে বরণ করে। কিন্তু যতদিন সে পৃথিবীতে থাকে, সৌন্দর্যের আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া তাহারই সন্ধানের জন্য ধন, ঐশ্বর্য, সুখ, যশ, প্রতিপত্তির মধ্যে সৌন্দর্যের অন্বেষণে সে ছোটে। সৌন্দর্যের জন্য সে লালায়িত, কিন্তু জানে না সে, তাহার সৌন্দর্যোপলব্ধি কিসে হইবে। অথচ তাহার নিজের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহাকে পাইবার জন্য সে নিরবধি অসহ্য দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে চায়। নিজের অজ্ঞাতসারে নিশ্চয়ই সে এমন একটা কিছুর আস্বাদ পাইতেছে যাহাকে ছাড়িয়া থাকা তাহার পক্ষে

অসম্ভব। তাহাকে সেই অজ্ঞাত বস্তুর জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াই যেন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু সৌন্দর্যের আকর যে তাহারই মধ্যে মানুষ তাহা না বুঝিয়া সংসারের আবর্তে নিরন্তর ঘুরিয়া মরিতেছে। আপনার শরীর ও মনের আশ্রয়ে সে যেসকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, যতদিন সে তাহাদের নিগূঢ় মর্ম ও চূড়ান্ত অর্থ আবিষ্কার করিতে না পারে ততদিন সে বাহ্যসৌন্দর্যের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। যখন তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য মানুষের প্রাণ আকুল হয়, তখন সে এই বিশ্বসমস্যার নির্বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রস্তুত হইতে প্রবৃত্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। ফলে জীবের চরম লক্ষ্য কি তাহাই অনুসন্ধান করিতে থাকে। কিন্তু যতদিন বাহ্যসৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা যাহা তাহা লাভ করিবার সৌভাগ্য মানুষের না হয়, ততদিন সে বাহ্যসৌন্দর্যের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া থাকে। এই বহিঃ-সৌন্দর্যভাবপ্রণোদিত হইয়াই, একদিকে নিজের মতিবুদ্ধি এবং অন্যদিকে সমাজের প্রচলিত রুচির অনুবর্তী হইয়া মানুষ বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। সমাজের সঙ্গে তাহার একটা সম্বন্ধ আছে, একথা সে কখনও ভোলে নাই। তাহার নিজের দারিদ্রের কথাও তাহাকে ভাবিতে হইয়াছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে দশজনের একজন হইয়া থাকিতে হইবে,—সুতরাং তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে যে হইবে তাহাও সে উপলব্ধি করিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে বাধা-বিঘ্ন অন্তরায়ের হাত হইতেও আত্মরক্ষা করিতে হইবে। শরীরে কোন ব্যাধি না হয় এবং পারিপার্শ্বিক ও দৈব ঘটনা হইতে তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে তজ্জন্য তাহাকে চেষ্টা করিতে হইবে। এইজন্য প্রথম-প্রথম মানুষ আভিচারিক তন্ত্রে নানা ধর্মানুষ্ঠান করিতে লাগিল। অঙ্গে রক্ষাকবচ ধারণ করিল। ক্রমশ তাহার মধ্যে তাহার সুপ্ত সৌন্দর্যবোধ জাগিয়া উঠিল। দেশকালপাত্রানুসারে আত্মরক্ষা ও সৌন্দর্য প্রকাশের প্রচেষ্টা হইতে রক্ষাকবচগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপধারণ করিল। স্ত্রীপুরুষভেদে তাহাদের তারতম্য হইল। শনৈ শনৈ অলঙ্কারের সৃষ্টি হইল। বিবাহিত ও অবিবাহিতের পরিচ্ছদের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কারেরও পার্থক্য ঘটিল। ব্যক্তিগত রুচি এবং সমাজের প্রচলিত রুচির প্রভাব অলঙ্কারকে নানা রূপ প্রদান করিল।

সমাজের সকল অবস্থাতেই অলঙ্কারের প্রতি ঝোঁক, সাজসজ্জার প্রতি ঝোঁক মানুষের রহিয়াছে। যখন মানুষ মৃৎপাত্রের ব্যবহার জানিত না, যখন তাহাদের মধ্যে কৃষির প্রচলন হয় নাই, যখন মানুষ জন্তুদিগকে গৃহে পালন করিতে শেখে নাই, সেই আদি প্রত্নযুগেও মানুষের মনে শরীরকে অলঙ্কৃত, ভূষিত ও মণ্ডিত করিবার প্রবৃত্তির উন্মেষ হইয়াছিল। ফুজিয়ান জাতি, আন্দামান দ্বীপের প্রাচীন জাতি প্রভৃতি যে সকল আদিম জাতি আজও বাঁচিয়া থাকিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে শরীর-মণ্ডনের আদিম প্রথার নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া যায়। আদি প্রত্নযুগের মানুষ শরীরে শ্রী ও শোভা সম্পাদনার জন্য স্থায়িভাবে অঙ্গবিশেষের বিকৃতি
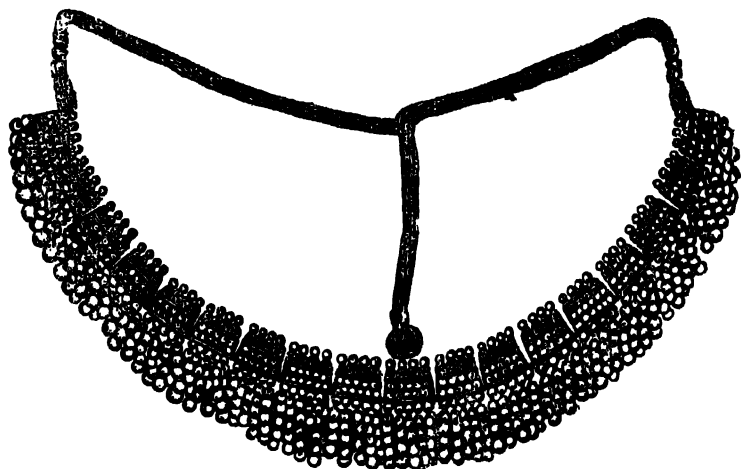
সাধন করিত, উল্কিচিত্রণে অঙ্গ বিভূষিত করিত। অঙ্গে রং ফলাইত এবং রত্নাভরণ প্রভৃতি দিয়া দেহ মণ্ডিত করিত। রত্নাভরণের মধ্যে কণ্ঠে পরিহিত হারের ব্যবহারই আদিম জাতিদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিল। এই হার নানা আকারে, নানা উপকরণে নির্মিত হইত। কণ্ঠাভরণ, নাসালঙ্কার, অধরভূষণ, হস্তাভরণ, চরণ-মণ্ডন ও কটি-মেখলা নানাজাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ, কাল ও জাতিভেদে রুচির বিভিন্নতা অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় অলঙ্কার বিষয়েও সুস্পষ্ট। আদিম যুগে প্রকৃতিজাত

সৌন্দর্য-উপকরণে অঙ্গাভরণের ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। পাখির পালকে শরীর অলঙ্কৃত করিবার প্রথা এখনও রহিয়াছে। প্রশান্ত

মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপের অধিবাসীরা কাকের পালকে দেহ শোভিত
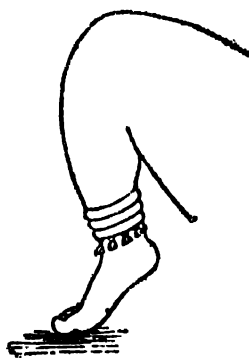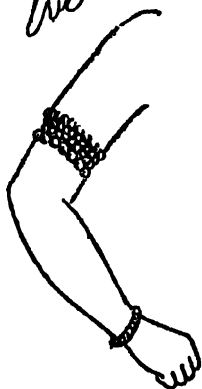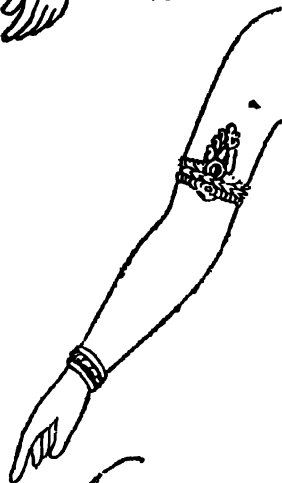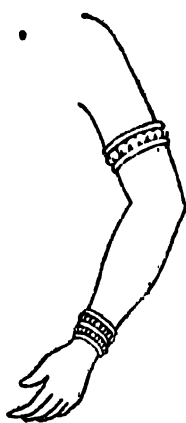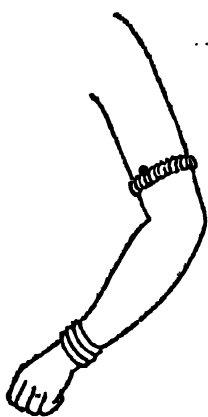
করে। তাহারা কড়ির হারও পরে। ইউরোপের সুসভ্য ইংরেজ অথবা ফরাসী জাতি উটপক্ষী ও ময়ূর প্রভৃতির চাকচিক্যময় পালকের সজ্জা এখনও ভালবাসে। অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসিগণ তাহাদের পূর্বপুরুষের চিহ্নস্বরূপ জন্তু ও বৃক্ষাদি, দেবক প্রভৃতি নিজেদের শরীরে প্রচ্ছান করিয়া থাকে। এক সময়ে মানুষ প্রজাপতির ডানা, নানা প্রকারের বীজ, অত্যুজ্জ্বল প্রস্তর, বিচিত্র পত্র প্রভৃতি অঙ্গে ধারণ করিয়া তাহার অঙ্গশোভা বর্ধন করিয়াছে।
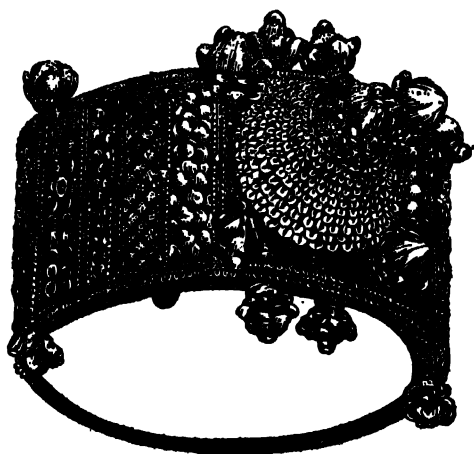
তারপর জ্ঞান ও সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা ধাতুর অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছে। কেমন করিয়া এই সমস্ত প্রসাধনের ব্যাপার ঘটিল তাহা অনু-সন্ধানের বিষয়।

যে করিয়া হউক অলঙ্কার-প্রীতি মানুষের মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। অলঙ্কার কোনদিন মানুষ ত্যাগ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। আমরা বলিয়া থাকি কামকাঞ্চনত্যাগী সংসার-বিরাগী তাপসেরা অলঙ্কারের প্রতি বিরূপ। তাঁহারা কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের জন্য সাধনা করেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও অলঙ্কার ছাড়িতে পারেন না। তাঁহারা যে জটাধারণ করেন, চীর ও উর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করেন, ভস্ম বিলেপন করেন এবং সাম্প্রদায়িক প্রথানুযায়ী রুদ্রাক্ষ, দণ্ড, কমণ্ডলু, সিন্দুর, কর্ণাভরণ, কটি-শৃঙ্খল, চিমটা, ত্রিশূলাদি ধারণ করেন, সেগুলি কি অলঙ্কারের রকমফের

নয়? বৈষ্ণব-বৈরাগীর কৌপীন, বহির্বাস, মালা, তিলক, শিখা, এগুলিও পুরোদস্তুর অলঙ্কার-প্রিয়তার নিদর্শন।

অলঙ্কার শোভা বর্ধন করে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র তাহা বর্জন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। যে-দেশের নীতি উপদেশ দেয় অর্থ অনর্থের মূল—অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্,—সে-দেশে কেবল শোভা সংবর্ধনের জন্য অর্থসাপেক্ষ অলঙ্কারকে বিলাস-ব্যসনের নিদান ভাবা সুযুক্তি ভিন্ন আর কি বলিব? সাধু, সন্ন্যাসী, বৈরাগী অলঙ্কারের প্রতি বীতশ্রদ্ধই হন হউন, কিন্তু গৃহীর পক্ষে অলঙ্কার ত্যাগ করা দুষ্কর। একেবারে অনাবশ্যক এ কথা বলিতে তো আমার সাহসে কুলায় না। অলঙ্কার আমাদের ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানে আমাদের সহায়। বিবাহে আমাদের সালঙ্কারা কন্যা দান করিতে হয়। সর্বকর্মের প্রারম্ভে দেবতা ও গুরু-পুরোহিতের অঙ্গুরীয়-বরণ প্রয়োজন। পারিবারিক স্নেহ-প্রীতি-বন্ধনে অলঙ্কার আমাদের প্রধান অবলম্বন। অর্থবিজ্ঞানের বহু সমস্যার সাধক অলঙ্কার। ইহার প্রসাদে কত শিল্প-কলা, কত বিজ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছে, কত ধাতু ও রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান জাগিয়া উঠিয়াছে।

সকল দেশের চেয়ে ভারতে গহনার আদর বেশী। প্রাচীনতম না হইলেও অপেক্ষাকৃত পুরাতন আর্যগণ অলঙ্কারের খুব প্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের বড় বড় বীর যোদ্ধারা অলঙ্কার পরিতেন। আমাদের স্থাপত্যে গহনাপরা এরূপ যোদ্ধমূর্তি যথেষ্ট আছে। আর সেগুলি সবই এক ধরণের—উৎসবের বেশে সজ্জিত—তদুপযোগী আভরণে অলঙ্কৃত। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে এই সমস্ত মূর্তি যেন একই ছাঁচে ঢালা—পরিবর্তন কাহাকে বলে তাহারা যেন জানেও না, বোঝেও না। আশ্চর্য, ভারতের আশপাশের দেশেও এই একই অপরিবর্তনীয় লীলার অভিনয় হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন আর্যদের এবং আর্য-ঔপনিবেশিকদের উৎসবোপযোগী অলঙ্কারের আকৃতি ও প্রকৃতি ভারতের গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে। অবশ্য দেশ-বিদেশের বিশেষ বিশেষ রুচি ও পদ্ধতির অনুবর্তী হইয়া একই অলঙ্কার বহু আকারে পর্যবসিত হইয়াছে। বর্মা ও সায়ামে, তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ায়, বালি ও যবদ্বীপে রাজাদের উৎসববেশে, বরকন্যার সাজসজ্জায় সেই পুরাতন

ভারতীয় উৎসবের অলঙ্কার কথঞ্চিৎ সংস্কৃত আকারে আজও দেখিতে পাওয়া যায়। নাট্যশালাগুলিতেও যেখানে প্রাচীন চরিত্রের অভিনয় করিতে হয়, সেখানে প্রাচীন অলঙ্কারগুলিও বাদ যায় না। আরও আশ্চর্যের কথা ভারতের অনার্য অধ্যুষিত প্রদেশে, অথবা প্রাচীন সুসভ্য প্রদেশবাসী জাতিসকলেয় নিম্নস্তরের মধ্যে প্রাচীন অলঙ্কারের নিদর্শন যত বেশী পাওয়া যায়, ভারতের প্রাচীন সুসভ্য রাজ্যগুলিতে তাহার একাংশেরও কল্পনা করা যায় না। সুসভ্য দেশে লোকে বেশভূষায় কাল-প্রভাবেরই বশবর্তী হইয়া থাকে।

প্রাচীন অলঙ্কারের মধ্যে শিল্পরুচি ও শিল্পচাতুরী সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তখনকার বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি অসাধারণ কারুকার্য খচিত—শিল্পীর প্রশংসনীয় শিল্পবুদ্ধি অলঙ্কারের ভিতর দিয়া সর্বপ্রকারে আত্মরক্ষা করিয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধদের ভাস্কর্য ও মৃৎশিল্পকৌশল কোনোদিন আসিরীয়দের অলঙ্কৃতির অভ্যাসসিদ্ধ একঘেয়ে একটানা পদ্ধতির মধ্যে আত্মাবমাননা বিঘোষিত করে নাই।

বেশভূষায় দেহমণ্ডনের আকাঙ্ক্ষা সকলেরই মধ্যে প্রবল। আমরা বাঙালী, আমরা আবার অলঙ্কারের অতিমাত্রায় ভক্ত। বাঙালী কতকগুলি অলঙ্কারকে পুণ্যদায়ক মনে করে। 'অনন্ত' তাহাদের মধ্যে একটি। নবরত্নের অঙ্গুরী, অষ্টধাতুর তাগা, নাভিশঙ্খের কেয়ূর আমাদের সৌভাগ্য বর্ধন করিয়া থাকে। কতকগুলি অলঙ্কার পতি-পুত্রের কল্যাণবর্ধন করিয়া থাকে। নিজের আয়তি রক্ষণ করিয়া থাকে বলিয়া স্ত্রীলোকের নিকট সেগুলি আদর, যত্ন ও পূজা পাইয়া থাকে। শাঁখা, নৎ, নোয়া—এই শ্রেণীর অলঙ্কার। সাধারণের বিশ্বাস, গলায় মাদুলী, হাতে কবচ বা তাগা, আঙ্গুলে আংটি, পায়ে কড়া প্রভৃতি ধারণে দেবরোষ, গ্রহদোষ ও রোগশান্তি হয়, বিষদোষ নষ্ট হয়, ভূতপ্রেতের ভয় থাকে না। কোনো কোনো রোগ সারাইবার জন্য লোকে কুমীরের নখ সোনা দিয়া বাঁধাইয়া কোমরে ধারণ করে। কেহ বা সোনা, রূপা ও তাঁবা একসঙ্গে জড়াইয়া অঙ্গুরী করিয়া হাতে দেয়। মৃতবৎসা রমণীরা শিশুর দীর্ঘজীবন কামনায় সদ্যোপ্রসূত সন্তানের নাক ফুঁড়িয়া সোনা, রূপা বা লোহার মাকড়ি অথবা

বামপদে লৌহমল কিংবা সোনার আবরণ দিয়া উচ্ছিষ্ট আমড়া, বাঘনখ ও কুমীরের দাঁত গলায় পরাইয়া দেয়।

আমাদের দেশে একই অলঙ্কার স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহার্য হইলে আকৃতির পার্থক্য হয়। শিশু, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার গহনার আকার ও প্রকারভেদ আছে। আমাদের দেবদেবীর অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য নানা প্রকারের। এক দেবতার যে অলঙ্কার থাকিবে, অন্য দেবতার তাহা থাকিবে না। অলঙ্কার দেখিয়া অনেক সময় দেবমূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দেশবিশেষের ধাতুবিশেষ, রত্নবিশেষ, অলঙ্কারবিশেষ ব্যবহার নিষিদ্ধ। এইরূপ বহু ব্যবহার ও সংস্কার লইয়া আমাদের অলঙ্কারতত্ত্ব বিপুলায়তন হইয়াছে। বাঙালীর গায়ে আজকাল কিছু বেশী মাত্রায় পশ্চিমে হাওয়া লাগিয়াছে ও শিক্ষাদীক্ষায় রীতিও বদলাইয়া গিয়াছে, কাজেই আদর্শ ভিন্ন পথ ধরিয়াছে। তাহার উপর, কালে পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। আগেকার গহনা এখন বেয়াড়া বেখাপ্পা বোধ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। তখনকার দিনে বাঙালীর কানের অনেক গহনা ছিল। ঝুমকা বা ঝুমকো[১] ; পোস্তদানার ফলের অনুকরণে ঢেঁড়ি[২], —তাহার উপর ঘণ্টার মত ঝুমঝুম করিবে বলিয়া ঝুমকা ঢেঁড়ি ; ইহার আর চলন নাই। চাঁপাফুলের অস্ফুট কলি হইতে চাঁপা[২]—ইয়ারিঙ্ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। পিপুলপাত, কর্ণফুল[৩] বা কানফুল, মাকড়ি, দুল, কান, কানবালা, কনকবৌলী[৪], চৌদানী। পুরুষরাও কানে অলঙ্কার পরিত। নাম বীরবৌলী[৫]। এছাড়া আরও কানের গহনা ছিল। কণ্ঠাভরণ ছিল মটরমালা,—ঘুরিয়া ফিরিয়া আজকাল পুনরায় ইহার চলন হইয়াছে। আর ছিল চাঁপাকলি,—এটি চম্পক-কলিকার মালা, বোঁটায়-বোঁটায় গাঁথা দেখিতে অনেকটা নেকলেসের মত। হংসগ্রীবার অনুকরণ করিয়া হাঁসুলী[৬] ; নির্বিষ হেলে সাপের লেজের অনুকরণে হেলেহার ; কামরাঙা-হার, দড়াহার, কণ্ঠমালা, মুক্তমালা, তেনরী, ধুকধুকি, পাঁচ লহর বা পাঁচ হালীর পাঁচনরী, সাতনরী, দানা, মোহনমালা, ঝিলমিলি হার[৭] প্রভৃতি অনেকরকমের হার ছিল ; মেয়েদের কটিভূষণ ছিল—কিঙ্কিনি[৮], গোট, কোমরপাটা, মেখলা, চন্দ্রহার। শিশুদের কটিভূষণ ছিল নিমফলের মত

দানাওয়ালা নিমফল, কুলের আঁটির মত দানাগাঁথা সোনা-রূপার বোর, বোরপাটি বোরপাটা—এগুলি বোর ও তাবিজের মত সোনা-রূপার পাতা গাঁথা ; তেঁতুল বিছার অনুকরণে বিছা। তেঁতুলে বিছার আকৃতির হারও ছিল, তার নামও বিছা—নিমফুলের অনুকরণেই হার নিমফুল। শিশুদের কোমরে বেঙ ও দেওয়া হইত। আবার গোঁপ-হারও ছিল। গোপহারের কল্পনা কিছু উদ্ভট বা উৎকটও মনে হইতে পারে ; গোঁপের সঙ্গে এ হারের কোনো সম্বন্ধ নাই—পশ্চিমবঙ্গের অনুনাসিকের পাল্লায় পড়িয়া হিন্দুস্থানী পুরুষদের গোপ নামক হার আমাদের মেয়েদের গোঁপহার হইয়াছে। যাহা হউক, রমণীদের করতলপৃষ্ঠের শোভা বর্ধন করিত রতনচূড়, তাহারা হাতে পরিত পলাকাটি, যবদানা, মরদানা, মুড়কি আকারে গড়া মুড়কি মাদুলী ; মটরী-কঙ্কণ, গৈয়ে কঙ্কণ, গৈয়ে নোয়া ; কঙ্কণ খাড়ু, নারিকেল ফুল, বালা, শাঁখা[৯], লবঙ্গফুল ; পৈঁছা, বাউটি ; উপর হাতে পরিত তাড়[১০], তাগা, বাজু[১১], জসম, ইত্যাদি। কুলুপা শঙ্খ অনেকদিন আগে বাংলায় চলিত। এটি নাচি-করা শাঁখা। সাধারণত দু-সেট হইত। এক সেট হলুদে, এক সেট সবুজ। হলুদে সেটকে লক্ষ্মণ বলিত ; সবুজ সেটের নাম রাম। রামেশ্বরী সত্যনারায়ণে আছে—"কুলুপা দু-বাই শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।" বাই মানে সেট। মাথার অলঙ্কার ছিল, সীঁথি, ঝাঁপা, ঝাঁপটা[১২], শিরোমণি ; খোঁপার শোভা ছিল—প্রজাপতি, ফুল, চিরুণী, কাঁটা ; রমণীদের নাসাশোভা ছিল নোলক, নথ, বেশর[১৩], লবঙ্গ, শতেশ্বরী ইত্যাদি। পায়ের গহনা ছিল মল, বেঁকি, বাঁকমল[১৪], ঘুমুরগাঁথা মল, ঝুজ্‌ঝুরপাতা মল, হীরাকাটা মল, নূপুর[১৫], নেউর, কেয়ূর, পাশুলি, আনট বিছা,[১৬] গুজরিপঞ্চম, পঞ্চম, পাঁজর, মঞ্জীর, তোড়া, খলখলি, ছরা, ঝুমুর চরণচাপ প্রভৃতি। পায়ের বুড়ো আঙুলের গহনা আঙ্গট, কড়া, চুট্‌কি। হাতের আঙুলের আংটি, মুদরি।

আমি দিগ্‌দর্শন হিসাবে অলঙ্কার সম্বন্ধে দুইটা কথা বলিলাম। এইবার প্রাচীনতম যুগ হইতে আমাদের দেশে অলঙ্কারের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আরও দুইটা কথা বলিব।

চারিখানি বেদের কোনো বেদে 'অলঙ্কার' বলিয়া কোনো শব্দ পাওয়া

যায় না। বেদে কিন্তু 'অরংকৃত', 'অরংকৃতি' শব্দ পাওয়া যায়—অর্থ অলঙ্কার। বৈদিক 'অরম্' শব্দ হইতে 'অলম্' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঋ হইতে অর নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয়ার একবচনে অরম্ [অব্যয় (adv. acc.)], 'অরম্' হইতে 'অলম্'=ঠিক, যথেষ্ট (fit, fitly, justly)। "অলঙ্কার" শব্দ বেদে নাই বলিয়া তখন নরনারীর অঙ্গশোভারূপ অলঙ্কার অথবা কাব্যশোভারূপ অলঙ্কার ছিল না, একথা বলা যাইতে পারে না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ভূষণ, আভরণ প্রভৃতি অলঙ্কার-পর্যায়ের কোন শব্দই বেদে নাই। বেদে অনেক অলঙ্কার বা গহনার নাম পাওয়া যায়। অলঙ্কার বাচক শব্দ বেদে নাই তাহাও নয়। ঋক্‌সংহিতায় দেখা যায় মরুদ্গণ অলঙ্কারের বিশেষ প্রিয় ছিল (১.৬৪ ; ৮.২০ ; ১০.৭৮)। তাহারা সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার পরিয়া শরীরের শোভা বর্ধন করিত। রুদ্রকে ঋগ্বেদে উজ্জ্বল স্বর্ণালঙ্কারমণ্ডিত ও কণ্ঠহার শোভিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মরুদ্গণ ও অশ্বিদ্বয়েরও অনুরূপ বর্ণনা আছে। দেবপ্রতিদ্বন্দ্বী অসুরদেরও স্বর্ণ ও মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কার ছিল। ঋষি কক্ষিবান্ স্বর্ণকুণ্ডল ও রত্নহার-শোভিত পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারাদির কথা আছে। বৈদিক অলঙ্কার বুঝাইতে একটি সাধারণ শব্দের প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। সে শব্দটি অঞ্জ বা অঞ্জি। একটা উদাহরণ দেওয়া গেল।

"চিত্রৈরঞ্জিভির্বপুষে ব্যঞ্জতে বক্ষঃসু রুক্মাঁ অধি যেতিরে শুভে।
অংসেষ্বেষাং নি মিমৃক্ষুর্ঋষ্টয়ঃ সাকং জজ্ঞিরে স্বধয়া দিবো নরঃ" ॥

—ঋ. ১.৬৪ ৪

—"শোভার জন্য মরুদগণ নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা স্বশরীর অলঙ্কৃত করেন। শোভার নিমিত্ত বক্ষে সুন্দর হার ধারণ করেন। অংসদেশে আয়ুধ ধারণ করেন, নেতা মরুদ্গণ অন্তরীক্ষ হইতে স্বকীয় বলের সহিত প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।"

ম্যাকডোনেল[২] ও কীথ[৩] তাঁহাদের 'বৈদিক সূচী'তে মাত্র একুশটি অলঙ্কারের নাম দিয়াছেন। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয়া যায়—

ঋগ্বেদ

১। আনূক। ২। ওপশ। ৩। কর্ণশোভন। ৪। কুরীর। ৫। কৃশন; ৬। কৃশনিন্। ৭। খাদি। ৮। নিষ্ক। ৯। ন্যোচনী। ১০। পুণ্ডরীক। ১১। পুষ্কর। ১২। প্রভূষণ। ১৩। বর্হন। ১৪। ভূষণ। ১৫। মণি। ১৬। রত্ন। ১৭। রুক্ম। ১৮। রুক্মি। ১৯। ললামী। ২০। বরিমৎ। ২১। ব্যঞ্জন। ২২। বিষন। ২৩। শতপত্র। ২৪। সিবন। ২৫। সুনিষ্ক। ২৬। স্রুকা। ২৭। হিরণ্যয়ী। ২৮। হিরণ্যশিপ্র। ২৯। হিরামৎ।

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় আরও কয়েকটি নূতন নাম

৩০। পুণ্ডরিস্রজ্। ৩১। প্রাকাশ। ৩২। ভোগ। ৩৩। স্রজ্।

অথর্ববেদে আরও কয়েকটি নূতন নাম

৩৪। কুম্ব। ৩৫। জীবভোজন (অঞ্জন)। ৩৬। দেবাঞ্জন। ৩৭। নলদ। ৩৮। নিষ্কগ্রীব। ৩৯। নীনাহ (=কোমর-পাট্টা)। ৪০। প্রসাধন। ৪১। মধুলক। ৪২। রুক্মস্তরণ। ৪৩। ললাম। ৪৪। ললামগু। ৪৫। ললাম্য। ৪৬। সীমন্। ৪৭। সুরুক্ম। ৪৮। সুস্র। ৪৯। স্বন্দাঞ্জি। ৫০। হরিত-স্রজ্। ৫১। হিরণ্যজ। ৫২। হিরণ্যস্রক। ৫৩। হৈরণ্য।

এইগুলির কোন-কোনটির অর্থ সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছেন; যেমন গেল্ডনার[4] (Geldner) বলেন, "আনূক" শব্দের অর্থ 'ভূষণ'; কিন্তু রোট[5] (Roth), লুড্ভিগ[6] (Ludwig) ও ওলডেনবার্গ[7] (Oldenburg) বলেন, ইহারা ক্রিয়ার বিশেষণ। ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ "ভূষণ" অর্থই স্বীকার করিয়াছেন। আমাদেরও তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

উপরিলিখিত শব্দগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখি যে, বৈদিক যুগে স্বর্ণালঙ্কার ও মণিমুক্তার অলঙ্কারের প্রচলন ছিল। তখন 'ওপশ' ছিল—কেশালঙ্কার। মাথার ভূষণ ছিল 'কুম্ব'। কর্ণশোভন তো ছিলই। সে যুগে রমণীরা মাথায় আরও একটা গহনা পরিত—তার নাম ছিল 'করীর'। তাহারা পায়ে পরিত 'খাদি'। গলায় পরিত 'নিষ্ক'। এছাড়া 'প্রবর্ত' নামে একরকম গোলাকৃতি অলঙ্কার ছিল। তখনকার মেয়েরা

মাথার সম্মুখের দিকে ঝালর দেওয়া রত্নখচিত সীঁথি পড়িত। এই সীঁথির মাঝখানে চন্দ্রাকৃতি খচিত থাকিত। খোঁপার সঙ্গে ইহারই একাংশ লাগাইয়া দেওয়া হইত। এই সীঁথি চার রকমের, তাহাদের নাম—ললাম, ললামী, ললাম্য ও ললামগু। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে সুবর্ণনির্মিত স্রকের কথা আছে। বৈদিককালে সোনার অর্ধচন্দ্রাকৃতি একরকম হার ছিল তাহার নাম 'রুক্ম'। ইহা বক্ষের শোভা সম্পাদন করিত। তারপর 'ফণ', 'প্রাকাশ', 'মণি', 'মনা', 'শঙ্খ', স্রুক—আরও কত রকমের ভূষণ ছিল।

অলঙ্কার শব্দ চারি বেদে নাই বটে, কিন্তু উল্লেখের অভাব অনস্তিত্বের কারণ হয় নাই। শতপথব্রাহ্মণে অলঙ্কার শব্দের প্রথম প্রয়োগ পাওয়া যায়—

"অঞ্জনাভ্যঞ্জনে প্রযচ্ছত্যেষ হ মানুষোঽলঙ্কারঃ।"

—১৩. ৮. ৪. ৭ ; ৩. ৫. ১. ৩৬

তারপর উপনিষদ্-যুগে অলঙ্কার শব্দের প্রচার হয়; মৃত্যুর পর পরজীবনে বস্ত্রালঙ্কার ব্যবহারের জন্য শবের সহিত বস্ত্র ও অলঙ্কার দেওয়া হইত। অথর্ববেদে (১৮. ৪. ৩১) তাহার নিদর্শন আছে। উপনিষদেও তাহার নজির পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য-উপনিষদে (৮. ৮. ৪) গহনা (ornament) অর্থে অলঙ্কার শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়—"প্রেতস্য শরীরং বসনেনালঙ্কারেণ সংস্কুর্বন্তি"—৮. ৮. ৫। এখানে প্রেতের শরীরকে বসন দিয়া অলঙ্কার দিয়া সংস্কার করা হইতেছে। ছান্দোগ্যে গহনারও নাম আছে—রাজা জানশ্রুতি রৈক ঋষিকে ছয় শত গরু; একটি নিষ্ক ও অশ্বতরী-যুক্ত রথ দান করিয়াছিলেন। এ নিষ্ক ছিল হার "রৈক্বেমানি ষট্শতানি গবাময়ংশ্বতরীরথো নুমত্রতাং ভগবো দেবতাং শাধি য়াং দেবতা মুপাস্ম ইতি। তমুহপরঃ প্রত্যুবাচাহহারে ত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত্ব"—৪র্থ অধ্যায়। বৈদিক যুগে 'সৃঙ্কা' নামে অত্যুজ্জ্বল হারের নাম কঠবল্লীতে (১. ১৬) পাওয়া যায়। যম নচিকেতাকে একটি সৃঙ্কা দিয়াছিলেন।

"তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ সৃঙ্কাঞ্চেমা মনেকরূপাং গৃহাণ" (১. ১৬)

গহনার নাম অলঙ্কার হইল কেন? প্রাচীনকালের ঋষিদের মধ্যে একজন ইহা লইয়াও মাথা ঘামাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নারীকে যত কিছু দাও না কেন, তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না। তাহাকে ভালো

কাপড়, ভাল খাবার, ভাল জিনিস. যাহাই দাও, সে 'না' বলিবে না—যেমনি তাহাকে গহনা দিবে অমনি সে খুশী হইয়া বলিবে 'আর না' 'অলম্' 'বেশ হইয়াছে'। এই অলং করা হয় বলিয়া গহনার নাম হইয়াছে 'অলংকার'। অলঙ্কারের এটি একটি প্রাচীন সুরসিক শাব্দিকের সরস তাৎপর্য।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রের পূর্বে অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনা কোথাও দেখা যায় না। পরবর্তী কোষগ্রন্থে অলঙ্কারের নাম ও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রের ২১শ অধ্যায়ে ভরত অলঙ্কার লইয়া অনেক কথাই বলিয়াছেন। তিনি অলঙ্কারকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, অলঙ্কার আবেধ্য, বন্ধনীয়, ক্ষেপ্য ও আরোপ্য। কুণ্ডলাদি আবেধ্য; শ্রোণীসূত্র, অঙ্গদাদি বন্ধনীয়; নূপুর, বস্ত্রাভরণ ক্ষেপ্য; স্বর্ণসূত্র ও নানাপ্রকার হার আরোপ্য।

"চতুর্বিধন্তু বিজ্ঞেয়ং দেহস্যাভরণং বুধৈঃ।
আবেধ্যং বন্ধনীয়ঞ্চ ক্ষেপ্যমারোপ্যকস্তথা॥
আবেধ্যং কুণ্ডলাদীহ যৎস্যাচ্ছ্রবণভূষণম্।
শ্রোণীসূত্রাঙ্গদৈর্মুক্তা বন্ধনীয়া বিনির্দিশেৎ॥
প্রক্ষেপ্যং নূপুরং বিদ্যাদ্বস্ত্রাভরণমেব চ।
আরোপ্যং হেমসূত্রাণি হারাশ্চ বিবিধাশ্রয়াঃ॥

—নাট্যশাস্ত্র, ২১.১১-১৩

তারপর তিনি বিশেষভাবে নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, চূড়ামণি আর মুকুট হইল শিরোভূষণ। কর্ণের অলঙ্কার—কুণ্ডল। মুক্তাবলী অর্থাৎ মুক্তাহার হর্ষক এবং সূত্র কণ্ঠভূষণ। অঙ্গুলির আভরণ হইল বটিকা ও অঙ্গুলিমুদ্রা। কেয়ূর ও অঙ্গদ—কূর্পরের ভূষণ। ত্রিসর ও হার গ্রীবা ও স্তনমণ্ডলের ভূষণ। তরল ও সূত্রক এই দুইটি কটিভূষণ ছিল। তখন দেহ-ভূষণ বলিলে বুঝাইত মুক্তহার ও মালা। এগুলি সাধারণত বেশ বিলম্বিত হইত। এই সমস্ত অলঙ্কার পুরুষরা পরিত।

"চূড়ামণিঃ সমুকুটঃ শিরসো ভূষণং স্মৃতম্।
কুণ্ডলং কর্ণমেবৈকং কলাকরণমিষ্যতে॥

মুক্তাবলী হর্ষকঞ্চ সসূত্রং কণ্ঠভূষণম্।
বটিকাঙ্গুলিমুদ্রা চ স্যাদঙ্গুলিবিভূষণম্॥
ত্রিসরশ্চৈব হারশ্চ গ্রীবাবক্ষোজভূষণম্।
তলং সূত্রকঞ্চৈব ভবেৎ কটিবিভূষণম্॥
অয়ং পুরুষনির্যোগঃ কার্যস্ত্বাভরণাশ্রয়ঃ।
ব্যালম্বিমুক্তিকা হারা মালাখ্যা দেহভূষণম্॥ ২১. ১৫-১৮

তারপর দেবতাদের ও মর্ত্যবাসিনী রমণীদের অলঙ্কারের কথা ভরত মুনি বর্ণনা করিয়াছেন। সেই অলঙ্কারগুলির নাম ভরত নাট্যশাস্ত্রে (২১.১৯-২১) এইরূপ—

শিখাপাশ। কুণ্ডল। শিখাজাল। খড়্গপত্র। খণ্ডপত্র। বেণীগুচ্ছ। চূড়ামণি। দারক। মকরিকা। ললাটতিলক। মুক্তাজাল। গুচ্ছ (ভ্রূ এবং কক্ষের উপরিভাগে ধারণ করা হইত)। গবাক্ষি। কুসুম (নানারকম ফুলের অনুকরণে স্বর্ণাভরণ)।

এ ছাড়া, কানের গহনার নাম (২১.২২-২৪)—কর্ণিকা, কর্ণবলয়, পত্রকর্ণিকা, আপেশ্রক, কর্ণমুদ্রা, কর্ণোৎপল, নানারত্নখচিত দন্তপত্র। গণ্ডস্থলেরও গহনার নাম—তিলক ও পত্রলেখা। যাস্কের[৪] নিরুক্তে এবং পাণিনির[৫] অষ্টাধ্যায়ীতে শুধু অলঙ্কারের উল্লেখ আছে তাহা নহে, বিভিন্ন প্রকার নানা অলঙ্কারের নাম ও বর্ণনা আছে। একটা উদাহরণ দিতেছি—পাণিনি ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া শব্দের বুৎপত্তি করিয়াছেন। এক জায়গায় (৪.৩.৬৬) দুইটি ভূষণের নাম করিয়াছেন। কর্ণে থাকে বলিয়া একটি গহনার নাম 'কর্ণিকা', ললাটে থাকে বলিয়া আর একটি অলঙ্কারের নাম 'ললাটিকা'। তাহার সূত্র হইল—"কর্ণললাটাৎকনলঙ্কারে"। ইহার বৃত্তি এই—"কর্ণললাটশব্দাভ্যাং কন্ প্রত্যয়ো ভবতি তত্র ভব ইত্যেতস্মিন্ বিষয়েঽলঙ্কারেঽভিধেয়ে"। 'বৎ' প্রত্যয় (৪.৩.৫৫) না হইয়া সেইখানে আছে এই অর্থে 'কন্' প্রত্যয় হইবে।

রামায়ণে (সুন্দর ২.৬) লিখিত আছে, লঙ্কাপুরযোষিদ্গণের কর্ণে বজ্র অর্থাৎ হীরকখচিত বৈদূর্যমণিখচিত কুণ্ডল ছিল। মহাভারতেও (বন. ৫৭) মণিকুণ্ডলের উল্লেখ আছে। ভাগবতেও (১০.২৯.৪) গোপাঙ্গনাদের

কৃষ্ণাভিসার বর্ণনায় তাহাদের বলা হইয়াছে—আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতো-দ্যমাঃ সবত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলা। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের একটি স্ত্রী-মূর্তির কর্ণে 'তালপত্র' নামক কর্ণাভরণের নিদর্শন আছে। অমরকোষের বর্ণনার সহিত ইহার মিল আছে। ভুবনেশ্বরের (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের[10] Indo-Aryans) ৬৪ সংখ্যক চিত্রের কর্ণাভরণ বাংলাদেশের ঝুমকার অনুরূপ। ৬৫ সংখ্যক মূর্তি—মণিকর্ণিকা। ৬৬ নং চিত্র পুরীর কাষ্ঠশিল্প হইতে গৃহীত। এই মূর্তির অনুরূপ কর্ণাভরণ বাংলাদেশে 'ঢেঁড়ী' নামে পরিচিত। ৬৩, ৬৪, ৬৫ নং চিত্রের কর্ণাভরণগুলি স্বর্ণনির্মিত ও তাহাতেও মণি-মুক্তা সুক্ষ্মভাবে খচিত ছিল।

কৌটিল্যের[11] অর্থশাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীনকালে বহু-প্রকার অলঙ্কারের প্রচলন ছিল। বহুবিধ কণ্ঠহারের মধ্যে শীর্ষক, উপশীর্ষক, প্রকাণ্ডক, অবঘাটক ও তরলপ্রতিবন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার মুক্তাহারের উল্লেখ বহু গ্রন্থে পাওয়া যায়। সমান আকৃতির মুক্তামালার হার রচনা করিয়া কেন্দ্রস্থলে একটি বড় মুক্তা দিয়া 'শীর্ষক' প্রস্তুত হইত। এইরূপ হারের কেন্দ্রস্থলে পাঁচটি বড় বড় মুক্তা থাকিলে তাহাকে উপশীর্ষক বলিত। 'প্রকাণ্ডকে' ক্রমহ্রাসমান মুক্তামালায় রচিত হারের কেন্দ্রস্থলে একটি বড় মুক্তা থাকে। অবঘাটক সমান অবয়বের মুক্তামালায় রচিত হইত। মুক্তা-হারের কেন্দ্রস্থলে একটি উজ্জ্বল মুক্তা দিয়া যে হার রচিত হইত তাহার নাম —তরলপ্রতিবন্ধ। এক হাজার আট লহরে 'ইন্দ্রচ্ছন্দ', ইহার অর্ধেক লহরে 'বিজয়চ্ছন্দ' এবং চৌষট্টি লহরে 'অর্ধহার' নামক মুক্তাহার রচিত হইত। এতদ্ভিন্ন চুয়ান্ন গাছি মুক্তামালার লহরে 'রশ্মিকলাপ', বত্রিশ লহরে 'গুচ্ছ', সাতাশ লহরে 'নক্ষত্রমাল', চব্বিশ লহরে 'অর্ধগুচ্ছ', বিশ লহরে 'মানবক' এবং দশ লহরে 'অর্ধমানবক' হার রচিত হইত। উপরোক্ত হারগুলির ঠিক মধ্যভাগে একটি বড় মুক্তা বসাইয়া দিয়া সৌন্দর্যবৃদ্ধি করা হইত ; এইরূপ হার 'বিজয়চ্ছন্দ-মানবক', 'অর্ধহার-মানবক' ও 'রশ্মিকলাপমানবক' প্রভৃতি আখ্যা পাইত।

অনেক গাছি মুক্তামালায় লহরের হারগুলি আবার শীর্ষক, উপশীর্ষক, প্রকাণ্ডক, অবঘাটক এবং তরলপ্রতিবন্ধ প্রভৃতির আদর্শেও প্রস্তুত হইত।

উপরোক্ত আদর্শে রচিত হারগুলিকে 'শুদ্ধহার' বলিত ; এইরূপ 'ইন্দ্রচ্ছন্দ-শীর্ষক', 'ইন্দ্রচ্ছন্দ-উপশীর্ষক' প্রভৃতি হার ছিল।

মুক্তামালায় রচিত অন্য প্রকার হারের নাম ফলকহার ; এইসকল হারের মধ্যভাগে তিনটি, পাঁচটি করিয়া চ্যাপ্টা মুক্তা বসান থাকিত ; এইরূপ তিনটি চ্যাপ্টা মুক্তাখচিত হারকে 'ত্রিফলক' এবং পাঁচটি মুক্তাখচিত হারকে 'পঞ্চ-ফলক' বলিত। একগাছি লহরে রচিত মুক্তাহারকে 'একাবলি' এবং 'একাবলি'র' মধ্যভাগে একটি 'মণি' বসানো থাকিলে তাহাকে 'যষ্টি' বলিত। এইরূপে হারের মধ্যে মধ্যে স্বর্ণমালা থাকিলে তাহাকে 'রত্নাবলী' বলিত।

পরপর একগাছি করিয়া মুক্তাহার এবং সমান অবয়বের স্বর্ণহারে রচিত হারকে 'অপবর্তক' হার বলা হইত। দুই গাছি মুক্তাহারের মধ্যে একগাছি স্বর্ণলহরা দিয়া 'সোপানক' প্রস্তুত হইত। এইরূপ হারের মধ্যভাগে একটি 'মণি' খচিত থাকিলে তাহাকে 'মণি-সোপানক' বলা হইত। স্বর্ণখচিত অপবর্তক, সোপানক, মণি-সোপানক, যষ্টি, একাবলি প্রভৃতি প্রাচীনকালে শিরোহার, কঙ্কণ, বলয় ও নুন্টিকা প্রভৃতি মুক্তাখচিত অলঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায়।

অর্থশাস্ত্রে স্বর্ণকারদেরও কথা আছে। সদর রাস্তার কেন্দ্রস্থলে স্বর্ণকারের দোকান থাকিত ; উচ্চবংশের সচ্চরিত্র নিপুণ কারিগর ভিন্ন অন্য কেহ দোকান খুলিতে পারিত না। স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার বিভাগ বা ব্যবসায় যাহাতে সততার সহিত চালিত হয়, সেইজন্য রাষ্ট্রের একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকিতেন ; তাঁহার অধীনে 'অক্ষশালা' থাকিত। এই অক্ষশালায় স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতুর কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হইত এবং স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হইত। স্বর্ণকারগণ স্বর্ণের গুণনির্ণয়ে এবং ধাতুদ্রব্যাদি সম্বন্ধে রসায়নবিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। অক্ষশালায় চারিখানি কক্ষ এবং মাত্র একটি দ্বার থাকিত ; অক্ষশালায় স্বর্ণকারগণ এবং যাহাদের সেখানে কাজ রহিয়াছে তাহারা ভিন্ন কেহই প্রবেশ করিতে পারিত না। ইহার নিয়মাবলী অত্যন্ত কঠোর ছিল। স্বর্ণকারগণ বিশুদ্ধ স্বর্ণের কাঞ্চন, পৃষিত (শূন্য গর্ভ), তন্ত্রী বা মণিখচিত স্বর্ণ এবং তপনীয় প্রভৃতি বিবিধ স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতে নিযুক্ত থাকিত। অক্ষশালায় যে স্থানে বসিয়া স্বর্ণকারগণ কার্য

করে, তাহাদের কোন কার্য যে-পর্যন্ত সমাপ্ত না হয়, সেই পর্যন্ত সেইখানে অসমাপ্ত দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি থাকিত। তাহারা কার্যের জন্য যে স্বর্ণ গ্রহণ করিত, দৈনিক কার্য সমাপন করিয়া তাহার হিসাব তাহাদের বুঝাইয়া দিতে হইত। যে-সকল অলঙ্কার সমাপ্ত হইত তাহা কারিগর ও তত্ত্বাবধায়কের শীলমোহরে বন্ধ করিয়া রাখা হইত।

ক্ষেপণ, গুণ এবং ক্ষুদ্র—এই তিন প্রকার অলঙ্কারের কাজ ছিল। কাচের দানায় স্বর্ণখচিত-করণের কাজকে ক্ষেপণ বলা হয়। স্বর্ণের লহরকে গুণ বলিত। এতদ্ভিন্ন নিরেট অথবা শূন্যগর্ভ বিবিধ মালা তৈরী হইত, তাহাকে 'ক্ষুদ্র' বলা হইত।

স্বর্ণকারগণকে স্বর্ণ দিলে সেই পরিমাণ রাজমুদ্রাও প্রস্তুত করিয়া দিতেন; সাধারণ লোকও এইরূপ স্বর্ণবিনিময়ে স্বর্ণকারগণের নিকট হইতে মুদ্রা গ্রহণ করিতে পারিতেন। স্বর্ণকারগণ এইজন্য রাষ্ট্রের অধীনে বিশেষ তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইতেন।

শূদ্রকের[12] মৃচ্ছকটিকে একজন মণিকারের বিপণিবর্ণনায় আমরা মুক্তা, হীরক, মণিমাণিক্য, পদ্মরাগমণি, প্রবাল, গোমেদ, বৈদূর্যমণি প্রভৃতির এবং স্বর্ণে খচিত বিবিধ মণি-মুক্তার কারুকার্যের উল্লেখ পাই। বিভিন্ন অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্যবিচারে ইহার উপাদান, দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি ও সংস্কৃতির কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হয়; শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে শিল্পের উপাদান বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট; যে দ্রব্য বা পদার্থ হইতে যে অলঙ্কার প্রস্তুত হয়, তাহার সঙ্গে সেই অলঙ্কারের মৌলিক যোগ রহিয়াছে। কর্দম অথবা পাথরে যে কারুকার্য করা হয়, তাহার সঙ্গে নিশ্চয়ই সূতার কারু-কার্যের পার্থক্য রহিয়াছে। প্রত্যেক কারুকার্যেই একটি ছন্দ ও একটি সুর রক্ষিত হয়; তাহা দেখিলেই শিল্পীর রুচি ও সংস্কৃতির আভাস পাওয়া যায়।

কাব্যেও অলঙ্কারের ছড়াছড়ি। পুরুষরাও নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান করিত। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। মেঘদূতের যক্ষ "কনকবলয়ভ্রংশরিক্ত-প্রকোষ্ঠ"—প্রকোষ্ঠ হইতে তাহার কনকবলয় ভ্রষ্ট হইয়াছে। আবার ভাল কাজ করিলে তাহার পুরস্কারের জন্য এগুলি দানও করা হইত। চারুদত্ত কর্ণপূরককে পুরস্কার দিতে উদ্যত হইলেন। পূর্বে তাঁহার ধন ছিল, তখন

গহনা পরিতেন। এখন অদৃষ্টের পরিহাসে তিনি নিঃস্ব,—কিন্তু তাঁহার মনে নাই—তাঁহার অঙ্গে ভূষণ নাই। পূর্ব-অভ্যাসবশত শীঘ্র অলঙ্কার খুলিয়া দিতে গেলেন। কিন্তু অঙ্গের যেখানে যেখানে অলঙ্কার ধারণ করা হয়, সেই সেই স্থানে হাত দিয়া দেখিলেন—আভরণ নাই। তখন নিরুপায় হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসসহ উত্তরীয় নিক্ষেপ করিলেন। মুদ্রারাক্ষসে দেখা যায়, রাক্ষস অলঙ্কার পরিয়া মলয়কেতুর নিকট যাইতেছেন। পর্বতক এই অলঙ্কারগুলি পরিতেন। রাক্ষস নিবেদন করিতেছেন—"উচ্যতাং শকটদাসঃ। যথা পারধাপিত কুমারেণাভরণানি বয়ম্। তন্নযুক্তমনলঙ্কৃতৈঃ কুমারদর্শনমনুভবিতুম্। অতো যত্তদলঙ্করণত্রয়ং ক্রীতং তন্মধ্যাদেকং দীয়তাম।"—শকটদাসকে বল, কুমার আমার অলঙ্কার পরিয়াছেন অলঙ্কার না পরিয়া কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করা অনুচিত। সুতরাং যে তিনটি অলঙ্কার কেনা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একটি যেন পাঠাইয়া দেন। 'রত্নাকর' একখানি অ[illegible] প্রাচীন গ্রন্থ। মল্লিনাথ মেঘদূতের টীকায় এই গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। মল্লিনাথকৃত একটি বচন এই—

"কচধার্যং দেহধার্যং পরিধেয়ং বিলেপনম
চতুর্ধা ভূষণং প্রাহুঃ স্ত্রীণামন্যচ্চ দৈশিকম।"

--উত্তরমেঘ, ১৩ শ্লোকের টীকা।

এই গ্রন্থের মতে রমণীদিগের অলঙ্কার চতুর্বিধ (১) 'কচধার্য', অর্থাৎ যাহা মস্তকে ধারণ করা যায়, ২) 'দেহধার্য'—অঙ্গশোভন অলঙ্কার, (৩) 'পরিধেয়'—বস্ত্রাদি, (৪) 'বিলেপন'—চন্দন, কস্তুরী প্রভৃতি। ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিশেষ বিশেষ অলঙ্কার 'দৈশিক' নামে অভিহিত

সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় তখন নূপুর, বলয়, কাঞ্চী, হার ও কুণ্ডলের খুবই প্রচলন ছিল।

রাজশেখরের [illegible] 'কর্পূরমঞ্জরী'তে পাই—

"মরগ অমস্তীয়জুঅং চরণে সে লম্ভিআ বঅস্সাহিং।
তীএ নিঅম্বফলএ ণিবেসি আ পঙ্করাঅ মণিকঞ্চী।
দিণ্ণা বলআ বলিও করকমল পট্টণাল জুঅলম্মি।"

—বয়স্যরা চরণে নূপুর পরাইয়া দিল। নিতম্বফলকে পদ্মরাগমণির

কাঞ্চী নিবেসিত হইল। করকমলে বলয়, কণ্ঠে মুক্তাহার দেওয়া হইল, আর কর্ণে কুণ্ডলযুগল স্থাপিত হইল।

কর্পূরমঞ্জরীর অন্যস্থানেও পাওয়া যায়—সুন্দরীর হিন্দোল-লীলার আন্দোলনের সহিত তাহার মণিনূপুর রণিত হইতেছে, হার ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিতেছে, মেখলার কিঙ্কিণী কণিত হইতেছে, চঞ্চল বলয়ের মধুর নিনাদ শ্রুত হইতেছে।

তখনকার দিনে সুচতুর স্বর্ণকারদের দক্ষতাও লক্ষণীয়। মৃচ্ছকটিকের চতুর্থ অঙ্কে ইহার বেশ আভাস পাওয়া যায়। শিল্পিগণ বৈদূর্য, মৌক্তিক, প্রবাল, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীল, কর্কেতরক, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতির রত্ন বাছাই করিতেছে। স্বর্ণ দিয়া মাণিক্য বসাইতেছে। সোনার গহনা তৈরী করিতেছে। লাল রঙের সূত্র দিয়া মুক্তাভরণগুলি গাঁথিতেছে। বৈদূর্যমণি ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিতেছে। শঙ্খ কর্তন করিতেছে—শানে প্রবাল ঘর্ষণ করিতেছে।

প্রাচীনকালে কণ্ঠাভরণ দুই রকমের ছিল। যাহা কণ্ঠে সংলগ্ন থাকিত, তাহার সাধারণ নাম ছিল 'গ্রৈবেয়ক'। হৃদয়দেশে কথঞ্চিৎ বিলম্বিত হইলে তাহার নাম হইত 'ললন্তিকা'। ললন্তিকা সোনার হইলে তাহাকে 'প্রালম্বিকা' বলিত—আর মুক্তার হইলে 'উরঃসূত্রিকা' নামে অভিহিত হইত।

সুশ্রুত[14] (সূত্রস্থান ১৬ অধ্যায়) বলিয়াছেন—

"রক্ষা-ভূষণনিমিত্তং বালস্য কর্ণৌ বিধ্যতে।"

বাণ[15] তাঁহার হর্ষচরিতে 'ত্রিকণ্টক' নামক কর্ণাভরণের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"কদম্বমুকুলস্থূলমুক্তাফলযুগলমধ্যাধ্যাসিত মরকতস্য ত্রিকণ্টককর্ণাভরণস্য প্রেঙ্খকঃ প্রভয়া।"

শিশুপালবধে কৃষ্ণের কুণ্ডলে গারুত্মতমণির কথায় পাই—

"তস্যোল্লসৎ কাঞ্চনকুণ্ডলাগ্র-প্রত্যুপ্তগারুত্মতরত্নভাসা"—২.৩৩

তারপর শিল্পশাস্ত্রে ও কোষগ্রন্থে অলঙ্কারের বেশ একটি পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। নিঘণ্টু ও যাস্কের নিরুক্ত ও পাণিনির পরে অমরাদির কোষগ্রন্থে অলঙ্কারের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মিশ্রকল্প—পত্র, রত্ন ও অন্যান্যের সংমিশ্রণে তৈরী। এইগুলি দেবতা ও রাজাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরী।

সাধারণ অলঙ্কারের নাম—

পাদনূপুর, কিরীট, মল্লিকা, কুণ্ডল, বলয়, মেখলা, হার, কঙ্কণ, শিরোভূষণ, কর্ণভূষণ, কেয়ূর, কর্ণ, চূড়ামণি, বালপট্ট, নক্ষত্রমালা (২৭টি মুক্তা দেওয়া), অর্ধহার (৬৪ লহরযুক্ত), সুবর্ণসূত্র (হৃদয়শোভা), রত্নমালিকা, চির (চারফেরা নেকলেস), সুবর্ণকঞ্চুক, হিরণ্যমালিকা (সোনার চেন), লম্বহার, পাদজাল, মকরভূষণ, মিশ্রিত ও রত্নকল্প, (রাজা ও দেবতা ব্যবহার্য), রত্নপুষ্প, রুদ্রবন্ধ, লম্বপত্র, বলয়।

ময়মত প্রভৃতি শিল্পশাস্ত্রে অলঙ্কারের যথেষ্ট পরিচয় আছে। মানসারেও অনেক কথা আছে। মানসার[16] বলে—শরীরের সাধারণ অলঙ্কারের নাম 'অঙ্গভূষণ'—গৃহের আসবাব 'বহির্ভূষণ'। মানসার মতে অলঙ্কার চতুর্বিধ—পত্রকল্প, চিত্রকল্প, রত্নকল্প ও মিশ্রিত বা মিশ্রকল্প। এগুলি দেবতার উপযোগী। তবে চক্রবর্তী রাজা পত্রকল্প ব্যতীত আর তিনটি ব্যবহার করিতে পারেন। অধিরাজ ও নরেন্দ্র নামক রাজা রত্নকল্প ও মিশ্রিত পরিতে পারেন। অন্যান্য রাজাদের ভূষণ মিশ্রকল্প। লতা ও পত্র হইতে তৈরী বলিয়া নাম হইয়াছে 'পত্রকল্প'। পুষ্প, পত্র, অঙ্কন, বহুমূল্য প্রস্তর ও অন্যান্য অলঙ্কারের নাম চিত্রকল্প। রত্নকল্প—পুষ্প ও রত্ন (jewellery) দি... তৈরী।

মনুতে স্বর্ণ-শিল্প একটি বিশিষ্ট জাতির ব্যবসা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; স্বর্ণকারগণ অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতেন; মনু স্বর্ণ-ব্যবসায়ে কৃত্রিমতার জন্য কঠোর 'শাস্তিরও' ব্যবস্থা করিয়াছেন। অমরসিংহের অভিধানে মুকুট, কিরীট প্রভৃতি বিবিধ শিরোভূষণ, অঙ্গুরীয়ক বিবিধ কর্ণ-কুণ্ডল, কর্ণপুষ্প, শতনরী প্রভৃতি বিভিন্ন হার, অনন্ত, বলয়, কঙ্কণ, মেখলা, বেষ্টনী, হস্ত, ও পদের বিভিন্নপ্রকার কঙ্কণ, নূপুর, ও বলয় প্রভৃতির উল্লেখ ও বর্ণনা রহিয়াছে।

প্রাচীন যুগের অলঙ্কারাদির অধিকাংশই বর্তমানকালে প্রচলন না থাকিলেও ভুবনেশ্বর-মন্দির, সাঁচী ও অমরাবতীর খোদিত মূর্তি হইতে

আমরা হস্ত, পদ, কোমর, কণ্ঠ এবং মস্তক প্রভৃতির বিবিধ অলঙ্কারের নিদর্শন পাই।

সাঁচী এবং অমরাবতীতে আমরা বলয়, কঙ্কণ প্রভৃতি যেসকল অলঙ্কারের নিদর্শন পাই সেগুলি তত উন্নত পদ্ধতির নহে; অবশ্য সাঁচী অপেক্ষা অমরাবতীর কারুকলা একটু উন্নত পদ্ধতির। ভুবনেশ্বরের কারুকলা বিশেষ উন্নত ও পরিস্ফুট।

মুকুট, কিরীট, চূড়া প্রভৃতির কারুকার্য বিশেষ সূক্ষ্ম ছিল। যাজপুরের দেবমন্দিরে 'ইন্দ্রাণী'র মুকুটের কারুকার্য অতুলনীয়। ইহা দেখিতে ইরানীয় টুপির (cap) মত, কিন্তু অতি সুন্দরভাবে রত্নখচিত।

মণিমুক্তাখচিত কারুকার্যময় নাকছবি ও নাসাঙ্গুরীক প্রভৃতি নাসিকার অলঙ্কারের প্রচলন এখনও বঙ্গদেশে এবং ভারতের সকল প্রদেশেই রহিয়াছে। একজন অন্ধ্র-মহিলার বর্ণনায় তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত নাসাঙ্গুরীর সঙ্গে দোলায়মান মুক্তা দুলিতেছে—এইরূপ বর্ণনা সারদা-তিলকে রহিয়াছে। প্রাচীন ভাস্কর্য বা স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে ইহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

ভুবনেশ্বরের প্রাচীরগাত্রে খোদিত সে-সকল বড় বড় প্রতিমূর্তি রহিয়াছে, সেইসকল মূর্তিতে বিবিধ সুন্দর হারের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই হারগুলি দেখিলে বোধ হয় মণিমুক্তাখচিত বিভিন্ন আদর্শের হারের প্রচলন ছিল।

হাতে বালা-পরা বাঙালী মেয়েদের বিশেষ আদরের; বিশেষত স্বামী বর্তমানে ইংরেজ মহিলারা বিবাহের চিহ্নস্বরূপ বিবাহ-অঙ্গুরীয়কে যেরূপ সম্মান দেয়, বাঙালী মেয়েরা তদপেক্ষা অধিক সম্মান লৌহযুক্ত স্বর্ণবলয়কে দিয়া থাকে। উৎকলে বালার পরিবর্তে খাড়ু ব্যবহৃত হয়, খাড়ু একটু বড় ও উঁচু। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে (*Indo-Aryans,* Vol I. pp. 234, 235) ৭০ নং চিত্রে অন্যপ্রকার খাড়ুর নমুনা আছে। ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪ নং চিত্রে বিভিন্নপ্রকার বালার নিদর্শন আছে। ৭৪ নং চিত্রের অনুরূপ বালা বঙ্গদেশে পটুরী নামে পরিচিত। ৭৫, ৭৬ নং চিত্রে সুপরিচিত শাঁখার চিত্র আছে। ইহা শাঁখ কাটিয়া প্রস্তুত হয়।

বর্তমানে লোকের রুচির পরিবর্তন হওয়ায় চুড়ি প্রভৃতির প্রচলন হইয়াছে। বাজু, তাবিজ, তাড় প্রভৃতি হস্তাভরণের পরিবর্তে বাঙালী মেয়ে অন্য অলঙ্কার অথবা সাদাসিধা অলঙ্কার ধরিয়াছে। কিন্তু উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশে বাজু, তাবিজ, তাড়, পেটা চুড়ী প্রভৃতি রৌপ্য ও স্বর্ণাভরণ এখনও প্রচলিত। ভগবতী ও কার্ত্তিকেয়ের মূর্তিতে বাজু ও বলয়ের অতি উচ্চাঙ্গের নিদর্শন রহিয়াছে।

গ্রীকেরা মেখলা পরিতে ভালবাসিতেন। ইহা শুধু অলঙ্কার ছিল না, কটিবন্ধের কাজও ইহা করিত। ভারতে শুধু সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ইহা সজ্জাভরণরূপে ব্যবহৃত হইত, শুধু স্ত্রীলোকেরা নহে, বয়স্ক পুরুষেরাও মেখলা পরিধান করিত। ইহা শুধু একটি নরীতে সীমাবদ্ধ ছিল না,

অনেকগুলি নরীতে ইহার সৌন্দর্য বর্ধিত হইত। চন্দ্রহার-মেখলা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

শীতপ্রধান দেশে পায়ের কোনরূপ অলঙ্কার পরা কঠিন, কারণ গরম মোজা বা জুতা প্রভৃতি দ্বারা পদদ্বয় সব সময়েই ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু ভারতের অবস্থা ভিন্ন রূপ। প্রাচীনকালে পায়ের বহু প্রকার অলঙ্কার প্রচলিত ছিল; কিঙ্কিণী পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা উভয়েই পরিত। পাঁজর, নূপুর, গুজরি প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার এখনও প্রচলিত। নূপুরের ঝুনুঝুনু এবং কিঙ্কিণীর রিণিঝিনি শব্দ এখনও শুনিতে পাওয়া যায়।

উড়িষ্যায় প্রচলিত কঙ্কমালা অনুরূপ পদাভরণ। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে (*Indo-Aryans,*) ৮৪, ৮৫ এবং ৭৮ নং চিত্রের পদাভরণ শুধু উড়িষ্যা এবং তেলেঙ্গি দেশে সীমাবদ্ধ ছিল। পাঁজর মুসলমান মহিলারা এখনও পরিয়া থাকেন। ৭৮, ৭৯ এবং ৮০ নং চিত্রে ভিন্ন ভিন্ন কিঙ্কিণীর ছবি আছে। ৮১, ৮২ এবং ৮৩ নং চিত্রে ঘুণ্টিকার (ঘুঙ্গুরের) চিত্র আছে।

অতি প্রাচীন যুগের নির্মিত কোন অলঙ্কার পাওয়া যায় নাই; শুধু ভাস্কর্য চিত্রাদি হইতে আমরা মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারের পরিচয় পাই। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের বহু পূর্ব হইতেই করমণ্ডল উপকূলে মুক্তা সমুদ্র হইতে আহরিত হইত তাহার প্রমাণ আমরা পাই। মনুতে মূল্যবান রত্ন ও প্রস্তরাদির উল্লেখ এবং ইহার ব্যবসায়ের কঠোর বিধান রহিয়াছে। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে মণিমুক্তাদি স্বর্ণডোরে গ্রথিত করার কথা পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ খ্রীস্টের জন্মের অন্তত ৮০০ শত বৎসর পূর্বে রচিত। মণি ও রত্নাদিকে 'কাচ' বলা হইয়াছে; কাচ বলিতে পদ্মরাগ-মণি, হীরক প্রভৃতিকেই বুঝাইত।

বিভিন্ন যুগের কারু-শিল্প অথবা অলঙ্কার পরীক্ষা করিয়া তাহার বিভিন্ন ধারা ও সংস্কৃতির ক্রমপরিণতি অতি সহজেই ধরা যায়।

কোন কোন আদর্শ অন্ধভাবে অনুকরণ হইয়া থাকে, এবং শত-শত বৎসরেও তাহার পরিণতি হয় নাই। পুরাতন হইতে নূতনে যে পরিণতি, তাহাতে সূক্ষ্মভাবে পুরাতনের আভাস পাওয়া যায়। পরিণতির একটি উচ্চ আদর্শ লাভ করিয়া অনেক সময়ে শিল্পের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, শিল্পী তখন

পুরাতনে ফিরিয়া যায়; এইরূপে অনেক দেশে প্রাচীন শিল্পের পুনরুদ্ভব হইয়াছে।

এই প্রবন্ধ-সঙ্কলনে নিম্নলিখিত গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তজ্জন্য গ্রন্থকারগণের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

Acharya, P K.: Dictionary of Indian Architecture; Coomaraswamy: History of Indian and Indonasian Art.; গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ—প্রাচীন শিল্পপরিচয়; Mitra, R. L.: Antiquities of Orissa and Indo-Aryans, Ruth Bunzel: Social Sciences; Westermarck: The History of Human Marriage; Karston, R.: The Civilization of the South American Indians; Frazer: Totomism and Exogamy; Haddon: Evolution in Art; Holmes: Origin and Development of Form and Ornament; Boas F.: Primitive Art.

চিত্র-পরিচয়

পাদটীকা

১ হিন্দুস্তানীদের মধ্যে আছে ঝুমক, ঝুম্মক।

২ 'ঢেঁড়ি চাঁপি মাকুড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল।'—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

৩ 'সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয়' —কৃত্তিবাসী রামায়ণ। হিন্দুস্তানীদের 'করনফুল', 'কনফুল'।

৪ 'সুবর্ণের কড়ি বৌলি রজতমুদ্রা পাশুলি সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।'
—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি।

৫ হিন্দুস্তানীদের 'বীড়'।

৬ হিন্দুস্তানীদের 'হঁসুলী'।

৭ 'গলায় তাহার দিল হার ঝিলমিলি'—কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

৮ 'কটিতে কিঙ্কিনিধ্বনি শুনি মনোহর।'—ঘনরাম।

৯ 'শঙ্খের উপর সাজে সোনার কঙ্কণ।'—কৃত্তিবাসী রামায়ণ।
'হাতে বালা, পায়ে মল, কাঁকালেতে গোট।'—হেমচন্দ্র।

১০ 'ভুজে বিরাজিত তাড় ভুবন উজর।'—ঘনরাম।

১১ 'নানা ছন্দে বাজুবন্দ হেম ঝাঁপাঝুরি।
পরিয়া পাইল শোভা পরম সুন্দরী।'—শিবায়ন।

১২ 'মাথায় ঝাপ্‌টা সিঁথী কটিতটে বেড়ি চন্দ্রহার।'—মাইকেল।

১৩ 'নাকেতে বেশর দিল মুক্তা সহকারে।'—কৃত্তিবাসী রামায়ণ।
'বেশর খচিত—শতেশ্বরী পহিরল'।—ভূপতিনাথের পদ।
'লবঙ্গবেসরে কারো মুখ করে আলো।'—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

১৪ 'দুবাহুতে দিব্যশঙ্খ রজতের মলবঙ্ক স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ'
—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি।
'দুবাহু শঙ্খেতে শোভিল বিলক্ষণ।'—কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

১৫ 'দুই পায়ে দিল তার রজত নূপুর।'—কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

১৬ 'পাতামল, পাশুলি আনট বিছা পায়।
গুঞ্জরিপঞ্চম আর শোভা কিবা তায়।'—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

[প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৪১, পৃ. ৯৯—১১০]

প্রসঙ্গ-কথা

1 ফুজিয়ান জাতি : জাপানের ফুজি-পর্বতের অধিবাসী ।—*En. Brit.*

2 ম্যাকডোনেল (Macdonell, Arthur Antony) (1854—?) : বৃটিশ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত । 'অথববেদ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

3 কীথ (Keith, A. B.) : 'অথর্ববেদ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

4 গেল্‌ডনার (Geldner, Karl F) : জর্মন পণ্ডিত । 'অদিতি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

5 রোট (Roth, Rudolf) : 'অদিতি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

6 লুটভিগ (Ludwig) : 'অনার্য' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

7 ওলডেনবার্গ (Oldenberg, Herman) : 'অদিতি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

8 যাস্ক : নিরু[illegible]কার । 'অনার্য' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

9 পাণিনি : বৈয়াকরণিক আচার্য । পাণিনি দ্র.

10 রাজেন্দ্রলাল মিত্র : 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

11 কৌটিল্য (নামান্তর চাণক্য) : অর্থশাস্ত্র প্রণেতা । 'বৌদ্ধযুগে শিল্প-শিক্ষা' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

12 শূদ্রক (২-৩য় খ্রী. শ[illegible]) : রাজা শূদ্রক ব্রাহ্মণবংশ্য রাজা ছিলেন । তিনি মৃচ্ছকটিক নামে সুপ্রসিদ্ধ প্রকরণগ্রন্থ রচনা করেন । —সনৎস্থ.

13 রাজশেখর কবিরাজ : 'বৌদ্ধযুগে শিল্প-শিক্ষা' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

14 সুশ্রুত (১ম খ্রী. শতাব্দী): রাজা কনিষ্কের সভাসদ। অতি প্রাচীনকালে সুশ্রুত নামে এক গ্রন্থ ছিল। ইনি ঐ গ্রন্থ অবলম্বন করে 'সুশ্রুত-সংহিতা' প্রণয়ন করেন।—সনৎসু.

15 বাণ (ভট্ট) (৬-৭ম খ্রী. শতাব্দী) : কবি বাণভট্ট চিত্রভানুর পুত্র। বাৎস্যগোত্রীয় বিহারদেশীয় ব্রাহ্মণ। মহারাজা হর্ষবর্ধনের আশ্রয়ে থেকে বাণভট্ট 'পার্বতী-পরিণয়', 'কাদম্বরী' এবং 'হর্ষচরিত' প্রণয়ন করেন।—সনৎসু.

16 মানসার : শিল্পশাস্ত্র। এই শাস্ত্রীয় গ্রন্থখানি অবলম্বন করে প্রফুল্ল কুমার আচার্য—Indian Architecture according to Mansâr Silpa-Sastra (Allahabad, 1927) রচনা করেন।

রথযাত্রা

(১)

"রথেতু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" এই আজন্ম সংস্কারের বশবর্তী হইয়া ধর্মগতপ্রাণ হিন্দু আজন্ম দুঃখের নিদান জন্ম হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাগ্রহে পুরী যাত্রা করিয়া থাকেন। অদ্য আমরা সেই রথযাত্রা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিব।

আষাঢ় মাসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় দয়িতাপাণ্ডাগণ রমণীর ন্যায় গামছা দ্বারা বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া গোপিকাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আনন্দাতিশয়ে হাসিতে হাসিতে 'পট্টডোরী' দিয়া শ্রীভগবানের কটিদেশ বাঁধিয়া ফেলেন। তৎপরে হর্ষ-কোলাহল করিতে করিতে অগ্রে বলরাম, তারপর সুভদ্রা, সুদর্শন ও পরিশেষে শ্রীজগন্নাথদেবকে লইয়া যাত্রা করেন। এই 'পাণ্ডুবিজয়' যাত্রাকে উৎকলে 'ধাড়িপহণ্ডী' বলে। সর্বাগ্রে শ্রীবলরামকে তাঁহার শ্রীরথ 'তালধ্বজ' প্রদক্ষিণ করাইয়া তাহার উপর অবরোপিত করা হয়। এইরূপে শ্রীসুভদ্রা দেবী ও শ্রীসুদর্শনকে 'বিজয়া' রথে ও সর্বশেষে শ্রীভগবানকে 'নন্দি ঘোষ' রথে চাপান হয়।

শ্রীমন্দির হইতে গুণ্ডিচা বাড়ী পর্যন্ত রথযাত্রা হইয়া থাকে। বৈষ্ণবদিগের মতে এই যাত্রা ভগবানের ঐশ্বর্যময়ী রাজধানী দ্বারকা হইতে লীলাস্থলী প্রকৃতির রম্য উপবন শ্রী-বিভূষিত শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা। কবিকেশরী কর্ণপূর[১] রচিত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের দশম অঙ্কে এই কথাই লিখিত

আছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থেও (মধ্যলীলা, ১৪শ পরিচ্ছেদে) এই কথাই দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

"যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারকা-বিহার।
সহজ প্রকট করে পরম উদার॥
তথাপি বৎসর মধ্যে হয় একবার।
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার॥
বৃন্দাবন-সম এই উপবনগণ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন॥
বাহির হইতে করে রথযাত্রা ছল।
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল॥"

গুণ্ডিচা বাড়ীর সুন্দরাচলের উপর অবস্থিত নীলাচলেই প্রভুর মন্দির। আর প্রভুর অসংখ্য সেবক পাণ্ডা থাকিতে দয়িতাগণ দ্বারা আনীত হওয়ার অর্থ বোধ হয় তাহাদের মধ্যে অনেকে গোপী-ভাবাপন্ন বলিয়া। অন্যদেশের রথযাত্রা ও পুরীধামের রথযাত্রার পার্থক্য প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুল-কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের অমৃতময়ী ভাষায় বলি, "অন্যদেশের রথযাত্রার ভাব—ক্রূরমতি কংস কর্তৃক প্রেরিত অক্রূর যেন ব্রজের জীবন কৃষ্ণধনকে লইয়া রথে করিয়া মথুরায় গমন করিতেছেন; আর ব্রজের নরনারী, পশুপক্ষী, তরুলতা, তৃণগুল্ম, নদীভূমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছেন; কিন্তু এখনকার রথযাত্রার ভাব ঠিক ইহার বিপরীত। অন্য স্থানের রথযাত্রা—বিষাদের বিষতরঙ্গিণী, আর পুরীধামের রথযাত্রা—আনন্দের মঞ্জু-মন্দাকিনী। অন্য স্থানের রথযাত্রা—করুণা-ঔদাস্যের আলেয়া বেহাগ বাগেশ্রী, আর পুরীধামের রথযাত্রা—উজ্জ্বল-মধুর রসের সাহানা-বাহার। অন্য স্থানের রথযাত্রা—বিরহের হা-হুতাশামাখা নিদাঘ-মধ্যাহ্ন, আর পুরীধামের রথযাত্রা মিলনের মঙ্গলগীতি-মুখরিত মৃগাঙ্ক-কর-বিধৌত মধুযামিনী।"

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা আমাদের এই সনাতন রথযাত্রাকে বৌদ্ধদিগের রথযাত্রার অনুকরণ বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন। প্রমাণগুলির সারবত্তা ত আমরা দেখিতে পাই না। বৌদ্ধদিগের রথ ছিল, হিন্দুদিগের রথ আছে;

অতএব হিন্দুর রথ বৌদ্ধদের অনুকরণ। এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য, যখন হিন্দুদিগের সমগ্র শাস্ত্রেই রথের বর্ণনা রহিয়াছে, তখন কি করিয়া এ বিষয়ে হিন্দুগণ বৌদ্ধদিগের নিকট ঋণী ?

হিন্দুর নানা দেশে নানা দেব-বিগ্রহের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ঘোষপাড়ার রথযাত্রা বৈশাখ মাসে হইয়া থাকে। অনেক বৈষ্ণব-প্রধান দেশে কার্ত্তিক মাসে উত্থান-একাদশীর দিন রথযাত্রা হইয়া থাকে। শ্রীহরিভক্তি-বিলাস গ্রন্থের ১৬শ বিলাসে ইহার বিষয় সম্যক্‌-রূপে জানিতে পারা যায়। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণার সুপ্রসিদ্ধ রথযাত্রা কার্ত্তিক মাসেই হয়। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের ও শ্রীবৃন্দাবনধামের শেঠেদের শ্রীরঙ্গনাথজীউর রথ কৃষ্ণানবমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

[ভারতবর্ষ, ১৩২০, শ্রাবণ, পৃ. ২৯৩-২৯৪

(২)

আমরা বাংলা দেশের লোক—রথযাত্রা বলিলে সাধারণত জগন্নাথদেবের রথযাত্রাই বুঝিয়া থাকি ; কিন্তু জগন্নাথের রথযাত্রা ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর রথযাত্রার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভবিষ্যপুরাণে সূর্যদেবের রথযাত্রা ; একাম্রপুরাণে শিবের রথযাত্রা ; পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও ভবিষ্যোত্তরপুরাণে বিষ্ণুর রথযাত্রা ; দেবীপুরাণে মহাদেবীর রথযাত্রা—এইরূপ নানা পুরাণে নানা দেবদেবীর রথযাত্রার উল্লেখ আছে। আর এই রথযাত্রা পর্বটা যে কেবল ভারতেরই পর্ব, তাহাও নহে ; নেপালরাজ্যে ভৈরবের রথযাত্রা, লিঙ্গযাত্রা, নেতা-দেবীর রথযাত্রা, কুমারী যাত্রা, মৎস্যেন্দ্র-নাথের যাত্রা ইত্যাদি দেবদেবীর রথযাত্রা প্রচলিত আছে। ভারতের প্রতিবেশী নেপাল ত দূরের কথা, ইউরোপের সিসিলি দ্বীপেও রথযাত্রা আছে; গ্রন্থ-বিশেষে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে. রথযাত্রা পর্বটা সার্বভৌমিক এবং বহু প্রাচীন।

যে পুরাণে বা যে দেশে, যে দেবদেবীর রথযাত্রার উল্লেখ বা প্রচলন থাকুক না কেন, বর্তমানকালে আমরা কিন্তু রথযাত্রা বলিলে জগন্নাথদেবের রথযাত্রাই বুঝিয়া থাকি। আমরা সকলেই উৎসবে আমোদ-আহ্লাদ করিয়া থাকি, উৎসব দেখিবার জন্য কত নরনারী, কত দেশ-বিদেশ হইতে দেশ-দেশান্তরে গমন করিয়া থাকেন, তজ্জন্য যত কিছু অর্থ ব্যয় হউক, যত কিছু কায়িক ক্লেশ স্বীকার করিতে হউক, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠাবোধ করেন না, এমন কি কখন কখন প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিতেও হৃষ্টান্তঃকরণে প্রস্তুত হইয়া থাকেন, অথচ ইহার গুপ্ত রহস্য অনেকেরই পরিজ্ঞাত নহে। নিতান্ত অজ্ঞেয় না হইলেও আপাতত অজ্ঞাত সেই গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা ; কিন্তু প্রয়াস কতদূর সফল হইয়াছে বলিতে পারি না।

জগতে সভ্য-অসভ্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, প্রাচ্য-প্রতীচ্য, সকল জাতিই অল্পাধিক দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার ও কোন না কোন প্রকারে আরাধনা করিয়া থাকে। দেবদেবীগণও প্রায়শ সকলেই যে অল্পাধিক সংখ্যক লীলা করিয়াছেন, সেই লীলাকারী দেবতার উপাসক-জাতিগণের গ্রন্থবিশেষও তাহার সাক্ষ্য-প্রদান করিতেছে। নির্দিষ্ট মাসে, নির্দিষ্ট দিনে বা নির্দিষ্ট তিথিতে সেই লীলার বাৎসরিক উৎসব সম্পাদনকে পর্ব বলে। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে গ্রীক জাতির উপাস্য দেবতার সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। আর সেটা যদি গর্ব বা গৌরবের বিষয় হয় এবং গৌরব যদি শ্রেষ্ঠতার পরিমাপক ও প্রতিপাদক হয়, তবে এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারে যে, জাতিদিগের মধ্যে ইউরোপে গ্রীক শ্রেষ্ঠ হইলেও, ভারতীয় হিন্দু জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দুর দেবতাও যত, পর্বও তত। দোল, রাস, জন্মাষ্টমী, রামলীলা, ইত্যাদি পর্ব শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের লীলা-বিশেষের সাংবাৎসরিক স্মারক উৎসব। এ সকল পর্ব তাঁহাদের স্বকৃতলীলার স্মারক উৎসব, সুতরাং এগুলিকে দৈব পর্ব বলা যাইতে পারে।

লীলা যে কেবল দেবতারাই করিয়াছেন, তাহা নহে। অনেক প্রখ্যাত-নামা মুনি-ঋষিও অনেক সময় অনেক লীলা করিয়াছেন। তাঁহাদের লীলা

কোন স্মারক উৎসব বা পর্ব না হইয়া সামাজিক বিধি ও নিষেধ-প্রথায় দাঁড়াইয়াছে। অগস্ত্য ঋষি আদিত্য-দেবের অনুরোধে তাঁহার প্রিয় শিষ্য বিন্ধ্যাচলের উন্নত শির চিরদিনের মত অবনত করাইয়া হিন্দুসমাজে চির-প্রচলিত অগস্ত্যযাত্রার নিষেধ-প্রথা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হিন্দুসমাজে সাধারণ গৃহস্থের মধ্যেও অনেক সময় অনেক মহাপুরুষ ও মহীয়সী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের লোকপ্রসিদ্ধ কার্যকলাপ কেবল নরলোককে নহে, সমগ্র দেবলোককেও মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়াছে; তাঁহাদের কার্যাবলী নরনারী অনুষ্ঠিতব্য পুণ্য-ব্রতাদিতে পরিণত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাবিত্রী চতুর্দশীর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এখন দেখা যাউক, জগন্নাথের রথযাত্রা কোন দেবতার, কোন ঋষির বা কোন মহাপুরুষের কোন লীলার সাংবাৎসরিক উৎসব কি না। এ সম্বন্ধে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। উৎসবটা যে হিন্দু-জাতির অনুষ্ঠিত একটা প্রাচীন ধর্মোৎসব সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু কোন্ সময়ে, কাহার কোন্ লীলা অবলম্বনে ইহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা এ পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই, এবং কোন পুরাণাদিতেও তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। তবে এক সম্প্রদায়ের প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বলেন যে, বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বৌদ্ধ সাধারণ যে রথযাত্রা উৎসব করিত, তাহা হইতেই জগন্নাথের রথযাত্রার উৎপত্তি। আমরা কিন্তু এ সিদ্ধান্ত অবিবাদে শিরোধার্য করিয়া লইতে প্রস্তুত নহি, কারণ ফা-হিয়ানের বিবরণ অনুসারে দেখা যায় যে, ঐ উৎসব ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দিবসে হইত। যদি বুদ্ধদেবের জন্মতিথিই ঐ উৎসবের উপলক্ষ হয়, তবে উৎসব তারিখের সমতা নাই কেন? একমাত্র বুদ্ধ একদিন মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তবে এ বৈষম্যের কারণ কি? দ্বিতীয়ত ফা-হিয়ান বৌদ্ধোৎসবের রথের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই, "মধ্যস্থলে মূল বিগ্রহ; তাঁহার সহচররূপে দুই পার্শ্বে দুই বোধিসত্ত্ব এবং তাঁহাদের অনুচররূপে নানা দেবমূর্তি। এদিকে দেখিতে পাই, যে পুরাতত্ত্ব-বিদ্গণ ফা-হিয়ানের বর্ণনা অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধোৎসব বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহারাই আবার বলেন যে, পূর্বকালে বৌদ্ধগণের মধ্যে

বোধিসত্ত্ব ও দেবদেবীর মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল না। তাহা হইলে আর বৌদ্ধোৎসবের অনুকরণে হিন্দুৎসবের সৃষ্টি এ কথার সামঞ্জস্য থাকে কৈ? সুতরাং এ বাক্যের যাথার্থ্য আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারিলাম না। আর এক সম্প্রদায় বলেন, ভারতে মূর্তিপূজা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে রথযাত্রার উৎসব প্রচলিত হইয়াছে এবং জগন্নাথদেবের রথযাত্রা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলাচরিত্রের একাংশ মাত্র। কথাটা একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না; কারণ যাত্রা শব্দের অর্থ একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন এবং রথযাত্রা শব্দে বুঝিতে হইবে যে, রথে আরোহণ করিয়া গমন। ভগবান্ জগন্নাথদেবের রথযাত্রা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শাস্ত্রবচন দেখিতে পাওয়া যায়—

"আষাঢ়স্য সিতেপক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যাসংযুতা।
তস্যাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রয়া সহ।
যাত্রোৎসবং প্রবৃত্ত্যাস্য প্রীণয়েচ্চ দ্বিজান্ বহূন্॥"

আষাঢ় মাসের পুষ্যা নক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে সুভদ্রা ও বলরামের সহিত জগন্নাথদেবকে রথে আরোহণ করাইয়া এই উৎসব করিতে হয় এবং তাহাই করা হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কবে কি উপলক্ষে রথে আরোহণ করিয়া বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, শাস্ত্রে তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাই যে, কৌশলপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় আনাইয়া তাঁহার প্রাণবধ করিবার নিমিত্ত দুষ্ট কংসাসুর যখন অক্রূরকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কংসপ্রেরিত রথারোহণে অক্রূর সমভিব্যাহারে সবান্ধবে বৃন্দাবন হইতে মথুরা যাত্রা করিয়াছিলেন। এ যাত্রায় অবশ্য বৃন্দাবন-লীলার একাংশের সাদৃশ্য লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু অন্যদিকে অনেক অসাদৃশ্য থাকিয়া যায়।

আমাদের বাংলাদেশে রথযাত্রা উপলক্ষে যেসকল গান রচিত ও গীত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই বৃন্দাবনের গোপিকা ও গোপবালকদিগের কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনাজনিত কাতরোক্তিব্যঞ্জক; সুতরাং সেইসকল গীতের মর্মানুসারে রথযাত্রাকে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রা বলিয়া কল্পনা করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে; কিন্তু জগন্নাথের সঙ্গে বলরাম ও সুভদ্রা-দেবীকে রথে

বসাইবার ব্যবস্থা থাকায় বিষম গোলযোগ বাঁধিয়াছে। বলরামকে না হয় সঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই; কিন্তু বৃন্দাবনে সুভদ্রা-দেবীকে কিরূপে পাওয়া যায়? ভক্ত-বিশেষের খাতিরে একটা অপ্রাকৃত ভাবের কল্পনা স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায়, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিলে তাহা অমার্জনীয় হইয়া পড়ে। প্রথমত এ বৈষম্যের মীমাংসা করা চাই। দ্বিতীয়ত, যাত্রার সপ্তাহান্তে যে পুনর্যাত্রার ব্যবস্থা আছে, তাহারই বা সামঞ্জস্য রক্ষা হয় কিরূপে? মথুরা হইতে ত শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করেন নাই, অন্তত ভাগবতে ত তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্রীজীব গোস্বামী[2] প্রভৃতি দুই-একজন ভক্ত-বৈষ্ণব-পণ্ডিত কষ্টকল্পিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা আপত্তি-জনক। যাহা সর্ববাদিসম্মত নহে, তাহা একটা সার্বভৌমিক উৎসবের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

শোনা গিয়াছে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় দুই-একটি গ্রামে রথযাত্রার পুনর্যাত্রা নাই। হইতে পারে, সেখানে যাহারা রথযাত্রায় পুনর্যাত্রার প্রবর্তন করেন নাই, তাঁহারা রথযাত্রাকে মথুরাযাত্রা বলিয়াই মানিয়া লন, অথচ মথুরা হইতে অপ্রত্যাগমনের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চান; সেইজন্য পুনর্যাত্রার ফাঁদে পা না দিয়া ফাঁকে দাঁড়াইয়াছেন; অথবা একটা স্থানীয় দেশাচার বা লোকাচারকেই বা সর্বত্র প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে সার্বজনীন ধর্মমূলক দেবোৎসবের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

কেহ কেহ এরূপ অভিমতও প্রকাশ করেন যে, জগন্নাথদেবের রথযাত্রা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা হইতে বৃন্দাবন যাত্রা অবলম্বনে কল্পিত হইয়াছে এবং পুরীধামের রথযাত্রা প্রণালী উহারই প্রতিপোষক। অবশ্য দ্বারকাপুরী হইতে মথুরা-যাত্রায় সুভদ্রা দেবীর সংযোগ ঘটাইতে অথবা পুনর্যাত্রা করিতে এক-পক্ষে কোনও আপত্তি ঘটিতে পারে না বটে, কিন্তু অপরপক্ষে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবার কথা। এ স্থলে প্রথমে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকা হইতে বৃন্দাবনে গিয়া-

ছিলেন কি না? যদি তাহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহা সর্ববাদিসম্মত কিনা? দ্বিতীয় কথা এই যে, মানুষ স্বীয় প্রকৃতির আদর্শে দেবপ্রকৃতির কল্পনা করিয়া থাকে। নিজেরা যেমন গুরুজনে ভক্তি, সন্তানে স্নেহ, বৈরিজনের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে, দেবতাদিগের সম্বন্ধেও নিজেদের রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে সেই সেই ভাবের কল্পনা করিয়া থাকে। নিজেদের আহার-বিহারের প্রথানুসারে দেবতা পূজোপচারাদির আয়োজন করিয়া থাকে, তবে পারিবারিক ব্যবহার সম্বন্ধেই বা তাহা না করিবে কেন? বৃন্দাবনে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের সহিত যেরূপ মাখামাখি করিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল বিরহের পর পুনরায় বৃন্দাবনে গমন করিলে তাঁহার সহিত তাহারা যে ব্যবহার করিবে, সে ব্যবহার তাঁহার মহিষীবর্গ বা পরিবারস্থ অন্য কাহারও নিকট গোপন রাখিবার চেষ্টাই স্বভাবসিদ্ধ; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি যে সুভদ্রাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া তাঁহার গুপ্ত কথা প্রকাশ হইবার পথ স্বেচ্ছায় উন্মুক্ত করিয়া দিবেন একথা সাধারণ সংসারী গৃহস্থ কেমন করিয়া কল্পনা করিবে? সুতরাং দ্বারকা হইতে বৃন্দাবন-যাত্রার কল্পনা করিতেও সম্ভবত অনেকেরই আপত্তি হইতে পারে। হয়ত কোন কোন মহাত্মা বলিতে পারেন যে, মানব-প্রকৃতির আদর্শে দেব-প্রকৃতির কল্পনা করা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। প্রেমময় ভগবান্ সম্বন্ধে আবার সঙ্কীর্ণ লোকলজ্জা বা দ্বেষ-হিংসার কলুষিত কল্পনা কেন? স্বীকার করিলাম, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-ভবনেও যখন স্বয়ং লক্ষ্মী-দেবীর অন্তরে সপত্নী-বিদ্বেষের দারুণ অনল প্রজ্বলিত দেখিতে পাই, পল্লী-বিশেষের সহিত আত্মীয়তা সংস্থাপন-অপরাধে স্বয়ং ভগবতীর নিকট মহেশ্বরকে নির্যাতিত হইতে দেখি, মানব-সমাজে নিন্দিত রঙ্গালাপ দর্শন-অপরাধে যখন জগজ্জননী পার্বতী ও আশুতোষকে শাপ প্রদান করিতেছেন দেখিতে পাই, তখন দ্বারকানাথের সম্বন্ধেই বা সে আশঙ্কা না হইবে কেন? অতএব রথযাত্রাকে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা হইতে বৃন্দাবন যাত্রার উৎসব বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

আমাদের মনে হয় জগন্নাথের রথযাত্রা ভগবানের কোন লীলার উৎসব নহে, ভক্তের আধ্যাত্মিক ভাবের উৎসব। যত কিছু মহাপ্রভুরই রঙ্গ।

ভগবান যে ব্রজবাসীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, "কর্ম্ম শেষ" করিয়া পুনরায় ব্রজধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, মহাপ্রভু তাঁহার সেই প্রতিশ্রুত "কর্ম্ম শেষ" এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য ও ভগবানের সত্যভঙ্গ-কলঙ্ক অপনোদনের নিমিত্ত একটা কাল্পনিক পুনর্যাত্রার প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। আর সকলেই ত আধ্যাত্মিক জগতের জীব নহে, সাধারণ অজ্ঞ লোকদিগের সহজ উপলব্ধির জন্য গুণ্ডিচা মন্দির ও মাসীর বাড়ীর একটা ভাবাঙ্ক জন-সাধারণের চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, নতুবা জগন্নাথধামে ভগবানের কোন্ পক্ষের কোন্ মাসী আছেন, তাহা ত বলিতে পারি না। তখন অন্ধ বিশ্বাসের কাল ছিল, মহাপুরুষ স্বীয় ভাবের বশে যে চিত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন, কোন যুক্তিতর্কের অবতারণা না করিয়া লোকে সেই বাক্যই ধ্রুবসত্য জ্ঞান করিয়া আসিতেছে; কিন্তু এখন যুক্তির কাল আসিয়াছে, বিনা যুক্তিতে আর কেহ কোন কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়, তাই আজ রথযাত্রার উপলক্ষ-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতেছে।

রথযাত্রা সম্বন্ধে আমাদের এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইতে পারে। সত্যে উপনীত হইবার নিমিত্তই এই প্রবন্ধের অবতারণা। মধুচক্রে মধু আছে, কিন্তু কেবল হাত পাতিলেই মধু পাওয়া যায় না। চক্রের নিম্নভাগে ধারণোপযোগী পাত্র রক্ষা করিয়া খোঁচা মারিলেই তবে মধু পাওয়া যায়। এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া "রথযাত্রা" সমস্যার মধুচক্রে প্রবন্ধের খোঁচা মারিলাম।

রথযাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অনেক কথা আছে। সকল কথার অবতারণা করিতে গেলে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন। উপরে প্রধানত আমরা বাংলা ও উড়িষ্যার প্রচলিত রথযাত্রার ভিত্তি-সম্বন্ধীয় দুই-একটি কথার আলোচনা করিয়াই বাহুল্য ভয়ে ও পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কায় ক্ষান্ত হইলাম। উৎসবের প্রণালী-সম্বন্ধে হিন্দুমাত্রেরই কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে। সেই জন্য সে সম্বন্ধে আর কিছু বলা হইল না। এক্ষণে বাংলা, উড়িষ্যা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে রথযাত্রার উৎসব হইয়া থাকে এবং ইতঃপূর্বে সূর্য, বিষ্ণু, শিব, মহাদেবী

প্রভৃতি পুরাণোক্ত দেবদেবীর ও অন্যান্য পাশ্চাত্যভূমি প্রচলিত রথের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই সকল রথের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সূর্যের রথযাত্রা

এ রথযাত্রা ভবিষ্যপুরাণোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই রথযাত্রা করিতে হয়। চতুর্থী তিথিতে অযাচিত ভক্ষণ, পঞ্চমীতে সংযম, ষষ্ঠীতে নিশীথে মাত্র ভোজন করিয়া সপ্তমীর দিন পূর্ণ উপবাসী থাকিয়া সূর্যদেবকে রথে আরোহণ করাইতে হয়। দোলযাত্রার পূর্ব রাত্রে সূর্যদেবের রথের সম্মুখে অগ্নিকার্য বিধেয়। রাত্রিকালে ভগবানকে রথে আরোহণ করাইয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণে ও উৎসবাদিতে অতিবাহিত হয়; অষ্টমীর দিন প্রাতে বাদ্যভাণ্ডাদি সহকারে রথভ্রমণ করাইতে হয়। সংবৎসরের কল্পনায় রথের চক্র, নেমী প্রভৃতি গঠিত হয় এবং স্বর্ণ, রৌপ্য বা দৃঢ় কাষ্ঠ দ্বারা রথ নির্মিত হয়। জগন্নাথের রথে যেমন বলরাম ও সুভদ্রাকে আরোহণ করাইতে হয়, সূর্যদেবের রথে তদ্রূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবতাকে যথাবিধানে স্থাপন করিয়া রথচালনা করিতে হয়। রথ টানিবার জন্য অশ্বই প্রশস্ত; অভাবে বলীবর্দও নিয়োজিত করা হয়। যাহারা সূর্যেতর দেবতার উপাসক, কোনরূপ কুক্রিয়াসক্ত বা অনুপবাসী, তাহাদের পক্ষে রথ-বহন নিষিদ্ধ। পূর্বদ্বার দিয়া রথ বাহির করিয়া যে স্থানে লইয়া যাইবে, তথায় একরাত্রি অবস্থান করিয়া নানাবিধ সৎকর্ম, বেদ-পাঠ, ব্রাহ্মণ-ভোজন ও সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রাদি দেবগণের পূজা করিতে হয়।

বিষ্ণুর রথযাত্রা

পদ্ম, স্কন্দ ও ভবিষ্যোত্তর পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, চাতুর্মাস্যের শেষ হইলে ভগবানের উত্থানের পর কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশীর রাত্রিতে বিষ্ণুকে রথে স্থাপন করিয়া উৎসব করিতে হয়। পুরাকালে প্রহ্লাদ প্রথমে মহাবিষ্ণুর রথ টানিয়াছিলেন, পরে দেবসিদ্ধ গন্ধর্বগণও এই রথ-যাত্রার অনুষ্ঠান করিতেন। বিষ্ণুর রথকে পুরভ্রমণ করাইতে হয়।

শিবের রথযাত্রা

একাম্রপুরাণের মতে শিবের রথযাত্রার নাম অশোকা মহাযাত্রা। চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে এই উৎসব করিতে হয়। রথনির্মাণের প্রণালী এইরূপ,—রথের বর্ণ শুভ্র, চারিখানি চক্র, উচ্চতার পরিমাণ একুশ হাত এবং মণ্ডল ষোল হাত পরিমিত হইবে। রথের তোরণ চতুষ্টয়ে চারিটি স্বর্ণ কলস থাকিবে। ব্রহ্মা রথের সারথি হইবেন। মহাদেবের রথের দক্ষিণ-ভাগে নন্দী, উত্তরে মহাকাল, পৃষ্ঠভাগে বিনায়ক পুরোভাগে শিবাহন কার্ত্তিক ও অনন্তদেবের পূজা করিয়া তাহার পর মহাদেবের পূজা বিধেয়। এইরূপে যথাবিধানে পূজাদি করিয়া রথপ্রদক্ষিণপূর্বক মহাদেবকে রথে আরোহণ করাইয়া রথযাত্রার ব্যবস্থা আছে।

দেবীর রথযাত্রা

দেবীপুরাণে মহাদেবীর রথোৎসবের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কার্ত্তিকী শুক্লা তৃতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী, একাদশী বা পূর্ণিমার সাপ্তভৌম রথে দেবীকে স্থাপন করিয়া যাত্রা করিতে হয়। দেবীর পূজায় সকলপ্রকার অন্নপানাদির নৈবেদ্য ও সকলপ্রকার বলি দিতে হয়। রথস্থ বেতালদিগের উদ্দেশেও বলি দিবার ব্যবস্থা আছে। পুরভ্রমণ অন্যান্য রথেরই মত।

মেরীর রথযাত্রা

ইতঃপূর্বে আমরা যে ইউরোপে সিসিলি দ্বীপের রথযাত্রার উল্লেখ করিয়াছি, সেই রথযাত্রা যীশু জননী মেরীর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উহা কতকটা সূর্য-রথেরই মত। এই রথে চন্দ্র-সূর্যাদি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের প্রতিকৃতি রথের নিম্নদেশ হইতে চূড়া পর্যন্ত ক্রমশ ক্ষুদ্রাকারে গঠিত ও সন্নিবেশিত করা হয়। রথ টানিবার জন্য বহুসংখ্যক মহিষও সংযোজিত করিয়া দেওয়া হয়। শুনিতে পাওয়া যায় সিসিলি দ্বীপের এই রথযাত্রার সময় অতি বীভৎস কদাচারের অভিনয় হইয়া থাকে। বাংলা দেশের লোকের যেমন বিশ্বাস যে, রথে জগন্নাথকে দর্শন করিলে আর জন্মমৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, সিসিলির রমণী-মণ্ডলীতেও সেইরূপ একটা সংস্কার আছে যে, মেরীর রথের ঘূর্ণায়মান চক্রে পিষ্ট হইয়া মৃত্যু হইলে,

সেই মৃত ব্যক্তির আত্মা মেরীর সহিত স্বর্গে গমন করে, আর তাহাকে মর্ত্য-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাহার সন্তানের এইরূপে রথচক্রে মৃত্যু হয়, পরকালে তাহারও অক্ষয় স্বর্গবাস অবশ্যম্ভাবী। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া অনেক স্ত্রী মূল্য দিয়া দরিদ্র জননীদিগের নিকট হইতে সন্তান ক্রয় করিয়া সেই সন্তানকে সঞ্চরমান রথের চক্রে বাঁধিয়া দেয়। সারাদিন চক্রের সহিত বদ্ধাবস্থায় ঘুরিয়া সেই শিশুকে কি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহাকে কি অবস্থায় ফিরিয়া পাওয়া যায় আর সেইদৃশ্য কি হৃদয়বিদারক, পাঠক তাহা মানসচক্ষে কল্পনা করিয়া দেখুন। অনেক বালককে এইরূপে রথের চাকায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সমস্ত দিনের পর রথ থামিলে তাহাদের যদি কেহ জীবিত থাকে, তাহাকে লইবার জন্য জননীদের মধ্যে পরস্পর মারামারি কাটাকাটি বাধিয়া যায়। আজকাল এই নৃশংস পদ্ধতি অনেক পরিমাণে উঠিয়া গিয়াছে।

নেপালের রথযাত্রা

আজকাল নেপালের অনেক দেবদেবীর রথযাত্রা উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু তত্রাপি যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা ভারতের আর কুত্রাপি নাই। এখনও সেখানে জৈনদিগের পার্শ্বনাথ ও মহাবীর স্বামীর রথযাত্রা ব্যতীত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার রথযাত্রা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টিই প্রধান।

১। ভৈরবযাত্রা ও লিঙ্গ-যাত্রা। বৎসরের প্রারম্ভেই ১লা, ২রা বৈশাখ দুইখানি রথে ভৈরব ও ভৈরবীকে স্থাপন করিয়া ঐ রথদ্বয়কে নগর পরিক্রমণ করাইয়া আনা হয়।

২। দেবীযাত্রা। এই যাত্রার নাম নেতাদেবীর যাত্রা। ভৈরব-যাত্রার পর শুক্লা চতুর্দশীতে এই রথযাত্রা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

৩। কুমারী-রথযাত্রা। নেপালে কেবল রথযাত্রা বলিলে এই কুমারী রথযাত্রাকেই বুঝায়। কোন দেবদেবীর প্রতিমা লইয়া এই রথোৎসব অনুষ্ঠিত হয় না। ইহাতে অষ্টমাতৃকার অন্যতম কুমারী এবং গণেশ, একটি বালিকা আর কুমারস্বরূপ একটি বালকের রথে পূজা হইয়া থাকে।

নেপালে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, রাজা জয়প্রকাশ মল্ল প্রথমে কুমারী-বিশেষকে অবমাননা করিয়া তাঁহার ভূ-সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সেইদিন রাত্রিতে তাঁহার রাণী মূর্ছিতা হইয়া পড়েন এবং কুমারী আসিয়া তাঁহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া রাণীর মুখে এই কথা প্রকাশ করেন। রাজা ভীত হইয়া কুমারী পূজার আয়োজন করিলেন। পূজার প্রণালী এইরূপ :—একটি সপ্তবর্ষীয় কুমারী ও দুইটি বালক মনোনীত করিয়া লওয়া হয়। যাহাকে কুমারী করা হইবে সেই কন্যা ও বালক দুইটিকে শোণিত-সংলিপ্ত বহুতর সুবৃহৎ মহিষশৃঙ্গ-সজ্জিত একটি ভীতিপ্রদ গৃহে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যদি সেই ভীষণ দৃশ্যে তাহারা কিছুমাত্র বিচলিত না হয়, তাহা হইলে কন্যাকে স্বয়ং দেবীর অবতার কুমারী ও পুত্র দুটি কার্ত্তিক গণেশ বলিয়া সকলের ভক্তি আকর্ষণ করে। স্বয়ং নেপালপতি আসিয়া কন্যার পূজা করেন এবং তাঁহার ব্যয়ের জন্য তিন হাজার টাকার এবং বালক দুইটির জন্য দেড়হাজার টাকা আয়ের জায়গীর দেওয়া হয়। ঐ তিনজন যে গৃহে থাকে, তাহা "দেওতার মুকান্" বলিয়া গণ্য। ঐ কুমারীকে দেবী ভাবিয়া কেহ আর বিবাহ করিতে পারে না; কিন্তু বালক দুইটির গলে মাল্য দিবার জন্য নেওয়ার কুমারীগণ সকলেই উৎসুক। তিন চারি বর্ষ পর্যন্ত ঐ তিনজনের পূজা চলিয়া থাকে; তৎপরে আবার নূতন নূতন বালক-বালিকা নির্বাচিত হয়। এই তিনজনকে সুসজ্জিত মন্দিরাকার রথে স্থাপন করিয়া যখন রথযাত্রা হয়, তখন সর্দারগণ পরিবৃত হইয়া স্বয়ং নেপালাধিপতি পূজা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

সেরিঙ্গপত্তনের রথ

মাদ্রাজের ন্যায় সেরিঙ্গপত্তনেও রথযাত্রা সমারোহে সম্পন্ন হয়। এই স্থানের রথোপরি বিশালকায় সিংহমূর্তি সংস্থিত থাকে। উৎসবের সময় বিষ্ণু বিগ্রহ মন্দির হইতে আনয়নপূর্বক রথমঞ্চে স্থাপিত করা হয়। খ্রীস্টীয় ১৪শ শতাব্দীর পূর্বে এ প্রদেশে রথযাত্রার কথা শোনা যায় না।

জাপানে রথযাত্রা

বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে জাপানে বৌদ্ধগণ রথে বুদ্ধমূর্তি সংস্থাপন-পূর্বক রাজপথ দিয়া বুদ্ধের রথযাত্রার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন তোকিওতে ছোট ছোট বালক লইয়া প্রতি বৎসর এক পবিত্র আনন্দের রথযাত্রা হইয়া থাকে। এই রথযাত্রায় বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই যোগ দিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে।

কুম্ভকোনমের রথযাত্রা

কুম্ভকোনমের রথযাত্রাও হিন্দুর উৎসব। এখানে প্রতি বৎসর রথযাত্রা হইয়া থাকে; কিন্তু এ রথে কোন দেবতা অধিষ্ঠিত থাকেন না—প্রধান মন্দিরের পুরোহিতকে স্রক্‌চন্দনদ্বারা সুশোভিত করিয়া রথে বসাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর রথখানিকে রাজপথ দিয়া বহুলোক-সাহায্যে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। পরিশেষে বহু সমারোহে একটি প্রসিদ্ধ পুষ্করিণীর সম্মুখে রথখানি সমানীত হয়। এই স্থানে নানা পূজোপচারে রথ-সমাসীন পুরোহিতকে পরিতুষ্ট করা হয়। কুম্ভকোনমের এই রথযাত্রা ব্যাপার প্রায় ৭০০ বৎসরের প্রাচীন।

মাদ্রাজের রথযাত্রা

মাদ্রাজের এই রথযাত্রা বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। জেসুইটগণ যখন খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মলবরে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা এই স্থানের রথযাত্রার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই স্থানের রথ অতি বৃহৎ ও নানা দেবদেবীর মূর্তিদ্বারা চিহ্নিত। এই রথে সাধারণত বিষ্ণুমূর্তিই অধিষ্ঠিত থাকেন। মাদ্রাজের রথযাত্রা উপলক্ষে বিপুল সমারোহ হইয়া থাকে।

[ভারতবর্ষ, ১৩২০ ভাদ্র, পৃ. ৪৩৪-৪৪১]

(৩)

রঘুনন্দনের[3] দ্বাদশ যাত্রাতত্ত্বে—মাসে মাসে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে যাত্রা বলে। দ্বাদশ মাসে ভগবান বিষ্ণুর দ্বাদশ প্রকার যাত্রা এই প্রকারে অভিহিত হইয়াছে : বৈশাখ মাসে চন্দনী-যাত্রা, জ্যৈষ্ঠে স্নাপনী (স্নানযাত্রা), আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসে শয়নী, ভাদ্র মাসে দক্ষিণপার্শ্বীয়া, আশ্বিনে বামপার্শ্বিকা, কার্ত্তিক মাসে উত্থানী, অগ্রহায়ণ মাসে ছাদনী, পৌষে পুষ্যাভিষেক, মাঘে শাল্যোদনী, ফাল্গুনে দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে মদনভঞ্জিকাযাত্রা।

আমরা বাংলাদেশের লোক—রথযাত্রা বলিতে সাধারণত জগন্নাথদেবের রথযাত্রা বুঝিয়া থাকি ; কিন্তু জগন্নাথের রথযাত্রা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর রথযাত্রার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎ-পুরাণে সূর্যদেবের রথযাত্রা ; একাম্রপুরাণ ও ভবিষ্যোত্তরপুরাণে বিষ্ণুর রথযাত্রা ; দেবীপুরাণে মহাদেবীর রথযাত্রা—এইরূপ নানাপুরাণে নানা দেবদেবীর রথযাত্রার উল্লেখ আছে। আর এই রথযাত্রা পর্বটি যে কেবল ভারতেরই পর্ব তাহাও নয় ; নেপাল রাজ্যে ভৈরবের রথযাত্রা, লিঙ্গযাত্রা, নেতা-দেবীর রথযাত্রা, কুমারীযাত্রা, মৎস্যেন্দ্রনাথের যাত্রা ইত্যাদি দেবদেবীর রথযাত্রা প্রচলিত আছে। ভারতের প্রতিবেশী নেপাল তো দূরের কথা, ইউরোপের সিসিলি দ্বীপেও রথ-যাত্রা আছে ; গ্রন্থ-বিশেষে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে রথযাত্রা পর্বটি সার্বভৌমিক ও বহু প্রাচীন।

যে পুরাণে বা যে দেশে, যে দেবদেবীর রথযাত্রায় উল্লেখ বা প্রচলন থাকুক না কেন, বর্তমানকালে আমরা কিন্তু রথযাত্রা বলিলে জগন্নাথদেবের রথযাত্রাই বুঝিয়া থাকি। জগতে সভ্য-অসভ্য শিক্ষিত-অশিক্ষিত, প্রাচ্য-প্রতীচ্য, সকল জাতিই অল্পাধিক দেব-দেবীর অস্তিত্ব স্বীকার, আর কোন না কোন প্রকারে আরাধনা করিয়া থাকে। দেবদেবীগণও প্রায়শ সকলেই যে অল্পাধিক সংখ্যক লীলা করিয়াছেন, সেই লীলাকারী দেবতার উপাসক জাতিগণের গ্রন্থবিশেষও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

হিন্দুর দেবতাও যত পর্বও তত। দোল, রাস, জন্মাষ্টমী, রামনবমী ইত্যাদি পর্ব শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের লীলাবিশেষের সাংবাৎসরিক স্মারক উৎসব। এ সকল পর্ব তাঁহাদের স্বকৃত লীলার উৎসব; সুতরাং এগুলিকে দৈব পর্ব বলা যাইতে পারে।

জগন্নাথের রথযাত্রা সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। তবে উৎসবটি যে হিন্দুজাতির অনুষ্ঠিত একটি প্রাচীন ধর্মোৎসব সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন্ সময়ে, কাহার কোন্ লীলা অবলম্বনে এই উৎসব প্রচলিত হইয়াছে, তাহা এপর্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। আর কোন পুরাণাদিতেও তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। এক সম্প্রদায়ের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বৌদ্ধ সাধারণ যে রথযাত্রা উৎসব করিত তাহা হইতে জগন্নাথের রথযাত্রার উৎপত্তি। আমরা কিন্তু এ সিদ্ধান্ত অবিবাদে শিরোধার্য করিয়া লইতে প্রস্তুত নই; কারণ ফা-হিয়ানে[৭]র বিবরণ অনুসারে দেখা যায় যে, ঐ উৎসব ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন দিবসে হইত। যদি বুদ্ধদেবের জন্মতিথিই ঐ উৎসবের উপলক্ষ হয় তবে উৎসব তারিখের সমতা নাই কেন? একমাত্র বুদ্ধ একদিন মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তবে এ বৈষম্যের কারণ কি? দ্বিতীয়ত ফা-হিয়ান বৌদ্ধোৎসবের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাই—মধ্যস্থলে মূল বিগ্রহ, তাঁহার সহচররূপে দুই পার্শ্বে দুই বোধিসত্ত্ব এবং তাহাদের অনুচর রূপে নানা মূর্তি।"

কেহ কেহ বলেন বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের প্রতীকের অনুকরণে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম করা হইয়াছে। এ যুক্তি অতি অসার।] [রথযাত্রা (২) দ্র.]

একানংশা[১]

একানংশা=১ কুহূ (অমাবস্যা)

২ দুর্গার নামবিশেষ।—মহা. ৩. ২১৭ অ.

কাত্যায়নী দুর্গা অর্থে একানংশার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় হরিবংশে কৃষ্ণরূপে বিষ্ণুর জন্ম সম্পর্কে।—৫৮ অ.

কংস দৈত্য ও তাঁহার অনুচরগণের বিনাশের জন্য দেবগণ বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। বিষ্ণুর মায়া নিদ্রাকে নন্দগৃহিণী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে বলিলেন। কংস যখন তাঁহাকে পাথরে আচড়াইতে যাইবেন তখন তিনি আকাশে চলিয়া যাইবেন এবং চার হাত ধারণ করিবেন। এই চার হাতে থাকিবে—ত্রিশূল, অসি, সুরাপাত্র ও পদ্ম। লোকে আর্যাস্তব করিবে।—৫৮ অ.

ফলেও তাহাই হইল। কৃষ্ণের রক্ষার্থ যোগকন্যা একানংশার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া তিনি পূজিত হইতে লাগিলেন।

"সা কন্যা ববৃধে তত্র বৃষ্ণিসদ্মনি পূজিতা।
পুত্রবৎ পাল্যমানা সা দেবদেবাজ্ঞয়া তদা॥—৫৮

বৃহৎ-সংহিতায় একানংশার মূর্তির পরিচয় আছে—

"একানংশা কার্যা দেবী বলদেবকৃষ্ণয়োর্মধ্যে।
কটিসংস্থিতবামকরা সরোজমিতরেণ চোদ্বহন্তী॥
কার্যা চতুর্ভুজা যা বামকরাভ্যাং সপুস্তকং কমলম্।
দ্বাভ্যাং দক্ষিণপার্শ্বে বরমর্থিষ্বক্ষসূত্রঞ্চ।
বামেষ্বষ্ট ভুজায়াঃ কমণ্ডলুশ্চাপমম্বুজং শাস্ত্রম্।
বরশবরদর্পণযুক্তাঃ সব্যভুজা সাক্ষসূত্রাশ্চ॥—৫৮. ৩৭-৩৯।

এখানে তিন রকম মূর্তির কথা হইয়াছে—দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা ও অষ্টভুজা। জন্মকালে সম্ভবত তিনি দ্বিভুজা ছিলেন। হরিবংশ মতে তিনি চতুর্ভুজা। বিষ্ণু ও ব্রহ্মপুরাণে তিনি অষ্টভুজা। এই দুই পুরাণে তাঁহাকে একানংশা বলা হয় নাই—বলা হইয়াছে—যোগনিদ্রা, মহামায়া বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী। নূতন কথা পাওয়া গেল বৃহৎসংহিতায়—বলদেব ও কৃষ্ণের মধ্যে অবস্থিতারূপে। একটু ইঙ্গিত হরিবংশে ১৬০ অধ্যায়ে আছে মাত্র।

বরাহমিহির প্রতিমালক্ষণে ৫৮টি শ্লোক দিয়াছেন। তাহার মধ্যে একানংশার জন্য তিনটি শ্লোক। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে খ্রী. ৬ষ্ঠ শতকে একানংশা জনপ্রিয় দেবী ছিলেন। লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে একানংশার মূর্তি আছে। তাহাতে বলরাম কৃষ্ণের মধ্যে একানংশা।

জগন্নাথ মন্দিরে কিন্তু—ত্রিমূর্তির মধ্যবর্তিনী মূর্তি একানংশার নয়—সুভদ্রার।

কৃষ্ণ বলরামের মত পূজা পাইবার কথা শাস্ত্রে কোথাও নাই। তবে একানংশা যে কাত্যায়নী বা দুর্গা তাহা সহজেই প্রমাণ করা যায়। ব্রহ্ম-পুরাণে সুভদ্রাকে মধ্যমূর্তি বলা হইয়াছে সুভদ্রার নমস্কারমন্ত্র তাহাতে এরূপ দেওয়া হইয়াছে—

"নমস্তে সর্বগে দেবি নমস্তে শুভসৌখ্যদে।

ত্রাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি কাত্যায়নি নমোস্তু তে।" ৫৭. ৫৮

মন্ত্রে কিন্তু সুভদ্রার নাম নাই। মন্ত্রে তাঁহাকে কাত্যায়নী ও সর্বগা বলা হইয়াছে। সুভদ্রা সর্বগা নন। হরিবংশ ৫৮ অ., মৎস্যপু. ১৫৪ অ. একানংশাকে ত্রৈলোক্যচারিণী ও সর্বগা বলা হইয়াছে।

দুর্গা কেমন করিয়া কখন একানংশা নামে অভিহিত হইলেন? কৃষ্ণ বলদেবের সঙ্গে অবস্থিতা বলিয়া কেমন করিয়া তিনি পূজিতা হইলেন? কখন তাঁহার নাম সুভদ্রায় পরিবর্তিত হইল? একানংশা=এক অর্থাৎ প্রসিদ্ধ, অনংশা=অখণ্ডা। অর্থাৎ তিনি অদ্বৈত ও অখণ্ড। একা চানংশেতি একানংশা ভগবতা একা সতী অবিভক্তা—নীলকণ্ঠ।

হরিবংশে ১৬৬, ১৬৮ ও ১৭৮ অধ্যায়ে দেখা যায় একানংশা যাদবদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিপদের সময় তাঁহারা তাঁহার পূজা করিতেন। বেশ কথা। ভাগবতে পাই গোপীরা কাত্যায়নী ব্রত করিয়া ছিলেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন যশোদাসুতাই কৃষ্ণের জীবন-রক্ষাকর্ত্রী পক্ষান্তরে বলদেবেরও, তখন তাঁহারা তাঁহাদের কুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী একানংশা বলিয়া তাঁহাকে মনে করিলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ একানংশার আশ্রিতরূপে রহিলেন। যখন কৃষ্ণ পরমপুরুষ বলিয়া পূজিত হইলেন তখন লোকে একানংশাকে একেবারে ত্যাগ করিলেন না। তবে তাঁহাকে ইঁহাদের নিম্নে স্থান দিলেন।

ব্রহ্মপুরাণমতে অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরীতে মন্দির নির্মাণ করিলেন এবং কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার পূজা প্রবর্তন করিলেন। তিনি পঞ্চরাত্র পদ্ধতিক্রমে পুরুষোত্তম বিষ্ণুর পূজা করিতেন (৪৮. ১২)। স্কন্দপুরাণ,

বিষ্ণুখণ্ড, পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য ২৯ অধ্যায়ে আছে বলভদ্র দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে পূজিত হইবেন, পুরুষোত্তম পুরুষসূক্তে এবং সুভদ্রা দেবীসূক্তে। তখন এই ত্রিমূর্তির মধ্যে একানংশাকে রাখিতে হইলে শক্তি দেবতাকে তাঁহাদের দেবের উপরে স্থান দিতে হয়। তদ্ভিন্ন তিনি শাক্তপদ্ধতিক্রমে পূজিত (হরি. ৫৮ অ.)। পঞ্চরাত্র পদ্ধতিতে এটি বিসদৃশ হইবে, কাজেই তাঁহারা একানংশাকে নির্বিবাদিনী সুভদ্রাতে পরিণত করিলেন। একানংশা যেমন বিষ্ণুভগিনী, 'ভগিনীরামকৃষ্ণয়োঃ' (হরি. ১৬. ১৭৮), তিনি যেমন 'যাদবী'—সুভদ্রাও তাই।

জগন্নাথমূর্তি

"এবন্তু মূর্তয়স্তেন চতস্রো বৈ প্রকাশিতাঃ"—উৎকল খণ্ড, ১৯. ১৮।

চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য ২য় অধ্যায়—

"সেই প্রভু গৌরচন্দ্র চতুর্ব্যূহরূপে।
আপনে বসিয়াছেন সিংহাসনে সুখে॥
আপনেই উপাসক হই করে ভক্তি।
অতএব কে বুঝিবে ঈশ্বরের শক্তি।"

বিপ্র রামদাস বিরচিত দার্ঢ্যভক্তিরসামৃত উৎকলভাষায় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহার ৪৬ অধ্যায়ে কৃষ্ণপ্রিয়ার চরিত্রবর্ণনের প্রারম্ভেই আছে—

"নমস্তে প্রভু হলহস্ত
নমস্তে প্রভু জগন্নাথ॥
সুদর্শন আদি করি।
চতুর্ধা রূপ অচ্ছ ধরি॥"

কেহ কেহ বলেন জগন্নাথ প্রণবমূর্তি। জগন্নাথ হইতেছে—দারুব্রহ্ম। আর প্রণব হইতেছে সেই ব্রহ্মের মূর্তি। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—'ওঁ মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম।'

কেহ বলেন—জগন্নাথের মূর্তি আর কিছু নয়—উহা শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের (৩. ১৯) "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা"—এই শ্রুতিভাগের ব্যাখ্যা। ব্রহ্মবস্তুর হাত নাই, পা নাই, কিন্তু তিনি তাড়াতাড়ি যাইতে

পারেন, সকল সামগ্রী গ্রহণ করিতে পারেন। তাই জগন্নাথেরও হাত নাই, পাও নাই। কানাই খুটিয়ার[5] মহাপ্রকাশে বর্তমান মূর্তি সম্বন্ধে একটি উপযোগী আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইয়াছে।

রথযাত্রা

রথযাত্রার দিন প্রশস্ত বড় দাণ্ড (বড় রাস্তা) লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। জগন্নাথদেবের কাছারী বাড়ীর সম্মুখে তিনখানি রথ সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান হয়। তিনখানি রথ উচ্চতায় ২২ হাত করিয়া। জগন্নাথের রথের চক্র ১৬টি, বলরামের রথের চক্র ১৪টি, সুভদ্রার রথের চক্র ১২টি। জগন্নাথের রথ গরুড়ধ্বজ, বলরামের রথ তালধ্বজ আর সুভদ্রার পথ পদ্মধ্বজ।

জগন্নাথের রথের উপরিভাগ হরিদ্রা ও লোহিত বর্ণের বস্ত্রে ঢাকা। বলরামের রথ সবুজ ও লাল রঙের কাপড়ে ঢাকা; আর সুভদ্রার রথ কাল এবং রাঙা রঙের পটে আবৃত। সকল রথেরই উপর চক্র; স্থানে স্থানে চামর ও ঘণ্টা সংলগ্ন; চারিদিকেই নানা চিত্রপট আর খোদিত বিবিধমূর্তি দ্বারা অলঙ্কৃত। রথযাত্রার পূর্বদিনেই জগন্নাথদেবের নেত্রোৎসব বা নব-যৌবন হইয়া থাকে। ভক্তরা ঐদিনই শ্রীগুণ্ডিচামার্জনও করিয়া থাকেন।

প্রতিপদের দিন রথ তিনখানি রথযাত্রার উপযোগী করিয়া পাশাপাশি সাজাইয়া রাখা হয়। তারপর নেত্রোৎসব (চক্ষুদান) ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অমনি 'টাটী ফিটান' অর্থাৎ স্নানযাত্রার পর থেকে এ কয়দিন পর্যন্ত শ্রীজগন্নাথ যে টাটী বা দরমার বেড়ার মধ্যে অবস্থান করেন, সেই বেড়া খুলিয়া দেওয়া হয়। জগন্নাথদেবের আজ্ঞাস্বরূপ আজ্ঞামালা লইয়া মহাবাদ্যোদ্যমের সঙ্গে সেবকগণ রথের নিকট চলেন। জগন্নাথ রথে চড়িয়া গুণ্ডিচামন্দিরে যাত্রা করিবেন—এই আজ্ঞা যেন সারথীকে জানান। অমনি ঘনঘন জয়-জয় ধ্বনি হরিধ্বনি চারিদিক থেকে উত্থিত হয়; মহানন্দে তিনখানি রথ সিংহদ্বারের ঠিক সামনে পাশাপাশি উত্তর মুখে সাজাইয়া রাখা হয়।

বেলা ১১টার সময় 'পাণ্ডু-বিজয়' আরম্ভ হয়। অমনি শত-শত কাঁসর

বাজিয়া ওঠে, ঘন-ঘন ঘণ্টা-নিনাদ ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে থাকে। মঠ-বাড়ীর মহান্তগণ ও সেবাধিকারিগণ বহু সংখ্যক শ্বেত-চামর দুলাইতে থাকেন। বিচিত্র বহুমূল্য বস্ত্রনির্মিত রজতদণ্ডে সংলগ্ন আড়ানি লইয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গে শত-শত ভক্ত বাতাস দিতে থাকেন। ছত্রধারীরা চিত্রবিচিত্র ছত্র লইয়া প্রভুর মস্তকে ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন।

দয়িতাপণ্ডাগণ মেয়েদের মত গামছা লইয়া বুকের উপর পর্যন্ত বাঁধিয়া আনন্দধ্বনি করিতে করিতে প্রভু সমীপে উপস্থিত হন। আর পড়িহারী পণ্ডা রুলের মত মোটা দুইটি বেত হাতে লইয়া বেতের মত শব্দ করিতে করিতে প্রভুকে 'আহে গোকুল-নায়ক—আহে বৃন্দাবন মণিমা' বলিয়া বারবার সম্বোধন করিতে থাকে। ঐ সম্বোধনে প্রভুরও যেন চমক ভাঙ্গিয়া যায়—তাঁহার যেন গোকুল-বৃন্দাবনের কথা বেশী বেশী মনে পড়িয়া যায়। তিনি যেন আর স্থির থাকিতে পারেন না। পাণ্ডুবিজয় করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। দয়িতাপণ্ডাগণও তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝাইয়া তাঁহাকে চারিদিক থেকে জড়াইয়া ধরেন—হাসিতে হাসিতে পট্টডোরী দিয়া কটিতে কসিয়া বাঁধেন—তারপর হর্ষকোলাহল করিতে করিতে প্রভুকে লইয়া চলেন।

অগ্রে বলরাম—তারপর সুভদ্রা-সুদর্শন, তারপর স্বয়ং জগন্নাথ পিঠে পিঠে চারিমূর্তিই যাত্রা করেন।

এদেশে এই প্রকার পাণ্ডুবিজয়কে 'ধাড়িপহণ্ডী' বলে। সাহিত্য-পরিষদের ছাপা কৃত্তিবাসী রামায়ণে, আর দ্বিজ মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থে ধাড়ি শব্দ আছে। সংস্কৃতে ঐ 'ধাটি' শব্দটির মানে "বলপূর্বক আক্রমণ"—"বলাদাক্রমণং ধাটিঃ।" এখানেও জগন্নাথ—সুভদ্রা বলরামাদির পিছনে পিছনে তাড়া করার মত তাড়াতাড়ি গমন করেন বলিয়াই বোধহয় এই পহণ্ডীর নাম "ধাড়ি-পহণ্ডী" হইয়াছে। প্রভুরা যখন একলা পৃথক পৃথক পাণ্ডুবিজয় করেন ওড়িশায় ঐ পহণ্ডী-বিজয়কে "গুটিপহণ্ডী" বলে। উৎকল ভাষায় ও প্রাচীন বাংলায় "গুটি" শব্দের অর্থ 'একটি'।

শ্রীপ্রভুরা যেমন জগমোহনের বাহিরে আসিতে থাকেন, অমনি তাঁহাদের মাথায় পুষ্পাদি-নির্মিত 'জটা' পরাইয়া দেওয়া হয়। বৃন্দাবন-বিহারে যাইতে হইবে কিনা, তাই প্রভুদের মণিরত্নের অলঙ্কার ভাল লাগে

না। ফুলের ভূষণ পরিপাটি হয়। এই জন্যই বোধ হয় শ্রীপ্রভু ললাটের মণিভূষণটিও খুলিয়া ফেলেন। তখন যে শোভা হয় তা বড়ই মধুর।

তারপর তাঁহারা যেমনি শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে বিজয় করেন অমনি ছত্রপতি মস্তকে ছত্র-ধারণ করেন। আর চারিদিক থেকে ফলমূল-মিষ্টান্নাদি দিবার ধুম পড়িয়া যায়। প্রভুরাও মঠবাড়ীর মহান্ত প্রভৃতির ভক্ত্যুপহৃত ভোগ খাইতে খাইতে আনন্দবাজারের ভিতর দিয়া 'বাইশ পাহাছের' উপরে আসিয়া উপস্থিত হন। সিংহদ্বার থেকে শ্রীমন্দিরের উপরে উঠিবার যে বাইশটি বড় বড় সিঁড়ি আছে, এদেশে তাহাকেই "বাইশ পাহাছে" বলে। ঐ বাইশ পাহাছেরও দুধারি ভোগ খাইতে খাইতে প্রভুরা অবতরণ করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা সিংহদ্বার পার হইয়া অরুণ-স্তম্ভের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। আর অমনি চারিদিক থেকে উলু-উলু ধ্বনি হরিধ্বনি হইতে থাকে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

বলরাম জগন্নাথের রথ-প্রদক্ষিণ করিয়া তালধ্বজ নামক নিজের রথে আরোহণ করেন। তারপর সুভদ্রাদেবীও ঐ রকম করিয়া 'বিজয়া' নামক নিজের রথে চড়েন। সুদর্শনও ঐ রথের উপর শুভ বিজয় করেন। সকলের শেষে জগন্নাথও 'নন্দিঘোষ' নামক স্বীয় রথের উপর গিয়া ওঠেন। চারিদিকেই অসংখ্য দর্শক। তাহাদের করতালি—হর্ষোল্লাসধ্বনি।

পাণ্ডু-বিজয় শেষ হইতে দুঘন্টা সময় তো যায়ই। কিছুক্ষণ পরে রামকৃষ্ণ বলদেবের রথে এবং মদনমোহন জগন্নাথের রথে আসিয়া আরোহণ করেন। জগন্নাথের অনেকগুলি 'বিজয়-প্রতিমা' আছেন, তাঁহারা জগন্নাথের প্রতিনিধিরূপে গিয়া শ্রীপ্রভুরই নানা লীলা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। জগন্নাথের কথায় কথায় শ্রীমন্দিরের বাহির হওয়া তো বড় সহজ ব্যাপার নয়। তাই এই সকল বিজয়প্রতিমাকেই সকল লীলা সম্পাদন করিতে হয়। চন্দনযাত্রার সময় রামকৃষ্ণ ও মদনমোহনই প্রভুর প্রতিনিধিরূপে নরেন্দ্র সরোবরে গিয়া নৌকাবিহারাদি নানালীলা করিয়া থাকেন। আবার দোলযাত্রার সময় ইঁহারা গমন করেন না। চতুর্ভুজ গোবিন্দদেবই দোলমঞ্চে গিয়া আবীরে লালে লাল হইয়া দোলায় দুলিতে থাকেন। এইরকম করিয়া এক-একটি লীলার অনুরূপ

বিজয়প্রতিমা বাহিরে বিজয় করিয়া শ্রীপ্রভুর সকল লীলা সমাধান করেন। অন্য জায়গায় যাই হোক, পুরীধামের জগন্নাথদেবের রথযাত্রা—আমার নিজের ধারণা—দ্বারকা থেকে বৃন্দাবনযাত্রা। তাই বোধ হয় বৃন্দাবন-লীলা বাল্যভারাক্রান্ত কন্দুকহস্ত রামকৃষ্ণ (রাম ও কৃষ্ণ) আর নবকিশোর নটবর মদনমোহন—এই তিন বিজয়প্রতিমাও শ্রীপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই শুভ বিজয় করেন। সুদর্শন যদি প্রেমে বিভোর হইয়া দণ্ডাকৃতি না হইতেন, তাহা হইলে এই রথযাত্রায় তাঁহার যাওয়া ঘটিত কিনা সন্দেহ। শ্রীবৃন্দাবন তো আর ঐশ্বর্যের স্থান নয়।

পুরীধামের রথযাত্রা যে দ্বারকা থেকে বৃন্দাবনযাত্রা, তার দুই-একটা প্রমাণ দিতেছি। শ্রীজগবন্ধুর বারমেসে মন্দির যে স্থানে অবস্থিত ঐ স্থান নীলাচল নামেই প্রসিদ্ধ। এককালে যে তাহা 'অচল' বা পর্বতই ছিল, তা 'বাইশ পাহাছে' উঠিতে উঠিতে বেশ বোঝা যায়। আর যে জায়গায় শ্রীপ্রভুর গুণ্ডিচামন্দির বর্তমান, সেই জায়গাটি 'সুন্দরাচল' নামে সুপরিচিত। গুণ্ডিচামন্দিরে উঠিতেও পাহাড়ে ওঠার মত অনেকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিতে হয়। এদেশের লোকে রথযাত্রাকে 'গুণ্ডিচাযাত্রা' বা গুণ্ডিচা বলিয়া থাকে। আমাদের প্রাচীন বাংলাভাষায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি শ্রীগ্রন্থসমূহে আর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থগুলিতে রথযাত্রা গুণ্ডিচাযাত্রা বলিয়াই অভিহিত। কবিকেশরী কর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের ১০ অঙ্কে এই গুণ্ডিচাযাত্রার বর্ণনা পড়িলে জগন্নাথ যে প্রতি বৎসর রথযাত্রা বা গুণ্ডিচাযাত্রাচ্ছলে দ্বারকা থেকে বৃন্দাবন গমন করেন, একথা স্পষ্টই বোঝা যায়। দেখুন—

"যদ্যপি জগন্নাথো দ্বারকালীলামনুকরোতি, তথাপি গুণ্ডিচাব্যাজেন বৃন্দাবন-স্মারকেষ্বেতেষূপবনেষু বিহর্তুং প্রত্যব্দমেব, নীলাচলং পরিত্যজ্য সুন্দরাচলম্ আগচ্ছতি।"

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও মধ্যলীলার ১৪শ পরিচ্ছেদে এই একই কথা দেখিতে পাওয়া যায়—

"যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারকা-বিহার।
সহজ প্রকট করে পরম উদার॥

তথাপি বৎসর মধ্যে হয় একবার।
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার॥
বৃন্দাবন-সম এই উপবনগণ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন॥
বাহির হইতে করে রথযাত্রাছল।
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল॥"

দয়িতাপণ্ডাগণই পরমানন্দে জগবন্ধুকে রথে লইয়া আসেন। এ কার্যে অন্য কাহারও অধিকার নাই। সংস্কৃতে দয়িত শব্দের অর্থ 'প্রিয়'। দয়িতা শব্দের অর্থ—'প্রিয়া'। এই দয়িতাপণ্ডারা যথার্থই জগন্নাথের প্রিয়তমা ব্রজদেবীগণের প্রতিনিধিস্বরূপ। জগন্নাথের তো এত সেবক আছেন, কিন্তু ইঁহাদের মত জগন্নাথকে আপনার—আত্মীয় স্বগোত্র—স্বজাতি বলিয়া কেই বা মনে করে? জগবন্ধুর যখন নব-কলেবর হয়, তখন এই দয়িতাগণ রীতিমত অশৌচ লইয়া থাকেন। আর এত প্রীতির পবিত্র সম্বন্ধ না থাকিলে কি তাঁহারা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ভালবাসায় মেশামিশির মত আপন অঙ্গ সংলগ্ন করিতে পারিত? ইঁহারা ব্রজের ভাবে ভাবিত বলিয়াই না লক্ষ্মীদেবী ইঁহাদের গায়ের গন্ধ পাইতে না পাইতে শ্রীমন্দির থেকে সরিয়া পড়েন? ব্রজের ধনকে ব্রজে লইয়া যাইতে ব্রজবাসীদেরই তো আনন্দ উল্লাস।

এইবার সুসজ্জিত সারথিগণ বর্ষার ছাতি মাথায় দিয়া রথের উপর চড়িয়া বসিবেন। ইঁহারা বসিলে রথের সিঁড়িগুলি খুলিয়া ফেলা হয়। প্রত্যেক রথে চারিটি করিয়া ঘোড়াও জুড়িয়া দেওয়া হয়। মুদীরথ পণ্ডাই রাজার প্রতিনিধিরূপে মার্জনী হস্তে রথ যাবার পথ পরিষ্কার করিতে থাকেন। জগবন্ধুর রথের উপর ইতিপূর্বে দুটি বড় বড় কাঠের সিন্দুক তুলিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাতে প্রভুদের বেশভূষা রক্ষিত থাকে। সেবকগণ, সিন্দুক হইতে বেশভূষা বাহির করিয়া প্রভুদের মনের মত সাজাইতে থাকেন। আর উৎকলদেশী ভক্তগণ—আহে মণিমা, আহে বলিয়ারভুজ, আহে ত্রিপঞ্চকালিয়া, আহে বটঠাকুর, আহে সুভদ্রামায়, আহে সুদর্শন প্রভৃতি পবিত্র শব্দ উচ্চারণ করেন। তারপর পথের টান

আরম্ভ হইবে বলিয়া রথের চারিদিকে ঘেরা দেওয়া হয়। রথেও মোটা কাছি দড়ি বাঁধা হয়। রথ টানিবার লোকের অভাব নাই। পূর্বে কালাপিঠিয়ারা আপনা-আপনি আসিয়া রথ টানিত। এখন ৫০০ গৌড়কে জগন্নাথের ভাণ্ডার থেকে খোরাকি দিয়া নিযুক্ত রাখা হয়। যাত্রীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া তাহারাও রথরজ্জু আকর্ষণ করে।

অনেক বৈষ্ণবপ্রধান দেশে কার্ত্তিক মাসে উত্থান একাদশীর দিন রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হরিভক্তি-বিলাস গ্রন্থের ১৬শ বিলাসে এই ব্যাপার বিশেষ করিয়া বর্ণিত আছে। মেদিনীপুর জেলায় চন্দ্রকোণার গিরিধারী-লালজীর রথযাত্রা খুব বিখ্যাত—এ রথযাত্রা কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় হয়। চন্দ্রকোণায় রঘুনাথজীর রথ বিজয়ার দিন হয়। ঘোষপাড়ার রথযাত্রা বৈশাখ মাসে হইয়া থাকে। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের আর শ্রীবৃন্দাবনের শেঠেদের শ্রীরঙ্গনাথ জীউর রথযাত্রা হয় চৈত্রশুক্লা নবমী তিথিতে।

[শ্রীভারতী, ১৩৪৬ আষাঢ়, পৃ. ৬৮১—৬৮৮]

পাদটীকা

১ বঙ্গীয় রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালের ১৯৩৬ খ্রী. প্রকাশিত প্রবন্ধের সারসঙ্কলন।

প্রসঙ্গ কথা

1 কবিকেশরী কর্ণপুর (১৫২৭—১৫৭৬ খ্রী.) : কবি ও পদকর্তা। প্রকৃত নাম—পরমানন্দ দাস সেন। পিতা—শিবানন্দ সেন। বাস—বর্ধমান, কুলীনগ্রাম। শ্রীচৈতন্য কর্তৃক 'কবিকর্ণপুর' নামে অভিহিত। 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটক (১৫৪০ খ্রী.) ব্যতীত অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন।—জী-কো.

2 শ্রীজীব গোস্বামী (?—১৬১৮ খ্রী.) : বৈষ্ণব ভক্ত ও গ্রন্থকার। জন্ম—বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ, ফতেয়াবাদ। পিতা—বল্লভ গোস্বামী (নামান্তর—অনুপম মল্লিক)। গৌড়ে এবং কাশীতে শিক্ষা। শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবন গিয়ে ৬৫ বছর বাস করেন। ইনি অনেকগুলি বই লেখেন—গোপালচম্পূ, গোপালবিরুদাবলী, কৃষ্ণার্চন-দীপিকা, ষট্‌সন্দর্ভ ই. ।—সা-সে-ম.

3 রঘুনন্দন (ভট্টাচার্য) (আনু. ১৫০৭ খ্রী.) : স্মার্তপণ্ডিত। জন্ম—নবদ্বীপ। পিতা—হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য। মুসলমান শাসনাধীনে হিন্দু সমাজের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হলে সমাজের শৃঙ্খলার জন্য স্মৃতি অনুশাসন দেন। রচিত গ্রন্থ অনেকগুলি—জ্যোতিষতত্ত্ব (১৫৬৭), নব্যস্মৃতি, দ্বাদশযাত্রাপ্রমাণতত্ত্ব ই. ।—ঐ

4 ফা-হিয়ান : চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক। 'বৌদ্ধযুগে শিল্পশিক্ষা' প্রসঙ্গ কথা দ্র.

5 কানাই খুটিয়া : পদকর্তা। তাঁর কোন বিবরণ সংগৃহীত হয় নি। 'খুটিয়া' উপাধি উড়িষ্যার জগন্নাথদেবের পরিচারক-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে আছে কি না জানা যায় নি। তাঁর একটি পদ অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে (পৃ. ১৩৫) পাওয়া যায়। সরল বাংলায় বেশ মর্মস্পর্শী। সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, পৃ. ২॥৵.

6 কৃষ্ণদাস কবিরাজ (আনু. ১৫৩০—১৬১৬) : গ্রন্থকার ও পদকর্তা। জন্ম—বর্ধমান, কাটোয়ার ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে। পিতা—ভগীরথ দাস। মাতা—সুনন্দা। শৈশবে সংস্কৃত, ফার্সী ও নানা শাস্ত্র পাঠ করেন। কিছুকাল কবিরাজি চিকিৎসা। পরে সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে রূপ, সনাতন, রঘুনাথ, জীব গোস্বামী প্রভৃতির পুণ্যাশ্রমে জীবন কাটান। তাঁর গ্রন্থ গোবিন্দলীলামৃত (কাব্য), প্রেমরত্নাবলী, অদ্বৈতসূত্রের করচা, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (১৬১৫ খ্রী.) ই.।—জী-কো.

দোল

দোল বসন্তের উৎসব। একসময় শুষ্কতৃণ—অঙ্কুরিত, তরু-লতা—পল্লবিত, মুকুলিত; প্রকৃতির সৌন্দর্যের নবীন ছটায় নয়ন-মন আনন্দ-রসে সিক্ত। শাস্ত্রে বলে, এটা বসন্তকাল; সুতরাং বসন্তসমাগমে বাসন্তী মাধুরীতে প্রকৃতি বিভোর হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা না বলিলে প্রত্যবায় আছে। বসন্তে কবিও গান ধরিয়া বলেন—

"মনের কোণে রঙ্ ধরেছে,
আকাশ-বাতাস বদ্‌লে গেছে,
মল্লী-চাঁপা-যুঁই-বেলেতে দখিন্ হাওয়া যায় বুলে
তাকা তোরা চোক তুলে।"

বসন্তের কত কবি কালোপযোগী কত ভাবেরই সুর তুলিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত কবিচূড়ামণি জয়দেবও রাধা-সহচরীর মুখ দিয়া 'বসন্তে বাসন্তীকুসুমকুমারৈ রবয়বৈর্ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিহিতকৃষ্ণানুসরণাম্'—ধ্বনিতে বসন্ত প্রভাবের বর্ণনায় কন্দর্পজ্বরজনিত চিন্তাকুলতাও সমানয়ন করিয়াছেন। আজিকার দোললীলাও সেই বাসন্তী রুচির এক অভিনব লীলায়িত ক্রম। আমরা আজ এই বসন্তোৎসব সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলিবার উপক্রম করিব।

বহুকাল ধরিয়া ভারতের সর্বত্র বসন্তকালে একটি উৎসব চলিয়া আসিতেছে। আমরা বঙ্গদেশেও এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। তবে, আমরা যেভাবে করি অন্য দেশের লোকেরা ঠিক সেই ধারা অনুসারে

চলে না। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" এই মহাবাক্যের সার্থকতায় দেশভেদে এই উৎসবের যথেষ্ট অনুষ্ঠানভেদ আছে। আমরা বাংলা ও ওড়িষায় ইহাকে দোলযাত্রা বলি, উত্তরাঞ্চলে ইহার নাম হোলী। দাক্ষিণাত্যে বসন্তোৎসব 'সিঙ্গা' নামে পরিচিত। এখানকার সিঙ্গোৎসবের শাস্ত্রীয় নাম 'হুতাশনী'। সিঙ্গা মাসে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম সিঙ্গা। ভারতের একেবারে দক্ষিণাঞ্চলে লোকে এই উৎসবকে 'কমনপণ্ডুগাই' বলে। কন্নড়প্রদেশে ইহার নামান্তর 'কমন্নন হব্ব'। হব্ব শব্দের অর্থ উৎসব।

দোলযাত্রা হিন্দুদিগের উৎসব হইলেও মুসলমানরাও যে এই উৎসবে বড় কম আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা নহে (কোলব্রুকের[1] বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড, ২৩৫ পৃ.)। মুসলমানদিগের মধ্যেও এ উৎসবের প্রচলন সম্বন্ধে অনেক নজির দেখিতে পাওয়া যায়। সম্রাট অক্‌বরের অন্তঃপুরে হোলী খেলার একখানি চিত্র আছে। এই চিত্রে দেখা যায় যে, পুরমহিলাগণ তাঁহাদিগের সহচরীবর্গের প্রতি পিচকারি-বর্ষণ ও আবীর নিক্ষেপ করিয়া নানারূপ রঙ্গরস উপভোগ করিতেছেন। চিত্রখানি অবশ্য অক্‌বরের সমসাময়িক নহে; পরে, জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া অঙ্কিত হইয়াছিল (Loan Exhibition of Antiquities, Coronation Durbar, ১৯১১ নং C—৯২, পৃ. ৯০; চিত্র নং ২৮)। চিত্রখানি আল্‌ওয়ারের মহারাজের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। বদাউনী[2] ও অবুল ফজল[3] লিখিত বিবরণাবলী হইতে অবশ্য সম্রাট অক্‌বরের অন্তঃপুরে এই উৎসব-আনন্দের প্রচলন সম্বন্ধীয় কোনরূপ তথ্য পাওয়া যায় না। 'অইন-ই-অক্‌বরী'[4]তে আমরা মাত্র এইটুকু উল্লেখ দেখিতে পাই—"এখানেও চেরামতী নামক স্থানে হুলীর ভোজের সময় অদ্ভুত উপায়ে মৃত্তিকা হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া থাকে" (গ্লাডউইনের[5] অইন-ই-অক্‌বরী, ২য় খণ্ড, ৩৪ পৃ.; জ্যারেট সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৩ পৃ.)। তবে, লাহোরের মহম্মদ হুসেন আজাদ-প্রণীত 'দরবার অক্‌বরী' নামক একখানি আধুনিক উর্দু গ্রন্থে সম্রাট অক্‌বরের অন্তঃপুরে এই আনন্দ উৎসব প্রচলন থাকার কতকটা বিবরণ পাওয়া যায়। অযোধ্যার নবাব আসফ্-উদ্-দৌলার[6] সময়ে মুসলমানগণের মধ্যে এই উৎসবের যে কি আদর ছিল, তাহার বিস্তৃত

বিবরণ মীরতকী প্রণীত 'কুল্লীয়াৎ' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায় (কুল্লীয়াৎ-ই-মীরতকী, পৃ. ৯৫৪)। দিল্লীর আমীর, সৈয়দ হিদায়ৎ আলি খাঁর (ইনি নাজির-উদ্-দৌল্লা বক্সী-উল্-মুলক্ আশদ্ জং বাহাদুর নামেও পরিচিত) নিকট হইতেও আমরা এই উৎসব সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাইয়া থাকি। 'এসিয়াটিক রিসার্চে', কোলব্রুক বলেন—"আমি শুনিয়াছি মুসলমান হইলেও, সুজা-উদ্-দৌল্লা হোলীখেলার বড় পক্ষপাতী ছিলেন" (২য় খণ্ড, ৩৩৪ পৃ.)। এতদ্ভিন্ন ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথের 'কথা'য় ও সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' প্রভৃতি কয়েকখানি সাহিত্য-গ্রন্থ হইতেও মুসলমান অন্তঃপুরে 'হোলী'র কথা পাওয়া যায়।

গুর্জরাট প্রদেশের গ্রাম্য পারসীগণের মধ্যেও হোলী উপলক্ষে জ্বলন্ত অগ্নিতে আহুতিপ্রদান প্রভৃতি কতকগুলি প্রথার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় (বোম্বাই গেজেট, নবম খণ্ড)। শিখরাও, দশেরা ও দেওয়ালির মত বিশেষ ধুমধামের সহিত এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে (উইলসনে'র রচনাবলী, ১৪৭-১৪৮ পৃ.)।

বিহার ও উত্তরাঞ্চলে এই হোলী-উৎসব সাধারণত ফাল্গুনী পূর্ণিমার ১০।১২ দিন পূর্ব হইতে আরম্ভ হয় ও পূর্ণিমার দিনে ইহার অবসান হয়। তবে, অধুনা প্রায় পূর্ণিমার ৩।৪ দিন পূর্ব হইতেই উৎসব আরম্ভ হইয়া থাকে। আবাল-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিয়া নানারূপ নৃত্যগীত ও কুৎসিত রঙ্গরস করিয়া এই উৎসব উপভোগ করে। পরস্পরের প্রতি পিচকারি-বর্ষণ ও আবীর, কুঙ্কুম নিক্ষেপই এই উৎসবের প্রধান উপকরণ। পূর্ণিমার দিনেই এই উৎসবের বিশেষ জাঁক। সেদিন আর স্ত্রী-পুরুষে কোন ভেদ বিচার থাকে না। সকলেই স্বাধীন। যাহার যাহা ইচ্ছা অবাধে করিতে থাকে। নানারূপ নেশা, ক্রীড়া ও কুৎসিত আমোদের চূড়ান্ত করিয়া উৎসবের সমাধান হয়।

উৎসবের কয়েকদিন ধরিয়াই ইহারা যেরূপ অশ্লীল ভাষায় পরস্পর কথা-কাটাকাটি করিতে থাকে ও স্ত্রীলোক দেখিলেই তাহাদের প্রতি যেরূপ কুৎসিৎ বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা শুনিলে প্রত্যেক ভদ্র ব্যক্তিকেই লজ্জায় মস্তক অবনত করিতে হয়। এই উৎসব উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি

বিশেষ খাদ্য-প্রস্তুত-প্রণালী প্রচলিত আছে। পূর্ণিমার দিন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে এই সকল খাদ্য বিতরিত হইয়া থাকে।

পূর্ণিমার রাত্রে প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া কাষ্ঠাগ্নি প্রজ্বলিত করা হয় ও বালকেরা তাহাতে নানারূপ ক্রীড়া করিয়া থাকে। এই অগ্নি-উৎসবকে 'সম্মৎ' বলা হয়। সম্মৎ-জ্বালানো একটি বড় আমোদের ও সমারোহের ব্যাপার। শ্রীপঞ্চমীর দিন হইতে ইহার আয়োজন হইয়া থাকে। বালকেরা সেইদিন হইতে গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী হইতে কাঠ ও খড় সংগ্রহ করিয়া একটি খোলা জায়গায় উহা স্তূপীকৃত করে। অতঃপর, পূর্ণিমার রাত্রে গ্রামের দক্ষিণদিকে সেগুলিতে অগ্নিসঞ্চার করা হয়। এই সম্মতের মধ্যস্থলে একটি খোঁটা পুঁতিয়া তাহার উপরে একখানি 'পিষ্টক' রাখা হয়। এই পিষ্টককে 'ঠেকুয়া' বলে। সারারাত্রি ধরিয়া এই সম্মৎ জ্বালানো হয়। অতঃপর রাত্রিশেষে অগ্নি নির্বাপিত হইলে খোঁটার উপরিস্থিত সেই ঠেকুয়াখানি ভাঙ্গিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। খোঁটাটি পড়িয়া যাইবার সময়ে যে ব্যক্তি এই ঠেকুয়াখানি সংগ্রহ করিতে পারে, সে বিশেষ ভাগ্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়।

ভীল ও মুণ্ডা প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণের মধ্যেও এই উৎসব প্রচলিত আছে। এই উৎসব উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষে একটি কৃত্রিম যুদ্ধ হয়। সম্ভবত ভূত-প্রেত দূরীকরণই এই যুদ্ধের অভিপ্রায়। মিঃ গ্রাউজ[৪] মথুরায় নন্দ গাঁওএর পুরুষ ও বরসানার স্ত্রীলোকদের মধ্যে এইরূপ একটি চমৎকার কৃত্রিম যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন (মথুরা, পৃ. ৮৪)। উত্তর ভারতের কয়েকটি জাতির মধ্যে এই উৎসবে অগ্নিসংযুক্ত একটি খাতের মধ্য দিয়া চলাফেরা করার একটা প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে, আজকাল আর এ প্রথা বড়-একটা দেখা যায় না। মেবাড়ের ভীলেরা দশদিন ধরিয়া এই উৎসব করিয়া থাকে। হোলীর এই কয়দিনই তাহারা অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া থাকে ও আবীর-খেলা, নর্তন ও কদর্য রঙ্গ-রস করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরাও এই উৎসবে ইহাদের সহিত এই সকল কদর্য আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে এই সকল স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া রাস্তায় গান গায়িতে গায়িতে চলিতে থাকে এবং

কোন সমৃদ্ধ পুরুষ দেখিলে তাহার গতিরোধ করিয়া উপহারস্বরূপ তাহার নিকট কিছু আদায় করিয়া তবে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।

মারবাড় ও গোয়ালিয়ারে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই উৎসবের অধিকতর প্রভাব দেখা যায়।

ওয়ার্ধার স্ত্রীলোকেরা হোলীতে যোগদান করে না। মধ্যভারতের কয়েক স্থানে ও মান্দালায় এই বসন্তোৎসব ঋতুটি একটা অসংযত উচ্ছৃঙ্খলতার কাল বলিয়া পরিগণিত। ভর্গরভীলগণ সারাবৎসর ধরিয়াই হোলীর আগুন জ্বালাইয়া রাখে।

গুজরাটের কয়েকস্থলে হোলীপূর্ণিমার পরেও প্রায় দশ-বারদিন ধরিয়া স্থানে স্থানে হোলীর অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। কুমারীগণ এই সকল স্থান পূজা করিয়া থাকে। পণ্ডিত রামগরীব চৌবে ১৯১০ সালের 'ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরীতে (৩২ পৃ.) লিখিয়াছেন—'সাহারানপুরে 'সাং' বা 'স্বাং' নামে একজাতীয় বিশেষ সঙ্গীত আছে। এই সকল সঙ্গীত হোলী-উৎসবের প্রায় ৫ দিন পূর্ব হইতে গীত হইতে থাকে। এই সকল সঙ্গীত রচনায় স্থানীয় কবিদিগের মধ্যে বেশ একটু প্রতিযোগিতা দেখা যায়। সাহারানপুর-নিবাসী অম্বা নামক জনৈক গুজরাটী ব্রাহ্মণ এই সকল সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দ হইতে সাহারানপুরে এই সকল সঙ্গীতের প্রচলন আরম্ভ হয়।

পঞ্জাবে হোলী একটি কৃষি-দেবতার উৎসব। এখানে বয়স্থা স্ত্রীলোকগণ দরজার দুইপার্শ্বে 'হোলী'র অনুকরণে রক্ত বা পীতবর্ণে রঞ্জিত করিয়া 'স্বস্তিক'—চিহ্ন স্থাপন করিয়া উহার পূজা করিয়া থাকেন। (ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরি ১৯০৯, ১২৭ পৃ.)।

মথুরায় গোয়ালা জাতিদিগের হোলী-পূজা একটি অদ্ভুত উৎসব। গ্রাউজ-প্রণীত 'মথুরা' নামক পুস্তকে (৮৪ পৃ.) ইহার একটি সুন্দর বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্নেল টড[৭], তাঁহার প্রসিদ্ধ ইতিহাসে (১ম খণ্ড, ৫৯৯ পৃ.) মারবাড়ে প্রচলিত হোলীর উৎসব-প্রথা বড় সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। আধুনিক মারবাড়ীগণের মধ্যে স্ত্রীলোকেরাই নানা সঙ্গীত ও রঙের দ্বারা এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই উৎসবে বাজারের

মধ্যে নাথুরামের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে ঐ মূর্তিকে টুকরা-টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। দাক্ষিণাত্যে এ উৎসব একটি নূতন জিনিস। এখানকার অধিবাসিগণ এই উপলক্ষে কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করে ও নানা অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিয়া পরস্পরের প্রতি আবীর নিক্ষেপ করে। হোলী-উৎসব ধারওয়ারে অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। লিঙ্গায়ৎগণের হোলী-উৎসব একটি বড় মজার ব্যাপার। এই উপলক্ষে তাহারা একটি কাষ্ঠের ভবন নির্মাণ করে। এই ভবন মধ্যে কামের ক্রোড়ে রতিকে বসাইয়া একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়। স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিয়া এই মূর্তির সমক্ষে নৃত্য-গীতবাদ্যাদি করিতে থাকে। পূর্ণিমাই এই উৎসবের উপযুক্ত দিন। তবে উৎসব কয়েকদিন ধরিয়া চলে। উৎসবের পুরদিবস কাষ্ঠাগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়।

এই উৎসবের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মতামত দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের দেশে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়াই এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে, এক অসুর বড়ই দৌরাত্ম্য করিত। তাঁহার অত্যাচারে লোকে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইত। কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে হত্যা করিয়া দোলায় বসিয়া বিশ্রাম-সুখলাভ করিয়াছিলেন। দোল শব্দের অর্থ 'ইতস্তত সঞ্চালন'। কৃষ্ণচন্দ্রের এই ব্যাপার অবলম্বন করিয়াই দোলোৎসব। জৈমিনি ঋষি বলিয়াছেন—

'ফাল্গুনে মাসি কুর্বীত দোলারোহণমুত্তমম্।
যত্র তিষ্ঠতি গোবিন্দো লোকানুগ্রহণায় বৈ॥
প্রত্যর্চাং দেবদেবস্য গোবিন্দস্য চ কারয়েৎ।'

ফাল্গুন মাসে শ্রীকৃষ্ণ বুঝি জীবের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়া থাকেন। এইজন্যই লোকে এই সময়েই বিশেষ করিয়া তাঁহার পূজার আয়োজন করিয়া থাকে।

স্কন্দপুরাণের ফাল্গুনমাহাত্ম্য একটা বড় অধ্যায়। এই অধ্যায়ে ফাল্গুন-মাহাত্ম্যের কত কথারই আলোচনা আছে। এই সম্পর্কে হোলিকা নামে এক রাক্ষসীর আখ্যায়িকা এবং মেড্র অসুরের দহন লইয়া একটি গল্প আছে। ভবিষ্যোত্তরপুরাণে এই উৎসবের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্যপ্রকারের

আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। ফাল্গুনমাহাত্ম্যে যে সকল জঘন্য বিষয়ের আলোচনা ও বিবরণ আছে, ইহাতে তাহা নাই। এই গল্পটি অন্য রকমের।

গল্পটি এই—একদিন যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ, ফাল্গুন মাসে যে গ্রামে গ্রামে কাঠ জ্বালাইয়া ও পল্লীতে পল্লীতে বালকেরা চীৎকার করিয়া এই উৎসব করিয়া বেড়াইতেছে ইহার কারণ কি? এ উৎসবে তাহারা কাহারই বা পূজা বা অবতারত্ব ঘোষণা করিতেছে?

হে জনার্দন, আমি এই উৎসব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করি। আমাকে দয়া করিয়া তাহা বলুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন সত্যযুগে রঘু নামে এক ধার্মিক ও গুণবান রাজা ছিলেন। তিনি সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া ন্যায় ও কারুণ্যসহকারে প্রজাপালন করিতে থাকেন। ফলে তাঁহার রাজ্যে অধর্মের স্থান হইল না। দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর অসদ্ভাব হইল। প্রজাদের প্রিয় হইয়া দেবতার আশীর্বাদে রাজা তাঁহার জীবন সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। পরে একদিন প্রজাপুঞ্জ কাঁপিতে কাঁপিতে রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, ঢুণ্ঢা নামে এক রাক্ষসী তাহাদের সর্বনাশ করিতেছে। তাহার প্রভাবে তাহারা ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছে। ওষধি ও মন্ত্র বলে বালকদের কোন উপকার হইতেছে না। কাজেই নিরুপায় হইয়া রাক্ষসীর হস্ত হইতে রক্ষার নিমিত্ত তাহারা রাজার শরণাপন্ন হইয়াছে। ইহা শুনিয়া রাজা তাঁহার পুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে ডাকিয়া বলিলেন, প্রজারা বিপন্ন, প্রজাদের কষ্ট দূর করুন। আর বলুন এ রাক্ষসী কেন এরূপ কষ্ট দিতেছে। বশিষ্ঠ রাজাকে অভয় দিয়া বলিলেন, আমি এই রাক্ষসীর বিবরণ বলিয়া ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় বলিব। পুরাকালে মালিনীর কন্যা ঢুণ্ঢা কঠোর সাধনা করিয়া শিবের অনুগ্রহ লাভ করে। শম্ভু বর দিতে চাহিলে সে অমরত্ব প্রার্থনা করিল। দেবাদিদেব কিন্তু এতদুর করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বর দিলেন যে, মর্ত্য বা সুরলোকে কোনও শক্তি তাহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। কেবল ঋতু-পরিবর্তনের সময় উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি ও বালকগণ হইতে তাহার বিশেষ ভয় থাকিবে। বালকেরা তাহার বৈরী একথা জানিতে পারিয়া রাক্ষসী তাহাদিগকে নানারূপে নির্যাতিত করে—তা ছাড়া অন্যান্য

লোককেও কম যন্ত্রণা দেয় না। এখন তাহাকে জব্দ করিতে হইলে কি করা চাই শাস্ত্র তাহা এইরূপ বলিতেছে—

'অস্য পঞ্চদশী শুক্লা ফাল্গুনস্য নরাধিপ।
শীতকালো বিনিষ্ক্রান্তঃ প্রাতর্গ্রীষ্মোভবিষ্যতি॥
অভয়ং সর্বলোকানাং পুরুষর্ষভ।
তথাহ্যশঙ্কিতালোকা হসন্তু চ রমন্তু চ।
দারুণানি চ খড়্গানি গৃহীত্বা সমরোৎসুকাঃ।
যোধা ইব বিনির্যান্তু শিশবঃ সংগ্রহর্ষিতাঃ॥
সঞ্চয়ং শুষ্ককাষ্ঠানাং লোলানঞ্চকারয়েৎ।
তত্রাগ্নিং বিধিবদ্দত্বা রক্ষোঘ্নৈর্মন্ত্রবিস্তরৈঃ।
ততঃ কিলিকিলা শব্দৈস্তালাশব্দৈর্মনোহরৈঃ।
তত্রাগ্নিং ত্রিপরিক্রম্য গায়ন্তু চ হসন্তু চ॥
জল্পন্তু স্বেচ্ছয়া লোকাঃ নিঃশঙ্কা যস্য যন্মতম্।
ভগৈর্বহুবিধশব্দৈঃ কীর্তয়ন্ দেশভাষয়া।
বিস্তারয়ংশ্চ গায়ংশ্চ সহস্র নাম তস্য বৈ॥
তেন শব্দেন সা পাপা হোমেন চ নিরাকৃতা।
অট্টাট্টহাসৈর্ভিন্‌ভানাং রাক্ষসী ক্ষয়মেষ্যাতি॥

কিছুদিন পূর্বে একখানি মরাঠী বই পড়িতেছিলাম। তাহাতে বসন্তোৎসবের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা দেখিলাম। গ্রন্থখানির নাম শিবলীলামৃত—এখানি স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মোত্তর খণ্ডের মরাঠী প্রস্থান।

ইহাতে যে উপাখ্যানটি আছে, তাহা এইরূপ—তারকাসুর ও তাহার তিনটি পুত্র এক সময়ে বড়ই অত্যাচারী ও দুর্দমনীয় হইয়া উঠে। স্বর্গে দেবগণও ভয়ে ত্রস্ত। দেবতারা শিবের ধ্যান আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র তিনজনে বসিয়া তাহাদের নিধনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে সাব্যস্ত হইল যে, এমন কোন শক্তির উদ্ভব চাই যাহা দ্বারা এই অসুরদের বিনাশ হইবে। শিবপুত্রই এই কার্য করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু সমস্যা এই যে, মহাদেব ধ্যানস্থ। তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করা যার-তার কাজ নয়। অনেক চিন্তার পর স্থির হইল যে কামদেবই মহাদেবের

ধ্যানভঙ্গ করিবেন। কাম রতিসহ এই কার্য করিতে সম্মত হইলেন। বসন্ত সমাগমে তাঁহারা দেবাদিদেব যেখানে ধ্যানমগ্ন সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বৃক্ষবল্লীর নূতন কিশলয়রমূহ উদ্‌গত, শুক-শারিকা মধুর সংলাপনিরত। ললিতবিহঙ্গকুলের কল-কূজনে ও মঞ্জুল ভ্রমরের সরস গুঞ্জনে কুঞ্জবন মুখরিত। কোকিলের কুহুতানে ময়ূর-ময়ূরীর গর্জনে এবং অন্যান্য পক্ষীর উন্মাদক গানে পাছে মহাদেবের ধ্যানের ব্যাঘাত হয়, তাই তাঁহার প্রিয় অনুচর নন্দী তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে করিতে দূরে গমন করিতেছে। কামদেব কুসুম-শরনিক্ষেপের মাহেন্দ্রক্ষণ বুঝিয়া রতিদেবীকে পশ্চাতে রাখিয়া যেমন শর-সন্ধান করিবেন, অমনই শম্ভু নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখেন সম্মুখে কাম। তিনি তাহাকে তিরস্কারব্যাকুল করিতেছেন এমন সময় তাঁহার তৃতীয় নেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া মদনকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে এই ঘটনা ঘটে। শিবদূতসকল আসিয়া মহা আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল—আনন্দে মত্ত হইয়া তাহারা গালাগালি, খেউড়ের ছড়াছড়ি করিতে লাগিল। মহাদেব তখন আদেশ দিলেন, এই ঘটনার স্মৃতি-স্বরূপ প্রতি বর্ষে এই দিনে বহ্ন্যুৎসব করিয়া পবিত্রভাবে দিবসযাপন করিতে হইবে। যিনি ইহার অন্যথাচরণ করিবেন, তাঁহার অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। এদিকে রতিদেবী হৃদয়-ভেদী আর্তনাদে ইন্দ্রের হৃদয় দ্রবীভূত করিলেন। দ্বাপরে কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র-রূপে রতি তাঁহাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া ইন্দ্র আশ্বস্ত করিলেন।

হরিবংশের ভবিষ্যপর্বে এই ঘটনার অনুরূপ বিবরণ আছে।

'পৃথ্বিরাজরসৌ'[10] গ্রন্থে এই বসন্তোৎসবের বিবরণ আর এক রকমের। পৃথ্বীরাজ হোলী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। পৃথ্বীরাজের প্রশ্নের উত্তরে একদিন চন্দ্রবাঈ তাঁহাকে বলেন, চাহুআন-কুলে ঢুণ্ঢা নামে এক রাক্ষস ছিল—উহার ভগিনীর নাম ঢুণ্ঢিকা। ঢুণ্ঢা আজমীর ও দিল্লীর সীমা অতিক্রম করিয়া কাশী গমন করে ও সেখানে তপস্যা করিতে থাকে। ঢুণ্ঢিকাও তদনুসরণ করিবার মানসে বারাণসী উপস্থিত হইয়া দেখে যে, তাহার ভাই নিজের শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিতে হোমাহুতি দিয়াছে। ঢুণ্ঢিকা ভ্রাতৃবিয়োগে স্তব্ধচিত্ত হইয়া তপস্যা আরম্ভ করিল। নিরাহারে

তপ করিতে করিতে বহু বর্ষ অতীত হইলে পার্বতী প্রসন্ন হইয়া বর লইতে বলেন। আমিষাহারী রাক্ষসী ইহা শুনিয়া বলিল, দেবী, যদি বর দিবেন, তাহা হইলে এই বর দিন, যেন আমি আবাল-বৃদ্ধা-যুবা যে-কোন মানবকে খাইয়া ফেলিতে পারি। রাক্ষসীর প্রস্তাবে ধর্ম-সঙ্কট দেখিয়া পার্বতী সমস্ত বৃত্তান্ত মহাদেবের গোচর করিলেন। মহাদেব চিন্তা করিয়া বলিলেন, তুমি গিয়া রাক্ষসীকে বল, যে ব্যক্তি উন্মত্তের ন্যায় অসভ্য কার্য করিবে, রাক্ষস-স্বরূপ বিবেচনা করিয়া সে তাহাকে খাইতে পারিবে না। মহাদেবের আদেশে পবনদেব এমন ধূলি উড়াইলেন যে, সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেল, আর লোকেরা তিনদিন অসভ্য কর্ম করিতে লাগিল। ফলে, ঢ়ুণ্ঢিকা মনুষ্য ভক্ষণ করিতে পারিল না। এই সময় হইতে হোলীর ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।

রাইট[11] সাহেব তাঁহার নেপালের ইতিহাসে (৪১ পৃ.) বলেন যে, এদেশে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে প্রতি বৎসর হোলীর সময় পতকামালা-শোভিত একটি কাঠের খোঁটা জ্বালান হয়। নেপালবাসিগণের ধারণা যে, এই উপায়ে পুরাতন বৎসরের দহন-কার্য সমাহিত হইয়া থাকে। মির্জাপুরে দ্রবিড়গণের মধ্যে হোলী-প্রথা প্রচলিত নাই, কিন্তু প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ইহাদের পুরোহিতগণ একটি কাঠের খোটা-জ্বালাইয়া থাকেন। এই প্রথার নাম 'সম্বৎ-জ্বালানা' অর্থাৎ পুরাতন বৎসরের দহন। (W. Crooke[12] : *An Introduction to the Popular Religion and Folklore of Northern India,* p. 392)। কুমায়ুনবাসিগণ এই উপলক্ষে একটি গাছ কাটিয়া উহাকে নিষ্পত্র করে এবং হোলী-দেবতার তুষ্টি সাধনের নিমিত্ত উহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া পুড়াইয়া ফেলে (Frazer.[13] : *Golden Bough,* Vol IV, p. 306-7)। কর্নেল টড্ তাঁহার প্রসিদ্ধ রাজস্থানে 'হোলী' সূর্যের ক্রান্তিবিষয়ক কোন একটি উৎসব এইরূপ ধারণার পরিচয় দেন ; কিন্তু ক্রুক সাহেবের মতে উৎসবের মূলতত্ত্ব অনেকটা সূর্যের রশ্মির প্রসন্নতাসাধনের উপর নির্ভর করে (W. Crook : *Introduction,* p. 391)।

আবার ফ্রেজার সাহেব বলেন শস্যের উৎকর্ষ ও পরিপকতা বিধান কল্লেই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে (*Golden Bough,* Vol. IV. p. 306)

হোলীর আধুনিক অনুষ্ঠান-প্রণালী সম্বন্ধে বোধ হয়, আরও অনেক তত্ত্ব আছে। বস্তুত, যুগ-যুগান্তর ও দেশ-দেশান্তরের মধ্যে এই বসন্তোৎসবে যে সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহার মূলান্বেষণে আমরা দেখিতে পাই যে, কি প্রাচীন, কি মধ্য, কি বর্তমান, সকল যুগেই নানা দেশের এই বসন্তোৎসবে বসন্তের প্রতি একটা জীবন্ত শ্রদ্ধা ও প্রকৃতির নব জাগরণে সকলের ভিতর একটা স্বচ্ছন্দ অবাধ আনন্দের চিহ্ন সর্বতোভাবে বিরাজিত হয়।

[নবযুগ, ১৩৩১, ৩০ ফাল্গুন, পৃ. ৮৩২-৮৩৭]

প্রসঙ্গ-কথা

1 কোলব্রুক (Colebrooke, Henry Thomas) (1765—1837) : সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরিতে ভারতে আসেন ১৭৮৩ সালে। পূর্ণিয়া ও ত্রিহুতে অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেকটর, সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারক, পরে প্রধান বিচারক, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত ও ব্যবহারশাস্ত্রের অধ্যাপক, এসিয়াটিক সোটাইটি অফ বেঙ্গলের সভাপতি (১৮০৭—১৪), ইংলণ্ডে গমন ও সেখানে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি (১৮২৩)। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। লণ্ডন থেকে তাঁর Miscellaneous Essays, দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।—জী-কো.

2 বদাউনি : অকবরের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বদাউনি অন্যতম। তিনি হিন্দু পণ্ডিতের সাহায্যে 'রাজনামা' নামে মহাভারত রচনা করেন।

3 অবুল ফজল, শেখ (১৫৫১—১৬০২) : প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও সম্রাট অকবরের অন্যতম মন্ত্রী। আগ্রায় জন্ম। পিতা—মুবারিক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুকবি অবুল ফৈজী। অবুল ফজল নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং সুলেখক। তিনি অনেকগুলি বই লেখেন—তার মধ্যে 'অকবর-নামা' ও 'অইন-ই-অকবরী' বিশেষ প্রসিদ্ধ। রাজকুমার সেলিম (জাহাঙ্গীর) নানা কারণে অবুল ফজলের শত্রু হন এবং উচণ্ডার (আর্চার) রাজা বীরসিংহ দ্বারা তাঁকে হত্যা করান।—জী-কো.

4 অইন-ই-অকবরী : অবুল ফজল কর্তৃক লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

5 গ্লাডউইন (Gladwin, Francis) (?—1813) : বেঙ্গল আর্মীতে কাজ করেও তিনি ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন—ফার্সী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় অভিজ্ঞ হন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির

সদস্য ছিলেন। 'আইন-ই-অকবরী'র কিছু অংশ অনুবাদ করেন, History of Hindustan (1788), Persian-Hindustani-English Dictionary (1809) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ফার্সী অধ্যাপক (১৮০১), পাটনার কাস্টমসের কালেকটর (১৮০২) ই.।—*BDIB.*

6 আসফ-উদ্-দৌলা : অযোধ্যার নবাব (সিংহাসনারোহণ 1775—1797)। ইনি দাতা এবং উদারস্বভাবযুক্ত ছিলেন।

7 উইলসন : 'অথর্ববেদ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

8 গ্রাউজ (Growse, Frederic Salmon) (1837—1893): প্রাচ্যবিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্। ১৮৬০ খ্রী. সিবিলিয়ান কর্মচারীরূপে ভারতে মথুরা ও বুলন্দশহরে আসেন। তিনি এখানেই মথুরার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন এবং দুই খণ্ডে Mathura: A District Memoir (Allahabad, ১৮৮০) প্রকাশ করেন। তুলসীদাসের রামায়ণও তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন (১৮৮৩)। —*BDIB.*

9 কর্নেল টড (Tod, Lieut. Col. James) (1782—1835): ইনি ১৭৯৯ খ্রী. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরূপে বাংলায় আসেন এবং পরবর্তী কালে ব্রিটিশ সরকারের গোয়ালিয়ারের রেসিডেন্ট হন (১৮১২-১৭)। বহুকাল রাজপুতনায় থেকে রাজপুতদিগের রীতি-নীতি ও তাঁদের পূর্বপুরুষদের বীরত্বের কাহিনী সংগ্রহ করে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Annals and Antiquities of Rajasthan or the Central and Western Rajput States of India (১৮২৯-৩২) রচনা করেন। তাঁর আর একখানি বই Travels in Western India, a visit to the Sacred Mounts of the Jains and the most Celebrated Shrines of Hindu Faith between Rajputana and the Indus. etc. (Lond. 1839).—*BDIB.*

10 পৃথ্বীরাজরসৌ : হিন্দী কবি চাঁদ বর্দাই কৃত কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থে ভারতের শেষ হিন্দু রাজা চৌহানপতি পৃথ্বীরাজের (বা রায়) জীবনী

ও রাজত্বের তিনটি প্রধান ঘটনা বিবৃত আছে। চাঁদকবি পৃথ্বীরাজের সভাকবি। পঞ্জাবে ব্রাহ্মণবংশে আনুমানিক ১২শ খ্রী. জন্ম।—চরিতাভিধান

11 রাইট (Wright, Daniel) : গ্রন্থ—History of Nepal, with an introductory sketch of the country and people of Nepal (1877).

12 W. Crooke (Crooke, William) (1848—) : সিবিল সার্ভিস কর্মে ভারতে আসেন ১৮৭১ সালে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও ও অযোধ্যায় ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টররূপে কর্ম। তিনি উক্তদেশের আচার-রীতি, জনশ্রুতি, পুরাবৃত্ত, জাতি প্রভৃতির চর্চা করেন ও গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থ—Popular Religion and Folklore of Northern India (১৮৯৬), The Tribes and Castes of the N. W. P. and Oudh (১৮৯৬) ই.।—*BDIB.*

13 Frazer (Sir James George) (1858—) : খ্যাতনামা ইংরেজ নৃতত্ত্ববিদ। নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে এবং প্রাচীন গ্রাম্যকথা, পুরাণ প্রভৃতি অনেক মূল্যবান বই আছে। বিশেষ গ্রন্থ—The Golden Bough. ১২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।—*En. Brit.*

প্রাচীন পুথির বিবরণ

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে হাতের লেখা পুরানো পুথি যে একান্ত প্রয়োজন, এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। আজকাল আমরা যেমন ছাপা বই অতি সহজেই পাইতে পারি, বাংলা দেশে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে বই পাইবার তেমন সহজ উপায় ছিল না। অনেক কষ্টে কাহারও নিকট হইতে পুথি সংগ্রহ করিয়া, তাহা নকল করিয়া বা করাইয়া লইতে হইত। ইংরেজ অধিকারের পূর্বে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে এই রকম করিয়াই দেশে সাহিত্যচর্চা হইত। ক্রমশ ছাপাখানার কল্যাণে আধুনিক উপন্যাস, নাটক যত বাহির হইতে লাগিল, কষ্টলভ্য পুথির প্রতি আগ্রহ ততই কমিতে লাগিল। এইরূপে ধীরে ধীরে পুথি অপ্রচলিত হইয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে শিক্ষিত-সমাজে প্রাচীন সাহিত্যের চর্চাও একরূপ বিলুপ্ত হইল।

সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হইবার কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও শিক্ষিত বাঙালীর বিশ্বাস ছিল যে, বাংলা দেশে প্রাচীন কালে সাহিত্য-চর্চা বলিয়া কোন জিনিসই ছিল না। অশিক্ষিত লোকেরা পাঁচালী গান করিত, মুদী দোকানদারেরা কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত পড়িত—শিক্ষিতেরা ঘৃণায় সে দিকে বড় একটা দৃষ্টিপাত করিত না।

সৌভাগ্যক্রমে এখন আর সে দিন নাই। পূজ্যপাদ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,[1] শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু,[2] মুন্সী আবদুল করিম,[3] ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র

সেন,[4] শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র,[5] স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী[6] ও ব্যোমকেশ মুস্তফী[7] প্রমুখ সাহিত্যিকগণের চেষ্টায় প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আমরা সেই দ্বারে প্রবেশ করিয়া এখন দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদের এই প্রাচীন সম্পদ নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয় ;—ইহাতে আমাদের জানিবার, শুনিবার, বুঝিবার, শিখিবার অনেক আছে এবং আরও বাকী আছে—এই সম্পদ্ সংগ্রহ করিবার।

মুসলমান-বিজয়ের আগে—চৈতন্যদেবের ছয় শত বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। কিন্তু প্রমাণে সন্তুষ্ট হইলেই আমাদের চলিবে না ; তাহার নিদর্শন আরও আমাদের সংগ্রহ করিতে হইবে। এখনও কত মঠে মন্দিরে, কত পল্লীর নিভৃত কুটীরে কত রত্ন লুক্কায়িত থাকিয়া কালের করাল আক্রমণে ক্রমশ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এখনও আমরা এগুলির উদ্ধারে যত্নবান্ না হইলে ভবিষ্যতে পরিতাপ করিয়াও আর পাওয়া যাইবে না।

জাতির অতীত ইতিহাস আলোচনায় প্রাচীন সাহিত্য অন্যতম উপাদান। যে জাতি প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদে যত অধিক সম্পন্ন, সে নিজেকে ততই গৌরবান্বিত মনে করে। যে জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, প্রাচীন সাহিত্য তাহার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কেন না, প্রাচীন সাহিত্যেই সেই সময়ের সামাজিক সংস্থান, যান-বাহন, রন্ধনশালা, শয়নাগার, অশনবসন, খাদ্যদ্রব্য, ধর্মাধর্ম, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইতে পারে।

অতএব আমাদের উচিত—সর্বপ্রযত্নে পুথি সংগ্রহ করা। যদিও বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং রঙ্গপুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি পরিষদের শাখা অনেক পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্তে বীরভূম রতন লাইব্রেরী, বোলপুর শান্তিনিকেতন, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনেক পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তথাপি ইহাই পর্যাপ্ত নহে, এবং বাংলা দেশ হইতে এখনও পুথির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও এমন অনেক পুথি আছে, যাহার নাম পর্যন্ত হয়তো আমরা অবগত নই। সেই সমস্ত পুথি যদি

আবিষ্কার করিতে পারা যায়, তবে সেগুলি দ্বারা হয়তো বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের এক-একটা অধ্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

বাংলা পুথি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিবার পূর্বে পুরানো পুথিশালা ও পুথির কথা কিছু বলিব। ঠিক ইতিহাসের দিক দিয়া নয়, পুথির ইতিহাসের দিগ্‌দর্শন জন্য আলোচনা হিসাবে কয়েকটা কথা বলিব।

ভারতবর্ষে পুথি প্রাচীন কালে ছিল। কতকাল পূর্বে ছিল, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে লোকবৃত্তপ্রসঙ্গে প্রতিসন্ধ্যায় পুস্তক-বাচনের প্রথার উল্লেখ আছে। পুস্তকবাচন করিতে হইলে পুথি মুখস্থ করিয়া আওড়াইতে হইত। ঐ সময় নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সভা-সমিতি থাকিত। লোকেরা প্রতি সন্ধ্যায় আসিয়া সেখানে আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিত। আমোদের মধ্যে পুস্তকবাচন—মুখস্থ পুথি আওড়ান একটি নিত্যকর্ম ছিল।

বাবিলনে, আসিরিয়ায় ও মিসরে খ্রীস্টাব্দের ৩০০০ বৎসর পূর্বেও যে পুথিশালা ছিল, তাহার মুখ্যভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বৈদিক বা বৈদিকযুগের অব্যবহিত পরে পুথিশালা ছিল কি না, তাহার মুখ্য বা গৌণ কোনরূপই প্রমাণ আমাদের নাই। সকলের চেয়ে পুরাতন পুথিশালা মিসরেই ছিল বলিতে হয়। মিসররাজ Memphisএর[8] Osymandyas[9] এই পুথিশালা স্থাপন করেন। পুরাতন যুগে Alexandrian Libraryই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। ইহাতে ৪০০,০০০ বই ছিল। ইহার পর Pergamonএর[10] রাজাদের গ্রন্থাগারের নাম করা যাইতে পারে। ইহার গ্রন্থসংখ্যা ২০০,০০০। দুঃখের বিষয়, এই সময় ভারতের কোন গ্রন্থশালা ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভারতের শিক্ষাদীক্ষা প্রাচীন জগতের কেন্দ্রস্থান ছিল, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। এক সময়ে এসিয়ার শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্রভূমি ছিল তক্ষশিলা,[11] বারাণসী, কৃষ্ণাতীরবর্তী শ্রীধন্যকটক,[12] নালন্দা,[13] বিক্রমশিলা[14] ও ওদন্তপুরী[15]। কিন্তু প্রাচীন যুগের পুথিশালা সম্বন্ধে বলিতে হইলে বলিতে হয়—বাবিলন, আসিরিয়া ও মিসর এবং এমন কি, গ্রীক ও রোমের পরও ভারতের স্থান।

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গান্ধার মধ্যবর্তী তক্ষশিলা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার ও অন্যান্য শিক্ষার প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। ইহা বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডি (Rawalpindi) হইতে ৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে। ব্রাহ্মণ ও বড় বড় লোকের ছেলেরা শিক্ষার জন্য এখানে আসিত। তক্ষশিলার ছাত্ররাও বারাণসী ও পাটলিপুত্রে পড়িতে যাইত। বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ছাত্রেরা তক্ষশিলায় পড়িয়া, সেখান থেকে বারাণসী ও পাটলিপুত্রে যাইত। তক্ষশিলার তীক্ষ্ণধী ছাত্ররা কখন কখন বারাণসীতে গিয়া শিক্ষকতাও করিত। যখন শিক্ষকেরা ছাত্র পড়াইতেন বা কাহারও সঙ্গে কোন বিশেষ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন, তখন তাঁহাদের হাতে বেশ সুন্দরভাবে বাঁধান বই থাকিত। বর্ষ,[16] উপবর্ষ[17] ও পাণিনি[18] প্রথমে তক্ষশিলার ছাত্র ছিলেন। পরে তাঁহারা তক্ষশিলা ত্যাগ করিয়া পাটলিপুত্রে[19] গমন করেন। রাজশেখরের[20] কাব্যমীমাংসায় এ কথা লেখা আছে। এই সমস্ত বিদ্যাপীঠে নিশ্চয়ই পুথিশালা ছিল। গান্ধারের তক্ষশিলায় লেখা একখানা পুথি সম্প্রতি খোটানের[21] নিকটে গোসিঙ্ (Gosing) নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মধ্য-এসিয়ায় কুষাণযুগের গোড়ার দিকের কয়েকখানি বৌদ্ধ নাটক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি তিনটি বিদ্যাপীঠের কোন একটিতে লেখা হইয়াছিল। আরও আগেকার ভারতীয় পুথি মধ্য-এসিয়ায় বৌদ্ধমঠে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে Dr. Stein[22] মধ্য-এসিয়া হইতে অনেকগুলি অতি প্রাচীন বৌদ্ধ পুথি আবিষ্কার করিয়াছেন।

চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তীর্থযাত্রীরা বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতে আসিতেন। সর্বপ্রথম ফা-হিয়ান[23] (Fa-Hian) চীনের পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী চঙ্-অন (Ch'ang an) হইতে ৩৯৯ খ্রীস্টাব্দে যাত্রা করেন এবং ছয় বৎসর পরে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি বৌদ্ধদের ৩০টি পবিত্র স্থান দর্শন করেন। তিনি একসঙ্গে ২-৩ বৎসর পাটলিপুত্র ও তাম্রলিপ্তির[24] বিদ্যাপীঠে অবস্থান করিয়াছিলেন। এইখান হইতে তিনি সিংহলে গমন করেন। তথা হইতে চীনে ফিরিয়া যান। বৌদ্ধদের বিবিধ সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ এইসকল স্থান হইতে সংগ্রহ ও নকল

করেন। যে সমস্ত মঠে তিনি গিয়াছিলেন, সেগুলি খুব বড় ছিল—মঠগুলিতে ৬০০-৭০০ ভিক্ষু থাকিত। পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বৌদ্ধদের বিনয়পিটক লিখিয়া লন। তিনি সেখানে মহাসঙ্ঘিকবাদীদের নিয়ম, সর্বাস্তিবাদীদের ৬০০০-৭০০০ গাথা, সংযুক্তাভিধর্মহৃদয়সূত্র, পরিনির্বাণবৈপুল্লসূত্রের একটি অধ্যায় (৫০০ গাথা), মহাসঙ্ঘিক অভিধর্ম এবং ২৫০০ গাথায় সম্পূর্ণ একটি সূত্র দেখিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীনতম পুথিশালার নিদর্শন ইহার পূর্বে আর কোথাও পাওয়া যায় নাই।

ফা-হিয়ানের ২০০ বৎসর পরে চীনপরিব্রাজক য়ুয়ন্-চয়ঙ্[25] (Yuan-Chwang) ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ষোল বৎসর (৬২৯-৬৪৫) ধরিয়া মধ্য-এসিয়া ও উত্তর-ভারত ভ্রমণ করেন। সি-য়ু-চি (Hsi-yu-chi) নামক পশ্চিমদেশবিবরণ গ্রন্থে বৌদ্ধদের বিদ্যা ও আচার বিশেষ করিয়া বর্ণিত আছে। ভারতবর্ষে কান্যকুব্জরাজ হর্ষের[26] পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ভারতের বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গলাভ করেন। মহাযান-বিদ্যাকেন্দ্র নালন্দায় তিনি শীলভদ্রের[27] নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন; এইখানে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি একটি প্রাচীন সঙ্ঘারাম[28] দর্শন করেন। এখানে অনেক মঠ ও মন্দির ছিল। ১৮ সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা সেখানে থাকিত। হিরণ্যপর্বতে গঙ্গাতীরে তিনি একটি নগর দর্শন করেন। এখানে ১০টি সঙ্ঘারাম ও ৪০০০ হীনযান সম্মিতীয়বাদী দর্শন করেন। তাম্রলিপ্তিতে ১০টি মঠে ১০০ জন ভিক্ষু দেখেন। এইরূপে নালন্দা প্রভৃতি বহু স্থানে মঠাদি অবলোকন করেন। য়ুয়ন্-চয়ঙ্ চীনদেশে শাস্ত্রের বড় বড় বাণ্ডিল পুথি লইয়া যান। ভারতে কত বড় বড় পুথিশালা ছিল, তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থের তালিকা হইতে বেশ বোঝা যায়। তিনি মহাযানসূত্রের ২২৪ খানি, মহাযান-শাস্ত্র ১৯২ খানি, স্থবিরবাদীদের গ্রন্থের ১৪ খানি, মহাসঙ্ঘিকবাদীদের ১৫, সম্মিতীয়বাদীদের ১৫, মহীশাসকবাদীদের ২২, কাশ্যকীয় গ্রন্থ ১৭, ধর্মগুপ্তীয় গ্রন্থ ৪২, সর্বাস্তিবাদীদের ৬৭, হেতুবিদ্যা ৩৬, শব্দবিদ্যা ১৩ খানি অর্থাৎ ৬৫৭ খানি গ্রন্থের ৫২০টি বাণ্ডিল পুথি চীনদেশে লইয়া যান।

তাকাকুসু[29] (Takakusu) প্রদত্ত তালিকা হইতে এই সংবাদ পাওয়া যায়।

৭ম শতকের শেষে চৈনিক পরিব্রাজক ই-সিঙ্[30] (I-tsing) নালন্দা বিদ্যাপীঠে ১০ বৎসর (৬৭৫-৬৮৫) বিনয়গ্রন্থ পাঠে অতিবাহিত করেন। তিনি বলেন, একমাত্র মঠেই ৩০০০ ভিক্ষু থাকিত। নালন্দাতে ৮টি হল ছিল, তাতে ৩০০টি ঘর ছিল। এখানে কখন কেমন করিয়া অধ্যয়নাদি হইত, তাহার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে।

এখন দেখা গেল যে, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম শতকে বৌদ্ধ মঠগুলিতে নানা রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। আবার আর এক দিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয়ের সময় ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের যথেষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। গুপ্তদের হিন্দুবংশের রাজত্বকাল ৩২০ খ্রীস্টাব্দ। সমগ্র উত্তর ভারতে ইঁহাদের আধিপত্য ছিল। ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে হূনদের[31] আক্রমণে এই রাজত্বের ধ্বংস হইয়াছিল বটে, কিন্তু হিন্দুসম্রাট হর্ষ গুপ্ত-রাজত্ব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গুপ্তদের রাজ্যকালে দেশের চারিদিকে হিন্দুমন্দির নির্মিত হইয়াছিল। হেমাদ্রি[32] প্রভৃতি স্মৃতিকাররা হুকুম জাহির করিলেন যে, মন্দিরে পুস্তকদানে মহাপুণ্য। অমনি দলে দলে লোকে পুথি দিয়া মন্দির পূর্ণ করিতে লাগিলেন। মন্দিরগুলি এইরূপে এক-একটি পুথিশালা হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে পুথিদানের নজিরও বিরল নয়। ৫৬৮ সালের বলভী-লিপিতে এইরূপ দানের উল্লেখ আছে। গুপ্তযুগে মন্দিরগুলি গ্রন্থ-ভাণ্ডার হইয়া উঠিল। ৬৫০ খ্রী. হইতে ১০০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষের সর্বত্র পুথি-সংগ্রহ একটা নেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর এই সময় ভারত বহু রাজ্যে বিভক্তও হইয়াছিল।

পুরাতন পুথিশালা প্রথমে দুই রকমের ছিল—কতকগুলি মঠের সংলগ্ন, কতকগুলি মন্দিরের সংলগ্ন। তার পর যখন রাজাদের অনুগ্রহে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য খুব বাড়িয়া উঠিল, তখন সম্ভ্রান্ত লোকেরাও নিজেদের বাড়ীতে ভাল ভাল পুথির সংগ্রহ রাখিতে লাগিলেন। নালন্দাবিদ্যাপীঠে অনেক-গুলি সুবৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ পুথিশালা ছিল। ৪র্থ শতকে নালন্দা একটি ছোট গ্রাম মাত্র। কিন্তু এই সময়ে সিংহলরাজ মঘবর্মা সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকালে

(৩৩০-৩৭৫) আম্রবনে প্রকাণ্ড বিহার নির্মাণ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ৭ম শতকে য়ুয়ন্-চয়ঙ্ যখন ভারতে আসেন, তখন ইহার খুব নাম। চন্দ্রপাল[33], গুণমতি,[34], স্থিরমতি[35], প্রভামিত্র[36], জিনমিত্র[37], পদ্মসংস্থ[38] ও বীরদেব[39] এই নালন্দায় অধ্যয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। দিঙ্নাগ[40] নালন্দায় অনেক কাল কাটাইয়াছিলেন। এখানে 'রত্নোদধি'তে পুথি সংরক্ষিত থাকিত। রত্নোদধি হীনযান ও মহাযানদের ৯ তলা মন্দির। ১৯১৫-১৬ সালের Arch. Report-এ উল্লেখ আছে যে, খুঁড়িয়া দেখা গিয়াছে যে, ঘরগুলি ১২ ফুট × ১৮ ফুট। এই বিরাট পুথিশালাটি কেমন করিয়া নষ্ট হইয়া গেল, তাহা জানা যায় না। তিব্বতে একটি প্রবাদ আছে যে, তৈর্থিক ভিক্ষুরা রত্নোদধি পুড়াইয়া ফেলে। যাহা হউক, ৯ম শতকে নালন্দা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কিন্তু এটা ঠিক যে, তখন ইহা বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র ছিল না। এই সময় পাল-রাজাদের চেষ্টায় দুইটি বিরাট বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয়—একটি বিহারে ওদন্তপুরীতে, আর একটি গঙ্গার উত্তর-তীরে বিক্রমশিলায়। ওদন্তপুরী-রাজ গোপাল[41] বিহার নির্মাণ করিয়া দেন; পালবংশের ২য় রাজা ধর্মপাল[42] (৮০০ খ্রী.) বিক্রমশিলার বিদ্যাপীঠ ও গ্রন্থভাণ্ডার নির্মাণ করিয়া দেন। ইহা তান্ত্রিক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। ন্যায় ও ব্যাকরণও এখানে পড়া হইত। বিক্রমশিলায় সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতী-ভাষায় তর্জমা করা হয়। তিব্বতী পণ্ডিতরাও এখানে অধ্যয়ন করিতেন। তিব্বতের সাহিত্য এক বিরাট ব্যাপার। নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলার পুথিশালা হইতেই তিব্বতীয় বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি। ওদন্তপুরীর পুথিশালা বিহারের মন্দিরেই অবস্থিত এবং নালন্দার পুথিশালার চেয়ে বড়। এই চমৎকার পুথিশালাটি ১২০২ সালে বখতিয়ার খলজীর এক সেনাপতি পুড়াইয়া দেন। তখন বিভিন্ন বিহারের অধিকাংশ ভিক্ষু নেপালে ও তিব্বতে পলাইয়া যায়।

প্রাচীন কালের পুথি বা পুথিশালা সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানা যায় না। ১০ম ও ১১শ শতকে চীনে একটি খুব বড় বৌদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। এখানে ভারতীয় ভিক্ষুরা গিয়া চীনাভাষায় ভারতীয় বৌদ্ধগ্রন্থ তর্জমা করিত। উদ্যবাসী ধনপাল এইরূপ একজন ভিক্ষু। তিনি ৯৮০ সালে

চীনে যান। ধর্মদেব নামক আর একজন ভারতবাসী তাঁহাকে সাহায্য করেন। ৯৯৫ সালে কলসন্তি, ৯৯৭ সালে রাহুল, ১০০৪ সালে শ্রমণ শীলভদ্র, ১০১৬ সালে বরেন্দ্র চীন-রাজসভায় গিয়া গ্রন্থানুবাদ করেন।

পুথিশালার ইতিহাসে জৈনদেরও কীর্তি বড় কম নয়। রাজপুতানা, গুজরাট, পাটন, জসল্মীর, সুরাট্, কাম্বে, থরড, ভট্নের ও অমেদাবাদের উপাশ্রয়ে উৎকৃষ্ট পুথিশালা তাঁহাদের ছিল। এই সমস্ত পুথির সংগ্রহ মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এখনও বর্তমান আছে। উপাশ্রয়গুলি বিহারের মত। ইঁহারা পুথিশালাকে ভারতীভাণ্ডার বা শুধু ভাণ্ডার বলেন। কোন কোন ভাণ্ডারে ১০,০০০-এর বেশী পুথি আছে। গায়কোয়াড়ের রাজ্যের অন্তর্বর্তী পাটনের ভাণ্ডার ১০-১২ শতকে খুব বিখ্যাত ছিল। উপাশ্রয়ে যতিরা বাস করেন। উপাশ্রয় যত পুরাতন, তাহার পুথিশালা তত মূল্যবান্ ও উপাদেয়। পাটনে ১২র বেশী উপাশ্রয় আছে। এটি চালুক্যদের[43] সময়ে নির্মিত। ইহার পুথির সংখ্যাও খুব বেশী। পাটন-ভাণ্ডার অন্যান্য ভাণ্ডার অপেক্ষা বড়। কর্নেল টড[44] (Col. Tod) হেমাচার্যের[45] ভাণ্ডার আবিষ্কার করেন। লোকে ইহাকে পাটন-ভাণ্ডার বলে। এই সমস্ত ভাণ্ডার নগরশেঠ ও পঞ্চের কর্তৃত্বে রক্ষিত। এগুলির বর্তমান অবস্থা দেখিয়া অতীতের গৌরবময় অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে।

থরডের ভাণ্ডারগুলিতে জৈনসম্প্রদায়ের ইতিহাসগ্রন্থ ও বহু শাস্ত্রগ্রন্থ আছে। জসল্মীরে পরেশনাথ মন্দিরের অধীনে পাটনে একটি সুন্দর ভাণ্ডার আছে। ধারার ভোজরাজের প্রাসাদে ১১শ শতকে একটি বৃহৎ পুথিশালা ছিল। সাহিত্যে ইহা অপেক্ষা প্রাচীন পুথিশালার কথা উল্লিখিত নাই। সিদ্ধারিয়[46] মালববিজয়ের পর পুথিশালাটি অনিলবাড়ে[47] লইয়া যান এবং চালুক্য-রাজকীয় পুথিশালার সঙ্গে মিশাইয়া দেন। এই পুথিশালাটি খুব প্রসিদ্ধ। চালুক্যরাজ বিশালদেবেরও (১২১২-১২৬২) ভারতী-ভাণ্ডার নামে একটি সুন্দর পুথিশালা ছিল।

আজও ভারতের নানা স্থানে রাজকীয় পুথিশালা আছে। রাজস্থান, আলোয়ার, জয়পুর, যোধপুর, বিকানের, জম্মু, মহীশূর, তাঞ্জোর, নেপাল

প্রভৃতি গ্রন্থাগারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। যোধপুর দরবার লাইব্রেরীতে ১৮০০ সংস্কৃত পুথি আছে, ছাপা বই, হিন্দী ও মারবাড়ী পুথিও যথেষ্ট। দুষ্প্রাপ্য পুরাণ, তন্ত্র ও মাহাত্ম্য-গ্রন্থের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। জসল্মীর গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য পুথি, কাব্য, হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা বড় কম নয়। দুষ্প্রাপ্য জৈনগ্রন্থও আছে। তালপাতায় লেখা ১২, ১৩ ও ১৪শ শতকের দুষ্প্রাপ্য হিন্দুশাস্ত্রের পুথি ৫০খানির উপর আছে। বিকানের লাইব্রেরীতে ১৪০০ পুথি আছে। ভট্নেরে সংস্থিত গ্রন্থাগারে প্রায় ৮০০ পুথি আছে। কাশ্মীরের রাজারা পুরানো পুথির বড়ই তারিফ করিতেন; অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া পুথিও সংগ্রহ করিতেন। নেপালের দরবার লাইব্রেরী এই সমস্ত লাইব্রেরীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন—ইহাতে প্রায় ৫০০ তালপাতার পুথি আছে। তাঞ্জোর লাইব্রেরী ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত—এটি সর্বাপেক্ষা বড়। অনেক দামী পুথি আছে।

মুসলমানরাও তাঁহাদের পুথিশালা নির্মাণ করিতেন। সুলতান জলালুদ্দীন খল্জী[48] রাজকীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীনের[49] রাজত্বকালে নিজামুদ্দীন অউলিয়ার একটি পুথিশালা ছিল। ১৫শ শতকে বহমনি রাজ্যের মন্ত্রীর একটি পুথিশালা ছিল। এটি বিদর শিক্ষা-কেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত ছিল। ৩০০০ পুথিও ইহাতে ছিল। বহমনি রাজাদের অহমদনগরে আর একটি পুথিশালা ছিল। কবি ফেরিস্তা[50] ইহার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আদিল শাহনী রাজাদের বিজাপুরে পুথিশালা ছিল। বাবরের[51] রাজত্বকালে অফগান গাজি খাঁর[52] একটি পুস্তকাগার ছিল। হুমায়ুন[53] ও কামরান[54] যখন কারারুদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহাদের এই গ্রন্থাগার থেকে বই পাঠান হইত। হুমায়ুন দ্বিতীয়বার বাদশাহ হইবার পর তাঁহার প্রমোদভবন শেরমণ্ডলকে পুথিশালায় পরিণত করিয়াছিলেন। অকবরের[55] একটি বড় পুথিশালা ছিল। ইহাতে পুথিগুলি বিষয় অনুসারে সাজান থাকিত।

বঙ্গদেশের কোন কোন মঠে মূল্যবান প্রাচীন পুথি সংরক্ষিত আছে। রাজসাহী, মৈমনসিংহ, পাবনা, তীরহুত ও ওড়িষার বহু মঠে এইরূপ সংগ্রহ আছে।

আজ বাংলা দেশে গ্রন্থাগারের ছড়াছড়ি। এগুলি ইউরোপের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইলেও এক দিনে গড়িয়া ওঠে নাই। এখন কলিকাতায় পাড়ায়-পাড়ায় গ্রন্থাগার। ৫০ বৎসর পূর্বে তাহা ছিল না। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের[56] গ্রন্থাগার, স্যর রাধাকান্ত দেব[57], বাবু রামকমল সেন[58], রাজা পীতাম্বর মিত্র[59], সুবলদাস মল্লিক[60] প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট লোকেরই গ্রন্থাগার ছিল। মফঃস্বলে, ঢাকা, নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও ২৪ পরগনার কোথাও কোথাও পুথির সংগ্রহ খুব ছিল। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও মেদিনীপুরেও পুথি পাওয়া যাইত। ঢাকায় পণ্ডিতদের নিকটই পুথির সংগ্রহ থাকিত। নদীয়ায় কৃষ্ণনগরের রাজার তন্ত্রের পুথি সকলের চেয়ে বেশী ছিল। বর্ধমানে টোল বড় একটা ছিল না, তবে মানকরের হিতলাল মিশ্রের[61] বেদান্তসংগ্রহ ও অন্যান্য পুথি মন্দ ছিল না। হুগলীতে শ্রীরামপুর কলেজে অল্প হইলেও দামী পুথি ছিল, সেগুলি Dr. Careyর[62] সংগ্রহ; কয়েকটি টোলেও কিছু কিছু সংস্কৃত পুথি ছিল। ২৪ পরগনার কয়েকজন জমিদারের তন্ত্র ও পুরাণসংগ্রহ ছিল। হরিনাভি ও ভাটপাড়ায় পুথির সংগ্রহও বড় মন্দ ছিল না।

প্রাচীন পুথি ও পুথিশালা সম্বন্ধে দিগ্‌দর্শন হিসাবে এই কয়টি কথা বলিলাম। প্রাচীন পুথির আলোচনার সঙ্গে অনেক কথাই আসিয়া পড়ে। পুথি কিসে লেখা হইত, কি দিয়া লেখা হইত, কি কালি দিয়া লেখা হইত ইত্যাদি। যত পুথি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, অধিকাংশ পুথিই দেশী কাগজে লেখা, কাগজে লিখিবার পর শাঁক বা ঝিনুক দিয়া ঘসিয়া মাজা। কতকগুলি পুথি সাদা কাশ্মীরী কাগজে লেখা। তালপাতা ও তেরেটপাতায় লেখা পুথিও কিছু কিছু পাওয়া যায়। দেশী কাগজগুলা এবড়ো-থেবড়ো—অমসৃণ। অনায়াসে জলদ লিখিবার সুবিধার জন্য কাগজে কিছু মাখাইয়া সমান করিয়া লওয়া হয়। তেঁতুলবীচির কাই পুরু করিয়া লাগাইলে কাগজ বেশ চক্‌চকে হয়। সাধারণত কাগজে চালের মাড় লাগাইয়া এই কার্য করা হয়। তবে তাহাতে এক ভয় আছে; সহজে ঠাণ্ডা ও পোকা লাগিয়া যায়। এই সমস্ত কাগজে খুব পোকা ধরে। শঙ্খবিষ (white arsenic) মাখাইলে

কিন্তু শীঘ্র পোকা লাগিবার ভয় থাকে না। ৬০-৭০ বছর আগে বিলাতী কাগজের চাক্‌চিক্যে ভুলিয়াও তাহাতে পুথি লেখা হইয়াছে। John letter paper-এও পুথি লেখা হইয়াছে। বাজারে একরকম হল্‌দে তুলট কাগজ পাওয়া যায়, এগুলিও তেঁতুল দিয়া রঙ করা বটে, কিন্তু ইহাতে পোকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই।

কাগজে লেখা পুথি আমাদের দেশের আবহাওয়ার গুণে পাঁচ-ছয় শত বৎসরের বেশী টেঁকে না। সাহিত্য-পরিষদে ৬০০ বছরের পুরানো পুথি আছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র[63] কাশীধামে বাবু হরিশ্চন্দ্রের কাছে ১৩৬৭ সংবতের (১৩১০ ঈশাব্দের) লেখা ভাগবতের পুথি দেখিয়াছিলেন। এর চেয়ে পুরানো পুথি তিনি কোথাও দেখেন নাই। আর কাগজে লেখা পুথি ভারতে আজ পর্যন্ত যত পাওয়া গিয়াছে, ১৩১০ ঈশাব্দের পুথিই প্রাচীনতম।[১]

পুথি লিখিবার পদ্ধতির একটা প্রাচীন সন্ধান ধারার রাজা ভোজের[64] আমলে লেখা 'প্রশস্তিপ্রকাশিকা'য় পাওয়া যায়। চিঠি লিখিবার প্রণালী বর্ণনাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কাগজ কেমন করিয়া মুড়িতে হয়, বাম দিকে কতখানি জায়গা ফাঁক রাখিতে হয়, বাম দিকের নীচের কোণে কতখানি কাটিতে হয়, সামনেটা সোনার পাত দিয়া কেমন করিয়া সাজাইতে হয়, পত্রের পিছন দিকে কেমন করিয়া অনেকগুলি শ্রী লিখিতে হয়—এই রকম কথা ইহাতে আছে। ব্যাসসংহিতা অন্তত দুই হাজার বছরের পুরানো শাস্ত্র। ইহাতে লেখা আছে, দলিলের প্রথম খসড়া একটি কাঠের ফলকের উপরে লেখা হইবে, সুবিধা না হইলে মাটির উপর লেখা হইবে, তারপর ভুলভ্রান্তি শুধরাইয়া লিখিতব্য যাহা, তাহা পত্রস্থ করা হয়। কাত্যায়ন-স্মৃতিতে ইহার অনুবাদ আছে। কাত্যায়ন বলিতেছেন,—

"পূর্বপক্ষং স্বভাবোক্তং প্রাড়্‌বিবাকোঽভিলেখয়েৎ।
পাণ্ডুলেখেন ফলকে ততঃ পত্রং বিশোধয়েৎ ॥"

এখানে পত্র মানে পাতা নয়। গাছের পাতা ২।৫ খানা নষ্ট হইলে কিছু আসিয়া যায় না। কাগজ দামী বলিয়া প্রথমে মাটিতে লিখিয়া ঠিক করিয়া, কাগজে শেষে লেখা হইত। ঈশাব্দ ১১শ শতকের পূর্বে ভারতে

কাগজ ব্যবহারের নজির পাওয়া যায় না। ব্যাসসংহিতা প্রভৃতির বচন প্রক্ষিপ্ত না হইলে কাগজের অস্তিত্ব বহু পূর্বেই স্বীকার করিতে হয়। চীনেরা অতি প্রাচীন কাল থেকে কাগজ তৈরী করিত। খ্রীস্টীয় ৪র্থ শতকে তিব্বতে কাগজে বই ছাপা হইত। তিব্বতী ও কাশ্মীরীরা চীন থেকে কাগজ লইত। হিন্দুদের তিব্বতী বা কাশ্মীরীদের কাছ থেকে কাগজ লওয়া অসম্ভবও নয়। ভূর্জপত্রে অতি প্রাচীন কালে লেখা হইত। কিন্তু তাহাতে পুথি লেখা হইত না; ভূর্জপত্র সহজে নষ্ট হইয়া যায়—ইহাতে কবচাদি লিখিয়া ধারণ করা হইত।

তালপাতার চেয়ে তেরেট বেশী টেঁকসই। তালপাতে পুথি লিখিতে হইলে সেগুলি প্রথমে শুকাইয়া লওয়া হয়, তারপর সিদ্ধ করা হয় অথবা কিছুকাল জলে ভিজাইয়া রাখা হয়। পরে আবার শুকাইয়া লইয়া পুথির আকারে ভাল করিয়া কাটিয়া লওয়া হয়। অতঃপর তেলা পাথর বা শাঁক দিয়া মাজিয়া লইয়া পুথির কার্যে ব্যবহার করা হয়।

বাংলা ভাষায় যত পুথি পাওয়া গিয়াছে, সবই কবিতাছন্দে লেখা। বাংলা পুথি সবই সুর করিয়া পড়া যাইত। অনেকগুলি যে গাওয়া হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রচয়িতার নিজের লেখা পুথি কোথাও আছে কি না, জানি না। যদি থাকে, তাহা একান্তই দুর্লভ; আর সেরূপ পুথি প্রাচীনও নয়। রচয়িতা যত প্রাচীন হইবেন, তাঁহার নিজের লেখা পুথি ততই দুর্লভ হইবে। আমরা যে সমস্ত পুথি পাইয়াছি, সেগুলি রচয়িতার লিখিত পুথির প্রতিলিপি তো নয়ই সেগুলি অনুলিপি, অধিকাংশ স্থলে অনুলিপির অনুলিপি, অনেক সময় তাহার অনুলিপি। আর যাঁহারা এই সমস্ত পুথি নকল করিয়াছেন, তাঁহারা অনেক সময় বিচক্ষণ তো ননই—সাবধানও নন। কখনও কখনও পুথির সমাপ্তিতে colophon-এ দেখিতে পাওয়া যায়—"যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং লেখকে দোষো নাস্তি।" এরূপ লেখক বা নকলকারী শব্দাদি বুঝিতে না পারিলে ভুলিয়াও বুদ্ধি খরচ করিতে নারাজ। ইঁহাদেরই হাতে পড়িয়া প্রভু 'ভুসি সে কাবল প্রভু ভুসি সে কাবল' হইয়া দাঁড়ান। ইঁহাদের হাতে শ্রীচৈতন্যও পার পান নাই। ইঁহারা তাঁহাকেও বলাইয়াছেন,—"প্রভু কহে ডোমের অন্ন যেই জন খায়।···কৃষ্ণভক্তি হয়॥"

অনেক সময় গায়নরা অপরের লিখিত গান লিখিয়া বা লিখাইয়া লইয়া থাকেন। যখন তাঁহারা নিজে লেখেন, তখন তাঁহাদের রস, ভাব ও ছন্দের দিকেই ঝোঁক থাকে, বানানের দিকে নজর থাকে না। আবার এক জেলার গায়ন যখন অপর জেলার রচকের গান নকল করেন, তখন তিনি নিজের বাক্‌ছন্দের অনুযায়ী করিয়া নকল করিয়া থাকেন। ইহাতে মূল গানের সহিত নকলের তফাৎ হইয়া পড়ে। কখনও কখন একজন গায়ন অপর একজনের কাছে গান শিখিতেন, গান লিখিয়া লইতেন, পরে নিজে গায়ন হইতেন। ইঁহারা নিজেও গীত রচনা করিতে পারিতেন। আবশ্যক-মত অন্যের গানের মধ্যে নিজেদের রচিত গানও বসাইয়া দিতেন। কেহ বা এরূপ করিয়া গুরুর নামে নিজেকেও তরাইতেন। এইরূপ নানা কারণে প্রাচীন পুথি বহু স্থানে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই প্রাচীন পুথি সম্পাদন করিতে হইলে বিশেষ সতর্ক হইয়া পরিশ্রম করিতে হয়। একখানি পুথি পাইলে প্রথমেই প্রাপ্তিস্থান স্থির করিয়া, দেশ-কাল-বিষয় নির্ণয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। পুথিকে সাধারণত চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—

(১) রচকের নিজের লেখা পুথি।

(২) লিপিকরের লেখা পুথি।

(৩) লিপিকরের লেখা পুথি; কিন্তু পুথির নামে, বিষয়ে, ভণিতায় অনুরূপ দুই, তিন বা অধিক পুথি পাওয়া গিয়াছে।

(৪) অজ্ঞাত লেখকের পুথি।[২]

প্রাচীন পুথির বানান

এই চারি শ্রেণীর পুথির আলোচনার পূর্বে আমরা প্রাচীন পুথির কিরূপ বানান হওয়া উচিত, তাহা স্থির করিবার চেষ্টা করিব।

প্রাচীন পুথির বানান সম্বন্ধে দুই রকমের মত প্রচলিত। কেহ উহাকে লিপিকরগণের অজ্ঞতার ফল বলিয়া উল্লেখ করেন; আবার কেহ বা উহাতে সেই সেই সময়ের শিক্ষা ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া, ঐ বানানকে অজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে একেবারেই অনিচ্ছুক। পুথি মুদ্রণের

সময় ঐরূপ বানান আমূল সংশোধন করিয়া দেওয়া কর্তব্য, ইহাই প্রথম পক্ষের মত; দ্বিতীয় পক্ষ সংশোধনের একান্ত বিরোধী। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লিপিকরগণ কর্তৃক লিখিত অসংখ্য পুথির বানান সম্বন্ধে এইরূপ কোনও একটি সাধারণ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা কতদূর সমীচীন, তাহা বিবেচনার বিষয়। বাংলা পুথির মধ্যে যেমন সুপ্রাচীন, প্রাচীন ও অর্বাচীন, এই তিনটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়, সেই রকম লিপিকরগণের মধ্যেও তিনটি শ্রেণী সুস্পষ্ট —শিক্ষিত, কিঞ্চিৎ শিক্ষিত ও মূর্খ। বলাবাহুল্য, শিক্ষিত শ্রেণীর লিপিকরের বানানও আজকালকার বানানের ন্যায় একেবারে বিশুদ্ধ নহে। তবে তাহার মধ্যে বানানের একটা সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতা আছে, অক্ষরের স্পষ্টতা বা সুস্পষ্টতা আছে। কিঞ্চিৎ শিক্ষিতের বানানে সামঞ্জস্য সর্বত্র না থাকিলেও একেবারে যে নাই, তাহা নহে; কোথাও আছে, কোথাও নাই; অক্ষর সুখপাঠ্য না হইলেও অপাঠ্য নহে। কিন্তু মূর্খ লিপিকরের অক্ষর অপাঠ্য এবং বানান বিভীষিকা উৎপাদন করে। ইহা যাঁহারা পুথি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। পূর্বকথিত ত্রিবিধ কালে লিখিত এবং ত্রিবিধ বানানযুক্ত সকল পুথির বানান সম্বন্ধেই যদি আমূল শোধন অথবা যথাযথ রক্ষণ, ইহার যে কোন একটিমাত্র প্রণালী অবলম্বন করা যায়, তবে তাহা কখনই সঙ্গত হইবে না। কারণ, প্রাচীন বাংলার বানানে কোনও নিয়ম বা শৃঙ্খলা ছিল না, ইহা যেমন ঠিক নহে, তেমনই ইহার বানান সংস্কৃতানুসারী ছিল, ইহাও সত্য নহে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, একই লিপিকর বাংলা ও সংস্কৃত দুইখানি পুথি লিখিয়াছেন; সংস্কৃত পুথিতে একটিও বর্ণাশুদ্ধি নাই; অথচ বাংলা পুথির বানান সংস্কৃতানুসারী নহে।

বাংলা ভাষা সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে, কি প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে, তাহার বিচারের স্থল এখানে নহে। কিন্তু যে কয়খানি সুপ্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রাকৃতের প্রভাব সমধিক বিদ্যমান। এমন কি, বৌদ্ধ গান ও দোহার যে যে অংশ বাংলা বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে, তাহাকে একরূপ প্রাকৃত বলিলেও চলে। অন্য দিকে আবার কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত বাংলা ভাষা প্রাকৃত-ভাষা বা পরাকৃত ভাষা নামে অভিহিত হইত। হিন্দী প্রভৃতি অপরাপর প্রাদেশিক ভাষার প্রাচীন গ্রন্থও সংস্কৃত অপেক্ষা

প্রাকৃতেরই সমধিক নিকটবর্তী। এই সকল কারণে সমস্ত পুথিরই বানান আমূল সংশোধন করা যেমন কর্তব্য নহে, তেমনি মূর্খ লিপিকরের লিখিত অর্বাচীন পুথির বানানও যথাযথ প্রকাশ করা সঙ্গত নহে।

পুথির বানান কিরূপ রাখিতে হইবে, সে বিষয়ে পুথির দেশ, কাল ও লেখকের বিচার আবশ্যক। বলাবাহুল্য, সুপ্রাচীন পুথির বানান (যেমন বৌদ্ধগান ও দোহা এবং কৃষ্ণকীর্তন) যথাযথ রাখিয়া মুদ্রণ করা উচিত— তাহাতে কোনও রূপ সংশোধন বাঞ্ছনীয় নহে। প্রাচীন পুথির (১৫০ বৎসরের ঊর্দ্ধ এবং ৪০০ বৎসরের নিম্ন) বানান, লিপিকরের বিচার করিয়া লিপিকর মূর্খ হইলে সম্পূর্ণ শোধন, কিঞ্চিৎ শিক্ষিত হইলে সংস্কৃত-প্রধান অংশের শোধন এবং শিক্ষিত হইলে যথাযথ মুদ্রণ করা কর্তব্য। অর্বাচীন পুথির বানান সংশোধন করিয়া মুদ্রণে কোনও আপত্তি নাই।

আমরা পূর্বে চারি শ্রেণীর পুথির[৩] কথা বলিলাম। তন্মধ্যে যে কোন পুথি সম্পাদন করিবার পূর্বে সম্পাদকের কর্তব্য হইবে, বারবার পুথিখানি পাঠ করা। পুনঃপুন পুথি পাঠ করিতে করিতে রচয়িতার রচনার সুর ধরিতে পারা যাইবে। সম্পাদককে রচয়িতার সময়ের ও দেশের ভাষা জানিতে হইবে। যে বিষয়ের পুথি, সেই বিষয়ে সম্পাদকের বিশিষ্ট জ্ঞান থাকা উচিত। শুধু তাহাই নয়, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে তাঁহাকে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইতে হইবে। পুথির ঐতিহাসিক প্রমাণ কিরূপে পরীক্ষা করিতে হয়, তদ্বিষয়ে তিনি সুচতুর হইবেন।

একই শব্দের অনেক রকম বানান দেখিলে পুথির লেখককে আহাম্মক মনে করিতে হইবে না। তবে সর্বনাম ও ক্রিয়ার বিভক্তি ভিন্ন ভিন্ন দেখিলে পুথিখানিকে অকেজো বুঝিতে হইবে। কেন না, লেখক যে দেশেরই হউন না কেন, তিনি কখন রকম রকম বিভক্তি লিখিতে পারেন না। বিভক্তির পার্থক্য দেখিলে বুঝিতে হইবে, রচক ও লিপিকর এক দেশবাসী নন। তাহা যদি না হয়, লিপিকর অসাবধান। যদি একই পুথিতে একই শব্দের বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে লিপিকর যে মূর্খ, তাহা ধরিয়া লইতে পারা যায়।

রচকের লেখার অনুলিপি যদি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় পাওয়া যায়, তাহা

হইলে দেখা যায়, অনেক সময় কবির কবিত্ব বজায় থাকে বটে, কিন্তু ভাষা কতক বদলাইয়া যায়, কতক ঠিকই থাকে। ভাষার মিশ্রণও হইয়া যায়।

এ পর্যন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ৫ খানি বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ডে দুই সংখ্যায় মুন্‌শী আব্‌দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়ের সংগৃহীত ৬০০ পুঁথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপর ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় তাঁহার 'রতন-লাইব্রেরী'তে সংগৃহীত পুঁথিগুলির মধ্যে ২০১ খানি পুঁথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। অতঃপর পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশ মত পরিষদের পুঁথিশালার ভারপ্রাপ্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এবং তিনি পরিষদের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার স্থলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় পরিষদের পুঁথিশালার সংগৃহীত পুঁথিগুলির বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইঁহাদের উভয়ের লিখিত পুঁথিগুলির বিবরণ এইভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, ৩য় খণ্ড ১ম সংখ্যায় ১০০ ও দ্বিতীয় সংখ্যায় ১০০, মোট ২০০ পুঁথির বিবরণ। উক্ত পাঁচ সংখ্যা পুঁথির বিবরণে ১০০১ খানি পুঁথির বিবরণ প্রকাশিত হইল। মুন্‌শী আবদুল করিম সাহেবের নিকট এখন কতগুলি পুঁথি রহিয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের নিকটও দুই সহস্রের উপর পুঁথি রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রে এ যাবৎ বহু পুঁথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে নানা শ্রেণীর বহু পুঁথি রহিয়াছে—

১। এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল।

২। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

৩। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ।

৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫। সংস্কৃত কলেজ।

৬। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি।

৭। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮। ঢাকা মিউজিয়াম।

৯। মুন্‌শী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ।

১০। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র।

১১। শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট।[65]

এতদ্‌ব্যতীত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিভিন্ন শাখায়, মহামহোপাধ্যায় ড. শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ[66] প্রভৃতি অনেকেরই নিকট প্রাচীন পুথি রহিয়াছে। এই সকল পুথিসংগ্রহ হইতে বাংলা পুথি বাছিয়া পণ্ডিত ঔফ্রেক্ট (Aufrecht) সাহেবের সংস্কৃত পুথির তালিকা Catalogus Catalogorumএর ন্যায় একখানি বাংলা প্রাচীন সাহিত্য-কোষ প্রকাশ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্যভার গ্রহণ করিলে শোভনীয় হয়। কয়েকটি অনুরাগী সদস্য ও হিতৈষী এই কার্য করিবার সঙ্কল্প বহু পূর্বেই করিয়াছিলেন, কিন্তু নানারূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়ায় সে বিষয়ে কোন কার্য হয় নাই। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যালোচনার জন্য পথ সুপরিষ্কৃত হইবে—শিক্ষার্থীদের প্রভূত উপকার হইবে।

একটি দুঃখের কথা না জানাইয়া বক্তব্য শেষ করিতে পারিতেছি না। আজকাল কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালীর মাতৃভাষায় সাহিত্যের পরীক্ষা ও পঠন-পাঠনের সুব্যবস্থা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বাংলা প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধান ও আলোচনা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু এই শ্রেণীর ছাত্রসম্প্রদায়ের এই বিষয়ে যে বিশেষ আগ্রহ আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। আমাদের বোধ হয়, বাংলা দেশে সর্বসমেত ২৫ জন ছাত্র প্রাচীন পুথির সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিয়া থাকেন কি না সন্দেহ। এখনও পর্যন্ত বাংলা প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে যে কয়জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি রহিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ না করিলে নব্য সাহিত্যিকগণ অথবা শিক্ষার্থিগণ যে বিশেষ লাভবান হইবেন, তাহা বোধ হয় না। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয় এবং অনেকেই বার্ধক্যের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালার পুথির বিবরণ[৪]

প্রথম খণ্ড

	নাম		লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ
১।	ডাকচরিত,		১০৯০ সাল		
২।	রামায়ণ আদিকাণ্ড,			কৃত্তিবাস,	অসম্পূর্ণ
৩।	”	”	১১৯১	কৃত্তিবাস,	সম্পূর্ণ
৪-৮।	”	”	...	কৃত্তিবাস,	খণ্ডিত
৯।	”	”	১২৩৮	”	”
১০-১২।	”	”	...	”	”
১৩।	”	”	১২০২	”	সম্পূর্ণ
১৪।	”	”	১২৩৮	”	”
১৫।	”	”	১২৪০	”	খণ্ডিত
১৬।	”	”	১২৪৪	”	”
১৭।	”	”	১২৪৬	”	সম্পূর্ণ
১৮।	”	”	...	”	অসম্পূর্ণ হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ
১৯।	”	”	১২৪০	”	সম্পূর্ণ গঙ্গার জন্মকথা
২০।	”	”	১২৬৭	”	” গঙ্গার মাহাত্ম্য
২১।	”	”	...	”	খণ্ডিত
২২।	”	”	...	”	” যযাতির পালা —সুপ্রাচীন
২৩।	রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড,		১২০৫	কৃত্তিবাস,	সম্পূর্ণ
২৪।	”	”	...	”	খণ্ডিত
২৫।	”	”	...	”	সম্পূর্ণ

	নাম	লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ
২৬।	রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড	১১৮৮	কৃত্তিবাস	খণ্ডিত
২৭।	,, ,,	...	,,	সম্পূর্ণ
২৮।	,, ,,	...	,,	খণ্ডিত
২৯।	,, ,,	১২১২	,,	সম্পূর্ণ
৩০।	,, ,,	১২৩৫	,,	,,
৩১।	,, ,,	১২৩৮	,,	,,
৩২।	,, ,,	১২৩৮	,,	,,
৩৩।	,, ,,	১২৪৯	,,	,,
৩৪।	,, ,,	...	,,	খণ্ডিত প্রাচীন
৩৫।	,, ,,	...	,,	,, (স্থানে স্থানে রামদাস, ভক্তদাস বা ভক্তদাস দত্তের এবং অনন্ত আচার্যের ভণিতা আছে।)
৩৬।	,, ,,	...	,,	খণ্ডিত
৩৭।	রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড	...	,,	সম্পূর্ণ
৩৮।	,, ,,	১২৪০	,,	,,
৩৯।	,, ,,	১২৩৮	,,	,,
৪০।	,, ,,	১২৩৬	,,	,,
৪১।	,, ,,	১২৪২	,,	খণ্ডিত
৪২।	,, ,,	১২৪৪	,,	,,
৪৩।	,, ,,	...	,,	সম্পূর্ণ
৪৪।	,, ,,	...	,,	খণ্ডিত
৪৫।	,, ,,	১২৬৩	,,	,, গয়ায় পিণ্ডদান পালা (কবিশেখরের ভণিতাযুক্ত এক ত্রিপদী আছে।)

	নাম		লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ
৪৬।	রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড		১২৬৫	কৃত্তিবাস	সম্পূর্ণ গয়ায় পিণ্ডদান পালা।
৪৭।	রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড		১২২৪	"	"
৪৮।	"	"	১২৩৯	"	"
৪৯।	"	"	১২৪৪	"	"
৫০।	"	"	...	"	"
৫১।	"	"	১২৫৪	"	খণ্ডিত সুপ্রাচীন
৫২।	রামায়ণ সুন্দরকাণ্ড		১৬৩১ শকাব্দ	"	খণ্ডিত লিপিকর সাহ মোহাম্মদ
৫৩।	"	"	১১৪২ সাল	"	"
৫৪।	"	"	১১৭৩	"	সম্পূর্ণ
৫৫।	"	"	১১৭৭	"	অসম্পূর্ণ
৫৬।	"	"	১১৮৫	"	"
৫৭।	"	"	১২৩১	"	সম্পূর্ণ
৫৮।	"	"	১২৪০	"	"
৫৯।	"	"	১২৪৫	"	"
৬০।	"	"	১২৪৭	"	"
৬১।	"	"	১২৫১	"	"
৬২।	"	"	১২৫৫	"	খণ্ডিত
৬৩।	"	"	১২৬২	"	"
৬৪।	"	"	১২৬৭	"	সম্পূর্ণ
৬৫-৬৭।	"	"	...	"	খণ্ডিত
৬৮।	"	"	১২৬৬	"	"
৬৯।	"	"	...	"	"
৭০।	রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড		১১৭৪	"	সম্পূর্ণ
৭১।	"	"	১১৯৫	"	"
৭২।	"	"	১২১৯	"	খণ্ডিত

	নাম		লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ
৭৩।	রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড		১২৫৯	কৃত্তিবাস	সম্পূর্ণ
৭৪।	"	"	...	"	অসম্পূর্ণ
৭৫।	"	"	...	"	" (একস্থানে অদ্ভুতাচার্যের ভণিতা আছে।)
৭৬-৯৩।	"	"	...	"	খণ্ডিত
৯৪।	"	"	...	"	" অঙ্গদ রায়বার।
৯৫।	"	"	১২১৬	"	" "
৯৬।	"	"	১২৫৬	"	সম্পূর্ণ অতিকায়ের যুদ্ধ
৯৭।	"	"	১২৩৪	"	খণ্ডিত " পালা
৯৮।	"	"	১২৪১	"	" " "
৯৯।	"	"	১২৩৭	"	সম্পূর্ণ তরণী সেনের যুদ্ধ পালা।
১০০।	"	"	...	"	" তরণীসেন বধ

দ্বিতীয় সংখ্যা

	নাম		লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ
১০১।	রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড,		১২৪৬	কৃত্তিবাস	সম্পূর্ণ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল।
১০২।	"	"	১২৫৭	"	" (লেখক কনকরাম ধুবী)
১০৩।	"	"	১২৬২	"	" "
১০৪।	"	"	...	"	খণ্ডিত হনুমানের ঔষধ আনয়ন।
১০৫।	"	"	১২৪৭	"	সম্পূর্ণ মহীরাবণের পালা।
১০৬।	"	"	১২৫৮	"	" "
১০৭।	"	"	...	"	" "
১০৮।	"	"	...	"	খণ্ডিত রাম রাবণের যুদ্ধ।
১০৯।	"	"	১২৪০	"	সম্পূর্ণ সীতার অগ্নিপরীক্ষা।

	নাম	লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ
১১০।	রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড	...	কৃত্তিবাস খণ্ডিত	সীতার উদ্ধার।
১১১।	” ”	১২৬৭	” সম্পূর্ণ	সীতার উদ্ধার পালা।
১১২।	” ”	...	” খণ্ডিত	রামের দেশাগমন হইতে শেষ পর্যন্ত।
১১৩।	” উত্তরাকাণ্ড	১২১৭	” সম্পূর্ণ	
১১৪।	” ”	১১৯৪	” ”	
১১৫।	” ”	১২৪৯	” খণ্ডিত	
১১৬।	” ”	...	” ”	
১১৭।	” ”	১২০৫	” ”	(গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির পরিবারের পরিচয় আছে।)
১১৮।	” ”	...	” অসম্পূর্ণ	
১১৯।	” ”	১২৪৪	” খণ্ডিত	
১২০।	” ”	১২০০	” ”	
১২১।	” ”	...	” ”	
১২২।	” ”	১২৫৫	” ”	
১২৩-২৪।	” ”	...	” ”	
১২৫।	” ”	...	” ”	শ্রীরামের অশ্বমেধ।
১২৬।	” ”	১২২৬	” সম্পূর্ণ	লবকুশের যুদ্ধ
১২৭।	” ”	১২৫৭	” ”	” ”
১২৮।	” ”	১২৬৪	” ”	” ”
১২৯।	” ”	১২৪৩	” ”	(রাম সহ) লবকুশের বাগ্‌যুদ্ধ।
১৩০।	” ”	১২১৪	” খণ্ডিত	লবকুশের পালা।
১৩১।	” ”	...	” সম্পূর্ণ	লবকুশের যুদ্ধ।
১৩২।	” ”	...	” খণ্ডিত	লবকুশের যুদ্ধ।

	নাম	লিপিকাল	রচয়িতা		বিশেষ বিবরণ
১৩৩।	রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড	১২৩৭	কৃত্তিবাস	সম্পূর্ণ	
১৩৪।	„ কিষ্কিন্ধ্যা	১২৩৭	„	„	
১৩৫।	„ সুন্দর	১২৩৭	„	„	
১৩৬।	„ লঙ্কা	১২৩৭	„	„	
১৩৭।	„ উত্তর	১২৩৭	„	„	
১৩৮।	„ কিষ্কিন্ধ্যা	১২৩৬	„	„	
১৩৯।	„ সুন্দর	১২৩৬	„	„	
১৪০।	„ লঙ্কা	১২৩৬	„	„	
১৪১।	„ উত্তর	১২৩৫	„	„	
১৪২।	„ অযোধ্যা	···	„	„	(এক স্থানে প্রসাদদাসের ভণিতা আছে।)
১৪৩।	„ কিষ্কিন্ধ্যা	···	„	„	
১৪৪।	„ সুন্দর	১১৩৫	„	„	
১৪৫।	„ লঙ্কা	১২৩৬	„	„	
১৪৬।	„ অযোধ্যা	···	„	খণ্ডিত	
১৪৭।	„ অরণ্য	১১২৮	„	সম্পূর্ণ	(এক স্থানে নিধিরামের ভণিতা আছে।)
১৪৮।	„ কিষ্কিন্ধ্যা	১২৩৮	„	„	
১৪৯।	„ সুন্দর	···	„	অসম্পূর্ণ	
১৫০।	„ অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা	···	„	অযোধ্যা অসম্পূর্ণ, অন্যগুলি সম্পূর্ণ	
১৫১।	„ অযোধ্যা হইতে উত্তরা	১২০৪ (ত্রিপুরাব্দ)	„	সম্পূর্ণ	একস্থানে ষষ্ঠীবরের ও অন্যস্থানে ভবানীদাসের ভণিতা আছে।
১৫২।	শতস্কন্ধ রাবণবধ (অদ্ভুত রামায়ণ)	১২৩০	„	সম্পূর্ণ	

	নাম	লিপিকাল	রচয়িতা		বিশেষ বিবরণ
১৫৩।	শতস্কন্ধ যুদ্ধ (অদ্ভুত রামায়ণ)	১২৫১	কৃত্তিবাস	সম্পূর্ণ	
১৫৪।	শতস্কন্ধ যুদ্ধ (অদ্ভুত রামায়ণ)	...	”	খণ্ডিত	
১৫৫।	শতস্কন্ধ রাবণবধ	...	”	”	
১৫৬।	শতস্কন্ধের যুদ্ধ	...	”	”	
১৫৭।	শতস্কন্ধ রাবণবধ	...	”	”	
১৫৮।	শিবরামের যুদ্ধ	...	”	অসম্পূর্ণ	
১৫৯।	রামায়ণ নরমেধযজ্ঞ	১২৪২	”	সম্পূর্ণ	
১৬০।	যোগাদ্যার বন্দনা	১২১৮	”	”	
১৬১।	”	১২৩৪	”	”	
১৬২।	”	১২৫৩	”	”	
১৬৩।	”	...	”	”	
১৬৪।	মহাভারত সভাপর্ব	১১৯২	সঞ্জয়	খণ্ডিত	
১৬৫।	” ”		”	”	
১৬৬।	” বনপর্ব	১২২৮	”	সম্পূর্ণ	
১৬৭।	” বিরাটপর্ব	১২৬৩	”	”	
১৬৮।	মহাভারত গদাপর্ব	১২৫৩	সঞ্জয়	সম্পূর্ণ	
১৬৯।	পরাগলী মহাভারত—আদি হইতে অশ্বমেধ,	১৬৩২ শক	কবীন্দ্র পরমেশ্বর,	সম্পূর্ণ	
১৭০।	পরাগলী মহাভারত আদি	...	”	অসম্পূর্ণ	
১৭১।	” শল্য	১২৫৩	”	সম্পূর্ণ	
১৭২।	” ৮ পর্ব	১২২৩	কবীন্দ্র	খণ্ডিত	
১৭৩।	গোবিন্দবিজয়—মণিহরণ	১০৫৯	গুণরাজ খান	সম্পূর্ণ	
১৭৪।	শ্রীকৃষ্ণবিজয়—কংসবধ	১০৯১			

	নাম	লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ
১৭৫।	গোবিন্দবিজয়	...	গুণরাজ খান	অসম্পূর্ণ
১৭৬।	পদ্মাপুরাণ		নারায়ণদেব	"
১৭৭।	লক্ষ্মীচরিত্র	...	গুণরাজ খান	সম্পূর্ণ
১৭৮।	লক্ষ্মীচরিত্র	...	...	খণ্ডিত
১৭৯।	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	...	চণ্ডীদাস	"
১৮০।	প্রাচীন পদাবলী	...	চণ্ডীদাস, রসিকচান্দ	খণ্ডিত
১৮১।	পদাবলী	...	বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস	"
১৮২।	দন্তাত্মিকা গ্রন্থ	১২২১	গোবিন্দদাস	"
১৮৩।	পদাবলী	১১৮৩	"	সম্পূর্ণ
১৮৪।	"	...	"	অসম্পূর্ণ
১৮৫।	প্রাচীন পদাবলী	...	"	"
১৮৬।	পদাবলী	...	"	খণ্ডিত
১৮৭।	একান্ন পদ	...	"	"
১৮৮।	"	১১৮৫	"	সম্পূর্ণ
১৮৯।	"	...	"	"
১৯০।	চিত্রগীত	...	"	"
১৯১।	একান্ন পদ	...	"	অসম্পূর্ণ
১৯২।	পদাবলী	...	গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, প্রেমদাস, প্রতাপরুদ্র	অসম্পূর্ণ
১৯৩।	প্রাচীন পদ	...	গোবিন্দদাস	একটিমাত্র পদ আছে।
১৯৪।	দন্তাত্মিকা পদাবলী	১২৫৬	রায়শেখর	সম্পূর্ণ
১৯৫।	"	...	"	অসম্পূর্ণ
১৯৬।	"	১২৫৬	"	"
১৯৭।	প্রাচীন পদাবলী	...	বাসুদেব ঘোষ	"
১৯৮।	একুশ পদ	...	বলরাম দাস	সম্পূর্ণ
১৯৯।	রসমঞ্জরী	১২১৩,	পীতাম্বর দাস	"

	নাম	লিপিকাল	রচয়িতা	বিশেষ বিবরণ
২০০।	পদাবলী,	১২২৩,	শেখর, যদুনাথ, বিদ্যাপতি, মনোহর, মোহনদাস, বাসু ঘোষ, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, ব্রজকিশোর, গোবিন্দদাস, চন্দ্রশেখর।	'আখর' সংযুক্ত। খণ্ডিত।

পরিষদের পুঁথির বিবরণের ভূমিকায় এই কয়টি কথা লিখিলাম। পুঁথি ও পুঁথিশালা সম্বন্ধে আরও অনেক কথার আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শরীর অসুস্থ থাকায় এবং সময়ের অল্পতাপ্রযুক্ত এক্ষেত্রে বিশেষ আলোচনা সম্ভবপর হইল না। ভবিষ্যতে বিশেষভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পাদটীকা

১ *Notices,* x, p. III (Report)।

২ পুঁথিবিচার সম্বন্ধে উপরিলিখিত মন্তব্যগুলির জন্য আমি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট ঋণী।

৩ এখানেও আমি শ্রীযুক্ত যোগেশবাবুর সিদ্ধান্তের অনুবর্তী হইয়াছি।

৪ এই বিবরণ সংগ্রহে আমি পরিষদের প্রধান কর্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়ের সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

[বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ, ১৩৩৩, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ. ১-১৯]

প্রসঙ্গ-কথা

1 হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : 'মহাভারত' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

2 নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৯) : প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্। জন্ম—কলকাতা, আদিবাস হুগলি, মাহেশ। পিতা—নীলরতন বসু। কিছুকাল তিনি ময়ূরভঞ্জে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেয়ার পদে নিযুক্ত থাকেন এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ সংগ্রহ করেন। বহু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা-সাহিত্যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান ২২ খণ্ডে বিশ্বকোষ ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস সংকলন।—সা-সে-ম.

3 আবদুল করিম (১৮৭১-১৯৫৩) : সাহিত্য-বিশারদ। প্রাচীন পুথির সংগ্রাহক এবং অনেকগুলি প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনা করেন।—ঐ

4 দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩১) : শিক্ষাব্রতী, বাংলার প্রাচীন পুথি-সংগ্রাহক ও বাংলা-সাহিত্যের গবেষক। জন্ম—ঢাকা, বকজুড়ি। পিতা—ঈশ্বরচন্দ্র সেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৯১) ও পরে কল. বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক। ডি লিট (১৯২২), রায়বাহাদুর। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য-সম্বন্ধে বহু বই লেখেন। তাঁর বিখ্যাত বই বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬), বঙ্গ সাহিত্য-পরিচয়, ২ খণ্ড, The History of Bengali Language and Literature. ই.।—ঐ

5 শিবরতন মিত্র (১২৭৮-১৩৪৫ ব.) : সাহিত্য-সেবী ও গ্রন্থকার। জন্ম—বীরভূম, সিউড়ি। পিতা—ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র। ইনি প্রায় ১০ হাজার প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করে সিউড়িতে রতন লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি প্রায় ৩৪ খানি বই লেখেন তন্মধ্যে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।—ঐ.

6 রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১২৭১-১৩২৬): বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যসেবী। জন্ম—মুর্শিদাবাদ, কান্দি টেয়াবৈগুপুরে। পিতা—গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী। অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ, রিপন কলেজ (১৯০৩)। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিষয় সরল ভাবে প্রকাশ করার অসাধারণ ক্ষমতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অক্লান্ত কর্মী ও সম্পাদক। ইনি কয়েকটি বিজ্ঞানের ও ধর্মতত্ত্বের বই লেখেন।—ঐ

7 ব্যোমকেশ মুস্তফী (১৮৬৮-১৯১৬): সাহিত্য-সেবী। পিতা—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। বাংলাসাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্য পরিষদের অক্লান্ত কর্মী ও সহ-সম্পাদক। কয়েকটি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক।—ঐ

8 Memphis: প্রাচীন ইজিপ্টের রাজধানী।

9 Osymandyas: ইজিপ্টের মেমফিসের রাজা (আনু. ১৩০০-১২৩৬ খ্রী-পূ.)।

10 Pergamon: এসিয়া-মাইনরের অন্তর্গত এক রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী।

11 তক্ষশিলা: গান্ধার রাজ্যের রাজধানী। পশ্চিম পঞ্জাবে অবস্থিত। বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডি জেলার টাকশিলা ও তক্ষশিলা অভিন্ন। প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। পাণিনি (?) ও চাণক্য এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। রাজবৈদ্য জীবক এখানে ঔষধ ও অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করেন। আলেকজাণ্ডার, বৌদ্ধ পরিব্রাজক চৈনিক ফা-হিয়ান ও হুয়েন সাং এখানে আগমন করেন। এই নগরী প্রত্নতত্ত্ববিদদের আকর্ষণীয়।—*MHEAI.*

12 শ্রীধন্যকটক: কৃষ্ণানদীর তীরে বিদর্ভ রাজ্যে (অধুনা অমরাবতী) অবস্থিত প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ। *MHEAI*, p. 92.

13 নালন্দা: 'বৌদ্ধযুগে শিল্প শিক্ষা' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.।

14 বিক্রমশিলা: ৯ম শতাব্দীতে পালবংশের ২য় রাজা ধর্মপাল কর্তৃক বিক্রমশিলা বিদ্যাপীঠ নির্মিত হয়। এটি বর্তমান ভাগলপুর

জেলার অন্তর্গত পাথরঘাটে অবস্থিত ছিল। একাদশ শতাব্দীতে ইহা বৌদ্ধচর্চার কেন্দ্র ছিল। বিক্রমশিলার বৌদ্ধবিহার খ্রী. দ্বাদশ শতাব্দীতে বক্তিয়ার কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়। বিক্রমশিলা-বিহারের অধ্যক্ষ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ধর্মপ্রসঙ্গের জন্য তিব্বতে যান (১০৪০ খ্রী.)। —*MHEAI.*

15 ওদন্তপুরী (উদন্তপুর): রাজা গোপাল খ্রী. ৯ম শতাব্দীতে বিহারে ওদন্তপুরী বিদ্যাপীঠ নির্মাণ করেন। নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলার পুথিশালা হতে তিব্বতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি। ওদন্তপুরীর পুথিশালা বিহারের মন্দিরের মধ্যেই অবস্থিত ও নালন্দার পুথিশালার চেয়েও বড়। এটিও বক্তিয়ারের সেনাপতি ১২০২ খ্রী. অগ্নিদগ্ধ করে ধ্বংস করে।—*MHEAI.*

16 বর্ষ: 'বৌদ্ধযুগে শিল্পশিক্ষা' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

17 উপবর্ষ: 'বৌদ্ধযুগে শিল্পশিক্ষা' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

18 পাণিনি: পাণিনি দ্র.

19 পাটলিপুত্র: আধুনিক পাটনা। মগধের রাজা অজাতশত্রুর (৪৮০ খ্রী-পূ.) দুই মন্ত্রী সুজীব ও বশুকার কর্তৃক ইহা স্থাপিত। অজাতশত্রুর পৌত্রের সময় ইহা রাজধানীতে পরিণত হয়।

20 রাজশেখর (কবিরাজ) (৯ম-১০ম খ্রী. শতাব্দী): সংস্কৃত কবি ও পণ্ডিত। মহারাষ্ট্রের যাযাবর ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম। পিতা—দুহিক মহামন্ত্রী। মাতা—শীলবতী। তাঁর স্ত্রী অবন্তিসুন্দরী একজন বিদুষী মহিলা। রাজশেখর কনৌজরাজ মহেন্দ্রপালের উপাধ্যায় (৯০৩ খ্রী.) ও তৎপুত্র মহীপালের উপাধ্যায় (৯১৭ খ্রী.)। সংস্কৃত কাব্যজগতে এঁর প্রতিষ্ঠা বড় অল্প নয়। কর্পূরমঞ্জরীর প্রাকৃত ভাষায় নাটিকা, কাব্যমীমাংসা, কবিবিমর্শ, বালরামায়ণ প্রভৃতি রচনা করেন। —সা-সে-ম.

21 খোটান: অফগানিস্তান ও ইরানের সীমান্তবর্তী দেশ।

22 Dr. Stein (Sir Aurel): ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ্। মধ্য এসিয়া, পারস্য ও বেলুচিস্তানে ইনি খননকার্য ও গবেষণা করেন। তাঁর আবিষ্কৃত কতিপয় দ্রব্য ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। অনেক গ্রন্থ

রচনা করেন তন্মধ্যে—Ancient Khotan (Oxford, 1907), Alexander's Campaign on the Indian North-West Frontier (Lond. 1927), The Desert Crossing of Hsuan-Tsang, 630 A. D. (Lond. 1919.) ই.।—*BDIB.*

23 ফা-হিয়ান : 'বৌদ্ধযুগে শিল্পশিক্ষা' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

24 তাম্রলিপ্তি : মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকের প্রাচীন নাম। সে সময়ে এখানে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এখানে কিছুকাল ছিলেন।

25 য়ুয়ন্-চয়ঙ (Yuan-Chwang) : 'পাণিনি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

26 হর্ষ (বর্ধন শিলাদিত্য) (৬০৬-৬৪৭ খ্রী.) : কনৌজ ও থানেশ্বরের অধিপতি। তাঁর সময়ে 'হর্ষাব্দ' নামে এক নতুন অব্দ প্রচলিত হয়। পরে মগধরাজা হন।

27 শীলভদ্র : নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্র সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে খ্যাত ছিলেন। তাঁর ছাত্ররূপে য়ুয়ন্-চয়ঙ কয়েক বছর নালন্দায় ছিলেন।

28 সঙ্ঘারাম : বৌদ্ধ সাধুদিগের বিহার বা উপবন, বৌদ্ধ মঠ।

29 তাকাকুসু (Takakusu) : ই-সিঙের ভ্রমণ বিবরণ অনুবাদ করেন। —*CI*

30 ই-সিঙ (I-tsing) : 'পাণিনি' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

31 হুন : হুনগণ এসিয়ার অকর্ষিত দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের একটি যাযাবর জাতি। তাদের প্রকৃতি ছিল হিংস্র ও ধ্বংসবিলাসী। তাদের প্রধান নায়ক তোরমান পঞ্জাব থেকে মালব পর্যন্ত জয় করেন। হুনেরা পরে রাজপুত জাতির মধ্যে বিলীন হয়।

32 হেমাদ্রি (১২-১৩ খ্রী. শতাব্দী) : স্মৃতিগ্রন্থকার। জন্ম—দাক্ষিণাত্যে। গ্রন্থ—চতুর্বর্গচিন্তামণি।

33 চন্দ্রপাল : নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অধ্যক্ষ শীলভদ্রের সময়।

34 গুণমতি : দার্শনিক পণ্ডিত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান ছিলেন ৬৩০-৬৪৪ খ্রী.।

35 স্থিরমতি : নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। গ্রন্থ—মহাযানাবতার-শাস্ত্র, মহাযানধর্মধাত্ববিশেষাতান্ত্র।

36 জিনমিত্র : নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি মূলসর্বাস্তিবাদ-বিনয়সংগ্রহ নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন।

37 প্রভামিত্র : নালন্দার আচার্য।

38 পদ্মসংস্থ : ঐ

39 বীরদেব : ঐ

40 দিঙ্‌নাগ (৪-৫ম খ্রী. শতাব্দী) : প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ও বৌদ্ধ কবি। জন্ম—দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চী নগরীতে ব্রাহ্মণকুলে। রামঠেক বিহারের অধ্যক্ষ। আচার্য অসঙ্গের কাছে শাস্ত্রাভ্যাস করেন। অসঙ্গের কনিষ্ঠ ভাই আচার্য বসুবন্ধু তাঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন। প্রধান গ্রন্থ—প্রমাণসমুচ্চয়।—সনৎসু.

41 গোপাল (রাজা। ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে) : পালবংশের স্থাপয়িতা। বাংলায় অরাজকতা দূর করার জন্য বাংলার নেতৃস্থানীয়েরা গোপালকে রাজা নির্বাচিত করেন। তিনি সিংহাসনে বসে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

42 ধর্মপাল (৭৭০-৮১৫ খ্রী.) : ইনি গোপালের পুত্র ও পালবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত জয় করেন।

43 চালুক্যবংশ (৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে) : দাক্ষিণাত্যে প্রথম পুলকেশী চালুক্যবংশ স্থাপন করেন।

44 কর্নেল টড (Tod, Col. James) : 'দোল' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

45 হেমাচার্য : হেমচন্দ্র সূরি। 'প্রাচীন সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

46 সিদ্ধারিয় (সিদ্ধরাজ জয়সিংহ) (১০৯৩-১১৪৩): অণহিলবাড়ের চালুক্যবংশে শ্রেষ্ঠ নৃপতি। পিতা—১ম কর্ণদেব (১০৬৩)।—ব-ম.

47 অনিলবাড় (অণহিলবাড়, অধুনা পাটন): মধ্যযুগে গুজরাটের রাজধানী। চাপোৎকট (চাবড়া বংশ) বনরাজ ৭৪৬ খ্রী. অণহিলবাড় প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় হতে ১৪২২ খ্রী. সুদীর্ঘ ৩৬৬ বৎসর ইহা গুজরাতের রাজধানী ছিল। চাবড়াবংশের অবসানে চালুক্যবংশ। তার পতন হলে বাঘেল বংশ, অবশেষে দিল্লী সম্রাটের হাতে যায়।—ব-ম. ১ম. পৃ. ৮০৬।

58 জালালুদ্দিন খলজি (১২৯০-১২৯৬ খ্রী. রাজত্বকাল): দিল্লীর সিংহাসন লাভের সময় তাঁর বয়স ৭০ বছর। তিনি শান্তিপ্রিয়, ধর্মভীরু ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

49 আলাউদ্দিন (১২৯৬-১৩১৬ খ্রী. রাজত্বকাল): খুল্লতাত ও শ্বশুর ইলাউদ্দিনকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করে দিল্লীর সুলতান হন। দেশজয় ও লুণ্ঠনে উদ্যোগী ছিলেন।

50 ফেরিস্তা (মুহম্মদ কাশিম) (১৫২০): কবি ও ঐতিহাসিক। গ্রন্থ: গুলসান-ই-ইব্রাহিমী।

51 বাবর: জহীরুদ্দিন মুহম্মদ বাবর ভারতে মুঘলরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। রাজত্বকাল ১৫২৬-১৫৩০ খ্রী.।

52 অফগান গাজি খাঁ: শূরবংশীয় শের শাহের খুল্লতাত।

53 হুমায়ুন: বাবরের পুত্র। রাজত্বকাল—১৫৩১-৪৩, ১৫৫৫-৫৬খ্রী.।

54 কামরান: বাবরের দ্বিতীয় পুত্র, হুমায়ুনের ভ্রাতা।

55 অক্‌বর: হুমায়ুনের পুত্র। দিল্লীর সম্রাট। রাজত্বকাল—১৫৪৬-১৬০৫ খ্রী.।

56 রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজা, স্যর) (১২৩৮-১৩১৪): সাহিত্যানুরাগী ও সুকবি। জন্ম—কলকাতা পাথুরিয়াঘাটা। পিতা

—হরমোহন ঠাকুর। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৮৭০)। কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা। —সা-সে-ম.

57 স্যর রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭): বিদ্যোৎসাহী ও গ্রন্থকার। কলকাতা শোভাবাজার রাজবংশে জন্ম। পিতা—গোপীমোহন দেব। আর্বী, ফার্সী, বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত ভাষায় সমভাবে পারদর্শী। হিন্দু কলেজের ডিরেক্টর (১৮১৮)। কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা তার মধ্যে 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রসিদ্ধ। রাজা বাহাদুর উপাধিলাভ। —ঐ

58 রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪): আভিধানিক। জন্ম—২৪-পরগনা গরিয়ায়। পিতা—গোকুলচন্দ্র সেন। কর্ম—উইলিয়ম কলেজ (১৮৮২), এসিয়াটিক সোসাইটি (১০১৮), কলকাতা ট্যাকশালের ভারতীয় দেওয়ান (১৮৩১), ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের ট্রেজারার (১৮৩৩)। তাঁর সংকলিত ইংরেজি-বাংলা অভিধান বিখ্যাত।— ঐ

59 রাজা পীতাম্বর মিত্র (১৭৪৭-১৮০৬): সম্রাট শাহ আলমের সেনাপতিরূপে সম্রাটের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি লাভ ও ১০হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক। শেষ বয়সে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে শুঁড়োর বাগানে রাজপ্রাসাদ তৈরি করে বসবাস। সেখানে শুঁড়োর রাজা বলে পরিচিত।—ঐ

60 সুবলদাস মল্লিক: কলকাতার মল্লিকবংশীয় বিশিষ্ট ধনী।

61 হিতলাল মিশ্র: ইনি 'রামসীতা' নামে অধ্যাত্ম রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করেন (১৮৬২)।—সা-সে-ম.

62 Dr. Carey (1761-1838): মিশনারী ও শিক্ষাব্রতী। ১৭৯৩ সালে বাংলায় শ্রীরামপুরে কলেজ স্থাপন, মিশন প্রতিষ্ঠা ও মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক (১৮০১)। অনেকগুলি বই লেখেন—বাংলা ব্যাকরণ, সংস্কৃত রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদ, ই.।—ঐ

63 রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১): প্রত্নতাত্ত্বিক ও বহু ভাষাবিদ্। পিতা—জনমেজয় মিত্র এবং পিতামহ—পীতাম্বর মিত্র।

এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের সহ-সম্পাদক (১৮৪৬), গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৮৪৬) ও সভাপতি (১৮৮৫)। সভাপতি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসো-সিয়েশন (১৮৫৬-৮০)। প্রত্নতত্ত্বে অসাধারণ প্রতিভা। নানা বিষয়ে প্রায় ৪০ খানা গ্রন্থ রচনা, তন্মধ্যে Indo-Aryans, ২ খণ্ডে (১৮৮১) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। —সা-সে-ম.

64 রাজা ভোজ (১০১০-১০৫৫ খ্রী.): গুজরাতে পরমারবংশীয় রাজা মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা ভোজ এই বংশের গৌরব ছিলেন। তিনি ছন্দ, অলঙ্কার, কাব্য, রাজনীতি, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা করেন।

65 অমূল্যধন রায়ভট্ট: বৈষ্ণবশাস্ত্রবিদ্। পাণিহাটি শ্রীপাট-মন্দিরের কর্মাধ্যক্ষ।

66 অজিত ঘোষ (১৮৯০— ?): কলাশিল্পবিদ্। পিতা—ফকিরচাঁদ ঘোষ। আইন ব্যবসায়ী। কলাশিল্প সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন।

67 ঔফ্রেক্ট: 'অথর্ববেদ' প্রসঙ্গ-কথা দ্র.

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—ক

(আলোচনা)

ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের 'ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা' নামে প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থখানির প্রথম প্রবন্ধ 'ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা' সম্বন্ধে এই সংকলন-গ্রন্থের সম্পাদক ড. সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর ভূমিকায় নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করেন :

"বহুভাষাবিদ্ অমূল্যচরণ পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত পরিচিত থাকায় দেশীয় বিষয়বস্তুর মূল্যায়নে তৎপর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের কল্যাণকর ভাবসম্পদ আহরণে আগ্রহের পরিচয় দেন। অমূল্যচরণের মানস বিশেষ করিয়া ভারতীয় ছিল সন্দেহ নাই। তবে তাঁহার আন্তর্জাতিক দিকটাও উপেক্ষা করিবার নহে। বস্তুত তাঁহার বিশ্ববোধ স্বাদেশিকতার অঙ্গীভূত। ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, দর্শন ইত্যাদির বিচার-বিশ্লেষণে অমূল্যচরণ স্বদেশ ও স্বজাতির প্রীতির মধ্যে বিশ্বসচেতনতার পরিচয় দিয়াছেন এবং এই পরিচয় দেশীয় বিষয়বস্তুর উৎকর্ষ প্রমাণেই বিশেষ করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বর্তমান সংকলনের (ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা) প্রথম প্রবন্ধ 'ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা' প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"সকল প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে মাত্র একটি বাঁচিয়া আছে। সেই অদ্বিতীয় গৌরবের স্থান ভারতীয় সভ্যতার। অন্যদেশে অন্য যে সভ্যতা উদ্ভূত হইয়াছিল তন্মধ্যে এমন প্রেরণা ছিল না, এমন গভীরতা ছিল না, যাহার ব্যাপকতা এত বেশী। সে সকল সভ্যতার সমস্যা ছিল সাময়িক। তাহাদের চিন্তা বর্তমানকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। সেখানে পরের সভ্যতা নূতন কথা লইয়া আসিয়াছে, পরের চিন্তা নূতন আলোক লইয়া আসিয়াছে, সেই নূতন বাণীকে বাধা দিবার মত শক্তি পুরাতনের ছিল

না। সে সমস্ত পুরাতন সভ্যতা ছিল মাত্র পাথরের—ইটের সভ্যতা—সেনাবাহিনীর সভ্যতা। বাহ্যজীবনের বহু প্রয়োজনের, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের, আরামের বন্দোবস্ত তাঁহারা করিয়াছেন। কিন্তু অন্তর্জীবনের গূঢ় সমস্যার—সত্যকার জীবনসমস্যার কোন বাণী সে সকল সভ্যতায় নাই। প্রাণহীন এ রকম বস্তুসভ্যতা বাঁচিতে পারে না। ভারতীয় সভ্যতার প্রাণস্পন্দন ছিল বলিয়াই ইহাকে 'আধ্যাত্মিক' বলিয়া কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত অধরপ্রান্তে একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছেন। ইহার বস্তুসভ্যতার অংশ কতটা তাহা এখানে বিচার্য নয়। কিন্তু এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, ইহা বিশেষ করিয়া আধ্যাত্মিক বলিয়াই বাঁচিয়াছে। মাত্র এই সভ্যতার আত্মা আছে—তাই সে মরে নাই।" [পৃ ২-৩]

এই প্রবন্ধেই তিনি অন্যত্র মন্তব্য করিয়াছেন—

"ভারতবর্ষের সহিত এসিয়া-মাইনরের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল। সেই সুদূর দেশে হিন্দু দেবতারা শান্তিদেবতারূপে দেখা দিয়াছেন। শান্তির বাণী লইয়াই ভারতবর্ষের প্রথম আন্তর্জাতিক পরিচয়। শান্তিই ভারতের সনাতন বাণী, শান্তিই ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ প্রতীক। সে যুগের অপর সকল সভ্যতার আন্তর্জাতিক পরিচয় গ্রহণ করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে, সে-পরিচয় তাদের লুণ্ঠনে। সে লুণ্ঠন হয় ব্যবসাচ্ছলে, নয় প্রকাশ্য সৈন্যবলে।" [পৃ. ৫]

এইসব স্থলে অমূল্যচরণের ব্যক্তিস্বরূপের অভ্রান্ত পরিচয় বিধৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সামাজিক গঠনের ধারাবাহিকতা সুদূর অতীতকাল হইতে আজ পর্যন্ত যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তাহা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে পাণিক্করের নিম্নলিখিত মন্তব্যে,—

"The society described in the *Mahabharata* is not essentially different from what holds sway today in India. The life that the Buddha witnessed 2,500 years ago continues over the continent with no fundamental modifications. People argue about the same questions of *karma* and *maya,* believe in the same doctrines and lead the

same lives. The rules of marriage, the rituals of burial, and the organisation of social relationship are not basically different. The Buddha born today would recognise the people of India as his own." [K. M. Panikkar : A Survey of Indian History, 3rd. ed. reprinted, Bombay 1962 ; p. 2]

পানিক্করের মতে এই ধারাবাহিকতা হিমালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। এই ধারাবাহিকতা সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমতও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তিনি তাঁহার 'Indian History, its nature, scope and method' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"The icons discovered at Mahenjo-daro are those of gods and goddesses who are still worshipped in India, and Hindus from the Himalaya to Cape Comorin repeat even today the Vedic hymns which were uttered on the banks of the Indus nearly four thousand years ago. This continuity in language and literature, and religious and social usages, is more prominent in India than even in Greece and Italy, where we can trace the same continuity in history." [R. C. Majumdar (General Editor] : The History and Culture of the Indian People, vol. 1., 2nd impression ; London 1952 ; pp. 38-39]

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব কেবলমাত্র যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনীতিক চিন্তার চর্চায় নহে। তাহার প্রকৃত পরিচয় অধ্যাত্মজীবনোদ্ভূত ধর্মদর্শন, শিল্পসাহিত্য, সামাজিক ও নীতিবিষয়ক ধারণা প্রভৃতিতে। এই কথা মনে রাখিয়াই ভারতের ইতিহাস পাঠ করা কর্তব্য। রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায়,—

"The wars and conquests, the rise and fall of empires and nations, and the development of political ideas and institutions should not be regarded as the *principal*

object of our study, and must be relegated to a position of secondary importance. On the other hand more stress should be laid upon philosophy, religion, art and letters, the development of social and moral ideas, and the general progress of those humanitarian ideals and institutions which form the distinctive feature of the spiritual life of India and her greatest contribution to the civilisation of the world."—[*Ibid*, vol. 1, p. 43]

অমূল্যচরণও লিখিয়াছেন,—

"ভারতের চিন্তা পৃথিবীর বস্তুতেই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। বস্তুর আশ্রয় যাহা, বস্তুর অতীত যাহা তাহারই সন্ধান সে পাইয়াছে। ভারত রূপের মধ্যে অরূপের সাধনা করিয়াছে। নশ্বর ভঙ্গুরকে অতিক্রম করিয়া ভারতের সাধনা হইতেছে শাশ্বত নিত্যের। এই জগতের প্রাণের সন্ধানে তাহার যাত্রা। অমৃতের পথ পাইয়া সে চলিয়াছে। ভারতে জীবন অতি দীর্ঘ সাধনা—অবিদ্যা হইতে মুক্তির সাধনা, বিদ্যার আবির্ভাবের সাধনা।" [পৃ. ৩] [ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা, ভূমিকা, (পৃ. ২৭-৩০), ১৩৭২]

অসুরজাতি ও অনার্য

অসুরজাতি প্রবন্ধটি প্রথমে 'মাসিক বসুমতী' ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ মাসে ও 'অনার্য' প্রবন্ধটি বঙ্গীয় মহাকোষ ২য় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। 'ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা' গ্রন্থে 'অসুরজাতি' এবং 'অনার্য' প্রবন্ধটি 'আর্য ও অনার্য' নামে প্রকাশিত হয়। এই দুটি প্রবন্ধের প্রসঙ্গে ড. গুপ্তের আলোচনা নিম্নে দেওয়া হল :

'আর্য ও অনার্য' এবং 'অসুর জাতি' প্রবন্ধ দুটিতে অমূল্যচরণ আর্য ও অনার্যের উৎপত্তির ইতিহাস, ভারতবর্ষে তাহাদের আগমন এবং ভারতীয় সভ্যতায় তাহাদের দানের বিষয়ে অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় সভ্যতা আর্য ও আর্যেতর দ্রাবিড় জাতির দানে

সমৃদ্ধ এবং কোনো কোনো দিক দিয়া ইহাতে দ্রাবিড়দের দানই অধিক। সুদূর হরপ্পা ও মহেঞ্জো-দারো সভ্যতায় কেউ কেউ দ্রাবিড় প্রভাব আবিষ্কার করিয়াছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে,—

"It has been generally admitted, particularly after a study of both the bases of Dravidian and Aryan culture through language and through institutions, that the Dravidians contributed a great many elements of paramount importance in the evolution of Hindu civilization, which is after all (like all other great civilizations) a composite creation, and that in certain matters the Dravidians and Austric contributions are deeper and more extensive than that of the Aryans. The pre-Aryans of Mohenjo-daro and Harappa were certainly in possession of a higher material culture than what the Semi-nomadic Aryans could show." [S. K. Chatterjee : *Race-movements and Prehistoric Culture*. *The History and Culture of Indian People*, (vol. 1. pp. 157-158)]

আর্য সভ্যতার পূর্বে হিন্দু সভ্যতার অংশীভূত দ্রাবিড় ও অন্যান্য সভ্যতার অস্তিত্ব থাকিলেও আর্য সভ্যতার সহিত দ্রাবিড় সভ্যতার মিলনেই ইহার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। পানিক্করের ভাষায়,—

"...The unity of India is a conscious achievement of Hinduism *after a great Aryo-Dravidian synthesis had taken place*. Before that time civilised communities existed in India in different and perhaps in isolated areas : the people who created the Indus Valley Civilisation, the Aryans in Panchanad and later in the Gangetic Valley, and the communities in the South." [K. M. Panikkar : A Survey of Indian History, p. 3].

আর্য-সভ্যতার পূর্বে হরপ্পা ও মহেঞ্জো-দারোর মতো হিন্দু সভ্যতার আবিষ্কারে তাহার অগ্রদূতের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইলেও ভারতীয় সভ্যতার মূলে আর্যদের দান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। কেহ কেহ সিন্ধু উপত্যকায় অবস্থিত মহেঞ্জো-দারো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানের সভ্যতায় ঋগ্বেদের আর্য উপাদান আবিষ্কার করিয়াছেন। এ বিষয়ে এ ডি পুসলকারের মন্তব্য,—

"It would not, therefore, be correct to ascribe the authorship of the Indus Valley culture to the Aryan or any particular race. It represents the synthesis of the Aryan and non-Aryan cultures. The utmost that we can say is that the Rigvedic Aryans probably formed an important part of the populace in those days, and contributed their share to the evolution of the Indus Valley Civilization [The History and Culture of the Indian People, p. 195].

অমূল্যচরণও মহেঞ্জো-দারো, হরপ্পা প্রভৃতির স্থানে আবিষ্কৃত মৃৎশিল্পের নিদর্শন, মূর্তি খোদিত ফলক প্রভৃতিতে আর্য ও দ্রবিড় সভ্যতার প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় সভ্যতায় দ্রবিড় জাতির দান সম্পর্কে তাঁহার অভিমত,—

"আর্য ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে দ্রবিড় জাতির দান বড় কম নয়। প্রাচীন দ্রবিড়-সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে আর্যপ্রভাবশূন্য। আর্যদের সহিত ইঁহাদের সমাজগঠনেরও পার্থক্য রহিয়াছে। দ্রবিড়-সমাজে মাতৃপক্ষ হইতে পরিবার গঠিত, আর্যসমাজে কিন্তু পিতৃপক্ষ হইতে পরিবার গঠিত। তথাকথিত 'অসুর' সমাজের সহিত দ্রবিড়-সমাজ গঠনের অনেকটা মিল আছে। আর্যগণ যাহাকে ময় অসুর বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন সেই ময়ই দ্রবিড়-সভ্যতার বিজ্ঞান সাধনার চরম সাক্ষ্যদান করিতেছে। পূর্ত ও স্থপতি বিদ্যার আর্য আদর্শ বিশ্বকর্মা, দ্রবিড় আদর্শ ময়দানব। [পৃ. ৪০]

সিন্ধু-সভ্যতার প্রসঙ্গে মার্শালের "Mohenjo-daro and the Indian

Civilization' তিন খণ্ড (১৯৩১), ম্যাকের 'The Indus Civilization' (১৯৩৫) এবং মর্টিমার হুইলারের গ্রন্থসমূহ পাঠ করা যাইতে পারে।" [ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা, ভূমিকা, পৃ. ৩০-৩২]

মানসী ও মর্মবাণী (১৩৩৩ পৌষ, পৃ. ৫৮৭) পত্রিকার 'মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা'য় নিম্নোক্ত মত প্রকাশিত হয়—

১। অসুর জাতি—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। লেখক এই প্রবন্ধে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূলে যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ দিয়াছেন।

"বেদপন্থী ও অবেস্তাপন্থীদের পূর্বপুরুষগণ পূর্বে একস্থানে একসঙ্গে বাস করিতেন। বেদপন্থীদের পূর্বপুরুষগণ আপনাদিগকে 'দেব' বলিতেন ও অন্যদলকে 'অসুর' বলিতেন।···

বৈদিক যুগের শেষভাগে অসুররা আর্যদিগের সঙ্গে পৃথক হইয়া পড়েন এবং ভারতের গণ্ডী পার হইয়া পারস্য বা তুর্কীস্তানে গিয়া বাস করেন। আর্যগণ যখন ভারতে বেশ জাঁকিয়া বসিলেন, তখন যে সমস্ত অসুর ভারতের বাহিরে যাইবার উপায় করিতে পারিলেন না, তখন হটিতে হটিতে প্রয়াগ, ছোটনাগপুর, মির্জাপুরের দিকে গিয়া আড্ডা গাড়িলেন। কেহ বা তিব্বত দিয়া কামরূপ গিয়া উপস্থিত হইলেন। কতক দক্ষিণ-ভারত পর্যন্ত গিয়া আশ্রয় লইলেন। যাঁহারা ভারতের বাহিরে গেলেন তাঁহাদের প্রভাব ও পরাক্রম বৃদ্ধি পাইতে এখন হইতে ৫ হাজার বৎসর পূর্বে তাঁহারা বাবিলনের শত ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সাম্রাজ্যের নাম হয় অসুর বা আসিরিয়া।"

লেখক মহাশয় যে সমস্ত গুরুতর সমস্যার সমাধান করিয়াছেন তাহার একটিও যদি উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে উপস্থাপিত করিয়া বৈজ্ঞানিক রীতিতে আলোচনা করিতেন, তবে তিনি অক্ষয় কীর্তি লাভ করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে আর্য জাতি ভারতবর্ষেরই আদিম অধিবাসী এবং অন্তত ৫।৬ হাজার বৎসর পূর্বে ভারতে বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছিলেন—ইহারও প্রমাণ প্রয়োগ আবশ্যক।

বৈদিক যুগে যজ্ঞপ্রথা

এই প্রবন্ধের 'অগ্নিষ্টোম' অংশ (পৃ. ৬৫-৭৫) 'প্রণব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এর পর নতুন তথ্য সংযোজিত হয়ে বঙ্গীয় মহাকোষের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়। 'অতিরাত্র' ও 'অগ্নিহোত্র' প্রবন্ধ দুটি বঙ্গীয় মহাকোষ ব্যতীত আর কোথাও প্রকাশিত হয় নি। এই তিনটি প্রবন্ধ মিলিত হয়ে 'বৈদিক যুগে যজ্ঞপ্রথা' প্রকাশিত হল। আনন্দবাজার পত্রিকার (১৯২৫, ৩১ মে) সংবাদে আমরা জানতে পারি যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় ৩০ মে বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে 'বৈদিক ও তান্ত্রিক যজ্ঞ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। আমরা অনেক অনুসন্ধান করেও এই প্রবন্ধটির সন্ধান পাইনি।

অদিতি

এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে সুশীল গুপ্ত লিখেছেন—

বেদে পুরুষ দেবতাদিগেরই বিশেষ প্রাধান্য। সেখানে দেবীর সংখ্যা যেমন স্বল্প, তাঁহাদের গুরুত্বও তেমনি অধিক নয়। বৈদিক দেবীদের মধ্যে একমাত্র অদিতিই উচ্চস্থানের অধিকারিণী, কেননা তিনি দেবগণের মাতা। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে তাঁহাকে পৃথিবীর সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। অমূল্যচরণ লিখিয়াছেন, "বৈদিক দেবতত্ত্বে অদিতি প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করেন। কিন্তু সমগ্র ঋগ্বেদে কোন একটি সম্পূর্ণ সূক্ত তাঁহার নাই। অধিকাংশ সূক্তে তাঁহার পুত্র আদিত্যগণের সহিত অদিতি উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কোথাও বলা হয় নাই। তবে তাঁহার সমগ্রভাব, বিস্তৃতভাব, ঔজ্জ্বল্য ও জ্যোতির্ময়তার উক্তি বেদে আছে।" [পৃ. ১০২-৩] [ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা ভূমিকা, পৃ.৩৪]

অত্রি

ড. সুশীল গুপ্ত বলেন—'ঋষি অত্রি' প্রবন্ধে ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অত্রির কথা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ হইতে শুরু করিয়া পুরাণ,

রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে অত্রির প্রসঙ্গ দেখা যায়। ঋগ্বেদের অত্রি কি করিয়া রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের কাল পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন সে বিষয়ে অমূল্যচরণ বলিয়াছেন, "…গোত্রপিতার নামে সেই সেই বংশীয় প্রধান পুরুষগণের পরিচয় দেওয়ার প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান ছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বহু প্রমাণ পাইয়াছেন।" [পৃ. ১১৯] [ঐ]

বৈদিক যুগের শিল্প

পৃ. ১৩১, প. ৫—মুদ্রিত মূল পাঠে 'কুবিন্দক অর্থাৎ কুম্ভকার' ছিল। কুবিন্দক—অর্থ তন্তুবায়—কুম্ভকার নয়। 'কুবিন্দক (অর্থাৎ কুম্ভকার)' একটি পুত্রের নাম হলে, মোট পাঁচটি পুত্রের নাম পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু এখানে ছটি পুত্রের কথা বলা হয়েছে। তাই মনে হয় মূল পাঠে তন্তুবায় শব্দটি মুদ্রাকর প্রমাদে বাদ পড়ে গিয়েছিল। ত্রুটি সংশোধিত হল।

অথর্ববেদ

'অথর্ববেদ' প্রবন্ধ সম্বন্ধে ডঃ গুপ্তের বক্তব্য—

'অথর্ববেদ' প্রবন্ধে অথর্ববেদ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা খুবই চিত্তাকর্ষক। ঋকবেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদকে লইয়াই প্রধানত বৈদিক সাহিত্য গঠিত। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে বৈদিকোত্তর যুগেই বেদগুলির বিভাগ ও নামকরণ করা হয়। অথর্ববেদের কিছু অংশ যে ঋগ্বেদ হইতে প্রাচীন সে বিষয়ে ঋগ্বেদ হইতেই প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। উপর্যুক্ত চারিটি বেদের মধ্যে অথর্ববেদের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে বটকৃষ্ণ ঘোষের একটি উক্তি অভিনিবেশযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,—

"For the history of the Indian people of Vedic age the *Atharvaveda* is certainly the most important and intersting of the four Saṁhitās, describing, as it does,

the popular beliefs and superstitions of the humble folk, as yet only partly subjugated by Brāhmanism." [B. K. Ghosh : Vedia Literature—General View (The History and Culture of Indian People, p 225)]

অথর্ববেদের প্রসঙ্গে জে এন শেণ্ডের 'The Religion and Philosophy of the Atharvaveda' ও এস ব্লুমফিল্ডের 'The Atharvaveda' গ্রন্থ দুইটি পঠনীয় (১৮৯৯)। [ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা, (১৩৭২), ভূমিকা, পৃ. ৩৪-৩৫]

অতিথিগ্ব

অতিথিগ্ব—কথাটির অর্থ হচ্ছে যার কাছে অতিথিগণ সেবাপ্রাপ্তির জন্য গমন করে থাকেন, অতিথিবৎসল, অতিথিসেবক। ঋগ্বেদে রাজা দিবোদাসের উপনাম। [ব-ম.]

ভারতে লিপির উৎপত্তি

প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত ও বিশেষভাবে আলোচিত হয়। আলোচনাটি উদ্ধৃত হল।

১০ই শ্রাবণ ১৩১০, ২৬ জুলাই ১৯০৩, রবিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম এ মহাশয় বলিলেন, —আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, উহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইউরোপীয় মতে ভারতীয় লিপির উৎপত্তি বিদেশে। অমূল্যবাবু এই মতের বিরোধী,—সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধ বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। তাঁহার বিদ্যাবত্তা, গবেষণা,

চিন্তাশীলতা বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি বহুভাষায় লিখিত নানা দেশের ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মত উদ্ধৃত ও যথাসম্ভব খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে ভারতের বর্ণ Serio-Arabic হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা নহে। ধরিতে গেলে অক্ষরটা কি? কিছুই নহে, বিনা দুধে ঘোল—কল্পনার সাহায্যে শব্দের জ্ঞাপক কতকগুলি চিহ্নমাত্র। তবে এ কল্পনা দ্বারা জগৎ উপকৃত। কোন্ জাতি প্রথমে অক্ষরের কল্পনা করেন, ইহার অনুসন্ধান পণ্ডিতমণ্ডলী বহুকাল হইতে করিতেছেন। ইহার আলোচনা ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে ১৪শ লুই-এর দূতকে শ্যামদেশের রাজা কাম্বোডিয়া অক্ষরে লিখিত একখানি পালি-গ্রন্থ উপহার দেন। সেই গ্রন্থ পাইয়া ফরাসী জাতি অক্ষরতত্ত্ব উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করিল। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটি গঠিত হয়। এই সভার যত্নে এসিয়া মহাদেশের ধর্ম ও বিদ্যা আলোচনার সূত্রপাত হইলে অনেক উৎকীর্ণ লিপি, এসিয়া-মাইনরের হিব্রুলিপি প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমণ্ডলী স্থির করেন, এই সকল অবলম্বনে গবেষণা দ্বারা অক্ষরের ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারে। অশোকলিপি এ পর্যন্ত যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা তত প্রাচীন নহে। ইহার আকার, গঠন ও লেখন প্রণালী অতি পরিষ্কার। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা এই লিপিগুলিকে ২৫৩ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দের প্রাচীন বলিতে চাহেন না, অথচ ইউরোপে খ্রীস্ট-পূর্ব একাদশ শতাব্দীর লিপি পাওয়া গিয়াছে। সে সকল লিপির লিখিত বিবরণাদি হইতে তাহাদের প্রাচীনত্ব জানা যায়। খ্রীস্ট-পূর্ব দশম, নবম, অষ্টম শতাব্দীর লিপি অনেকগুলি ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিসরের মৌর্তিক অক্ষর খ্রীস্ট-পূর্ব ৫ হাজার বৎসরের পূর্বে ক্ষোদিত হইয়াছে। অক্সফোর্ডের মিউজিয়মে ৪৭০০ খ্রী-পূ. বৎসরে উৎকীর্ণ এক স্তম্ভ আছে। ব্যাবিলোনিয়ার কীলকাকৃতির অক্ষর ২৭০০ বৎসর খ্রীস্ট-পূর্বের, চীনের চিত্রিতাক্ষর খ্রীস্ট-পূর্ব ২৫০০ বৎসরের। কিন্তু ভারতের অক্ষর অশোকের পূর্বের আর নাই। অশোকের পরের সহস্র সহস্র উৎকীর্ণ লিপি আছে, কিন্তু পূর্বের আর নাই। সম্প্রতি কপিলবাস্তুর নিকটবর্তী পিপ্‌রা হইতে এক লৌহ সিন্দুক ভূগর্ভে পাওয়া গিয়াছে, উহার

গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি আছে। ঐ সিন্ধুকে বুদ্ধদেহাবশেষ রক্ষিত। সুতরাং উহা ৫৪৩ খ্রীস্ট-পূর্বের অধিক নহে। অতএব এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ৫৪৩ খ্রীস্ট-পূর্বের উৎকীর্ণ লিপি ব্যতীত আর অধিক পুরাতন লিপি পাওয়া যায় নাই। সাঁচি নামক স্থানে মৌদ্‌গল্যায়ন ও সারিপুত্রের দেহাবশেষ পাত্রেও যে অক্ষর আছে তাহার সময়ও উহার কিন্তু পরবর্তী। কারণ ঐ দুই বুদ্ধশিষ্য বুদ্ধদেবের পরে মৃত। গিরিব্রজ হইতে যে ক্ষোদিত লেখা পাওয়া গিয়াছে, তাহার পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই। গত বৎসর হইতে India Exploration Fund স্থাপিত হইয়াছে, তাহার কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই; হইলে কি হইবে বলা যায় না। অন্যদেশের ন্যায় ভারতবর্ষে প্রাচীন লিপির বর্তমানতা আর নাই। ঋষিরা উৎকীর্ণ লিপির আবশ্যকতা বুঝিতেন না। সাধারণ লোকশিক্ষার ব্যবস্থা তাঁহারা অধ্যয়ন অধ্যাপনা দ্বারা করিতেন। বুদ্ধের পরবর্তী কালে প্রয়োজনবশে লিপি উৎকীর্ণ করাইবার প্রথা প্রবর্তিত হয়; কিন্তু তাহা বলিয়া যে বুদ্ধের পূর্বে লিপি প্রথা ছিল না, তাহা নহে। ভূর্জ পত্রে লেখা, আরও পূর্বে ভারতে ছিল বৈ কি? পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা খ্রীস্ট-পূর্ব নবম শতাব্দীতে ভারতে লিপি প্রথা ছিল, ইহা অনুগ্রহ করিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পাণিনি অত প্রাচীন নহেন। যবন শব্দে কেবল গ্রীককে বুঝায় না। ভারতের বাহিরে পাশ্চাত্ত্য জাতি মাত্রই যবন হইতে পারেন। ধননন্দ যখন রাজা, তখন পাণিনির গুরু উপবর্ষ পণ্ডিত বর্তমান, সুতরাং উপবর্ষের সময় খ্রীস্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দী। উণাদি প্রত্যয়ের মধ্যস্থ শব্দ দ্বারা পাণিনিকে আবার বেশী পরবর্তী বলা সমীচীন হয় না। যাস্কের নিরুক্তে, গোপথ, শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণে, শ্রৌতসূত্রগুলিতে অক্ষরের উল্লেখ আছে। এগুলি বুদ্ধের বহু পূর্ববর্তী; সুতরাং নবম খ্রীস্ট-পূর্ব শতাব্দীর বহু পূর্বে ভারতে অক্ষরের বর্তমানতার, সাক্ষ্য ও প্রমাণ আছে। কিন্তু এগুলি আনুষঙ্গিক প্রমাণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। অমূল্যবাবুর সিদ্ধান্ত ভারতীয় অক্ষরের সৃষ্টি ভারতে, বিদেশে নহে; ইহার প্রমাণ না হইলে অনেক বিষয়ে আমাদের অর্বাচীনত্ব প্রকাশ হইবে। ফিনিসীয় অক্ষর প্রত্যক্ষ বস্তু দর্শনে সৃষ্ট, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমণ্ডলী তাহার প্রমাণ করিয়াছেন। ভারতীয় অক্ষরের উৎপত্তি মূলে

সেরূপ কোন বীজ আছে কি না, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ক-এ করাত, খ-এ খরগোস, গ-এ গাধা ইত্যাদি বাঙ্গালা বর্ণমালার পাঠরীতি অতি অল্প দিনের কল্পনা বলিয়াই বোধ হয়। তদ্ভিন্ন ভারতীয় বর্ণমালা যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সজ্জিত, তাহা প্রথম উদ্ভাবিত বর্ণমালার পক্ষে সাজে না। ইহা বহুকালের মার্জিত প্রণালীর ফল। সুতরাং আদর্শ একটা ছিল, যাহার মার্জনা হইয়া বর্তমান ভারতীয় বর্ণমালা গঠিত হইয়াছে। অশোকের ৪১টি ক্ষোদিত লিপির অক্ষর সব একরকম। তাহার পর হাজার বর্ষের মধ্যে অক্ষরের প্রাদেশিক বিভিন্নতা বহুপ্রকার দেখা যায়। কিন্তু অশোকলিপির প্রাদেশিক বিভিন্নতা নাই। ইহাও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের আর একটি প্রবল যুক্তি। আমার নিজের কিন্তু এ সকল যুক্তিতে আস্থা নাই, অথচ প্রতিকূলে প্রমাণ দিবারও কিছু এখনও হাতে আসে নাই। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা সাহাবাদ গিরির উৎকীর্ণ লিপির অক্ষর দেখিয়া বলেন, ঐ অক্ষরেব মূলে Greco-Bactria। পরে Indo-Pali পারস্যের মধ্য দিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। ফিনিসীয় বাণিজ্য পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। কেহ কেহ বলেন, ঋগ্বেদ ধৃত "পণি" শব্দে বণিক বিশেষ বুঝায়। মহীধর এই ব্যাখ্যা করেন। অনেকের মতে উহাই ফিনিসীয় শব্দের সূচক। সায়ণ ঐ শব্দের অর্থ দেবতা-অপদেবতা করিয়াছেন। কেহ বা দস্যুও করিয়াছেন, রামায়ণে লোহিত সাগরের বর্ণনা আছে। সমরখণ্ডের সঙ্গে ফিনিসীয় ও ভারতীয় বাণিজ্য চলিত ; সুতরাং ফিনিসীয় অক্ষর আনা অসম্ভব নহে। তবে কিরূপে কাহাদের দ্বারা কোথা হইতে আসিল, তাহা নির্ণয় করা বড় দুরূহ। কারণ প্রাচীন ভারতীয় অক্ষরের সঙ্গে কোন প্রাচীন বিদেশীয় অক্ষরের একটুও সাদৃশ্য নাই, অতএব পরের আদর্শে গঠিত কেমন করিয়া বলা যায়? প্রিন্সেপ বলেন, গ্রীক অক্ষর হইতে ভারতীয় অক্ষরের উৎপত্তি। আমার মতে ভারতের প্রাচীন বর্ণমালা যাহা ছিল, তাহা বর্তমান নাই। অশোকের অক্ষরের মূলে ফিনিসীয়, সীরিয়-আরবীয়, আরবীয়-ফেলিক্স্ বা গ্রীক অক্ষর আদৌ ছিল না, তাহা স্থির হয় না। দেবনাগর অক্ষর আদৌ প্রাচীন নহে। উহা প্রাদেশিক অক্ষর মাত্র। বৌদ্ধ হর্ষবর্ধনের পর কান্যকুব্জের হিন্দুরাজগণের সময়

কাশীতে শিক্ষা স্থান নিরূপিত হয়। কাশীতে নাগরাক্ষর চলিত। কাশীতে অধীত ছাত্রগণের বিভিন্ন দেশে নাগরাক্ষরে লিখিত প্রাচীন পুস্তকাদি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নাগরাক্ষরের সর্বত্র প্রচার। এখন নাগরাক্ষরের এত প্রচার আমরা দেখিতেছি, ইহার মূলে ইংরাজ রাজের শিক্ষা বিভাগের আদেশ বলবান। ইংরাজ বাঙ্গালা ব্যতীত সর্বত্র নাগরাক্ষরে সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষা গ্রহণের ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া গত ৫০ বৎসরের মধ্যে ইহার বিপুল প্রচার করিয়াছেন। যদি কোনদিন এসিয়ার সর্বত্র একাক্ষর হয়, তবে সে দেবনাগরই হইবে। বাঙ্গালা বর্ণমালা দেবনাগর বর্ণমালার অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু, বি এ মহাশয় বলিলেন, অমূল্যবাবুর প্রবন্ধের জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহার গবেষণার ফলে আমরা বুঝিয়াছি ভারতের অক্ষর ভারতেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। সর্ব-জাতির শিক্ষাদাতা ভারত সর্ববিষয়ে গুরুগিরি করিয়া যে কেবল বর্ণ জ্ঞানের জন্য কাহারও শরণাপন্ন হইয়াছিল, তাহা বিশ্বাস করাই ভুল। কিন্তু ইহার প্রমাণ চাই। অমূল্যবাবু যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে বিপক্ষ মত খণ্ডিত হইবে বটে কিন্তু স্বমত প্রতিপন্ন হইবে কিরূপে? আমাদিগের বর্তমান বর্ণমালা সাজাইবার বৈজ্ঞানিক প্রণালীই তাহার আধুনিকত্বের প্রমাণ। ইহার যে একটা আদি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। যত দিন না আমরা সেটি খুঁজিয়া বাহির করি, তত দিন আমাদিগকে, অনেক কথা শুনিতে হইবে। সতীশবাবুর উল্লিখিত প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োজন; কিন্তু তাহা বাহির করিবার জন্য আমাদিগকে সাহেবদিগের ন্যায় মাটী খোঁড়া-খুঁড়ী করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন বিশেষ সুবিধা কিছুতেই করিতে পারা যাইবে না। অশোক লিপির কাল ২৫০ খ্রী-পূর্ব বৎসর। যদি পিপ্‌রার সিন্দুক বাহির না হইত তাহা হইলে আমরা অক্ষর লইয়া ৫৪৩ খ্রী-পূর্বাব্দে পৌঁছিতে পারিতাম না। গিরিব্রজের লিপি পড়াই যাইতেছে না। বাহির করা হইয়াছে অথচ সাহেবেরা পড়িয়া দিলেন না বলিয়া আমরাও হাত পা কোলে করিয়া বসিয়া আছি। প্রতীক্ষায় আছি সাহেবেরা পড়িয়া দিলে পর কবে তাহাদের যুক্তির ফাঁক ধরিয়া তর্ক তুলিব। ইহাতে

কাজ হইবে না, কথায় প্রমাণ মিলিবে না। মাটী কাটিতে হইবে, তবে মিলিবে।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি এল মহাশয় বলেন,—অমূল্যবাবুর প্রবন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করিলাম। তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তৃপ্তি হইল না। অক্ষর বহু পূর্ব হইতে ছিল, প্রমাণ করা যায়। কেবল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যায় না। ইহা বড়ই গোলের কথা। আমার একটা কথা আপনারা প্রণিধান করিবেন। আমরা স্বতঃসিদ্ধ বাক্য স্বরূপ একটা পাশ্চাত্ত্য গণনাকে অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লইয়া থাকি। আমি সেই গণনাকে অতটা অভ্রান্ত বলিয়া ধরিতে চাহি না। ৩২১ খ্রী-পূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার ভারতে আসেন। ভূদেববাবু বলেন, এইটা গোড়ায় গলদ। আমাদের দেশের ইতিহাস রাজতরঙ্গিনী প্রভৃতি যাহা দু-এক খানা আছে তাহাকে আমরা অবিশ্বাস করি কেন? তাহার সহিত ঐ বিষয়ের সময়ের মিল হয় না। আলেকজাণ্ডার মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ভারতে না আসিয়া যদি গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ভারতে আসিয়াছিলেন বলা হয়, তাহা হইলে রাজতরঙ্গিনী প্রভৃতির অনেক কথার সুন্দর মীমাংসা হয়। বুদ্ধদেবের সময়ও ঐ এক গণনাকে মূল ধরিয়া স্থির করা হয়, সুতরাং আমাদের সময়াদি সবই গোল ঘটিয়া গিয়াছে। এই গোল মিটাইলে অশোকলিপি কত অব্দ পিছাইয়া যাইবে, তাহা বুঝা এবং সতীশবাবুর প্রার্থিত প্রত্যক্ষ প্রমাণের সুযোগ হইতে পারে এবং মন্মথবাবুকেও আর কোদাল পাড়িতে হইবে না। স্বাধীন চেষ্টা করা না হউক, ইহা আমার বলা অভিপ্রেত নহে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমি সভাপতিত্ব করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসি নাই, অধিকন্তু আমি সুস্থও নহি। আজকার আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসাও সহজ নহে। প্রবন্ধ সম্বন্ধে সতীশবাবু, নিখিলবাবু প্রভৃতি যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বড় কিছুই নাই, তবে বাঙ্গালা বর্ণমালা বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রে কতকগুলি জ্ঞাতব্য কথা আছে, সেগুলি আমি আপনাদিগকে বলিতেছি। সতীশবাবু বলিয়াছেন, বাঙ্গালা বর্ণমালা প্রাচীন, বস্তুত তাই। যজুর্বেদে প্রণবাদি সম্বন্ধে যে

উপদেশ আছে, তাহাতে বাঙ্গালা বর্ণমালাই সূচিত হয়। ষট্‌চক্রের সাধকগণ চক্রে চক্রে দেহ মধ্যে বর্ণের স্বরূপ দেখিতে পান, সে রূপ বাঙ্গালা বর্ণমালার রূপ। প্রণব সাধকেরা বলেন, সমস্ত বর্ণের উৎপত্তি প্রণব হইতে। প্রণব সাধকেরা সকল শব্দের শেষেই প্রণবের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করেন, এমন কি পশ্বাদির শব্দেও প্রণব বিদ্যমান। সতীশবাবু বলেন, অক্ষরের উৎপত্তি কাল্পনিক, হিন্দু-শাস্ত্রার্থদর্শী শব্দসাধকগণ তাহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা জ্যোতির্ময়রূপে অক্ষর প্রত্যক্ষ করেন। সতীশবাবু বলিয়াছেন, নাগরাক্ষর কালে এসিয়ার একমাত্র হইবে। কেন? বাঙ্গালা অক্ষর সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র যদি একটা সাক্ষ্য দেন এবং সাধকগণ প্রমাণ দিতে পারেন, তবে বাঙ্গালাই সর্বত্র হউক না? সাহিত্য পরিষৎ মিশনরী পাঠাইয়া বাঙ্গালা অক্ষর প্রচারের ব্যবস্থা করিতে পারেন। বাঙ্গালা, বেহার, আসাম, উড়িষ্যা, নাগরী অপেক্ষা বাঙ্গালা অক্ষরকে বেশী আদরে গ্রহণ করিবে। বর্ণের উৎপত্তি, রূপ ও জ্ঞান লাভ করিতে হইলে গবেষণা অপেক্ষা সাধনায় বেশী কাজ হইবে, হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ এইরূপ। [সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১০ সাল, মাসিক কার্যবিবরণী, পৃ. ৸০.-১/০]

ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ১৫ই আশ্বিন মাসিক অধিবেশনে শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা' বিষয়ে প্রবন্ধটি পাঠ করলে উক্ত সভায় আলোচিত হয়। আলোচনাটি উদ্ধৃত হল।

"ভারতে লিপির অস্তিত্ব কতকাল হইতে ছিল, তাহা প্রবন্ধলেখক বেদ, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ, সংহিতাদি গ্রন্থ হইতে চার-পাঁচশত বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি পাণিনি প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তক হইতেও ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা প্রমাণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে নানা বিভিন্ন মতের সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, ভারতের লিপি ভারতেই উৎপন্ন। লিপি বিষয়ে ভারত কাহারও নিকট ঋণী নহে।"

"শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষীয় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অত্যন্ত হাস্যাস্পদ। এই সমস্ত মতের তীব্র সমালোচনা হওয়া আবশ্যক।"

"শ্রীরামেন্দ্র ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে, ঐতরেয় গ্রন্থে অক্ষর শব্দের উল্লেখ আছে।

"শ্রীযুক্ত সভাপতি (চারুচন্দ্র বসু) মহাশয় বলেন যে, সমস্ত প্রবন্ধ না দেখিয়া কোনরূপ মতামত প্রদান করা সম্ভব নহে। বিদেশীয় সাহিত্যিক-গণ অক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ক্রমশ ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।" [সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ১৩১৭, কার্যবিবরণী, পৃ. ৪৯]

মহাভারত

মহাভারত প্রবন্ধটি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত সচিত্র মহাভারতের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা। রামানন্দবাবুর মূল বইখানি আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। অমূল্যচরণের বাড়ীতে প্রকাশিত ভূমিকার একটি ছাপা ফাইল ছিল। তা থেকেই প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে। প্রকাশ কাল দেওয়া সম্ভব হয় নি। ফাইল কপিটির শেষের কয়েকটি লাইন কীটদষ্ট হওয়ায় তার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি। প্রবন্ধটি 'ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা' বইয়ে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে সুশীলবাবুর মতামত—

'মহাভারত' প্রবন্ধটিতে অমূল্যচরণ 'মহাভারতে'র যে জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন তাহা খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। 'মহাভারত' ভারতবর্ষের মানস-দর্পণ। ভারতের সামাজিক জীবনকে আমরা যেভাবে জানি তাহা ঠিক সেইভাবেই মহাভারতে প্রতিফলিত হইয়াছে। বর্তমান আকারে মহা-ভারতের যে রূপ পাওয়া যায় তাহা চতুর্থ শতাব্দীতে সৃষ্ট হইলেও 'মহা-ভারতে'র গল্প যে বহু পূর্বে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে পাণিনি (খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী) 'মহাভারতে'র প্রধান চরিত্রগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাতন কাহিনী সংস্কৃত আকারে বর্তমান মহাকাব্যে বিধৃত

হইলেও মূল ঘটনা ও চরিত্রের বিশেষ কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই। এই প্রবন্ধটির প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সুলিখিত প্রবন্ধ 'মহাকাব্যের লক্ষণ' (নানা কথা, ১৯২৪) প্রবন্ধে 'মহাভারতে'র স্বরূপ নিরূপণকে স্মরণ করা যাইতে পারে।

বাংলা 'মহাভারতে'র আলোচনাকালে অমূল্যচরণ লিখিয়াছেন, "শ্রীকর নন্দী বাংলায় সর্বপ্রথম মহাভারত রচনা করেন। আদি হইতে আরম্ভ করিয়া অশ্বমেধ পর্বে ইহার পরিসমাপ্তি। এখানি 'পরাগলী মহাভারত' নামে প্রসিদ্ধ" [পৃ. ২৮০]। কিন্তু সুকুমার সেনের মতে "পরমেশ্বর দাসের 'পাণ্ডববিজয়-পঞ্চালিকা'ই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম ভারত-পাঁচালী কাব্য। পরমেশ্বর দাস 'কবীন্দ্র' উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন।" [সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং। কলিকাতা ১৯৪৮, পৃ. ২২৩]। এই পাঁচালী 'মহাভারতে'র মতো অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত।

অমূল্যচরণ অন্যত্র লিখিয়াছেন, "বিজয় পণ্ডিতের নামে একখানি মহাভারত দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয় পণ্ডিত বলিতে কেহ ছিলেন না। এই মহাভারতখানি পরাগলী মহাভারতেরই সংক্ষিপ্তসার।...... 'বিজয়পাণ্ডব' কয়েকস্থানে লিপিকর প্রমাদবশত 'বিজয় পণ্ডিতে'র সৃষ্টি করিয়াছেন" [পৃ. ২৮১]। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে নগেন্দ্রনাথ বসু মুর্শিদাবাদে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের ভারত পাঁচালীর সংক্ষিপ্ত একটি পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পুস্তকের শেষ ভণিতায় বিজয়পাণ্ডবকথা'র স্থলে লিপিকর প্রমাদে 'বিজয়পণ্ডিতকথা' থাকায় তিনি এটিকে বিজয়পণ্ডিত নামে এক কবির রচনা বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন।

এই প্রবন্ধের এক জায়গায় আছে, "পরাগলী মহাভারত পড়িয়া 'বিজয়-পাণ্ডবকথা' হয়। আর তাহাই ফাঁপিয়া ফুলিয়া 'সঞ্জয়ী মহাভারত' হইয়াছে" [পৃ. ২৮২]। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গে ভারত পাঁচালীর নানা প্রবাহ একত্র হইয়া 'সঞ্জয়' মহাভারতের সৃষ্টি হইয়াছে। এর আদিপর্বে রাজেন্দ্রদাসের, অশ্বমেধপর্বে গঙ্গাদাস সেনের এবং স্বর্গারোহণপর্বে ষষ্ঠীবর সেনের ভণিতা দেখা যায়। [ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা, পৃ. ৩৫-৩৬]

প্রাচীন সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ

প্রবন্ধটি প্রবাসী (১৩৩০, শ্রাবণ পৃ. ৫০৩-৫০৫) পত্রিকার কষ্টিপাথর বিভাগেও সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি

দেশ পত্রিকায় (১৩৪২, ৭ অগ্রহায়ণ পৃ. ১১০, ১৩৬) 'প্রাচীন ভারতে শিক্ষা' এই শিরোনামায় প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির মধ্যে শিক্ষাধারার অংশটুকু প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীভারতী পত্রিকায় (১৩৪৫, ভাদ্র, পৃ. ৯-১৪) এটি পুনর্মুদ্রিত হয় এবং পরে ইহা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত হয়।

প্রাচীন ভারতের গ্রাম্য-সমিতি

কায়স্থ-পত্রিকা, (১৩৪৬, কার্ত্তিক মাসে) পুনর্মুদ্রিত হয়।

পাণিনি

প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ১৩১৩, ২৩ অগ্রহয়ণে মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও বিস্তৃত আলোচিত হয়। আলোচনাটি সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার কার্যবিবরণী থেকে উদ্ধৃত হল।

"শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার 'পাণিনি' প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয় প্রেরিত 'পাণিনি' সম্বন্ধে একখানি পত্র পঠিত হইল। পূর্ণবাবুর পত্রে কবি পাণিনির কতকগুলি কবিতা ছিল; ঐ সকল কবিতা এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত এবং উক্ত কবিতাগুলি সম্বন্ধে অমূল্যবাবুও তাঁহার প্রবন্ধে আলোচনা করিয়া যাওয়ায় উহার সম্বন্ধে অধিক আলোচনা আবশ্যক হইল না।

তৎপরে সভাপতি (মহাম. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ) মহাশয় জানাইলেন যে পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় সম্প্রতি মহাভাষ্যের যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, উহা শীঘ্রই পুস্তকাকারে ছাপা হইবে। ঐ পুস্তকের ভূমিকা-

রূপে অমূল্যবাবুর এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবে। সামাধ্যায়ী মহাশয়ের ইচ্ছা মুদ্রণের পূর্বে এ সম্বন্ধে ভালরূপ আলোচনা হইলে পাণিনির ঐতিহাসিক তত্ত্ব সাধারণের নিকট বিষদভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। এতএব এ সম্বন্ধে উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী আলোচনা করিলে বড়ই সুখের হয়।

রায় শরচ্চন্দ্র দাস, সি আই ই, বাহাদুর বলিলেন, তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে পাণিনি সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা পরে, প্রবন্ধকারের নিকট পাঠাইয়া দিব। অমূল্যবাবুর প্রবন্ধ অতীব সুন্দর গবেষণাপূর্ণ হইয়াছে। পরিষদে এইরূপ প্রবন্ধই চাই। প্রবন্ধকার ইউরোপীয় ও নিজের মত লিখিয়াছেন, ইহাই আবশ্যক। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকে প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে ইউরোপীয় মতের সমালোচনা থাকে, অনেকস্থলে মীমাংসা থাকে না। সে সকল প্রবন্ধ অপেক্ষা যাহাতে অপরের মত—সমালোচনার সহিত লেখকের নিজের মত প্রকটিত হয়, সেই সকল প্রবন্ধই সমধিক আদরণীয়। আমাদের এখন এ সকল বিষয়ে মৌলিকত্ব দেখান আবশ্যক। প্রবন্ধ-লেখককে আমার অশেষ ধন্যবাদ।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু বলিলেন—পাণিনি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সামান্য। অমূল্যবাবু পাণিনি সম্বন্ধে এদেশীয় ও বিদেশীয় যাবতীয় মতের সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তদতিরিক্ত নূতন কিছু চাই। ৬০ বৎসর ধরিয়া পাণিনি বুদ্ধের আগে কি পরে এই তর্কই চলিয়া আসিতেছে। গোল্‌ডস্টুকার ও মুলার পাণিনিকে বুদ্ধের আগে বলেন, সভাপতি মহাশয় পালি ব্যাকরণের আলোচনা কালে সসঙ্কোচে পাণিনিকে বুদ্ধের আগে বলিয়াছেন। কতকগুলি শব্দ সহায়ে অনেকে পাণিনিকে বুদ্ধের পর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—নির্বাণ, শ্রমণ প্রভৃতি। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বর্ণনা আছে শ্রমণেরা বেদ-মন্ত্রের উপাসক ও উপদেষ্টা ছিলেন। রামায়ণে দশরথ কর্তৃক শ্রমণভোজনের কথা আছে। শবরী শ্রমণা রামায়ণের এক অপূর্ব চিত্র ইত্যাদি। আমার এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য অর্ধ শতাব্দীর অধিক কালের আলোচনাতেও এই একটা বিষয়ের মীমাংসা হইল না। এই রূপ নিষ্ফল আলোচনায় ফল পাওয়া যায় না। যাহা হউক অমূল্যবাবুর গবেষণার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ করিতেছি।

পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী বলেন, গুটিকতক শব্দ লইয়া সময় নিরূপণের চেষ্টা সকল সময়ে সুফল প্রসব করে না। জৈমিনি যে ভাবে শব্দ বিচার করিয়াছেন, তাহাতে শব্দ দ্বারা সময়াদি নিরূপণে আমাদের ন্যায় লোকের ঘোর সন্দেহ হয়। আমার পাণিনির সময় বা স্থানের নিরূপণ করিতে একবারেই সাহস হয় না। প্রক্ষিপ্ত নির্ণয় ব্যাপারটি অনেক স্থলেই আমরা আমাদের ইচ্ছানুকূল করিয়া থাকি। পাণিনির সূত্রগুলি পড়িয়া পাণিনির স্থান-কাল নিণাত হইতে পারে এমন কোনও অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত আমি পাণিনি পড়িয়া পাই নাই। তবে এইটুকু ঠিক যে ক্যাতায়ন পাণিনির বহু পরবর্তী, কারণ তিনি তাঁহার বার্ত্তিকে পাণিনিসূত্রের বিস্তার করিয়াছেন। ভাষ্যকার পতঞ্জলি আবার বার্ত্তিককার কাত্যায়নের পরবর্তী কারণ পতঞ্জলি কাত্যায়নের কতকগুলি বার্ত্তিকে দোষারোপ করিয়াছেন! যোগসূত্রকার পতঞ্জলি ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি একই ব্যক্তি, ভগবান ব্যাস যোগসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। তিনি দ্বাপরযুগের লোক, অতএব স্থির করুন পাণিনি কতকালের লোক।

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, অমূল্যবাবুর প্রবন্ধে গবেষণা ও পরিশ্রম বড় বেশী, এত খাটিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিতে সাধারণত কাহাকেও দেখা যায় না। কিন্তু ইহাতেও হয় নাই, আরও খাটুনি চাই। বিভিন্নতর প্রমাণ আভ্যন্তরীণ আলোচনা আরও বেশী চাই, তবে পাণিনি-তথ্য নির্ণীত হইবে। সিদ্ধ শব্দের দ্বারা বিচার করিতে গেলে অতি ধীর ভাবে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। ত্রিমুনির মধ্যে পার্থক্য বড় বেশী দিনের নয়। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি খুব বেশী দিনের ব্যবধানের লোক নহেন। তাঁহারা খ্রীস্টের পূর্ববর্তী ইহা নিশ্চিত, তবে বুদ্ধের পরবর্তী কি পূর্ববর্তী তাহার সঠিক মীমাংসা হওয়া দুরাশা মাত্র।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, অমূল্যবাবুকে অগণ্য ধন্যবাদ। তাঁহার পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও গবেষণা। এতদিন পর্যন্ত যেখানে যাহা কিছু আলোচনা হইয়াছে, অমূল্যবাবু স্বীয় প্রবন্ধে প্রায় তাহার সকলগুলিরই আলোচনা করিয়াছেন। এসম্বন্ধে বৈদেশিক মত এত বিভিন্ন প্রকার আছে যে তদ্দ্বারা আমরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি। কিছুই স্থির করিতে পারি না।

তিব্বতীয় টোঙ্গুরগ্রন্থমধ্যে পাণিনি ব্যকরণ ও চন্দ্রব্যাকরণ উল্লেখ আছে। উহা দ্বারা তিব্বতীয়গণের সংস্কৃতানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাতে পাণিনির সময় সম্বন্ধে কিছুই নাই। বৈয়াকরণ পাণিনি ও কবি পাণিনির কথা প্রবন্ধকার বলিয়াছেন, তদ্ভিন্ন উক্ত পাণিনি দর্শনকার ছিলেন। দর্শনের মধ্যে পাণিনীয় দর্শন নামে এক দর্শনের উল্লেখ দেখা যায়। "সংস্কৃত ভাষাও অর্থাৎ বর্তমানকালে আমরা যে আকারে সংস্কৃত ভাষা দেখিতেছি, প্রবাদ এই লৌকিক সংস্কৃত ভাষা কবি বাল্মীকি হইতে সৃষ্টি, বাল্মীকি প্রথম কবি বটেন। কিন্তু লৌকিক ভাষার আদি স্রষ্টাই পাণিনি ; বৈদিক ও লৌকিক এই বিভাগকর্তাই পাণিনি। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা বলেন, বুদ্ধের পূর্ববর্তী সাহিত্যাদি বৈদিক ভাষায় রচিত আর পরবর্তীগুলি লৌকিক ভাযায় লিখিত। পাণিনি অপেক্ষা প্রাচীনতম ব্যাকরণ আর নাই। পাণিনির পূর্বে ঐন্দ্র ব্যাকরণ নামেই হউক আর যে কোন নামেই হউক একপ্রকার বিস্তৃত ব্যাকরণ যে ছিল, তাহার প্রমাণ পাণিনিতেই পাওয়া যায়। তবে তাহার অস্তিত্ব এখনও দেখা যায় নাই। কলাপ পাণিনির পরে রচিত কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয় কলাপ পূর্ব ব্যাকরণের মতে রচিত। পাণিনির সময় সম্বন্ধে বলা যায়,—এক উপবর্ষ পাণিনির গুরু ছিলেন ; আর এক উপবর্ষ ধননন্দের মন্ত্রী ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রের ভাষ্যে শাব্দিক উপবর্ষের মতাদি দেখিতে পাওয়া যায়। শবরস্বামীর গ্রন্থে উপবর্ষের মতাদি উদ্ধৃত। এখন পাণিনি যদি নন্দমন্ত্রী উপবর্ষের শিষ্য হন, তাহা হইলে তিনি খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক হন। প্রবাদেও কিছু সত্য আছে। শবরস্বামী বলেন 'নেম' শব্দের অর্থ অর্ধ, 'পিক' অর্থ কোকিল, 'তামরস' অর্থে পদ্ম, সুতরাং এগুলি বৈদেশিক শব্দ। যাহা হউক পাণিনি সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। এ পর্যন্ত যে সকল সাক্ষ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পাণিনিকে নিঃসন্দেহে বুদ্ধপূর্ব লোক বলা যায় না। অমূল্যবাবুর প্রবন্ধ অতি উপাদেয় হইয়াছে, আমি তজ্জন্য পুনরায় তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।
[সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৩, কার্যবিবরণী, পৃ. ১২৩-১২৫]

পাণিনি প্রবন্ধের সামান্য অংশ আপিশলী-শিক্ষা প্রবন্ধের ভূমিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

রথযাত্রা

রথযাত্রার (৩)-এর অংশটি শ্রীভারতী পত্রিকায় 'সত্যব্রত বর্মা' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষে প্রকাশিত রথযাত্রা (১ ও ২) প্রবন্ধে চারখানি বিভিন্ন দেশের রথযাত্রার ছবি ছিল—(১) সেরিঙ্গপত্তনের রথ, (২) কুম্ভকোনমের রথ, (৩) মাদ্রাজের রথ ও (৪) জাপানের রথ। ছবি অস্পষ্ট থাকায় সেগুলির পুনর্মুদ্রণ করা সম্ভব হয়নি।

দোল

এই প্রবন্ধের প্রথম কিছু অংশ 'হোলী—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে' শিরোনামায় 'শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক' মাসিক পত্রিকায় ১৩৩৩, চৈত্র সংখ্যায় (পৃ. ৩২৯-৩৩৫) প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই তিনি একটা অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছেন। সংযোজিত অংশটি এই—

"আজ হোলী—চারিদিকে লালে লাল। আবীর-কুঙ্কুম-পিচকারীর আমোদরঙে বালক-যুবা সব মাতিয়াছে। আকাশ-বাতাস রক্তিম ছটায় ভরিয়া গিয়াছে। দিকে দিকে রাধাকৃষ্ণের দোললীলার অনুষ্ঠান চলিতেছে। বৃন্দাবনে এইদিন বড় আনন্দের দিন। সাধারণে তো উন্মত্তের ন্যায় আবীর-গুলাল-রঙের ভরপুর নেশায় মশগুল ; আর সাধক যিনি—ভক্ত যিনি—তিনি প্রেমনেত্রে দেখেন—

"এ দৌউ খেলত হো হো হোরী।
নন্দ-নন্দন বৃষভানু-নন্দিনী
আবীর গুলাল লিএ কর ঝোরী॥
বৃন্দাবন কী কুঞ্জগলিন মেঁ
বোলত হো হো হোরী।
পরস্পর রঙ্গ মেঁ বোরী॥
কর-কঙ্কন কঞ্চন পিচকারী কেশর
রঙ্গ লৈ দোরী।

ছিরকত রঙ্গ ছলস হিঁয়ে হরষে
নিরখ হঁসত মুখমোরী
করে চিতবন চিতচোরী ॥

আর আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া ফলগূৎসবের অনুকারী অনুষ্ঠান করেন।"

শ্রীভারতীতেও এটি পুনর্মুদ্রিত হয় তবে প্রথম সংযোজনটি বাদ দিয়ে।

বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ১৩৩০, ৩০ ভাদ্র (ইং ১৯২৩, ১৬ সেপ্টেম্বর) মাসিক অধিবেশনে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণে সংস্কৃত, কাশীদাসী ও সঞ্জয়ী মহাভারতের আখ্যানগত পাঠভেদ পাঠ করিলেন। পরিষৎ-পত্রিকার গ—পরিশিষ্টে এই পুথির বিবরণ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁর মহাভারত প্রবন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্তসহ এই পাঠভেদের উল্লেখ করেছেন। (মহাভারত দ্র.)

প্রাচীন পুথির বিবরণ

পরিষৎ-পত্রিকার গ-পরিশিষ্ট (পৃ. ২৩-২৫)

কাশীদাসী মহাভারত

৭১। দময়ন্তী নলের গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলে, অন্যান্য রাজগণ নিজ নিজ রাজ্যে প্রতিগমন করিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

দময়ন্তী নলকে বরমাল্য অর্পণ করিলে, অন্যান্য নৃপতিগণ আপনাদিগকে অপমানিত মনে করিয়া, সকলে মিলিয়া নলকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দেবতাদের প্রসাদে নল, একসঙ্গে সকলকেই পরাভূত করিলেন। নৃপতিগণ পরাভূত হইয়া নিজ নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৭২। কলির অনুরোধে দ্বাপর, অক্ষ অর্থাৎ পাসারূপ ধারণ করিয়া পুষ্করের নিকট গমন করেন এবং কলির প্ররোচনায় নল, পুষ্করের সহিত পাসা খেলায় প্রবৃত্ত হইলে, অক্ষরূপী দ্বাপরের প্রভাবে নল পরাজিত হন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

নলকে বিড়ম্বিত করিবার জন্য কলি, দ্বাপরের সহায়তা প্রার্থনা করিলে, দ্বাপর প্রথমত কলিকে এই কার্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কলি তাহাতে সম্মত হইল না। তখন দ্বাপর, নলের মত ধার্মিক রাজার বিরুদ্ধে আমি কিছু করিতে পারিব না, এই কথা বলিয়া দেবগণের সহিত চলিয়া গেল। একমাত্র কলির প্রভাবেই নল পুষ্করের নিকট পরাজিত হইলেন।

মূল মহাভারত

বনপর্বের ৫৮ অধ্যায়ে অক্ষে প্রবেশ করিয়া সাহায্য করিতে কলি, দ্বাপরকে অনুরোধ করিয়াছে। এবং ৫৯ অধ্যায়ে দ্বাপরের সহিত কলি, নলের নিকটে উপস্থিত হইল বলা হইয়াছে। পরে আর দ্বাপরের কোন উল্লেখ নাই। কলি নিজেই পাসা হইয়া পুষ্করের নিকট উপস্থিত হইল, এইরূপ কথা আছে।

কাশীদাসী মহাভারত

৭৩। রাজা নল, বনমধ্যে দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তিনি একাকী বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক অজগরের সম্মুখে পতিত হন। তাঁহার কাতর চীৎকার-শ্রবণে এক ব্যাধ আসিয়া সাপকে মারিয়া ফেলে। দময়ন্তীর রূপে মুগ্ধ হইয়া পরে ব্যাধ তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইলে, দময়ন্তীর শাপে ব্যাধ ভস্ম হইয়া যায়। পরে তিনি বণিকগণের সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে চেদীরাজ সুবাহুর আশ্রয়ে সৈরিন্ধ্রীবেশে কিছুকাল অবস্থান করেন। দময়ন্তীর পিতৃনিযুক্ত ব্রাহ্মণ চর এইখানে তাঁহার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে পিতার নিকট লইয়া যায়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

নল, বনমধ্যে একাকী দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তিনি দুঃখিত চিত্তে ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এই সময় এক ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তাহা দেখিয়া তিনি নলের উদ্দেশে কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দময়ন্তীর পিতা কর্তৃক দময়ন্তীর অন্বেষণে নিযুক্ত চর ও সৈন্যগণ সেইদিকে আসিতেছিল। তাহারা আর্তস্বর শুনিয়া, সত্বর আসিয়া ব্যাঘ্রকে মারিয়া ফেলিল ও দময়ন্তীর পরিচয় পাইয়া, তাহাকে পিতৃসকাশে লইয়া গেল।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৭৪। ওদিকে নল, দময়ন্তীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে যাইতে দাবানলে বেষ্টিত কর্কোটক নামে একটি নাগকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে দাবানল হইতে উদ্ধার করেন। এই নাগের দংশনে নল বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হন এবং তাহারই উপদেশ মত তিনি ঋতুপর্ণ রাজার সারথিত্ব স্বীকার করিয়া সেখানে অবস্থান করেন। পরে ঋতুপর্ণের সহিত বিদর্ভনগরে যাইবার সময় নল, তাঁহার নিকট হইতে দ্রব্য-সংখ্যা-বিস্তার মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলে, সেই মন্ত্রের তেজে কলি, নল-দেহ পরিত্যাগ করিয়া যায়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

দাবানলের মুখ হইতে নল, একটি সর্পকে উদ্ধার করেন। সর্প ইহাতে পরম কৃতজ্ঞ হইয়া নলকে নানাবিধ স্তবস্তুতি করিল এবং বলিল, পাপিষ্ঠ কলি আপনার এই রূপ দুর্দশা করিয়াছে। আচ্ছা, আমি তাহার প্রতিশোধ দিতেছি। এই বলিয়া নাগ, নলের পৃষ্ঠে দংশন করিল এবং সেই বিষের জ্বালায় কলি তাঁহার শরীর হইতে বাহির হইয়া গেল। তখন নল, বিকর্ণ নামে এক রাজার দেশে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার প্রধান অমাত্যরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীরন্যায়।

পরিষৎ-পত্রিকার গ-পরিশিষ্ট (পৃ. ২৯-৩১)

কাশীদাসী মহাভারত

৭৫। অযোধ্যারাজ ঋতুপর্ণের নিকট নল গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন, চরমুখে দময়ন্তী এই সংবাদ পাইয়া মাতার সহিত পরামর্শপূর্বক সুদেব নামে এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে তথায় প্রেরণ করিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণের নিকট রাজার নামে এই মর্মে এক পত্র দিলেন যে "রাত্রি প্রভাতে দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর হইবে; দেশ-বিদেশের রাজারা পূর্বেই বিদর্ভ নগরে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনাকেও নিমন্ত্রণ করা হইতেছে।" উদ্দেশ্য, ঋতুপর্ণের সারথিরূপে নল যদি যথার্থ ই সেখানে থাকেন, তবে এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনিই ঋতুপর্ণকে লইয়া বিদর্ভে আসিতে পারিবেন, অন্য কেহ পারিবে না। কেননা, নলের ন্যায় সারথিবিদ্যা পৃথিবীতে আর কেহ জানে না। অপরদিকে স্বয়ম্বরের কথা একেবারেই মিথ্যা, কেবল নলকে আনাই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

সঞ্জয়ী মহাভারত

দময়ন্তীর পিতা, দময়ন্তীর অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত-চিত্তে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলে,—কি উপায়ে নলের সন্ধান পাওয়া যায়। মন্ত্রীদের পরামর্শে স্থির হইল, দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর ঘোষিত হইবে, তাহা হইলে নল যেখানেই থাকুন, সেই স্বয়ম্বর-সভায় নিশ্চয় আসিবেন। পরামর্শ অনুসারে পৃথিবীর সকল রাজার নিকট দূত পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করা হইল, নল যে বিকর্ণ রাজার অমাত্যরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনিও নিমন্ত্রিত হইলেন এবং বিদর্ভ নগরে স্বয়ম্বরের যথোচিত আয়োজন হইতে লাগিল।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়। তবে ঋতুপর্ণের নিকট পত্র প্রেরণের উল্লেখ নাই, দময়ন্তী সুদেবের নিকট মৌখিক ঐ সব কথা বলিয়াছেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৭৬। যথাসময়ে নলের সহিত রাজা ঋতুপর্ণ বিদর্ভরাজ ভীমের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও কুশল প্রশ্নাদির পর ভীম যখন তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি স্বয়ম্বরের কথা মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং অগত্যা ভীমের সহিত সাক্ষাৎ করিতেই আসিয়াছেন বলিলেন। তখন বিদর্ভরাজ তাঁহার অবস্থানের জন্য পৃথক প্রাসাদে স্থান দিলেন এবং অন্যান্য যাবতীয় বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বাহুক নামধারী নল অশ্বশালায় রথ ও অশ্ব রাখিয়া দিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

রাজা বিকর্ণ, দূতমুখে নিমন্ত্রিত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে বিদর্ভে যাইবেন, এই চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় নল সেখানে উপস্থিত হইলেন। বিকর্ণ তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে, নল বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে বিদর্ভে লইয়া যাইবার জন্য রাজা ভীম এইরূপ আয়োজন করিয়াছেন। তখন তিনি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বিকর্ণকে বিদর্ভে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবেন, এইরূপ আশ্বাস দিয়া উভয়ে রথারোহণে যাত্রা করিলেন এবং সেইদিনই সন্ধ্যার সময় বিদর্ভে পৌঁছিলেন। সেই সময়ে রাজা ভীম স্বয়ম্বর সমাগত অন্যান্য রাজগণকে অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। অন্যান্য রাজার ন্যায় বিকর্ণকেও তিনি সমাদরপূর্বক পৃথক্ বাসস্থানাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৭৭। অশ্বশালায় বাহুক-নামধারী নলের নিকট কেশিনী নামক একজন দূতী পাঠাইয়া নানাপ্রকার পরীক্ষান্তে দময়ন্তী যখন নিশ্চিতরূপে অবগত হইলেন যে এই ব্যক্তিই রাজা নল, তখন তিনি মাতার অনুমতি লইয়া, পুত্র কন্যাসহ অশ্বশালায় গিয়া নলের সহিত মিলিত হইলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শপূর্বক নানারূপ অনুসন্ধানান্তে রাজা ভীম অবগত হইলেন যে নল জীবিত আছেন এবং এই স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। পরদিবস যথাসময়ে স্বয়ম্বর সভার অনুষ্ঠান হইলে দময়ন্তী সেই সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে অন্যান্য রাজবৃন্দের সহিত ইন্দ্র প্রভৃতি চারিজন লোকপাল নলের আকার ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। তখন দময়ন্তী নলের অদর্শনে নানারূপ বিলাপ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে চাহিলে দেবগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া গুপ্তবেশে অবস্থিত নলকে বলিলেন যে দময়ন্তী অতিশয় পবিত্র স্বভাব, ইহার কোনও পাপ নাই। অতএব তুমি স্বরূপ ধারণ করিয়া ইঁহার সহিত মিলিত হও। দেবগণের কথা শুনিয়া নল সভা মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিলে দময়ন্তী তাঁহার গলে মাল্য অর্পণ করিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়। তবে একটু পার্থক্য এই যে দূতী দ্বারা পরীক্ষান্তে পিতামাতার অনুমতি লইয়া বাহুক-রূপী নলকে অন্তঃপুরে আনয়নপূর্বক দময়ন্তী তাঁহার সহিত মিলিত হন।

পরিষৎ-পত্রিকা খ-পরিশিষ্ট (পৃ. ৩৪-৩৫)

কাশীদাসী মহাভারত

৭৮। রাজা ঋতুপর্ণ যখন শুনিতে পাইলেন যে বাহুক-নামধারী তাঁহার সারথিই নিষধের অধিপতি রাজা নল, তখন তিনি নলের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনান্তে নানাবিধ ইষ্টালাপপূর্বক অন্য একজন সারথি লইয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

বিকর্ণ রাজা দূত দ্বারা নলকে নিজের নিকট ডাকাইয়া আনিলে নল, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বিকর্ণও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। পরে বিকর্ণকে নল, পবনমন্ত্র দান করিলে, সেই মন্ত্রে রথ চালাইয়া আকাশ-পথে তিনি দেশে গমন করিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়। ঋতুপর্ণ, নলকে নিজের নিকট আহ্বান করেন।

ইহার পর সঞ্জয়ী মহাভারতে সংক্ষেপে শকুন্তলার উপাখ্যান আছে। মূল এবং কাশীদাসী মহাভারতে এই উপাখ্যান আদিপর্বের অন্তর্গত। এই উপাখ্যানেও উভয় পুথিতে এইরূপ পার্থক্য দেখা যায়।—

কাশীদাসী মহাভারত

৭৯। শকুন্তলার পুত্র সর্বদমনের যখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার বয়স উপস্থিত হইল তখন মহর্ষি কণ্ব, কতিপয় শিষ্য দ্বারা সপুত্রা শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে, দেবগণ আকাশবাণী দ্বারা দুষ্মন্তকে জানাইয়া দিলেন যে শকুন্তলা তোমার ধর্মপত্নী এবং সর্বদমন তোমার পুত্র। ইঁহাদিগকে তুমি গ্রহণ কর। এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া, দুষ্মন্ত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পঞ্চমাস গর্ভাবস্থায়, কণ্বমুনি, শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দুষ্মন্ত ব্রহ্মশাপে শকুন্তলার সহিত তাঁহার পরিণয়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাই শকুন্তলার নানাবিধ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়াও তিনি তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন না। তখন শকুন্তলা রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একাকী অসহায়ভাবে এক প্রান্তর মধ্যে বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার জননী মেনকা আসিয়া তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গেলেন এবং শকুন্তলা সেইখানে একটি পুত্র প্রসব করেন। কি কারণে, তাহার উল্লেখ নাই—পরে দুষ্মন্ত তাঁহাকে গ্রহণ করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর অনুরূপ।

কাশীদাসী মহাভারত

৮০। ইন্দ্রের আদেশে লোমশ মুনি, কাম্যক বনে যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অর্জুনের কুশল সংবাদ জ্ঞাপনপূর্বক আশ্বস্ত করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পাঁচ বৎসর যাবৎ অর্জুনের অদর্শনে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া কাম্যক বন হইতে ধবল পর্বতে গিয়া বাস করিতেছেন। অর্জুনের প্রার্থনানুসারে লোমশ মুনি এইখানে আসিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে অর্জুনের কুশল সংবাদ জ্ঞাপন করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়। তবে ইন্দ্র অর্জুন উভয়ের অনুরোধে লোমশ মুনি যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন করেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৮১। সৌগন্ধিক পুষ্প আনিবার জন্য ভীম, গন্ধ-মাদন পর্বতে গিয়াছিলেন। তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ঘটোৎকচের সহায়তায় গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হইলেন এবং এই স্থানে অবস্থান কালে জটাসুর নামে এক অসুরকে ভীম বিনাশ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ঘটোৎকচের সাহায্যে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়া ভীমের সহিত পুনরায় কাম্যক বনে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর জরা নামে এক রাক্ষসকে ভীম কাম্যক বনে সংহার করেন।

মূল মহাভারত

যুধিষ্ঠির প্রভৃতির ভীমের সহিত গন্ধমাদন পর্বত হইতে বদরিকাশ্রমে গমন এবং সেই বদরিকাশ্রমে ভীম কর্তৃক জটাসুর নিহত হন।

পরিষৎ-পত্রিকা খ-পরিশিষ্ট (পৃ. ৩৮-৩৯)

কাশীদাসী মহাভারত

৮২। অর্জুন স্বর্গ হইতে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া, গন্ধমাদনপর্বতে অবস্থিত যুধিষ্ঠিরাদির সহিত মিলিত হয়েন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

স্বর্গ হইতে অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়া, ধবল (কৈলাস ?) পর্বতে অবস্থিত যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সহিত অর্জুন মিলিত হয়েন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি সঞ্জয়ী মহাভারতে নূতন—মূলে বা কাশীদাসীতে ইহা নাই।

৮৩। একদিন দুর্যোধন, আচার্য দ্রোণের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া এমন একটি ফল প্রার্থনা করুন, যে ফল মাটিতে উৎপন্ন বৃক্ষজাত নহে। দুর্যোধনের উদ্দেশ্য—এরূপ ফল যুধিষ্ঠির দিতে পারিবেন না। তখন ক্রুদ্ধ দ্রোণের শাপে তাঁহারা সকলে ভস্মীভূত হইবেন। দ্রোণ, কাম্যক বনে যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া, উক্ত রূপ একটি ফল প্রার্থনা করিলে, যুধিষ্ঠির প্রথমত কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে কিছুক্ষণ অবস্থান করিলেন। পরে বলিলেন, আমি যদি যথার্থ ধর্মপুত্র হই, তবে আমার হাতের উপর এখনই একটি বৃক্ষ হউক—অমনি তাঁহার হাতের উপরে একটি বৃক্ষ হইল। ভীম বলিলেন,—আমি যদি পবনের পুত্র হই, তবে এই বৃক্ষে ডাল এবং পাতা হউক, তাহাই হইল। এই রূপে অর্জুনের কথায় সেই বৃক্ষে পুষ্প, নকুলের কথায় ফল, সহদেবের কথায় সেই ফলের পুষ্টতা, এবং দ্রৌপদীর কথায় সেই ফল পাকিয়া গেলে, দ্রোণ তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া, ফল লইয়া চলিয়া গেলেন। দুর্যোধনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল।

বিরাট পর্ব

কাশীদাসী মহাভারত

৮৪। কোন দেশে এক বৎসর কাল অজ্ঞাতভাবে বাস করা যায়, পাণ্ডবগণ এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে বসিলেন। অর্জুন পাঞ্চাল, বিদর্ভ, মৎস্য, বাহ্লীক প্রভৃতি কতকগুলি দেশের নাম করিলেন। এবং তন্মধ্যে মৎস্য বা বিরাট রাজার দেশই অজ্ঞাতবাসের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া যুধিষ্ঠির স্থির করিলেন। কোনও দেশের দোষগুণ সম্বন্ধে কোন আলোচনা নাই।

সঞ্জয়ী মহাভারত

কোন দেশে অজ্ঞাতভাবে বাস করা যায়, সে সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে বসিয়া অর্জুন এক-একটি দেশের নাম উল্লেখপূর্বক সেই দেশের কি দোষ,

তাহার উল্লেখ করিতেছেন,—চেদি দেশের রাজা মণিমন্ত, তাঁহার প্রধান সেনাপতি একজন ধীবর, এইজন্য সে দেশ পরিত্যক্ত হইল। তার দক্ষিণে স্বর্ণকুম্ভ দেশ, রাজার নাম সৈবল—কিন্তু এ দেশে পান ও সুপারি নাই, অতএব এ দেশ ত্যক্ত হইল। তাহার উত্তরে আর এক দেশ আছে—রাজা সুবাহু। কিন্তু এখানে ক্ষত্রিয়ে দান গ্রহণ করে বলিয়া এ দেশ ত্যক্ত হইল। ইহার পশ্চিমে আর একদেশ, রাজার নাম—শান্তিপন। এখানে প্রত্যেক পুরুষের শত-শত স্ত্রী, তাই এখানকার পুরুষ অতি অল্পায়ু। সৌরাষ্ট্র দেশে নীল নামে রাজা, এখানে গুরু ও ব্রাহ্মণের সম্মান নাই, পিতাপুত্রে একসঙ্গে বেশ্যালয়ে যায় এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় একসঙ্গে আহার করে। ইহার পর বিরাট রাজার দেশই উপযুক্ত বলিয়া সকলে স্বীকার করিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৮৫। পাণ্ডবগণ তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র বস্ত্রদ্বারা একসঙ্গে বাঁধিয়া, বিরাট নগরের অদূরে বনমধ্যস্থ এক শমীবৃক্ষের শাখায় বাঁধিয়া রাখিলেন এবং নিকটস্থ গোপজাতীয় লোকদিগকে বলিলেন যে আমাদের বৃদ্ধাজননী পথে আসিতে আসিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার দেহ এই বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিলাম। কিন্তু বাস্তবিক কোন মৃতদেহ অস্ত্রের সহিত রাখা হইল না।

সঞ্জয়ী মহাভারত

বিরাট নগরের অদূরে শ্মশানের নিকটস্থ শমীবৃক্ষে পাণ্ডবগণ, অস্ত্রশস্ত্র বাঁধিয়া রাখিলেন এবং সেই বৃক্ষের নিকটে যাহাতে লোকজন না যায়, তজ্জন্য শ্মশান হইতে একটি মৃতদেহ আনিয়া তাহার সহিত বাঁধিয়া রাখিলেন।

মূল মহাভারত

শ্মশান হইতে মৃতদেহ আনয়নপূর্বক অস্ত্রের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া তাহাকে নিজেদের মাতৃদেহ বলিয়া নিকটস্থ গোপগণের নিকট পাণ্ডবরা বলেন।

গ-পরিশিষ্ট (পৃ. ৫১-৫২)

কাশীদাসী মহাভারত

৮৬। প্রথমে জ্যেষ্ঠানুক্রমে পঞ্চপাণ্ডব এবং সর্বশেষে দ্রৌপদী বিরাট-ভবনে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

প্রথমে যুধিষ্ঠির ও ভীম, তৎপরে দ্রৌপদী এবং তৎপরে অর্জুন, নকুল ও সহদেব বিরাটালয়ে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হন।

মূল মহাভারত

প্রথমে যুধিষ্ঠির, তৎপরে ভীম, দ্রৌপদী, সহদেব, অর্জুন ও সর্বশেষে নকুল বিরাট-গৃহে প্রবেশপূর্বক আশ্রয় প্রাপ্ত হন।

কাশীদাসী মহাভারত

৮৭। কীচক বধের পর কীচকের নিরানব্বই জন ভাই দ্রৌপদীকে কীচকের মৃত্যুর কারণ জানিয়া রাজা বিরাটের অনুমোদনক্রমে দ্রৌপদীকে কীচকের সহিত পোড়াইবার জন্য বাঁধিয়া লইয়া গেল। এদিকে দ্রৌপদীর আকুল ক্রন্দনে ভীমের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি নগরপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন-পূর্বক একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা কীচকের নিরানব্বই জন ভাইকে সংহার করিলেন। পরে দ্রৌপদীর বন্ধন মোচন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দানপূর্বক যথাস্থানে চলিয়া গেলেন। বিরাট রাজা গন্ধর্বকর্তৃক কীচকের ভ্রাতৃগণের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ভীত ও শোকাকুলিতচিত্তে শবদাহের অনুমতি দিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

বিরাটের অনুমতিক্রমে দ্রৌপদীকে কীচকের সহিত দগ্ধ করিবার জন্য বাঁধিয়া লইয়া অন্যান্য লোকজনসহ কীচকের ৯৯ জন ভাই শ্মশানাভিমুখে চলিয়াছে—এমন সময় দ্রৌপদীর কাতর ক্রন্দনে জাগরিত হইয়া ভীম প্রকাণ্ড এক বৃক্ষ হস্তে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে গন্ধর্ব আসিতেছে মনে করিয়া কীচকের ভ্রাতৃগণ এবং অন্যান্য সকলে প্রাণভয়ে পলায়ন করিলে সম্মুখবর্তী কয়েকজনকে সংহারপূর্বক ভীম, দ্রৌপদীকে

মুক্ত করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে গন্ধর্বের ভয়ে নগরের কোন লোক বাহিরে আসে না। শবানুযাত্রী ও কীচকের ভাইরা গিয়া বিরাট রাজাকে বলিল,—আমরা কীচককে দাহ করিতে পারিলাম না। শ্মশানের কাছে গেলেই গন্ধর্বরাজ বৃক্ষহস্তে আমাদিগকে মারিতে আইসে। অতএব আপনি ইহার ব্যবস্থা করুন। রাজা তখন ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, বল্লব ব্রাহ্মণ (ভীম) ব্যতীত আর কেহ কীচককে দাহ করিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া বল্লব নামধারী ভীমকে আনুপূর্বক বৃত্তান্ত বলিলে ভীম রাজাকে পরামর্শ দিলেন যে, বহু লোকজন লইয়া শ্মশানে গেলে সেই লোক কোলাহল শুনিয়া গন্ধর্বরাজ ধাইয়া আসিবে, অতএব আমার মতে আমি একক গিয়া কীচককে দাহ করিব এবং আর সকলে এক-এক জন করিয়া আমাকে ক্রমশ কাষ্ঠ দিয়া আসিবে। রাজা এই পরামর্শ গ্রহণ করিলে তদনুরূপ ব্যবস্থা হইল এবং ভীম গিয়া চিতা প্রস্তুত করিয়া কীচককে দাহ করিতে লাগিলেন। এদিকে কীচকের ভাইরা এক-এক জন করিয়া কাঠ লইয়া যেমন ভীমের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল, ভীম অমনি প্রত্যেককে ধরিয়া কীচকের চিতায় নিক্ষেপ করিয়া দাহ করিতে লাগিলেন। এই রূপে ৯৯ জন ভাইকে কীচকের সহিত পোড়াইয়া মারিয়া রাজার নিকট গিয়া ভীম বলিলেন যে, আমার নিকট এক-এক ভার কাষ্ঠ দিয়া কীচকের শোকে তাহার ভাইরা সকলেই চিতায় দেহত্যাগ করিয়াছে। রাজা শোকাকুল চিত্তে শ্মশানে গিয়া কাতর নয়নে সেই সকল দৃশ্য দর্শন করিলেন।

মূল মহাভারত

ভীম ১০৫ জন উপকীচককে (কীচকের ভ্রাতা বা বান্ধব) বৃক্ষাঘাতে নিহত করেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৮৮। দক্ষিণ গোগৃহে রাজা সুশর্মা বিরাটকে যুদ্ধে বন্দী করিয়া লইয়া গেলে যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম একাকী গিয়া, সুশর্মার সৈন্যসকল বিনাশপূর্বক দুই হাতে বিরাট ও সুশর্মা দুই জনকে ধরিয়া লইয়া আইসেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

রাজা বিরাটকে সুশর্মা বন্দী করিয়া লইয়া গেলে বিরাটের সৈন্যসকল একত্রিত করিয়া যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব চারি ভাই সুশর্মার সহিত যুদ্ধ করেন। ভীমের শরজালে সুশর্মার রথ ও অশ্ব বিনষ্ট হইলে, সেই অবসরে বিরাট, সুশর্মার রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্বক নিজ সৈন্যদলে মিলিত হন এবং পরে ভীম সুশর্মাকে বন্দী করিয়া আনেন।

মূল মহাভারত

সঞ্জয়ী মহাভারতের ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৮৯। উত্তর-গোগৃহে অর্জুনের সম্মোহন বাণে কুরুপক্ষের যাবতীয় লোক মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

সঞ্জয়ী মহাভারত

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য ও অশ্বত্থামা এই চারিজন ব্যতীত কুরুপক্ষের অন্য সকলেই অর্জুনের সম্মোহন বাণে মুগ্ধ হইয়াছিল।

মূল মহাভারত

একমাত্র ভীষ্ম ব্যতীত আর সকলেই অর্জুনের সম্মোহন বাণে মোহিত হইয়াছিল। ভীষ্ম এই অস্ত্রের প্রতিষেধ জানিতেন বলিয়া তিনি মুগ্ধ হন নাই।

পরিশিষ্ট—খ

(প্রসঙ্গ-কথা)

অসুর-জাতি

2 হনলি : ৬ষ্ঠ খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্র.

9 Tella : পাঠ এরূপ হবে—প্রাচীন সভ্যতার অনেক নিদর্শন বিভিন্ন স্তরে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সভ্যতা খ্রী-পূ. ৪০০০-৩০০০ বৎসর স্থায়ী ছিল।—MMBA. pp. 120, 135, 243

অনার্য

17 Dr. Giles : ভাষাতত্ত্ববিদ। কেম্ব্রিজের ইমান্নুয়েল কলেজের ফেলো এবং অধ্যাপক। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের রীডার। গ্রন্থ—A Short Manual of Comparative Philology ই.।

অদিতি

4 কোলিনে, 9 ওয়ালিস ও 12 কৃষ্ণস্বামী ঘুলে : এঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। এঁদের বক্তব্যের প্রামাণ্য তথ্য প্রবন্ধেই দেওয়া আছে।

ভারতে লিপির উৎপত্তি

24 জেসেনিয়স (Gesenius, Friedrich Heinrich Wilhelm) : জর্মন প্রাচ্যবিদ্যাবিদ। জন্ম ১৭৮৭ খ্রী.। মৃত্যু ১৮৪২ খ্রী.।

29 পেপী (Peppé) : ইনি Piprāhwā অর্থাৎ পিপ্রাহ্বা (বাংলা পিপ্রাহোয়া) নামে গ্রামে বৌদ্ধস্তূপ এবং তার মধ্যে বুদ্ধের

দেহাবশেষ সমেত লেখযুক্ত পেটিকা আবিষ্কার করেন ১৮৯৮ খ্রী.। এঁর প্রবন্ধ JRAS-এ ১৮৯৮ খ্রী. প্রকাশিত হয়। পেপী সাহেবের কোন জীবন-চরিত পাওয়া যায় নি।

ভারতীয় অক্ষরের প্রাচীনত্ব

6 স্বামী জ্ঞানানন্দ: ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে পণ্ডিত জয়স্‌ওয়াল ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারিতে স্বামী জ্ঞানানন্দ আবিষ্কৃত বিক্রমখোল লিপি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। স্বামীজি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

অথর্ববেদ

7 ড. রাইডার: ইনি ল্যানম্যানের সহযোগে হুইটনীকৃত অথর্ববেদের ঋষিদের তালিকা পরীক্ষা করেন।

12 শ্রীতত্ত্বনিধি (বা চামুণ্ডাদিদেবতালক্ষণ): কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত। মহীশূর-স্টেটের ৭নং পুথি। ১৮২৩ শক বা ১৯৫৮ সংবতে বোম্বে থেকে ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস কর্তৃক প্রকাশিত। ক্ষেমরাজের সংস্করণের ৯৬ পৃ. অথর্ববেদ মূর্তি কল্পিত আছে।

পাণিনি

12 বুস্তন: ভ্রমক্রমে এটিকে গ্রন্থ বলা হয়েছে। এটি গ্রন্থ নয়। বুস্তন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের শিষ্য এবং চরিতকার।—গৌড়রাজমালা, পৃ. ৪৫।

নির্দেশিকা

('...' চিহ্নিত অংশ বই-এর নাম)

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা/পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮।১২	পশুগণের	পশুর্গণের
২৫।২০	boghas-koi[১৮]	boghas-koi[18]
২৭।২৬	কীলহর্ন	কীলহর্ন[19]
৩০।৭	হর্নলি	হনলি
৩৬।২৭	কুল্লুট	কুল্লুক
৫৫।২২	বুন্থ্‌ক	বুর্ন্থ্‌ফ
৮৯।১৮	শাস্ত্র	শস্ত্র
১০১।২১	মেষসমূহের	মেঘসমূহের
২৫৬।১৪	উৎকর্ণ	উৎকীর্ণ
২৮৫।২৮	ভারন-	ভারত-
২৯৪।১৭	গঙ্গাধরদাস	গদাধরদাস
২৯৭।২	(শক ১৪০২)	(শক ১৮০২)
৩১৩।১৯	কণ্‌স্‌স	কণ্‌হস্‌স
৪৩০।২২	দাক্ষের	দাক্ষেয়
৪৪০।২২	ই-সিঙ-সিঙ	ই-সিঙ
৪৮৪।২৭	ই	দুই